লেখক

ভ্রমশুদ্ধি।

"একবারকার যোগী আর এক একবার বোজা" নামক প্রবন্ধের ভিতরের পৃষ্ঠা নম্বর ভুলক্রমে ৩৪৭ স্থলে ৩৪৩ এবং সংবাদ ও মন্তব্য ৩৫০ স্থলে ৩৪১ ছাপা হইয়াছে। পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন

গীতাশাঙ্কর ভাষ্যানুবাদের পৃষ্ঠা নম্বর পৃষ্ঠার নীচে দেখিবেন।

সামাজিক ছবি।

(নং ১)

—০:*:০—

"শ্যাম গেও মধুপুর, হাম কুলবালা,
বিপথে পড়ল সখি মালতী মালা।"

পূর্ণ বাবুর বৈঠকখানায় হারমনিয়ম ও ডাইনে ডুবকির বাজনার সঙ্গে একখানি মিঠা গলা গাহিতেছিল,

"বঁধু গেও মধুপুর"

বাহিরে চাঁদনি সন্ধ্যা। বিরহসন্তপ্ত গোপ-বধূর আক্ষেপ প্রতিধ্বনি তান তরঙ্গে গা ভাসাইয়া নিশ্চল জ্যোৎস্নাসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যাটি যথার্থই 'শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতা।' পাছে তাহার সৌন্দর্য্য-রাশি মূকতা রূপ অঙ্গ-হীনতা দোষে দূষিত হয়, তাই বুঝি কেহ ছবি খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য স্বীয় মোহিনী শক্তি বিস্তার করিয়া মধুর মানব কণ্ঠ সৃষ্টি করিয়াছিল।

"শ্যাম গেও মধুপুর"

সেই সন্ধ্যায় সেই মধুর কণ্ঠের কুহকে বড় কাহারও শীঘ্র চলিয়া যাইবার শক্তি রহিল না। পূর্ণ বাবুর বৈঠকখানার সম্মুখে সাধারণ রাস্তায় লোক দাঁড়াইয়া গেল। দুটি যুবক সন্ধ্যা সমীরণ সেবন করিয়া সেই পথে ফিরিয়া যাইতেছিল, তাহারাও দাঁড়াইল।

গায়ক আবার ধরিল,

"গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল;
আমার এ রূপ যৌবন, পরশ রতন
কাঁচের সমান ভেল।"

এমন সময় যুবক দুটীর দৃষ্টি বৈঠকখানার উপরের ঘরে জানালার দিকে আকৃষ্ট হইল। কারণ, হঠাৎ সেই জানালা দিয়া একটি আলো দেখা গেল এবং একটি বিরক্তিপূর্ণ স্বর বলিল, "এখানে একলা বসে আছিস কেন, কি হচ্ছে এখানে?"

"ব্যাপারটা বুঝ্লে ?" একটি যুবক অপরটিকে বলিল।

"বুঝ্লুম বৈ কি। কি অন্যায়। মেয়েটি বিধবা হয়েছে বলে গান শুন্তেও দোষ। চল। আমার আর ভাল লাগ্‌ছে না।"

"দোষ হ'তে পারে বৈ কি। পূর্ণ বাবুর বাড়ীতে গাওনা বাজনা করা উচিত নয়।" চলিতে চলিতে প্রথম যুবকটি বলিল।

"কি রকম? মেয়ে বিধবা হয়েছে বলে পূর্ণ বাবুকেও বৈধব্য গ্রহণ করতে হবে নাকি।"

"মেয়ের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা উদ্দেশ্য থাক্‌লে কিছু তপস্যা, আত্মসংযম কর্‌তে হবে বৈ কি। যুবতী মেয়ে—এক বছর হয়নি বিধবা হয়েছে, বাপ সেই মেয়ের কাণের কাছে বৈটকখানায় বিরহসংগীত গাওয়াচ্ছেন। মেয়ে নিজের বাড়ীতে ও পাড়ায় অনবরত ইন্দ্রিয়সম্ভোগের ও কামের চর্চ্চা শুন্‌ছে ও দৃষ্টান্ত দেখ্‌ছে। একে দুরন্ত যৌবন, তার উপর এত উদ্দীপন, ব্রহ্মচর্য্যার অবসর কোথায়?"

"একথা মানি। কিন্তু বাড়ীতে একজন বিধবা হলে বাড়ীশুদ্ধ বিধবা হতে হবে, এও ত বড় অস্বাভাবিক ব্যাপার। তার চেয়ে বিধবা বিবাহ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।"

"তাতে লাভ হবে না। বিধবাবিবাহ সমাজে চলে গেলে বিধবা-দের জ্বালাগুলি কুমারীদের পোয়াতে হবে। মেয়েদের সংখ্যা স্বভাবতঃ পুরুষের চেয়ে বেশী। সমান সমান ধর্‌লেও যতগুলি বিধবা দুবার বিবাহ কর্‌বে, ততগুলি কুমারীর বিবাহ হবে না। কাযেই পতি অভাবে বিধ-বাদের যে অবস্থাগুলি হচ্ছে, কুমারীদের ঠিক সেই গুলি হবে। লাভের মধ্যে কুমারীদের উপর অবিচারটা জ্যাদা হবে, কারণ, বিধবাদের এক বারের অধিক পতি লাভের অবসর দেওয়া হলে, তারা একবারও পাবে না।

"বটে। তাই বুঝি বলে, য়ুরোপে বিবাহের বাজারে বিধবাদের জন্য কুমারীদের বর মেলা ভার। তা হলে উপায় কি? আমি ত কিছু বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।"

"প্রশ্নটা গুরুতর। এক কথায় মীমাংসা হবার নয়। সব দেশে সব সমাজেই এই গোল আছে। তবে আমাদের সমাজে বাড়ার ভাগ কতকগুলো মিছে জঞ্জাল জন্মে ব্যাপারটাকে আরও খারাপ করে তুলেছে। এই বাজে আমেদ গুলোকে এখনি উঠান উচিত। তা হলে দুঃখ অনেক লাঘব হবে"—

"কি সেগুলো?"

"প্রথম বাল্য বিবাহ। একে ত এ প্রথাটা মহা অস্বাভাবিক, সমস্ত জাতটাকে নির্বীর্য্য করে ফেলেছে। মনে কর, উনিশ কুড়ি বছর বয়স না হলে মেয়েদের শরীর পুষ্ট হয় না, গর্ভ ধারণে পরিপক্কতা হয় না। আর তের বছরে সন্তান হচ্ছে। এরকম পুরুষানুক্রমে কত শতাব্দী ধরে হয়ে আসছে। কচি বাঁশে ঘুন ধরে, কচি গাছে তক্তা হয় না, এ সব কথা আমাদের দেশের লোকে খুব বোঝে। আর এইটুকু বোঝে না যে, কচি ছেলের ছেলে হওয়া কত অনিষ্টজনক। আমাদের দেশের লোকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী, আত্মনির্ভরশীল হবে কি করে? কারুর যে হাড় শক্ত হতে পায়নি। মানুষের গুণ দোষ পুরো পেতে হলে মানুষের শরীরটা পুরোমাত্রায় পাওয়া চাই। দুশ পুরুষ ধরে বিশ বাইশ বছরের বাপ, আর তের চোদ্দ বছরের মা হয়ে আসছেন, শরীর গড়বে কি করে? তাই না আমরা শারীরিক বা মানসিক বলের কায করতে পারি না, কোন জাতীয় বা সামাজিক একটা বড় কায করতে পারি না? যারা চেষ্টা করতে যায়, ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে তাদের অধিকাংশকে মানব লীলা সম্বরণ করতে হয়। জমায় বল নাই, খরচ করে কি?

"আমারও মত তাই। আমি বলি, দশ বছর যদি আকাল পড়ে, বিবাহটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কতকটা মঙ্গল হয়। সে যা হোক, —আমাদের বিধবাদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।"

"হাঁ। উনিশ কুড়ি বছর বয়সে মেয়েদের বিবাহ হলে, বাল বিধবা থাকবে না। আমাদের সমাজে বালবিধবাদের যন্ত্রণাই ভয়ানক। দ্বিতীয় কথা, মেয়েদের লেখা পড়া শেখান। লেখা পড়া শিখলে আপনাদের ভাল মন্দ বুঝতে পারবে, আপনার পায়ে দাঁড়াতে পারবে, আপনাদের কষ্ট লাঘব করবার উপায় করতে পারবে। তৃতীয় কথা, চিরকুমারী থাকার প্রথা প্রবর্ত্তন করা। অনেকের মত, বৈদিক সময়ে, এমন কি, মহাভারতের সময়েও আমাদের সমাজে এ প্রথা ছিল। মেয়েদের বিবাহ ছাড়া গতি নাই, এ কথার মানে কি? পুরুষের বেলা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের চেয়ে উচ্চদশা আর নাই, আর মেয়েদের বেলা উল্টো বুঝি? এ সব লক্ষ্মীছাড়া ভুলগুলো সামাজিক মন থেকে হঠাতে না পারলে হিন্দুজাতির কল্যাণ নাই।

তাড়িত-রহস্য।

প্রথম প্রস্তাব।

(শ্রীঅনাথনাথ পালিত এম, এ)

প্রকৃতি-বিজ্ঞান মনুষ্যজাতির সুখস্বচ্ছন্দতাসম্বর্দ্ধনে যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। পাশ্চাত্যজাতীয়েরা আজ যে সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া আপনাদিগকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছেন, প্রকৃতিবিজ্ঞান শাস্ত্রের সমুন্নতি যে সেই সভ্যতার মূল, ইহা কে অস্বীকার করিবে? বিজ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা প্রকৃতির রহস্যউদ্ভেদে সমর্থ হইয়া মানব এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন। বিশ্বরাজ্যে নিত্য কত নূতন ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনুষ্যের জ্ঞানভাণ্ডার বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রকৃতিদেবীর কখনও প্রশান্ত মূর্ত্তি কখন বা রুদ্র মূর্ত্তি অনুধ্যান করিতে করিতে ভাবুক কত গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সাধারণ লোকের চিন্তার অবিষয়ীভূত তুচ্ছ ঘটনা কত শত মহতী গবেষণার সাহায্য করিয়াছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা মনুষ্যসমাজের উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাদিগের অধিকাংশই তাড়িতবিজ্ঞানমূলক। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে কে জানিত যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ প্রেরিত হইয়া সহস্র নর নারীর চিন্তাকুল মনে শান্তি আনিতে পারে? কে জানিত যে, যানবিশেষ দ্বারা স্বল্পকাল মধ্যে ভূগর্ভবর্ত্তী পথে অনায়াসে সুদূরপর্য্যটন সাধিত হইতে পারে? কে জানিত যে, রশ্মিবিশেষ দ্বারা অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতিরেকে দেহের অভ্যন্তরস্থ অস্থিসমূহ অতি সহজে পরীক্ষিত হইতে পারে? কে জানিত যে, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্ ক্রিয়াবিশেষের অধীন হইলে একই প্রতিঘাত দ্বারা বিশ্বরাজ্যস্থ একই শক্তির

---

* ইতিপূর্ব্বে উদ্বোধনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রতি শনিবার মেট্রোপলিটান কলেজ গৃহে কলিকাতা বিবেকানন্দসমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীঅনাথনাথ পালিত মহাশয় বহু পরীক্ষার সহিত বিজ্ঞানবিষয়িণী বক্তৃতা করিতেছেন। এই প্রবন্ধে সেই বিষয়গুলিই উদ্বোধনের পাঠকবর্গের উপকারের নিমিত্ত আরও বিস্তৃত ও সরলভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ইতি সং।

পরিচয় দিতে পারে? যে তাড়িতবিদ্যালোচনা দ্বারা এই সকল মহোপকার সাধিত হইয়াছে, নিম্নে তৎসংঘটিত ব্যাপার সমূহের যথাযথ বিচার করা গেল।

ঘর্ষণজ তাড়িত, তাড়িতের লক্ষণ ও প্রকারভেদ। তাড়িতদোলক।

১। পদার্থদ্বয়ের সংঘর্ষণে উভয়েই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড আকর্ষণ রূপ গুণ প্রাপ্ত হয়, ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে পণ্ডিতেরা জানিতেন। একখানি শুষ্ক রেশমী রুমাল একখণ্ড লাক্ষার সহিত ঘর্ষণ করিলে দেখা যায় যে, লাক্ষাটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজকে আকর্ষণ করিতে পারে। আরও দেখা যায় যে, অন্ধকারে লাক্ষাখণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। এই আকর্ষণ ও স্ফুলিঙ্গ যে শক্তির পরিচায়ক, তাহাই "তাড়িত"। রেশমী রুমালের সহিত ঘর্ষণ দ্বারা শুষ্ক কাচদণ্ডও এইরূপ আকর্ষণী শক্তি প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠফলকে আবদ্ধ ধাতুদণ্ড হইতে রেশমী সূত্র দ্বারা আলম্বিত অতি ক্ষুদ্র শোলা খণ্ডের বা "তাড়িত-দোলকের" (Electric Pendulum) নিকট তাড়িতযুক্ত লাক্ষাদণ্ড (গালার বাতি) আনিলে দেখা যায় যে, শোলাটি প্রথমে নিকটে আসিতেছে, পরে দূরে চলিয়া যাইতেছে। এক্ষণে লাক্ষা-সংস্পর্শনে তাড়িতযুক্ত শোলার নিকট ঘৃষ্ট কাচদণ্ড আনয়ন করিলে দোলকটি আকৃষ্ট হইবে। তাড়িতযুক্ত শোলাটি ঘৃষ্ট লাক্ষা দ্বারা বিকৃষ্ট ও ঘৃষ্ট কাচ দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কাচে ও লাক্ষায় বিরুদ্ধধর্ম্মী তাড়িত উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিরুদ্ধধর্ম্মবিজ্ঞাপনের জন্য কাচে "ধন" (+Plus বা Positive) ও লাক্ষায় "ঋণ" (−Minus বা Negative) তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে, কহা যায়। ধর্ম্মবৈষম্যসূচনা ব্যতীত ধন ও ঋণ এই দুই সংজ্ঞার অন্য কোনও বিশেষ অর্থ নাই। একই পদার্থ—যেমন কাচ, পশমের সহিত ঘর্ষণে ঋণতাড়িতযুক্ত ও রেশমের সহিত ঘর্ষণে ধনতাড়িতযুক্ত হয়।

তাড়িতাকর্ষণ অন্যোন্যাশ্রয়ী

২। যেমন তাড়িতযুক্ত কাচদণ্ড তড়িদ্বর্জ্জিত শোলা খণ্ড বা তাড়িতদোলককে আকর্ষণ করে, সেইরূপ রেশমী সূত্র দ্বারা আলম্বিত হইলে তড়িদ্বিযুক্ত পদার্থ দ্বারা উহা নিজেও আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ যদি কাচদণ্ডের নিকট হস্ত স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহা হস্তের নিকটে আসে এবং হস্ত সরাইলে তাহাকে অনুসরণ করে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, দুইটি পদার্থের মধ্যে একটি তাড়িতযুক্ত ও

অপরটি তাড়িতবিহীন হইলে উভয়েই পরস্পর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তবে যেটি সঞ্চলনসমর্থ, তাহারই গতি দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। আলম্বিত ঘৃষ্ট কাচদণ্ডের নিকট অপর একটি ঘৃষ্ট কাচদণ্ড আনিলে প্রথমটি দূরে চলিয়া যায়, কিন্তু ঘৃষ্ট লাক্ষাদণ্ড আনিলে তাহার নিকটে আসে।

বিষম তাড়িতে আকর্ষণ, সম তাড়িতে বিকর্ষণ।

এইরূপ আলম্বিত ঘৃষ্ট লাক্ষা অপর ঘৃষ্ট লাক্ষাদ্বারা বিকৃষ্ট ও ঘৃষ্ট কাচ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, "সম"তাড়িতযুক্ত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে "বিকর্ষণ" (Repulsion) ও "বিষম" তাড়িতযুক্ত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে "আকর্ষণ" (Attraction) ঘটে। পূর্ব্ববর্ণিত লাক্ষাস্পৃষ্ট তাড়িতদোলকে সম-তাড়িতের উৎপত্তি হওয়াতেই উহা ক্ষণকাল পরে লাক্ষা হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিল।

৪। পদার্থদ্বয়ের পরস্পর মর্দ্দনে উভয়েই তাড়িতযুক্ত হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, একটিতে ধন ও অপরে ঋণ তাড়িত উৎপন্ন হইয়াছে; আরও

মর্দ্দিত পদার্থদ্বয়ে সমান পরিমাণ বিষম তাড়িতের উৎপত্তি।

জানা যায় যে,উভয় তাড়িতেরই পরিমাণ সমান। কেননা মর্দ্দিত পদার্থদ্বয় (যেমন কাচদণ্ড ও রেশম) পরস্পর সংস্পৃষ্ট অবস্থায় তাড়িতযুক্ত দোলকের নিকট আনীত হইলে দোলকটি নিশ্চল থাকে কিন্তু একে একে আনীত হইলে একটি দ্বারা আকৃষ্ট ও অপরটি দ্বারা বিকৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, একে যে পরিমাণ ধন তাড়িত জন্মিয়াছে, অপরে ঠিক ততটুকু ঋণ তাড়িত জন্মিয়া পরস্পরের ক্রিয়াকে ব্যর্থ করিয়াছে।

৫। তাড়িতদোলকের ন্যায় কাষ্ঠফলকে আবদ্ধ সূচীমুখে অতি শিথিলভাবে আশ্রিত ও অবাধে সঞ্চলনসমর্থ যে কোনও অতি লঘু দণ্ড (যেমন খড়, হংসপুচ্ছ বা কাষ্ঠ) দ্বারাও তাড়িতের সত্তা পরীক্ষা করা যায়। এইরূপ

সাধারণ তড়িদ্বীক্ষণ, স্বর্ণপত্র তড়িদ্বীক্ষণ।

যে কোনও যন্ত্রকে "তড়িদ্বীক্ষণ" (Electroscope) কহে। আরও সূক্ষ্মতর উপায়ে পরীক্ষা করিতে হইলে একটি মোটা কাচের বোতলের তলা কাটিয়া ফেলিয়া বোতলকে একখানি কাঠে বসাইতে হইবে; এখন উহার ছিপি ভেদ করিয়া একটি পিত্তল-শলাকা প্রবেশ করাইতে হইবে, যাহার ঊর্দ্ধপ্রান্তে বৃত্তাকার পিতলের পাত

বা বর্ত্তুল থাকিবে ও অধঃপ্রান্ত হইতে দুইখানি অতি পাতলা সোণালির তবক ঝুলিবে পরে "রাং" নামক কোমলধাতুর দুইখানি পাত সোণালির তবকের সম্মুখে বোতলের ভিতর পিঠের সহিত এরূপে সংলগ্ন করিতে হইবে যে, উহারা তলার কাঠকে স্পর্শ করিতে পারে। এইরূপে যে যন্ত্র প্রস্তুত হইল, তাহাকে "স্বর্ণপত্র তড়িদ্বীক্ষণ" (Gold-Leaf Electroscope) বলে। যন্ত্রটিকে অল্পকাল রৌদ্রে রাখিলে উহা শুষ্ক হইবে। এখন কোনও মর্দ্দিত পদার্থকে উহার বর্ত্তুলের সহিত স্পর্শ করিলে সোণালির পাত দুইখানি ফাঁক হইয়া যাইবে, কেননা পদার্থ হইতে সমধর্ম্মী তাড়িত উভয় পত্রে সঞ্চালিত হইয়া পরস্পরকে বিকৃষ্ট করে।

৬। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মর্দ্দন বা ঘর্ষণ দ্বারা সকল পদার্থেই তাড়িত উৎপন্ন হয়, কিন্তু কতকগুলি পদার্থ তাড়িত সংরক্ষণ করিতে পারে, অপরগুলি পারে না। প্রথমোক্ত শ্রেণীকে "অপরিচালক" (Non-Conductor) শেষোক্তকে "পরিচালক" (Conductor) কহে।

অপরিচালক বা তাড়িত রক্ষক, পরিচালক।

ধাতুপদার্থ, হস্ত ইত্যাদি তাড়িতের পরিচালক; কাচ, লাক্ষা, ধুনা, গন্ধক, রেশম, পশম, ফ্লানেল প্রভৃতি অপরিচালক। পরিচালক পদার্থে তাড়িত উদ্ভূত হইবামাত্র সন্নিহিত অন্য পদার্থে অথবা পৃথিবীতে চলিয়া যায়; এই জন্য উহাতে তাড়িতের সত্তা দেখা যায় না। কোনও পিত্তল দণ্ডে বা বর্ত্তুলে তাড়িত-রক্ষা করিতে হইলে কাচ বা অন্য অপরিচালক-পদার্থনির্ম্মিত দণ্ডের অবলম্বন ব্যবহার করিতে হইবে। এইরূপে সুরক্ষিত পিত্তলবর্ত্তুল রেশম দ্বারা মর্দ্দিত হইলে উদ্ভূত তাড়িত উহার পৃষ্ঠের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকিবে, কেননা পরিচালনশক্তি নিবন্ধন তাড়িত মর্দ্দিত অংশ হইতে অমর্দ্দিত অংশে চলিয়া যায়। কাচের পায়াযুক্ত চৌকিতে দণ্ডায়মান কোনও লোককে বিড়ালের চামড়া বা ভাল গরম ফ্লানেল দিয়া জোরে আঘাত করিলে উহার গাত্রে সর্ব্বত্র তাড়িত জন্মে; অঙ্গুলি মুড়িয়া উহার গ্রন্থিস্থলকে ঐ লোকের গাত্রের যে কোনও স্থানের, বিশেষতঃ নাসিকা ও কর্ণের নিকট লইয়া গেলে পিট্ পিট্ শব্দ করিয়া তড়িৎস্ফুলিঙ্গ অঙ্গুলিতে আসে। কিন্তু মর্দ্দিত কাচদণ্ডের কেবল মর্দ্দিত অংশেই তাড়িতের সত্তা পাওয়া যায়। সুবিধা পাইলেই তাড়িত পৃথিবীতে চলিয়া যায়।

৭। এই প্রস্তাবে যে তাড়িতের বিষয় বর্ণিত হইতেছে, তাহাকে "স্থিতিশীল" (Statical) তাড়িত কহে, কেননা ইহা পদার্থের পৃষ্ঠে স্থির ভাবে থাকে, উহার অভ্যন্তরে স্রোতের ন্যায় সঞ্চারিত হয় না। স্থিতিশীল তাড়িত, পদার্থের বহিষ্পৃষ্ঠেই থাকে, অভ্যন্তরে যায় না—

স্থিতিশীল তাড়িত; উহার অধিষ্ঠান—পদার্থের বহিষ্পৃষ্ঠ।

এই ব্যাপার পরীক্ষা করিতে হইলে, একটি ছিদ্রযুক্ত ও সুরক্ষিত * তড়িদ্বিশিষ্ট ফাঁপা পিত্তলবর্ত্তুলের অন্তঃপৃষ্ঠের সহিত কাচদণ্ডসংলগ্ন একটি শোলা-খণ্ডকে স্পর্শ করাইতে হইবে; পরে উহাকে তড়িদ্বীক্ষণের নিকট স্থাপন করিলে বুঝা যাইবে যে, শোলাটিতে তাড়িতোদ্ভব হয় নাই; অতএব পিত্তল বর্ত্তুলের অন্তঃপৃষ্ঠে তাড়িত নাই। কিন্তু বর্ত্তুলের বহিষ্পৃষ্ঠসংস্পর্শে শোলাটি তাড়িতযুক্ত হয় সুতরাং তাড়িত পদার্থের বহিষ্পৃষ্ঠেই থাকে। একটি সুরক্ষিত খাঁচা বা ফাঁপা ধাতুপদার্থের অভ্যন্তরে স্বর্ণপত্র তড়িদ্বীক্ষণ স্থাপন করিয়া আধারটিকে তাড়িতোদ্ভব যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিলে স্বর্ণপত্রদ্বয় ফাঁক হইয়া যায় না। খাঁচাটির ভিতর একটি পাখী পুরিয়া খাঁচাটীকে কাচের পায়াযুক্ত কাঠের টুলে বসাইয়া তাড়িতযুক্ত করিলে পাখীটীর শরীরে কোনও ক্ষতি হয় না।

৮। স্থিতিশীল তাড়িত পদার্থের পৃষ্ঠে সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে থাকে না। যে স্থান সূক্ষ্ম, সেই স্থানেই অধিক পরিমাণে সম্মিলিত হয়। কেবল বর্ত্তুলপৃষ্ঠেই সর্ব্বত্র সমান পরিমাণ তাড়িতের সত্তা দেখা যায়। ডিম্বাকৃতি পদার্থের দীর্ঘতম অক্ষের প্রান্তদ্বয়ে

পদার্থপৃষ্ঠে তাড়িতের অসমান স্থিতি।

অধিক পরিমাণ তাড়িত থাকে। সূচীমুখ শলাকাযুক্ত পদার্থে তাড়িত সঞ্চার করিলে তাড়িত সত্বর সূচীমুখে সন্নিহিত বায়ুরাশিতে সঞ্চারিত হয় বলিয়া পদার্থটি তড়িদ্বিযুক্ত হইয়া যায়। তাড়িতযুক্ত পদার্থের সহিত প্রজ্বলিত দীপশিখা স্পর্শ করিলে শিখাস্থ বিন্দু সমূহের সাহায্যে পদার্থটি তড়িদ্বিহীন হয়।

৯। একটি সুরক্ষিত পিত্তলবর্ত্তুলকে তাড়িতধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া অন্য একটি "উদাসীন" (Neutral) বা অনুত্তেজিত পিত্তলবর্ত্তুলের সহিত সংলগ্ন করিলে প্রথমটির তাড়িত দ্বিতীয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চারিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা

* সচরাচর কাচের পায়াযুক্ত কাঠের টুল বা চৌকি দ্বারা তাড়িত সুরক্ষিত হয়।

জানা যায়, যে, যদি উভয়ের ব্যাস সমান থাকে, তবে তাড়িত সমভাগে বিভক্ত হয়, নচেৎ ব্যাসের অনুপাতে উভয়ে তাড়িত সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ যদি প্রথমটির ব্যাস দ্বিতীয়ের ব্যাসের দুই, তিন ইত্যাদি গুণ হয়, তবে প্রথমটির তাড়িতের পরিমাণ দ্বিতীয়স্থিত তাড়িতের দুই, তিন ইত্যাদি গুণ হইবে। সাধারণতঃ—কাচদণ্ডে আঁটা দুইটি পরিচালক পদার্থের মধ্যে যদি একটিতে তাড়িত থাকে, আর একটিতে তাড়িত না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগকে ছোঁয়াইবামাত্র অথবা কোন তার দিয়া সংযুক্ত করিবামাত্র প্রথম পদার্থের তাড়িত উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে; অবশ্য এই বিভাগের পর দেখা যাইবে যে, যে পদার্থটির "তাড়িতধারণাশক্তি" (Capacity) যত বেশী, সেটি তত বেশী তাড়িত পাইয়াছে। এস্থলে বলা বাহুল্য, যে, বর্ত্তুল বা ভাঁটার মতন জিনিষের তাড়িতধারণাশক্তির পরিমাণ—উহার ব্যাসের দ্বারা হইয়া থাকে; অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, একটা ভাঁটার ব্যাস আর একটির ব্যাসের দশগুণ হইলে, প্রথমের তাড়িতধারণাশক্তি দ্বিতীয়ের তাড়িতধারণাশক্তির দশগুণ হইবে।

তাড়িতের পুনর্বিভাগ।

১০। ঘর্ষণ (মর্দন) বা স্পর্শন ভিন্ন অন্য উপায়েও তাড়িত উৎপন্ন করা যায়। কাচদণ্ডে আঁটা ধাতুর ভাঁটার নিকট ধনতাড়িতযুক্ত দণ্ড আনিলে উহার সন্নিহিত প্রান্তে ঋণ তাড়িত ও দূরবর্ত্তী প্রান্তে ধন তাড়িত জন্মে। দণ্ডের ধন তাড়িত ভাঁটার ঋণ তাড়িতকে আকর্ষণ ও ধন তাড়িতকে বিকর্ষণ করে; এই জন্য সম্মুখীন প্রান্তের তাড়িতকে "আবদ্ধ" (Bound) ও দূরবর্ত্তী প্রান্তের তাড়িতকে "মুক্ত" (Free) তাড়িত কহা যায়। ভাঁটার যে কোনও প্রান্তে অঙ্গুলিস্পর্শ করিলে মুক্ত ধন তাড়িত শরীর মধ্য দিয়া পৃথিবীতে চলিয়া যায়। এক্ষণে অগ্রে অঙ্গুলি ও পরে দণ্ডকে সরাইয়া লইলে আবদ্ধ তাড়িত সন্নিহিত প্রান্তে আবদ্ধ না থাকিয়া মুক্ত হইবে এবং ভাঁটার বাহির পিঠে সর্ব্বত্রই সঞ্চারিত হইবে। এইরূপে ভাঁটাতে বিষম (ঋণ) তাড়িত জন্মিবে। কাচদণ্ডে আঁটা ধাতুময় নলের† দুই মুখে বাটির মতন দুখানি ধাতুপাত্র

তাড়িত প্রভাব বা তাড়িতোদ্দীপন।

† এই নলটির বদলে, তাকিয়ার মতন গঠনের কাষ্ঠখণ্ডে রাংতা জড়াইয়া এবং উহাতে কাচদণ্ড আঁটিয়া, সচরাচর তাড়িতের উদ্দীপনরূপ পরীক্ষা করা হয়।

জুড়িয়া (ঝালাইয়া) দিয়া, পরে উহার উভয় প্রান্ত ও মধ্যস্থল হইতে সূত্রদ্বারা শোলাখণ্ড ঝুলাইয়া দিয়া উহাকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তাড়িত-যুক্ত করিতে গেলে দেখা যায়, যে, প্রথমে উভয় প্রান্তস্থ শোলাগুলি ফাঁক হইয়া যাইতেছে কিন্তু মধ্যের শোলাগুলি নিশ্চল রহিয়াছে, পরে নলটিতে অঙ্গুলিস্পর্শ করিলে দূর প্রান্ত হইতে তাড়িত চলিয়া যাওয়ায় শোলাগুলি পুনরায় জুড়িয়া যায়, এখন অঙ্গুলি ও দণ্ড যথাক্রমে সরাইলে নলের পিঠে সর্ব্বত্র তাড়িত সঞ্চারিত হয় সুতরাং নলের পিঠের সর্ব্বত্রই শোলাগুলি ফাঁক হইয়া যায়। এক পদার্থের নিকট উদাসীন অন্য ধাতুপদার্থে এই রূপে বিষম তাড়িত উৎপন্ন করাকে "তাড়িত-প্রভাব" বা "তাড়িতোদ্দীপন" (Electrification by Influence or Induction) কহে এবং এইরূপে উৎপন্ন তাড়িতকে "উদ্দীপ্ত" (Induced) তাড়িত কহে।

১১। এক্ষণে বুঝা গেল, যে, তাড়িতযুক্ত পদার্থের সংস্পর্শেও যেমন উহা হইতে তাড়িত সঞ্চালিত হইয়া, তাড়িতহীন পদার্থকে তাড়িত-যুক্ত করে; তেমন উহা হইতে কিছু দূরে থাকিলেও উহার প্রভাবে উদাসীন পদার্থে তাড়িত জন্মিতে পারে। কিন্তু সংস্পর্শ বা "পরিচালন" (Conduction) আর প্রভাব বা "উদ্দীপন" (Induction) এই দুই প্রক্রিয়ার কিছু প্রভেদ আছে।

পরিচালনে ও উদ্দীপনায় উৎপন্ন তাড়িতের প্রভেদ।

সংস্পর্শে দ্বিতীয় পদার্থে যে তাড়িত উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথম পদার্থের তাড়িতের সহিত সমধর্ম্মী অর্থাৎ প্রথমে ধন তাড়িত থাকিলে দ্বিতীয়ে ধন তাড়িত আর প্রথমে ঋণ তাড়িত থাকিলে দ্বিতীয়ে ঋণ তাড়িত হয়; কিন্তু প্রভাবে উৎপন্ন তাড়িত বিষমধর্ম্মী অর্থাৎ প্রথমে ধন তাড়িত থাকিলে দ্বিতীয়ে ঋণ তাড়িত উদ্দীপ্ত হয়, আর প্রথমে ঋণ তাড়িত থাকিলে দ্বিতীয়ে ধন তাড়িত জন্মে। আবার সংস্পর্শন দ্বারা দ্বিতীয় পদার্থে তাড়িত উৎপাদন করিবার জন্য প্রথমটিতে কিঞ্চিৎ তাড়িতের হ্রাস হইয়াছে; কিন্তু প্রভাবে তাড়িত উৎপাদন করিতে হইলে প্রথমটির তাড়িত কিছুই কমিয়া যায় না। প্রথমটি শুদ্ধ দ্বিতীয়টির উদাসীনত্ব নাশ করিয়া "ঋণ" ও "ধন" তাড়িতের বিচ্ছেদ জন্মাইয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন প্রথমোক্ত উপায়ে অর্থাৎ সংস্পর্শনপ্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় পদার্থকে অঙ্গুলিস্পর্শদ্বারা পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করা কোন মতেই উচিত নহে; কিন্তু দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায়

অর্থাৎ "প্রভাবে" তাড়িত উৎপন্ন করিতে হইলে দ্বিতীয় পদার্থকে ক্ষণিক পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করিতে হয়।

১২। স্বর্ণপত্র তড়িদ্বীক্ষণের মাথা বা ভাঁটা হইতে কিছু দূরে ধনতাড়িতযুক্ত ঘৃষ্ট কাচদণ্ড (R) আনিলে উহার প্রভাবে ভাঁটাটিতে (K) "ঋণ" ও তবক দুখানিতে (G G) "ধন" তাড়িত উৎপন্ন হয়। তবক দুখানি এইজন্য ফাঁক হইযা যায। এখন ভাঁটাটি স্পর্শ করিলে তবক দুখানির মুক্ত ধন তাড়িত পৃথিবীতে চলিয়া যায়; এই জন্য উহারা পূর্ব্বের ন্যায় জুড়িয়া যায। অঙ্গুলি ও দণ্ডকে যথাক্রমে সরাইলে দেখা যায, যে, তবক দুখানি পুনরায় ফাঁক হইয়া গিয়াছে। বদ্ধ ঋণ তাড়িত মুক্ত হইযা ভাঁটা হইতে, তবক দুখানি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হওয়ায উহাদিগকে ঐরূপ ফাঁক হইতে দেখা যায। তাড়িতযুক্ত * তড়িদ্বীক্ষণের সাহায্যে অজ্ঞাত পদার্থের তাড়িত পরীক্ষা করিতে হইলে, উহাকে ভাঁটা হইতে কিছু দূরে রাখিতে হইবে। এখন যদি তবক দুখানি পূর্ব্বের অপেক্ষা বেশী ফাঁক হয, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে, উক্ত পদার্থে তড়িদ্বীক্ষণের সহিত সমধর্ম্মী তাড়িত আছে; কেননা অজ্ঞাত পদার্থে সমধর্ম্মী তাড়িত থাকিলে উহা ভাঁটার তাড়িতকে বিকৃষ্ট করিযা তবক দুখানিতে তাড়াইযা দিবে এবং এইরূপে তাহাদের ব্যবধান (Divergence) বাড়িযা যাইবে। আর যদি তবক দুখানি পূর্ব্বের অপেক্ষা কম ফাঁক হয়, তাহা হইলে অজ্ঞাত পদার্থে বিষম তাড়িত আছে বুঝিতে হইবে কেননা উহার তাড়িত তড়িদ্বীক্ষণের তাড়িতকে আকর্ষণ করিয়া উহাকে যত নিকটে আনিতে পারে, চেষ্টা করিবে অর্থাৎ তবক দুখানির তাড়িত ভাঁটাটিতে আসিতে
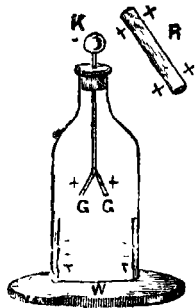
স্বর্ণপত্র তড়িদ্বীক্ষণে প্রভাবজ তাড়িতের উৎপত্তি।

স্বর্ণপত্র তড়িদ্বীক্ষণ দ্বারা তাড়িতপরীক্ষা।

* তাড়িতযুক্ত তড়িদ্বীক্ষণ বলিলে বুঝিতে হইবে যে, উহার ভাঁটা, তবক আর সংযোজক তার এই তিন স্থানে তাড়িত জন্মিয়াছে। যেন মনে করা হয় না, যে, কাচের বোতলে তাড়িত উৎপন্ন হইয়াছে; বোতলের দরকার—বাতাসের ঝটিকা নিবারণ।

বাধ্য হইবে, ইহাতে ব্যবধান কমিয়া যাইবে। তাড়িতহীন তড়িদ্বীক্ষণের নিকট একই দূরে দুইটি তাড়িতযুক্ত পদার্থ একে একে আনীত হইলে, তবক দুখানির ব্যবধান সমান হইবে না; একটি অপরটি অপেক্ষা যত বেশী ব্যবধান উৎপাদন করিবে, তাহাতে তত বেশী তাড়িত আছে বুঝিতে হইবে।

এইরূপে স্বর্ণপত্র তড়িদ্বীক্ষণ দ্বারা আমরা কোন পদার্থে তাড়িত আছে কি না, যদি থাকে ত কি প্রকার (ধন না ঋণ) আরও মোটা-মুটি কত পরিমাণই বা আছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারি।

৫ম প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে যে, তবক দুখানির সুমুখে দুখানি রাংতার পাত (T T) বোতলের ভিতর পিঠে আঁটা আছে, এ দুখানি বোত-লের তলার কাঠকে (W) ছুঁইয়া আছে, ইহারা থাকাতে তবক দুখানির ব্যবধান আরও বাড়িয়া যায়. কেননা তবক দুখানির তাড়িত (ধরা গেল যেন ধন) রাংতা দুখানিতে তাড়িত উদ্দীপন করিবে—তাহাতে উহাদের নিকটবর্ত্তী ভাগে ঋণ তাড়িত জন্মিবে আর দূরবর্ত্তী প্রান্তে উদ্দীপ্ত ধন তাড়িত তলার কাঠ দিয়া চলিয়া যাইবে। প্রত্যেক রাংতার ঋণ তাড়িত নিজের সুমুখের তবকের ধন তাড়িতকে টানিবে। একে ত তবক দুখানিতে সমানধর্ম্মী তাড়িত থাকায় পরস্পরকে ছাড়াছাড়ি বা বিকর্ষণ করিয়া দেয় আবার রাংতায় ও তবকে টানাটানি বা আকর্ষণ; কাজে কাজেই তবকদিগের ফাঁক বাড়িয়া যায়।

১৩। কোন তাড়িতযুক্ত পদার্থের নিকটে অপর কোন তাড়িতহীন পদার্থ আনিলে ইহার সন্নিহিত প্রান্তে বিষম আর দূরবর্ত্তী প্রান্তে সম তাড়িত জন্মে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নিম্ন-লিখিত পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, দ্বিতীয় পদার্থে "উদ্দীপ্ত" (Induced) "বিষম" ও "সম" এই উভয় তাড়িতেরই পরিমাণ প্রথম বা "উদ্দীপক" (Inducing) পদার্থের তাড়িতের পরিমাণের সহিত সমান অর্থাৎ প্রথমটিতে যত তাড়িত আছে, দ্বিতীয়ের প্রান্তদ্বয়ে ঠিক তত তাড়িত জন্মিবে।

উদ্দীপক ও উদ্দীপ্ত তাড়িতের পরিমাণ সমান।

কাচের পায়াযুক্ত কাঠের টুলের উপর একটি টিনের বদ্‌না রাখিয়া উহার বাহির পিঠকে স্বর্ণপত্র তড়িদ্বীক্ষণের সহিত তার দ্বারা সংযুক্ত কর। এক্ষণে রেশমী সূত্র দ্বারা ঝোলান "ধন" তাড়িতযুক্ত একটি পিত্তলের বল বদ্‌নার

ভিতর আসিলে তবক দুই খানি জুড়িয়া না থাকিয়া ফাঁক হইয়া যাইবে। ইহার কারণ এই, যে, বলটির ধন তাড়িত বদ্‌নার ভিতর পিঠে "ঋণ" ও বাহির পিঠে "ধন" তাড়িত জন্মাইয়াছে; এই ধন তাড়িত তড়িদ্বীক্ষণে সঞ্চারিত হইয়া তবক দুখানিকে ফাঁক করিয়া দিয়াছে। আরও দেখা যাইবে যে, বলটি বদ্‌নার ভিতরে যতই নামিবে, তবক দুখানির ব্যবধান তত বাড়িবে। অবশ্য এইরূপ বৃদ্ধি বদ্‌নার ভিতরে কিছু দূর নামানো পর্য্যন্ত চলিবে, তাহার পর বলকে আরও নামাইলে তবক দুখানির ব্যবধান আর বাড়িবে না। এখন যদি বলকে বদ্‌নার ভিতর পিঠের সহিত স্পর্শ করান হয়, তবে দেখা যাইবে যে, তবক দুখানির ফাঁক কিছুও কম বেশী হয় নাই আর বলটিকে বাহিরে আনিয়া পরীক্ষা করিলে উহা তাড়িতবিহীন হইয়াছে জানা যাইবে। স্পর্শনের পূর্ব্বে ও পরে তবক দুখানির ব্যবধান সমান থাকায় এবং বলটি স্পর্শন দ্বারা তাড়িতহীন হওযায সপ্রমাণ হইতেছে যে, বলে যত পরিমাণ "ধন" তাড়িত ছিল, বদ্‌নার ভিতর পিঠে ঠিক তত পরিমাণ "ঋণ" তাড়িতের সঞ্চার হইয়াছে—বল বদ্‌নার ভিতর পিঠ ছুঁইলে সমান পরিমাণ ধন ও ঋণ তাড়িত মিশিয়া যাওযায বল তাড়িতহীন হইযাছে, যদি ইহারা সমান পরিমাণে না থাকিত, তাহা হইলে ছোঁযাইবার পর তবকের ফাঁকের কিছু কম বেশ হইত। কিন্তু যদি বলকে বদ্‌নার সহিত স্পর্শ না করাইযা আমরা বদ্‌নাকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করি, তাহা হইলে তবক দুখানি পুনরায জুড়িযা যায; কেননা উহাদের মুক্ত "ধন" তাড়িত পৃথিবীতে চলিযা যায়। এক্ষণে যথাক্রমে অঙ্গুলি ও বল সরাইলে তবক দুখানি আবার ফাঁক হইযা যায। ইহার কারণ এই, যে, বদ্‌নার ভিতরের পিঠের আবদ্ধ ঋণ তাড়িত বলটি সরাইবা মাত্র মুক্ত হইযা উহার বাহির পিঠে তড়িদ্বীক্ষণে সঞ্চারিত হয়। আরও দেখা যায় যে, পাত দুখানি এইবারে যত ফাঁক হইল, প্রথমেও ঠিক তত ফাঁক হইযাছিল কিন্তু শেষের ফাঁক উদ্দীপ্ত ঋণতাড়িতজনিত আর প্রথমের ফাঁক উদ্দীপ্ত ধনতাড়িতজনিত অতএব উদ্দীপ্ত ঋণ ও ধন উভয় তাড়িতের পরিমাণ সমান। আর পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে, যে, বলের তাড়িতের পরিমাণ বদ্‌নার ভিতর পিঠের তাড়িতের পরিমাণের সহিত সমান। অতএব বলে যত টুকু ধন তাড়িত ছিল, বদনার ভিতর পিঠে ঠিক তত টুকু ঋণ ও বাহির পিঠে তত টুকু ধন তাড়িত জন্মিয়াছে। পদার্থের অভ্যন্তরে

যে সমান পরিমাণে ঋণ ও ধন তাড়িত—অপর পদার্থের প্রভাবে জন্মে, ইহা আরও সহজে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। তাড়িতহীন তড়িদ্বীক্ষণের মাথা হইতে কিছু দূরে ধনতাড়িতযুক্ত পদার্থ আনিলে প্রথমে তবক দুখানি ফাঁক হয কিন্তু উহা সরাইয়া লইবামাত্র তবক দুখানি আবার জুড়িয়া যায ; ইহাতে জানা যাইতেছে যে, পদার্থটি আনিবার সময় মাথায যত টুকু ঋণ তাড়িত জন্মিয়াছে, তবক দুখানিতে ঠিক তত টুকু ধন তাড়িত উৎপন্ন হইযাছে এবং পদার্থটি সরাইবা মাত্র বিষমধর্ম্মী (ধন ও ঋণ) তাড়িতদ্বয আব বিশ্লিষ্ট থাকিতে না পাবিয়া মিশ্রিত হইযা যায় এবং তড়িদ্বীক্ষণকে তাড়িতহীন করে।

১৪। সহজে তড়িৎসংগ্রহ করিতে হইলে নিম্নলিখিত অল্পব্যযসাধ্য ক্ষুদ্র যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই যন্ত্রকে "তড়িদ্বাহক" (Electrophorus) কহে।

স্বল্প ব্যয-সাধ্য তড়িৎ-সংগ্রহ-যন্ত্র বা তড়িদ্-বাহক।
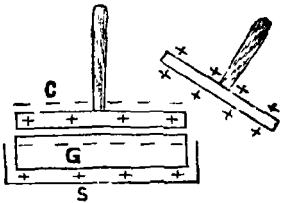
ইহার দুইটি অঙ্গ (১) উৎপাদক, (২) সংগ্রাহক, "আবরণ" বা "বাহক"। এক খানি টিনেব থালায (S) লাক্ষা বা গালা গালাইযা ঢালিলে এবং ঐ লাক্ষা শীতল হইযা জমাট বাঁধিলে রুটি বেলিবার চাকিব মতন যে চাকি প্রস্তুত হইবে, তাহাই উৎপাদক (G) ; আর এক খানি পিতলেব থালাব কেন্দ্রস্থলে একটি কাচদণ্ড আঁটিযা দিলে সংগ্রাহক

(C) প্রস্তুত হইবে। এক্ষণে লাক্ষাব চাকিকে জোবে ফ্লানেল দ্বাবা আঘাত কবিলে চাকিতে ঋণ তাড়িত জন্মিবে। এই ঋণ তাড়িত টিনেব থালাব ভিতব পিঠে ধন তাড়িত ও বাহির পিঠে ঋণ তাড়িত উৎপাদন করিবে। এই ঋণ তাড়িত পৃথিবীতে চলিযা যাইবে কিন্তু ধন তাড়িত চাকিব ঋণ তাড়িতকে "আবদ্ধ" কবিবে, এই কারণে চাকিব তাড়িত বাযুমণ্ডলে বা পৃথিবীতে শীঘ্র পলাইযা যাইতে পারিবে না সুতরাং অনেকক্ষণ উহাতে অবস্থান কবিবে। এখন যদি "সংগ্রাহক" বা পিতলেব থালাকে চাকি খানির উপব স্থাপন করা যায, তাহা হইলে থালা খানি চাকিব সহিত সম্পূর্ণ ভাবে মিলিযা থাকিবে না ববং উভয়েব মধ্যে একখানি অতি পাতলা বাযুস্তর ব্যবধান থাকিবে, ঐ স্তরের ভিতর দিযা তাড়িতপ্রভাব চলিবে § এবং

§ গালার চাকি খানা অপরিচালক বলিয়া পিতলের থালায তাড়িত পরিচালন করিতে পারিবে না, ইহা কেবল তাড়িত উদ্দীপন করিবে, সুতরাং থালায় তাড়িত উৎপন্ন হইবার কারণ—"উদ্দীপন"—পরিচালন নহে।

চাকির ঋণ তাড়িত পিতলের থালার নীচের পিঠে ধন ও উপর পিঠে ঋণ তাড়িত উৎপাদন করিবে। থালা খানিকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে মুক্ত ঋণ তাড়িত পৃথিবীতে যাইবে ও ধন তাড়িত চাকির ঋণ তাড়িত দ্বারা আবদ্ধ রহিবে। এক্ষণে প্রথমে অঙ্গুলি সরাইয়া পরে থালা খানিকে উঠাইলে পূর্ব্বোক্ত বদ্ধ ধন তাড়িত মুক্ত হইয়া উহার দুই পিঠেই সঞ্চারিত হইবে। এই তাড়িতোৎপত্তি পরীক্ষা করিতে হইলে উহাকে তড়িদ্বীক্ষণের নিকট লইয়া যাইলেই চলিবে; অথবা কোন অঙ্গুলি মুড়িয়া উহার গাঁঠকে পিতলের থালার নিকট আনিলেই উহা হইতে তড়িৎস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া বায়ু ভেদ করিয়া পিট্ পিট্ শব্দ করিতে করিতে অঙ্গুলিতে প্রবেশ করিবে। এই যন্ত্রসাহায্যে অপরিমিত তাড়িতস্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায়। লাক্ষার উপর তাড়িতযুক্ত পিতলের থালা খানিকে এক বার স্থাপন ও পরে উহাকে স্পর্শ করিয়া উত্তোলন করিয়া অঙ্গুলির গাঁঠটি আনিলেই হইল। যতবার এইরূপ করা হইবে, ততবার তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যাইবে।

১৫।• গালার চাকি খানিকে একবার মাত্র তাড়িতযুক্ত করিয়া, উহার উপর পিতলের থালাখানিকে বসাইয়া রাখিয়া আঙ্গুল দিয়া ছুঁইয়া আমরা তাহাকে যতবার উপরে তুলিব, ততবারই তাড়িতস্ফুলিঙ্গ পাইব। অনেকেই জানেন যে, ষ্টীম এঞ্জিনে কয়লা পোড়াইয়া যে তাপ পাওয়া যায়, তাহা জলকে বাষ্পে পরিণত করে—আবার ঐ বাষ্পের প্রসারণ শক্তি দ্বারা ষ্টীম এঞ্জিনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালিত হয়; ইহাতে কত বড় বড় কায হইতেছে। ঐ কাযের মূল যেমন কয়লা পোড়ানো, সেইরূপ এখানে এই অপর্য্যাপ্ত স্ফুলিঙ্গ পাওয়ার মূল কারণ কি, তাহা আলোচনা করা যাক। আমরা জানি যে, একটা ভারী জিনিষ তুলিতে গেলে আমাদের হাতের পেশী সঙ্কুচিত হয়—আমাদের হাতে একটু টান বা জোর লাগে—আমরা বলি হাত ভেরে গেল। কেন জোর লাগে? কেন এমন হয়? ইহার জবাব এই, যে, পৃথিবী ঐ জিনিষটাকে আপনার কেন্দ্রের দিকে টান্‌ছে, জিনিষটা প'ড়ে যাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা কচ্ছে—তাকে ধ'রে রাখ্‌তে গেলে আমাদিগকে পেশী সঙ্কোচনরূপ কিছু শক্তি খরচ কর্‌তে হবে; মোটের উপর পৃথিবী, যে, ঐ জিনিষটাকে টান্‌চে—যে টানটা জিনিষের ভারের কারণ, সেই টান বা আকর্ষণের বিপক্ষে আমাদিগকে কিছু কায কর্‌তে হবে। তা হলে

দাঁড়াচ্চে এই, যে, পেশীসঙ্কোচন রূপ শক্তি ব্যয় কোরে, জিনিষটাকে তুলে রাখা রূপ কায সম্পন্ন হ'ল, একটার বিনিময়ে আর একটা পাওয়া,

তড়িদ্বাহকে অপর্য্যাপ্ত তাড়িতস্ফুলিঙ্গরূপ শক্তির মূল কি?

এ ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে বল্‌তে দেওয়া হবে না যে, শক্তি নষ্ট হ'ল—শক্তির বিনাশ নাই; শক্তির বিনিময়ে কিছু কায লাভ হ'ল। মনে কর, যে, উঁচু ছাদের উপরে একটা পাত্রে রাশিপরিমাণ জল তোলা গেল; এখন কেহ হয়ত বলিবেন যে, জল তুল্‌তে অনেকটা শক্তি নষ্ট হল—'নষ্ট' কথাটি কিন্তু ঠিক নয়, কেন না যখন ঐ জলরাশিকে কোন বিশেষ যন্ত্রে ফেলা যাইবে, তখন ঐ কলটি চলিতে আরম্ভ করিবে ও ভূরি ভূরি কায করিয়া দিবে। জল তুলিতে যে শক্তি খরচ হইয়াছিল, সেই শক্তি ছাদের উপরিস্থিত পাত্রের রাশীকৃত জলে প্রচ্ছন্ন বা "অব্যক্ত" (Potential) ভাবে ছিল—পূর্ব্বকথিত কলটিকে চালাইয়া দিয়া সেই শক্তি আবার ব্যক্ত হইল। এ সব উদাহরণ ছেড়ে দিয়ে তড়িদ্বাহকে কি হচ্ছে, দেখা যাক। এখানে চাকির ঋণ তাড়িত থালার ধন তাড়িতকে টান্‌ছে—এই টান বা আকর্ষণ ছাড়াতে গেলেই সেই পরিমাণ কিছু কায করা চাই। যদি চাকি খানিতে তাড়িত না থাক্‌তো, তা হলে থালাখানাকে তার উপর বসাইয়া রাখিয়া তুলিতে গেলে অবশ্য আমাদিগকে থালার উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ আছে, তার বিপক্ষে কিছু কায কর্ত্তে হোতো; কিন্তু এখন কথাটা হচ্ছে এই, যে, চাকির তাড়িত থালার তাড়িতকে টান্‌ছে; কাজে কাজে এখন থালাকে তুল্‌তে গেলে আগের চেয়ে আমাদিগকে আর কিছু বেশী কায কর্ত্তে হবে। পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করা—সে ত আগের বারেও ছিল, এ বারেও আছে; তবে বাড়ার ভাগ হচ্ছে দুটো বিরুদ্ধধর্ম্মী তাড়িতের মধ্যে যে আকর্ষণ বা টান, তাকেও অতিক্রম করা; সুতরাং প্রতিবার থালাটি তোলায় একটু একটু বেশী কায করা হ'ল, সে টুকু কি নষ্ট হয়ে যাবে? না—তা ত হোতে পারে না। যে টুকু বেশী শক্তি খরচ হোলো, তার বদলে কি লাভ হোলো?—প্রতিবার এক একটি তাড়িতস্ফুলিঙ্গ। চাকিটাতে তাড়িত না থাক্‌লে থালা তুল্‌তে গেলে পেশীসঙ্কোচনরূপ যত টুকু শক্তি খরচ কর্ত্তে হোতো, চাকিটাতে তাড়িত থাকাতে চাকির ও থালার বিরুদ্ধতাড়িতের আকর্ষণ অতিক্রম কর্ত্তে তাহার চেয়ে

কিছু, বেশী শক্তি খরচ কর্ত্তে হচ্চে—যে টুকু বেশী শক্তি খরচ হোলো, তাহাই তাড়িতস্ফুলিঙ্গ রূপ শক্তিতে দেখা দিল।

১৬। তাড়িতহীন তাড়িতদোলকের * নিকটে তাড়িতযুক্ত কাচদণ্ড আনিলে দোলকটি কাচদণ্ডের নিকটে আসে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দণ্ডটি আনিবার পূর্ব্বে দোলকটিতে সমান পরিমাণ ধন ও ঋণ তাড়িত মিশ্রিত হইয়াছিল; যেমনি দণ্ডটিকে আনা গেল, অমনি ধন ও ঋণ তাড়িত পৃথক্ হইয়া গেল। মনে কর, যেন দণ্ডে ধন তাড়িত আছে; এখন দণ্ডের তাড়িতের প্রভাবে দোলকের সন্নিহিত প্রান্ত (A) তে ঋণ (—) তাড়িতের, আর দূরবর্ত্তী প্রান্ত (B) তে ধন (+) তাড়িতের উদ্দীপন হইবে।
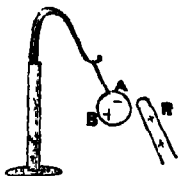
তাড়িতদোলক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে, বিষমধর্ম্মী তাড়িতের মধ্যে আকর্ষণ ও সমধর্ম্মী তাড়িতের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটে। সুতরাং দণ্ডের ধন (+) তাড়িত A র ঋণ (—) তাড়িতকে আকর্ষণ করিবে, আর Bর ধন (+) তাড়িতকে বিকর্ষণ করিবে। কিন্তু A, Bর চেয়ে দণ্ডের কাছে আছে, সুতরাং দণ্ড ও Aর মধ্যে যে আকর্ষণ, তাহা দণ্ড ও Bর মধ্যে যে বিকর্ষণ, তার চেয়ে বেশী; এখন দেখা যাইতেছে যে, দণ্ডটির দরুণ দোলকটির উপর দুটি শক্তি কার্য্য করিতেছে—একটি হইতেছে সন্নিহিত প্রান্ত Aর উপর আকর্ষণ আর একটি হইতেছে দূরবর্ত্তী প্রান্ত Bর উপর বিকর্ষণ, আর আকর্ষণটি বিকর্ষণের চেয়ে বেশী; তাহা হইলে বাকী কাটিলে পাওয়া যায়—আকর্ষণ। কাজে কাজে দোলকটি দণ্ডদ্বারা আকৃষ্ট হয়।

অগ্রে উদ্দীপন,
পশ্চাৎ আকর্ষণ। }

এই ব্যাপারে বুঝা গেল যে, দণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে তাড়িতহীন দোলকে তাড়িতের উদ্দীপনা হয় অর্থাৎ "আগে তাড়িতের উদ্দীপন, পরে আকর্ষণ।"

পার্শ্বস্থ চিত্রে প্রদর্শিত তাড়িতদোলকের একই ধাতুদণ্ড হইতে যদি দুইটি

* এ পর্য্যন্ত তাড়িতদোলক ছোট ছোট শোলার টুকরায় প্রস্তুত হয়, বলা হইয়াছে; কিন্তু সচরাচর বৃক্ষবিশেষের নরম ও হাল্‌কা মজ্জা বা মাজকে (Pith) ছোট গুলির আকারে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা হয়। ইহাকে Pithball বলে।

দোলক ঝুলান যায়—একটি রেশমী সূত্রদ্বারা, অপরটি তুলার সূত্রদ্বারা; তাহা হইলে তাড়িতযুক্ত কোনও দণ্ড উহাদিগকে সমান জোরে টানিবে না। ধরা যাক, যেন এই দণ্ডটিতে ধন তাড়িত আছে। তাহা হইলে তুলার সূত্রদ্বারা ঝুলান দোলকের, নিকটবর্ত্তী প্রান্তে ঋণ ও দূরবর্ত্তী প্রান্তে ধন তাড়িতের উদ্দীপনা হয়—এই উদ্দীপ্ত ধন তাড়িত পরিচালক সূত্র দ্বারা পৃথিবীতে চলিয়া যায়; কিন্তু রেশম অপরিচালক সুতরাং রেশমী সূতায় ঝুলান দোলকের দূরবর্ত্তী প্রান্তের ধন তাড়িত পালাইতে না পারিয়া থাকিয়া যায়, কাজে কাজে দ্বিতীয় দোলকটিতে আকর্ষণী শক্তির বিরুদ্ধে এক বিকর্ষণী শক্তি থাকে সুতরাং মোটের উপর আকর্ষণ কিছু কম হয়; প্রথম দোলকটিতে সমধর্ম্মী ধন তাড়িত দূরবর্ত্তী প্রান্ত হইতে পৃথিবীতে চলিয়া যায় বলিয়া বিকর্ষণী শক্তি কিছুই থাকে না সুতরাং আকর্ষণ পুরো মাত্রায় হয়।

বঙ্গে অকালমৃত্যু।

৪র্থ প্রস্তাব।

২। ওলাউঠা।

(ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ ঘোষ এম, বি লিখিত।)

অনেকের মতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিসূচিকা ও দেশভাষায় ওলাউঠা নামে অসাধ্য ব্যাধি একই রোগ। প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ চরকে বিসূচিকার উল্লেখ দেখিয়া ইঁহারা অনুমান করেন, ভারতে এই পীড়া বহুকাল বিদ্যমান। কিন্তু চরকে ইহার নিদান ও লক্ষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার সহিত এখনকার ওলাউঠার অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মন্দাগ্নি প্রযুক্ত ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইলে আমাজীর্ণ উৎপন্ন হয়। মহর্ষি চরক এই আমাজীর্ণ রোগের দুই প্রকার ভেদ কহিয়াছেন। যখন আমদোষ ঊর্দ্ধ ও অধঃ (বমন ও অতিসার দ্বারা) নিঃসারিত হয় ও সর্ব্বাঙ্গে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা উৎপাদন করে, তখন ইহাকে বিসূচিকা এবং যখন "বিবদ্ধমার্গ" অর্থাৎ বমন ও মলভেদ না হইয়া বাতরোধ প্রযুক্ত উদারাধ্মান,

মলবোধ, পিপাসা, উদ্গার উপস্থিত করে, তখন অলসক সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। চরকে লিখিত আছে, ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, ইন্দ্রিয়-পরবশ এবং পশুর ন্যায় অপরিমিতভোক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয়। সুশ্রুত বিসূচিকায় অতিসার, বমন, পিপাসা, শূল, ভ্রম, মূর্চ্ছা, জৃম্ভ, দাহ, উদ্বেষ্টন (হস্তপদের শিথিলতা), দেহের বিবর্ণ, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও শিরঃশূল এই সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিরুদ্ধ ও বিসদুষ্ট আহার প্রযুক্ত আমাশয় ও পক্বাশয়ের প্রদাহ (Gastro-enterites) উৎপন্ন হইলে উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু ওলা-উঠায় অধিক পরিমাণে জলবৎ ভেদ ও বমন বশতঃ, হাতেপায়ে খালধরা, দেহের তাপহীনতা, (হিমাঙ্গ) বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, মূত্ররোধ, ক্ষীণ-স্বর, হস্তপদ নীলবর্ণ, অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষু প্রভৃতি অবসন্নতার (Collapse) চিহ্ন সকলই পীড়ার বিশেষ লক্ষণ। অসাধ্য হইলে বিসূচিকায় অবসন্নতার অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু সুশ্রুতে

শ্যাবদন্তোষ্ঠনখঃ অত্যসংজ্ঞোবমি অর্দ্দিতঃ অভ্যান্তরযাতনেত্রঃ।

ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ববিমুক্তসন্ধিঃ॥

প্রভৃতি লক্ষণ, বিসূচিকা ও অলসক উভয় ব্যাধিরই মৃত্যুচিহ্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং বিসূচিকা সম্বন্ধে ইহাদিগের বিশেষত্ব নাই। প্রকৃতপক্ষে আমাশয় ও পক্বাশয়ের প্রদাহে অনেক সময়ে মুমূর্ষু অবস্থায় অবসন্নতা উপস্থিত হয় বলিয়া উহাকে ওলাউঠালক্ষণাক্রান্ত বলা যাইতে পারে না। আর এক কথা,—বসন্ত ও প্লেগের ন্যায় ওলাউঠা মারীভয় উৎপাদক। ইহা যেরূপ দুশ্চিকিৎস্য, ইহার সংক্রামকতা ততোধিক ভয়ানক। ইহার নামোচ্চারণে হৃদয় অবসন্ন হয়। বঙ্গের আপামর সাধারণ গ্রাম্যদেবতারূপে স্থাপন করিয়া ওলাবিবির পূজার দ্বারা রোগের করাল হস্ত অতিক্রমের আশা করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ওলাঠাকুরাণী,—শীতলা, মনসা ও ষষ্ঠীর ন্যায় বঙ্গের প্রতি গৃহস্থের উপাস্য। মহর্ষি চরক ও সুশ্রুত জনপদোদ্ধ্বংসন মহামারীর বিষয় অবগত ছিলেন এবং জ্বর, কাশ, যক্ষ্মা, ও নেত্ররোগেরও সংক্রামকতা উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু বিসূচিকার সংক্রামতা সম্বন্ধে তাঁহারা যে নীরব, ইহার সদুত্তর কি? চরকোক্ত বিসূচিকা কি কোনরূপ দেশ কালের বৈগুণ্য বশতঃ সংক্রামকতা লাভ করিয়া আধুনিক ওলাউঠায় পরিণত হইয়াছে অথবা ওলাউঠার বমন বিরেচনাদি

অনেক লক্ষণ বিসূচিকার সহিত ঐক্য হয় বলিয়া ভারতে এই নবাগত পীড়া বিসূচিকা নামে অভিহিত হইয়াছে ?

যোগবাশিষ্ঠে বিসূচিকা সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে।—হিমালয়ের উত্তরে কর্কটী নাম্নী এক রাক্ষসী বাস করিত। ইহার অপর নাম বিসূচিকা। নিশাচরীর দেহ শুষ্ক, কৃশ, কজ্জলবর্ণ, গলদেশে কঙ্কালমালা লম্বিত, রাশি রাশি ভক্ষণ করিয়াও তাহার জঠরানল তৃপ্ত হইত না। অতৃপ্তক্ষুধার তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে সে কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট জীবদেহজীর্ণকারী শূচিকাকার ব্যাধি হইবার বর লাভ করে। ব্রহ্মার আদেশে সে বিবিধ উপসর্গবিশিষ্ট বিসূচিকা নামধেয় ব্যাধি হইয়া, অপরিমিত ও অশুদ্ধদ্রব্যভোজী, দূরপ্রবাসী, দুষ্ক্রিয়া ও অশাস্ত্রীয় ব্যবহারকারীদিগের বিনাশ সাধনে নিযুক্ত হইল। কেবল বিসূচিকানিবারক মন্ত্রদ্বারা রক্ষিত জনগণের উপর তাহার কর্তৃত্ব রহিল না। * একমাত্র বেধন, প্লীহা সমুৎপাদন ও বস্তি শিরাদি নিপীড়ন তাহার কার্য্য ছিল। সে প্রাণীহিংসা পূর্ব্বক দশদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পথিমধ্যে পরিক্ষিপ্ত বস্ত্র ও ভাণ্ড তাহার অলঙ্কার হইয়াছিল। অবশেষে বহুবর্ষ যাবৎ অসংখ্য প্রাণিনাশে অনুতপ্ত হইয়া রাক্ষসী প্রাক্তন দেহ লাভ করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়। ব্রহ্মার বরে সে পূর্ব্ব রাক্ষসী দেহ প্রাপ্ত হইল বটে কিন্তু বিবেক উৎপন্ন হওয়াতে তাহার জীবহিংসায় আর প্রবৃত্তি রহিল না। জীবন রক্ষার্থ সে তত্ত্বজ্ঞানহীন মূঢ়দিগকে ভক্ষ্যরূপে প্রাপ্ত হইবে, এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সুদেশ নামক কিরাত মণ্ডলে প্রবেশ করতঃ তদ্দেশীয় রাজা ও অমাত্যকে বিসূচিকা মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক সৌহৃদ্য স্থাপন করে। কিরাতরাজ প্রত্যুপকার স্বরূপ স্বরাজ্যস্থ পাপাচার বধ্য ব্যক্তিদিগকে রাক্ষসীর ভক্ষ্যরূপে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং ছয় দিবসের মধ্যে তিন সহস্র বধ্য আনয়ন পূর্ব্বক বিসূচীকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিলেন। ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে পর রাক্ষসী হিমাচলে প্রত্যাগমন

* বিসূচিকা মন্ত্র।—ওং হ্রীং হ্রাং রীং রাং বিষ্ণুশক্তয়ে নমঃ। ওং নমো ভগবতি বিষ্ণুশক্তিমেনাং ওং হরহর নয়নয় পচপচ মথমথ উৎসাদয় উৎসাদয় দূরে কুরু স্বাহা। হিমবন্তং গচ্ছজীব সঃ সঃ সঃ। চন্দ্রমণ্ডলে গতোসি স্বাহা॥ বাম হস্তে এই মন্ত্র লিখিয়া রোগীকে মার্জ্জনা করিবে। অনন্তর রোগী সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়াছে এবং বিসূচিকা রাক্ষসী হিমালয়-পলায়ন করিয়াছে, এই প্রকার চিন্তা করিলে বিসূচিকা ক্ষয় হয়।

পূর্ব্বক সমাধিস্থ হইল। পঞ্চবর্ষান্তে পুনরায় রাজসদনে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ বধ্যগ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে অদ্যাপিও ঐরূপ করিয়া থাকে। নিশাচরী বিসূচিকা কিরাত দেশে পিশাচভয়াদি দোষ সকল নিরাকৃত করাতে তথায় মঙ্গলা নামে প্রতিষ্ঠিতা ও দেবমন্দিরে সংস্থাপিতা হইযাছে। পরম সমাদরে এই প্রতিমার পূজা হইয়া থাকে। তাহার কৃপায় লোকের বাসনা পূর্ণ হয়, বিমুখ হইলে প্রজালোকের উচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত উপাখ্যানের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিলে বুঝা যায়, যোগবাশিষ্ঠ রচিত হইবার পূর্ব্ব হইতে ভারতে বিসূচিকা নামক ব্যাধি বিশেষ প্রবল হইযাছিল এবং সময়ে সময়ে মারীভয় উৎপাদন করিত। বিসূচিকার আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিদান ও ইহার নামার্থ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ভিন্ন অপর কোন লক্ষণের বর্ণনা নাই সুতরাং প্রকৃত ব্যাধি নির্ণয় করা সুকঠিন। যোগবাশিষ্ঠে বিসূচিকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজার উল্লেখ থাকিলেও কোন পুরাণ বা তন্ত্রে ইহার নামোল্লেখ পাওয়া যায় না এবং বসন্তরোগোৎপাদক শীতলা দেবীর ন্যায় কোনরূপ মূর্ত্তি, মন্ত্র বা ধ্যানাদি প্রচলিত না থাকাতে উক্ত উপাখ্যানের রচনাকাল আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। যদি ইহাকে সংক্রামক বিসূচিকা বা ওলাউঠা বলিযা অনুমান করা যায়, তাহা হইলে ইহা যে এদেশে তন্ত্রমতের প্রচলন সময়ে মহামারী উৎপাদক ব্যাধিরূপে বর্ত্তমান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ভারতের কোন স্থানে বিসূচিকার মূর্ত্তি ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠা বা পূজার ব্যবস্থা আছে কি না জানিনা। কিন্তু অধুনা বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য দেবতার ন্যায় ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে। এদেশে এরূপ পূজার সূচনা কতদিন নিশ্চয় বলা যায় না, কিন্তু ইহা যে মুসলমান অধিকারের সময় দেশব্যাপ্ত হইযাছে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। কলিকাতার উত্তরে বেলগেছিয়ায় ওলাইচণ্ডীর মন্দির আছে। প্রায় শতবৎসর গত হইল, ডনকাষ্টার নামক জনৈক ইংরাজ বণিক বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে দেবী অধিষ্ঠিত সিন্দূরলিপ্ত শিলাখণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বোধ হয়, তাঁহার রেশম ও সোরার বিস্তৃত ব্যবসায়ে নিযুক্ত কুটির কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে দেবীর পূজা দ্বারা পীড়াভয় দূর হইয়াছে দেখিয়া তাহাদিগের সন্তোষবর্দ্ধনার্থ এই দেউল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কলিকাতার

উত্তর প্রান্তের লোকেই ইঁহার নিয়মিত পূজা করিত, কিন্তু এক্ষণে বহু-দূরস্থ ও ভিন্নপ্রদেশীয়গণ যাত্রিসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দেখা যায়। কোন স্থানে ওলাবিবি অশ্বারূঢ়া ও ঘাঘরা-পরিধানা, কোথাও চতুর্হস্তা, কপাল-মালাভূষিতা। অনেক স্থলে নিম্বমূলে ঘটাসনে পূজিতা হইয়া থাকেন। পৌরোহিত্য কার্য্য কোথাও মুসলমানে (খিদিরপুরে) কোথাও (হুগলিজেলায়) গোয়ালা ব্রাহ্মণে সম্পাদন করিয়া থাকে। শনি ও মঙ্গলবার পূজার প্রশস্ত দিবস এবং ছাগবলি প্রধান উপকরণ বলিয়া গণ্য। উড়িষ্যা অঞ্চলে বিমলা ও তাহার সঙ্গিনী যোগিনী পীড়ার প্রাদুর্ভাব কালে পূজিতা হইয়া থাকেন। বর্দ্ধমানের কোন কোন স্থানে ইঁহার নাম ঠাকুরাণী। রামচন্দ্র-পুর গ্রামে একজন মুচি ঠাকুরাণীর পূজক। হিন্দু ও মুসলমানে ইঁহার পূজা করিয়া থাকে। হিন্দুরা ছাগ ও মিষ্টান্ন উৎসর্গ এবং মুসলমানে মুরগি ও হাঁস বলি দিয়া দেবীর তুষ্টি সম্পাদন করে।

যখন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাসকোডিগামা প্রমুখ পর্ত্তুগিজগণ, মালাবার উপকূলে প্রথম পদার্পণ করেন, তাঁহারা তথায় ওলাউঠার প্রাদু-র্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণা-পথে যে সময়ে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান রক্তে বসু-ন্ধরা প্লাবিত করিতেছিল, যখন সতত ভ্রাম্যমান সমরোন্মত্ত বাহিনী দল, ইতস্ততঃ পলায়নপর ভয়ত্রস্ত প্রজাকুল, ভারত সাম্রাজ্যে মোগলরাজ-লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান ঘোষণা করিতেছিল, ওলাউঠা মারীভয়ের বিকটমূর্ত্তিও আমরা সেই সময়ে ভারতের নানাস্থানে বিরাজমান দেখিতে পাই। ১৭৮১ সালে গঞ্জাম প্রদেশে কর্ণেল পিয়ার্সের কর্ত্তৃত্বাধীনে দেশীয় সৈনিকদলে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া কিরূপ মৃত্যুভয় উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। পঞ্চ সহস্র সৈনিক পুরুষের মধ্যে সহস্রাধিক লোক পীড়াভিভূত হইয়া-ছিল। ভারত গভর্ণমেন্ট ডাইরেক্টার সভায় এতৎসম্বন্ধে যে বিবরণী প্রেরণ করেন, তাহাতে লিখিত ছিল,—"এই ব্যাধি গঞ্জাম হইতে কলিকাতায় উপ-স্থিত হয়। একপক্ষ যাবৎ দেশীয়দিগের পল্লী উৎপীড়িত ও বহুসংখ্যক কালকবলিত করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে।" ১৭৮৩ সালের এপ্রেল মাসে হরিদ্বারে এক সপ্তাহে বিশসহস্র যাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময়ে মহীসুরে টিপুসুলতানের বিরুদ্ধে অবস্থিত মহারাষ্ট্রসৈন্য-দলে মধ্যভারতে করমণ্ডল উপকূলের মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে মহামারীর

প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ইংরাজ অভ্যুদয়ের প্রাক্কাল হই-তেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, কলিকাতা, দানাপুর, পাটনা প্রভৃতি নগরসমূহের স্বাস্থ্য ইতিহাসে ইহার নাম শুনা যায়। এই সকল নগর ব্যতীত বহুজন-সমাগমস্থল, নদীসঙ্গম, দেবস্থান প্রভৃতি তীর্থভূমি ওলাউঠা মহামারী উৎ-পাদনের প্রধান কেন্দ্র স্বরূপ গণ্য হইত। এই সকল স্থান হইতে মারী-ভয় সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া থাকে। এরূপ কিম্বদন্তী,—ওলাউঠা প্রথম ১৮১৭ সালের আগষ্ট মাসে যশোহর নগরে উৎপন্ন হয়। সেই সময়ে এমন মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল যে, পীড়াভয়ে অধিবাসিগণ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করাতে যশোহর লোকশূন্য হইয়া যায়। বিচারকার্য্যাদি কিছুদিনের জন্য স্থগিত হইয়াছিল। কলিকাতার চিকিৎসকসভার কর্ত্তৃ-পক্ষগণ নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন,—"যে মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রতি বৎসর এই সময়ে এদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, তবে বর্ত্তমান ঋতুর বৈষম্য এবং যশোহরের কোন স্থানীয় কারণে এত-দূর প্রবল হইয়াছে। কলিকাতার কোন কোন অংশ এরূপ মহামারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে দেখা যায় এবং এই নিম্ন ও আর্দ্র বঙ্গদেশের এমন কোন নগর নাই, যাহা ইহার হস্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে।"

১৮১৭ সালের জুলাই মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই লোকক্ষয়কর মহামারী পাটনা, মৈমনসিং, কলিকাতা, যশোহর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, ভগলপুর, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, বালেশ্বর, কটক, বহরমপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইতে শুনা যায়। কিন্তু এইরূপে বঙ্গের সর্ব্বত্র অকালমৃত্যু প্রবাহিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। ১৮১৮ সালে ইহা সমগ্র ভারত প্লাবিত করিয়াছিল। ১৮১৯ সালে ব্রহ্মদেশ; ১৮২০ সালে আরব, শ্যাম, মালাক্কা ও চীন; ১৮২১ সালে পারস্য ও তুরস্কে প্রবেশ করিয়া আসিয়ার সীমান্তে উপস্থিত হয়। ১৮৩০ সালের পূর্ব্বে আসিয়া খণ্ডের বহির্ভাগে ওলাউঠা মারীভয় অজানিত ছিল। ঐ সালে প্রথম ইহা ইউরোপে প্রবেশ লাভ করে এবং তথা হইতে আমেরিকা ও আফ্-রিকার উত্তরাংশ অধিকার করিয়া থাকে। অদ্যাবধি সাতবার ওলাউঠার ভীষণ মৃত্যুঝটিকায় ইউরোপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এবং প্রতিবারই এই মানবকুলসংহারক ব্যাধি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সলিলসিক্ত নিম্নবঙ্গে আবি-র্ভূত হইয়া মহাবল সঞ্চয় করতঃ সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য-

স্বাস্থ্যবিদ্‌গণ এক বাক্যে বঙ্গদেশকেই ওলাউঠার জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হতভাগ্য বঙ্গের কপালে এ কলঙ্ক অনপনেয়। বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর ওলাউঠায় গড় মৃত্যুসংখ্যা দুইলক্ষ। এই দুর্দ্দমনীয় ব্যাধির হস্তে প্রত্যহ প্রিয় স্বজনগণের অকালমৃত্যুও আমাদিগকে ইহার নিবারণে নিশ্চেষ্ট রাখিযাছে কিন্তু কার্য্যকুশল পাশ্চাত্যগণ কদাচিৎ ইহার করাল হস্তের সংস্পর্শ অনুভব করিলেও ইহার উচ্ছেদ সাধনে কিরূপ সফলকাম হইযাছে, ইংলণ্ডের স্বাস্থ্যবিবরণী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। ওলাউঠা মহামারী কি কারণে কেবল বঙ্গদেশের সমতলে বদ্ধমূল রহিয়াছে, কি কারণেই বা সর্ব্বগ্রাসী সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সময়ে সময়ে দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইযা থাকে, আমরা যথাস্থানে এই সকল প্রশ্নের অনুশীলন করিব।

নিশ্চেষ্ট অবস্থা।

(শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।)

সন্ন্যাসী ও গৃহীর সাধন সম্বন্ধে কথা উত্থাপন হইলে, পরমহংসদেব বলিতেন, যিনি গৃহে থাকিযা সাধনা করিতে পারেন, তিনি বীরভক্ত। আমরা তখন বুঝিয়াছিলাম যে, ইহা একটী উত্তেজনা বাক্য, গৃহীদিগের উৎসাহ দিবার নিমিত্ত। কিন্তু এখন অনুভব হয়—তাহা নয়, তিনি সত্যই বীরভক্ত। সন্ন্যাস গ্রহণে সাধক নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, আপনাকে নিরাশ্রয় জ্ঞান করে, বার বার দুর্গম কান্তার হইতে উদ্ধার পাইয়া ভাবে— আমার রক্ষাকর্ত্তা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণে এই উচ্চ শিক্ষা লাভ হয। এই উচ্চ শিক্ষাই ঈশ্বর লাভের প্রথম সোপান। এই অবস্থায় সাধনা আরম্ভ হয়, এত দিনে তীর্থ ভ্রমণের ফল সম্পূর্ণ হয়, দিবারাত্র বলে—"ভগবান, আমি নিরাশ্রয়, তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা, তুমি এখন কোথায়?" এই উচ্চ শিক্ষা গৃহে অতি কঠিন। কখনো জনশূন্য তুষারাবৃত উচ্চ শৃঙ্গে, নিরাশ্রয় অবস্থায় কেহ আহার দেয় নাই; তাঁহার অর্জ্জিত অর্থে প্রত্যহ পোলাও কালিয়া মেলে; কখনো পথহীন কান্তারে প্রবেশ করেন নাই; সে কান্তারে রক্ষাকর্ত্তা আছেন কি না, তাহা তিনি জানেন না; রাজশাসিত রাজপথে সুখময় যানে বসিয়া যাতায়াত করেন; পীড়ায়

সময় ডাক্তার আছে, নারায়ণ বৈদ্য ও গঙ্গোদক ঔষধ, এ অবস্থা তিনি উপলব্ধি করেন নাই; বৈষয়িক কার্য্যে কৌন্সলি আছে, সর্ব্বস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা—ভাল কৌন্সলি দিয়াছেন,—তিনি যে নিরাশ্রয়, এ কথা তাঁহার উপলব্ধি হওয়া অতি কঠিন।

কিন্তু যদি আমরা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখি যে, ঘোর তরঙ্গে সাগরনিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় আমরা প্রত্যেকেই নিরাশ্রয়; তুঙ্গ শৃঙ্গে যিনি সন্ন্যাসীকে আহার দিয়াছেন, তিনিই আমাদের নিত্য আহার দিতেছেন; অর্থ সম্পদ্ সকলই তাঁহারই দান, জলবুদ্বুদের ন্যায় এখনি লয় হইবার সম্ভাবনা; প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন নাশের সম্ভাবনা; চতুর্দ্দিকে বিপদ্‌জাল,বিপৎকালে আশ্রয় নাই, তিনিই একমাত্র আশ্রয়;—তাহা হইলে সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ থাকে না। কিন্তু বিষয়বিজড়িত মলিন বুদ্ধি কিছুতেই বুঝিতে দেয় না যে, সাগরনিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায় আমরা নিরাশ্রয়। চক্ষের উপর বজ্রাঘাত, সর্পাঘাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি নিত্যই দেখিতেছি। এই আছে—এই নাই—যেন ভাসিতে ভাসিতে সাগরের জলে ডুবিয়া গেল। এই ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, পদ্মা ভাঙ্গিয়ে নিল, রাজা ছিল—ভিকারী। এই স্বজন দাস দাসী পরিবেষ্টিত—মৃত্যু সময় তালা দিতে সকলে ব্যস্ত, শয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষার নিমিত্ত কেহই নাই। দারুণ রোগের যন্ত্রণা, বিচক্ষণ ডাক্তার বসিয়া আছে, উপশম হইতেছে না। তথাপি নিরাশ্রয় জ্ঞান হয় না। ঘোর বিপদে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় জ্ঞান উদয় হয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎই ঘোর অন্ধকারে আবৃত। আবার ভুলিয়া যায়; আমি নিরাশ্রয়, এই মহাজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যবান, এই সংসারে থাকিয়া সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তিনি পরমহংস, তাঁহার পক্ষে সংসার-গৃহ নাই।

কেহ বলিতে পারেন, এই অবস্থা কি হয়? পরমহংসদেব বলিতেন, —হয়। আমরা দেখিয়াছি,—হয়। পরমহংসদেবের ভক্তের মধ্যেই দেখিয়াছি। এ মহাপুরুষ-চরিত্র বর্ণনা করা আমার কতদূর সাধ্য জানি না, কিন্তু সত্যই সেই মহাপুরুষ দেখিয়াছি। তাঁহার নাম ছিল দুর্গাচরণ নাগ, —ইনি পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দেওভোগ গ্রাম-নিবাসী,—ইনি যখন পরমহংসদেবের নিকট যান, শুনিয়াছিলেন যে, ডাক্তার, উকিল, দালাল, এদের ঈশ্বর লাভ হওয়া কঠিন। নাগ

মহাশয় (আমরা সকলে তাঁহাকে নাগ মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম) হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ঔষধের বাক্সটী গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ডাক্তারি করিতে গিয়া, দর্শনীর পরিবর্ত্তে রোগীর পথ্য অনেক সময়ে নিজে দিয়া আসিতেন। কোন দ্রব্য ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে, দোকানদারকে করজোড়ে বলিতেন,—"কৃপা করিয়া এক টাকার সন্দেশ দেন।" দোকানদার যাহা দিল, তাই। ঘরের বাঁশ বাঁকারি ভাঙ্গিয়া অতিথিকে কাট দেওন,—গৃহ আছে, স্ত্রী আছে, ইনি গৃহী। কিন্তু ইহাঁর সন্ন্যাসী হইতে কিছু প্রভেদ নাই। সন্ন্যাসীর ন্যায় আত্মচেষ্টারহিত। একদিন তাঁহার গৃহের পার্শ্বে অপর গৃহে আগুন লাগিয়াছে, তাঁহার পরিবার যাহা জিনিসপত্র ছিল, বাহিরে আনিতেছেন। তিনি নিবারণ করিয়া বলিলেন,—"কি করিতেছ? গৃহে লইয়া যাও। যদি অগ্নিদেব দগ্ধ করেন, কে রক্ষা করিবে? আইস—আমরা অগ্নিদেবের স্তব করি, যাহাতে রক্ষা হয়।" সত্যই, রক্ষা হইল। ইহা বায়ুর গতি পরিবর্ত্তনেই হউক বা যাহাতেই হউক, কিন্তু সত্যই রক্ষা হইল। এইরূপ পরম নিশ্চেষ্ট মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি।

এ স্থলে তর্ক উঠিতে পারে, আমাদের কি নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত? না, কখনই নয়। সাধারণের পক্ষে কখনই নয়। আলস্য বশতঃ যদি কখনও নিশ্চেষ্ট হইবার চেষ্টা পাও, দেখিবে, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইতে পারিতেছ না। নিশ্চেষ্ট হওয়া একটী অবস্থা। অলস হইয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা নয়। তোমার বাসনা তোমায় চেষ্টা করাইবে। নিরন্তর সৎ চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়া যদি নিশ্চেষ্ট হইতে পার। কায়মনোবাক্যে ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া তবে নিশ্চেষ্ট হইতে পারিবে। পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বুঝিবে যে, আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়—তবে নিশ্চেষ্ট হওয়া সম্ভব। নতুবা আমি নিশ্চেষ্ট হইযাছি এই ভান জীবনে বিড়ম্বনা। যাহারা অপদার্থ, কার্য্যে উদ্যমশূন্য, তাহারাই অদৃষ্টে যাহা আছে বলিয়া (প্রকৃত নিশ্চেষ্ট হয় না) কার্য্যে বিরত থাকে। নিয়ত দৈবজ্ঞের নিকট কখন সুসময় আসিবে, তাহা জানিতে ব্যগ্র হয়; বিপদে অধীর ও সম্পদে উল্লসিত, নিশ্চেষ্ট ভানে তাহাদের জীবন যাত্রা একটী বিড়ম্বনা, তাহারা তমোগুণের আদর্শ। সংসারে এই সকল ব্যক্তি লক্ষ্মীছাড়া; কিন্তু যিনি পঙ্ক-

পুরুষার্থ-সম্পন্ন, ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট,—তিনি মহা ক্ষমতাশালী। মা লক্ষ্মী তাঁহার পশ্চাতে বনে অন্ন লইয়া যান, লক্ষ্মীর বরপুত্র ভূপতি তাঁহার দর্শনে অবনতশির হন। তিনি সুখ দুঃখে অটল, সঞ্চয়বুদ্ধিরহিত, সমস্ত সংসার তাঁহার পিতৃসংসার স্থানে নির্ভয়ে বিচরণ করেন। এই নিশ্চেষ্ট অবস্থা লাভ করা সন্ন্যাসী অপেক্ষা গৃহীর শতগুণে কঠিন। সন্ন্যাসীরা তো ফক্কড়, ফাঁকি দিয়াছে। আমরা সেয়ানা হইয়া সকলের কাছে ফাঁকে পড়িতেছি। গুরুর নিকট প্রার্থনা যে, সেয়ানা বুদ্ধি দূর হইয়া যেন আপনাকে "সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়" জ্ঞান লাভ করিতে পারি। যেন তুমি একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, এই বোধ সকল অবস্থায় অচল থাকে, নিদ্রা জাগরণে সমান থাকে, যেন অকপট হৃদয়ে একবার তোমায় ডাকিতে পারি।

সাবিত্রী।

ঈশ্বর ঈশ্বরী পদ করিয়া বন্দনা,
বন্দি ভক্তি ভাবে অতি বাণী পাদুখানি,
সুখদ পরশে যার মুদিত কমল
বিকচে পুলক ভরে, বিস্তারি সৌরভ;
অতুল প্রভাবে যার, কি কব অধিক
মূকমুখে স্ফুরে বাণী সুধাসার হেন।
নমি অবশেষে তোমা হে কবিশেখর
বেদব্যাস! অজ্ঞানের মোহদূরকারী!
অতি আশে দীন আমি লয়েছি শরণ
চরণযুগলে তব, কৃপা চক্ষে চাহি,
কৃতার্থ করহ দাসে। বহুদিন হতে
জাগিছে কামনা হৃদে গাহিতে সে গান
পুণ্যময়ী সাবিত্রীর, সুধাসম যাহা
পিয়ে নিত্য সুরগণ ত্রিদিব সভায়
অপ্সর-কিন্নর-কণ্ঠ-নির্ঝর-নিঃসৃত।

সেই পদরজঃ শিরে বাণীপুত্রবর—
যাহার প্রভাবে কবি ভারবি ভারতে
অবিনাশি যশকীর্ত্তি করিলা স্থাপন।
যেই পদরজঃ শিরে করিয়া ধারণ
নবরসে পূর্ণকাব্য রচিলা ভাষায়
কাশীদাস পুণ্যামৃতকুণ্ড সম, যাহে
অবগাহি, গৌড়জন নাশে পাপরাশি।
উহার প্রভাব বিনে কি সাধ্য আমার
কবিত্বসম্পদহীন—করিতে কীর্ত্তন
মহতী সাবিত্রী গীতি কীর্ত্তি-অনুযাত,
তুষিতে সজ্জন যত; তোষে যেই মতে
সমীরণ হৃত বাস করি বিতরণ।

গত বহুদিন হায়, সে দিন কি আর
উদিবে ভারতে পুনঃ, শোভিবে সুন্দর
নিষ্কলঙ্ক গৌরবের প্রভায় উজ্জ্বল,
খেদাইবে দূরে ঘোর এ তিমির রাশি,
শতেক শতাব্দী ব্যাপি অবিচ্ছিন্ন ভাবে
আচ্ছাদি রেখেছে যাহা অতীত গৌরব?

গত বহুদিন আজি—নর্ম্মদার কূলে
শোভে যথা দেশ-চারু মদ্র অভিধান
স্বর্গৈকপ্রদেশ সম—নিবসিত তথা
বিবস্বৎকুলোজ্জ্বল নৃপ অশ্বপতি।
দ্বিতীয় রাঘব প্রায় প্রজার পালনে
সতত নিরত নৃপ করি প্রাণপণ;
প্রজাগণ—জনকের স্নেহের সন্তান।
নাহি রাজ্যে অত্যাচার শমন সোদর
লোলজিহ্ব, রক্তনেত্র, ভ্রূকুটি কুৎসিৎ,
করাল কৃপাণ করে উন্মত্ত তাণ্ডবে;

অত্যাচার সহোদর দুর্ভিক্ষ ভীষণ
শীর্ণকায়, অস্থিময়, ব্যাদিত বয়ান,
কোটরবিগতচক্ষু, ধূলিরুক্ষকেশ,
মুখে অমঙ্গল ধ্বনি রটিত সতত,
অথবা মড়ক ঘোর জনক ব্যাধির,
মৃত্যুর নির্দ্দয় পুত্র,—পরশে যাহার
সুন্দর নন্দন বন শ্মশান সদৃশ,
যার নাম প্রবেশিলে শ্রবণ কুহর
জীববৃন্দ শুষ্ককণ্ঠ, বিবর্ণ বদন,
সঘনে ধ্বনিত-বক্ষ মুমূর্ষুর প্রায়।
ভ্রমে কভু রাজ্য প্রান্ত করে না পরশ
শোক দুঃখ সহোদরা উন্মাদ যমজা
বিষাদ কালিমাবৃত বদন মণ্ডল
মুখে হাহাকার ধ্বনি মর্ম্মভেদকর,
নেত্রে দরদর ধারা, তপত নিশ্বাসে
ভস্মীভূত হয়ে সব উড়ে রেণু রেণু।
সুশাসনরূপ দণ্ডে দণ্ডিত এ সবে।
যথাকালে দেয় দেখা (ধাম্মিক নৃপতি)
ছয় ঋতু, বার মাস, ধনধান্যে ভরা
বসুমতী; অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা,
অগ্নিভয়, বিদ্রোহিতা নাহি সেই দেশে।
সুশাসনে প্রজাগণ দৃঢ় অনুগত।
কার মনে ইচ্ছে সদা নৃপের মঙ্গল।

অহরহ পুরমাঝে আনন্দের স্রোত,
কোথাও বাজিছে বাদ্য; গাহিছে কেহ বা
সঙ্গীত সুগীত যায় ঈশ্বর বন্দনা,
নৃপকীর্ত্তিকথা কিম্বা রাগভাবান্বিত।
নাচিছে নর্ত্তকীদল; কুহকী যাহারা
চক্ষু মন করি মুগ্ধ কুহকের বশে
দেখায় কুহক কত কৌতুক করিয়া।

প্রজার মঙ্গল ইচ্ছি সতত নৃপতি,
পরম বিশুদ্ধ চিতে, শুদ্ধ কলেবরে,
পরম পিতার পদ করেন অর্চ্চনা,
যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান শাস্ত্রের সম্মত।
দীন হীন জনে যত আপন হস্তেতে
প্রদানেন ধনধান্য, খাদ্য বহুবিধ,
বস্ত্র অলঙ্কার আদি; না রাখেন আর
হৃদয়ের খেদ কারও, হাসিমুখে সবে
ফিরি যায়, আশীর্ব্বাদ করি উচ্চারণ।
আনন্দে আনন্দ-অশ্রু ফেলেন নৃপতি,
মুক্তাফল জিনি যাহা অমূল্য জগতে।

হায় রে, বিধিব বিধি কে পারে বুঝিতে
এ জগতে; হেন দেব-রূপী নর এই
যে নৃপতি, মনপদ্ম সতত তাঁহার
অপ্রফুল্ল, অনুদিত সন্তান তপন!
অসুখী নৃপতি নিজে, মহিষী সতত
খেদিতা অন্তরে বহু, তাঁহাদের দুখে
দুখিত নিতরা প্রজা পারিষদ আদি।

বহু বহুকালব্যাপি সস্ত্রীক নৃপতি
পূজিলা সাবিত্রী দেবী, পরে বর লভি
পায় কন্যা, স্মরি যার পুণ্যময় নাম-
স্বধর্ম্মবিচ্যুতা নারী লভি পুণ্যধন
অবহেলে চলি যায় বৈকুণ্ঠ নগরী।
আজন্ম দরিদ্র সেই যেই জন হায়
আজন্ম পুষিছে হৃদে আশার আশ্বাস,
কুহকী স্বপ্নের ছলে কত প্রতারিত,
হঠাৎ শয়ন হতে উঠিয়া প্রভাতে
হেরি লব্ধ দুই করে দুইটী মাণিক
সাত নৃপতির ধন—অপার আনন্দ

ভোগে সুখী-মন যথা; আজি নৃপতির,
লভি কন্যা, সেইরূপ আনন্দ অমেয়।

আকাশ সম্ভবা বাণী দিইল ঘোষণা—
"পুণ্যবান্ তুমি নৃপ, তুষ্ট দেবকুল,
সেই সে কন্যারূপে সাবিত্রী আপনি
উদয় তোমার ঘরে, বাড়াইতে তব
কুলমান, ধন্য বলি মানহ আপনা।"
শুনে নৃপ শূন্য দেশে অমর-সঙ্গীত,
আনন্দের কোলাহল, বীণা যন্ত্র ধ্বনি,
নুপুরের মৃদুরব নৃত্য-বিজনিত।
সহসা পবন আনি ছড়ায় চৌদিকে
পারিজাত পরিমল, দেবপুষ্পবাস।
সহসা হাসিল দিক স্বর্গীয় বিভায়
অপরূপ, যেন কেহ স্বর্ণরজঃ দিয়া
আ-অম্বর ক্ষিতিতল করিল মার্জ্জিত।
(ক্রমশঃ)

নমো বিবেকানন্দায়।

"ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ।"

পূরব দুয়ার খুলে কে এলো রে ধীরে ধীরে,
জ্বালিয়া জ্ঞানের দীপ আঁধার বঙ্গের ঘরে॥
নিখিল চন্দ্রমা জ্যোতি, কে তুমি গো মহামতি,
দ্বিতীয় ভাস্কর ভাতি বিশ্বভূমি আলো করে॥
হেরে সে আলোকরাশি, চমকিত বিশ্ববাসী,
চাহিয়ে মানব পানে আত্মার স্বরূপ হেরে॥
শুনেছি পণ্ডিত পাশে, এ আলোক কভু আসে,
দিতে "তত্ত্বমসি" বার্ত্তা জাগা'তে অজ্ঞান নরে,
শুনিনু এ ব্রহ্ম-জ্যোতি, পুন ভাসাইতে ক্ষিতি,
দিতে সেই তত্ত্বভাতি উদিত ভারত দ্বারে॥
তাই আজি লোকময়, আনন্দের ধারা বয়,
এ সংবাদ সুধাময় বিলাইতে ঘরে ঘরে॥
পৌষ, কৃষ্ণাসপ্তমী। কিরণ।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব।

বিগত ৯ই জানুয়ারি শনিবার বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে মধ্যাহ্নে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও রাত্রে কালীপূজা হয়।

১০ই জানুয়ারি পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী বেদ এবং স্বামী শুদ্ধানন্দ উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। নানাস্থানে স্বামীজির ফটো লিথো প্রভৃতি চিত্রাবলি সুসজ্জিত ভাবে স্থাপিত হয়। বাবু কাশীনাথ সুকুল, বাবু পুলিনবিহারী মিত্র ও পালখিয়াব ভক্তবৃন্দ সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। কনসার্টও সুললিত স্বরে বাদিত হইয়াছিল।

মধ্যাহ্নে সিষ্টার নিবেদিতা স্বামীজির সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "আমরা এখানে কেবল উৎসবের আনন্দে ক্ষণিক উন্মত্ত হইতে সমবেত হই নাই। যাহাতে স্বামীজির শিক্ষা প্রাণপণে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, তাহার শক্তি লাভের জন্যই এই উৎসবের আয়োজন। তাঁহার কি শিক্ষা ছিল? তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার নাম লোকে গান করুক? না, আমরা জানি, তিনি নাম যশ প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হউক? না, তিনি তাহাও চাহিতেন না। তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার বিশেষ উপদেশ বা কার্য্যপ্রণালী সকলে অনুসরণ করুক? না, তিনি তাহাও চাহিতেন না। তবে তিনি চাহিতেন কি? তিনি চাহিতেন, সকলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াক, মানুষ হউক।" বক্তৃতান্তে প্রায় ৫।৬ শত ভদ্রলোক প্রসাদ পাইলে গরিবদিগের ভোজন আরম্ভ হইল। দুই সহস্রের অধিক গরিব দুঃখী উদর পুরিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিল। কলিকাতাস্থ বিবেকানন্দ সমিতি সকলের সভ্যগণও 'স্মৃতিমন্দিরের' ছাত্রগণ পরমোৎসাহে তাহাদের সেবা করিয়া আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করিয়াছিলেন।

কাশীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম ও ভাবদা রামকৃষ্ণ অনাথাশ্রম হইতেও আমরা উৎসবের সংবাদ পাইয়াছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'দেবী চৌধুরাণী'।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ শনিবার ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, পৌষ শুক্লা সপ্তমী তিথি। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম উপলক্ষে ভক্তদের অবসর হইয়াছে। অনেকে

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য এক টাকা; ভাল কাপড়ে বাঁধান মূল্য পাঁচ সিকা। ১৩।২, গুরু প্রসাদ চৌধুরীর লেনে শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্তের নিকট বা ৫৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে (বাগবাজার) শ্রীশান্তিরাম ঘোষের নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ইংরাজী অনুবাদ New York Vedanta Society দ্বারা শীঘ্র ছাপা হইবে অর্থাৎ Leaves from the Gospel of Sri Ramakrishna এই পুস্তক সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীম—কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

Dehra-Dun

24th November, 1897

My dear M—

Many many thanks for your second leaflet It is indeed wonderful. The move is quite original and never the life of a great teacher was brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing.

The language also is beyond all praise, so fresh, so pointed and withal so plain and easy.

I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. Strange is n't it? Our Teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you this great work He is with you evidently.

With all love and namaskar

(Sd.) Vivekananda.

Socratic dialogues are Plato all over, you are entirely hidden. Moreover the dramatic part is infinitely beautiful. Every body likes it here or in the West.

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিযাছেন। সকালেই অনেকে উপস্থিত হইযাছেন। মাষ্টার ও প্রসন্ন † আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার ঘরের দক্ষিণ দিকের দালানে বসিযাছেন। তাঁহারা আসিযা চরণবন্দনা করিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে বল্লেন, 'কই, বঙ্কিমকে আন্‌লে না ?'

বঙ্কিম একটী স্কুলের ছেলে। ঠাকুর বাগবাজারে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। দূর থেকে দেখিযাই বলিযাছিলেন, ছেলেটী ভাল।

ভক্তেরা অনেকেই আসিযাছেন। কেদার, রাম, নৃত্যগোপাল, তারক, সুরেশ (মিত্র) ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কিযৎক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পঞ্চবটীতে গিযা বসিযাছেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে ঘেরিযা রহিযাছেন, কেহ বসিযা কেহ দাঁড়াইযা। ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে ইষ্টকনির্ম্মিত চাতালের উপর বসিযা আছেন। দক্ষিণপশ্চিম দিকে মুখ করিযা বসিযা আছেন। সহাস্যে মাষ্টারকে বলিলেন, 'বইখানা কি এনেছ ?'

মাষ্টার। আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পড়ে আমায একটু একটু শোনাও দেখি।

ভক্তেরা আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিলেন, কি পুস্তক। পুস্তকের নাম 'দেবী চৌধুরাণী।' ঠাকুর শুনিযাছেন, দেবী চৌধুরাণীতে নিষ্কাম কর্ম্মের কথা আছে। লেখক শ্রীযুত বঙ্কিমের সুখ্যাতও শুনিযাছিলেন। পুস্তকে কি তিনি লিখিয়াছেন, তাহা শুনিলে তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। মাষ্টার বলিলেন, 'মেযেটী ডাকাতের হাতে পড়েছিল। মেযেটীর নাম প্রফুল্ল, পরে হ'ল দেবী চৌধুরাণী। যে ডাকাতটীর হাতে মেয়েটী পড়েছিল, তার নাম ভবানী পাঠক। ডাকাতটী বড় ভাল। সেই প্রফুল্লকে অনেক সাধন ভজন করিয়েছিল। আর কি রকম কোরে নিষ্কাম কর্ম্ম করতে হয, তাই শিখিযেছিল। ডাকাতটী দুষ্ট লোকদের কাছ থেকে টাকা কড়ি কেড়ে এনে গরীব দুঃখীদের খাওযাতো, তাদের দান কোত্তো। প্রফুল্লকে বলেছিল, আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও ত রাজার কর্ত্তব্য।

† শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন—স্বামী ত্রিগুণাতীত। ইনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করেন।

মাষ্টার। আর এক জায়গায় ভক্তির কথা আছে। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লর কাছে বাকৃবার জন্যে একটী মেয়েকে পাঠিয়ে দিছ্‌লেন। তার নাম নিশি। সে মেয়েটী বড় ভক্তিমতী। সে বোল্‌তো, শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী। প্রফুল্লর বিয়ে হয়েছিল। প্রফুল্লর বাপ ছিল না, মা ছিল। মিছে একটা বদ্‌নাম তুলে পাড়ার লোকে ওদের একঘরে করে দিছ্‌ল। তাই শ্বশুর প্রফুল্লকে বাড়ীতে নিয়ে যায় নি। ছেলেকে আরও দুটী বিয়ে দিছ্‌ল। প্রফুল্লের কিন্তু স্বামীর উপর বড ভালবাসা ছিল। এই খানটা শুন্‌লে বেশ বুঝ্‌তে পারা যাবে।

"নিশি। আমি তাঁহার (ভবানী ঠাকুরের) কন্যা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্রফুল্ল। এক প্রকার কি?

নি। সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্র। সে কি রকম?

নি। রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্র। তিনিই তোমার স্বামী?

নি। হাঁ—কেন না, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছ। স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।'

মূর্খ ব্রজেশ্বর (প্রফুল্লের স্বামী) এত জানিত না!

বয়স্যা বলিল, 'শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেন না, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।'

এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর—একথার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম্মপ্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পুরিতে পারি না, কিন্তু সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।

প্রফুল্ল মূর্খ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'আমি অত কথা ভাই বুঝিতে পারি না। তোমার নামটী কি, এখনও ত বলিলে না?'

বয়স্যা বলিল, 'ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি। আমি দিবার বহিন নিশি। দিবাকে এক দিন আলাপ করিতে লইয়া আসিব। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, শোন। ঈশ্বরই পরম স্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা। শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন, ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুইভাগ করিলে কতটুকু থাকে?'

প্র। দূর্! মেয়ে মানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?

নি। মেয়ে মানুষের ভালবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আর।"

(আগে ঈশ্বর সাধন না আগে লেখাপড়া ?)

মাষ্টার। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে সাধন আরম্ভ করালেন।

"প্রথম বৎসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে, আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে, যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকটে যাইতেন—প্রফুল্ল নেড়া মাথায় অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত।"

তার পর প্রফুল্লের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হোল। ব্যাকরণ পড়া হোল, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা। একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত, একটু ন্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এর মানে কি জান? না পড়্‌লে শুন্‌লে জ্ঞান হয় না। যে লিখেছে, এ সব লোকের এই মত। এরা ভাবে, আগে লেখা পড়া তার পর ঈশ্বর। ঈশ্বরকে জান্‌তে হলে লেখাপড়া। কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ কর্‌তে হয়, তা হলে তার কখানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ, এ সব আগে আমার অত খবরে কাজ কি? যো সো করে, স্তব করেই হোক, দ্বারবানদের ধাক্কা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভেতর ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্য্যের খবর জান্‌তে ইচ্ছা হয়, তখন যদুমল্লিককে জিজ্ঞাসা কল্লেই হয়ে যাবে। খুব সহজে হয়ে যাবে। আগে

রাম, তার পর রামের ঐশ্বর্য্য—জগৎ। তাই বাল্মীকি "মরা" মন্ত্র জপ কোরেছিলেন; আগে "ম" অর্থাৎ ঈশ্বর, তার পর "রা" অর্থাৎ জগৎ—তাঁর ঐশ্বর্য্য।

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া ঠাকুরের কথামৃত পান করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(নিষ্কাম কর্ম্ম ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।)

মাষ্টার। অধ্যয়ন শেষ হলে আর অনেক দিন সাধনের পর ভবানী ঠাকুর প্রভুর সঙ্গে আবার দেখা করতে এলেন। এইবার নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দিবেন। গীতা থেকে শ্লোক বল্লেন,

'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥' *

গীতা। ৩।১৯।

অনাসক্তির তিনটী লক্ষণ বল্লেন,—

(১) ইন্দ্রিয়সংযম।
(২) নিরহঙ্কার।
(৩) শ্রীকৃষ্ণে ফলসমর্পণ।

নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ হয় না। গীতা থেকে আবার বল্লেন,

'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥' †

গীতা। ৩। ২৭।

যে কাযই কর, তোমার গুণে তাহা হইল, কখন মনে করিবে না।"

তার পর সর্ব্বকর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ। আবার গীতা থেকে বল্লেন,—

---

* অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। কারণ, অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিলে পুরুষ সেই শ্রেষ্ঠ ভগবৎপদ লাভ করেন।

† সমুদয় কর্ম্মই প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা কৃত হইতেছে; কিন্তু অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তি আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥*'

গীতা। ৯।২৭।

নিষ্কাম কর্ম্মের এই তিনটী লক্ষণ বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ বেশ। গীতার কথা। কাট্‌বার জো নেই। তবে আর একটা কথা আছে।

শ্রীকৃষ্ণে ফলসমর্পণ বলেছে; কৃষ্ণে ভক্তি বলে নাই?

মাষ্টার। এখানে একথাটী বিশেষ করে বলা নাই।

(সন্ন্যাস ও ঈশ্বরলাভ)

তার পর ধনের কি ব্যবহার কত্তে হবে, এই কথা হল। প্রফুল্ল বল্লে, এ সমস্ত ধন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কল্লাম।

"প্রফুল্ল। যখন আমার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।

ভবানী। সব?

প্রফুল্ল। সব।

ভবানী। ঠিক তাহা হইলে কর্ম্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার আহারের জন্য যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে। অতএব তোমাকে হয় ভিক্ষাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহরক্ষা করিতে হইবে। ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে। অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহরক্ষা করিবে।"

মাষ্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সহাস্যে)। এই টুকু পাটোয়ারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ঐ টুকু পাটোয়ারি। ঐ টুকু হিসেব বুদ্ধি। যে ভগবানকে চায়, সে একেবারে ঝাঁপ দেয়। দেহরক্ষার জন্য এইটুকু থাক্‌ল, এ সব হিসাব আসে না।

মাষ্টার। তার পরে আছে, ভবানী জিজ্ঞাসা কল্লে, ধন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কেমন কোরে কর্ব্বে? প্রফুল্ল বল্লে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতে আছেন। অতএব সর্ব্বভূতে ধন বিতরণ করবো। ভবানী বল্লে, ভাল, ভাল। আর গীতা থেকে শ্লোক বল্‌তে লাগ্‌লো,—

* যাহা কিছু কর, যাহা খাও, যে হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, তাহাই আমাতে অর্পণ কর।

'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥' *

গীতা। ৬ অঃ ৩০।৩১।৩২।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এগুলি উত্তম ভক্তের লক্ষণ।

(বিষয়ী লোক ও তাহার ভাষা।)

মাষ্টার পড়িতে লাগিলেন। সর্ব্বভূতে দানের জন্য অনেক শ্রমের প্রয়োজন। কিছু বেশবিন্যাস, কিছু ভোগবিলাসের ঠাটের প্রয়োজন হবে। ভবানী তাই বল্লেন, কখন কখন কিছু 'দোকানদারী' চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্তভাবে)। দোকানদারী চাই। যেমন আকর, তেমনি কথাও বেরোয়। রাতদিন বিষয় চিন্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা, এ সব করে করে কথাগুলোও এই রকমই হয়ে যায়। মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর বেরোয়। দোকানদারী কথাটা না বলে ঐটে ভাল করে বল্লেই হোতো, "আপনাকে অকর্ত্তা জেনে কর্ত্তার ন্যায় কায করা।" সে দিন একজন গান গাচ্ছিল। সে গানের ভিতরে 'লাভ,' 'লোকসান' এই সব কথাগুলো অনেক ছিল। গান গাচ্ছিল, আমি বারণ কল্লুম। যা ভাবে রাতদিন, সেই বুলিও উঠে!

---

* যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আমাকে দেখিয়া থাকে এবং সকল বস্তুকেও আমাতে দেখিয়া থাকে, তাহার নিকট আমি কখনই অদৃষ্ট থাকি না, সেও কখন আমার দৃষ্টির দূরে থাকে না। যে ব্যক্তি জীব ও ব্রহ্মে অভেদদর্শী হইয়া সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করে, সে যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না, সেই যোগী আমাতেই অবস্থান করে। হে অর্জ্জুন, সুখই হউক, দুঃখই হউক, যিনি নিজের তুলনায় সকলের প্রতিই সমদর্শন করেন, সেই যোগীই আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(ঈশ্বরদর্শনের উপায়।)

পাঠ চলিতে লাগিল। এইবারে ঈশ্বরদর্শনের কথা। প্রফুল্ল এবার দেবী চৌধুরাণী হইয়াছেন। বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথি। দেবী বজ‍্‌রার উপর বসিয়া দিবার সহিত কথা কহিতেছেন। চাঁদ উঠিয়াছে। গঙ্গা-বক্ষে বজরা নঙ্গর করিয়া আছে। বজরার ছাদে দেবী ও সখীদ্বয়। ঈশ্বর কি প্রত্যক্ষ হন, এই কথা হইতেছে। দেবী বল্লেন, যেমন ফুলের গন্ধ ঘ্রাণের প্রত্যক্ষ, সেই রূপ ঈশ্বর মনের প্রত্যক্ষ হন। "ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। মনের প্রত্যক্ষ। সে এ মনের নয়। সে শুদ্ধ মনের প্রত্যক্ষ। তখন এ মন থাকে না। বিষয়াসক্তি একটু থাক্‌লেও হয় না। মন যখন শুদ্ধ হয়, তখন শুদ্ধ মনও বল্‌তে পার, শুদ্ধ আত্মাও বল্‌তে পার।

মাষ্টার। মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ যে সহজে হয় না, একথা একটু পরে আছে। বলেছে, প্রত্যক্ষ করতে দূরবীন চাই। ঐ দূরবীনের নাম যোগ। তার পর যেমন গীতায় আছে, বলেছে, যোগ তিন রকম,—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ। এই যোগদূরবীন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ খুব ভাল কথা। গীতার কথা।

(পাতিব্রত্যধর্ম্ম ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ।)

মাষ্টার। শেষে দেবী চৌধুরাণীর স্বামীর সঙ্গে দেখা হোলো। স্বামীর উপর খুব ভক্তি। স্বামীকে বল্লে, 'তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম,—শিখিতে পারি নাই। তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। 'শিখিতে পারি নাই!' এর নাম পতিব্রতা ধর্ম্ম। এও আছে।

পাঠ সমাপ্ত হইল। ঠাকুর হাসিতেছেন। ভক্তেরা চাহিয়া আছেন, ঠাকুর আবার কি বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে কেদার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি।) এ এক

রকম মন্দ নয়। পতিব্রতাধর্ম্ম। প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা কচ্চেন।

(ঠাকুরের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা
ও
সর্ব্বভূতে ঈশ্বরদর্শন।)

"কি অবস্থা সব গেছে! হরগৌরী ভাবে কতদিন ছিলুম! আবার কতদিন রাধাকৃষ্ণ ভাবে! কখন সীতারামের ভাবে! রাধার ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করতুম, সীতার ভাবে রাম রাম করতুম।

"তবে লীলাই শেষ নয়। এই সব ভাবের পর বল্লুম, মা, এ সবে বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নেই, এমন অবস্থা করে দাও। তাই আবার কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই ভাবে রইলুম। ঠাকুরদের ছবি ঘর থেকে বার কোরে দিলুম!

"তাঁকে সর্ব্বভূতে দর্শন করতে লাগ্‌লুম। পূজা উঠে গেল। এই বেল-গাছ। বেলপাতা তুল্‌তে আসতুম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁস খানিকটা উঠে এল। দেখ্‌লাম, গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হোলো। দুর্ব্বা তুল্‌তে গিয়ে দেখি, আর সে রকম করে তুল্‌তে পারিনি। তখন রোক করে তুল্‌তে গেলুম।

"আমি লেবু কাট্‌তে পারি না। সে দিন অনেক কষ্টে, 'জয় কালী' বলে তাঁর সম্মুখে বলির মত করে তবে কাট্‌তে পেরেছিলুম। এক দিন ফুল তুল্‌তে গিয়ে দেখিয়ে দিলে,—গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন বিরাট সম্মুখে—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া। আর ফুল তোলা হোলো না।

"তিনি মানুষ হয়েও লীলা কচ্চেন। আমি দেখি, সাক্ষাৎ নারায়ণ! কাঠ ঘস্‌তে ঘস্‌তে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাক্‌লে মানুষেতেই ঈশ্বর দর্শন হয়। তেমন টোপ হোলে বড় রুই কাতলা কপ্ কোরে খায়।

"প্রেমোন্মাদ হলে সর্ব্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল, আমিই কৃষ্ণ! তখন উন্মাদ অবস্থা। গাছ দেখে বলে, এরা তপস্বী, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান

কচ্চে। তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ কোরে ঐ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে।

"পতিব্রতা-ধর্ম্ম। স্বামী দেবতা। তা হবে না কেন? প্রতিমায় পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না?

(প্রতিমায় আবির্ভাব।)

"প্রতিমায় আবির্ভাব হতে গেলে তিনটী জিনিষের দরকার,—প্রথম পূজারির ভক্তি, ২য় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, ৩য় গৃহস্বামীর ভক্তি।

"বৈষ্ণবচরণ বলেছিল, শেষে নরলীলাতেই মনটী কুড়িয়ে আসে।

"তবে একটী কথা আছে,—তাঁকে সাক্ষাৎকার না কল্লে এরূপ লীলা দর্শন হয় না। সাক্ষাৎকারের লক্ষণ কি জান? বালক স্বভাব হয়। কেন বালকস্বভাব হয়? ঈশ্বর নিজে বালকস্বভাব কি না! তাই যে তাঁকে দর্শন করে, তারও বালক স্বভাব হয়ে যায়।

"এই দর্শন হওয়া চাই। এখন তাঁর সাক্ষাৎকার কেমন কোরে হয়? তীব্র বৈরাগ্য। এমন হওয়া চাই যে, বোল্‌বে, কি জগৎপিতা—আমি কি জগৎ ছাড়া? আমায় তুমি দয়া কোর‍্বে না? শালা!

"যে যাকে চিন্তা করে, সে তার সত্তা পায়। শিবপূজা করে শিবের সত্তা পায়। একজন রামের ভক্ত রাতদিন হনুমানের চিন্তা কোর‍্তো। মনে কোত্তো, আমি হনুমান হয়েছি। শেষে তার ধ্রুব বিশ্বাস হোলো যে, তার একটু ল্যাজও হয়েছে।

"শিব অংশে জ্ঞান হয়, বিষ্ণু অংশে ভক্তি হয়। যাদের জ্ঞানীর স্বভাব, তাদের শিব অংশ, যাদের বিষ্ণু অংশ, তাদের ভক্তের স্বভাব।

মাষ্টার। চৈতন্যদেব? তাঁর ত আপনি বলেছিলেন, জ্ঞান ও ভক্তি দুই ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। তাঁর আলাদা কথা। তিনি ঈশ্বরের অবতার! তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাৎ! তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, সার্ব্বভৌম যখন জিহ্বায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাওয়াতে ফর্‌ফর্‌ করে উড়ে গেল, ভিজ্‌লো না। সর্ব্বদাই সমাধিস্থ! কত বড় কামজয়ী! জীবের সহিত তাঁর তুলনা! সিংহ বার বছরে একবার রমণ করে, কিন্তু মাংস খায়; চড়ুই কাঁকর খায়, কিন্তু রাতদিনই রমণ করে। তেমনি অবতার আর

জীব। জীব কাম ত্যাগ করে; আবার একদিন রমণ হয়ে গেল, সাম্লাতে পারে না।

(মাষ্টারের প্রতি।) লজ্জা কেন? যার হয়, সে লোক পোক দেখে! 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।' এ সব পাশ। 'অষ্ট পাশ' আছে না?

"যে নিত্যসিদ্ধ, তার আবার সংসারে ভয় কি? ছকবাঁধা খেলা। আবার কেঁপ্লে কি হয়, ছক বাঁধা খেলাতে এ ভয় থাকে না।

"যে নিত্যসিদ্ধ, সে মনে কল্লে সংসারেও থাক্‌তে পারে। কেউ কেউ দুই তলোওযার নিয়ে খেল্‌তে পারে। এমন খেলওয়াড় যে, ঢিল পড়্‌লে তলোয়ারে লেগে ঠিক্‌রে যায়।

একজন ভক্ত। মহাশয়, কি অবস্থায় ঈশ্বরকে দর্শন পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মন সব কুড়িয়ে না আন্‌লে কি হয়? ভাগবতে শুকদেবের কথা আছে--পথে যাচ্ছে, যেন সঙ্গীন চড়ান! কোন দিকে দৃষ্টি নাই। এক লক্ষ্য—কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি। এর নাম যোগ!

"চাতক কেবল মেঘের জল খায়। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী আর সব নদী জলে পরিপূর্ণ, সাত সমুদ্র ভরপুর, তবু সে জল খাবে না। মেঘের জল পড়্‌বে, তবে খাবে!

"যার এরূপ যোগ হয়েছে, তার ঈশ্বরের দর্শন হতে পারে। থিয়েটারে গেলে যতক্ষণ না পর্দ্দা উঠে, ততক্ষণ লোকে বসে বসে নানারকম গল্প করে—বাড়ীর কথা, আপিসের কথা, ইস্কুলের কথা, এই সব। যাই পর্দ্দা উঠে, অমনি কথাবার্ত্তা সব বন্ধ! যা নাটক হচ্চে, একদৃষ্টে তাই দেখ্‌তে থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি এক আধটা কথা কয়, সে ঐ নাটকেরই কথা।

"মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দের কথাই কয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নৃত্যগোপাল সাম্‌নে বসিয়া আছেন। তিনি সর্ব্বদা ভাবস্থ, মুখে একটী কথা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ (নৃত্যগোপালের প্রতি সহাস্যে)। গোপাল! তুই কেবল চুপ কোরে থাকিস্!

নৃত্য। আমি—জানি—না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বুঝেছি, কিছু বলিস্ না কেন। অপরাধ?

“বটে, বটে। জয় বিজয় নারায়ণের দ্বারী। সনক সনাতনাদি ঋষিদের ভিতরে যেতে বারণ করেছিল। সেই অপরাধে তিন বার এই সংসারে জন্মাতে হয়েছিল।

“শ্রীদাম * গোলোকে বিরজার দ্বারী ছিলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণকে বিরজার মন্দিরে ধর্‌বার জন্যে তাঁর দ্বারে গিছ্‌লেন, আর ভিতরে ঢুক্‌তে চেয়েছিলেন—শ্রীদাম ঢুক্‌তে দেয় নাই। তাই শ্রীমতী শাপ দিলেন, তুই মর্ত্ত্যে অসুর হয়ে জন্মাগে যা। শ্রীদামও শাপ দিছ্‌লো! (সকলের ঈষৎ হাস্য।)

“কিন্তু একটী কথা আছে,—ছেলে যদি বাপের হাত ধরে, তা হলে খানায় পড়্‌লেও পড়্‌তে পারে, কিন্তু বাপ যার হাত ধরে থাকে, তার ভয় কি!

* * * * *

কেদার (চাটুয্যে) এখন ঢাকায় থাকেন; তিনি সরকারী কর্ম্ম করেন। আগে কর্ম্মস্থল কলিকাতায় ছিল, এখন ঢাকায়। তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত। ঢাকায় অনেকগুলি ভক্তের সঙ্গ হইয়াছে। সেই সকল ভক্তেরা তাঁর কাছে সর্ব্বদা আসেন ও উপদেশ গ্রহণ করেন। ভক্তদর্শনে শুধু হাতে আস্‌তে নাই। অনেকে মিষ্টান্নাদি আনেন ও কেদারকে নিবেদন করেন।

কেদার (অতি বিনীত ভাবে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। তাদের জিনিষ কি খাবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি ঈশ্বরে ভক্তি করে দেয়, তা হলে দোষ নাই। কামনা করে দিলে সে জিনিষ ভাল নয়।

কেদার। আমি তাদের বলেছি, আমি নিশ্চিন্ত। আমি বলেছি, যিনি আমায় কৃপা করেছেন, তিনি সব জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তাত সত্য! এখানে সব রকম লোক আসে, তাই সব রকম ভাব দেখ্‌তে পায়।

কেদার। আমার নানা বিষয় জানা দরকার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। না গো, সব একটু একটু চাই। যদি মুদির দোকান কেউ করে, সব রকম রাখ্‌তে হয়—কিছু মুসুর ডালও চাই, হোলো খানিকটা তেঁতুল এ সব রাখ্‌তে হয়।

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

"যে বাজনার ওস্তাদ, সে সব বাজনা কিছু কিছু বাজাতে পারে।

* * * * *

ঠাকুর ঝাউতলায় বাহ্যে গেলেন—একটী ভক্ত গাড়ু লইয়া সেইখানে রাখিয়া আসিলেন।

ভক্তেরা অনেকেই এদিক উদিক বেড়াইতে লাগিলেন—কেহ বা ঠাকুরের ঘরের দিকে গমন করিলেন, কেহ কেহ পঞ্চবটীতেই ঠাকুরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিলেন, ঠাকুর ফিরিয়া আসিতেছেন।

ঠাকুর পঞ্চবটীতে ফিরিয়া আসিতেছেন। সেখানে আসিয়া বলিলেন—"দু তিন বার বাহ্যে গেলুম। যদু মল্লিকের বাড়ী খাওয়া—ঘোর বিষয়ী! পেট গরম হয়ে রয়েছে।"

ঠাকুরের পানের ডিবে পঞ্চবটীর চাতালে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। আরও দু একটী জিনিষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ঐ ডিবে আর কি কি আছে, ঘরে আন।

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের দিকে দক্ষিণাস্য হইয়া যাইতে লাগিলেন। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। কাহারও হাতে পানের ডিবে, কাহারও হাতে গাড়ু ইত্যাদি।

ঠাকুর মধ্যাহ্নের পর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। দুই চারিটী ভক্ত আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাট্‌টীতে একটী ছোট তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'মহাশয়, জ্ঞানে কি ঈশ্বরের Attributes—গুণ—জানা যায়?'

ঠাকুর বলিলেন, "সে এ জ্ঞানে নয়। অমনি কি তাঁকে জানা যায়? সাধন কত্তে হয়। আর একটা কোন ভাব আশ্রয় কত্তে হয়। দাস ভাব। ঋষিদের শান্তভাব ছিল। জ্ঞানীদের কি ভাব জান? স্বস্বরূপকে চিন্তা করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (একজন ভক্তের প্রতি সহাস্যে)। তোমার কি?

ভক্তটী চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তোমার দুই ভাব—স্বস্বরূপকে চিন্তা করাও বটে, আবার সেব্য সেবকের ভাবও বটে। কেমন ঠিক কিনা?

•ভক্ত (সহাস্যে ও কুণ্ঠিত ভাবে)। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তাই হাজ্‌রা বলে, তুমি মনের কথা সব বুঝ্‌তে পার।

"ও খুব এগিয়ে গেলে হয়। প্রহ্লাদের হয়েছিল।

"কিন্তু ও ভাব সাধন কত্তে গেলে কর্ম্ম চাই।

"একজন কুলগাছের কাঁটা টিপে ধরে আছে—হাত দিয়ে রক্ত দর দর কোরে পড়্‌ছে, কিন্তু বলে, আমার কিছু হয় নাই, লাগে নাই! জিজ্ঞাসা কল্লে বলে,—বেশ, বেশ। তাই ভাব সাধন কত্তে হয়।"

ভক্তেরা ঠাকুরের কথামৃত পান করিতে লাগিলেন।

গীতাতত্ত্ব।

—০ঃ*ঃ০—

(১৮ই জানুয়ারি, ১৯০৩ত্র কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে স্বামী সারদানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।)

ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতদের মতে ভারতবর্ষের ধর্ম্মই বল, দর্শনই বল, কেবল বৈরাগ্যের কথাই বল্‌ছে;—সংসারের কোন বিষয়ে মন দিও না, কেবল ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, এই কথাই বল্‌ছে। তাঁরা বলেন, সেই জন্যই হিঁদু জাতটার ভিতর একটা Melancholy বা বিষাদের ছায়া, একটা কর্ম্মে উদাসীনতা বা উদ্যমরাহিত্য, দুদিনের জীবনে এসব আর কেন, এই রকম একটা ভাব এবং তার ফল স্বরূপ আলস্য ও জড়তা এসে পড়েছে। কথাটা কতদূর সত্য, তা গীতা পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়। 'ভগবান্ গীতাকার কেবল যে বার বার বল্‌ছেন, কর্ম্ম ছেড়ো না, তা নয়। কিন্তু নিজ জীবনে প্রতি ক্ষণে দেখাচ্চেন, Intense activity with intense rest,—অপূর্ব্ব কর্ম্ম উদ্যমের মধ্যে অপূর্ব্ব বিরাম। সব কায কচ্চেন, অথচ ভিতরে অনন্ত স্থিরতা। ইহাকেই গীতাকার নির্লিপ্ততা, অনাসক্তি ইত্যাদি নামে নির্দ্দেশ করেছেন। অতএব ইউরোপী পণ্ডিতেরা যে বলেন, হিন্দুশাস্ত্র মানুষকে অকর্ম্মণ্য করেছে, এ কথা সত্য নয়। ওঁরা মনে করেন, ওঁদের ধর্ম্ম ওঁদের জাতটাকে

বড় লড়ায়ে করে তুলেছে এবং সে জন্যই ওঁদের ভিতর সাংসারিক উন্নতি এবং কর্ম্মোদ্যম এত বেশী। সেটাও বাস্তবিক ঠিক কথা নহে। বাইবেলে প্রত্যেক জায়গায় বৈরাগ্যের উপদেশ;—"Think not of the morrow, the birds of air have their nest and the beasts of burden have their lair, But the Son of Man hath not where to lay down his head."—কাল্‌কের জন্যে কিছু ভেবো না, আকাশের পাখীরও বাসা আছে এবং বন্য পশুরও থাক্‌বার গর্ত্ত আছে, কিন্তু শিক্ষাদাতা যে আমি, আমার মাথা গুঁজে থাকিবার একটুও স্থান নাই। ঈশার জীবনী আমাদের দেশের সন্ন্যাসিজীবনের মত—পড়্‌লেই বুঝা যায়। ওঁরা এখন বাইবেলের মানে ঘুরিয়ে আপনাদের দরকার মত মানে করে নিয়েছেন। তা বলে কি সেই মানে নিতে হবে? গীতা বলেন, মানুষের ধর্ম্মানুষ্ঠান তার প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। Anglo-Saxon জাত সকলকে দাবাবে, সকলের সঙ্গে লড়াই কর্‌বে, কেন না ওদের ভেতর রজোগুণ ঠাসা রয়েছে। ওরা ধর্ম্মের মর্ম্মও যে ঐরূপে আপনাদের মত বুঝ্‌বে, এতে আর বিচিত্র কি? নচেৎ সকল ধর্ম্মের মর্ম্মই এক, এবং সকল ধর্ম্ম, ত্যাগই পূর্ণ জ্ঞান ও অমৃতত্ব লাভের এক মাত্র পথ, এ কথা মানুষকে শিক্ষা দিচ্চে।

মহাভারত ও গীতা পাঠে বুঝা যায়, কোন্‌টা কর্ম্ম, কোন্‌টা অকর্ম্ম, কি কি কায করা উচিত এবং কি কি উচিত নয় এবং মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য—জ্ঞান—কর্ম্মের দ্বারা লাভ হয় কি না, এই বিষয় নিয়ে যে কোন কারণেই হোক, সেই সময়ে একটা সন্দেহ উঠেছিল। সেই জন্য গীতাতে বারবার ইহা বুঝাবার চেষ্টা যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম পৃথক্ নয়। কর্ম্ম আশ্রয় কল্লে চিত্ত শুদ্ধ হবে এবং তাহা হলে জ্ঞান আপনিই আস্‌বে। অর্জ্জুন কিন্তু ওকথা সহজে বুঝ্‌তে পাচ্চেন না, কেবল ভুলে যাচ্চেন। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ ফের বল্‌ছেন, সকলের এক পথ নয়। নিজের লাভ লোক্‌-সানের দিকে দৃষ্টি না রেখে কর্ত্তব্য বোধে সংসারের যাবতীয় কাযই কর, অথবা কামকাঞ্চন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন কাটাও, উভয় পথের ফল একই হবে। কারণ, উভয় পথই মানুষকে ত্যাগ শিক্ষা দিচ্চে এবং সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই ধর্ম্ম লাভের একমাত্র পথ।

ভোগ সুখের জন্য অনুষ্ঠিত সাংসারিক কর্ম্মও মানুষকে ধীরে ধীরে ত্যাগ শিক্ষা দেয়। সাংখ্যকার মহামুনি কপিল বলেন, পুরুষকে স্বমহিমা অনুভব করিয়ে দেবার জন্যই প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টি রূপ বিচিত্র উদ্যম। ভোগ সুখের দ্বারা আপনার তৃপ্তি সাধন কত্তে গিয়ে ধাক্কার উপর ধাক্কা খেয়ে মানুষ, জীবনের প্রতিদিন কেমন ধীরে ধীরে অনিত্য সুখের উপর বিরক্ত হয় ও ত্যাগ শিক্ষা করে, তা ভাব্‌লে ওকথা ধ্রুব সত্য বলে বোধ হয়। আবার ছেলেকে ভুলিয়ে ঔষধ খাওয়ানোর মত মানুষের চোখের উপর নাম, রূপ, যশ, প্রভুত্ব বা অন্য কোন একটা অনিত্য পদার্থ-বিশেষকে অতিরঞ্জিত কোরে ধোরে তাইতেই সুখ শান্তি, তল্লাভেই পুরুষার্থ, ইহা বুঝিয়ে কেমন সহজ উপায়ে প্রকৃতি তাকে অন্যান্য অনিত্য পদার্থ সকলের তুচ্ছতা অনুভব করিয়ে দেয়।

মনে কর, একজন ভাব্‌লে, আমি বড় লোক হব। প্রথমে বুঝ্‌লে, বড় লোক মানে টাকা হবে, দশ জন লোক বশে থাকবে ইত্যাদি। অনেক পরিশ্রমে ধনী হল। বুদ্ধি শুদ্ধিও একটু মার্জ্জিত হল। কিন্তু ধনী হবার পর দেখ্‌লে, বিদ্বান্ হওয়া আরও বড়। তখন একটু আগিয়ে গিয়ে বুঝ্‌লে, ঠিক বড় হতে গেলে আরও কিছু ত্যাগ স্বীকার চাই। কেন না, বিদ্যা শেখা দরকার, নচেৎ লোকে বড় লোক বলে মান্‌বে কেন? বিদ্যা শিখ্‌তে গেলে কাজেই পাঁচজনকে লয়ে বৃথা আমোদ প্রমোদ, আপাতমধুর নানাপ্রকার সুখসম্ভোগ ইত্যাদি হতে আপনাকে পৃথক্ রাখ্‌তে হলো। এইরূপ বড়লোক কথাটার মানে যত বুঝ্‌তে লাগ্‌লো, তত ধীরে ধীরে তার ধারণা হতে লাগ্‌লো যে, ত্যাগ-স্বীকার না কল্লে উচ্চ হওয়া যায় না। মানুষ এইরূপ সকল বিষয়ে বোঝে যে, ত্যাগ স্বীকার না কল্লে কিছুই লাভ হয় না। শাস্ত্র বল্‌ছেন, ছোটখাট বিষয়গুলিতে এইরূপে অল্প অল্প ত্যাগ কত্তে শিখে অবশেষে মানুষ পূর্ণ ত্যাগ কোরে অমৃতত্ব পর্য্যন্ত লাভ করে।

কর্ম্মের দ্বারা মানুষ যতই অগ্রসর হয়, ততই উচ্চতর মহত্বের আদর্শ তার মন বুঝ্‌তে ও ধত্তে পারে। উহা লাভ কত্তে অন্যান্য সামান্য বিষয় ত্যাগ করা আবশ্যক দেখে সে, সে গুলি ত্যাগ করে ফেলে। বিবেকানন্দ স্বামীজির একটী উপমা এখানে বেশ খাটে,—আমরা সূর্য্যকে এখান থেকে দেখ্‌ছি, একটী থালার মত। হাজার মাইল এগিয়ে যাও, সেই সূর্য্যই

দ্ভূত বড় দেখাবে। আরও হাজার মাইল যাও, আরো বড় দেখাবে। কিন্তু তোমার বোধ থাক্‌বে, এ সূর্য্য সেই। তেমনি আদর্শ এগিয়ে এগিয়ে ভগবানে পৌঁছিবে অথচ আমাদের বোধ হবে, আমরা একটা আদর্শই চিরকাল ধরে আছি। পরমহংসদেব বলতেন, মানুষ যদি একটা বিষয় ঠিক ঠিক ধরে, তা হলে তাতেই শেষে ভগবানের পূর্ণ বিকাশ দেখ্‌তে পারে।

গীতায় বল্‌ছেন, যোগ ও ভোগ, কর্ম্ম ও সন্ন্যাস, মানুষের নিজের অবস্থা ভেদে সত্য ও অসত্য, লাভের বিষয় বা ত্যাগের বিষয়, এই ভাবে অনুভূত হয়। অর্থাৎ কাহারো মনে যোগই ঠিক আবার কারো মনে ভোগই ঠিক বলে ধারণা হয়। দেখা যায়, কর্ম্ম সকলের সমান নয়। সাধারণ মানবের কর্ম্ম আপনার সুখ বিলাস এবং স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনে আবদ্ধ। তা হতে যে একটু উঁচু হয়েছে, সে নিজের দেশের জন্য ভাবে। কিসে দেশের লোক খেতে পাবে, কেমন করে তাদের লেখা পড়া শেখবার সুবিধা হবে, কেমন করে তারা পৃথিবীর অপর জাতের সঙ্গে সমান হয়ে চল্‌তে পারবে, এই সব চিন্তায় ব্যাকুল হয়; তার চেয়ে যারা বড় হয়েছে, তারা ভাবে, কেমন করে দেশের লোক সত্য পথে থাক্‌বে, সংযমী হবে, অপরের উপর বিনা কারণে অন্যায় অত্যাচার না করে দয়ার চক্ষে দেখ্‌বে ইত্যাদি। (কেন না, তারা দেখ্‌তে পায়, ঐ সব দোষ এলে পরেই জাতটার পতন হবে।) আবার তার চেয়ে যে বড়, তার কর্ম্ম জগদ্ব্যাপী। সকল কালের সকল দেশের সকল অবস্থাপন্ন মানবের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাঁরা সেই ধ্যানে মগ্ন। যেমন অবতারেরা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন, সাংখ্য ও যোগ তফাত নয়, মূর্খেরাই আলাদা মনে করে। হে অর্জ্জুন, যখন তুমি এখনও এত উচ্চ অধিকারী হও নি যে, একেবারে কর্ম্ম ছেড়ে দিতে পার, তখন কর্ম্মের মধ্য দিয়া তোমার উদ্দেশ্য লাভ কর্‌তে হবে, নিজের লাভ লোকসানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ত্তে কর্ত্তে যার চিত্ত একেবারে স্বার্থগন্ধহীন হয়ে গেছে, তারই ধ্যানাদি দ্বারা সমাধি লাভ করা ছাড়া সাধারণ মানবের ন্যায় কায করায় কিছু লাভ নাই। সেই তখন নিজের মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে ক্রমবিকাশের স্রোতে সাধারণ মানব-প্রকৃতির সীমা উল্লঙ্ঘন করেছে। অতএব তার পক্ষে তখন অন্যরূপ ব্যবস্থা, এই বুঝে কায করে যাও।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এইরূপে কর্ম্মের চরম পরিণাম অকর্ম্ম বা কর্ম্মরহিতাবস্থা, শাস্ত্রের এই কথা না বুঝায় এক বিষময় ফল হয়েছিল। যত ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও অজ্ঞ লোকেরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে একেবারে বড় লোক হতে বসেছিল। অমুক কর্ম্মী, এ কথা বোল্‌লে লোকে নাক সেঁট্‌কাত বা তাকে দয়ার চক্ষে দেখে বোল্‌তো, 'এখনও বুঝ্‌তে পারে নি, ধীরে ধীরে বুঝ্‌তে পার্ব্বে, কর্ম্ম না ছাড়্‌লে কিছু হবে না' ইত্যাদি।

মানুষের এই রকম ভুল সকল দেশেই সকল সময়েই হয়ে থাকে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চেয়ে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি বড় বলেছেন অথচ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই জ্ঞানশূন্যা বা অহেতুকী ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়, এ কথাও বলেছেন। সে কথাটী ভুলে যাওয়ায় আজকালকার বৈষ্ণব বাবাজীদের দুর্দ্দশা দেখ। সকলেই একেবারে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি লাভ কর্ব্বে! জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যে করে, সে যেন তাদের চোখে বড় কুকাজ কচ্চে। সকলেই একেবারে বড় লোক হবে! বড় লোক হতে গেলে যে কত 'কাট খড় পোড়াতে' হয়, কত স্বার্থত্যাগ ও উদ্যম কত্তে হয়, তা কেউ কর্ব্বে না। একটা গল্প মনে পড়ে,—একজন লোক এক সন্ন্যাসীর মঠে গিয়ে এক সাধুকে বোল্‌লে,"মহারাজ, আমায় চেলা বানিয়ে নিন।" মঠের লোকেরা জিজ্ঞাসা কল্লে, "তুমি পার্ব্বে? চেলা হওয়া বড় শক্ত। মঠের ঠাকুরজীর ভোগ রাঁধ্‌তে হবে, হাণ্ডা মল্‌তে (মাজ্‌তে) হবে, জল তুল্‌তে হবে, সাধুদের ফাই ফরমাজ খাট্‌তে হবে, গুরু যা বলে দেবেন, সে পড়া মুখস্থ কর্ত্তে হবে, তাঁর সব কথা শুন্‌তে হবে ও সন্ধ্যার পর তাঁর পদসেবা কত্তে হবে।" সে দেখ্‌লে বিষম মুস্কিল! ভেবে চিন্তে জিজ্ঞাসা কল্লে, "আচ্ছা, গুরু যিনি হবেন, তাঁকে কি কর্ত্তে হবে?" তারা বোল্‌লে, "গুরু?—জপধ্যান পূজাদি করবেন, চেলাদের শিক্ষা দেবেন ও তাদের দিয়ে কায করিয়ে নেবেন।" তখন সে বল্লে, "তবে মহারাজ, আমাকে একেবারে গুরুই বানিয়ে নিন।" আমাদের দেশে এখন এ ভাবটা বড় অধিক। ভক্তশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসের কথাটী শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই আমাদের শুনাতেন যে, গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক। এ ভাবটা যে গৃহস্থের ভিতর বেশী, আর সন্ন্যাসীর ভিতর কম, তাও নয়। লোকে মনে করে, সন্ন্যাসী হয়ে গেরুয়া কাপড় পর্‌লেই আর কর্ম্ম থাকে না,

একেবারে জ্ঞানী হয়ে যায়। তা নয়। গীতাকার বলেন, 'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥' সর্ব্বদা কর্ম্ম করলে আত্মাকে সাক্ষাৎ দেখার দরুন যাঁর সর্ব্বদা সকল অবস্থায় এই জ্ঞান ঠিক ঠিক থাকে যে, আমি কিছুই করি না, আমি আত্মা, আর আত্মাকে না দেখে জ্ঞানীর ভান করে অলস হয়ে বসে থাক্‌লে যিনি দেখেন যে, বিষয়চিন্তারূপ যত কর্ম্ম সব করা হচ্ছে, মানুষের ভিতর তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কর্ম্ম যেমন করে করা উচিত, ঠিক সেই রকম করে কর্ত্তে পারেন। তাঁর ভিতরেই গীতাকারের ন্যায় অনবচ্ছিন্ন কর্ম্ম-উদ্যমের ভিতর যোগীর অবিরাম শান্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যিনি ঠিক ঠিক জ্ঞানী বা ঠিক ঠিক ভক্ত হয়েছেন, তাঁর ঐরূপ হয়। তিনিই কর্ম্ম কর্ব্বার সময়েও আপনাকে তা থেকে আলাদা দেখ্‌তে পান। তিনি যেন পাকা নারকেল, ভিতরে খোলা থেকে শাঁস আলাদা হয়ে গেছে, নাড়, খট্ খট্ কোরে আওয়াজ হবে আর আমরা যেন ডাব,—খোলাতে শাঁসেতে একসঙ্গে জড়িয়ে রইছি। খোলায় আঘাত লাগ্‌লে শাঁসেও গিয়ে লাগে। কর্ম্মযোগ কর্ত্তে কর্ত্তে মানুষ পেকে যায়। পাকা নারকেলের মত তার ভিতরে খোলা ও শাঁস ছেড়ে যায়। মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইন্দ্রিয় ও শরীর প্রভৃতি হতে তার আত্মা আলাদা হয়ে গিয়ে আপনাতে আপনি থাক্‌তে পারে। ঐ সব বাইরের জিনিষগুলো ছেড়ে দিয়ে তার আত্মা আলাদা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জেগে থাক্‌বার সময় ত কথাই নাই, ঘুমাবার সময়ও সে আপনার শরীরটাকে দেখে যেন আর একটা কার শরীর, যেন অপর একজন কেউ ঘুমাচ্চে। সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীরামপ্রসাদ যেমন গেয়ে গেছেন, ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি, এখন যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি। তার অবস্থাও তখন ঠিক ঐরূপ হয়। আর ঐ গানের মানেও সেই ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পারে। মানুষ যত নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করে, ততই ধীরে ধীরে তার শরীরেন্দ্রিয়াদি থেকে আমি বুদ্ধি হঠে গিয়ে আত্মায় গিয়ে দাঁড়ায় ও ঐরূপ অবস্থা লাভ হয়।

আর এক কথা এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বত্র একটা বিষয় বোঝাবার বিশেষ চেষ্টা দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, মুক্তি-

জিনিষটা কর্ম্মের দ্বারা লাভ কর্‌বার নয়। উহা 'কর্ম্মসাধ্য' নয়। গীতাকারেরও এ কথাটা ঐ ভাবে বোঝাবার চেষ্টা দেখা যায়। এর মানে কি? এ কথাটার ঠিক ঠিক মানে বুঝা দরকার। না বুঝ্‌লে বিশেষ ক্ষতি। কেননা তা হলে কর্ম্মটাকে ছোট জিনিষ মনে হবে। মনে হবে, মুক্তির সঙ্গে ওটার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই, অতএব কর্ম্ম কর্ত্তে প্রবৃত্তি থাক্‌বে না, কর্ম্মে নিষ্ঠা আল্‌গা হয়ে যাবে। তবে এ সব বিচার শাস্ত্রে কিসের জন্য? এইটা বুঝাবার জন্য যে, কর্ম্মের দ্বারা আত্মার স্বরূপ বা স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না, আত্মা ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত, উৎপত্তিবিনাশশূন্য, নিত্যানন্দস্বভাব। কর্ম্ম—শরীর মন ইন্দ্রিয়াদিকে বদ্‌লে দেয়। যে সব যন্ত্রের ভিতর দিয়ে আমরা আত্মা ও জগৎ দেখ্‌ছি, কর্ম্ম সেই গুলোকে ঘসে মেজে পরিষ্কার কোরে দেয়। ফলস্বরূপ মন বুদ্ধির ভিতর দিয়ে এতদিন যে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছিলাম, কুয়াসার ভিতর দিয়ে দেখার মত এতদিন যে ছোট জিনিষটাকে বড় দেখাচ্ছিল বা জিনিষটার অস্তিত্বই বোধ হচ্ছিল না, সেই সব ভুলগুলো ঘুচে গিয়ে যে জিনিষটা যেমন, সে জিনিষটাকে ঠিক তেমনি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অতএব তাঁদের মতে কর্ম্মের ফল হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি। আত্মাটা যে ছোট ছিল, কর্ম্মের দ্বারা ধীরে ধীরে বাড়্‌তে লাগ্‌লো এবং অবশেষে এত বেড়ে উঠ্‌লো যে, তার সব বাঁধন গুলো পটপট করে ছিঁড়ে গেল, তা নয়; কেন না, এক রকম কর্ম্মের দ্বারা আত্মাটা যদি বাড়্‌তে পারে, তা হলে আর এক রকম কর্ম্মের দ্বারা সেটা ছোট হতে হতে, অবশেষে বিল্‌কুল নাও থাক্‌তে পারে—এইটা এসে পড়ে। এই জন্য তাঁরা বলেন যে, আত্মার মুক্তি যদি কর্ম্মসাধ্য হয়, তবে তার অন্তও আছে। কারণ, কর্ম্ম দ্বারা যে জিনিষের উৎপত্তি হয়, তার আদি, বৃদ্ধি ও বিনাশ আছে। অতএব তাঁরা বলেন, মুক্তিটা আত্মাতে সর্ব্বদা রয়েছে, ওটা হচ্ছে তার যথার্থ স্বভাব; সেইটে ভুলে গিয়েই তার আপনাকে দেহ মন ইত্যাদি বোলে মনে হচ্ছে, আর তার ফলেই আপনাকে সুখী দুঃখী বলে মনে কর্‌ছে।

যদি জিজ্ঞাসা কর, এ রকম ভুল তার কেন হল? তাতে তাঁরা বলেন, সেটা বোঝ্‌বার বা বোঝাবার কথা নয় হে বাপু। সে ভুলটা আগে হলে তবে বোঝা বোঝান আসে। তোমার মন বুদ্ধির দৌড়টা ঐ ভুলের গণ্ডীর ভিতর। সে জন্য সে ভুলটার কারণ মন বুদ্ধি কেমন

করে জান্‌বে হে? তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, কেমন করে সে ভুলটা হ'ল, তা হলে তাঁরা বলেন, 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।' অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানটা ঢাকা পড়েছে, সেই জন্য এই কষ্ট। আবার যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে উপায়? তা হলে তাঁরা বলেন, হাঁ, সেটার একটা উপায় ঠাউরিছি। সুখ দুঃখ, লাভ লোকসানের দিকে নজর না দিয়ে সং কাজ গুলো করে যাও দেখি। তা হলেই এই অজ্ঞানের জড় অহঙ্কারটা নষ্ট হয়ে যাবে; আর 'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।' এইরূপে কায কর্ত্তে কর্ত্তে পূর্ণ ভাবে নিষ্কাম হলেই সে জ্ঞান আপনা আপনি এসে পড়্‌বে। তা হলেই ভ্রমটা ঘুচে যাবে। তখন শরীর মন যে আর কায কর্ব্বে না, তা নয়, ঈশ্বরেচ্ছায় আরো ভাল করে কায কর্ব্বে। তখন বুঝ্‌বে, কখন বা কর্ম্ম করা দরকার আবার কখন বা চুপ করে থাকা দরকার। আরো বুঝ্‌বে, কর্ম্মই বা কি আর কর্ম্ম থেকে বিরত হয়ে ঠিক ঠিক চুপ করে থাকাটাই বা কাকে বলে। তখনি মানুষের কায করা বা না করা এ দুটো ক্ষমতাই আসবে। সাধারণ মানুষের তা নাই। সে কেবল কায কর্ত্তেই জানে। এক দণ্ডও কায না করে চুপ করে থাক্‌তে জানে না। কায যেন ভূতের মত তার ঘাড়ে চেপে রয়েছে আর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। এইরূপে কর্ম্মের অধীন হয়ে সে এমন জড়িয়ে পড়ে যে, বিশ্রাম বা মুক্তির ভাবটা তার নজর থেকে একেবারে উড়ে যায়। মববারও আর অবসর পায় না। ইহাই বিপদ্‌। যদি বল কেন? কোন কায না করে কি আমরা স্থির হয়ে কখন কখন বসে থাকি না? বা রাত্রিকালে ঘুমাই না? তখন আর কি কায করে ঘুরে বেড়াই? গীতাকার বলেন, হাঁ, ঘুরে বেড়াও না সত্য, কিন্তু তা বলে কি কায করা একেবারে বন্ধ দাও? চিন্তা, ভাবনা বা স্বপ্ন এ গুলোও যে কর্ম্ম। তার পর নিঃশ্বাস ফেলা, হৃদয়স্পন্দন, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি কাযগুলো তো হতেই থাকে। তবে আর একেবারে কায থেকে বিরত হলে কি করে? ওকথা কোন্ কাযের কথা নয় হে বাপু। তুমি কর্ম্মের দাস। একেবারে পরাধীন। ভুলে মনে কচ্চ, আমি স্বাধীন, আমি কায কর্‌লেও কর্ত্তে পারি, না কর্‌লেও কর্ত্তে পারি; বিরাম কাকে বলে, তার কিছুই বোঝ না এবং একটু আধটু বুঝ্‌লেও তোমার তা করবার শক্তি নাই। যদি বিরাম কথাটার যথার্থ মানে বুঝ্‌তে চাও, তা

হবে নিজের লাভ লোকসানটা আজ থেকে আর না খুঁজে কর্ত্তে হয় তাই কন্ধি বলে সব কায গুলো করে যাও। তা হলেই কালে বুঝ্‌তে পার্ব্বে, এই রকমে কায করার নামই হচ্চে কর্ম্মযোগ। যে কাযগুলো কত্তে কত্তে লোকের নানাপ্রকার বন্ধন আস্‌ছে, সেই গুলোকে এমন ভাবে করা যে, যা কিছু শুন্‌ছো, যা কিছু বোল্‌ছো, যা কিছু কোর্‌ছো, সেই সমুদয় কায গুলো তোমায় আর জড়িয়ে না ফেলে কর্ম্মের দাসত্ব থেকে মুক্ত কোরে দেবে।

কর্ম্মযোগ ব্যাপারটা কি? না, কর্ম্ম কর্‌বার এইরূপ কৌশল;—'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং'—এমন কৌশলে কর্ম্ম করা যে, কায করে আর জড়িয়ে পড়্‌তে না হয়; যাতে আমাদের ইচ্ছামত স্বাধীন ভাবে কায কত্তে পারি। কি কর্‌লে তেমন করে কায করা যায়? নিজের লাভের দিকে দৃষ্টি না রাখ্‌লে। যেখানেই স্বার্থ, সেখানেই ফলের আশা আর সেখানেই আসক্তি এসে পড়ে। তুমি কায কর কিন্তু দেখো, কায যেন না তোমায় পেয়ে বসে। নতুবা কায ত কত্তেই হবে। পিতা-মাতার সেবা কত্তে হবে, যদি বিবাহিত হও ত স্ত্রীপুত্রদের পালন কত্তে হবে। যে সমাজে আছ, তার প্রতি কর্ত্তব্য আছে; যে দেশে জন্মেছ, তার প্রতি কর্ত্তব্য আছে; সমগ্র মনুষ্য জাতির প্রতি কর্ত্তব্য আছে। শাস্ত্র বলেন, দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়।

কায কত্তেই হবে। তবে পরমহংসদেব যেমন বল্‌তেন, সেই ভাবে কাযগুলো কর। মনে কর, যেন তুমি বড় লোকের বাড়ীর চাকরাণী। সে কায কর্ম্ম কচ্চে, ছেলেদের খাওয়াচ্চে দাওয়াচ্চে, তাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হচ্চে কিন্তু মনে মনে জানে, আমি এদের কেউ নই। মনিব যে দিন ইচ্ছা কর্ব্বে, সেই দিনই তাড়িয়ে দেবে। তুমিও সংসারে এই ভাবে থেকো।

অর্জ্জুন যতদিন রাজত্ব ভোগ লড়াই দাঙ্গা প্রভৃতি তাঁর জীবনের সব কায গুলো এই ভাবে করে আস্‌ছিলেন, ততদিন তাঁর বুদ্ধি পরিষ্কার ছিল। ভালবাসার মোহে পড়ে ততদিন তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যায় নি। ক্ষত্রিয় জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য—সত্যনিষ্ঠা, অন্যায় অত্যাচারের দণ্ড-বিধান করে ন্যায় বিচার স্থাপন, ধর্ম্মের উচ্চভাব আপনার হৃদয়ে পোষণ করে অপরকে তাহাতে প্রবৃত্ত করান, শরণাগতকে শরণদান,

দুর্ব্বল শত্রুর প্রতি ক্ষমা ও দয়াভাব, আপনার আত্মীয় কুটুম্ব বা ভালবাসার পাত্রও অন্যায় অধর্ম্ম করলে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া ইত্যাদি—এতদিন বজায় রেখে কাষ করে যাচ্ছিলেন। মনে করেছিলেন, এ ত খুব সোজা। এই ভাবেই চিরদিন কাষ করে যাবেন। কিন্তু মায়ার বিষম প্রতাপ! হঠাৎ একদিন কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাভিনযের আড়ম্বর উদ্যোগ, জীবনের পরিবর্ত্তনসঙ্কুল পরীক্ষার দিন সামনে উপস্থিত। দেখ্‌লেন, ঘটনাস্রোতে আপনি একদিকে এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে, ছাড়্‌বার পথ নাই! ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায, বিচার সব তাঁর দিকে। অমিতপ্রজ্ঞ ধর্ম্মবন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিকে। নাই কেবল তারা, যাদের জীবনের কিশোর কাল হতে শ্রদ্ধাভক্তি করে এসেছেন, ভালবেসেছেন, হৃদয়ের কোমল ভাবগুলো দিয়ে এসেছেন। নাই কেবল তারা, যাদের হাত থেকে এমন অত্যাচার অবিচার অধর্ম্ম নৃশংসতা পাবাব প্রত্যাশা মানুষ স্বপ্নেও করে না। আবার তাবা যে কেবল তাঁর দিকে নাই, তাও নয, তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। এত সাধের ক্ষত্রিয-ধর্ম্ম, জীবনের উচ্চ আদর্শ যদি রক্ষা কর্ত্তে হয—ত তাদের হত্যা কবা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। দেখ্‌লেন,—তাদের হৃদযেব উষ্ণ শোণিতধারায তর্পণ ভিন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠা দেবী প্রসন্না হচ্চেন না। অর্জ্জুনের বীর হৃদয় সে ছবি স্থির হয়ে দেখ্‌তে পাল্লে না। ভিতরে সহস্র সহস্র বিপরীত ভাবের প্রবল তরঙ্গ সমূহ এককালে ছুটাছুটি কবে আবর্ত্তসঙ্কুল করে ফেল্‌লে। ভালবাসার মোহ এল। মোহ, ধর্ম্মভাবেব উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ ডুবিযে ফেল্‌লে। কাযেই বুদ্ধি আব দিঙ্‌নির্ণয়ে সমর্থ না হয়ে আবর্ত্তের ভিতর নৌকা চালিয়ে অসহায় হয়ে পড়্‌লো। তখন স্বার্থ এলো। মান অপমানের চিন্তা, জয় পরাজয়ের ভয ও ভাবনা সব একে একে এসে বোল্‌লে, "পালাও পালাও, এ ত ধর্ম্ম নয়, এ যে অধর্ম্ম কর্ত্তে বসেছ। কাদের সঙ্গে লড়াই কত্তে কোমর বেঁধেছ? এদের সঙ্গে পার্ব্বেই বা কেমন করে? ঐ দেখ ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম, ঐ দেখ গুরু দ্রোণ, ঐ দেখ বিচিত্রকবচকুণ্ডলধারী, একঘাতী-অস্ত্রসহায় কর্ণ, ঐ দেখ অমর কৃপ ও অশ্বত্থামা, ঐ দেখ পিতৃবরদর্পী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ—এদের সঙ্গে পার্ব্বে? একটুকু জমির জন্যে এত বড় বিশ্বব্যাপী মানটা কি খোয়াবে? পালাও পালাও, ভিক্ষা করে খাও, সেও ভাল আর যদি জেতও ত এদের মেরে সে রাজ্যভোগ কি

সুখের হবে?" অর্জুন যে ধর্ম্মের জন্য, সত্য বিচারের জন্য লড়াই কর্ত্তে দাঁড়িয়েছেন, সে কথা ভুলে গেলেন। সব কালেই জীবনের এইরূপ স্থলে মানুষের এমনি হয়। উদ্দেশ্য ভুলে স্বার্থে জড়িয়ে পড়ে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এটা বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

রূপ রসাদি ভাবতে ভাবতে কোন জিনিষটা প্রথমে মানুষের মনে ভাল লাগে ও মন সেই দিকে ঢলে পড়ে, biassed হয়। অমনি কামের উদয় অর্থাৎ ঐটে আমার হোক, এইরূপ ইচ্ছা হয়ে সেইটে পর্ত্তে এগিয়ে যায়। উহাতে বাধা পেলেই বিরক্তি আসে। বিরক্তির পরিণাম ক্রোধ। তার বশীভূত হয়ে সে সেই বাধাটা দূর কর্ত্তে চেষ্টা করে। তার পরিণামে মোহ আসে। মোহ আসলে সত্যপথে চলবো, ধর্ম্মপথে থাকবো ইত্যাদি উচ্চ উদ্দেশ্য গুলি ভুলে যায়। ইহারই নাম স্মৃতির লোপ হওয়া। তখন ন্যায়ে হোক অন্যায়ে হোক সে জিনিষটা মানুষ লাভ কত্তে ছোটে। গুরু উপদেশ প্রভৃতি এতদিন যা তাকে মন্দ কায, পাপ কায থেকে নিরত রেখেছিল, সে সব ভুলে যায়। ফলে বুদ্ধি গুলিয়ে যায় ও পাপ কায করে অশেষ প্রকারে কষ্ট পায়।

মনে কর, কেউ অর্থ উপার্জ্জন কর্ত্তে চায়, দেশের উপকার কর্ব্বে বোলে। প্রথম প্রথম ঐ ভাব বেশ প্রবল থাকে। কিন্তু টাকা হাতে আসলে টাকার প্রতি মায়া হয় এবং ক্রমে অর্থলালসায় উদ্দেশ্য ভুলে নিজের সুখবিলাস অথবা কাঞ্চনকেই জীবনের লক্ষ্য করে ফেলে। সেই জন্য উদ্দেশ্য ঠিক রাখতে হয়, ফলের দিকে দৃষ্টি রাখলে চলবে না; এই হচ্চে কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগী কে হতে পারে? যে আপনাকে বশ কত্তে পেরেছে, আপনার ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ করেছে; জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য যার অবিচলিত আছে, কায যাকে না চালিয়ে যে কাযকে চালায়, সেই কর্ম্মযোগী হতে পারে। উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে সে বুঝতে পারে, আমার কায ফুরিয়েছে এবং কায থেকে অবসর নেয়।

গীতায় তাই শিক্ষা দিচ্চেন, কায কর। কায না করার চেয়ে কায

করা ভাল। কিন্তু কায করে গিয়ে ফলকামনা কোর্ব্বো না। ফল-কামনা আসলেই বাধা পড়তে হবে। দেখতে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে যারা কোন বড় কায কোরেছে, তারা সকলেই সংযমী পুরুষ, আপনার উদ্দেশ্য ঠিক রাখে। ছাত্রজীবনে কে বড় হয়? যে পাঁচটা আমোদে না যেতে উদ্দেশ্য ঠিক রাখে। সংসারে কে বড় হয়? ধর্ম্মে কে বড় হয়? যে উদ্দেশ্য ঠিক রাখতে পারে। উদ্দেশ্যহারা হলেই পড়তে হবে ও তোমার দ্বারা কাযের মত কায আর একটাও হবে না। কেননা, তোমার বুদ্ধি গুলিয়ে যাবে। কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা নয়, তা আর ধর্ত্তে পার্ব্বে না। ফলে কতকগুলো বাজে কাযে ছুটাছুটি করে মরাই সার হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, মন থেকে একেবারে ফলকামনা যদি যায়, তা হলে কায কোর্ব্বো কেমন করে? কোন উদ্দেশ্য-বিশেষ কামনা করা ভিন্ন কায কি করা যায়? ঠিক কথা; উদ্দেশ্য ছাড়া কায হতে পারেনা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের দিকে যাবার সময় নিজের লাভালাভ খতাব কেন? আমরা কেবল নিজের লাভ লোক্‌সান খতাতে চাই। ওইটে আগে খতিয়ে তবে কাযে লাগি। লেখা পড়া শিখি রোজগার কর্ত্তে পার্ব্বো এবং নাম হবে বলে, জ্ঞানের জন্য নয়। স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে ভালবাসি নিজে সুখী হই বলে, তাদের জন্য নয়। এইরূপে তলিয়ে দেখলে আমাদের সকল কাযেরই উদ্দেশ্য দেখতে পাই স্বার্থসেবা—আপনার অহঙ্কারের যোড়শোপচারে পূজা ভিন্ন আর কিছু নয়। আমাদের মুখে একখানা থাকে আর মনে একখানা থাকে। এই ভাবের ঘরে চুরীটা প্রথমে না ঘুচলে কোন যথার্থ কাযই আমাদের দিয়ে হবে না। কোন সত্যের পথই আমাদের চোকের সাম্‌নে পড়বে না। সেই জন্যই গীতাকার অর্জ্জুনকে সাম্‌নে রেখে আমাদের সকলকে বলছেন, ফলকামনাই সর্ব্ব-নাশের মূল। ফলকামনাই তোমায় অজ্ঞানে জড়িয়ে রেখেছে, কর্ত্তব্য কত্তে দিচ্চে না। চোখে ঠুলি বেঁধে সাম্‌নে সত্য থাকলেও দেখতে দিচ্চে না। ফলকামনা ছাড়, ছাড়। ফলটার দিকে দৃষ্টি না রাখলেই অজ্ঞান অধর্ম্মের মূল স্বার্থপরতার হাত থেকে এড়াবে। তখন ঠিক ঠিক সুখ কাকে বলে, তা বুঝবে, ঠিক ঠিক ভালবাসা কাকে বলে, তা দেখবে। ফলটার দিকে দৃষ্টি না রাখলেই তুমি যোগী হবে, জ্ঞানী হবে, ভক্ত হবে। তোমার সব দুঃখ দূরে যাবে।

শাস্ত্র পড় বা বক্তৃতাই শোন, শাস্ত্রের কথাগুলি যদি জীবনে পরিণত করে কায না কত্তে পার, শাস্ত্র যদি জীবনে না খাটে, জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় সহায় না হয়, তবে সে পড়াশুনা সব মিথ্যা। তার কোন প্রয়োজন নাই। ছাত্রজীবনেই বল, সংসারে ভোগের ভিতরেই বল আর সন্ন্যাসের ত্যাগের মধ্যেই বল, এটা কত্তে শেখা আগে চাই। তা হলেই মানুষ যেখানে যেমন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, শাস্ত্রজ্ঞান জীবনের উচ্চ লক্ষ্য তার সামনে ধরে তাকে সেখান হতেই তুলে দেবে।

স্বামীজি বল্‌তেন, আমাদের দেশে এখন আর শাস্ত্র কেউ বোঝে না, কেবল ব্রহ্ম, মায়া, প্রকৃতি প্রভৃতি কতকগুলা কথা শিখে মাথা গুলিয়ে মরে। শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যটা ছেড়ে দিয়ে কেবল কথাগুলো নিয়ে মারামারি করে। শাস্ত্র যদি মানুষকে সকল সময়ে সকল অবস্থায় সাহায্য কত্তে না পারে, তা হলে সে শাস্ত্রের বড় একটা আবশ্যক নাই। শাস্ত্র যদি সন্ন্যাসীকে পথ দেখান আর গৃহীকে পথ দেখাতে না পারেন, তা হলে সে একদেশী শাস্ত্রে গৃহস্থের কি দরকার? অথবা শাস্ত্র যদি মানুষ অন্য কায কর্ম্ম সব ছেড়ে বনে গেলে তবে তাকে সাহায্য কত্তে পারেন, কিন্তু সংসারের কোলাহলের ভিতর, দিনরাত খাটুনির ভিতর, রোগ শোক দৈন্যের ভিতর, অনুতপ্তের নিরাশার ভিতর, অত্যাচারিতের ধিক্কারের ভিতর, রণক্ষেত্রের করালতার ভিতর, কামের ভিতর, ক্রোধের ভিতর, আনন্দের ভিতর, জয়ের উল্লাসের ভিতর, পরাজয়ের অন্ধকারের ভিতর, এবং পরিশেষে মৃত্যুর কাল রাত্রির ভিতর মানুষের হৃদয়ে আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে পথ দেখাতে না পারেন, তবে দুর্ব্বল মানুষের সে শাস্ত্রে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

মনে কর, ছাত্রজীবনে জ্ঞান লাভের জন্য বা অন্য কোন সৎ উদ্দেশ্যে আমায় বিলাত যেতে হবে। শাস্ত্র যদি না আমায় সে সময় সে বিষয়ে সাহায্য কত্তে পারে, তবে আমার দশা কি হবে? কিন্তু তলিয়ে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, আমাদের শাস্ত্রের কোন দোষ নাই, দোষ আমাদের। আমরা শাস্ত্রোপদেশ কিরূপে জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় লাগাতে হয় ও লাগাতে পারা যায়, তা একেবারে ভুলে গেছি। ভুলে গিয়ে মনে করছি, খাঁটি ধর্ম্ম কর্ম্ম কত্তে হলে বনে যেতে হবে। গীতাকারের অন্য মত। তিনি একদিকে অর্জ্জুনকে বল্‌ছেন, ন্যায় বিচারের জন্য লড়াই না কল্লে তোমার ধর্ম্ম লাভ কিছুতেই হবে না, আবার উত্তরাধি অন্য-

প্রকৃতির লোককে বল্‌ছেন, তোমাকে সব ছেড়ে ছুড়ে পাহাড়ে বদরিকা-শ্রমে গিয়ে অনন্যমনে ধ্যান জপাদি কত্তে হবে। তা না হলে তোমার ধর্ম্মলাভ হবে না। অতএব শাস্ত্রের কথাই হচ্চে এই, তুমি যেখানেই থাক, কর্ম্মফল ছেড়ে ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম্ম কল্লে সেখান থেকেই তোমার মুক্তি হবে।

পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে মানুষ যে কাজ কত্তে পারে, আমাদের চোখের সামনে পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দ স্বামী তাহা নিজ নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন। তাঁরা আমাদের মত শাস্ত্রের ছোবড়া নিয়ে টানাটানি করেন নি। আমাদের জীবনের সহিত শাস্ত্রোপদেশের ঐক্য চাই। তা হলেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝ্‌তে পারা যায়, তা দেখিয়ে গেছেন। কেমন করে শাস্ত্রজ্ঞান জীবনে প্রতিফলিত কত্তে হয়, তাই শিখিয়ে গেছেন। আমাদের সেটী যত্ন করে শিখা চাই। তোমাদের সমিতিরও তাই উদ্দেশ্য, সেটা যেন কখন ভুলো না। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে ধর্ম্ম নানা-ভাবে প্রকাশিত হবে, এইটী নিজে নিজে ভাল করে বুঝে জগতের সামনে জীবনে সেইটি দেখাতে হবে, এ কথাটা ভুলো না। শাস্ত্রের উপদেশগুলি একালেও যে জীবনে পরিণত করা যায়, আর কত্তে পারলে মানুষ যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, বিশেষ সাহায্য পায়, জীবন-সংগ্রামে বিশেষ জোর পায়, তা দেখাতে হবে, ভুলো না। শাস্ত্রের যদি দোষ থাকৃতো বা উহা যদি একালের অনুপযোগী সেকেলে একঘেয়ে উপদেশে পূর্ণ থাক্‌তো, তা হলে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ধর্ম্মবীর বিবেকানন্দের জীবন গঠনে কখন সহায় হতে পাত্তো না, এটা বেশ করে বুঝো। শাস্ত্রের দোষ দিও না। দোষো আপনার চোককে, যে, শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ, ঠিক ঠিক উদ্দেশ্য তার দেখ্‌বার শক্তি নাই। দোষো আপনার শিক্ষাকে, যাতে চোক, কাণ, নাক, মুখের ব্যবহার কেমন করে কত্তে হয়, তাও লোককে শিখ্‌তে দেয় না।

আমাদের ভিতর কটা লোক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কর্ত্তে জানে? ইন্দ্রিয়কে সূক্ষ্ম জিনিষ ক্রমে ক্রমে ধর্ত্তে শেখালে তবে ত তারা ধর্ত্তে পারবে। আজকাল আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্চে, কেমন করে আমরা ভাল কেরাণীটী হতে পারবো। নূতন নূতন ভাবে চিন্তা কর্ত্তে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় ধারণা কর্ত্তে, মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয় চালনা কর্ত্তে শিখান দূরে থাক্,

চিন্তা করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে হাত পাগুলা পেটের ভিতর ঢুকিয়ে ছেলেগুলোকে একেবারে জড় করে তুলছে। ইন্দ্রিয়গুলো সবল, কর্ম্মঠ হলে তবে ত সকল বিষয় উপলব্ধি কর্ত্তে পার্ব্বে এবং তবেই ত জ্ঞান হবে। আমরা চাই,—অশিক্ষিত ভাঙ্গাচোরা শরীরেন্দ্রিয় দিয়ে যোগীর বহুকালের শিক্ষিত সতেজ অথচ বশীভূত ইন্দ্রিয় মনের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সব একদিনে অনুভব কোর্ব্বো। আরে পাগল, তাও কি কখন হয়? আগে ইন্দ্রিয়গুলোকে সতেজ কর, শিক্ষা সহায়ে বশীভূত কর, বহুকাল ধরে অভ্যাস কর, শ্রদ্ধার সহিত চেষ্টা কর, তবে ত পার্ব্বি। তা কোর্ব্বো না, আর বোলবো,—আমাদের শাস্ত্রটা সব আজগুবি ও মিথ্যাতে ভরা। হিন্দু ধর্ম্মটা কিছু না। এর চেয়ে মূর্খতা আর কি হতে পারে? ছেলে বেলায় একটা গল্প পড়েছিলুম। গল্পটীর নাম—চোক থাকা ও না থাকার কত প্রভেদ। গল্পটী এই,—দুজন লোক এক মাঠের উপর দিয়ে একদিন বেড়াতে গিয়েছিলো। একজন সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বিশেষ কিছুই না দেখতে পেয়ে মহা বিরক্ত হয়ে ফিরে এল। আর তার সঙ্গী কত কি নূতন নূতন গাছ গাছড়া সংগ্রহ কোরে জমিটার উর্ব্বরতা পরীক্ষা করে নানা রকমের নূতন পাথরে জামার পকেট পুরে মহা আনন্দে ফিরে এল। এক মাঠেই বেড়াতে গিছলো। কিন্তু শেষের লোকটী চোখের ব্যবহার জানতো, এই প্রভেদ। স্বামীজির সহিত যারা বেড়িয়েছে, তারা জানে, তাঁর কিরূপ দৃষ্টি ও ধারণা ছিল। কতবার দেখিছি, একই দেশের ভিতর দিয়ে, একই স্থানে বাস করে, এক সঙ্গে বেড়িয়ে এলাম। তিনি এসে তাদের বিচিত্র আচার ব্যবহার ইতিহাসাদির কত কথা বলতে লাগলেন। আমরা শুনে অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলুম, ইনি এত কখন দেখলেন বা শুনলেন।

শাস্ত্র বলেন, দৃঢ়শরীর, সতেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম, ধারণাসমর্থ মনবিশিষ্ট পুরুষই বেদজ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। সে পুরুষ এখন কোথায়? দেশের লোকের ভিতর এই যে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে চুপ করে পড়ে থাকা দেখতে পাও, সবটা কি মনে কর, ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম্ম বিশ্বাস থেকে আসে? তা নয়। দুর্ব্বলতা ও তমোগুণই হচ্ছে তার প্রধান কারণ। অদৃষ্ট বা দৈব মানুষকে সহায়তা না করলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না বটে, কিন্তু গীতাকার বলেন, কার্য্য সিদ্ধি হবার পাঁচটা কারণের ভিতর

দৈবটা একটা কারণ মাত্র। দৈব সহায় না হলে যেমন কোন কায সফল হয় না, সেইরূপ তার সঙ্গে সঙ্গে সমান ভাবে চাই, "অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধং। বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টাঃ।" উপযুক্ত দেশ কাল, উদ্যমশীল কর্ত্তা, সতেজ শিক্ষিত ইন্দ্রিয়গ্রাম ও তৎসহায়ে বার বার নূতন নূতন উপায়ে কর্ত্তার উদ্যম করা। শাস্ত্র বলেছে, দৈবসহায় ভিন্ন কোন কায হয় না। সেটা আমরা বেশ করে ধরে বসে আছি, কিন্তু শাস্ত্র যে তা ছাড়া আরও বল্‌ছেন, সবল হও, অনলস হও, ক্রমাগত চেষ্টা কর, কার্য্য কর, সেগুলো আমরা শুনেও শুন্‌বো না, দেখেও দেখ্‌বো না। কেননা, তা যে আমাদের বিলকুল নাই, আমরা যে মহা তমোগুণে পড়ে রয়েছি।

কাযের আগ্রহ চাই, তার উপর দৈব চাই। দুটোরই দরকার। তবে ফলসিদ্ধি হয়। তোমার হাতে আছে উদ্যমী হওয়া, অনলস হওয়া, ফলসিদ্ধি তোমার হাতে নাই, তোমার দেখ্‌বার দরকারও নাই। তোমায় দেখ্‌তে হবে, উদ্দেশ্যটা ঠিক রাখ্‌তে পেরেছ কি না। কর্ম্ম-যোগে গীতাকার এইটী হোতে তোমায় শিক্ষা দিচ্ছেন।

কর্ম্মযোগের আর একটী উদ্দেশ্য আছে,—শক্তিক্ষয় নিবারণ করা। যোগ হচ্ছে,—কর্ম্ম করবার কৌশল। কর্ম্মবিশেষে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করা দরকার, ততটুকু তাতে লাগান, অল্পও নয়, অধিকও নয়। ফল-কামনা না কর্‌লে সেইটী হয়। মনে কর, ফলের দিকে মন দিয়ে যদি অকৃতকার্য্য হোলে, তা হলে মনস্তাপে তোমার কত শক্তি ক্ষয় হোলো। কর্ম্মযোগ বল্‌ছে, শক্তিক্ষয় কোরো না। শক্তি সঞ্চয় কর এবং শারীরিক শক্তির সার ভাগকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর। সংযম ও কর্ম্মযোগের এই শিক্ষা। যতটুকু শক্তি প্রয়োগ দরকার, ততটুকু কাযে লাগাও। তোমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, ততটুকু করেছ কি না, সর্ব্বদা দেখো। কিন্তু যেটা তোমার হাতে নাই, সেটার জন্য মাথা খুঁড়ে, হা হুতাশ করে শক্তিক্ষয় কোরো না। ভোগী, ফলকামী পুরুষের শক্তি সর্ব্বদাই ঐ রূপে ক্ষয় হয়। কাযেই কর্ম্ম কর্‌বার শক্তিও তার দিন দিন কমে যায়। সেই জন্য কেবল উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে কায করে চলে যাও।

ঐ রূপে কায কর্‌বার উপযুক্ত কে? যে আপনার মনটাকে বশ

কর্ত্তে পেরেছে। ঐরূপে কায করে গেলে কি হয়? কর্ম্মবন্ধন কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এই কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান বিশেষ রূপে দেখা যায়। দেখা যায়, তাঁর ইন্দ্রিয় মন সর্ব্বদা অশেষ কায করলেও তিনি অল্পমাত্রও ফলাকাঙ্ক্ষী নন। তাঁহার ন্যায় অবতারেরাই জগতের যথার্থ গুরু। তাঁদের জীবনই জ্ঞানের বিস্তারের জন্য, লোকের শিক্ষার জন্য। তাঁদের জীবন দেখে ঐ ভাবে কায কত্তে শেখ। নতুবা সংযম কত্তে না শিখলে, ফলাকাঙ্ক্ষায় কাযে প্রবৃত্ত হলে, মন ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়্‌বে এবং ঐ ইন্দ্রিয়ই আমাদের মাটি কর্‌বে। ইন্দ্রিয়ের দাস হলে চল্‌বে না, কায হবে না, উদ্দেশ্য হারাতে হবে। ইন্দ্রিয় ও মন বশে রাখ্‌তে হবে। মহান্ উদ্দেশ্য সাম্‌নে রেখে নিষ্কাম হয়ে কায করে যাও। দেখ্‌বে, জ্ঞানযোগী তীব্র বৈরাগ্য সহায়ে যে অবস্থা লাভ করেন, কর্ম্মযোগী কর্ম্মের দ্বারা ঠিক সেই অবস্থায় পৌঁছিবেন। দুজনেরই উদ্দেশ্য এক কিন্তু পথ আলাদা। পথে যতক্ষণ, ততক্ষণ উভয়ের মিল না থাক্‌লেও উদ্দেশ্যে পৌঁছিলে আর বিরোধ থাকে না।

আমেরিকায় বেদান্ত।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের বংশধরগণ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, 'তীব্র পাশ্চাত্য কিরণে,' যখন আঁখি ধাঁধিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং কেহ পিতৃপুরুষের সযত্নসঞ্চিত, পরবর্ত্তিগণের অজ্ঞতাজনিত উপেক্ষায় আবর্জ্জনামধ্যগত মাণিক্যের অস্তিত্ব অবিদিত হইয়া আবর্জ্জনা দূরীকরণে ক্ষিপ্রকর, কেহ বা পিতৃপুরুষগণের গূঢ় আদেশের মর্ম্মাববোধে অক্ষম হইয়াও কুসংস্কারের প্রেরণায় আবর্জ্জনাগুলির নিকট নতজানু হইতেন, তখন কে ভাবিয়াছিল যে, একদিন এই মাণিক্য আবর্জ্জনাবিমুক্ত হইয়া কেবল আমাদের গৃহ উজ্জ্বলিত করিবে, তাহা নহে, কিন্তু তাহার দূরবিসর্পী প্রভায় 'সাত সমুদ্র তের নদীর' পারকেও আলোকিত করিবে? এখনও অনেক

স্থলে মাণিক্য-অঙ্গ-সংলগ্ন আবর্জ্জনা-কণাগুলি অনেকের হৃদে ইষ্টকবচ-রূপে রক্ষিত হইতেছে এবং তাহাদের শান্তাস্ত শিরঃপীড়া আরোগ্য হইতে সৃষ্টির অজ্ঞেয় সূক্ষ্ম রহস্যোদ্ভেদশক্তি প্রচারিত হইতেছে ঘটে, কিন্তু কালের গতি অভিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শিগণ দেখিতেছেন; সূর্য্যোদয়ে পেচকের ও কেশরি-গর্জ্জনে জম্বুকের পলায়নের ন্যায় সেই অযত্নরক্ষিত মাণিক্য নিজ জ্যোতিঃ ও মহিমায় নিজ পারিপার্শ্বিকগণকে পরাভব করিয়াছে—শ্রুতির সেই 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং' বাণী সফল হইয়াছে।

পতিতপাবনী জহ্নুনন্দিনীর পূতসলিলধৌত, দ্বাদশশিবমন্দিরশোভিত, প্রকৃতি-পুরুষের নিত্য আরাধনায় পবিত্রিত দক্ষিণেশ্বরশ্রীমন্দিরের অদূর-স্থিত ফুলকুলসৌরভিত, বিহগকূলনিনাদিত, জনসমাগমবিরহিত বিপিনে পঞ্চবটী-যোগাসনে সমাধিস্থ মহাপুরুষের ইঙ্গিতে যে আজ সভ্যতাস্পর্দ্ধী, বিজ্ঞানসহায়,কর্ম্মৈকপরায়ণ জাতি পরিচালিত হইবে,তাহা কে স্বপ্নেও ভাবিয়া-ছিল? কিন্তু আজ সেই অসম্ভব সম্ভব দেখিতেছি। তাঁহার হৃদয়ে যে অনি-র্ব্বাণ ব্রহ্মানল জলিয়াছিল, তাহার স্ফুলিঙ্গ মাত্র লইয়া সেই 'কলিকাতা-বাসী যুবক' যে বহ্নি জ্বালাইয়া আসিয়াছেন, তাহা তদীয় তিরোধানে না নিবিয়া দিন দিন দেখিতেছি, আরো জলিয়া উঠিতেছে। এ হোমানলে যিনি একখণ্ড সমিধ্ বা স্রুবৈকমাত্র হবিঃ সংযোগ করিতে পারেন, তিনিও ধন্য।

আমরা স্বামী ত্রিগুণাতীতের আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে আশাতীত কৃতকার্য্যতার সংবাদ পাইয়া আশান্বিত হইয়াছি। তিনি এক্ষণে আমে-রিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে কার্য্য করিতেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার কার্য্য এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে ও এরূপ সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়া আসিতেছে যে, অবিরাম কার্য্য করিয়াও তিনি সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারিতেছেন না। স্থানাভাবে এবারে তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করিব। ভবিষ্যতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

[১] প্রতি রবিবারে সায়ংকালে ৮টার সময় সর্ব্বসাধারণের জন্য বক্তৃতা হয়। গতবর্ষে (১৯০৩ সালে) নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি নিম্নলিখিত-ভাবে দিয়াছিলেন। (১) ধর্ম্মের সুসমাচার (২) জগদ্রহস্যের উদ্ভেদ (৩) ব্রহ্মাণ্ড-সমস্যার অপূর্ব্ব মীমাংসা (৪) অদ্ভুত রত্নখনির আবিষ্কার (৫) বর্ত্তমানযুগের আদর্শ বৈদান্তিক শ্রীরামকৃষ্ণচরিত (৬) ভারতীয় পারি-

বাস্থিক জীবন (৭) ভারতের আচার ব্যবহার (৮) ভারতে বাল্যবিবাহ (৯) ভারতীয় নারীর নিত্য-কর্ত্তব্য (১০) অন্তঃপুরুষের শারীর-রহস্য (১১) মৃত্যুর পর থাকে কি? (১২) 'আমি'র স্বরূপ (১৩) আত্মার স্বরূপ (১৪) আধুনিক বিজ্ঞান খৃষ্ট ধর্ম্মের ভিত্তি (১৫) খ্রীষ্ট কাহাকে বলে? (১৬) বাইবেলের প্রকৃত ও হিতকরী ব্যাখ্যা (১৭) হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না? (১৮) প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান হইবার উপায় (১৯) অবিচলিত-স্বভাব হইবার উপায় (২০) পরমসুখী হইবার উপায় (২১) পরম সুন্দর হইবার উপায় (২২) ঈশ্বরত্ব লাভের উপায় (২৩) সৃষ্টি-বাদ (২৪) জীবনের লক্ষ্য (২৫) ঈশ্বরের স্বরূপ (২৬) ঈশ্বরদর্শনের উপায়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বক্তৃতার তালিকা এই:—[১] অব্যক্ত শক্তি [২] শক্তির ব্যক্ত-ভাব [৩] জীবাত্মা [৪] মন [৫] ভূত [৬] হঠ-যোগ [৭] রাজযোগ [৮] যোগসিদ্ধি [৯] ধর্ম্মবিজ্ঞান [১০] অনন্ত [১১] সিদ্ধি-রহস্য [১২] শত্রু না মিত্র? [১৩] বিশ্বাস-তত্ত্ব [১৪] বিচার-তত্ত্ব [১৫] প্রার্থনা-তত্ত্ব [১৬] উপাসনা-তত্ত্ব [১৭] আত্মাসম্বন্ধে বেদান্তের মত [১৮] ঈশ্বর সম্বন্ধে বেদান্তের মত [১৯] মানুষ কি, এতৎ-সম্বন্ধে বেদান্তের মত [২০] বেদান্ত মতে পরিত্রাতা কে? [২১] বেদান্ত মত [২২] কর্ম্ম-জীবনে বেদান্ত [২৩] মনুষ্য-জীবনের চারি অবস্থা [২৪] উদ্বাহ-তত্ত্ব [ক] [২৫] উদ্বাহ-তত্ত্ব [খ]।

[২] প্রতি সোমবার সায়ংকালে আটটার পর গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৮½টার সময় বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা।

[৩] প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর ধ্যান শিক্ষা।

[৪] প্রতি বক্তৃতার পর অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম-সাধন সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তর দেওয়া হয়।

[৫] বুধ ও শুক্রবারে সংস্কৃতভাষা শেখান হয়।

[৬] সান্‌ফ্রান্সিস্কো ব্যতীত অন্যান্য স্থলে যাইয়াও বক্তৃতা দিয়া থাকেন। গত বৎসর লস্ এঞ্জেলস নামক স্থানে তিন মাস থাকিয়া বক্তৃতা দেন।

[৭] বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একমাসকাল কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত 'শান্তি-আশ্রমে' যাইয়া যোগশিক্ষা দেওয়া হয়।

তাড়িত-রহস্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(সচিত্র।)

—০:*:০—

(শ্রীঅনাথনাথ পালিত এম্ এ)

১৭। ১লা মাঘের উদ্বোধনে প্রকাশিত মৎপ্রণীত "তাড়িত-রহস্য" প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে উক্ত হইযাছে, যে, "তাড়িতাকর্ষণ অন্যোন্যাশ্রয়ী"—অর্থাৎ দুইটী পদার্থের মধ্যে যদি একটীতে তাড়িত থাকে, অন্যটিতে তাড়িত না থাকে, তাহা হইলে উহারা পরস্পরকে টানিবে; কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, ঐ দুয়ের মধ্যে যেটি সঞ্চলন করিতে পারে, সেইটি অন্যটির (অর্থাৎ যেটি স্থির, তাহার) নিকট চলিয়া আসিবে। আরও উক্ত প্রবন্ধের তৃতীয় প্যারাগ্রাফে কথিত হইযাছে, যে, বিষমধর্ম্মী তাড়িতযুক্ত দুইটী পদার্থও পরস্পরকে আকর্ষণ করে। একদিকে দেখা যাইতেছে যে, তাড়িতহীন ও তাড়িতযুক্ত দুইটী পদার্থের মধ্যে আকর্ষণ ঘটে, অন্যদিকে বিষমধর্ম্মী তাড়িতবিশিষ্ট দুইটি পদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে পারে। এই দুইটি ব্যাপারে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যদি একটি পদার্থ দ্বারা অন্য এক পদার্থকে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে প্রথমটিতে তাড়িত আছে কি না স্থির নির্ণয় করা যায় না। এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে—হয় উহা তাড়িতহীন, নয় উভয় পদার্থে তাড়িত আছে, আর উহাদের তাড়িত বিষমধর্ম্মী। মনে করা যাউক, যেন একটি তাড়িতযুক্ত তাড়িতদোলকের নিকটে কাচদণ্ড আনিবামাত্র দোলকটি দণ্ডের নিকটে চলিয়া আসিল; এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দণ্ডটি তাড়িতযুক্ত না তাড়িতহীন? ইহার উত্তর স্বরূপে এই বলিতে হইবে যে, কাচদণ্ডে তাড়িত থাকিতেও পারে অথবা

বিকর্ষণই তড়িৎপরীক্ষার একমাত্র সুনিশ্চিত উপায়।

না থাকিতেও পারে। যদি থাকে ত তাহা হইলে উহা তাড়িতদোলকের তাড়িতের সহিত বিষমধর্ম্মী। এখন বুঝা গেল যে, আকর্ষণ দেখিয়া তাড়িতের অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু যদি কাচদণ্ডটি আনিবামাত্র দোলকটি দণ্ডের নিকটে না আসিয়া উহা হইতে সরিয়া যায়, তাহা হইলে তড়িৎপরীক্ষা বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না। আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, দণ্ডে ও দোলকে সমধর্ম্মী তাড়িত আছে; কেননা সমধর্ম্মী তাড়িতযুক্ত পদার্থ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, বিকর্ষণই তড়িৎপরীক্ষার একমাত্র সুনিশ্চিত উপায়—আকর্ষণ নহে।

১৭।ক। তাড়িতযুক্ত তড়িদ্বীক্ষণের শীর্ষ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি কাচদণ্ড আনিলে যদি পত্রদ্বয়ের ব্যবধান হ্রাস হয়, তাহা হইলে দণ্ড তাড়িতযুক্ত কি না, তাহা স্থির নির্ণয় করা যায় না। কেননা তাড়িত-হীন পদার্থ ও বিষমধর্ম্মী তাড়িতযুক্ত পদার্থ এই উভয়েই তবকদ্বুখানির ব্যবধান কমাইয়া দিতে পারে। কিন্তু যদি দণ্ডটি আনিবামাত্র ব্যবধান বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত বলা যায় যে, দণ্ডটি তাড়িতযুক্ত আর উহার তাড়িত তড়িদ্বীক্ষণের তাড়িতের সহিত সমধর্ম্মী। সুতরাং এস্থলে ব্যবধানবৃদ্ধিই তড়িৎপরীক্ষার সুনিশ্চিত উপায়।

১৮। "তাড়িত-রহস্য" প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবের পঞ্চম প্যারাগ্রাফে আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, লম্বভাবে ধৃত একটি সূচীর উপরে সহজে সঞ্চলন করিতে পারে, এমন ভাবে একটি হংসপুচ্ছ, খড় বা হাল্‌কা ও লম্বা পাত্‌লা কাঠ বা অন্য কোন পাত্‌লা পদার্থকে (পাত্‌লা লোহার পাত লইলেও চলিবে) আশ্রয় করিলে উহা দ্বারা তাড়িতপরীক্ষা করা যাইতে পারে।

চৌম্বকসূচী। চৌম্বকাকর্ষণ। বিষম মেরুতে আকর্ষণ. সম মেরুতে বিকর্ষণ।

সূক্ষ্ম প্রান্তবিশিষ্ট একখানি পাত্‌লা লোহার পাতের দুই প্রান্তে একখানি চুম্বকের দুই মুখ যথাক্রমে ঘষিলে লোহার পাতখানি লৌহচূর্ণসমূহকে টানিতে পারিবে অর্থাৎ উহা চুম্বকের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে, ইহা বোধ হয় অনেকে জানেন। আর এই লোহার পাত খানিকে যদি একটি লম্বভাবে স্থিত সূচীর উপর এরূপে আশ্রয় করা যায় যে, উহা অনায়াসে সূচীর বিন্দুর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে, তাহা হইলে, দেখা যায় যে, পাত খানি ঘুরিয়া আসিবার পর

যখন স্থির হইবে, তখন উহার প্রান্তদ্বয় প্রায় উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ নির্দ্দেশ করিবে। এইরূপ চৌম্বকধর্ম্মপ্রাপ্ত লোহার পাতকে "চৌম্বকসূচী" (Magnetic Needle) বলে। একটি ছুঁচের দুই মুখে চুম্বকের দুইপ্রান্ত ঘষিয়া যদি ছুঁচটিকে এমন ভাবে একটি ছিপির ভিতরে প্রবেশ করান যায় যে, উহা একটি জলপাত্রে জলের পৃষ্ঠের সহিত সমান্তরভাবে (সোজা হইয়া) ভাসিতে পারে, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, ছুঁচটি যখন স্থির থাকে, তখন প্রায় উত্তর দক্ষিণ দিক্ নির্ণয় করে। যাঁহারা "দিগ্‌দর্শন সূচী" বা কম্পাসের কাঁটা (Compass Needle) দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই ব্যাপারটি সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। এই চৌম্বকসূচী বা কম্পাসের কাঁটার যে মুখ উত্তর দিক্ নির্দ্দেশ করে, তাহাকে "উত্তর মেরু" (North Pole) আর অন্য মুখটিকে "দক্ষিণ মেরু" (South Pole) বলা গেল। এক খানা চুম্বক দণ্ডের এক প্রান্তকে চৌম্বকসূচীর উত্তর মেরুর নিকট লইয়া গেলে ঐ মেরুটি দণ্ড হইতে সরিয়া যায়; আর দণ্ডের অন্য প্রান্ত আনিলে উত্তর মেরুটি দণ্ডের নিকটে চলিয়া আসে। এই ব্যাপারে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দণ্ডের দুইটি প্রান্ত চৌম্বকসূচীর একই মুখ বা প্রান্তের উপর বিপরীত কার্য্য করে অর্থাৎ দণ্ডের একপ্রান্ত সূচীর উত্তর মেরুকে আকর্ষণ আর অপর প্রান্ত উহাকে বিকর্ষণ করে। সূচীর দক্ষিণ মেরুর উপর দণ্ডের প্রান্তদ্বয়ের ক্রিয়া উহার উত্তর মেরুর উপর ক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ দণ্ডের যে প্রান্তটি সূচীর উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা দক্ষিণ মেরুকে বিকর্ষণ করিবে আর দণ্ডের যে প্রান্তটি সূচীর উত্তর মেরুকে বিকর্ষণ করে, তাহা সূচীর দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করিবে। চুম্বকদণ্ডকে যদি এরূপে ঝুলান যায় যে, উহা পৃথিবীপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরভাবে থাকিতে পারে, তবে স্থির হইলে দণ্ডটিও চৌম্বক সূচীর ন্যায় উত্তর দক্ষিণ দিক্ নির্দ্দেশ করিবে; সুতরাং চৌম্বক সূচীর ন্যায় চুম্বক দণ্ডেরও এক প্রান্তকে উত্তর মেরু ও অপরকে দক্ষিণ মেরু বলা যায়। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, চুম্বক দণ্ডের উত্তর মেরু সূচীর উত্তর মেরুকে বিকর্ষণ ও দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ আর দণ্ডের দক্ষিণ মেরু সূচীর দক্ষিণ মেরুকে বিকর্ষণ ও উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, "সম" মেরুদ্বয়ের মধ্যে বিকর্ষণ ও "বিষম" মেরুদ্বয়ের মধ্যে আকর্ষণ ঘটে।

১৯। তাড়িত ও চৌম্বকধর্ম্ম (Magnetism) এই দুয়ের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। যথা—সমধর্ম্মী তাড়িতে ও সম মেরুদ্বয়ে বিকর্ষণ আর বিষমধর্ম্মী তাড়িত ও বিষম মেরুদ্বয়ে আকর্ষণ। আবও যেমন তাড়িতযুক্ত পদার্থের নিকটে থাকিলে তাড়িতহীন পদার্থে তাড়িতের উদ্দীপনা হয়; সেইরূপ যে লৌহ চুম্বক নহে, তাহা চুম্বকসংস্পর্শে চুম্বক হইযা যায। এতদ্ভিন্ন আব একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা উচিত, যে, দুইটি পদার্থ তাড়িতযুক্তই হউক বা চৌম্বকধর্ম্মীই হউক, যে শক্তি দ্বাবা পরস্পবকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে, তাহা উহাদের তাড়িত বা চৌম্বকধর্ম্মেব মাত্রাসাপেক্ষ; আরও ঐ শক্তি উহাদের দূরত্বের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ পদার্থ দুইটিব দূরত্ব ঠিক থাকিলে উহাদের তাড়িতের পরিমাণ যত অধিক হইবে বা উহাবা যত অধিক পরিমাণ চৌম্বকধর্ম্মী হইবে, উহাদেব পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণও তত অধিক হইবে; আব উহাদেব তাড়িত-পরিমাণ বা চৌম্বকধর্ম্মের মাত্রা ঠিক রাখিযা দূবত্ব যত বাড়ান যাইবে, আকর্ষণী অথবা বিকর্ষণী শক্তিও তত কমিবে অর্থাৎ দূরত্ব দুই তিন চাব ইত্যাদি গুণ বাড়িলে উক্ত শক্তি চার নয ষোল ইত্যাদি গুণ কমিবে। এই দুই প্রক্রিযায় আবার পার্থক্যও আছে। সকল দ্রব্যকেই উপাযবিশেষে তাড়িতযুক্ত করা যাইতে পাবে; কিন্তু কেবল লৌহকে (আর কোবাল্ট ও নিকেল নামক আর দুইটি ধাতুকে অতি অল্পপরিমাণে) চুম্বক কবা যাইতে পাবে। এতদ্ভিন্ন আর একটী বিষযেও প্রভেদ আছে, কোনও পদার্থে একপ্রকার তাড়িত (ধন + বা ঋণ —) উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু একটি মাত্র মেরুবিশিষ্ট চুম্বক কখনও পাওযা যায় না।

তাড়িত ও চৌম্বকধর্ম্মে সাম্য ও বৈষম্য।

২০। চৌম্বক সূচী চুম্বক দণ্ড দ্বাবা যেমন বিচলিত হয, তাড়িতযুক্ত দণ্ড দ্বারাও সেইরূপ বিচলিত হয। ঐ সূচীব নিকট তাড়িতযুক্ত দণ্ড আনিবা মাত্র সূচীটী দণ্ড দ্বাবা আকৃষ্ট হইযা উহার নিকটে আসে সুতরাং সূচীটি দ্বাবা তাড়িতেব সত্তা পরীক্ষা করা যায়; এই জন্য সূচীটিকে এক প্রকার তড়িদ্বীক্ষণ বলিলে দোষ হয না।। চৌম্বক সূচীর নিকট চৌম্বকধর্ম্মহীন লৌহদণ্ড আনিলেও

আকর্ষণ সংশয়ের মূল।

সূচী আকৃষ্ট হইবে, আবার কোনও চুম্বক দণ্ডের বিষম মেরু, সূচীর এক প্রান্তের নিকট আনিলে সূচীর ঐ মুখটি চুম্বক দণ্ডের উক্ত মেরুর নিকটে আসিবে কেননা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে, বিষম চুম্বক মেরুদ্বয়ের মধ্যে আকর্ষণ ঘটে। এই তিনটি ব্যাপারে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে, চৌম্বক সূচীর কোনও বিশেষ মেরুর (ধরা যাউক যেন উত্তর মেরুর) আকৃষ্ট হইবার কারণ এই তিনটির যে কোনটি;—(১) তাড়িতযুক্ত দণ্ড (২) চৌম্বকধর্ম্মহীন লৌহদণ্ড (৩) চুম্বক দণ্ডের বিষম মেরু (এ স্থলে দক্ষিণ মেরু); সুতরাং যখন এই আকর্ষণের কারণ তিনটি বস্তুর যে কোনওটি, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, আকর্ষণ বিশেষ সংশয়ের মূল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, যদি কোনও অজ্ঞাত পদার্থ চৌম্বক সূচীর এক-মুখ বা মেরুকে এরূপ আকর্ষণ করে, তাহা হইলে ঐ পদার্থটি কি—তাহা ঠিক বলা যাইবে না—উহা পূর্ব্বোক্ত তিনটির একটি হইতে পারে। আবার ঐ পদার্থটিকে সূচীর অন্য মুখ বা মেরুর নিকট লইয়া গেলে যদি ঐ মুখটিও পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পদার্থটি চুম্বক নয়; কেননা চুম্বক দণ্ড চৌম্বক সূচীর এক মুখকে আকর্ষণ ও অন্য মুখকে বিকর্ষণ করিবে—উভয় মুখকে কখন আকর্ষণ করিতে পারে না। উভয় মুখের আকর্ষণ তাড়িতযুক্ত দণ্ড বা চৌম্বকধর্ম্মহীন দণ্ড দ্বারাই উৎপাদিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, অজ্ঞাত পদার্থের প্রকৃত তথ্য নিরূপণ বিষয়ে ঘোর সন্দেহ রহিল। এখন পদার্থটি তাড়িতযুক্ত দণ্ড বা চৌম্বকধর্ম্মহীন দণ্ড ইহা স্থির নির্ণয় করিতে হইলে উহাকে দীপশিখার উপর রাখিতে হইবে—এরূপ করিলে বাস্ত-বিকই যদি উহাতে তাড়িত থাকে, তাহা হইলে উহা তাড়িতহীন হইবে সুতরাং উহা সূচীকে আর আকর্ষণ করিবে না; কিন্তু যদি এখনও আকর্ষণ করে, তবে বুঝিতে হইবে, যে, উহা চৌম্বকধর্ম্মহীন দণ্ড মাত্র। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, দণ্ডটিকে সূচীর দ্বিতীয় মুখের নিকট আনিবা মাত্র ঐ মুখটি যদি দণ্ড হইতে দূরে চলিয়া যায় বা উহা দ্বারা বিকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দণ্ডটি যে চুম্বক, এ বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকে না। অতএব দেখা গেল, যে, "আকর্ষণ সংশয়ের মূল"।

২১। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাড়িত, পরিচালক পদার্থের তীক্ষ্ণ ভাগ বা সূক্ষ্মতম অংশে অধিক পরিমাণে সম্মিলিত হয়। এই জন্য পদার্থে

তাড়িত রক্ষা করিতে হইলে উহাতে ধারাল অংশ, কাঁটা বা সূচীর মতন বিন্দু যাহাতে না থাকে, তাহা দেখা উচিত। সূচীমুখ শলাকা বা কাঁটা, কোনও তাড়িতযুক্ত বর্ত্তুলের সহিত সংযুক্ত থাকিলে বর্ত্তুলের ঐ অংশে তাড়িত সম্মিলিত হয়, এই জন্য সূচীমুখে তাড়িতের ঘনসন্নিবেশ হইয়াছে, বলা যায়। সূচীমুখে তাড়িতের "ঘনত্ব" বা "সান্দ্রত্ব" (Density) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া নিকটস্থ বায়ুকণাসমূহ সূচীসংস্পর্শে তাড়িতযুক্ত হয় এবং উহারা সূচীর সহিত সমানধর্ম্মী তাড়িত লাভ করাতে সূচী দ্বারা বিকৃষ্ট হইয়া দূরে চলিয়া যায় আর এক বায়ুকণাশ্রেণী আসিয়া উহাদের স্থান অধিকার করে এবং উহাদের ন্যায় তাড়িতযুক্ত হইবামাত্র বিকৃষ্ট হইয়া চলিয়া যায়। এইরূপে এক এক বার এক এক দল বায়ুকণা আসিয়া সূচী হইতে কিছু কিছু তাড়িত অপহরণ করিয়া লয়। ফলে লাভ হয় এই, যে, সূচীমুখযুক্ত বর্ত্তুলটি তাড়িতহীন হইয়া যায়। পদার্থকে তাড়িতহীন করা রূপ ক্রিয়া ভিন্ন সূচীর আর একটি অধিকতর প্রয়োজনীয় ক্রিয়া আছে। একটি স্বর্ণপত্র তড়িদ্বীক্ষণের শীর্ষস্থিত পিত্তলের চাকির সহিত যদি একটি সূক্ষ্মমুখ তার সংযুক্ত করিয়া দিয়া, যন্ত্রটির নিকট একটি তাড়িতযুক্ত দণ্ড আনা যায়, তাহা হইলে দণ্ডের তাড়িত, যন্ত্রটিতে তাড়িতের উদ্দীপনা করিবে—চাকি সংলগ্ন তারটিতে উদ্দীপ্ত বিষম তাড়িত বায়ুরাশিতে পলায়ন করিবে; কিন্তু মুক্ত সম তাড়িত স্বর্ণপত্রদ্বয়ে বা তবক দুখানিতে থাকিয়া যাইবে! এই ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে, উদ্দীপক পদার্থে যে প্রকারের তাড়িত আছে, তড়িদ্বীক্ষণে সেই প্রকারেরই তাড়িত উদ্দীপ্ত হইল। এখন বুঝা গেল যে, কোনও তাড়িতযুক্ত পদার্থের সাহায্যে (উদ্দীপনায়) অন্য পদার্থে তাড়িত সংগ্রহ করিতে হইলে শেষোক্ত পদার্থে সূচী বা কাঁটার শ্রেণী সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে; অবশ্য কাঁটাগুলি প্রথমোক্ত পদার্থের সম্মুখীন থাকিবে। ইহাতে এই লাভ হইবে, যে, প্রথম পদার্থ দ্বারা কাঁটাতে যে বিষমধর্ম্মী তাড়িত উদ্দীপ্ত হইবে, তাহা কাঁটা হইতে নির্গত হইয়া উক্ত পদার্থে পতিত হইবে এবং উহার তাড়িতের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে তাড়িতহীন করিবে; কেননা ঐ পদার্থে যত পরিমাণ তাড়িত ছিল, সূচীনিঃসৃত বিষমধর্ম্মী তাড়িতের পরিমাণ ঠিক তত। [উদাহরণ

বিন্দুসঙ্ঘের ক্রিয়া।

স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, প্রথম পদার্থে যেন + ১০ পরিমাণ 'ধন' তাড়িত ছিল আর সূচীনিঃসৃত বিষমধর্ম্মী অর্থাৎ 'ঋণ' তাড়িতের পরিমাণ—১০; উভয়ে মিশিয়া শূন্য (০) হইয়া গেল—অথবা জমা ১০ খরচ ১০ বাকী কিছু রহিল না।] কিন্তু দ্বিতীয় পদার্থে যে সমধর্ম্মী তাড়িত উদ্দীপ্ত হইবে, তাহার কিছু ক্ষতি হইবে না। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয়টি প্রথমের সাহায্যে কিরূপে তাড়িত সঞ্চয় বা সংগ্রহ করিয়া লইল। কোনও তাড়িতসংগ্রহ যন্ত্রের যে অংশে তাড়িত সঞ্চিত হয়, তাহার সহিত একটি সরু তার আঁটিয়া দিয়া, কোনও অন্ধকারময় গৃহে তাড়িত-সঞ্চয় পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যে তারের মুখ হইতে দীপ্তিমান্ সুন্দর তাড়িতস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। জাহাজের মাস্তুল হইতে সময়ে সময়ে এইরূপ আপনা আপনি তাড়িতালোকস্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। নাবিকেরা ইহাকে St. Elmo's Fire বলে। ইহার কারণ এই যে, জাহাজের উপরে বায়ুরাশিতে যে তাড়িত থাকে, তাহার উদ্দীপনায় মাস্তুলে বিরুদ্ধধর্ম্মী তাড়িত জন্মে; এই তাড়িত মাস্তুলের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়া নীলাভ স্ফুলিঙ্গাকারে বিদ্যোতমান হয়।

২২। অধিক পরিমাণে তাড়িত সংগ্রহ করিতে হইলে নিম্নলিখিত যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। একখানি কাঠের তক্তায় আবদ্ধ লম্বভাবে স্থিত দুইখানি কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক খানি পুরু কাচের থালাকে (G) এমন ভাবে আশ্রিত করিতে হইবে যে, কাচ খানির কেন্দ্র (মধ্যবিন্দু) ও কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যবিন্দুভেদকারী একটি দণ্ডের চতুঃপার্শ্বে থালাখানিকে ঘুরাইতে পারা যায়। কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের উপর ও নীচু উভয় প্রান্তেই দুই দুই খানি চামড়া (R R) সংলগ্ন করিতে হইবে—যাহারা ঘূর্ণিত কাচের উভয় পৃষ্ঠের সহিত সম্পূর্ণ রূপে ঘর্ষণ করিতে পারে। কাচের থালায় ঘর্ষণ
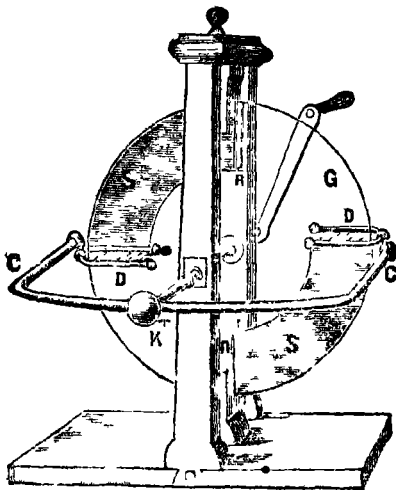
দ্বারা যে তাড়িত জন্মে, তাহাই যন্ত্রটির তাড়িতোৎপত্তির কারণ বলিয়া কাচের থালাকে যন্ত্রের "উৎপাদক" (Generator) অঙ্গ বলা গেল। তিন অংশে বক্রীকৃত একটি সুদীর্ঘ পিত্তল দণ্ডের (DCKCD) মধ্য অংশে একটি পিতলের গোলা (বর্ত্তুল বা ভাঁটা) (K) এবং প্রত্যেক বাহু বা প্রান্তে (C C) দুই সাব ধাতুনির্ম্মিত কাঁটা,দাঁত বা চিরুণির দাড়া (D) আবদ্ধ করিয়া ঐ দণ্ডকে যন্ত্রের অক্ষ (Axis) বা ঘূর্ণনদণ্ডের সহিত এইরূপে সংলগ্ন করিতে হইবে, যে, উভয় প্রান্তেরই কাঁটার সার দুইটি, কাচ খানির কোনও পৃষ্ঠ স্পর্শ না করিয়া, উহার অতি নিকটে অসংলগ্ন বা আলগা ভাবে থাকিতে পারে। বক্রীকৃত ধাতুদণ্ডে তাড়িত সুরক্ষিত করিবার জন্য উহাকে কাচের পায়ার উপর আশ্রয় করিতে হইবে অথবা (যেমন এই চিত্রে আছে) উহার সহিত সংলগ্ন, যন্ত্রের অক্ষ বা ঘূর্ণনদণ্ডকে কাচনির্ম্মিত করিলেই চলিবে। ধাতুদণ্ডের গোলাটিতেই তাড়িত সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহাকে যন্ত্রের "সংগ্রাহক" (Collector) অঙ্গ বলা গেল। কাচের থালায় ঘর্ষণ দ্বারা অধিক পরিমাণ তাড়িত উপাদন করিবার জন্য, উপরের ও নীচের এক এক যোড়া চামড়ার সহিত এক একখানি রেশমী কাপড় (S S) আঁটা থাকে।

র‍্যাম্‌স্‌ডেনের তাড়িতসংগ্রহ যন্ত্র। ইহার বর্ণনা।

২২।ক। একটী হাতল দিয়া যন্ত্রকে ঘুরাইলে কাচের সহিত চর্ম্ম ও রেশমের ঘর্ষণে কাচে "ধন" (+) ও চর্ম্মে "ঋণ" (—) তাড়িতের সঞ্চার হয়। *চামড়া দুখানির সহিত দুইটী পিত্তলের সরু শিকলি আঁটিয়া দিলে* ঐ শিকলি দিয়া ঋণ (—) তাড়িত পৃথিবীতে চলিয়া যাইবে। ধনতাড়িত-যুক্ত কাচের প্রভাবে বক্র ধাতুদণ্ডের নিকটবর্ত্তী প্রান্ত অর্থাৎ কাঁটার শ্রেণীতে (DD) ঋণ তাড়িত (—) ও দূরবর্ত্তী প্রান্ত অর্থাৎ পিত্তলের গোলাতে (K) ধন তাড়িত (+) জন্মে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ধাতু পদার্থের বিন্দুময় সূক্ষ্মতম স্থান হইতে তাড়িত নির্গত হইয়া যায়; এই জন্য কাঁটাগুলির সন্নিহিত বায়ুস্তর উহাদের ঋণ তাড়িত অপহরণ করিয়া কাচের থালার উপর পতিত হয়। কাচের ধন তাড়িত ঐ সমান পরিমাণ ঋণ তাড়িতের সহিত মিশিয়া যাওয়ায় কাচখানি তাড়িতহীন হয়; সুতরাং ঘর্ষণদ্বারা উহাতে পুনরায় ধন তাড়িত উদ্ভূত হইবে। আর প্রত্যেক

তাড়িতসংগ্রহ যন্ত্রের কার্য্য প্রণালী।

ঘর্ষণেই উদ্দীপ্ত ধন তাড়িত ধাতুময় গোলাতে (K) সঞ্চিত হইবে। এইরূপে যন্ত্রটিকে যতবার ঘুবান যাইবে, গোলাটিতে তত অধিক ধন তাড়িত জমিবে। ইহাতে বুঝা গেল যে, এই যন্ত্রে কেবল ধন তাড়িতই সংগৃহীত হয়। ইহা হইতে ঋণ তাড়িত সংগ্রহ করিতে হইলে, যন্ত্রকে কাচের পায়াযুক্ত একখানি কাঠের টুলের উপর স্থাপন করিয়া গোলকটিতে পিতলের সরু শিকলি দিয়া পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। ইহাতে ধন তাড়িত গোলা হইতে পৃথিবীতে পালাইবে, আর ঋণতাড়িত চামড়া দুখানিতে থাকিয়া যাইবে।

প্রভুভক্ত কুক্কুর।

(শ্রীরাখালকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ, প্রোফেসার,
জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা)

সরকারি নিয়ম অনুসারে বৎসরে একমাস "প্রিভিলেজ লিভ" পাইতে আমার অধিকার আছে। চাহিলে যে ছুটিটা প্রতি বৎসরে না পাওয়া যাইত, তাহা নহে। অনেকে পাওনা ছুটি লইতে ত্রুটি করিতেন না। আমি কিন্তু পনর বৎসরের মধ্যে একদিনও ছুটি লই নাই। ঈশ্বরকৃপায় শরীরটা আমার ভালই ছিল। বাড়ীতে যাইবার কোন বিশেষ আবশ্যকতাও ছিল না। দেশে যাইব যাহাদের জন্য, তাহারা আমার সঙ্গেই বরাবর কলিকাতাবাসী। অন্যান্য লোকে আমাকে ঠাট্টা করিত। আমি ঠিক জানিতাম, ছুটিতে বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে শরীর খারাপ হয়। আর যাহারা সহরে অনেকদিন বাস করে, তাহারা পল্লীগ্রামে যাইয়া থাকিতে পারে না। কেবল যে খাবার সময় কলের জলের অভাব বোধ হয়, তাহা নহে, দুই স্থানের সামাজিক আব হাওয়া ভিন্ন প্রকারের। আমাদের গ্রামে আপিসে কাজ করে, এমন লোক আর ছিল না। অবশ্য ভদ্র লোকের কোন অভাবই ছিল না। কিন্তু তাহাদের আমোদ প্রমোদ, মনের সহানুভূতি, চিন্তার গতি ভিন্ন দিকে; আমাদের ন্যায় চাকুরে লোকের মত নহে। তাহার উপরে আমাদের পরিবার ও সন্তান সন্ততি বিদেশে

সহরের মধ্যে যে ভাবে গঠিত হয়, তাহাদের সেভাবে হয় না। সুতরাং বাড়ী যাইয়া গ্রামের লোকেদের সঙ্গে আমি সপরিবারে কেমন খাপ খাইয়া উঠিতাম না। বোধ হয়, অধিকাংশ গ্রাম্য চাকুরে সহরবাসী হইয়া এই রূপে আপনার স্বজনের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইতাম। ক্রমে দেখিলাম, গ্রাম্য লোকেদের সহানুভূতি প্রতি বৎসর আমাদের উপরে অল্প হইয়া পড়িতেছে। আপনার লোককে সহানুভূতি-বিহীন সমালোচক দেখিলে প্রাণে বড় আঘাত লাগে। দুই একদিন তাহারা আমাদের নিকটে আসিত, সহরের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য। সেগুলি উদরস্থ করিয়াই তাহারা আমাদিগের প্রত্যেক বিষয় সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিত। আমি চিরকাল এই সমালোচনার ভয় করিয়া আসিতেছি।

এই হইল দেশে যাওয়ার আপত্তি। কিন্তু ছুটি লওয়াতেই আমার কিছু আপত্তি ছিল। পূজার বারদিনে অনিয়ম ঘটিয়া ক্ষুধামান্দ্য হয়। আর একমাস বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে কি করিয়া দিন কাটাইব, ইহাও আমার চিন্তার বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু এবার ছুটি লওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কন্যার বিবাহ দিতে দেশে যাইতে হইবে। আমাকে কিছু বেশী দিনের জন্য ছুটি লইতে হইবে শুনিয়া সাহেব মুচকি হাসিলেন কিন্তু ছুটি মঞ্জুর করিয়া উপরওয়ালার নিকট আমার আবেদন-পত্র পাঠাইলেন। যথাসময়ে ছুটি মঞ্জুর হইয়া আসিল। আমিও সপরিবারে দেশে রওনা হইলাম।

কলিকাতায় যে আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এমন উপযুক্ত পাত্রের অভাব, তাহা নহে। কিন্তু সহরে বিবাহের বাজারে জামাতা কিনিতে হয় অত্যন্ত অধিক দাম দিয়া। আমার মত গরীব কেরাণীর এতাদৃশ মহামূল্য জামাতা-রত্ন কিনিবার কোন উপায় নাই। কোন আত্মীয় লোকের সাহায্যে গ্রামের নিকটে উপযুক্ত পাত্র একরূপ স্থির করিয়াছিলাম। দেখাশুনা বাড়ী যাইয়া করিব মনস্থ ছিল। বাড়ী যাইয়া দেখিলাম, পাত্র স্থির করা যত সহজ কার্য্য মনে করিয়াছিলাম, তত সহজ কার্য্য নহে। তিন মাস ছুটির মধ্যে যে কন্যার বিবাহ দিয়া যাইতে পারিব, তাহা ত বোধ হয় না। তবে আত্মীয় সম্পর্কের কয়েকজন বহুদর্শী গ্রামস্থ ব্যক্তি একার্য্যে আমার সাহায্য করিতে ব্রতী হইলেন। সহ-

রের নকলে পাড়াগাঁয়েও বিবাহের বাজারে জামাতার বেশ দর চড়িয়াছে তবে ঠিক সহরের মত অত্যন্ত অধিক নহে। কিন্তু সহরে পয়সার কথা ছাড়িয়া দিলে মনের মত পাত্র পাওয়া যায়, অনেক গ্রামে উপযুক্ত পাত্রের সংখ্যা অতি অল্প। উপযুক্ততা হিসাবে দর নিতান্ত কম নয়। যাহা হউক, কন্যা বিবাহ বা পাত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিছু বলা আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সেকথা ছাড়িয়া দিলাম। যে ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার ইচ্ছা, তাহা বলিতেছি।

গ্রামে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন বড় ভাল লাগিল না। আহার নিয়মিত সময়ে হয় না। দ্বিপ্রহরে নিদ্রা দিয়া ও হাই তুলিয়া ও বিছানায় গড়াগড়ি দিয়া সমস্ত সময় কাটাইতে পারি না। গ্রামের সকল লোকেই আমার হিসাবে নিষ্কর্ম্মা। কারণ, কাহাকেও আপিস যাইতে হয় না। স্বচ্ছন্দভাবে আহার বিহার করে। সময়ের উপরে কাহারও দৃক্‌পাত নাই। কাহারও কাহারও বাড়ীতে ঘড়ি আছে বটে কিন্তু প্রয়োজনাভাবে তাহারা সকলেই প্রায় বিকলাবস্থায় পতিত। তাহার উপরে ঘড়ি চালাইব, কোন্ আদর্শ দেখিয়া? কলিকাতার মত সকল স্থানে বেলা একটার সময় তোপ পড়ে না। ক্রমে বুঝিলাম, সহরে হওয়ার ভিতরে তোপধ্বনিও একটা উপাদান। কেমন সংস্কার বশেই যেন একটার সময় উৎসুকনেত্রে আপনার ঘড়ির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতাম। পরক্ষণে বুঝিতাম, এ সে আপিসের কর্ম্মচারী পরিপূর্ণ সাহেব-বিরাজিত কক্ষ নহে যে, ঘড়িটা এক সেকেণ্ড তফাৎ হইলে মহাপ্রমাদ ঘটিতে পারে।

হায় রে ঘড়ি, তোমার আদর কি কেবল সহরেই? সহরে তোমার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য সাহেব হইতে দপ্তরি চাকর পর্য্যন্ত লালায়িত। আর এখানে সমস্ত দিনে কেহ তোমার বদনমণ্ডলের দিকে ফিরিয়াও দেখিতে চাহে না! মনের দুঃখে তুমি আপনার ভিতরে কত বিভ্রাট বাধাইতেছ, কিন্তু হে শুভ্রবদনে! হে জেনিভানন্দিনি! এখানে তোমার মৃদু বা দ্রুত গতির উপর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কথনই নির্ভর করে না, ইহা ধ্রুব নিশ্চিত জানিবে। কেরাণীজীবনের বিধাত্রী তুমিই। তোমার হুকুম না পাইলে কার্য্য শেষ করিয়া রাখিয়াও বাড়ী আসিতে পাই না। আর তোমার হুকুম পাইব যখন আশা হয়, তখন কত উৎসাহে কত নব উদ্যমে কত ক্ষুধার তাড়নায় সহিত চেয়ারের কাষ্ঠময় হাতখানা হইতে বাঁধা উড়ানী খুলিয়া লইয়া

কেহ মস্তকে শিবস্ত্রাণ স্বরূপ বাঁধে কেহ দুই কাঁধে ঝুলাইয়া দেয়! দেবি! তোমারই হুকুমে অর্দ্ধসিদ্ধ অন্নব্যঞ্জনে উদর অর্দ্ধপূর্ণ করিয়া ত্বরিৎগতি আফিস অভিমুখে ধাবমান হইয়া জীবন সার্থক করি। হে মণ্ডলাকারে, শীতপ্রধান দেশে তোমার জন্ম। তোমার অঙ্গও সুশীতল, কিন্তু তোমার অঙ্গুলিপ্রদর্শনের সহিত সাহেব-কূলের মস্তিষ্কের উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় কেন? তোমার অঙ্গুলি দশটার ঘর ধরিলেই দরওয়ানজীকে হাজিরা বহিখানা কেন সাহেবের টেবিলের উপরে রাখিয়া আসিতে হয়? কিন্তু তুমি ভক্তবৎসলা। আমি চিরকাল তোমার উপাসনা করিয়া আসিতেছি। প্রণমামি! আশীর্ব্বাদ কর দেবি! যেন কোন দিন দশটার পরে সাহেবের টেবিল হইতে হাজিরা বই লইয়া সই করিতে যাইতে না হয়। সাহেবপুঙ্গবের তৎকালীন বিলোল কটাক্ষ যেন আমার উপরে কখন নিপতিত না হয়। এ অসভ্য পল্লীগ্রামে তোমার লাঞ্ছনা ও অবহেলা দেখিয়া আমি মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইয়া আছি জানিবে। প্রসন্ন হও, চিরকাল প্রসন্ন থাকিও। আমার পকেটে থাকিয়া কখনও বিশ্বাসঘাতকের কাজ করিয়া মৃদুগতি হইও না। ভক্তবৎসলে! আমি তোমার জন্য সুবর্ণ-শৃঙ্খল গড়াইতে দিব, কন্যার বিবাহটা একবার কোনগতিকে হইয়া যাউক, সুবর্ণ-শৃঙ্খলের সহিত তোমার যোগ না হইলে লম্বোদর বাঙ্গালির উদরের শোভা বৃদ্ধি হইত কি করিয়া? সময় থাকিলে, ক্ষমতা থাকিলে আর কন্যাবিবাহের দায় স্কন্ধের উপরে না থাকিলে ঘড়ির বিষয়ে আরও কত অতি প্রয়োজনীয় অথচ দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত কবিতা ও প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা দেশের ও মানবজাতির কতপ্রকার উপকার না সাধিত হইতে পারে। কিন্তু আর এখন এসকল গবেষণার সময় কোথায়? অহো! কন্যার বিবাহ দেওয়া কি ঘোর দায়। কয়েক দিনের অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝিয়াছি, এই ঘোর দায়ের জন্য দেশের অনেক উন্নতি আটকাইয়া রহিয়াছে। হয় কন্যা বিবাহ দেওয়া প্রথা উঠিয়া যাউক আর না হয় বিবাহের বাজারে জামাতাবাবাজীদিগের দর কমুক। তাহা না হইলে নিশ্চয় নিশ্চয় জানিবে, বহুমূত্র রোগে দেশ ছারখার হইবে।

উদ্দেশ্য বিষয় বর্ণনা করিতে কিছু বিলম্ব হইল; কিন্তু স্বচক্ষে ঘড়ির অবমাননা দেখিয়া একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকাও ত যায় না।

থাক্ ও সকল কথা। ছুটির প্রথম কয়েক দিন কিছু অসুবিধা

বোধ করিলাম। বোধ হয় মাছগুলাকে ডাঙ্গায় তুলিলে এইরূপই বোধ করে। তার পরে?—তার পরে বেলায় খাওয়া, দ্বিপ্রহরে দীর্ঘনিদ্রা ও জৃম্ভণ, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়ে কর্ম্মিষ্ঠতা বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কিন্তু তবুও বেলা তিনটার পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। সে সময়ে সাথের সাথী, প্রাণের আরামদাতা হুক্কা ভিন্ন আর কাহারও সঙ্গ লাভ করিতে পারিতাম না। অন্ততঃ দুইজন খেলার সঙ্গী পাইলে তাস খেলিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু বেলা তিনটা পল্লীগ্রামের দ্বিপ্রহর, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। বহুধীমানের এ সময়ে নিদ্রার প্রথম সংস্করণই শেষ হয় না। তাঁহারা খেলিবার জন্য সমাগত হইবেন কি করিয়া? সাধারণ ভাবে বলিতে হইলে বলা উচিত, দ্বিপ্রহরের সময় নিদ্রা না যাইয়া তাস পেটা সহরে ফ্যাসান্। গ্রামে রাত্রিকালে খেলার জন্য লণ্ঠনহস্তে দূর দূরান্তর হইতে লোকে সমাগত হয়। সুতরাং গ্রামে খেলার স্পৃহার বা উদ্যমের অভাব স্বীকার করি না, তবে দেশভেদে আচারভেদ হওয়া সম্ভব। চারিটার সময় পাশাখেলা কোন কোন স্থলে প্রচার আছে এবং রবিবারে বা অন্য কোন ছুটির দিনে তৃতীয় প্রহরে কোন কোন বড় লোকের বৈঠকখানায় তাসও চলে বটে কিন্তু বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের পরে স্থির করিয়াছি, এ সকল সংস্কার সহরপ্রবাসীরা নূতন দেশে ফিরিয়া আসিলে তাহাদের মধ্যেই দেখা যায়। ইহা সহরের অনুকরণ মাত্র। আমি যে সময়ে বাড়ী আসিয়াছি, সে সময়ে কোন বড় ছুটি উপলক্ষে প্রবাসীদের গ্রামে ফিরিয়া আসিবার সময় নহে। গ্রামে প্রতি দিন রবিবার সুতরাং এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া সদর দরজায় বসিয়া সর্পগতির মত ঘুরিয়া ফিরিয়া গ্রাম্য গলিগুলি অপ্রশস্তভাবে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেমন গিয়াছে, তাহা মনোযোগের সহিত দেখা ও মধ্যে মধ্যে তামাকু সেবন ভিন্ন তৃতীয় প্রহর কাটাইবার অন্য কোন সদুপায় আবিষ্কার করিতে পারি নাই। কোন কোন দিন মাছ ধরিবার অছিলা করিয়া কয়েক জন যুবককে আমার সঙ্গী করিয়া লইতাম। ক্রমে এরূপ জীবনও বেশ ভাল লাগিয়া আসিতেছিল।

অলস জীবনের এক রূপ মাদক শক্তি আছে বোধ হয়। একবার অভ্যাস হইলে উহার প্রভাব দূর করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার

নহে। সহরে যেমন রৌদ্রের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, গ্রামে সেরূপ নহে। বেলা তিনটার পর সদর দরজায় একখানি টুল পাতিয়া বসিয়া থাকা কষ্টকর ব্যাপার নহে। ছেলের দল পথে কড়ি লইয়া খেলা করিতেছে। আমি টুলে বসিয়া ধুম পান করিতেছি এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদেব খেলার বিষযে অভিমত প্রকাশ করিতেছি। সম্মুখ দিয়া কিছু ইতস্ততঃ করিতে করিতে লাল ও সাদা ছাপযুক্ত একটা কুকুর আমাদিগের হইতে কিছু দুর দিযা চলিয়া যাইল। আজ প্রথম নয়। কয়েকদিন যাবৎ দেখিতেছি, এই কুকুরটা এই সমযে এই স্থান দিযা একই দিক্ হইতে আসে ও একই দিকে চলিযা যায়। তাহার গলায় একখানা কাপড় জড়াইয়া বাঁধা। প্রথম দিন সে আমাকে দেখিযা কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাব পবে যখন বুঝিল যে, এই মানবজাতীয় জীব কেবল আপনার মুখ হইতে প্রভূত ধুমোদ্গারেই ব্যস্ত, লুকাইযা ঢিল তুলিতেছে না, তখন কুকুরপ্রাণে সাহসের সঞ্চাব হইল এবং সম্মুখ দিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া চলিযা যাইল। তাহাতে এমন কিছুই ছিলনা যে, মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে। গ্রামেব ও সহবের প্রত্যেক স্থানেই এমন দেশী কুকুর অনেক দেখিতে পাওযা যায। কযেক দিন দেখিয়া দেখিয়া সে আমার মনের ভাব বুঝিল এবং প্রত্যহ অসঙ্কোচে সম্মুখ দিযা চলিয়া যাইত। কুকুব পুষিবাব বাতিক আমাব কখন ছিল না বরং উহাদিগকে কিছু ভয়ের চক্ষুতে দেখিতাম। কিন্তু প্রত্যহ এক সময়ে একদিক হইতে আসিতে ও এক দিকে যাইতে দেখিয়া আমার কৌতূহল উদীপ্ত হইযা উঠিতেছিল। ভাবিলাম, বালকেরা উহার ইতিহাস অবশ্যই সবিশেষ অবগত আছে। এমন একটা আলোচ্য বিষয় উপেক্ষা করা নীতিবিগর্হিত মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ওটা কাদের কুকুর হে? রোজ এই সময়ে কোথায় যায় আর কোথা হতেই বা আসে? জিজ্ঞাসাটা অবশ্য বিশেষ কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া নহে। সকলেব অপেক্ষা দীর্ঘকায় বালক বুদ্ধিমানের মত উত্তর করিল, "রাস্তার কুকুর। কেউ আবার ওগুলোকে পোষে নাকি?" সেদিন এই পর্য্যন্ত হইয়া ক্ষান্ত।

কত ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে কত বৃহৎ ঘটনার সূত্রপাত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? সেদিন সেই দীর্ঘকায় বালকটির মাথায় উঠিল, "এই

কুকুরটা রোজ এই পথ দিয়ে যাবে কেন? তার এত বড় আস্পর্দ্ধা!" তাহাই বা কে বলিতে পারিত? বালক কাহাকেও কিছু বলে নাই কিন্তু পরদিন বালকের দল সেই স্থানে খেলিতেছিল। বোধ হয় তাহারা কুকুরের আস্পর্দ্ধা দমন করিবার জন্য সে দিন প্রস্তুত হইয়া আসিযাছিল, তাহা না হইলে প্রত্যেকে এক গাছা লাঠি আনিবে কেন? পরদিন যথাসময়ে কুকুর মহাশয় নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে আপনার গন্তব্য পথে দেখা দিবামাত্র বালকের দল খেলা ফেলিয়া লাঠি হাতে তাহাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। হঠাৎ পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদল যে তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বোধ হয় কুকুরবুদ্ধিতে একথাটা শীঘ্র বুঝিতে পারিল না। দুই এক ঘা পৃষ্ঠদেশে পড়িলে তবে বুঝিল। তখন বিকট চীৎকারে আপনার মনোবেদনা বা বালকদের ধৃষ্টতা সকলকে জানাইতে লাগিল। তখনও রৌদ্রের উত্তাপ যথেষ্ট রহিয়াছে বলিয়া বিছানায় শুইয়া আমি নভেল পড়িতেছিলাম। হঠাৎ কুকুরের ডাকে ঔপন্যাসিক রাজত্ব ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলাম। তাহার পরে আবও একবার ডাক শুনিযা সমস্ত কথা বুঝিলাম। এ আর কোন কুকুর নহে। সেই লালসাদা দাগ যুক্ত কুকুরটা। বালকের দল তাহাকে কোন কারণে তাড়না করিতেছে। তৎক্ষণাৎ কটিবন্ধে কাপড় আঁটিতে আঁটিতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, ব্যাপার কি হইয়াছে। তখন কুকুরকে উদ্ধার করাই আমার প্রথম কার্য্য হইল। চারি দিক্ হইতে তাড়না এককালে কমিবামাত্র কুকুর মহাশয় আপনার গন্তব্য পথে দৌড়াইয়া পলাইল। তখন ভাবিলাম, বালক দলের মনোযোগ পূর্ব্ব দিনে তাহার প্রতি আকর্ষণ করিয়া ভাল কায করি নাই। আজ ব্যর্থমনোরথ হইল বটে কিন্তু পুনরায় উহার দর্শন পাইলে আর উহার নিষ্কৃতি নাই। এখন কুকুরটাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যহ আমাকে সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

একটি ক্ষুদ্র ব্যাপারের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইলাম। আমি যখন বালকদলের মধ্যে প্রবেশ করি, তখন কুকুরটা আমার দিকে সকরুণনেত্রে চাহিয়াছিল। সে আমাকে দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, এব্যক্তি শত্রুদলকে দমন করিতে সমর্থ হইবে অথবা আমার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিল। সে যে কি ভাবিয়া চাহিয়াছিল, তাহা আমি ঠিক বুঝি না। কিন্তু তাহার দৃষ্টিপাত আমার করুণা উদ্রেক করিয়াছিল।

আমি এখন একটা কায পাইযাছি। কুকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিযা দরজায় বসিযা থাকি। পর দিন তাহাকে কিছু খাইতে দিলাম। সে অতি ব্যগ্রভাবে খাইতেছিল কিন্তু জনৈক বালককে আসিতে দেখিযা কিছু সঙ্কুচিত হইল। আমি তাহাকে অভয দিলে সে পুনবায আহাব শেষ করিয়া চলিযা যাইল। বালকেব দল আসিল কিন্তু আব আক্রমণেব কোন ইচ্ছা প্রকাশ কবিল না। ববং সকৌতূহলে তাহার আহাবেব ব্যগ্রতা দেখিযা অনেক দিন খাইতে পায নাই বলিতে লাগিল। বাস্তবিকই তখন আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। কেবল আহাবেব আগ্রহ নহে, আকাব দেখিযাও সন্দেহ হয, সে যেখানেই থাকুক্ না কেন, ভাল করিযা খাইতে পায না। আমাব প্রাতাহিক আহাবেব পব যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত বাখিযা দিতাম, কুকুবটাকে খাইতে দিব বলিযা। দেখাদেখি বালকেব দলও তাহাই করিতে লাগিল। বালক-স্বভাবই এই, যাহা দেখে তাহাই শিখে। কুকুব বিড়াল দেখিলে যে মাবিতে যায, সেটা বোধ হয চপলতা বশতঃ, কোন কু-অভিপ্রাযে নহে। বালকেবা অল্পে ছাড়িবে কেন? তাহাবা কুকুবকে ভাল করিযা অতিথি সৎকার না কবিয়া ছাড়িবে না। তাহাবা কাকের ছানা, ইন্দুব প্রভৃতি মারিয়া আনিতে লাগিল, তাহাব রসনাব তৃপ্তির জন্য। কেবল পাতেব ভাত, মাছেব কাঁটা নিমন্ত্রিত কুকুব মহাশযকে খাওযাইযা মনে শান্তি লাভ কবিতে পাবিল না। সুতরাং লালসাদা কুকুরেব এপথে যাওযা বড সুখেব বিষয হইল।

বালকেবা তাহাব নামকবণ করিল,—"লালসাদা।" তাহাকে আব কেহ মাবিবাব চেষ্টা ভুলিযাও কবে না। তাহাব সহিত কত আত্মীযতা কবে, তাহাকে আপনাপন বাড়িতে আট্‌কাইযা প্রতিদিন পরিচর্য্যা কবিতে চাহে। লালসাদা কিন্তু কোথাও আট্‌কাইযা থাকিতে চায না। সে প্রত্যহ একই সমযে একই পথে চলিতে চাহে। যাইবাব সময বাড়ীবাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া যাইতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কাহাবও কাছে বাঁধা থাকিতে তাহার ঘোর আপত্তি আছে। যাহা হউক, বালকের দলে তাহার ইচ্ছা বুঝিয়া চলিতে শিখিযাছে, কিন্তু তাহার বড়ই মনক্ষুণ্ণ হইযাছে যে, একদিন একরাত্রি তিনি কাহাবও বাড়িতে বাস করিতে চাহেন না। এটা যে কুকুরস্বভাবের কোন্ গুণের পরিচাযক, তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আবও একটা বিষয়ে আমা-

দের সন্দেহ আছে। তাহার গলার চারিদিকে এক খানা কাপড়ের টুক্‌রা জড়াইয়া বাঁধা থাকে। প্রথমে ভাবিতাম, উহা বুঝি সহরের বগলস বাঁধার অনুকরণ, যাহাই হউক, উহাতে বুঝায় যে, কুকুরটা প্রভুহীন নহে। কিন্তু তাহার প্রভু কে? আর সে ব্যক্তি কুকুর পুষিয়া তাহাকে খাইতে দেয় না কেন? আমরা খাওয়াইবার ব্যবস্থা না করিলে অনাহারে মারা পড়িত। অথচ কুকুর কাহারও বাড়িতে অনেক আদর যত্ন পাইয়াও থাকিতে চাহেনা কেন? এই সকল আমার এখন নূতন চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বালকদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার অনুগমন করিয়া দেখিয়াছে, সে কাপড়খণ্ডে কি বাঁধা পুঁটলির মত মুখে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া মাঠের উপর দিয়া কোথায় যায়। ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন হঠাৎ সকল রহস্যের ব্যাখ্যা হইল। ঐ দিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পরই লালসাদার পরিচিত স্বর শুনিলাম। অথবা তাহার স্বরেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গ্রীষ্মকাল—জানলা খোলা ছিল। জানালার নীচে সে ডাকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, যেন বড় ব্যস্ত। কুকুরটা ত এত সকালে কোন দিন আসে না। আজ ব্যাপার কি? তাড়াতাড়ি বাহির হইবামাত্র সে আমার কাপড় ধরিয়া টানিল এবং দৌড়িয়া একদিকে চলিল। আবার আমি অগ্রসর হইলাম না দেখিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া আমার কাপড় মুখে ধরিয়া টানিল। বেশ বুঝিলাম, কোন কারণে সে আমাকে একটা বিশেষ দিকে লইয়া যাইতে চাহে। কি আশ্চর্য্য! কুকুরেও ত মানুষের মত অভিপ্রায় জানাইতে চাহে! কৌতূহলী হইয়া তাহার পশ্চাৎ চলিলাম। গ্রাম পার হইয়া মাঠপার হইয়া একদিকে চলিলাম। সে দিকে কোন গ্রাম নাই, লোকালয় নাই। অনেক দূর যাইয়া দেখিলাম, কতকগুলি গাছের ঝোপের ভিতরে একখানি কুঁড়ে ঘর। কুঁড়ে ঘরে এক বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শয়ান। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। পাশে আরও দুইখানি কুঁড়ে ঘর আছে। চাষারা বাস করে ঐ স্থানে।

একজন অপরিচিত লোককে সে স্থানে দেখিয়া প্রতিবেশীরা আসিল। তাহাদিগের নিকট শুনিলাম, ঐ বুড়া চাষার ঐ পালিত কুক্কুর ভিন্ন আর কেহ নাই। এক সময়ে তাহার আত্মীয় স্বজন ছিল। অবস্থাও কিছু ভাল ছিল। ম্যালেরিয়া জ্বরে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে পৃথিবীতে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কুকুর তাহাকে ছাড়িতে পারে

নাই। বৃদ্ধ কিছুকাল হইতে চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরে যাইতে পারিত না। কুক্কুর তাহার খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিত। বৃদ্ধ কাহারও দান লইতে চাহিত না। আপনি কৃষিকার্য্য করিতেও পারিত না। বোধ হয় পূর্ব্বসঞ্চিত কিছু ছিল। আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিতেছে দেখিয়া সেই সঞ্চিত অর্থেই চালাইত। কাহারও নিকট ভিক্ষা করিত না। প্রতিবেশীদেরও সাহায্য চাহিত না। কুকুরের গলায় কাপড় বাঁধা ছিল। সে দোকান হইতে খাদ্য আনিয়া দিত। হাটের দিনে কিছু চাল ডাল আনিয়া দিত। অন্যান্য দিন আপনার খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাহির হইত। না খাইতে পাইয়াও এই চতুষ্পদ জন্তুটা এইরূপে প্রভুভক্তি দেখাইয়াছে। বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে কুকুরটা আমার নিকটে আসিয়া বাস করিতেছে। প্রতিবাসীদের কাহারও নিকটে সে থাকিতে চাহিল না। সে এখন আমার পরিবারস্থ একব্যক্তি। বালকেরা তাহাকে কি করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবে, খুঁজিয়া পায় না। স্বয়ং গৃহিণী তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন করান। বাস্তবিকই আমরা তাহাকে মানুষের মত আত্মীয় বোধ করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—কথিত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ভক্তিযোগ)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে ছোট খাটটীতে বসিয়া আছেন। সমাধিস্থ। ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন,—একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে-

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—লিখিত প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য এক টাকা। কাপড়ে বাঁধাই পাঁচ সিকা। ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীশান্তিরাম ঘোষের নিকট অথবা ১৩।২ গুরু প্রসাদ চৌধুরীর লেনে শ্রীপ্রভাসচন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য।

ছেন। মহিমাচরণ, রাম (দত্ত), মনমোহন, নবাই চৈতন্য, মাষ্টার প্রভৃতি অনেকে বসিয়া আছেন।

আজ দোলযাত্রা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিন, ১৯শে ফাল্গুন, পূর্ণিমা তিথি, রবিবার ১লা মার্চ্চ, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ।

ভক্তেরা একদৃষ্টে দেখিতেছেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। এখন ভাবের পূর্ণমাত্রা। ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন,—

'বাবু, হরিভক্তির কথা'—

মহিমাচরণ। আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুং॥
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাং।
ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তরীঞ্চ॥

নারদপঞ্চরাত্রে এটী আছে। নারদ তপস্যা করছিলেন, এমন সময় দৈববাণী হল, "হরিকে যদি আরাধনা করা যায়, তা হলে তপস্যার কি প্রয়োজন? আর হরিকে যদি না আরাধনা করা হয়, তা হলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? হরি যদি অন্তরে বাহিরে থাকেন, তা হলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? আর হরি যদি অন্তরে বাহিরে না থাকেন, তা হলেই বা তপস্যার প্রয়োজন কি? অতএব হে ব্রহ্মন্, বিরত হও, বৎস, তপস্যার কি প্রয়োজন? জ্ঞানসিন্ধু শঙ্করের কাছে শীঘ্র গমন কর। বৈষ্ণবেরা যে হরিভক্তির কথা বলে গেছেন, সেই সুপক্কা ভক্তি লাভ কর, লাভ কর। এই ভক্তি,—এই ভক্তির দ্বারা ভবনিগড় ছেদন হবে—ভক্তি-কাটারি দিয়ে ছেদন হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। জীবকোটির ভক্তি বৈধী ভক্তি। এত উপচারে পূজা কত্তে হবে, এত জপ কত্তে হবে, এত পুরশ্চারণ কত্তে হবে। এই বৈধীভক্তির পর জ্ঞান। তার পর লয়। এই লয়ের পর আর ফেরে না।

"ঈশ্বরকোটির আলাদা কথা,—যেমন অনুলোম বিলোম। 'নেতি,

'নেতি' করে ছাতে পৌঁছে যখন দেখে, ছাতও যে জিনিষে তৈরি,—ইট, চুন, সুরকি,—সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈরি, তখন কখন ছাতেও থাক্‌তে পারে আবার ওটা নাবাও কর্‌তে পারে।

"শুকদেব সমাধিস্থ ছিলেন। নির্ব্বিকল্প সমাধি—জড় সমাধি। ঠাকুর নারদকে পাঠিয়ে দিলেন,—পরীক্ষিতকে ভাগবত শুনাতে হবে। নারদ দেখ্‌লেন, জড়ের ন্যায় শুকদেব বাহ্যশূন্য—বসে আছেন। তখন বীণার সঙ্গে হরির রূপ চার শ্লোকে বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রথম শ্লোক বল্‌তে বল্‌তে শুকদেবের রোমাঞ্চ হলো। ক্রমে অশ্রু, অন্তরে, হৃদয়মধ্যে চিন্ময় রূপ দর্শন কর্‌তে লাগ্‌লেন। জড় সমাধির পর আবার রূপ দর্শনও হলো। শুকদেব ঈশ্বরকোটি।

"হনুমান্ সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করে রামমূর্ত্তিতে নিষ্ঠা করে থাক্‌লো। চিদ্ঘন আনন্দের মূর্ত্তি—সেই রামমূর্ত্তি।

"প্রহ্লাদ কখন দেখ্‌তেন সোঽহং আবার কখন দাসভাবে থাক্‌তেন।

"নারদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে হরিভক্তি নিয়ে থাক্‌তেন।

"ভক্তি না নিলে কি নিয়ে থাকে? তাই সেব্য সেবক ভাব আশ্রয় কর্ত্তে হয়, তুমি প্রভু আমি দাস। হরিরস আস্বাদন কর্‌বার জন্য। রসরসিকের ভাব—হে ঈশ্বর, তুমি রস, * আমি রসিক।

(ভক্তির আমি।)

"ভক্তির আমি, বিদ্যার আমি, বালকের আমি, এতে দোষ নাই। শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার আমি রেখেছিলেন লোকশিক্ষা দিবার জন্য। বালকের আমির আঁট নাই। বালক গুণাতীত,—কোন গুণের বশ নয়, এই রাগ কল্লে আবার কোথাও কিছু নাই; এই খেলাঘর কল্লে আবার ভুলে গেল; এই খেলুড়েদের ভাল বাস্‌ছে আবার কিছুদিন তাকে না দেখ্‌লে সব ভুলে গেল। বালক সত্ত্ব রজ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।

"তুমি ঠাকুর আমি ভক্ত,—এটা ভক্তের ভাব, ভক্তির আমি। কেন ভক্তির আমি রাখে? তার মানে আছে। আমি ত যাবার নয়, তবে থাক্ শালা দাস আমি, ভক্তের আমি হয়ে।

---

* রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্।

"হাজার বিচার কর, আমি যায় না। আমি রূপ কুম্ভ। ব্রহ্ম যেন সমুদ্র—জলে জল। কুম্ভের ভিতরে বাহিরে জল। জলে জল! তবু কুম্ভ ত আছে। ঐটী ভক্তের আমির স্বরূপ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে, আমি তুমি আছে; তুমি ঠাকুর আমি ভক্ত, তুমি প্রভু আমি দাস এও আছে। হাজার বিচার কর, এ ছাড়্‌বার জো নাই। কুম্ভ না থাক্‌লে সে এক কথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তাঁহার নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসের উপদেশ।]

নরেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। কথা কহিতে কহিতে নীচে মেজেতে আসিয়া বসিলেন। মেজেতে মাতুর পাতা ছিল। এতক্ষণে ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইযাছে। ভক্তেরাও আছেন, বাহিরের লোকও আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। ভাল আছিস্? তুই নাকি গিরীশ ঘোষের ওখানে প্রাযই যাস্?

নরেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, মাঝে মাঝে যাই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের নিকট গিরীশ কয়মাস হইল নূতন আসা যাওয়া করিতেছেন। ঠাকুর বলেন, গিরীশের বিশ্বাস আঁকৃড়ে পাওযা যায় না। যেমন বিশ্বাস তেমনি অনুরাগ। বাড়ীতে ঠাকুরের চিন্তায় সর্ব্বদা মাতোয়ারা হয়ে থাকেন। নরেন্দ্র প্রায় যান; হরিপদ, দেবেন্দ্র ইত্যাদি অনেক ভক্ত তাঁর বাড়ীতে প্রায় যান। ভক্তেরা এলেই গিরীশ তাদের সঙ্গে কেবল ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথাই কন। গিরীশ সংসারে থাকেন, কিন্তু ঠাকুর দেখিতেছেন, নরেন্দ্র সংসারে থাকিবেন না। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুই গিরীশ ঘোষের ওখানে বেশী যাস্।

(ত্যাগ বা সন্ন্যাসের অধিকারী।)

"কিন্তু রসুনের বাটী যত ধোওনা কেন, গন্ধ একটু থাক্‌বেই। ছোক্‌রারা শুদ্ধ আধার; কামিনী কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই; অনেক দিন ধরে কামিনী কাঞ্চন ঘাঁট্‌লে রসুনের গন্ধ হয়।

"যেমন কাকে ঠোক্‌রান আম। ঠাকুরদের দেওয়া যায় না, নিজে-রও সন্দেহ।

নূতন হাঁড়ি আর দৈপাতা হাঁড়ি। দৈপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখ্‌তে ভয় হয়। প্রায় দুধ নষ্ট হয়ে যায়।

"ওরা থাক্‌ আলাদা। যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা দেবকন্যাও লেবে আবার রামকেও লাভ কর্‌বে।

"আর অসুররা নানা ভোগও কচ্ছে আবার নারায়ণকে লাভ কচ্ছে।

নরেন্দ্র। গিরীশ ঘোষ বেশ্যা ছেড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি বড় বেলায় দাম্‌ড়া হয়েছে,—বর্দ্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দাম্‌ড়া গাই গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, একি হলো? এ তো দাম্‌ড়া। তখন গাড়োয়ান বল্লে,—'মশায়, এ বেশী বয়সে দাম্‌ড়া হয়েছিল।' তাই আগেকার সংস্কার যায় নাই।

"এক জায়গায় সন্ন্যাসীরা বসে আছে—একটী স্ত্রীলোক সেই খান দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছে, একজন আড় চোখে চেয়ে দেখ্‌লে। সে তিনটী ছেলে হবার পর সন্ন্যাসী হয়েছিল।

"একটী বাটীতে যদি রসুন গোলা যায়, রসুনের গন্ধ কি যায়? বাবুই গাছে কি আম হয়? হতে পারে সিদ্ধাই তেমন থাক্‌লে বাবুই গাছেও আম হয়। সে সিদ্ধাই কি সকলের হয়?

"সংসারী লোকের অবসর কই? একজন একটী ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল। তার বন্ধু বল্লে,—একটী উত্তম ভাগবতের পণ্ডিত আছে, কিন্তু তার একটু গোল আছে। তার নিজের অনেক চাষ বাস দেখ্‌তে হয়। চারখানা লাঙ্গল, আটটা হেলে গরু। সর্ব্বদা তদারক কর্‌তে হয়। অবসর নাই। যার পণ্ডিতের দরকার, সে বল্লে, আমার এমন ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার নাই, যার অবসর নাই। লাঙ্গল-হেলে-গরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজ্‌ছি না, আমি এমন ভাগবত পণ্ডিত চাই, যে আমাকে ভাগবত শুনাতে পারে।

"এক রাজা রোজ ভাগবত শুন্‌তো। পণ্ডিত পড়া শেষ হলে রাজাকে বল্‌তো,—রাজা, বুঝেছ? রাজাও রোজ বলে,—তুমি আগে বোঝ। পণ্ডিত বাড়ী গিয়ে রোজ ভাবে,—রাজা এমন কথা বলে কেন যে, তুমি আগে বোঝ। লোকটা সাধন ভজন কর্‌তো—ক্রমে চৈতন্য হলো।

তখন দেখ্‌লে যে, হরিপাদপদ্মই সার আর সব মিথ্যা। সংসারে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। কেবল একজনকে পাঠালে রাজাকে বল্‌তে যে,—রাজা, এইবারে বুঝেছি।

"তবে কি এদের ঘৃণা করি? না, ব্রহ্মজ্ঞান তখন আনি। তিনি সব হয়েছেন,—সকলেই নারায়ণ। সব যোনিই মাতৃযোনি, তখন বেশ্যাও সতীলক্ষ্মীতে কোন প্রভেদ দেখি না।

"কি বল্‌বো, সব দেখ্‌ছি কলাইএর ডালের খদ্দের। কামিনী কাঞ্চন ছাড়্‌তে চায় না। লোকে মেয়ে মানুষের রূপে ভুলে যায়, টাকা ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে ভুলে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের রূপদর্শন কর্‌লে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়।

"রাবণকে একজন বলেছিলো, তুমি সব রূপ ধরে সীতার কাছে যাও, রামরূপ ধর না কেন? রাবণ বল্লে,—রামরূপ হৃদয়ে একবার দেখ্‌লে রম্ভা তিলোত্তমা এদের চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রীর কথা ত দূরে থাক্।

"সব কলাইএর ডালের খদ্দের। শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হয় না—এক লক্ষ্য হয় না, নানাদিকে মন থাকে।

"রাখালকে বল্লুম—

(সংসারীর দাসত্ব)

(মনমোহনের প্রতি)। তুমি রাগই কর আর যাই কর—রাখালকে বল্লুম,—ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস্, একথা বরং শুন্‌বো; তবু কারু দাসত্ব করিস্, চাকরী করিস্, এ কথা যেন না শুনি।

"নেপালের একটী মেয়ে এসেছিল। বেশ এস্‌রাজ বাজিয়ে গান কর্‌লে। হরিনাম গান। কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—তোমার বিবাহ হয়েছে? তা বল্লে—আবার কার দাসী হব, এক ভগবানের দাসী আমি।

"কামিনী কাঞ্চনের ভিতরে থেকে কি করে হবে? অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন। একদিকে মেগের দাস, একদিকে টাকার দাস, আর এক দিকে ইংরাজ মনিবের দাস,—তাদের চাকুরি করতে হয়।

"একটী ফকির বনে কুটীর করে থাক্‌তো। তখন আক্‌বর সা দিল্লীর রাজা ছিল। ফকিরটীর কাছে অনেকে আস্‌তো। অতিথিসৎকার করতে তাঁর বড় ইচ্ছা হয়। একদিন ভাব্‌লে যে, টাকা কড়ি না হলে কেমন

করে অতিথি সংকার হয়। তবে যাই একবার আকৃবর সার কাছে। সাধু ফকিরের অবারিত দ্বার। আকৃবর সা তখন নমাজ পড়্ছিলেন, ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বস্লো। দেখ্লে,—আকৃবর সা নমাজের শেষে বল্ছে,—হে আল্লা, ধন দাও, দৌলত দাও, আরো কত কি। এই সময়ে ফকিরটী উঠে নমাজের ঘর থেকে চলে যাবার উদ্যোগ কর্‌তে লাগ্‌লো। আকৃবর সা ইশারা করে বস্‌তে বল্লেন। নমাজ শেষ হলে বাদ্সা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—আপনি এসে বসলেন আবার চলে যাচ্ছেন কেন? ফকির বল্লে,—সে আর মহারাজের শুনে কায নেই, আমি চল্লুম। বাদসা অনেক জিদ করাতে ফকির বল্লে,—আমার ওখানে অতিথি অনেক আসে। তাই কিছু টাকা প্রার্থনা কর্‌তে আপনার কাছে এসেছিলাম। আকৃবর বল্লে, তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন? ফকির বল্লে—যখন দেখ্‌লুম, তুমিও ধন দৌলতের ভিখারী,—তখন মনে কর্‌লুম যে, ভিখারীর কাছে চেয়ে আর কি হবে? যদি চাইতে হয় ত আল্লার কাছে চাইব।

নরেন্দ্র। গিরীশ ঘোষ এখন কেবল এই সব চিন্তাই করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে খুব ভাল। তবে অত গালাগাল, মুখ খারাপ করে কেন? সে অবস্থা আমার নয়। বাজ পড়্‌লে ঘরের মোটা জিনিষ তত নড়ে না, কিন্তু সার্সি ঘট্ ঘট্ করে। আমার সে অবস্থা নয়। সত্ত্বগুণের অবস্থায় হৈ চৈ সহ্য হয় না। হৃদে তাই চলে গেল, মা রাখ্লেন না। শেষাশেষী বড় বাড়িয়েছিল। আমায় গালাগালি দিত, হাঁক ডাক কর্‌তো।

(নরেন্দ্রের প্রতি)। "গিরীশ ঘোষ যা বলে, তোর সঙ্গে কি মিল্‌লো?

নরেন্দ্র। আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলেন, তাঁর অবতার বলে বিশ্বাস। আমি আর কিছু বল্‌লুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু খুব বিশ্বাস! দেখেছিস?

ভক্তেরা সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন, ঠাকুর নীচেই মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। কাছে মাষ্টার, সম্মুখে নরেন্দ্র, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া রহিলেন, নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্রকে বলিলেন, বাবা, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। বলিতে বলিতে ভাবপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। সেই করুণামাখা সস্নেহ দৃষ্টি, তাহার সঙ্গে ভাবোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন,—

গান।

কথা বল্‌তে ডরাই, না বল্‌লেও ডরাই।
মনে সন্ধ হয় পাছে তোমাধনে হারাই হারাই॥
আমরা জানি যে মন্‌তোর, দিব তোকে সেই মন্‌তোর।
এখন মন তোর, আমরা যে মন্ত্রে বিপদে তরি তরাই॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেন ভয় পাইয়াছেন, বুঝি নরেন্দ্র আর কাহারও হইল, আমার বুঝি হল না।

নরেন্দ্র অশ্রুপূর্ণলোচনে চাহিয়া রহিলেন।

বাহিরের একটী লোক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও কাছে বসিয়াছেন। তিনি সমস্ত দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন,—

মহাশয়, কামিনী কাঞ্চন যদি ত্যাগ কর্‌তে হবে, তবে গৃহস্থ কি কর্‌বে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা তুমি কর না। আমাদের অমনি একটা কথা হয়ে গেল।

(গৃহস্থের প্রতি অভয় দান ও উত্তেজনা।)

মহিমাচরণ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, মুখে কথাটী নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। এগিয়ে পড়। আরও আগে যাও, চন্দন কাট পাবে; আরও আগে যাও, রূপার খনি পাবে, আরও এগিয়ে যাও, সোণার খনি পাবে, আরও এগিয়ে যাও, হীরে মাণিক পাবে। এগিয়ে পড়!

মহিমা। আজ্ঞে, টেনে রাখে যে,—এগুতে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কেন, লাগাম কাট, তাঁর নামের গুণে কাট। কালীনামে কালপাশ কাটে।

* * * * *

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর সংসারে বড় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার উপর দিয়া অনেক ঝাল যাইতেছে। ঠাকুর মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন। ঠাকুর বলিলেন,—

তুই কি চিকিৎসক হয়েছিস্?

'শতমারী ভবেদ্বৈদ্যঃ।
সহস্রমারী চিকিৎসকঃ॥' (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর কি বলিতেছেন, নরেন্দ্রের এই বয়সে অনেক দেখাশুনা হইল, সুখ দুঃখের সঙ্গে অনেক পরিচয় হইল?

নরেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(শ্রীশ্রীদোলযাত্রা ও ভক্তসঙ্গে আনন্দ।)

নবাই চৈতন্য গান গাইতেছেন। ভক্তেরা সকলেই বসিয়া আছেন। ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ উঠিলেন। ঘরের বাহিরে গেলেন। ভক্তেরা সকলে বসিয়া রহিলেন, গান চলিতে লাগিল।

মাষ্টার ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া কালী-ঘরের দিকে যাইতেছেন। রাধাকান্তের মন্দিরে আগে প্রবেশ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহার প্রণাম দেখিয়া মাষ্টারও প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের সম্মুখের থালায় আবির ছিল। আজ শ্রীশ্রীদোলযাত্রা—ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহা ভুলেন নাই। থালার ফাগ লইয়া শ্রীশ্রীরাধাশ্যামকে দিলেন, আবার প্রণাম করিলেন।

এইবার কালীঘরে যাইতেছেন। প্রথম সাতটী ধাপ ছাড়াইয়া চাতালে দাঁড়াইলেন। মাকে দর্শন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মাকে আবির দিলেন। প্রণাম করিয়া কালীঘর হইতে চলিয়া আসিতেছেন। কালীঘরের সম্মুখের চাতালে দাঁড়াইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন,—বাবুরামকে আন্‌লে না কেন?

ঠাকুর আবার পাকা উঠান দিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও আর একজন আবিরের থালা হাতে করিয়া আসিতেছেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া সব পটকে ফাগ দিলেন—দু একটী পট ছাড়া—নিজের ফটোগ্রাফ ও যীশু খ্রীষ্টের ছবি। এইবার বারাণ্ডায় আসিলেন। নরেন্দ্র ঘরে ঢুকিতে বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। কোন কোন ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের গায়ে ফাগ দিলেন। ঘরে ঢুকিতেছেন, মাষ্টার সঙ্গে আসিতেছেন, তিনিও আবির প্রসাদ পাইলেন।

ঘরে প্রবেশ করিলেন। সব ভক্তদের গায়ে আবির দিলেন। সকলেই প্রণাম করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ন হইল। ভক্তেরা এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুর মাষ্টারের সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছেন। কাছে কেহ নাই। ছোকরা ভক্তদের কথা কহিতেছেন। বল্‌ছেন,—"আচ্ছা, সব্বাই বলে বেশ ধ্যান হয়, পল্টুর ধ্যান হয় না কেন?"

"নরেন্দ্রকে তোমার কি রকম মনে হয়? বেশ সরল, তবে সংসারের অনেক তাল পড়েছে, তাই একটু চাপা ও থাক্‌বে না।

ঠাকুর মাঝে মাঝে বারাণ্ডায় উঠিয়া যাইতেছেন; নরেন্দ্র একজন বেদান্ত-বাদীর সঙ্গে বিচার কর্‌ছেন।

ক্রমে ভক্তেরা আবার ঘরে আসিয়া জুটিতেছেন।

মহিমাচরণকে স্তব পাঠ করিতে বলিলেন। তিনি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে স্তব বলিতে লাগিলেন।

হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং।
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্॥
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপং।
সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। ৩য় উল্লাস। ৫০ শ্লোক।

(গৃহস্থের প্রতি অভয়।)

আরও দু একটী স্তবের পর মহিমাচরণ শঙ্করাচার্য্যের স্তব বলিতে লাগিলেন। তাহাতে সংসারকূপের, সংসারগহনের কথা আছে। মহিমাচরণ সংসারী ভক্ত।

স্তবটী এই—

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে, স্থাণো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতিভয়সূদন মামনাথং, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
হে পার্ব্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে, ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরিশজাপ।
হে বামদেব ভবরুদ্র পিনাকপাণে, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব, গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ, বীরেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥

শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো, হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ।
ভস্মাঙ্গরাগনৃকপালকলাপমাল, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে, মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ, বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ।
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
গৌরীবিলাসভুবনায় মহেশ্বরায়, পঞ্চাননায় শরণাগতকল্পকায়;
শর্ব্বায় সর্ব্বজগতামধিপায় তস্মৈ, দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। সংসারকূপ কেন বল? ও প্রথম প্রথম বল্‌তে হয়। তাঁকে ধর্‌লে আর ভয় কি? তখন——

এই সংসার মজার কুটি।
আমি খাই দাই আর মজা লুটি॥
জনকরাজা মহাতেজা তার কিসে ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।

"কি ভয়? তাঁকে ধর। কাঁটা বন হলেই বা। জুতো পায় দিয়ে কাঁটা বনে চলে যাও।

"কিসের ভয়? যে বুড়ী ছোঁয়, সে কি আর চোর হয়?

"জনক রাজা দুখানা তলোয়ার ঘোরাত। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্ম্মের। পাকা খেলোয়াড়ের কিছু ভয় নাই।

এইরূপ ঈশ্বরীয় কথা চলিতে লাগিল।

ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিয়া আছেন, খাটের পাশে মাষ্টার বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ও যা বল্লে, তাইতে টেনে রেখেছে।

ঠাকুর মহিমাচরণের কথা বলিতেছেন ও তাঁহার কথিত ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক শ্লোকের কথা।

নবাই চৈতন্য ও অন্যান্য ভক্তেরা আবার গাহিতে লাগিলেন। এবার ঠাকুর যোগদান করিলেন আর ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর বলিলেন, এই কাজ হলো, আর সব মিথ্যে। প্রেম ভক্তি বস্তু আর সব অবস্তু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(গুহ্য কথা।)

বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর পঞ্চবটীতে গিয়াছেন। মাষ্টারকে বিনোদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিনোদ মাষ্টারের স্কুলে পড়িতেন। বিনোদের ঈশ্বর চিন্তা করে মাঝে মাঝে ভাবাবস্থা হয়। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাকে ভালবাসেন।

এইবারে ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিতেছেন। বকুলতলার ঘাটের কাছে আসিয়া বলিলেন,—এই যে কেউ কেউ অবতার বল্‌ছে, তোমার কি বোধ হয়?

কথা কহিতে কহিতে ঘরে আসিয়া পড়িলেন। চটি জুতা খুলিয়া ছোট খাটটীতে বসিলেন। খাটের পূর্ব্বদিকের পাশে এক খানি পাপশ আছে। মাষ্টার তাহার উপর বসিয়া কথা কহিতেছেন। ঠাকুর ঐ কথা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা একটু দূরে বসিয়াছিলেন। তাঁহারা এ সকল কথা কিছু বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি কি বল?

মাষ্টার। আজ্ঞে আমারও তাই মনে হয়। যেমন চৈতন্যদেব ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণ, না অংশ, না কলা? ওজন বল না।

মাষ্টার। আজ্ঞে, ওজন বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি। তবে তাঁর শক্তি অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি ত আছেনই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, চৈতন্যদেব শক্তি চেয়েছিলেন।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরেই বলিলেন,—কিন্তু ষড়্‌ভুজ?

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, চৈতন্যদেব ষড়্‌ভুজ হয়েছিলেন—ভক্তেরা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর—একথা উল্লেখ কেন করিলেন?

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তর্ক বিচার।)

ভক্তেরা অদূরে ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন। রাম (দত্ত) সবে অসুখ থেকে সেরে এসেছেন, তিনিও ঘোরতর তর্ক কর্‌ছেন।

ঠাকুর দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আমার এ সব বিচার ভাল লাগে না ঃ (রামের প্রতি)। থাম।—তোমার একে অসুখ! আচ্ছা, আস্তে আস্তে।

(মাষ্টারের প্রতি)। "আমার এ সব ভাল লাগে না' আমি কাঁদ্‌তুম আর বল্‌তুম, মা, এ বল্‌ছে এই এই, ও বল্‌ছে আর এক রকম ঃ কোন্‌টা সত্য তুই আমায় বলে দে!

আত্মস্পৃহা।

ওহে তুমি দেহবাসী রহস্য-নিলয়,
কিবা মায়া-মন্ত্র জান, কে তুমি, কি তুমি,
দিবে কি বলিয়া? ঘুচাবে কি তুমি এই
জন্মজাত এ আমার অজ্ঞান-তিমির?
ওহে অপ্রকাশ, ওহে চির-স্বপ্রকাশ,
কি উদ্দেশ্যে প্রবেশিয়া এ দেহ-নিবাসে
কি কার্য্য সাধন তরে এলে ধরণীতে
দিবে কি বলিয়া? ঘুচাবে কি অন্ধকার?

মায়ের সন্তান প্রতি কেন এত প্রীতি?
এত আত্মবিসর্জ্জন কেন বা তাঁহার?
দেহবাসী আত্মা ওহে মহান্ পুরুষ,
সে শুধু তোমারি প্রতি প্রীতির লাগিয়া।
কেন ভালবাসে সতী প্রাণপতি তার?
কেবল আকাঙ্ক্ষা তার পতির চরণ?
সে শুধু নিবৃত্তি তরে তব কামনায়।
কেন ভালবাসে পতি প্রেয়সী তাহার?
কেন রূপমোহ, কেন বিষয়ের তৃষা?
নহে নহে সে তো রূপমোহ অর্থতৃষা;
সে শুধু তোমারি তৃষ্ণা পুরাবার তরে
ক্ষণিক কল্পনামাত্র মুগ্ধ মানবের।

এই যে সংসারে নিত্য পৈশাচিক ভাব
হেরে এ নয়ন, বল সে কাহার তরে?
কি হেতু করিছে হত্যা পুত্র পিতৃদেবে?
জননী সন্তানে কেন করিছে নিধন?
পুরুষ করিছে কেন পত্নীর পীড়ন?
রমণী বিমুখী কেন স্বামীতে আপন?
কি লালসা রক্তভৃষা উঠিছে সংসারে
"দাও দাও মোরে দাও" শুধু এই রব
হাহাধ্বনি প্রতিধ্বনি উঠে দিকে দিকে
সে কাহার তরে? কার এ রক্তপিপাসা?
কার তৃষ্ণা পুরাইতে মুগ্ধ জীবগণ
করিতেছে নরমেধ যজ্ঞ আয়োজন?
হে রহস্যাকর, ওহে দেহগৃহবাসী,
তুমি সে রাক্ষসী বৃত্তি, তুমি সে রাক্ষস।

ওই যে জ্বলিছে গৃহ ধু ধু ধু ধু করি
লহ লহ উঠিতেছে অনলের শিখা
কে রমণী তুচ্ছ করি জীবনের আশা
ঝাঁপ দিল হের ওই অনল-সাগরে
সন্তান রক্ষার লাগি? পুনঃ দেখ চেয়ে
জলমগ্ন তরীখানি, বিপন্ন আরোহী
কে যুবক আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করি সেই
তরঙ্গসঙ্কুলা ভীমা পদ্মার হৃদয়ে
ঝাঁপ দিল রক্ষিবারে আর্ত্তের জীবন?
ক্রোরপতি মহারাজা সর্ব্বস্ব বিলায়ে
দরিদ্রেরে হাস্যমুখে যেতেছেন বনে।
সন্তান পিতার লাগি দিতেছে জীবন।
মৃত পতি ধরি সতী হৃদয় মাঝারে
অনলে দিতেছে ঝাঁপ। এই চারু দৃশ্য
কে দেখালে, কে আনিল মরতে স্বরগ?

স্নেহগৃহবাসী ওহে রহস্য-আকর,
তুমিই সে দেবমূর্ত্তি, তুমি সে দেবতা।

চির প্রজ্জলিত বহ্নিসম এ হৃদয়ে,
জ্বলিতেছে কিবা আনি দিব উপহার,
জন্মাবধি জীব চিরমগ্ন সে চিন্তায়।
প্রেম দিয়া প্রীতি দিয়া স্নেহসুখ দিয়া
উত্তপ্ত শোণিত দিয়া হৃৎ-পিণ্ড দিয়া
চিরদিন পূজা করি চরণ তোমার
কিসে তৃপ্ত হবে হায়, হা অন্ধ মানব!
কোথা তৃপ্তি! কোথা শান্তি! শুধু হাহারব!
নিতি নিতি নব আশা নবীন বাসনা,
নিতি নবস্পৃহা নিতি নূতন কল্পনা,
কোথা তৃপ্তি? কোথা শান্তি? হায় বৃথা শুধু;
জুড়াল না মিটিল না আত্মার পিপাসা।

জুড়াইব কিসে তোমা, কিসে তৃপ্তি পাবে?
এতদিনে নাহি পেনু পরিচয় যার
জানিব কেমন করি বাসনা তোমার?
কেমনে জানিব বল কি যে তুমি চাও
অবোধ শিশুর মত বাড়াইয়া কর
কোন্ গগনের চাঁদ ধরিবার আশে
যত কিছু আনি দিই চরণে তোমার
বারেক আঘ্রাণ করি ফেলে দাও দূরে?

বল হে করুণা করি বাসনা তোমার,
কিসে তব তৃপ্তি হবে দাও পরিচয়,
বারেক আলাপ কর আত্মীয়ের মত,
সন্ধান বলিয়া দাও কোথা গেলে পাব
তোমার সে কাম্য বস্তু সাধনার ধন!

পার্ব্বতীদেবীর মন্দিরে।

অদূরে চিরতুষারাবগুণ্ঠিতা হিমাদ্রিশৃঙ্গ নন্দাদেবী, অস্তগমনোন্মুখ দিনকরের কোমল রশ্মিচুম্বনে আরক্তগ্রীবা। পার্ব্বতীদেবীর মন্দিরের সান্ধ্যারাত্রিক শঙ্খধ্বনি হিমালয়ের শিখর হইতে শিখরান্তর পূত করিয়া দেবীপট্ট গ্রামে প্রতিধ্বনিত হইল। পাহাড়ী বালকগণ "জয় পার্ব্বতী মায়িকী জয়" শব্দে করতালিসহ নৃত্য করিতে করিতে মন্দিরাভিমুখে মস্তক ঈষৎ নত করিয়া মার শ্রীচরণে বালক-সহজ অতি পবিত্র ভক্তিধারা ঢালিয়া দিতেছে।

ব্রহ্মচারী শঙ্করনাথ ভিক্ষাদ্বারা যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ করিয়া এ মন্দির নির্ম্মিত করেন। সে আজ দশ বৎসর। এত দিন তিনি মন্দির সমীপস্থ পর্ণকুটীর আশ্রয় করিয়া অতিযত্ন সহকারে স্বপ্রতিষ্ঠিত পার্ব্বতীদেবীর সেবা করিয়া আসিতেছেন। আশা,—একদিন জগজ্জননীকে সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় শ্রীপদরাজীবযুগলে দেহ মন প্রাণ স্বীয় যথাসর্ব্বস্ব অঞ্জলি দানে কৃতকৃতার্থ হন।

'প্রতিমা প্রস্তরময়ী,' এ চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও মনে উঠিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সাবধান হইয়া 'মা চিন্ময়ী' বলিয়া মন নিরস্ত করিতেন। প্রত্যুষ হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত আরতি, পূজা, ভোগ ইত্যাদি বহুবিধ সেবাকার্য্যতৎপর ব্রহ্মচারীর হিমালয়ে একান্ত বাস আরোপিতচৈতন্যবুদ্ধি প্রতিমার সহবাসে অনেকান্ত হইত।

কয়েক দিন শঙ্করনাথের কি যেন একটা মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আরতির পর মাকে প্রণাম করিতে আজ তাঁর বিস্মৃতি কেন? ভুবনমোহিনীর বিমোহন রূপদর্শনে তিনি বিমুগ্ধ? না—তাঁহার ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু; এ কি কোন আন্তরিক বিষাদতাপের বহির্বিকাশ?

মন খেয়াল সত্য মানবে আর কত দিন? দশ বৎসরের ভক্তি, ব্যাকুলতা এখনও অফল; কখনও কি তার সফলতা হইবে? দশ বৎসর প্রস্তরে চেতনত্ব আরোপণ সত্ত্বেও প্রস্তরের জড়ত্ব জড়ত্বই রহিল; কখনও কি এ জড়ে চৈতন্য বিকাশ পাবে? মনের এ দুর্নিবার সন্দেহে শঙ্করনাথ মর্ম্মব্যথিত। প্রবল সন্দেহস্রোতে তাঁর এত দিনের বিশ্বাস, ভক্তি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।

রাত্রে দেবীর সেবা বন্ধ থাকিল। শঙ্করনাথ মন্দিরের কপাট রুদ্ধ করিয়া কুটীরে শয়ন করিলেন। মনকে কত বুঝাইতে লাগিলেন। কত মহাপুরুষের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন, যাঁহারা প্রতিমায় চিন্ময়ী প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি কেন দেখিলেন না? তাঁহার সেবায় শ্রদ্ধার ত্রুটি আছে? তাঁহার ক্রন্দনে কি সরলতার অভাব? না, যাহারা প্রতিমায় চৈতন্য দেখিয়াছে, তাহারা বিকৃতমস্তিষ্ক? শঙ্করনাথের নিদ্রা নাই।

প্রভাত হইল। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। চঞ্চল মনে দেবীপূজা অসত্যের পূজা; শঙ্করনাথ মন স্থির না হইলে পূজা করিবেন না।

সায়ংকাল আগতপ্রায়। "দশ বৎসর জীবন আকাশকুসুম লাভ চেষ্টায় কাটিয়া গেল। যদি গিয়া থাকে, আরও দশ বৎসর যাক্; শেষ না দেখিয়া ছাড়িব না।" শঙ্করনাথ মন্দিরের কপাট খুলিতে উদ্যত হইলেন। "না, মাকে পরীক্ষা করিব। সারাদিন আমি উপবাসী, সংশয়তাড়নে অস্থির। দেখি, মার প্রাণে সন্তানের দুঃখ প্রতিঘাত করে কি না।"

দেবীপট্ট-পল্লীবাসী বালকবৃন্দ মন্দিরচত্বোপরি ন্যস্তস্থিরদৃষ্টি, আরতি-শঙ্খধ্বনি প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব। সে ধ্বনি নাই; বালকবৃন্দের জয়ধ্বনি, করতালি, নৃত্য, প্রণাম সবই রহিল।

এ রাত্রেও শঙ্করনাথ অনিদ্রিত। প্রাণের আরাধ্য সত্যে অবিশ্বাসরূপ আশীবিষ যাঁহাকে কভু দংশন করিয়াছে, তিনিই শঙ্করনাথের যাতনা বুঝিতে সক্ষম।

পররাত্র পূর্ণিমা তিথি। নিশানাথের কিরণহাস্যে বসুমতী হাস্যময়ী। হৃদয়ের অমাবস্যা কি সে কিরণ দূর করিতে পারে! শঙ্করনাথ তীক্ষ্ণ-ছুরিকা হস্তে পাষাণময়ী দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। "মা, সত্য যদি তুমি, দেখা দেও; নহিলে অভাগা হৃদয়রুধিরে তোমায় শেষ পাদ্য প্রদান করিবে।"

সহসা স্নিগ্ধকর জ্যোতিতে মন্দির ভাসিয়া উঠিল। বাহ্যজ্ঞানহারা শঙ্করনাথ তাহাতে নিমগ্ন। দূরে কর্কশস্বরে কে যেন বলিতেছে, "বালক, যিনি অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের আধার, যাঁহার মহিমাসাগরে আদ্যন্তরহিত বিশ্ব বারিবিন্দুসম, যাঁহাকে লাভ করিলে অন্য কিছুই লভ্য থাকে না, মাত্র দশ বৎসরের চেষ্টা সে পরমপদ লাভে বিফল হইয়াছে বলিয়া তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি! কোটী কোটী যুগ যাঁহার নিমেষ কাল মাত্র, তল্লাভ-

চেষ্টা কোটী বৎসর বিফল হইলেও ধৈর্য্যচ্যুতির ন্যায্যতা কোথায়? আত্ম-হত্যা—বাতুল, বিশ্বপ্রলয় যাঁহার ক্রীড়া, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পিপীলিকার মৃত্যুতে তিনি কি বিচলিত? সেবা—যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, তাঁহার কিসের অভাব? সেবক মহামাতৃসেবায় নিজেই ধন্য, মার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সেবা করেছো, মার প্রয়োজনবুদ্ধিতে। অনন্ত মাকে সান্ত করেছো, দেবীজ্ঞানে পিশাচী পূজা করো নি? পিশাচীপূজকের দৃষ্টি দেবীদর্শনে অসমর্থ। যাও, এই দণ্ডে—বিশ্ববাসী মায়ের ছেলে—তাদের সেবা কর; শরীর মন প্রাণ এক করে, সর্ব্বাধার মায়ের অঙ্গে তারা, এ দৃঢ় বুদ্ধি-যোগে সেবা কর, তাতে দৃষ্টি বিমল হবে, তখন তুমি মার দর্শনে অধিকারী।"

ক্রমে শঙ্করনাথের বাহ্যসংজ্ঞা আসিল। দেখিলেন, তিনি ভূপতিত; মস্তক পার্ব্বতীদেবীর চরণোপরি। দেবীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কম্পিতকলেবরে মন্দির ত্যাগ করিলেন।

* * * * *

চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এত কাল তিনি দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, দরিদ্র ধনী মূর্খ জ্ঞানী নির্ব্বিশেষে জগজ্জনের কায়মনোবাক্যে সেবা করিতেন। যেখানে যাইতেন, সংসারদুঃখতাপিত নরনারী পরমাত্মীয় স্বরূপ তাঁহার সঙ্গে—পরমা শান্তি লাভ করিত। জরাগ্রস্ত এখন তাঁর বয়স অশীতি বৎসর। শেষ দিন সন্নিকট বুঝিয়া আদরের পার্ব্বতীদেবী দর্শনে তিনি বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন।

যে শিখরে পার্ব্বতীদেবীর মন্দির, তাহার নিম্নে নাতিপ্রশস্ত তটিনী প্রবাহিতা। শঙ্করনাথ ফিরিয়া আসিয়াছেন; নদীতে স্নান করিলেন। ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠিলেন। দেখিলেন, মন্দির ভগ্নাবশিষ্ট, চতুর্দ্দিকে জঙ্গল, বন্য পশুর আবাস। কৃচ্ছ্রসহকারে লতাগুল্ম কণ্টক বনের মধ্য দিয়া মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভিতরে প্রবেশ করিলেন—প্রতিমা বহুখণ্ডে বিভক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। আর উঠিলেন না।

যোগদৃষ্টি থাকিলে দেখিতাম,—শঙ্করনাথ চিরাভিলষিত শ্রীপদে সমাধিস্থ।

"পর্ব্বতবাসী"।

নূতন জাপান।

(স্বামী সদানন্দ)

হংক এর কথা আপনাকে পূর্ব্বে লিখিছি। কলিকাতা হতে হংকং পর্য্যন্ত আপকার কোম্পানির ষ্টিম জাহাজ যাতায়াত করে। হংকংএ জাহাজ বদল হল। যে জাহাজে চড়িলাম, তাহার মাস্তলে জাপানি নিশান। বড় জাহাজ, মাল ও যাত্রী বোঝাই। ষ্টিম জাহাজের নাম আকি মারু, খোদ জাপানি, নিপন ইউসেন কেইসা নামে জাপানি জাহাজওয়ালারা ইহার মালিক। এখানি তাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জাহাজ। জাপানের মেল (Mail) ইহারাই লইয়া যায়। এই কোম্পানির ষ্টিম ও পাল জাহাজ চীন, ফিলিপাইন, বোম্বাই, ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করে। জাহাজের অফিসার—কাপ্তেন, মালিম ও ইঞ্জিনিয়ার ইউরোপীয়, অন্যান্য কর্ম্মচারী ও খালাসী জাপানি। কাপ্তেন সাহেব জাতে ডাচ (Dutch), জাপানি ভাষায় কথা কন, অনেক কাল জাপানের চাকরি করছেন। জাপানের অনেক বড় জাহাজে এই রকম বিদেশী কাপ্তেন ও ইঞ্জিনিয়ার আছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের না ছিল একখানি ষ্টিম জাহাজ বা পাল জাহাজ, না ছিল দূর সমুদ্রে সদাগরী। সামান্য বাণিজ্য ব্যাপার দেশী জঙ্কের সাহায্যে চীন ও কোরিয়ার সঙ্গে চলত। জঙ্কের গঠন ও আকৃতি সমুদ্রযাত্রার একদম উপযোগী নয়। আমাদের দেশের মালদ্বীপি ডুডির মত তীরের নিকটে চলাচল করতে পারে। এখনো প্রায় বিশ হাজার জঙ্ক এইরূপ কাজে নিযুক্ত আছে। ১৮৭০ সালে জাপানে বিলাতি গঠনের ৩৫ খানি ষ্টিম ও ১১ খানি পাল জাহাজ ছিল। অধিকাংশই ইংলণ্ড ও আমেরিকার কাছে কেনা অতি সামান্য সংখ্যা জাপানে নির্ম্মিত হয়েছিল। এই সব নূতন ধরণের জাহাজ দেশীয় লোকে চালাতে জানত না বলে, বিদেশী লোকের হাতে প্রথমে চালাবার ভার দিতে হয়েছিল। তার পর জাপানি গবর্ণমেণ্ট নৌবিদ্যালয় স্থাপন করে খালাসি থেকে কাপ্তিনী পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ শিক্ষা দিতে লাগল। নৌবিদ্যালয়ের শিক্ষায় পারদর্শী হলে কাজ করবার লাইসেন্স পায়। তা না হলে জাহাজি কাজে ভর্ত্তি হবার যো নাই। দেশী

বিদেশী সকল লোকেই এখানে শিক্ষা পেতে পারে। ১৯০১ সালে প্রায় পনের হাজার জাপানি ও তিনশত জন ইউরোপীয়, জাপানি জাহাজে অফিসারী কাজ করিত। বিদেশী অফিসারের সংখ্যা এখন দিন দিন কম হয়ে আসছে। প্রথমে ষ্টিমার ও পাল জাহাজ জাপানিরা নির্ম্মাণ করতে পারত না, কিনে চালাত। এখন বড় ষ্টিমার ছাড়া আর সমস্তই জাপানে তৈয়ারী হচ্ছে। চৌদ্দশত ষ্টিম ও চার হাজার পাল জাহাজ এখন জাপানি নিশান উড়াইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করচে। সম্প্রতি ষ্টিল তৈয়ারী করবার কারখানা স্থাপন হওয়াতে, বড় বড় ষ্টিমার ও যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করবার সুবিধা হয়েছে।

একটি জাপানির সঙ্গে আমাদের আলাপ হল। ইনি জাপানের সিবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কলেজের ছুটিতে ফিলিপাইন বেড়াতে গিয়াছিলেন ; এখন জাপান ফিরে যাচ্চেন। ছেলেটি একটু ইংরাজি জানে, ইংরাজি শিখ্‌বার খুব ইচ্ছা ; কথা কবার সুবিধা হবে বলে আমাদের সঙ্গী হলেন। জাপান দেখ্‌তে যাচ্চি শুনে দেশের সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা হতে লাগ্‌ল। হংকং ছাড়্‌বার তিন দিন পরে আমাদের জাহাজ ইয়াংসি নদীর মোহানার ভিতর সাংহাই বন্দরে উপস্থিত হল। আশী মাইল দূর থেকে দেখা গেল, নদীর ঘোলা জল, নীল সমুদ্রে এসে পড়্‌ছে। ঠিক গঙ্গাসাগরসঙ্গম। সাংহাই ইয়াংসি নদীর মোহানা হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল উপরে। জাহাজ থেকে দেখা যেতে লাগ্‌ল, চারিদিকে বিস্তৃত চড়া, চীনে-চাষি লোকে চাষ বাস করছে। চীনের অনেক জঙ্গি জাহাজও এই খানে রয়েছে। সাংহাইতে ব্রিটিস, ফরাসী, জর্ম্মান প্রভৃতি কনসলেরা (Conusls) আছেন ; তাঁরা মিলে মিশে যে আইন করেন, তাহাই এখানে চলে। প্রত্যেক কন্‌সলের অধীনে স্বতন্ত্র পোষ্ট আফিস ও বিচারালয় আছে। জাহাজ থেকে নেমে আমরা বেড়াতে বেরুলাম ; জাপানি বন্ধুটিও আমাদের সঙ্গে। সাংহাই বড় সহর, নানাবিধ ব্যবসার স্থান। এখনো শিখ পল্টন এখানে রয়েছে কিন্তু হংকং-এর অপেক্ষা সংখ্যা কম। আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমানও অনেক রয়েছে ; সিন্ধি (Sindh) সদাগরেরা ইহাদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন। আর একটি জাপানির সঙ্গে পথে দেখা হল। ইনি আমাদের জাপানি সঙ্গীটির বন্ধু, চীনে বেড়াতে এসেছিলেন। আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ

করে তাঁর হোটেলে নিয়ে গেলেন। হোটেলটি জাপানি। পরিচারিকা প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীলোক, বিচিত্রবেশধারিণী, সহাস্যবদনা, বিনীত, ভদ্র ও সুরুচিসম্পন্না। প্রবেশ মাত্র মাথা নিচু করে অভিবাদন করলে। এইটি জাপানি শিষ্টাচার। কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি ইতর কি ভদ্র, পরিচিত বা অপরিচিত লোকের সঙ্গে কার্য্যগতিকে দেখা হলেই এইরূপ অভিবাদন করে থাকে। হোটেলের ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজান। শ্রান্তি দূর হলে তার পর জল খাবার দিয়ে গেল। একটী কাটের রেকাবীতে কতকগুলি রং করা কেক ও খান কত পাতলা কাগজ ভাঁজ করা। পরিবেশনকারিণী কাগজগুলি খুলে টেবিলে পেতে দিয়ে কেকগুলি ফুলের মত করে সাজিয়ে দিলে। কার সামনে নীলফুল কার বা লাল ইত্যাদি। কেক খেয়ে বোধ হল যেন খই খাচ্চি। আহারের সময় আর এক ঘরে নিয়ে গেল। লম্বা টেবিলের চারি দিকে চেয়ার পাতা। টেবিলের উপর আর এক খানি করে কাটের ছোট চৌকি। তাতে কতক গুলি বাটি সাজান। একটীতে ভাত, একটীতে মাছের ঝোল, এক খানি রেকাবীতে মাচ পোড়া, একটীতে ডালের ঝুরি ভাজার মত চিংড়ি দিয়ে ঝোল, মুলোর চাটনি আর কাঁটাচামচের বদলে, দুটি কাটি, ইহাই জাপানি আহার। সাধারণ জাপানীরা কোনরূপ মাংস আহার করে না। ব্যঞ্জনে মসলা নাই সুতরাং আমাদের দেশের লোকের আস্বাদনে ইহা বিস্বাদ। অতিথি সংকার ও সদালাপ শেষ হলে আমরা জাহাজে ফিরিয়া আসিলাম। সাংহাই পরিত্যাগ করিয়া তিন দিনের পর আমাদের জাহাজ জাপানে পৌঁছিল।

চারটি বড় দ্বীপ লইয়া জাপান। উত্তরে থোকেদো, মধ্যে নিপন, দক্ষিণে কিউসো ওসিককু। নিপন ও কিউসোর মধ্যে একটী অপ্রশস্ত প্রণালী, কোথাও ৪মাইল কোথাও বা এক মাইল বিস্তৃত। এই প্রণালী জাপানের 'ভিতর সমুদ্র' প্রবেশ করিবার পূর্ব্বদ্বার। 'ভিতর সমুদ্র' প্রশান্ত মহাসাগরের অংশ নিপন ও কিউস্যু ওসিককু দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত। ইহা দীর্ঘে ২৪০ মাইল, প্রস্থে ৪০ মাইল। পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণে সুদৃঢ় দুর্গরক্ষিত তিনটি অপ্রশস্ত প্রণালী দ্বারা প্রবেশ করা যায়। জাপানের সমস্ত জঙ্গী জাহাজ ও নৌবল এখানে নিরাপদে থাকৃতে পারে এবং সুবিধামত বহির্গত হয়ে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করতে পারে। এরূপ নিরাপদ

পোতাশ্রয় (Harbour অপর কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের জাহাজ 'ভিতর সমুদ্রের' পূর্ব্ব দ্বার দিয়া প্রবেশ কর্‌লে। উভয় তীরে উচ্চ পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় তোপসাজান, সাতটি অভেদ্য দুর্গ জলপথ রক্ষা কর্‌ছে। বাম দিকে সিমুনোসিকি বন্দর, দক্ষিণে মোজি। ১৮৬৩ সালে—জাপানের তখন পুরাতন আমল—এই স্থানের অর্দ্ধস্বাধীন জমিদার (দেইমো) মার্কিন, ফরাশি ও ডাচদিগের ৪খানি জঙ্গী জাহাজ 'ভিতর সমুদ্রে' প্রবেশমুখী দেখে প্রণালীপথ আটক করেন। বিদেশীরা পশ্চাৎপদ না হওয়াতে যুদ্ধ আরম্ভ হল। দেইমোর কামানের মুখে অনেকে আহত হন। তাৎকালিক দেশের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা সোগুণের কাছে (যথার্থ রাজা মিকাদো তখন শাসনক্ষমতাহীন) ক্ষতিপূরণের জন্য জানান হল। বিফলমনোরথ হওয়াতে ইংরাজ বাহাদুর মোড়ল হয়ে আঠার খান জঙ্গী জাহাজ জড় করে সিমুনোসিকিতে তোপ চালাতে লাগ্‌লেন। জাপানের হার হল। জাপানকে শাস্তি দিতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়েচে বলে, ত্রিশ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণের দাবি করে, সকলে টাকা আদায় করলেন। মার্কিন বুঝ্‌তে পার্‌লেন,—একাজটা গর্হিত হয়েচে। প্রাপ্ত টাকার আসলটা জাপানকে ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু অন্যান্য মহাপুরুষেরা সুদ সুদ্ধ নিঃসঙ্কোচে হজম কর্‌লেন। এই ঘটনা ছাড়া সিমুনোসিকি বন্দর আর একটী কারণে খ্যাতি লাভ করেচে। ১৮৯৫ সালে চীন জাপান যুদ্ধের পর, চীনের বৃদ্ধ মহামন্ত্রী লি হাং চাং, এইখানে চীন জাপানের সন্ধি প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হলে একজন জাপানি তাঁহাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

মোজিতে জাহাজ লাগিল। আমরা জাপানি বন্ধুর সঙ্গে তীরে উঠিলাম। নগরটি পাহাড়ের উপর। এখানে মানুষে টানা গাড়ি জিনরিক্‌সর কেবল ব্যবহার। গাড়িগুলি দেবদারু কাঠের, কাল রংএর বার্নিস দেওয়া ও সোনালির নানাপ্রকার চিত্র করা। জিনরিক্‌স চড়ে এখানকার সিমেণ্টের কারখানা দেখ্‌তে যাওয়া গেল। আমাদের জাপানি সঙ্গীর পিতৃবন্ধু ইহার স্বত্বাধিকারী। কারখানায় তাঁর দেখা না পেয়ে বাটীতে উপস্থিত হলাম। জিনরিক্‌স হতে যেমন নামিতে যাওয়া, পায়ের দমকে গাড়ির বোম দুটি মট্‌ করে ভেঙ্গে গেল। আমি বেজায় অপ্রতিভ, কিন্তু গাড়িওলা না রাম না গঙ্গা, কোন রূপ অসন্তুষ্টি ভাব প্রকাশ করলে না।

এটা কি জাপানি শিষ্টাচার না বিদেশী দেখে ক্ষমা করলে? বাটীতে প্রবেশ করবামাত্র গৃহস্বামী ও তাঁহার পত্নী অগ্রসর হয়ে মাথা নিচু করে হাস্যবদনে অভ্যর্থনা করলেন। এখানকার সমস্ত বাড়ি কাটের। সকল বাড়ীর সঙ্গে একটু করে বাগান, নানারকম ফুলগাছ দিয়ে সাজান।

সাবিত্রী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পৌর্ণমাসী সুধাকর উদিলে আকাশে
অস্থির সাগর যথা; অথবা যে কালে,
গোপবেশে সমুদিত, যশোদার ঘরে
রাধানাথে হেরিবারে, ব্রজবাসিগণ
ধাইলা আলোড়ি পুরী; সেই মতে আজি
জনস্রোত বিচঞ্চল রাজহর্ম্ম্যদ্বারে।

সুধাংশুর রূপালোকে চকোর যেমতি
স্থিরনেত্র মুগ্ধমন,—তেমতি সেরূপ
বারেক হেরিছে যেই, নয়ন তাহার
আর না ফিরিতে চাহে, অযসের সূচী
চুম্বকে আকৃষ্ট হয়ে অবরুদ্ধ যেন।
ঘরে ঘরে বাজে শঙ্খ, কুলনারী যত
তুলে উলু উলু ধ্বনি, মঙ্গলসঙ্গীত;
বাজে বীণা বেণু আদি; যুবতী যতেক
গাহে গীত, নাচে রঙ্গে, ছড়ায় চৌদিকে
ধান দুর্ব্বা যব পুষ্প লাজ মুদ্রা আদি।
গৃহচূড়ে প্রতি দ্বারে উড়িল পতাকা
—বিদ্যুল্লতা—সতত চঞ্চল সমীরণে।
দ্বারে দ্বারে শোভে মালা, চিক্কণ-গ্রন্থিত
বিবিধ কুসুমকুলে; মঙ্গল কলস,
মঙ্গল পল্লবরাজি—কমলমণ্ডিত।

রাজপথে দুই ধারে তরঙ্গ-বিভ্রমে
লম্বিত কুসুমমালা তরু শাখে শাখে।
তরুশিরে উড়ে ধ্বজ আনন্দে অস্থির।
কুসুমমণ্ডিত বর্ত্ম; সৌরভিত দিক্
ধূপ ধুনা পরিমলে; ধ্বনিত গগন
বাদ্যরোলে, গীতশব্দে, জনকোলাহলে।
সপ্তদ্বীপ হতে আসি রাজন্যমণ্ডলী
লয়ে ধন রত্নরাজি, রাজেশ্বর পদে
দেয় ভেট; সসম্মান আমন্ত্রণ করি
তুষেন নৃপতি সবে, সুধান সাদরে
রাজ্যের মঙ্গলবার্ত্তা। দীন দুঃখী যত,
সমাদরে নৃপমণি মুক্ত দুই করে,
বিতরেন তা সকলে আকাঙ্ক্ষা অধিক
ধন রত্ন বস্ত্র ভূষা খাদ্য বহুবিধ।
হেন মতে পুরবাসী তিন দিন ধরি
রহিলা আনন্দে মগ্ন, আশ্বিনে যেমতি
রহে বঙ্গ সুখে মগ্ন, আসেন যে কালে,
কৃপাময়ী, কৃপা করি ভকতসন্তানে।
জননীর স্নেহরসে হইয়া সিঞ্চিত,
জনকের আনন্দের বর্দ্ধনের সহ
বাড়িতে লাগিলা কন্যা; সবিত্রী তাহার,
সাবিত্রী রাখিলা নাম জগৎ-মঙ্গল।
শুভদিনে শুভক্ষণে আসি কুলগুরু
আরম্ভিলা বিদ্যাভ্যাস; অদ্ভুত প্রতিভা!
যখন যে শিক্ষা গুরু করেন প্রদান
অমনি অভ্যাসগত; কৃপণ যেমতি
অতি যত্নে রত্নরাশি করে সুসঞ্চিত,
তেমতি বালিকা অতি যত্নের সহিত
জ্ঞানধন হৃদিকোষে লাগিলা সঞ্চিতে।
জননী ভাবতী হেন দিলা শিক্ষা তায়

দীন হীন জনে দয়া, জীবন উৎসৃজি
পরহিতে হতে ব্রতী; জগৎ-পিতার
নিত্যপূজা—জগতের হিতবাঞ্ছা করি,
দমিতে দুরন্ত রিপু, সদা ভক্তিমতি
দেব দ্বিজে গুরুজনে, কারু কর্ম্ম যত।

(ক্রমশঃ)

ঋভু-নিদাঘ-সংবাদ।

(বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে)

ঋভু গুরু, নিদাঘ শিষ্য—গৃহী। গুরু শিষ্যবাড়ী গিয়া হাজির। আজ কাল যেমন কুলগুরুকে বাড়ী আসিতে দেখিলে শিষ্য অর্থ দিবার ভয়ে জড় সড় হন, নিদাঘ তা হইলেন না। কারণ, ইনি অতিথি সাজিয়া ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন। আরও অন্য কারণ ছিল; তা পরে প্রকাশ পাইবে।

অতিথি ত অর্ঘ্য নিয়ে হাত পা ধুয়ে আসনে বসুন। নিদাঘ বল্লেন, তবে আর কি? কিছু উপযোগ করুন।

অতিথি। খাবো তো বোল্‌ছো বাপু। কি খাব বল দিকি? বলি, ভাল খ্যাঁট ট্যাঁট আছে কিছু? ডাল চচ্চড়ি খেয়ে খেয়ে ত বাবা, অরুচি জন্মে গেছে।

নিদাঘ। মশায়, সুন্দর আতপ চালের ভাত, গব্য ঘৃত, ডাল, কপির তরকারী, পিটে, পায়েস প্রভৃতি আছে। যা ভাল লাগে, আহার করুন।

ঋভু। না বাবা, ও সব্ চল্‌বে না। মাংসের পোলাও কালিয়ে, পুরী, রাব্‌ড়ী, কচুরী, বরফী খাওয়াতে পার,—তবে তোমার অতিথি হই। না হলে বাপু চল্লুম।

এখনকার গৃহস্থ হলে অতিথির এতটা বেয়াদবি সহ্য করা দূরে থাক্, অতিথির—একেবারে অপরিচিত অতিথির—ও কথাগুলো মুখে আন্‌বারই ভরসা হোতো না। কিন্তু নিদাঘ একজন অতিশয় ধর্ম্মপরা-

যণ লোক ছিলেন। তিনি অমনি গিন্নিকে ডেকে অতিথি যা ফব-মাজ কোর্‌লেন, সব যত শীঘ্র সম্ভব তৈযার করাইযা অতিথির তৃপ্তি সাধন কোর্‌লেন। আহারান্তে তাম্বুলচর্ব্বণ, তামাকুসেবন প্রভৃতি যথা-রীতি হইল। তখন ভক্তরাজ নিদাঘ হাত যোড় করে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, প্রভু, বেশ তৃপ্তি হযেচে ত? আপনার বাড়ী কোথা? কোথায যাচ্ছেন কোথেকেই বা আস্‌ছেন?

তখন ঋভুকে একটু খানি গম্ভীর দেখা গেল—যেন সে মানুষ নয় --তিনি এক দিব্যি লেক্‌চাব জুড়ে দিলেন,—"ওহে ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে তৃপ্তির কথা কি বল্‌চো? যাব খিদে হয, তাবই খেলে তৃপ্তি হয। আমাব খিদেই হযনি. তৃপ্তি আবাব হবে কি? ক্ষুধা তৃষ্ণা ত দেহের ধর্ম্ম; তা ত আমাব কখন নেই। খিদে আমাব মোটেই হয না। তাইতে আমার সদাই তৃপ্তি রযেছে—আনন্দেব ত কম্‌তি দেখ্‌তে পাইনি। তুষ্টি, শান্তি এগুনো চিত্তেব ধর্ম্ম। অতএব তুমি তৃপ্তি হযেচে কি না, চিত্তকেই জিজ্ঞাসা কবতে পার। তুমি জিজ্ঞাসা কোর্‌ছিলে, আমার বাড়ী কোথা, কোথা যাব, কোথেকে আস্‌ছি,—এসব কথাব আব জবাব কি দোবো? আমি ত সেই আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ—তোমার প্রশ্নগুনোই যে ভুল হচ্চে। আমি ত কোথাও যাই না—কোথেকেও আসিও না—এক জায়গায় বসে আছি, তাও নয। আরও দেখ, তুমি বা অপর কেউও এবকম ক্ষুদ্র নও, তোমবা সর্ব্বব্যাপী। তুমি যে ক্ষুদ্র দেহ, ক্ষুদ্রমন বোলে আপ-নাকে জ্ঞান কোর্‌চো, তা ত তোমায় সাজে না—তুমি সর্ব্বব্যাপী, আপনাকে ব্রহ্ম বলে জ্ঞান কব। যদি বল মশায, আপনি বেশ এখন পেটটি ঠাণ্ডা করে লেক্‌চার ঝাড়্‌ছেন, নিজের ত দিব্যি পোলাও কালিযে না হলে খাওয়া হয না। তা বাপু, আমি সত্য বল্‌চি. আমি ভাল খাবার দাবার বড় তোযাক্কা বাখি না। ভাল খাওযাব কথা বল্লে তুমি ভাল মন্দর যে কোন ভেদ নেই, একথা বল কিনা, তাই তোমার জ্ঞান জান্‌বাব জন্যে তোমাকে পোলাও কালিযেব কথা বলেছিলুম। আমি তোমাকে ভাল জিনিষ খেতে বারণ কচ্চি না। কিন্তু ভাল খাবাব জন্যে যে একটা ছট্‌ফটানি, সেটা ছেড়ে দিতে হবে। দেখনা, পেট যখন আকণ্ঠ পূর্ণ হযেছে, সে সময় যদি খুব ভাল জিনিস নিযে এসো, তাতে বমি আসে। আবাব যখন বড্ড খিদে পেযেছে, তখন নুনী ভাত পেলেই অমৃত জ্ঞান হয। খাবার

জিনিষ গুলো আর কি? কতকগুলো পরমাণুর সমষ্টি মাত্র তো। এই রকম মনে করে সব বিষয়ে সমতা ভাব অবলম্বন করা দরকার। সমতা ভাব এলেই মুক্তি। 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।' ”

এরকম লেক্‌চার শুন্‌লে আমরা লাটি নিয়ে তাড়া কর্‌তুম, সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের উপাখ্যান বল্‌চেন, ইনি এই জ্ঞানের উপদেশ শুনে করজোড়ে প্রণাম কোরে জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে, আমাকে বল্‌তেই হবে। তখন গুরু আত্মপরিচয় দিয়ে শিষ্যকে জ্ঞানাভ্যাস কর্‌তে উপদেশ দিয়ে সরে পড়্‌লেন।

এ দফায় গুরু, শিষ্যের কাছে তোফা খ্যাঁট মেরেছিলেন, কিন্তু আর একেবারের ঘটনা শুনুন। এক্ষেত্রে শিষ্য গুরুর ঘাড়ে চড়েছিলেন। অনেক দিন বাদে আবার গুরু শিষ্যে দেখা। নিদাঘ ফুল দূর্ব্বাদি পূজার উপকরণ যোগাড় করে বাড়ী ফিরচেন, এমন সময় ঐ দেশের রাজা বেরিয়েচেন। আর রাজ্যের লোক রাজাকে দেখ্‌বার জন্যে ঝুঁকে পড়েচে। নিদাঘ ব্রাহ্মণ, ভাল মানুষ বেচারা। এক ধারে সরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন, রাজা চলে গেলে ভিড় কম্‌লে বাড়ী যাবেন। এমন সময়ে ঋভু ছদ্ম-বেশে হাজির। ঋভু নিদাঘের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম কোরে বোল্লেন, বামুন ঠাকুর, এ রকম একান্তে এক ধারে দাঁড়িয়ে যে? নিদাঘ বোল্লেন,—দেখ্‌চেন না, রাজা আস্‌চেন—লোকের বেজায় ভিড়।

ঋভু। কোন্‌টী রাজা, আমাকে দেখিয়ে দেবেন কি?

নিদাঘ। ওই যে পাহাড়ের মতন হাতী দেখ্‌চেন, ওরই উপর যিনি বসে আছেন, তিনি রাজা।

ঋভু। কোন্‌টী হাতী, কোন্‌টাই বা রাজা, আমাকে ভাল কোরে বুঝিয়ে দিন না।

নিদাঘ। হাতীর পিটে মানুষ চড়ে থাকে, এ কথাটা কে না জানে, মশায়? ওই নীচে যেটী, সেটী হাতী, আর ওর উপরেই রাজা বসে আছেন।

ঋভু। বামুন ঠাকুর, রাগ কর্‌বেন না। আমি আপনার কথা এখনও বুঝ্‌তে পাচ্চি না। নীচু উপর কাকে বলে, ঠাকুর?

ঋভুর এই কথা বলা আর নিদাঘের তাঁর ঘাড়ে চোড়ে বসা। বোল্‌তে লাগ্‌লেন—এইবারে বুঝ্‌তে পাচ্চেন,—আপনি যেন হাতী, আপনি নীচে

রয়েছেন আর আমি আপনার উপর চড়ে বসে রয়েছি, আমি যেন রাজা।

ঋভু। তাই যদি হয়, তবে আপনিই বা কে আর আমিই বা কে? বুঝিয়ে দেবেন কি?

তখন নিদাঘের সন্দেহ হোলো—লোকটা কে? তাড়াতাড়ি নেবে গুরুর পা ধরে বল্লেন—ক্ষমা কর্বেন—আপনি নিশ্চয় আমার গুরু। আর কাহারও মন এমন অদ্বৈতবিচারপরায়ণ নয়।

এইবারে গুরূপদেশে নিদাঘ বিশেষরূপে তত্ত্বচিন্তা কোরতে লাগ্লেন। শেষে সমস্ত ভূতকে তিনি আত্মার সহিত অভেদ দেখ্তে লাগ্লেন। তাঁর কোন ভেদজ্ঞান রইল না।

আমাদের গুরুরা শিষ্যের জ্ঞান বা ভক্তি উৎপাদনের জন্য কি যত্ন কোর্ছেন?

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

জর্জ্জ ডব্লিউ হেলের বাটী,
৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো।
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৯৪।

প্রিয় বন্ধুগণ,

তোমাদের পত্র পাইয়াছি। আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, আমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌঁছিয়াছে। 'ইণ্টিরিয়র' পত্রিকার সমালোচনা,—সমুদয় আমেরিকাবাসীর ভাব বলিয়া বুঝিও না। এই পত্রিকা এখানে কেহ জানে না বলিলেই হয়, আর ইহাকে এখানকার লোকে 'নীলনাসিক প্রেস্বিটেরিয়ান'দের কাগজ বলে। এ সম্প্রদায় খুব গোঁড়া। অবশ্য এই নীলনাসিকগণ সকলেই যে অভদ্র, তা নয়। সাধারণে যাহাকে আকাশে তুলিয়া দিতেছে, তাহাকে আক্রমণ করিয়া একটু বিখ্যাত হইবার ইচ্ছায় এই পত্রিকা ঐরূপ লিখিয়াছিল। আমেরিকাবাসী সাধারণ, তাহার মধ্যে পুরোহিতই অধিকাংশ, আমাকে খুব যত্ন করিতেছেন। এইরূপ

কোন বড় লোককে গালাগালি দিয়া পত্রিকাসকল যে খ্যাতনামা হইতে চায়, এই কৌশল এখানকার সকলেই জানে, সুতরাং এখানকার লোকে উহা কিছুই গ্রাহ্য করে না। অবশ্য ভারতীয় মিশনরিগণ যে ইহা হইতে অনেক সুবিধা পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বলিও,—'হে ইহুদী, লক্ষ্য কর, তোমার উপর এখন ঈশ্বরের বিচার আসিয়াছে।' তাহাদের প্রাচীন গৃহের ভিত্তি পর্য্যন্ত এক্ষণে যায় যায় হইয়াছে আর তাহারা পাগলের মত যতই চীৎকার করুক না কেন, উহা ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। মিশনরিদের জন্য অবশ্য আমার দুঃখ হয়। প্রাচ্যদেশবাসিগণ এখানে দলে দলে আসাতে তাহাদের ভারতে আসিয়া বড়মানুষী করিবার চাঁদা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রধান প্রধান পুরোহিতগণের মধ্যে একজনও আমার বিরোধী নহেন। যাই হোক, যখন পুকুরে নামিয়াছি, তখন ভাল করিয়াই স্নান করিব। আমি তাহাদের সম্মুখে আমাদের ধর্ম্মের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে একটী সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া পাঠাইয়া দিলাম। আমার অধিকাংশ বক্তৃতাই মুখে মুখে। আশা করি, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে পুস্তকাকারে সেগুলিকে গ্রথিত করিতে পারিব। ভারত হইতে কোন সাহায্যের আমার আবশ্যক নাই, এখানে আমার যথেষ্ট আছে। বরং তোমাদের নিকট যে টাকা আছে, তাহা দ্বারা এই ক্ষুদ্র বক্তৃতাটী মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর এবং বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাও। আর চারিদিকে উহার প্রচার কর। ইহাতে আমাদের জাতীয় মনের সম্মুখে আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী উদিত রাখিবে। আর সেই কেন্দ্র-বিদ্যালয়ের কথা এবং উহা হইতে ভারতের চতুর্দ্দিকে শাখাবিদ্যালয় সকল সংস্থাপনের কথাও ভুলিও না। আমি এখানে প্রাণপণে সহায়তা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি, তোমরা ভারতেও চেষ্টা কর। খুব দৃঢ়ভাবে কার্য্য কর। রামনাথ বা যে কোন নাথকে পাও, তাহার নিকট হইতেই সহায়তা লাভের চেষ্টা কর। এই কার্য্যের জন্য টাকা ধীরে ধীরে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে থাক। যদিও এখানে এবার অর্থের বড়ই অনাটন, তথাপি আমার যতদূর সাধ্য করিতেছি। এখানে এবং ইউরোপে ভ্রমণ করিবার সমুদয় খরচ আমার যথেষ্ট যোগাড় হইয়া যাইবে।

আমি কিডির পত্র পাইয়াছি। জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে কি থাকিবে,

এ সম্বন্ধে আমার কিছুই করিবার নাই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত মনুষ্যজাতি যে মহৎ চিন্তারাশি সৃজন করিয়াছেন, তাহা অতি হীন, অতি দরিদ্রের নিকট পর্য্যন্ত প্রচার; তার পর তারা নিজেরা ভাবুক। জাতিভেদ থাকা উচিত বা উঠিয়া যাওয়া উচিত, স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত বা অনুচিত, এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়। যেখানে তাহা নাই, সেই মানুষ, সেই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

জাতিভেদ থাকুক বা নাই থাকুক, কোন প্রণালীবদ্ধ মত প্রচলিত থাকুক বা নাই থাকুক, যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বা বর্ণ বা জাতি বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যে বাধা দেয়, (অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উহা অপরের অনিষ্ট করে) তাহাই পৈশাচিকভাবাপন্ন এবং তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটী চক্র প্রবর্ত্তন করিব, যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বরাশি বহন করিয়া লইয়া যায়। তার পর প্রত্যেক নরনারী আপন আপন অদৃষ্ট আপনিই গঠন করিয়া লইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং অন্যান্য জাতিরা জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা তাহারা ভাবুক। বিশেষতঃ তাহাদের জানা উচিত, অপরে কি করিতেছে। তার পর তারা কি করিবে, আপনারাই স্থির করুক। রাসায়নিক দ্রব্যগুলি আমাদিগকেই একত্রে মিশাইতে হইবে, উহা কোন বিশেষ আকার ধারণ করিবে প্রকৃতির নিয়মে। আমেরিকান মহিলাগণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—তাঁহারা আমার খুব বন্ধু। শুধু চিকাগোয় নয়, সমুদয় আমেরিকায়। তাঁহাদের দয়ার জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। প্রভু তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই দেশে মহিলাগণ সমুদয় জাতীয় উন্নতির প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরুষেরা কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত বলিয়া শিক্ষায় তত মনোযোগ দিতে পারে না। এখানকার মহিলাগণ প্রত্যেক বড় বড় কাযের জীবন-স্বরূপ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবে, আমি তাঁহার ফনোগ্রাফের কথা বিস্মৃত হই নাই, তবে এডিসন ইহার একটী নূতন সংস্কার করি-

য়াছেন। যতদিন না তাহা বাহির হইতেছে, ততদিন আমি উহা ক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

দৃঢভাবে কার্য্য কবিযা যাও, অবিচলিত অধ্যবসাযশীল হও ও প্রভুতে বিশ্বাস রাখ। কাযে লাগো। আমি আসিতেছি। আমাদেব কার্য্যেব এই মহান্ সার কথা মনে রাখিবে,—জনসাধারণের উন্নতি বিধান—ধর্ম্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া। মনে রাখিবে—দরিদ্রেব কুটীরেই আমাদের জাতির জীবন। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করেন নাই। আমাদেব আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্য্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণেব স্বামীর সংখ্যাব উপরে কোন জাতিব অদৃষ্ট নির্ভর কবে না, জাতিব অদৃষ্ট নির্ভব করে জনসাধাবণেব অবস্থার উপব। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদেব স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনাব পায আপনি দাঁড়াইতে শিখাইতে পাব? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতায ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমবা সকলে ইহা করিবাব জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যেব প্রসূতি। এগিযে যাও, এগিযে যাও। মৃত্যু পর্য্যন্ত গরীব, পদদলিতদেব উপর সহানুভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিযে যাও বীরহৃদয় বালকগণ।

তোমাদেব কল্যাণাকাঙ্ক্ষী বিবেকানন্দ।

জ্ঞান।

(শ্রী বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিত।)

বাঙ্গালা দেশে আমরা জ্ঞানের কথা শুনিলে ভয পাইয়া থাকি। মুক্তি লাভ হইলে কিছুই থাকিবে না, চিনি হওযা ভাল নয, চিনি খেতে ভাল বাসি, জ্ঞান শুষ্ক মার্গ, জ্ঞানের কচকচিতে কি হইবে, ইত্যাদি কথা আমরা প্রায শুনিতে পাই। এমন কি, কাহাকেও কাহাকেও লিখিতে দেখিয়াছি, সোঽহং-

বাদী হইলে স্বেচ্ছাচার হইতে হয়। কেহ কেহ আবার জ্ঞানমার্গ সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয় বলিয়া জ্ঞানকে সংসার হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাহেন।

আমাদের দেশে জ্ঞানের বহুল চর্চ্চা নাই বলিয়াই যে এই সমুদয় কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে যাহার সম্বন্ধে যত অনভিজ্ঞ, সে তাহাকে তত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্, জ্ঞান বলিতে কি বুঝা যায় এবং তাহা সাধনের উপায়ই বা কি?

জ্ঞানীদের মত এই,—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু আর সব অবস্তু। এই তাঁহাদের মূল মত। ইহারই উপর তাঁহাদের অন্যান্য মত প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে এই মত একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

এই কান্ত-ভীষণ প্রকৃতির লীলা, এই বিচিত্র-বৈষম্যময়-প্রকৃতিশালী নরনারীর বিচিত্র সম্মিলন স্বরূপ সমাজ-সংহতি, এ কি? এসকল কোথা হইতে আসিল? ইহার আদি কোথা, অন্তই বা কোথা?

দেখিতেছি, জগতে নানা প্রকার সুখ আছে, আবার দুঃখও আছে। কেহ কেহ ক্রমাগত সুখ সম্ভোগ করিয়া চলিয়াছে, কেহ আবার যেন দুঃখভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে আবার কেহ কেহ কতক সুখ কতক বা দুঃখ ভোগ করিতেছে। মনীষী ব্যক্তিগণ ইহার রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, একটু ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, বাস্তবিক সুখী দুঃখী বলিয়া কোন ভেদ নাই, কারণ, সকলেই বাসনানলে দগ্ধ। সুতরাং যাহাকে আমরা দুঃখী বলিতেছি, তাহাকে সাংসারিক ভোগসুখ অধিকতর পরিমাণে দিলেই যে সে সুখী হইবে, তাহা কখনই নহে, তাহার দুঃখ কোন মতেই ঘুচিবে না।

এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। কোন ব্যক্তি দশ টাকা মাহিনার এক চাকরি করিত। তাহার বাড়ীর পরিবারেরা তাহাকে সর্ব্বদা টাকা পাঠাও,টাকা পাঠাও লিখিয়া উত্যক্ত করিত। সে নিজ খরচের জন্য ৫৲ টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট বাটিতে পাঠাইয়া দিত। ক্রমশঃ তাহার সততা ও পরিশ্রমের গুণে ৫৲ টাকা করিয়া মাহিনা বৃদ্ধি হইয়া শীঘ্রই ৭৫৲ টাকা বেতন হইল। সে কখনও নিজ খরচের জন্য ৫৲ টাকার অধিক রাখিত না। উত্তরোত্তর বাড়ীতে অধিক টাকা গেলেও বাড়ী হইতে চিঠি আসিবার সময় প্রতিবারেই লেখা থাকিত, এই খরচে এখানে চল্‌ছে না। ৭০৲ টাকা পাঠাইলেও যখন

বাড়ী হইতে ঐরূপ পত্র আসিল, তখন তাহার মনে সহসা এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে একখানি কর্ম্মত্যাগপত্র লিখিয়া লইয়া আফিসে গিয়া হাজির। সকলে তাহার কর্ম্মত্যাগপত্র দেখিয়া বিস্মিত হইল। আফিসের সাহেবেরা তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিত, তাহাকে অতিশয় কর্ম্মঠ ও বিশ্বাসী বলিয়া জানিত। তাহারা মনে করিল, এ ব্যক্তি আরও কিছু অধিক বেতন চায়। তাহারা তাহাকে অধিক বেতন দিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু সে কোন মতেই আর চাকরী করিতে রাজি হইল না, কেবল বলিতে লাগিল, আমাকে লক্ষ টাকা মাহিনা দিলেও আমার চল্‌বে না। তখন সকলে তাহাকে উন্মত্ত স্থির করিল।

এটী নিতান্ত গল্প নহে; আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাইতেছি। এই অভাব যেমন দরিদ্রের কুটীরে, তেমনি ধনীর প্রাসাদেও বিদ্যমান। ইহা দেখিয়া মনীষীগণ স্থির করিলেন, আমাদের নানারূপ দ্রব্যের অভাব বোধ হইলেও অভাব বাস্তবিক কোন দ্রব্যগত নহে, অভাবের অভাব না হইলে নিস্তার নাই, নিবৃত্তি নাই। এই ভাব হইতেই ত্যাগ, বৈরাগ্য বা বিবেকের উৎপত্তি। ইহা ইতিহাসে ও সংসারে নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনা।

এখন আমাদের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। এখন কিরূপে সম্পূর্ণরূপে এই অভাব বৃত্তির মূলোচ্ছেদ করা যায়, তাহা চিন্তা করা যাউক। জ্ঞানিগণ দেখিলেন, আমরা চেষ্টা ও সাধনা বলে যখন অভাবকে শত ইচ্ছা কমাইতে পারি, তখন অভাব এক মানসিক বৃত্তিবিশেষ, সন্দেহ নাই। এখন তাঁহারা দেখিলেন, এই অভাব কিসের অভাব? কোন ভাবপদার্থ মূলে না থাকিলে কখন অভাব শব্দই আসিতে পারে না। অতএব আমাদের স্বরূপ 'ভাব' বা অস্তিত্ব বা পূর্ণতা। অভাব উহারই উপর যেন মেঘের ন্যায় পড়িয়া ভাব পদার্থকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। যখন আমি ভাবস্বরূপ, তখন আমার কোন রূপ সুখ দুঃখ নাই, আমি যখন পূর্ণ স্বরূপ, তখন আমি খণ্ড কখনই হইতে পারি না। সুতরাং এক আমিই আছি, আর কিছু নাই। আর এই যে অভাব বোধ, ইহাও আমি অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি, জানিতে না পারিলেও ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। এই জন্য ইহা ইন্দ্রজালবৎ—মায়া। এই অভাবের জন্যই ধ্যান

ধারণা সমাধি, ইহারই জন্য দানাদি সৎক্রিয়া, ইহারই জন্য চৌর্য্যব্যভি-চারাদি অপকর্ম্ম আবার ইহারই জন্য নিদ্রা আলস্য প্রভৃতি। অতএব এই অভাব ত্রিগুণময়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইহার ত্রিবিধ বিকাশ। ভাব পদার্থ এই ত্রিবিধ বিকাশের অতীত—ত্রিগুণাতীত। মানুষ বা অন্য জীবের বিচিত্র চেষ্টাময় কার্য্যকলাপ বা প্রকৃতির অত্যদ্ভুত লীলা, সমুদয়ই সেই অভাব হইতে উৎপন্ন। যেখানে কেবল ভাব পদার্থ, সেখানে সৃষ্টি নাই, বিকার নাই, চেষ্টা নাই। এই ভাব পদার্থই 'আমি' 'তুমি' রূপে খণ্ডশঃ বিভক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক 'আমি' 'তুমি' নাই। এই ভাব পদার্থকেই বলে ব্রহ্ম, অভাবকে বলে মায়া আর জীব এই ভাবাভাবের মিশ্রণ স্বরূপ।

জ্ঞানীর এই মত। এক্ষণে তাঁহার সাধনপ্রণালী কি, তাহা তাঁহার মত হইতেই সহজে বুঝা যাইবে। পূর্ব্বে যে ইঙ্গিত করা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইবে, বিবেক বৈরাগ্য তাঁহার প্রথম সাধন। সত্ত্বগুণের বিশেষ বিকাশ করিয়া যাহাতে রজঃ তমোগুণের তনুতা হয়, শেষে যুগপৎ ত্রিগুণেরই বিলয় হয়, ইহাই তাঁহার সাধনপ্রণালী। অতএব জ্ঞানীর পক্ষে নিম্নস্তরের কর্ম্মযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি যত প্রকার সাধনপ্রণালী আছে, তাহার মধ্যে যাহা দ্বারা তাঁহার সত্ত্বগুণের বিকাশের সুবিধা হয়, তাহাই অবলম্বনীয় এবং বাস্তবিক প্রকৃত জ্ঞানবাদিগণ তাহাই করিয়া থাকেন।

যেমন সকল মত বিকৃত হয়, তেমনি জ্ঞান মতও বিকৃত হইয়াছে ও উহার দোহাই দিয়া অনেকে নানা প্রকার অসদাচরণের বা যথেচ্ছাচরণের পোষকতা করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে জ্ঞানের কোন মালিন্য জন্মে নাই। জগতে এরূপ মতও এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা অজ্ঞানীদিগের হস্তে পড়িয়া অসদাচরণের যন্ত্রস্বরূপ না হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মতের কোন দোষ হইতে পারে না। এই কারণেই পরমহংসদেব অতিবিকৃত ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহের মতেও কোন দোষ দেখিতে পাইতেন না।

জ্ঞান কাহাকেও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলে না, বরং বলে, 'চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম',—কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কর্ম্মী যখন নানাবিধ কর্ম্মে বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, যখন সে আচমনের সময় কয় গণ্ডূষ জলপান করিব,

উত্তরমুখো বা পূর্ব্বমুখো বসিয়া পূজা করিব, কতবার জল ছিটাইব, অমুকের হাতে খাইতে দোষ ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ডের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলে, এ সব কি ছেলেখেলা করিতেছি, এ সকলের অর্থ কি, তখন জ্ঞান বজ্রগম্ভীররবে বলেন, 'চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম,'—তাহাই কর্ম্ম, যাহা চিত্তশুদ্ধিকর। চিত্তশুদ্ধি যাহাতে হয়, তাহাই কর। যদি পূর্ব্বমুখো বসিলে তোমার চিত্তশুদ্ধির সহায়তা হয়, তাহাই কর, আবার পশ্চিমমুখো বসিলে যদি হয়, তাহাতেও কোন আপত্তি নাই, বস্তুতঃ 'চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম।' অতএব জ্ঞানের আলোকে কর্ম্মী যথার্থরূপে ও উত্তমরূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন, দেখা গেল।

ভক্ত—তোমার ভক্তির বস্তু কোন ঐতিহাসিক অবতার বা সাকার মূর্ত্তি অথবা সগুণ ব্রহ্ম। তার্কিক আসিয়া বুঝাইয়া দিল, ইতিহাসের প্রমাণে কৃষ্ণ বা খ্রীষ্ট বলিয়া কেহ ছিলেন না ; সাকার মূর্ত্তি ভগবানের হইতেই পারে না ; যাঁহাকে ঈশ্বর বল, তাঁহাতে যে দয়া, সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের আরোপ কর, সেই গুণগুলি বাস্তবিক পরস্পরের বিরোধী। ঈশ্বর যদি দয়াময় হন, তবে তিনি কেন সকল জীবকে সুখী করিলেন না? তিনি যদি জানিতেন, জগতে কেবল দুঃখই বিরাজ করিবে, তবে তিনি জীবকে সৃষ্টিই বা করিলেন কেন ? যদিই বা সৃষ্টি করিলেন, তাহাকে পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিলেন না কেন? এ সকল প্রশ্নে ভক্তের চিত্ত যখন সংশয়দোলায় দোদুল্যমান হয়, তখন জ্ঞানীই তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, অবতারগণের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেও ভাবরূপে তাঁহারা নিত্য। সাকাররূপ সকলও এইরূপ নিত্য, ভক্তিযোগে এই সকল রূপ যোগনেত্রে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও জ্ঞানীদের উপদেশে বুঝিতে পারা যায়, যুক্তিতে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু মানুষ দ্বৈতভাবে জগৎকারণ পূর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাকে ঐরূপেই জানা যায়। একাত্মবুদ্ধি না হইলে তাঁহার পূর্ণ স্বরূপের পূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম হয় না।

জ্ঞানী যোগীরও গুরু। যে সকল যোগী নেতি ধৌতি প্রভৃতি নাড়ীশুদ্ধিকর কার্য্যে মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলেন, নাড়ীশুদ্ধির উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি না হইলে তোমার সমুদয় কার্য্য বৃথা। যাঁহারা সামান্য একটী সিদ্ধি পাইয়াই মাতিয়াছেন, জ্ঞানী তাঁহাদিগকে

বলেন, সমুদয় সিদ্ধি তোমার ভিতরে, শুধু তোমার নয়, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেরই ভিতরে রহিয়াছে। তুমি একটা সামান্য সিদ্ধি লইয়া মাতিযাছ, ইহা ত তোমায় সাজে না। তুমি ব্রহ্ম। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া একবার যথার্থ দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থিত হও দেখি।

অতএব দেখা যাইতেছে, জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মী, ভক্ত বা যোগী কাহারও বিরোধী নহেন, বরং সকলেরই সহায়ক।

জ্ঞানকে লোকে শুষ্ক তর্কের সঙ্গে এক করিয়া থাকে। জ্ঞান বাস্তবিক শুষ্ক তর্ক নহে। বাস্তবিক যতক্ষণ না তর্কবৃত্তির নিরোধ হয, ততক্ষণ জ্ঞানের উদয়ই হয না। সাধারণ বিষয়জ্ঞানের সহিতও ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বিষয়জ্ঞানে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয এই তিনটী থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে এ তিনের লয় হয়। উহা একরস, একতত্ত্বস্বরূপ।

এই জ্ঞান—কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, যে কোন আশ্রমী, যে কোন বর্ণ, আম্লেচ্ছচণ্ডাল সাধন করিতে পারেন। কারণ, সকলেরই ভিতর এই জ্ঞানস্বরূপ রহিযাছেন, কেবল একটা আবরণ পড়িয়াছে মাত্র। সাধন-চতুষ্টয় দ্বারা এই আবরণ সরাইতে পারিলেই জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশ হয। এই জ্ঞানই আনন্দ ও ইনিই ব্রহ্ম স্বরূপ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—কথিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাশীপুর বাগানের পূর্ব্বধারে পুষ্করিণির ঘাট। চাঁদ উঠিয়াছে। উদ্যান-পথ ও উদ্যানের বৃক্ষগুলি চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়াছে। পুষ্করিণির পশ্চিম দিকে দ্বিতল গৃহ। উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে; পুষ্করিণির ঘাট হইতে সেই আলো খড়খড়ির মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাহা দেখা যাইতেছে। কক্ষ মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ শয্যার উপর বসিয়া আছেন। একটি দুটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন বা এ ঘর হইতে ও ঘর যাইতে-ছেন। ঠাকুর অসুস্থ, চিকিৎসার্থ বাগানে আসিয়াছেন। ভক্তেরা সেবার্থ সঙ্গে আছেন।

পুষ্করিণির ঘাট হইতে নীচের তিনটি আলো দেখা যাইতেছে। একটি ঘরে ভক্তেরা থাকেন, তাহার আলো দেখা যাইতেছে। সে ঘরটি দক্ষিণ দিকের ঘর। মাঝের আলোটি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ঘর হইতে আসি-তেছে। মা, ঠাকুরের সেবার্থ আসিয়াছেন। তৃতীয় আলোটি রান্নাঘরের। সেই ঘর গৃহের উত্তর দিকে।

উদ্যানমধ্যস্থিত ঐ দুতলা বাড়ীর দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ হইতে একটি পথ পুষ্করিণির ঘাটের দিকে গিয়াছে। পূর্ব্বাস্য হইয়া ঐ পথ দিয়া ঘাটে যাইতে হয়। পথের দুইধারে, বিশেষতঃ, দক্ষিণ পার্শ্বে অনেক ফল ফুলের গাছ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১৲ টাকা। বাঁধান মূল্য পাঁচ সিকা। ৫৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীশান্তি-রাম ঘোষের নিকট অথবা ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলি-কাতায় শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য।

চাঁদ উঠিয়াছে। পুকুর ঘাটে গিরীশ, মাষ্টার, লাটু, আরও দুই একটি ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুরের কথা হইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরীশ ও মাষ্টার ঐ পথে বেড়াইতেছেন ও মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

মাষ্টার। কি সুন্দর চাঁদের আলো! কতকাল ধরে এই নিয়ম চল্‌ছে।

গিরীশ। কি করে জান্‌লে?

মাষ্টার। প্রকৃতির নিয়ম বদ্‌লায় না (Uniformity of nature) আর বিলাতের লোকেরা নূতন নূতন নক্ষত্র টেলিস্‌কোপ দিয়ে দেখেছে। চাঁদে পাহাড় আছে, দেখেছে।

গিরীশ। তা বলা শক্ত; বিশ্বাস হয় না।

মাষ্টার। কেন, টেলিস্‌কোপ দিযে ঠিক দেখা যায়।

গিরীশ। কেমন করে বল্‌বো, ঠিক দেখেছে। পৃথিবী ও চাঁদের মাঝখানে যদি আর কোন জিনিষ থাকে, তার মধ্যে দিয়ে আলো আস্‌তে আস্‌তে হয়ত অমন দেখায়।

আজ শুক্রবার। ১৬ই এপ্রেল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, ৪ঠা বৈশাখ, চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী। বাগানে ছোক্‌রা ভক্তেরা ঠাকুরের সেবার জন্য সর্ব্বদা থাকেন। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, কালী, যোগীন, লাটু ইত্যাদি; তাঁহারা থাকেন। গৃহী ভক্তেরা কেহ কেহ প্রত্যহ আসেন ও মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকেন। কেহবা মধ্যে মধ্যে আসেন। আজ নরেন্দ্র, কালী ও তারক দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ীর বাগানে গিযাছেন। নরেন্দ্র সেখানে পঞ্চবটী বৃক্ষমূলে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিবেন, সাধন করিবেন। তাই দুই একটি গুরুভাই সঙ্গে গিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে।

গিরীশ, লাটু, মাষ্টার উপরে গিযা দেখেন, ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন। শশী ও আরও দু একটি ভক্ত সেবার্থ ঐ ঘরে ছিলেন; ক্রমে বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখাল, ইঁহারাও আসিলেন।

ঘরটি বড। ঠাকুরের শয্যার নিকট ঔষধাদি ও নিতান্ত প্রয়োজনীয়

জিনিষাদি রহিয়াছে। ঘরের উত্তরে একটি দ্বার আছে, সিঁড়ি হইতে উঠিযা সেই দ্বার দিয়া ঘরে প্রবেশ কবিতে হয। সেই দ্বারের সামনা সামনি ঘরের দক্ষিণ গায়ে আর একটি দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া দক্ষিণেব ছোট ছাদটিতে যাওয়া যায। সেই ছাদের উপব দাঁড়াইলে বাগানের গাছ পালা, চাঁদের আলো, অদূরে রাজপথ ইত্যাদি দেখা যায।

ভক্তদের বাত্রি জাগরণ করিতে হয, তাঁহাবাও পালা কবিযা জাগেন। মশারি টাঙ্গাইয়া ঠাকুবকে শযন কবাইযা যে ভক্তটী ঘরে থাকিবেন, তিনি ঘরের পূর্ব ধারে মাদুর পাতিযা কখন বসিযা কখন শুইয়া থাকেন। অসুস্থতা নিবন্ধন ঠাকুবেব প্রায় নিদ্রা নাই। তাই যিনি থাকেন, তিনি কয়েক ঘণ্টা প্রায় বসিযা কাটাইযা দেন।

আজ ঠাকুরেব অসুখ কিছু কম। ভক্তেরা আসিযা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কবিলেন এবং ঠাকুরের সম্মুখে মেজের উপব বসিলেন।

ঠাকুব আলোটি কাছে আনিতে মাষ্টাবকে আদেশ করিলেন। ঠাকুর গিবিশকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)। ভাল আছ ? (একটী ভক্তের প্রতি)। এঁকে তামাক খাওয়া। আর পান এনে দে।

ঠাকুব কিযৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন, কিছু জল খাবার এনে দে।

লাটু। পান টান দিযিছি। জল খাবার দোকান থেকে আন্‌তে যাচ্ছে।

ঠাকুব বসিযা আছেন। একটি ভক্ত কয় গাছি ফুলের মালা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সে গুলি ধারণ করিলেন। ঠাকুরের হৃদযমধ্যে হরি আছেন, তাঁকেই বুঝি পূজা করিলেন। ভক্তেরা অবাক্‌ হইযা দেখিতেছেন।

দুই গাছি ফুলের মালা গলা হইতে লইযা ঠাকুর গিরিশকে দিলেন।

ঠাকুর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, জল খাবার কি এলো ?

মাষ্টাব ঠাকুবকে পাখা কবিতেছেন। ঠাকুরের কাছে একটি ভক্ত-প্রদত্ত চন্দনকাষ্ঠেব পাখা রহিযাছিল। ঠাকুর সেই পাখা খানি মাষ্টা-রেব হাতে দিলেন। মাষ্টার সেই পাখা লইযা বাতাস করিতেছেন।

মাষ্টার পাখা করিতেছেন, ঠাকুর দুই গাছি মালা গলা হইতে লইয়া তাঁহাকেও দিলেন।

লাটু ঠাকুরকে একটি ভক্তের কথা বলিতেছেন। সেই ভক্তটির

একটি ৭।৮ বৎসরের সন্তান প্রায় দেড় বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছে। সে ছেলেটি ঠাকুরকে কখন ভক্তসঙ্গে কখন কীর্ত্তনানন্দে অনেক বার দর্শন করিয়াছিল।

লাটু (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। ইনি এঁর ছেলেটির বই দেখে কাল রাত্রে বড় কেঁদেছিলেন। পরিবারও ছেলের শোকে পাগলের মত হয়ে গেছে। নিজের ছেলেপুলেকে মারে আছড়ায়। ইনি এখানে মাঝে মাঝে থাকেন বলে ভারি হেঙ্গাম করে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তটির শোকের কথা শুনিয়া কিছু চিন্তিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

গিরিশ। অর্জ্জুন অত গীতা টীতা পড়ে অভিমন্যুর শোকে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। তা এঁর ছেলের জন্য শোক হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গিরিশের জন্য জল খাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। বরাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তার পর নিজে হাতে করিয়া খাবার গিরিশের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ কচুরী।

গিরিশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরিশকে খাবার জল দিতে হইবে। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে কুঁজোয় করিয়া জল থাকিত। গ্রীষ্মকাল বৈশাখ মাস, ঠাকুর বলিলেন, "এখানে বেশ জল আছে"।

ঠাকুর অতি অসুস্থ। দাঁড়াইবার শক্তি নাই।

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন,—ঠাকুরের কোমরে কাপড় নাই। দিগম্বর বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিজে জল গড়াইয়া দিবেন! ভক্তদের নিশ্বাস বায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলাস থেকে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন, ঠাণ্ডা কিনা। দেখিতেছেন, জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্য ভাল জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে ঐ জলই দিলেন।

গিরিশ খাবার খাইতেছেন। ভক্তগুলি চতুর্দ্দিকে বসিয়াছেন। মাষ্টার ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন।

গিরিশ। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) । দেবেন বাবু সংসার ত্যাগ কর্‌বেন।

ঠাকুর সর্ব্বদা কথা কহিতে পারেন না, বড় কষ্ট হয়। নিজের ওষ্ঠাধর অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন, "পরিবারদের খাওয়া দাওয়া কিরূপে হবে, তাদের কিসে চল্‌বে ?"

গিরীশ। তা কি কর্‌বেন, জানি না।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। গিরিশ আবার খাইতে খাইতে কথা আরম্ভ করিলেন।

গিরিশ। আচ্ছা মহাশয়—কোন্‌টা ঠিক ? কষ্টে সংসার ছাড়া, না, সংসারে থেকে তাকে ডাকা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। গীতায় দেখ নি ? অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে কর্ম্ম কর্‌লে আর সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাক্‌লে ঠিক ঈশ্বর লাভ হয়।

"যারা কষ্টে ছাড়ে, তারা হীন থাকের লোক।

"সংসারী জ্ঞানী কি রকম জান ? যেমন সারসীর ঘরে কেউ আছে। ভিতর বার দুই দেখ্‌তে পায়।

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। কচুরি গরম আর খুব ভাল।

মাষ্টার (গিরিশের প্রতি)। ফাগুর দোকানের কচুরি। বিখ্যাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিখ্যাত।

গিরিশ (খাইতে খাইতে সহাস্যে)। বেশ কচুরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। লুচি থাক্, কচুরি খাও। (মাষ্টারের প্রতি)। কচুরি কিন্তু রজোগুণের।

গিরিশ খাইতে খাইতে আবার কথা তুলিলেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আচ্ছা মহাশয়, মনটা এত উঁচু আছে, আবার নীচু হয় কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারে থাক্‌তে গেলেই ও রকম হয়। কখন উঁচু কখন নীচু। কখন বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার কমে যায়, কামিনী কাঞ্চন নিয়ে থাক্‌তে হয় কিনা, তাই হয়। সংসারে ভক্ত কখন ঈশ্বরচিন্তা, হরিনাম করে; কখন বা কামিনী কাঞ্চনে মন দেয়। যেমন সাধারণ মাছি কখন সন্দেশে বসছে কখন বা পচা ঘা বা বিষ্ঠাতেও বসে।

"ত্যাগীদের আলাদা কথা। তারা কামিনী কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে; কেবল হরিরস পান কর্‌তে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয় কথা হলে উঠে যায়। ঈশ্বরীয় কথা হলে শুনে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে নিজেরা ঈশ্বর কথা বই আর অন্য বাক্য মুখে আনে না।

"মৌমাছি কেবল ফুলে বসে—মধু খাবে বলে। অন্য কোন জিনিষ মৌমাছির ভাল লাগে না।

গিরীশ দক্ষিণের ছোট ছাদটীর উপর হাত ধুইতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাই, তবে তাঁতে সব মন হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(শাস্ত্র ও অবতার। বৈধীভক্তি ও ভক্তি উন্মাদ)

গিরীশ পুনর্ব্বার ঘরে আসিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছেন ও পান খাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। রাখাল টাখাল এখন বুঝেছে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনে শুনে। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে, কিন্তু বুঝেছে যে, সব মিথ্যা। অনিত্য। রাখাল টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না।

"যেমন পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতর বাস কিন্তু গায়ে পাকের দাগটী পর্য্যন্ত নাই।

গিরীশ। মহাশয়, ও সব আমি বুঝি না। মনে কর্‌লে সব্বাইকে নির্লিপ্ত শুদ্ধ করে দিতে পারেন। কি সংসারী, কি ত্যাগী, সব্বাইকে ভাল করে দিতে পারেন। মলয়ের হাওয়া বইলে, আমি বলি, সব কাঠ চন্দন হয়—

শ্রীরামকৃষ্ণ। সার না থাক্‌লে চন্দন হয় না। শিমুল আরও কয়টী গাছ আছে, এরা চন্দন হয় না।

গিরীশ। তা শুনি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আইনে এরূপ আছে।

গিরীশ। আপনার সব বেআইনি!

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন। মাষ্টারের হাতের পাখা এক একবার স্থির হইয়া যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা হতে পারে. ভক্তি-নদী ওথ্‌লালে ডাঙ্গায় একবাঁশ জল!

"যখন ভক্তি উন্মাদ হয়, তখন বেদবিধি মানে না। দূর্ব্বা তোলে, তা বাচে না। যা হাতে আসে, তাই লয়। তুলসী তোলে, পড়্‌ পড়্‌ করে ডাল ভাঙ্গে।

"আহা কি অবস্থাই গেছে।

(মাষ্টারের প্রতি)। ভক্তি হলে আর কিছুই চাই না।

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। রামাবতারে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য কথ্য। কৃষ্ণাবতারে ও সবও ছিল আবার মধুর ভাব।

"শ্রীমতীর মধুর ভাব—ছেনালী আছে। সীতার শুদ্ধ সতীত্ব, ছেনালী নাই।

"তাঁরই লীলা। যখন যে ভাব।

বিজয়ের * সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে একটী পাগলের মত স্ত্রীলোক ঠাকুরকে গান শুনাইতে যাইত। শ্যামাবিষয়ক গান ও ব্রাহ্মসঙ্গীতও গাইত। তাকে পাগ্‌লী বলে। সে কাশীপুর বাগানেও সর্ব্বদা আছে ও ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য বড় উপদ্রব করে। ভক্তদের সেই জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশাদি ভক্তের প্রতি)। পাগ্‌লীর মধুর ভাব। দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছ্‌লো। হঠাৎ কান্না। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, কেন কাঁদ্‌ছিস্। তা বলে, মাথা ব্যথা কর্‌ছে!

"আর একদিন গিছ্‌লো। আমি খেতে বসেছি। হঠাৎ বল্‌ছে, 'দয়া কর্‌লেন না?' আমি উদারবুদ্ধিতে খাচ্চি। তার পরে বল্‌ছে, 'মনে ঠেল্লেন কেন?' জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোর কি ভাব?' তা বল্লে, 'মধুর-ভাব!' আমি বল্লাম, 'আরে, আমার যে মাতৃযোনি! আমার যে সব মেয়েরা মা!' তা বলে, 'তা আমি জানি না।'

"তখন রামলালকে ডাক্‌লাম। বল্‌লাম, 'ওরে রামলাল, কি মনে

* বিজয়—শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী।

ঠ্যালাঠেলি বল্‌ছে, শোন্ দেখি। ওর এখনও সেই ভাব আছে।

গিরীশ। সে পাগলী ধন্য! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক্, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা কর্‌ছে! সে যে ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ হবে না।

"মহাশয়, কি বল্‌বো! আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি! আগে আলস্য ছিল, এখন সেই আলস্য ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে! পাপ ছিল, তাই এখন নিরহঙ্কার হয়েছি। আর কি বল্‌বো।"

ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন। রাখাল পাগ্‌লীর কথা উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। বল্লেন, দুঃখ হয়, সে উপদ্রব করে, আর তার জন্য অনেকে কষ্টও পায়।

নিরঞ্জন (রাখালের প্রতি)। তোর মাগ আছে; তাই তোর মন কেমন করে। আমরা তাকে বলিদান দিতে পারি।

রাখাল (বিরক্ত হইয়া)। কি বাহাদুরী! ওঁর সাম্‌নে ঐ সব কথা।

* * * * *

(টাকায় আসক্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি)। কামিনী কাঞ্চনই সংসার। অনেকে টাকা গায়ের রক্ত মনে করে। কিন্তু টাকাকে বেশী যত্ন করলে একদিন হয়তো সব বেরিয়ে যায়।

"আমাদের দেশে মাঠে আল বাঁধে। আল জানো? যারা খুব যত্ন করে চারদিকে আল দেয়, তাদের আল জলের তোড়ে ভেঙ্গে যায়। যারা এক দিক্ খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে, তাদের কেমন পলি পড়ে, কত ধান হয়!

"যারা টাকার সদ্ব্যবহার করে, ঠাকুরসেবা, সাধু ভক্তের সেবা করে, দান করে, তাদেরই কাজ হয়। তাদেরই ফসল হয়।

"আমি ডাক্তার কবিরাজের জিনিষ খেতে পারি না। যারা লোকের কষ্ট থেকে টাকা রোজগার করে! ওদের ধন যেন রক্ত পুঁজ!

এই বলিয়া ঠাকুর দুইজন চিকিৎসকের নাম করিলেন।

গিরীশ। রাজেন্দ্র দত্তের খুব দরাজ মন। কারু কাছে একটী পয়সা লয় না। আর দান ধ্যান আছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ১৭ই জানুয়ারি কলিকাতা 'বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরে' স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণার্থ উৎসব হয়। প্রাতে চণ্ডীপাঠ ও হোম হইয়াছিল। অপরাহ্নে এক সভার অধিবেশন হয়, স্বামী সারদানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সিষ্টার নিবেদিতা, রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর, মিঃ জে চৌধুরী, সখারাম গণেশ দেউস্কর, নেশন সম্পাদক মিঃ এন ঘোষ প্রভৃতি সমাগত সভ্যগণ ছাত্রগণের শিক্ষা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। ঘোষ মহাশয় বলেন,—"আমি বিগত কয়েক বৎসর হইতে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের স্মৃতিসংরক্ষিণী সভার সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। আমার অভিজ্ঞতা এই, এই সকল সভার দ্বারা মৃত মহাপুরুষগণের স্মৃতিরক্ষার বড় একটা সাহায্য হয় না। আমি বিবেকানন্দের পুস্তকাবলি পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আমার বিশ্বাস,—তাঁহার মত সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া বেদান্ত কেহ এ পর্য্যন্ত বুঝান নাই। তাঁহার পুস্তকাবলি পাঠ করিতে করিতে আমার যখনই কোন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই আরও খানিক দূর পড়িয়া দেখি, তিনি যেন সেই সন্দেহ নিজে উত্থাপন করিয়া আবার উহার মীমাংসা করিতেছেন। আর একটি কথা আমার মনে হয় যে,—অন্যান্য বেদান্তব্যাখ্যাতাগণ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের উপর বিরুদ্ধভাবাপন্ন, কিন্তু স্বামীজীর, হিন্দুধর্ম্মের নামে প্রচলিত সকল অনুষ্ঠান গুলির প্রতি সহানুভূতি না থাকিলেও তিনি তাঁহার আমেরিকার সেই প্রথম বক্তৃতা হইতেই হিন্দুধর্ম্মকে বেদান্তের সহিত অভিন্নভাবাপন্ন ধরিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বক্তৃতা ও পুস্তকসমূহে বেদান্তকে হিন্দুধর্ম্মব্যাখ্যার যন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তকে এইরূপভাবে ব্যবহার করায় তিনি খুব ভালই করিয়াছেন। আমার মতে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন এই এই উপায়গুলির দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে। —(১ম) তাঁহার লিখিত সমুদয় গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া একটি উত্তম সংস্করণ। (২য়) এই ছাত্রাবাসের ন্যায় ছাত্রাবাস সকল সংস্থাপন। (৩য়) তাঁহার উপদেশ সকল শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন, তদভাবে সংস্কৃত কলেজে তদীয় ব্যাখ্যানুযায়ী বেদান্ত শিক্ষার জন্য নিয়মিত বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা। (৪র্থ) মহাপুরুষগণের স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার প্রকৃত অনুবর্ত্তী ও শিষ্যগণ, সুতরাং যাহাতে তাঁহার শিক্ষানুযায়ী জীবন গঠন করিতে পারা যায়, আমাদের সকলেরই তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমার মতে তদীয় উপদেশে গঠিতজীবন শিষ্যমণ্ডলিই তাঁহার সর্ব্বোত্তম স্মৃতিচিহ্ন।"

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির উদ্যোগে নূতন প্রকাশিত "বীরবাণী" পুস্তিকা (স্বামীজির ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রায় সমুদয় কবিতা ও গীতির সংগ্রহ, মূল্য /০, উদ্বোধন আফিসে প্রাপ্তব্য) সমবেত সভ্যমণ্ডলির মধ্যে বিতরিত হয়। সমিতির সভ্যগণের আহ্বানে সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ কিঞ্চিৎ জলযোগ করেন।

ঘোষ মহাশয়ের কথিত স্বামীজির স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার উপায়গুলি সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু তিনি যে স্বামীজির বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম্মকে অভিন্ন ধরিয়া লইবার কথা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার সেই কথাগুলি ভাল বুঝিতে পারি নাই। বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম্মকে অভিন্ন বলিয়াই আমরা জানি। অনাদিকাল হইতে বেদান্তপ্রচারিত সত্যসমূহ হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বেদান্তের বিভিন্ন সংগ্রাহকগণ বা ভাষ্যকারেরা যতই বিভিন্ন মত পোষণ করুন না কেন, কেহই আপনাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী মনে করেন নাই। তবে অবশ্য সকলেই শাস্ত্রবিরোধী দেশাচারসমূহ নিরাকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামীজিও এ বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। ঘোষ মহাশয় কি বেদান্তমতাবলম্বী অথচ হিন্দুধর্ম্মের উপর বিরুদ্ধভাবাপন্ন আচার্য্যগণ অর্থে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণকে বুঝিয়াছেন? যদি তাহাই তাঁহার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই, এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাই বেদান্তের উপর হিন্দুর ন্যায় শ্রদ্ধাসম্পন্ন নহেন। তাঁহারা উভয়েই বেদান্তকে সমালোচকের চক্ষে দেখিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে উহার অনেক স্থল খণ্ডন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিষয়ের বিশিষ্ট আলোচনা প্রত্যাশা করি।

বিগত ৺শারদীয় পূজার দিন উক্ত 'স্মৃতিমন্দিরের' ছাত্রগণের উৎসাহে পরম ভক্তিসহকারে বীণাপাণির অর্চ্চনা হয়। বাবু পুলিনবিহারী মিত্র আধ্যাত্মিক সঙ্গীত গাহিয়া সকলকে ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়াছিলেন।

সিষ্টার নিবেদিতা সম্প্রতি বাঁকিপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। গীতা সম্বন্ধেই অধিকাংশ বক্তৃতা হইয়াছিল। এক সভায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের যে যুদ্ধে অনিচ্ছা হইয়াছিল তাহা কাপুরুষত্বপ্রসূত কিনা এই সম্বন্ধে বিচার হয়। সিষ্টার নিবেদিতার ব্যাখ্যায় সকলেই গীতার মর্ম্ম সুন্দররূপে বুঝিতে পারেন। এই ব্যাখ্যার ফলস্বরূপ ১৫ই মাঘের এডুকেশন গেজেটে "গীতার ব্যাখ্যা" নামক একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পাঠকবর্গকে সেই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহাতে এক স্থলে বলা হইয়াছে,—"ধর্ম্মযুদ্ধে উপ-

স্থিত অর্জ্জুনের যুদ্ধস্থলে মোহ উপস্থিত হইল। উদ্বোধনে বলা হইয়াছে ভীরুতা। অর্জ্জুনে ভীরুতাব আরোপ ভাল লাগে নাই। কিন্তু সেদিন মিস নিবেদিতাব ব্যাখ্যায় সে ভ্রম কাটিয়া গিয়াছে।"

বিগত ১৭ই জানুয়ারি সালিখায়, ২৪শে জানুয়ারি দক্ষিণেশ্বরে ও ৭ই ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণপুরে উৎসব হয়। তদুপলক্ষে এই সকল স্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও ভক্তগণেব সম্মিলন ও কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। এই সকল উৎসবের দ্বারা ভক্তগণের মধ্যে স্বনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত ও জীবনেব মহান্ আদর্শকে মনে জাগ্রত রাখিবার বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। এই সকল উৎসব যাহাতে একঘেয়ে ভাবের পরিচায়ক না হইয়া পরমহংসদেবের সার্ব্বজনীন ভাবের বিকাশ স্বরূপ হয়, উৎসবের উদ্‌যোক্তাগণের দৃষ্টি সেই বিষয়ে বিশেষ আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

প্রাপ্তিস্বীকার।

From Colombo to Almora—দ্বিতীয় সংস্করণ। কাপড়ে বাঁধাই ৩৲ তিন টাকা, কাগজের মলাট ২॥৹ আড়াই টাকা। ব্রহ্মবাদিন্ প্রেস, ট্রিপ্লিকেন, মান্দ্রাজে প্রাপ্তব্য। এই পুস্তকে স্বামীজি ভারতপ্রত্যাগমনের পর যে সকল অভিনন্দনপত্র প্রাপ্ত হন এবং তাহার উত্তরে যে সকল অমূল্য বক্তৃতা করেন, তাহার সমুদয় গুলির সংগ্রহ আছে। এই পুস্তকে পূর্ব্ব সংস্করণের অপেক্ষা লাহোরের বক্তৃতা কয়েকটি অধিক আছে এবং প্রতি পৃষ্ঠার ধারে ধারে Marginal notes দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইবার পর অনেক দিন অবধি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে সাধারণের সে অভাব দূরীভূত হইল।

পূর্ব্বাভাস।—শ্রীনিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কবিতাপুস্তক। গৌরাঙ্গদেব কেন অবতার হইলেন, তৎসম্বন্ধে বৈষ্ণবদের মত ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

কন্যাদায়। শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত। সামাজিক নাটক। "বিবাহে বরপক্ষীয়দিগের অর্থলালসা বলবতী হওয়াতে ভদ্রসমাজে যে বিষম আঘাত লাগিতেছে" এবং "আমাদের সংস্কারচেষ্টা" যে "অধিকাংশ স্থলে অকিঞ্চিৎকর ও আন্তরিকতাশূন্য" তাহাই এই পুস্তকে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদের বোধ হয়, ভগবান্ এই অশুভের মধ্য দিয়া একটি শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতেছেন। কারণ, ইহাতে বাধ্য হইয়া কন্যাদিগেব বিবাহের বয়স আপনাপনি বৃদ্ধি হইয়া যাইতেছে।

তাড়িতরহস্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

শ্রীঅনাথনাথ পালিত এম্ এ।

২৩। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে, তড়িদ্যুক্ত পদার্থ উদাসীন পদার্থে তড়িতের উদ্দীপন করিতে পারে। স্বর্ণপত্র তড়িদ্বীক্ষণের শীর্ষ হইতে কিয়দ্দূরে তড়িদ্যুক্ত দণ্ড ধৃত হইলে পত্রদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান জন্মে। তড়িদ্বাহক যন্ত্রের পিষ্টক বা চাকিকে তড়িদ্বিশিষ্ট করিয়া তদুপরি উহার আবরণ বা পিত্তলের থালাখানিকে স্থাপন করিলে তাহাতে তড়িৎ উদ্ভূত হয়। এই সকল ব্যাপারে

তড়িৎ-সান্দ্রীকরণ বা তড়িদ্ঘনীকরণ যন্ত্র

স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে, কোন পরিচালক পদার্থে তড়িদুদ্দীপন করিতে হইলে, উহার ও উদ্দীপকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ব্যবধানস্বরূপ যে কোনও অপরিচালক পদার্থ সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাদ্বয়ে বায়ু-স্তরস্বরূপ ব্যবধানের মধ্য দিয়া উদ্দীপন-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। এই রূপ কাচ, লাক্ষা, গন্ধক প্রভৃতির মধ্য দিয়াও তড়িৎপ্রভাব সঙ্ঘটিত হইতে পারে। পরস্পর হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত কাচদণ্ডে আশ্রিত দুইখানি ধাতু-ফলকের মধ্যে একখানি কাচফলককে লম্বভাবে স্থাপন করিয়া এবং একখানি ধাতুফলককে ব্যাম্স্ডেনের তড়িৎসংগ্রহ যন্ত্রের বর্ত্তুলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া যন্ত্রকে ঘুরাইলে দেখা যায়, যে ফলকখানি ধনতড়িদ্যুক্ত হইয়াছে; শুদ্ধ তাহা নহে—এই তড়িৎ দ্বিতীয় ফলকে তড়িতের উদ্দীপন করিয়াছে। সুতরাং উহার সন্নিহিত প্রান্তে ঋণ ও দূরবর্ত্তী প্রান্তে ধন তড়িৎ জন্মি-য়াছে। প্রথমের ধন তড়িৎ দ্বিতীয়ের ঋণ তড়িৎকে আকর্ষণ ও ধন তড়িৎকে বিকর্ষণ করে। একটি ধাতুময় চেন্ দ্বারা দ্বিতীয় ফলককে ভূপৃষ্ঠের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিলে মুক্ত ধন তড়িৎ উহাতে চলিয়া যাইবে; কিন্তু ঋণ তড়িৎ প্রথমের ধন তড়িৎকে আকর্ষণ করিবে। ইহাতে এই ফল হইবে, যে, তড়িৎসংগ্রহ যন্ত্র হইতে আরও কিছু ধন তড়িৎ প্রথম ফলকে আসিবে —যে কিঞ্চিৎ অধিক ধন তড়িৎ আসিবে, তাহার প্রভাবে দ্বিতীয়ে কিঞ্চিৎ

অধিক ঋণ তড়িৎ জন্মিবে; এইরূপে কাচফলকের ভিতর দিয়া ধাতু-ফলকদ্বয়ের বিরুদ্ধ তড়িতের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ চলিবে এবং এই কারণেই উভয় ফলকে অতি অধিক পরিমাণে তড়িৎ উদ্ভূত হইবে। দ্বিতীয় ফলক না থাকিলে প্রথম ফলক খানিতে এত অধিক তড়িৎ সংগৃহীত হইত না। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ধাতুফলকদ্বয়ে অধিক পরিমাণে তড়িৎ সঙ্কলিত হয়; সুতরাং তড়িতের ঘন সন্নিবেশ হইয়াছে এরূপ বলা যায়। আর যন্ত্রটি দ্বারা তড়িতের ঘনসমাবেশ বা "সান্দ্রত্ব" (ঘনত্ব-Density) সম্পাদিত হওয়ায় ইহাকে "তড়িদ্ঘনীকরণ" বা "তড়িৎসান্দ্রীকরণ" যন্ত্র (Electrical Condenser) বলে। যে ফলকখানি তড়িৎসংগ্রহ যন্ত্র হইতে তড়িৎ আহরণ করে, তাহাকে "সঙ্কলক" (Collecting) ফলক, আর অন্যটি অর্থাৎ যাহা দ্বারা তড়িৎ ঘনীভূত হয়, তাহাকে "সান্দ্রীকরণ" (Condensing) ফলক বলে। এই পরীক্ষা দ্বারা জানা যাইতেছে, যে ভূতলের সহিত সংযুক্ত সুরক্ষিত একখানি ধাতুফলককে, তড়িদাধারের সহিত সংযুক্ত আর এক খানি সুরক্ষিত ধাতুফলক হইতে কিয়দ্দূরে রাখিয়া, উহাদের মধ্যে একখানি কাচফলক স্থাপন করিলে, প্রথমোক্ত ফলকের "তড়িদ্ধারণাশক্তি" (Capacity) বর্দ্ধিত হয়। তড়িৎসংগ্রহ যন্ত্রের বর্ত্তুলের নিকট অঙ্গুলিগ্রন্থি আনিলে এবং যন্ত্রকে ঘুরাইলে, পিট্ পিট্ শব্দে মধ্যস্থ বায়ু ভেদ করিয়া গ্রন্থিতে যে তড়িৎস্ফুলিঙ্গ আগমন করে, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; এই ব্যাপারটি তড়িৎসান্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার লক্ষণ মাত্র। কেননা এস্থলে গোলকে সঞ্চিত তড়িৎ, মধ্যবর্ত্তী বায়ুস্তরের অভ্যন্তর দিয়া অঙ্গুলিগ্রন্থিতে বিরুদ্ধ তড়িতের উদ্দীপন করে—দুইটি বিজাতীয় তড়িতের পরস্পর আকর্ষণের ফলস্বরূপে গোলকে অধিক পরিমাণে তড়িৎ সংগৃহীত হয়। অবশ্য অতিমাত্র সঞ্চিত বিরুদ্ধ তড়িতের পুনর্ম্মিলন তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়।

২৪। সান্দ্রীকরণ যন্ত্রের অঙ্গীভূত ফলকদ্বয়ের পরিমাণ যত অধিক হইবে, আর দূরত্ব বা ব্যবধান যত অল্প হইবে, যন্ত্রদ্বারা তত অধিক পরিমাণে তড়িৎ ঘনীভূত হইবে। অবশ্য ফলকদ্বয়ের আকৃতি এবং মধ্যবর্ত্তী অপরিচালক পদার্থের প্রকৃতি অনুসারেও যন্ত্রটির তড়িদ্ধারণাশক্তির তারতম্য হইয়া থাকে অর্থাৎ ধাতু-

সান্দ্রীকরণ যন্ত্রের তড়িদ্ধারণাশক্তির তারতম্যের কারণ।

পদার্থদ্বয়ের আকার—পাতের মতন বা নলের মতন বা বর্তুলের মতন হইলে যন্ত্রে সমান পরিমাণ তড়িৎ সঞ্চিত হইবে না; আবার একই যন্ত্রে সমান পরিমাণ স্থূল কাচের পাত কি গালার পাত কি গন্ধকের পাত, কি বায়ুর স্তর ইহাদের সকলের দ্বারা সমান মাত্রায় তড়িৎ ঘনীভূত হয় না।

২৫। একটি মোটা গলাবিশিষ্ট কাচের বোতলের ভিতরের তলায়, আর গলা হইতে কিছু দূর নীচে ভিতর ও বাহির পিঠে রাঙ্‌তার পাত বসাইয়া এবং বোতলের তলা স্পর্শ করিতে পারে, এমন দীর্ঘ একটি পিত্তলের তারকে উহার ছিপি ভেদ করাইয়া দিয়া তারের বহিঃপ্রান্তে একটী ক্ষুদ্র পিত্তলের গোলা সংলগ্ন করিলে অল্পব্যয়সাধ্য একটি তড়িৎ-সান্দ্রীকরণ যন্ত্র প্রস্তুত হইবে। ইহাকে ইংরাজীতে Leyden Jar বা লিডেন বোতল বলে। বোতলকে কিয়ৎ-

লিডেন্‌জার বা বোতল

কালের জন্য তড়িৎসংগ্রহ যন্ত্রের নিকট লইয়া গিয়া, উহার গোলাটিকে যন্ত্রের বর্তুলের নিকট ধরিলে পিট্‌ পিট্‌ শব্দে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া কতকগুলি তড়িৎস্ফুলিঙ্গ বোতলের গোলাটিতে প্রবেশ করিবে এবং বোতলে তড়িৎ ঘনীভূত হইবে। এক্ষণে বোতলকে যন্ত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া এক হস্তে ধরিয়া অপর হস্তদ্বারা উহার গোলা স্পর্শ করিলে বাহু-দ্বয়ের ভিতরে অতি ভয়ানক ধাক্কা দিয়া, শরীরের মধ্যে তড়িৎ চলিয়া যাইবে। এস্থলে বোতলের উভয়-পৃষ্ঠ-সংলগ্ন রাংতার পাতে বিপুল পরিমাণে বিষম তড়িৎ (ধন ও ঋণ) সঞ্চিত হয়; এক হস্তে বহিস্পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া পরে অন্য হস্ত দ্বারা অন্তঃপৃষ্ঠসংলিপ্ত গোলক স্পর্শ করিবা-মাত্র বিরুদ্ধ তড়িৎ বাহুমধ্যে ও বক্ষে সম্মিলিত হওয়ায় ঐ সকল স্থলে ভয়ানক "অভিঘাত" (Shock) বা ধাক্কা উৎপাদিত হয়। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ড-দেশের অন্তঃপাতী লিডেন নগরীর বিজ্ঞানাধ্যাপক মুশেনব্রোকের আদেশে তাঁহার শিষ্য কিউনিয়াস্ একটি বোতলের জলকে তড়িৎ-যুক্ত করিবার জন্য, এক হস্তে বোতলটি ধরিয়া তড়িৎসংগ্রহ যন্ত্রের গোলক হইতে লম্বমান একটি তারকে ঐ জলের সহিত স্পর্শ করাইয়া দিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল যন্ত্রটির কার্য্য চলিলে পর তিনি অকস্মাৎ অন্য হস্তে গোলক স্পর্শ করিবা-মাত্র ভীষণ অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত ব্যাপার স্বয়ং পরীক্ষা করিতে গিয়া, তাঁহার গুরুও বাহুদ্বয়ে ও বক্ষঃস্থলে এরূপ ভয়ানক অভিঘাত

পাইয়াছিলেন, যে, দুই দিন শয্যাগত হইয়াছিলেন এবং অনেক বন্ধুকে এতৎ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন, যে, সমগ্র ফরাশীস্ রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিলেও তিনি এই ব্যাপারে পুনঃ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন না।

২৬। পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় হস্তদ্বারা বিরুদ্ধধর্ম্মী তাড়িতের পুনঃসম্মিলনে "তড়িৎ-স্রাব" (Electrical Discharge) সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাপদে তড়িৎ-স্রাব সাধিত হইতে পারে। দুই অংশে বক্রীকৃত একটি তারের প্রান্তদ্বয়ে রাঙের পাতদ্বারা আবৃত দুইটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠবর্ত্তুল (সুপারি লইলেও চলিবে) সংলগ্ন করিয়া তারের মধ্যস্থলকে একটি দীর্ঘ নলাকার শিশির মুখে প্রবেশ করাইয়া দিয়া উহাকে ছিপি দ্বারা আবদ্ধ করিতে হইবে। এখন শিশিকে রৌদ্রে শুকাইয়া হস্তে ধরিয়া তারের এক প্রান্তকে পূর্ব্বোক্ত তড়িৎযুক্ত বোতলের বহিস্পৃষ্ঠের সহিত স্পর্শ করাইতে হইবে; পরে তারের অপর প্রান্তকে বোতলের শীর্ষস্থ গোলকের নিকট আনিবামাত্র পটাৎ শব্দে উজ্জ্বলালোকময় তড়িৎস্ফুলিঙ্গ উক্ত প্রান্তস্থিত কাষ্ঠবর্ত্তুল হইতে বোতলের গোলকে লাফাইয়া যাইবে। এস্থলে রাঙের পাতস্বরূপ বোতলের "আবরণী" দ্বয়ের (Coatings) বিরুদ্ধ তড়িতের পুনর্ম্মিলনে সহজে বোতলে তড়িৎ-স্রাব সম্পাদিত হয়। এই প্রণালীর তড়িদ্বিচ্যুতিকে "আকস্মিক" বা "মুহূর্ত্তসাধ্য" (Instantaneous) তড়িৎ-স্রাব বলে। আর ধীরে ধীরে

ধীর তড়িৎস্রাব ও মুহূর্ত্তসাধ্য তড়িৎস্রাব।

বোতল হইতে তড়িদ্বিযোজন করিতে হইলে উহাকে কাঠের পায়াযুক্ত টুলে বসাইতে হইবে। এক্ষণে অঙ্গুলিগ্রন্থিকে উহার বর্ত্তুলের নিকট লইয়া গেলে একটি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইবে; পরে গ্রন্থি, বোতলের বহিস্পৃষ্ঠের নিকট আনীত হইলে আর একটি স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যাইবে। এইরূপে যথাক্রমে বোতলের অন্তঃপৃষ্ঠ ও বহিস্পৃষ্ঠ স্পর্শ করিলে অনেকক্ষণ পরে বোতলটি সম্পূর্ণরূপে তড়িদ্বিহীন হইবে। এবম্বিধ তড়িদ্বিযোজন ব্যাপারকে "ধীর তড়িৎ-স্রাব" (Slow Discharge) কহে।

২৭। লিডেন জার বা বোতলের "আবরণী" অথবা অন্তঃপৃষ্ঠ ও বহিস্পৃষ্ঠ-সংলগ্ন রাঙের ফলকদ্বয়, পূর্ব্বোক্ত বক্রীকৃত তারের "নিঃস্রাবণদণ্ডের" (Discharger) প্রান্তদ্বয় দ্বারা যুগপৎ স্পৃষ্ট হইলে দেখা যায়, যে, কখন কখন বোতলটি সম্পূর্ণরূপে তড়িদ্বিমুক্ত হয় না। উহা হইতে পুনরায় এক বা অধিক

ক্ষণ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর অভিঘাত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার কারণ এই, যে, বোতলটিকে তড়িদ্‌যুক্ত করিবার সময় কাচপাত্রটি তৎসংলগ্ন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী তড়িতের আকর্ষণে "আকুঞ্চিত" (Strained) হইয়া যায়। এই আকুঞ্চনাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। ধন ও ঋণ এই বিষম তড়িৎ, পাত্রের অভ্যন্তরে কিয়ৎপরিমাণে প্রবেশ করে; উহারা প্রথম নিঃস্রাব-মুহূর্ত্তেই কাচপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয না। কিয়ৎকাল পরে বহির্গত হয়। তখন আবার পাত্রটি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই একবার তড়িৎস্রাব সংঘটিত হইলে পাত্রটিতে কিঞ্চিৎ তড়িৎ অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য এই উদ্বৃত্ত তডিতের মাত্রা, বোতলে তডিৎসংযোগকালের উপব নির্ভর করে। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, কাচপাত্রটি অতি ক্ষীণ হইলে আকুঞ্চনাবস্থা সহ্য করিতে পারিবে না—বিরুদ্ধধর্ম্মী তডিদ্দ্বয় কাচপাত্রভেদ করিয়া সম্মিলিত হইবে এবং পাত্রটি ভগ্ন হইযা যাইবে।

লিডেন জারের উদ্বৃত্ত তড়িতের কারণ।

২৮। কাচপাত্রটি সান্দ্রীকবণ ব্যাপাবেব মূলীভূত কারণ, উহারই পৃষ্ঠদ্বয়ে বিরুদ্ধ তড়িৎ সঞ্চিত হয, আর আবরণীদ্বয় দ্বারা কেবল উক্ত তড়িৎ পবিচালিত হয় মাত্র—এই সকল ব্যাপাবেব সম্যক্ পরীক্ষার জন্য এরূপ একটি লিডেন জার বা বোতল প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহার অঙ্গত্রয অর্থাৎ দুইটী ধাতুময়ী আবরণী ও কাচপাত্র পরস্পর পৃথক্ করা যায়। এইরূপ "বিচ্ছিন্ন লিডেন জার" (Dissected Leyden Jar) নির্ম্মাণের জন্য একটি কাচেব ও দুইটি টিনের গ্ল্যাসেব প্রযোজন। অন্তরাবরণী স্বরূপ টিনের গ্ল্যাসটি অন্যটির অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও উহার মুখ আবদ্ধ; এই আবদ্ধ মুখের সহিত বক্রীকৃত তারযুক্ত এক পিত্তল গোলক সংলগ্ন থাকে। বিরুদ্ধ তড়িতের অবস্থান কোথায ইহা পবীক্ষার জন্য এইরূপ লিডেন বোতলকে তড়িদ্‌যুক্ত করিয়া উহাকে কাচের পাযাযুক্ত কাঠের টুলে স্থাপন করিতে হইবে। পরে অতি সাবধানে যন্ত্রের তিনটি অঙ্গকে উন্মুক্ত করিয়া টুলে রাখিতে হইবে; অবশ্য উহাদিগকে পৃথক্ করিবার জন্য হস্ত ব্যবহার করা উচিত নয়, কাচদণ্ড দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এক্ষণে পরীক্ষা

সান্দ্রীকরণ যন্ত্রে তড়িতের অবস্থান ভূমি —অন্তবর্ত্তী কাচ-পৃষ্ঠ।

করিলে দেখা যাইবে, যে, আবরণীদ্বয়ে তড়িতের লেশমাত্র নাই। কিন্তু অঙ্গ গুলি পুনঃ সজ্জিত হইলে যন্ত্র হইতে পুনরায় তড়িৎস্রাব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এই ব্যাপারে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে, আবরণীদ্বয় কাচপাত্রটির উভয় পৃষ্ঠে বিরুদ্ধ ধর্ম্মী তড়িৎকে চালিত করিয়া দেয়, সুতরাং উক্ত পাত্রপৃষ্ঠই তড়িদ্দ্বয়ের অবস্থান-ভূমি। উহাদের আকর্ষণে কাচপৃষ্ঠ আকুঞ্চিত হইয়া যায়।

২৯। শরীরে ভীষণ উত্তেজনা উৎপাদন ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত বোতল্বের অন্য ক্রিয়া আছে। একটি শিকলির একপ্রান্ত তড়িদ্যুক্ত বোতলের বহিস্পৃষ্ঠে জড়াইয়া অপর প্রান্ত, ঈথার বা স্পিরিট (সুরাসার) নামক সহজে দাহ্য তরলপদার্থ পূর্ণ ধাতুপাত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া বোতলের গোলাটি পাত্রস্থ তরল পদার্থের নিকট আনিবা মাত্র তড়িন্নিঃস্রাব হইয়া যাওযায় তরল পদার্থটি প্রজ্বলিত হয়। তড়িন্নিঃস্রাব দ্বারা সূক্ষ্ম তার উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত হইতে পারে, ক্ষীণ কাচ বিদীর্ণ হয়। যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়। মূল পদার্থ সংযোগে যৌগিক পদার্থ উৎপাদিত হয়। তড়িৎসংগ্রহ যন্ত্র চালিত হইবার সময় একবার তীব্র গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। উহা "ওজোন" (Ozone) নামক বায়বীয পদার্থের উৎপত্তির লক্ষণ। বায়ুরাশিস্থ অম্লজনক বা অক্সিজেন (Oxygen) তড়িৎ-পরিচালনা দ্বারা বিকৃত ও ঘনীভূত হয়। এই ঘনীভূত অম্লজনকই ওজোন। দুই আয়তন উদজনক বায়ু ও এক আয়তন অম্লজনক বায়ুদ্বারা পূর্ণ বোতলে তড়িন্নিঃস্রাব সঞ্চালিত হইলে, ভযানক শব্দে বায়ুদ্বয়ের রাসায়নিক সম্মিলন সম্পাদিত হইয়া জল উৎপন্ন হয়। উপায়বিশেষে প্রস্তুত নির্ব্বাত কাচ নলে (Geissler's Tubes) তড়িন্নিঃস্রাব সঞ্চালিত হইলে দিব্যদ্যুতিভাণকারী নয়নাভিরাম বিচিত্র বর্ণস্তূপ আবির্ভূত হয়।

তড়িন্নিঃস্রাবের ক্রিয়া।

৩০। কৃত্রিম উপায়ে কিরূপে তড়িৎ উৎপন্ন করা যায়, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হইল। কিন্তু যে প্রাকৃতিক শক্তি ক্ষণপ্রভারূপে নযন চমকিত করিয়া কড় কড় শব্দে নরনারীর হৃৎকম্প জন্মাইয়া দেয, সেই বিদ্যুৎরূপা শক্তি ও তড়িৎ যে একই প্রকার, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যন্ত্রোদ্ভূত তড়িৎ বিদ্যুতের ক্ষুদ্র প্রতিমা-স্বরূপা। অতি প্রাচীন

কাল হইতে এই উভয় শক্তির সাম্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনই প্রথম এই সাদৃশ্যকে পরীক্ষা-সিদ্ধ করেন। তিনি রেশমী বস্ত্র নির্ম্মিত একখানি ঘুড়ীর রজ্জুতে রেশমী সূত্র বাঁধিয়া উহাদের সন্ধিস্থলে একটি চাবি ঝুলাইয়া দেন এবং রেশমী সূত্রের অপর প্রান্তটি একটি বৃক্ষে আবদ্ধ করেন। যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, ঘুড়ী উড়ান ব্যাপারটি তখন পরীক্ষা করা হয়। তিনি কিয়ৎকাল ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বিদ্যুতের ক্রিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমে চাবিটির নিকট অঙ্গুলি-গ্রন্থি আনয়ন করিলে তড়িত্স্ফুলিঙ্গ পাই-লেন না দেখিয়া তিনি হতাশ্বাস হইলেন। কিন্তু অল্পকাল পরে বৃষ্টি দ্বারা রেশমী সূত্র আর্দ্র ও তড়িৎ-পরিচালক হইলে তিনি স্ফুলিঙ্গোদয় দর্শন করেন। এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইযা তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়া-ছিলেন, যে, অশ্রুবিসর্জ্জন সংবরণ করিতে পারেন নাই। এস্থলে বলা বাহুল্য মাত্র যে, তড়িংযুক্ত মেঘ ঘুড়ী খানিতে তড়িতের উদ্দীপন করিয়া-ছিল।

বিদ্যুৎ ও তড়িতে সাদৃশ্য।

৩১। সকল সময়েই বায়ুমণ্ডলে তড়িৎ বিদ্যমান থাকে। শুদ্ধ যে ঝটিকাকালে উহার সত্তা উপলব্ধি করা যায়, এমন নহে। এই তড়িৎ সাধারণতঃ ধন কখন কখন ঋণ হইয়া থাকে। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধতর স্তরগুলি ধন তড়িৎ যুক্ত হয়; কিন্তু বৃষ্টির সময় তড়িতের প্রকৃতির ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটে। অর্থাৎ উহা ঋণ হইতে ধন, ধন হইতে ঋণ পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। এই তড়িতের উৎপত্তির কারণ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মত-দ্বৈধ আছে। কাহারও মতে ভূপৃষ্ঠ হইতে জলীয় বাষ্পের উদ্ভব, কাহা-রও মতে ভূপৃষ্ঠের সহিত বায়ুর সংঘর্ষণ, কাহারও মতে লতা গুল্মাদির জন্মই বায়ুমণ্ডলস্থ তড়িতের উদ্ভব-হেতু। এই তড়িতের সত্তা পরীক্ষা করিতে হইলে স্বর্ণপত্র তড়িদ্বীক্ষণের শীর্ষের সহিত এক সুদীর্ঘ সূক্ষ্ম শলাকা সংলগ্ন করিতে হইবে। ইহাতে পত্রদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যবধান উৎপাদিত হইবে, তাহা বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ দ্বারা উদ্দীপ্ত সমধর্ম্মী তড়িতের লক্ষণ

বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ পরীক্ষা।

মাত্র। এস্থলে বলা বাহুল্য, যে, উদ্দীপ্ত বিষমধর্ম্মী তড়িৎ শলাকার সূক্ষ্ম মুখ দ্বারা বায়ুরাশিতে পলায়ন করে; সুতরাং বায়ুমণ্ডলে যে জাতীয় তড়িৎ থাকে, পত্রদ্বয়ে সেই জাতীয় তড়িৎ উদ্ভূত হয়।

৩২। বায়ুরাশিতে অদৃশ্যভাবে বিদ্যমান জলকণা সমূহে ভূরি ভূরি তড়িৎ থাকে। পৃথিবীর আকর্ষণে উহারা ভূপৃষ্ঠাভিমুখে পতিত হইবার কালে পরস্পর মিলিত হইয়া যায়। কতকগুলি কণার সম্মিলনে যে বৃহত্তর জলকণা গঠিত হয় তাহার তড়িৎ এক একটি কণার তড়িতের অনেক গুণ। বর্ত্তুলাকার কণা সমূহের আয়তন বর্দ্ধিত হওয়ায় তড়িদ্ধারণাশক্তি বাড়িতে থাকে; কেননা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বর্ত্তুলের ব্যাস (Diameter) যত অধিক হয়, তড়িদ্ধারণের ক্ষমতাও তত অধিক হইবে। এক একটি মেঘে যে কত জলকণা আছে, তাহার পরিমাণ করা যায় না। সুতরাং এইরূপ তড়িদ্যুক্ত অসংখ্য বারিবিন্দুর সমবায়ে মেঘপৃষ্ঠে তড়িতের ঘন সন্নিবেশ সংঘটিত হয়। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে মেঘ ও ভূপৃষ্ঠ যেন একটি বিশাল তড়িৎসান্দ্রীকরণ যন্ত্রের দুইখানি আবরণ—তড়িদ্বিশিষ্ট মেঘ, যন্ত্রটির তড়িৎসঞ্চয়ী ফলক আর ভূপৃষ্ঠ ঘনীভবকারী ফলক। মধ্যবর্ত্তী বায়ুস্তূপের সহায়তায় ভূপৃষ্ঠে যে বিষমধর্ম্মী তড়িৎ উদ্দীপ্ত হয়, তাহা মেঘাশ্রিত তড়িৎকে আকর্ষণ করে; এইরূপে উহার নিম্নপৃষ্ঠে এত বিপুল পরিমাণে তড়িৎ বাড়িতে থাকে যে, ভূপৃষ্ঠস্থ বিরুদ্ধ তড়িতের সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য মাত্র যে, এই ব্যাপারে বায়ুরাশি সম্যক্ কুঞ্চিত হয়। বিরুদ্ধ তড়িতের মাত্রা যতই বর্দ্ধিত হয়, আকুঞ্চন প্রক্রিয়ার প্রকোপও তত বাড়িতে থাকে। শেষে বায়ুরাশি আকুঞ্চনাবস্থা আর সহ্য করিতে পারে না এবং লিডেন জারের কাচপাত্রটীর ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বিরুদ্ধ তড়িতের পুনঃ সম্মিলনরূপে তড়িৎ-স্রাব মেঘপৃষ্ঠের এক অংশ হইতে ভূপৃষ্ঠাভিমুখে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় আবির্ভূত হয়। এই ছটা কখন কখন অর্দ্ধক্রোশ দীর্ঘ হইয়া থাকে। বায়ুস্তূপবিদারণসম্ভূত শব্দই বজ্রনাদ বলিয়া বিখ্যাত। অবশ্য বিদ্যুৎ ও বজ্র একই সময়ে উৎপন্ন হয়; কিন্তু আলোকের গতি শব্দের গতি অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক বলিয়া আমরা অগ্রে বিদ্যুৎ দেখিতে পাই; পরে বজ্রধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে।

বিদ্যুৎ ও বজ্রের কারণ, বজ্রপাতের ক্রিয়া।

বজ্রপাতের ক্রিয়া বৈচিত্র্যময়ী। বজ্রপাতে জীবের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, দাহ্য পদার্থ প্রজ্বলিত হয়, ধাতব পদার্থ অতি উত্তপ্ত হইয়া দ্রবীভূত হয়, অপরিচালক পদার্থ খণ্ড খণ্ড হইয়া বিভক্ত হয়, লৌহ চৌম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় এবং চৌম্বক সূচীর মেরু বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। আকাশপথে বিদ্যুৎ-সঞ্চালন দ্বারা বায়ুর অক্সিজেন ঘনীভূত হইয়া "ওজোন" রূপে বিকৃত হয়; এই কারণেই বৃষ্টির জলে নাইট্রিক অ্যাসিডের সত্তার উপলব্ধি হয়। কখন কখন যে স্থলে বজ্রপাত হয়, তাহা হইতে অনেক দূরে জীবশরীরে উহার সাংঘাতিক ক্রিয়া দেখা যায়। তড়িত্বান্ মেঘ জীবদেহে বিরুদ্ধ তড়িৎ উৎপাদন করে; মেঘ ও ভূপৃষ্ঠের বিষমধর্ম্মী তড়িতের সম্মিলন কালে জীবদেহে উদ্দীপ্ত তড়িৎ সহসা নির্গত হইয়া ভূপৃষ্ঠে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। অকস্মাৎ তড়িদ্যুক্ত অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইবার সময় শরীর মধ্যে যে ভীষণ উত্তেজনা জন্মে, তাহাই পূর্ব্বোক্ত বিপৎসঙ্কুল ব্যাপারের কারণ।

বজ্রবারক

৩৩। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে, সূচীমুখ সূক্ষ্ম শলাকা, পদার্থকে তড়িদ্বিহীন করে। গৃহকে বজ্রাঘাত হইতে নিরাপদে রক্ষিত করিতে হইলে উহা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি সুদীর্ঘ সূক্ষ্মমুখ লৌহশলাকার স্থূলপ্রান্তকে ভূগর্ভের সহিত উত্তমরূপে প্রোথিত করিতে হইবে। শলাকাটির সূক্ষ্ম প্রান্ত গৃহের উচ্চতম অংশ অতিক্রম করিয়া শূন্যে অবস্থিত থাকিবে। এইরূপ লৌহদণ্ডকে "বজ্রবারক" (Lightning Conductor) বলে। তড়িদ্বিশিষ্ট মেঘ, দণ্ডে উর্দ্ধস্থ আকাশ পথ দিয়া যাইবার সময় দণ্ডে যে বিরুদ্ধধর্ম্মী তড়িৎ উদ্দীপন করে, তাহা দণ্ডের সূক্ষ্মশীর্ষ দিয়া নির্গত হয় এবং মেঘের তড়িতের সহিত মিলিত হইয়া উহাকে তড়িদ্বিহীন করে। এইরূপে দণ্ডটি যেন ধীরে ধীরে তড়িত্বান্ মেঘ হইতে তড়িৎরূপ অনল অপহরণ করে।

মেরুপ্রভা।

৩৪। পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে দিবাবসান কালে মধ্যে মধ্যে আকাশ পথে এক দিব্যপ্রভা বিদ্যোতমানা হয়। ইহাকে "মেরুপ্রভা" (Polar Aurora) বলে। এই ছটা প্রথমে যেন কুহেলিকার ন্যায় অস্ফুটভাবে প্রতিভাত হয়, ক্রমে পীতাভ ধনুর আকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া যায়। শেষে ভূপৃষ্ঠের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া

পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে রশ্মির বর্ণপবিবর্ত্তনও ঘটে। এই আলোকময় ধনুঃ চৌম্বকসূচীর ব্যতিক্রম উৎপাদন করে এবং উহার ন্যায় উত্তরদিক্ সূচনা করে। এই কারণে কেহ কেহ অনুমান করেন, যে, এই নৈসর্গিক ঘটনাটি বায়ুরাশির ঊর্দ্ধ্বতম প্রদেশের তড়িন্নিঃস্রাবেব লক্ষণমাত্র। যাহা হউক, প্রকৃতিদেবীর শিরোবেষ্টন স্বরূপ এই জ্যোতিঃ যে বিশ্বস্রষ্টার এক সুচারু শিল্পেব নিদর্শন, তদ্বিষযে কাহারও সন্দেহ নাই।

উত্তরাখণ্ডে গঙ্গোত্রি ও যমুনোত্রি।

(শ্রীনিকুঞ্জবিহাবী মল্লিক।)

আজ কাল শিক্ষিত সম্প্রদাযেব মধ্যে অনেকেব দেশভ্রমণে বা তীর্থ ভ্রমণে আগ্রহ দেখা যায। ইহা আমাদের দেশেব পক্ষে অতি শুভ চিহ্ন; কাবণ, শিক্ষিত লোকে যদ্যপি ভারতবর্ষেব বিভিন্ন অংশে অবস্থিত হিন্দুদিগেব আচার ব্যবহাব, রীতি নীতি, শিল্প বাণিজ্য এবং সামাজিক ও বাজনৈতিক অবস্থা সকল এই ভ্রমণ ব্যপদেশে বিশেষ মনোযোগেব সহিত লক্ষ্য রাখিযা এবং কোন্ দেশ কোন্ বিষযে কেন উন্নতি বা অবনতি লাভ করিতেছে, তাহা নিজে প্রত্যক্ষ করিযা, সে বিষয়ে স্থিব ভাবে বিচার পূর্ব্বক, নিজ দেশের বা সমাজেব আচার ব্যবহাব রীতি নীতি প্রভৃতিতে যে সকল দোষ আছে বা যাহাতে দেশেব বা সমাজের অবনতি হইতেছে, তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশের ও সমাজের নিশ্চযই প্রভূত উপকার হয। তাঁহাদের কৃত সংশোধন বিষয়ে নিরপেক্ষ ভাবে যে আন্দোলন, তাহাতে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই প্রাণের সহিত নিশ্চযই যোগ দান করে; নচেৎ দেশের বা সমাজের দুরবস্থা নিজে প্রত্যক্ষ না করিয়া, এবং অপরাপর দেশ বা সমাজ সেই সকল অবনতি হইতে আপনাদিগকে কি উপাযে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে, ও তাহার ফল সন্তোষজনক হইতেছে কি না, এই সকল নিজে বিচার না করিয়া যে আন্দোলন, তাহা বৃথা সময় নষ্ট মাত্র। আব হিন্দুধর্ম্মের

বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ মতের প্রাধান্য ভারতে কতদূর বিস্তার করিয়াছে ও সেই সেই মতের প্রতিপত্তিতে দেশের সাধারণ অবস্থা কতদূর উন্নত বা অবনত হইয়াছে, এবং সেই সকল মতে কতদূর উদার বা সঙ্কীর্ণ ভাব আছে, বা সেই সকল মতের মধ্যে সাধারণ ভাব কি কি আছে, যাহাকে হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি বা সাম্প্রদায়িকভাববর্জ্জিত ভিত্তি বলা যায়; এই সকল বিষয় ভারতের বিভিন্ন তীর্থ স্থান সকল ভ্রমণে বেশ বলিতে পারা যায়, কারণ, তীর্থ স্থানে ভারতের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীর সমবায় সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কারপ্রয়াসী লোকের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে সাম্প্রদায়িক গোড়ামি বা কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারেন। তীর্থ ভ্রমণে বিশেষ উপকার এই যে, ইহাতে অন্তরে ঈশ্বর চিন্তা বা ভগবদ্ভাবের বিশেষ উদ্দীপনা হয়, সহজেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়, ঘোর সাংসারিকের অপর কাহারও ইষ্টের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যে কেবল মাত্র নিজ বা নিজ পারিবারিক স্বার্থচিন্তার ভাব, তাহার বেগও মন্দীভূত হয়; এবং সাংসারিক নানা বিষয়ে অশান্ত জীবকে যেন অনেক পরিমাণে শান্তি দান করে।

আজকাল ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র রেল হওয়ায় এবং ইংরাজের অধিকার বিস্তৃত হওয়ায় তীর্থাদি ভ্রমণে কোন রূপ অসুবিধা নাই এবং তীর্থ ভ্রমণ বিষয়ে অনেক পুস্তকাদি বাহির হওয়ায় সাধারণের ঐ সকল স্থানের বিবরণ জানিবার বেশ সুবিধা হইয়াছে। তবে যে সকল তীর্থের নিকট এখনও রেল নাই এবং হিমালয়ে যে সকল তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ ভ্রমণে সাধারণের কিছু অসুবিধা হয়; কারণ, একে ত ঐ সকল স্থানের বিবরণ প্রাঞ্জল ভাবে কোন পুস্তকাদিতে পাওয়া যায় না, তাহাতে আবার পথ অতিশয় দুর্গম, ঐ সকল পথে সচরাচর সুবিধামত যান বাহনাদি পাওয়া যায় না, শারীরিক অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, পাকশাক করিবার অভ্যাস কতকটা নিজের থাকা চাই, ও শরীরেও সামর্থ্য থাকা দরকার। কিন্তু এই সকল দুর্গম তীর্থে শারীরিক যতই কেন কষ্ট হউক না, মনের বল যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পথে ঈশ্বরচিন্তা বা ভগবানের লীলাস্থান দেখিতে যাইতেছি, এই ভাব মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে; অপর কোনরূপ কুচিন্তা মনে আদৌ আসে না, তীর্থ স্থানের যতই নিকট হওয়া যায়, মনে ততই উত্তরোত্তর আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং

তীর্থে যাইয়া পৌছিলে সাংসারিক ভাব প্রায় একেবারে ভুলিয়া যাওয়া যায়। রেলের নিকট অবস্থিত যে সকল ধনজনপূর্ণ তীর্থ আছে, তথায় রেলে চড়িয়া গিয়া তথাকার ঐশ্বর্য্য বা সমৃদ্ধি দেখিয়া ও লোকজনের, গাড়ি ঘোড়ার কোলাহল শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ ভগবৎ-উদ্দীপনা বা আনন্দ হয় না। যাঁহারা এইরূপ দুর্গম তীর্থ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণের সুবিধার জন্য সেই সকল তীর্থের বিবরণ যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিলে ভবিষ্যৎ যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনেক সাহায্য হইতে পারে।

গত আশ্বিন মাসের উদ্বোধন পত্রিকায় 'হিমালয়ে কেদারনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। জন কতক বিদ্যালয়ের ছাত্র বিদ্যালয়ের অবকাশের সময় অলসভাবে নষ্ট না করিয়া প্রকৃতির অনন্ত গম্ভীর মূর্ত্তি, চির-শান্তি-নিকেতন সেই তুষারমণ্ডিত হিমালয়ে কেদারনাথ দর্শনে গিয়াছিল; দেশের শিক্ষিত যুবকদের ইহা অনুকরণীয় হইলে ভাল হয়। আমি নিজে কিছুদিন পূর্ব্বে হিমালয়ের এই সকল তীর্থে একবার গিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে গঙ্গোত্রি ও যমুনোত্রি পথের বিবরণ ও অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় সচরাচর পুস্তকাদিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, সাধারণের সুবিধার জন্য প্রদত্ত হইল।

আমি বৈশাখ মাসে, রেলযোগে হরিদ্বার পৌছিয়া হিমালয়ের গঙ্গোত্রি, যমুনোত্রি, কেদারনাথ, বদ্রিনাথ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিবার জন্য, রাস্তাদির বিবরণ পাণ্ডাদের, পাহাড়িদের এবং সাধুদের নিকট সংগ্রহ করিতে লাগিলাম; সকলেই প্রায় গঙ্গোত্রি ও যমুনোত্রি পথের বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতে লাগিল; এবং ঐ সকল স্থানে যাইবার রাস্তা নাই, সাধুরা মহা কষ্টে ঐ সকল স্থানে যায়, সাধারণে প্রায় যাইতে পারে না, সময় সময় খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না, পথে লোকজন বা সহযাত্রী মিলে না, সময় সময় পথভ্রান্ত হইয়া অনেকে অনাহারে মারা গিয়াছে, এইরূপ নানান ভয় দেখাইয়া উক্ত দুই স্থানে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিল। আমার নিজের রসুই করা ভাল রকম অভ্যাস না থাকায় ৫।৬ দিন মধ্যে রামচন্দ্র পাণ্ডা নামে গঞ্জাম (Ganjam) বাসী একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গী করিলাম। উক্ত ব্রাহ্মণের ঐ সকল তীর্থে যাইবার খুব প্রবল ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অর্থ ও সঙ্গীর অভাবে যাইতে ইত-

স্তবঃ করিতেছিল, আমি সঙ্গে লওয়ায় সে আনন্দিত হইল এবং আমারও রসুয়ের সুবিধা হইল। সাধুদের মুখে গঙ্গোত্রি ও যমুনোত্রি পথের দুর্গমতা শুনিয়া আমরা উভয়ে উপস্থিত উক্ত স্থানদ্বয় যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র কেদার ও বদ্রিনারায়ণ যাইবার ঠিক করিলাম। কেদার বদ্রির পথে বরাবর ৪।৫ মাইল অন্তর চটী থাকায়, এবং দ্রব্যাদিও আমাদের নিকট বিশেষ কিছু ছিল না বলিয়া আমরা আর হরিদ্বার হইতে মুটে করিলাম না। এই পথের যাত্রিগণের জন্য হরিদ্বারে বিস্তর পাহাড়ী মুট, ঝাঁপান (মানুষকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ঝুড়ি) ও কাণ্ডি (একপ্রকার ডুলি) মজুত থাকে। হরিদ্বার হইতে আমাদের যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিন, কলিকাতানিবাসী বিনোদবিহারী দাস নামে একটী বাঙ্গালী যুবকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তিনি তৎপূর্ব্ব দিন রাত্রে আসিয়া হরিদ্বার পৌঁছিয়াছেন, তাঁহারও হিমালয়ের ঐ সকল স্থানে যাইবার ইচ্ছা ছিল এবং তিনি আমাদের সহিত একত্রে যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় আমরা ৩ জন একত্রে পর দিবস প্রাতে কেদার বদ্রির পথে যাত্রা করিলাম।

কেদার বদ্রির পথ বেশ বাঁধা রাস্তা, পথে বরাবর মাইলষ্টোন দেওয়া থাকায় কত মাইল চলিয়া আসিয়াছি ও কত মাইল বাকি আছে, বেশ বুঝা যায়, পথে কুলি, কাণ্ডি ও ঝাঁপান পাওয়া যায়; এবং বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহ হরিদ্বার হইতে ১৫০।২০০ যাত্রী দর্শন করিতে যায়। আমরা তিন জনে যে যাহার আপনাপন বস্ত্র কম্বল ঘাড়ে করিয়া চড়াই ওৎরাই করিতে করিতে দিবা ১০।১১ টার সময় হরিদ্বার হইতে ৬৫ মাইল দূরে অবস্থিত দেবপ্রয়াগে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে অলকানন্দার সহিত ভাগীরথী গঙ্গা মিলিত হইয়াছে। বদ্রিনারায়ণের পাণ্ডাদের বাটী এই স্থানে। পাহাড়ের মধ্যে এটা বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, এই স্থান হইতে গঙ্গোত্রি যাইবার একটী পথ আছে। আমাদের ৩ জনেরই মনে গঙ্গোত্রি যাইবার প্রবল বাসনা থাকায় আমরা এই স্থান হইতে উক্ত পথের ভাল করিয়া সমাচার লইলাম। এই স্থানের পাণ্ডা বলিল যে, এই পথে চটী দোকান নাই, এই স্থান হইতে ২৫ মাইল যাইলে গড়োয়ালের বর্ত্তমান রাজধানী টিহিরি সহর পাওয়া যাইবে, সেখানে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়; অতএব এই ২৫ মাইলের জন্য ২।৩ দিনের মতন চাউল, দাল, আটা সঙ্গে লইতে হইবে; এবং সেই কারণ বোঝ বহিবার ও পথপ্রদর্শক স্বরূপ

মুটে করিলে ভাল হয়। তাহার উপদেশ মত এই স্থানে আমরা মুটের জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সুবিধামত মুটে পাওযা গেল না। আমাদের গঙ্গোত্রি যাইবার ইচ্ছা বিশেষ প্রবল হওয়ায় আমরা এইস্থানে দুই দিন থাকিয়া ও তিন দিনের মতন আহারীয দ্রব্য সঙ্গে লইযা, তৃতীয দিবস প্রত্যুষে গঙ্গোত্রি যাইবার জন্য এই স্থান হইতে টেবি বা টিহিরী যাত্রা করিলাম। আহারীয দ্রব্য ও কাপড়াদি মুটে না পাওযায আপনারাই ঘাড়ে কবিলাম, আর পূর্ব্ব দিবস পাণ্ডাকে বলা থাকায় তিনি আমাদের সঙ্গে গ্রামের বাহিরে আসিযা টেবি যাইবার পথ দেখাইয়া দিযা চলিয়া গেলেন।

এই পথে বেশ বাঁধা রাস্তা নাই। স্থানে স্থানে রাস্তার চিহ্ন আছে এবং স্থানে স্থানে নাই। পথে পাহাড়ী লোক ২।১ জন মধ্যে মধ্যে যাতাযাত কবিতেছে। যাহা হউক, আমরা চড়াই করিয়া প্রায় ১১টার সময একটী ঝর্‌নার নিকট বৃক্ষতলে আহারাদি করিলাম এবং এই স্থানেই এক জন পাহাড়ীকে মুটে ঠিক কবিলাম, তাহার নাম মানসিং, জাতি রাজপুত। এই স্থানেব নিকট কোন গ্রামে তাহার বাটী। সে তাহার পরিচিত পথের অপর লোকের দ্বারায তাহার নিজ বাটীতে মুটিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার সম্বাদ পাঠাইযা দিল এবং আমাদের সমুদায় দ্রব্যাদি একত্র বাঁধিয়া লইযা আমাদিগকে সঙ্গে করিযা যাত্রা কবিল।

পথে প্রথম রাত্র নাগগাঁয়ে কোন পাহাড়ির বাটীতে বাসা করিলাম। গ্রামে ২৪।২৫ ঘর লোকের বাস। সাধারণতঃ পাহাড়ের গাঁ, আমাদের দেশের গাঁয়ের ন্যায বহুজনপূর্ণ নহে। গাড়োয়াল এবং কুমাউনের লোক সাধারণতঃ সবল, বিনযী, বিশ্বাসী, আতিথেয এবং নিরাশ্রযকে আশ্রয দেয; বিশেষ, এই অঞ্চলে চুরি প্রবঞ্চনা খুব কম। এই নাগ গাঁয়ে একটী বড় কুসংস্কারপূর্ণ প্রথা প্রচলিত আছে। এই গাঁযে যে সকল মেযে জন্মায, তাহাদিগের বিবাহ দেওযা হয় না, তাহাদিগকে এই গাঁয়ের ইষ্ট দেবতা নাগ-নাথ নামক মহাদেবের কুমারী হইয়া চির জীবন থাকিতে হয়। নাগনাথ অর্দ্ধাঙ্গিনী পার্ব্বতী দেবীর মন্দির এখান হইতে প্রায ২ মাইল উচ্চে একটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। দেবীর নাম চন্দ্রবদনী দেবী। পথে দ্বিতীয রাত্র আমরা সুন্দর গাঁযে কোন পাহাড়ির বাটীতে থাকিয়া, তৃতীয দিবস বেলা ৮।৯ টার সময় এই পথের প্রায় শেষে আসিয়া পৌঁছিলাম। কেবল মধ্যে দুই মাইল ওৎরাই কবিলেই

গাড়োয়ালের রাজধানী টেরী সহরে পৌঁছিব। পাহাড়ের উপরকার এই স্থান হইতে দুই মাইল নিচে টেরি সহরের দৃশ্য অতীব রমণীব। টেরী সহর পাহাড়েব মধ্যে নিম্ন সমতল অধিত্যকা ভূমিতে অবস্থিত, সহরের চতুষ্পার্শ্বে শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্র, ফলবৃক্ষপূর্ণ বাগান, সাহেবদেব থাকিবার বাঙ্গালা, পোলো খেলিবাব জায়গা প্রভৃতি রহিয়াছে; এবং সহরের মধ্যে অবস্থিত, প্রশস্ত রাজপথ সকল সুন্দর সৌধমালা ও সহরের পার্শ্বে ভাগীরথী গঙ্গা সূক্ষ্ম রজত রেখার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, দেখা যাইতে লাগিল। আমরা পাহাড়েব উপর হইতে নিম্নে অবস্থিত এই সকল দৃশ্য ঠিক যেন এক খানি প্রকৃতি কর্ত্তৃক অঙ্কিত ছবিব ন্যায দেখিয়া মনে বড় আনন্দ লাভ করিলাম।

সে যাহা হউক এই ২ মাইল পথ ওৎরাই করিয়া বেলা ১১ টার সময আমবা টেরি সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম; সহরে রাজার বাটী বা কেল্লা একটী উচ্চ স্থানে অবস্থিত। এখানে গাড়োয়ালের হিন্দুরাজা থাকেন। নিকটেই রেসিডেন্ট (Resident) সাহেবের বাঙ্গলা এখানকার রাজা, সাধুশান্ত দিগকে গঙ্গোত্রি প্রভৃতি যাইবার কারণ অর্থ সাহায্য করেন। এখানে ছত্র, ধরমশালা, ডাক্তারখানা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস, পুলিশ, দেওযানী ও ফৌজদারি কাছারি এবং অনেক দেবালয় ও সকল প্রকার দ্রব্যের দোকান আছে। আমরা এই সকল দেখিতে দেখিতে সহরেব মধ্যে থাকিবার জন্য একটী ধরমশালায গেলাম; কিন্তু এই ধরমশালায সকল বিষযের সুবিধা না থাকায় আমরা গঙ্গার ধারে একটী মন্দিরে বাসা লইলাম। আমরা পর দিবস পথের জন্য আবশ্যকীয ২।১ টী দ্রব্য ও ২।৩ দিনের উপযোগী খাদ্য সামগ্রী খরিদ করিয়া সঙ্গে লইলাম। কারণ; গঙ্গোত্রি পথে চটী নাই, তবে মধ্যে মধ্যে ধরমশালা ও স্থানে স্থানে দুই একটী দোকান আছে; যাত্রিগণের নিজের সুবিধার জন্য এই পথে ২।১ দিনের খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে রাখা উচিত। টেরী সহর গঙ্গার বাম তটে অবস্থিত, এখান হইতে গঙ্গোত্রী ১০০ মাইল, গঙ্গোত্রি পর্য্যন্ত প্রায় গঙ্গার ধারে ধারে কখন বাম তট দিয়া কখন দক্ষিণ তট দিয়া বেশ বাঁধা রাস্তা আছে পথে চড়াই ওৎরাই বড় বেশী নাই।

টেরিতে ২ দিন থাকিয়া তৃতীয় দিন প্রাতে আমরা গঙ্গোত্রি যাত্রা করিলাম। প্রথমেই একটী পোলের উপর দিযা গঙ্গা পার হইযা গঙ্গার দক্ষিণ তট দিয়া চলিতে লাগিলাম। এক মাইল পর্য্যন্ত বেশ কার্টরোড

আছে, তাহার পর ৩৪ হাত প্রশস্ত একটী বাঁধা রাস্তা বরাবর গঙ্গোত্রী গিয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত কার্ট রোড বরাবর মসৌরি (Mussoorie) অবধি বিস্তৃত। যাঁহারা সোজা পথে (direct) গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী আসিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা রেলে করিয়া দেরাহুন (Dehra-Dun) আসিবেন; দেরাহুন হইতে রাজপুর হইয়া মসৌরি যাইতে হয়। রাজপুর অবধি টঙ্গা পাওয়া যায়; এবং তথা হইতে মসৌরি পর্য্যন্ত ডাণ্ডি বা ঘোড়া পাওয়া যায়। দেরাহুন হইতে চলিয়া গেলে মসৌরি ৩ দিনে পৌঁছান যায়। পথে চটী ও দোকান অনেক আছে। মসৌরি হইতে টেরি পর্য্যন্ত বেশ চওড়া কার্ট রোড ও পাক ডণ্ডি বা খুস্কি রাস্তা আছে; হাঁটিয়া গেলে কার্ট রোডে ৩ দিনে ও পাকডণ্ডি পথে ২ দিনে টেরি পৌঁছান যায়। তাহার পর টেরি হইতে গঙ্গোত্রি আমরা যে রাস্তায় গিয়াছিলাম, সেই রাস্তায় যাইলেই হইল। আমরা টেরী হইতে এক মাইল পথ মসৌরি যাইবার কার্ট রোডে আসিয়া, পরে ডান হাতি গঙ্গোত্রির রাস্তা পাইয়া সেই রাস্তায় চলিলাম।

প্রথম রাত্র পথে একটী গ্রামে বাস করিয়া দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় ধরাসু নামক স্থানে একটী ধরমশালায় রহিলাম, এই পথে যাত্রী খুব কম, মধ্যে মধ্যে ২।৪ জনের সহিত দেখা হইতেছে, তবে পাহাড়ি লোক অনেক যাতায়াত করে; পথে কদাচিৎ ২।১ টী দোকান পাওয়া যায়। তবে ধরাসু হইতে গঙ্গোত্রি পর্য্যন্ত ৫।৬ ক্রোশ অন্তর ধরমশালা আছে। ধরমশালা গুলি কোথাও একতলা কোথাও দুই তলা কাষ্ঠ ও পাথরে নির্ম্মিত। প্রায়ই অপরিষ্কার এবং পাহাড়ি মহাজন দিগের গমস্তারা এই সকল ধরমশালায় তাহাদের সমভিব্যাহারী মাল-বাহী ছাগল ও ভেড়া রাখিয়া আরও অপরিষ্কার করে। এই পথে পণ্য দ্রব্য সমুদয় মানুষের দ্বারা এবং ছাগল ও ভেড়ার পিঠে করিয়া আমদানি রপ্তানি হয়; ছাগল ও ভেড়ার পিঠে ছোট ছোট দুইটি করিয়া থলি দুইদিকে ছালা করিয়া বাঁধিয়া দেয়। তাহাতে চাউল, দাল, নুন, গম, যব প্রভৃতি দ্রব্য থাকে। প্রায়ই পথে এইরূপ ৫০০।৭০০ ছাগল ও ভেড়ার দল, সঙ্গে ৫।৬ জন মাত্র রক্ষক ও ২।৩টী কুকুরের সহিত এই সংকীর্ণ পথ আবদ্ধ করিয়া যাতায়াত করিতেছে, যাত্রীদিগকে এইরূপ দল আসিলে পথ ছাড়িয়া দিতে হয় এবং সময় সময় ইহাদের পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়।

আমরা তৃতীয় দিন দুপুর বেলায় ঢুণ্ডা নামক স্থানে পৌঁছিলাম, এখানে পার্শ্বেই গঙ্গা ও একটী পরিষ্কার ধরমশালা এবং নিকটেই একটী দোকান আছে। এই স্থানে ৫।৬ জন গৃহস্থ যাত্রীর সহিত দেখা হইল, সঙ্গে ৪।৫ জন পাণ্ডা আছে; যাত্রিগণের মধ্যে একজন পুরুষ অভিভাবক ভিন্ন সকলেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। ইহারা বেশ সঙ্গতিপন্ন, মসৌরিতে দোকান করে, ইহারা প্রথমে যমুনোত্রি দেখিয়া তবে গঙ্গোত্রি যাইবে। আমাদেরও যমুনোত্রি যাইবার বিশেষ ইচ্ছা থাকায় ইহাদের সঙ্গের পাণ্ডাদের নিকট হইতে উক্ত পথের অনুসন্ধান লইতে লাগিলাম। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম যে, এই স্থান হইতে ৪।৫ মাইল দূরে যমুনোত্রি যাইবার একটী রাস্তা আছে ও এই রাস্তায় চড়াই কম। অপর একটী রাস্তা উত্তর কাশীর কাছ হইতে আছে, কিন্তু তাহাতে ভয়ানক চড়াই করিতে হয়। সেই কারণ ইহারা প্রথমোক্ত পথে যাইবে স্থির করিয়াছে। আমরা যমুনোত্রি যাইব বলায় তাহারা বড়ই আনন্দিত হইল; বেলা একটার সময় আমরা তাহাদের সহিত একত্রে যাত্রা করিয়া ৪।৫ মাইল পথ গঙ্গোত্রির বাঁধা পথে আসিয়া পাহাড়ের উপর একটী চৌকিঘর দেখিতে পাওয়ায় পাণ্ডারা বলিল, এই স্থান হইতে বাঁ দিকে যমুনোত্রি যাইতে হইবে। আমরা সকলে সেই বাঁ দিকের পাহাড়ে উঠিবার উদ্যোগ করিলে পাহাড়ের উপরকার সেই চৌকি হইতে ২।৩ জন পাহারাদার বাহির হইয়া বলিল যে, এই পথের মধ্যে এক স্থানে পাহাড়ের ধস্ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রাজার হুকুমে কাহাকেও এই পথে যাইতে দেওয়া নিষেধ। অতএব আমরা উক্ত রাস্তায় যাইতে নিবৃত্ত হইয়া উত্তর কাশী হইতে যাইবার স্থির করিলাম এবং পুনরায় গঙ্গোত্রির পথে চলিলাম।

পথে যাইতে যাইতে মসৌরির সেই স্ত্রীলোকেরা বলিতে লাগিল, বাবুজী, আমরা একে বৃদ্ধা, তাহাতে এই পথে ঝাঁপান বা কাণ্ডি পাওয়া যায় না, আমরা উত্তরকাশী হইতে চড়াই পথে কি করিয়া যাইব? পাঠকগণের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, টেরি হইতে গঙ্গোত্রি বা যমুনোত্রির রাস্তায়, কেদার বদ্রিনারায়ণের রাস্তার ন্যায় ঝাঁপান বা কাণ্ডি পাওয়া যায় না, সকলকেই হাঁটিয়া যাইতে হয়। মসৌরির যাত্রিগণের সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকায়, তাহারা নিতান্ত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল সুতরাং আমরা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, পথে বরাট নামক স্থানের ধরমশালায় রাত্রে রহিয়া পর দিবস দুপুর বেলায় উত্তরকাশী আসিয়া পৌঁছিলাম।

উত্তরকাশীতে ২টী ছত্র আছে, ১টী কলিকাতাওয়ালার বা কলিকাতার মাড়োয়ারিদের ও অপরটী একজন ব্রহ্মচারীর স্থাপিত; সাধারণ যাত্রীর থাকিবার জন্য কলিকাতাওয়ালা ছত্রের লাগাও বেশ ভাল ধরমশালা আছে; আমরা সেই ধরমশালায় বাসা লইলাম। উত্তরকাশী গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত, এখানে বারাণসী কাশীর ন্যায় গঙ্গা উত্তরবাহিনী, এবং বিশ্বেশ্বর ও কেদারের মন্দির, আর গঙ্গায় মণিকর্ণিকা ও কেদার ঘাট আছে। আমরা এই স্থানের একজন পাণ্ডার সহিত গঙ্গার গর্ভে অবস্থিত মণিকর্ণিকা কুণ্ডে স্নান করিলাম এবং বিশ্বেশ্বর ও কেদার দর্শন করিয়া বাসায় আসিলাম।

উত্তরকাশীতে অনেক সাধু আসিয়া গ্রীষ্মকালে বাস করেন, স্থানও বেশ রমণীয়, ও ৩০।৪০ ঘর লোকের বাস; উক্ত ছত্র দুইটী হইতে দুপুরবেলায় একবার মাত্র সন্ন্যাসীদিগকে তৈয়ারি ভাত, রুটী, তরকারি বা ডাল দেওয়া হয় তাঁহারা উক্ত আহারীয় লইয়া, আপন আপন কুটীর বা গুফায় চলিয়া যান; এবং তথায় নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বর আরাধনা করেন; অপর সাধু-দিগকে ছত্র হইতে কাঁচা সিদা দেওয়া হয়। উত্তরাখণ্ডের (সাধুরা হিমা-লয়কে উত্তরাখণ্ড বলেন) মধ্যে কেবল এই স্থানে অনেক ভাল ভাল জ্ঞানী সন্ন্যাসীর সমাগম, এবং বেদান্তের বেশ আলোচনা দেখিলাম। কলিকাতাওয়ালা ছত্রের কর্ম্মচারীটী বেশ প্রাণের সহিত সাধুসেবা করেন, ও তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে খুব অনুরাগ আছে। গঙ্গোত্রি ও যমুনোত্রি-যাত্রাকারী সাধুদিগকে এই ছত্র হইতে পথে আহারের কারণ ৩।৪ দিনের সিধা দেওয়া হয়, এই রূপ টেরির ছত্রেও সিধা দিবার ব্যবস্থা আছে; এই ছত্র হইতে গঙ্গোত্রিতে ১টী ও যমুনোত্রির নিকট পাণ্ডাগাঁয়ে অপর একটী শাখা ছত্র খোলা হয়; কিন্তু শাখা ছত্রে কাঁচা সিধা দিয়া থাকে। আমরা উক্ত কর্ম্মচারীর মুখে শুনিলাম যে, যমুনোত্রির পথে অত্যন্ত বরফ থাকায় এখন পর্য্যন্ত পাণ্ডা গাঁয়ের ছত্র খোলা হয় নাই, তবে এখন অনেক পরিমাণে বরফ কমিয়া যাওয়ায়, ৫।৬ দিন পরে আহারীয় দ্রব্য কুলির দ্বারায় পাঠাইয়া ছত্র খোলা হইবে। যমুনোত্রি পথের অপ-রাপর সম্বাদও উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলাম।

এই ধরমশালায় দুইটী পাঞ্জাবি সাধু ২।৩ দিবস হইল যমুনোত্রি দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনের অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগায় বুকে পিঠে দারুণ বেদনা হইয়াছে, সে জন্য তাহার সঙ্গী বেদনার স্থানে তেল মালিস

করিতেছিল; আমরা তাহাদের মুখে শুনিলাম যে, পথে এখনও অনেক স্থানে বরফ আছে, সেই কারণ তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে এবং ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। উত্তরকাশীতে ২।৩টী দোকান আছে, আমরা যমুনোত্রি পথের জন্য ৫।৬ দিনের আহারীয় ক্রয় করিয়া লইলাম এবং এই স্থানে ২ দিন বিশ্রাম করিয়া তৃতীয় দিবস প্রাতে যমুনোত্রি বা যম্নোত্রি যাত্রা করিলাম (পাহাড়িরা যমুনোত্রিকে যম্নোত্রি বলে)।

আমরা উত্তরকাশী হইতে বাহির হইয়া প্রায় ১ মাইল পূর্ব্বোক্ত গঙ্গোত্রির রাস্তায় টেরির দিকে ফিরিয়া আসিয়া একটী বড় ঝরনার নিকট যমুনোত্রির রাস্তা পাইলাম এবং তথা হইতে গঙ্গোত্রির রাস্তা ত্যাগ করিয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া যমুনোত্রির দিকে চলিতে লাগিলাম। উত্তরকাশী হইতে যমুনোত্রি পাহাড়িদের কথায় ৩০ ক্রোশ, কিন্তু আমাদের হিসাবে আন্দাজ ৪৫ মাইল; পথে কোন রূপ বাঁধা রাস্তা, দোকান, চটী, বা ধরমশালা নাই, তবে মধ্যে মধ্যে গ্রাম পাওয়া যায় মাত্র। আমরা পথে প্রথম রাত্র কাওয়া গাঁয়ে থাকিয়া, দ্বিতীয় দিন বেলা ৩টার সময় উপরি কোট গাঁয়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই গ্রামের লোকেদের নিকট অগ্রবর্ত্তী পথের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, এই স্থান হইতে একটী পাহাড় ১০ মাইল চড়াই করিয়া, পুনরায় ৯ মাইল ওৎরাই করিলে তবে দাঙ্গর গাঁয়ে পৌঁছিব, এবং চড়াইয়ের মুখে ৭ মাইল জল পাওয়া যায় না। এই সকল বিবরণ শুনিয়া এবং আমাদের পাহাড়ি মুটে পূর্ব্বে কখন যমুনোত্রি আসে নাই, কি জানি যদি পথভ্রান্ত হই, এই ভয়ে আমরা এই গ্রাম হইতে পয়সা দিয়া একজন পথজানা লোক ও পানীয় জল সঙ্গে লইয়া পাহাড়ে উঠিবার সঙ্কল্প করিলাম; কারণ, তখনও তিন ঘণ্টা দিন রহিয়াছে। সে দিন আকাশে মেঘ হওয়ায় কোন লোকই আমাদের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইল না। তাহারা বলিল, যেরূপ মেঘ হইতেছে, তাহাতে শিলাবৃষ্টি হইতে পারে, এবং এখানে এক একটী শিলা আধ পোয়া, তিন ছটাক পরিমাণের পড়ে, পাহাড়ের উপর অনাবৃত স্থানে ঐ রূপ শিলাবৃষ্টি হইলে বড় বিপদ্‌জনক; আর এই স্থান হইতে দাঙ্গর গাঁ একদিনে যাইলেই বড ভাল, কারণ, রাত্রে এই পাহাড়ে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। আমরাও এই সকল অসুবিধার জন্য সে দিনের মতন যাত্রা বন্ধ করিয়া এই গ্রামের একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত দেবমন্দিরে বাসা

লইলাম। এই মন্দিরে আমাদের আগে আসিয়া ৪।৫ জন সাধু আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও যমুনোত্রি যাইবে।

সন্ধ্যায় সময় গ্রামের অনেক গুলিন লোক আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিল। পাহাড়ের মধ্যে গড়োয়াল অত্যন্ত দরিদ্র দেশ, এখানে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কম্বলের চাপকাণের ন্যায পা পর্য্যন্ত নিচু কোর্ত্তা ব্যবহার করে, অবস্থাপন্ন পুরুষে কম্বলের পাজামা পরে, নচেৎ ভিতরে লেঙ্গুট মাত্র থাকে, ইহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি ভাষায় কথা কয়, তবে অনেকেই শুদ্ধ হিন্দি কহিতে পারে ও সকলেই শুদ্ধ হিন্দি বুঝিতে পারে ; এখানকার কৃষিই উপজীবিকা, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া কৃষিকার্য্য করে। পুরুষেরা কেহ কেহ নিজের বা পরিবার ভুক্ত অপরের রোগের বিষয় বলিয়া আমাদের নিকট ঔষধ চাহিতে লাগিল। তাহাদের বিশ্বাস,—আমরা সকলেই চিকিৎসা জানি ; অপর কেহ কেহ তামাক চাহিয়া লইল, কারণ এখানে ভাল তামাক পাওয়া যায় না বলিয়া ইহারা শুষ্ক দোক্তা কল্কেয় ভরিয়া তামাক খায় ; স্ত্রীলোকেরা ছুঁচ সুতা, পুঁথির মালা, কপালে লাগাইবার টিপ্ প্রভৃতি চাহিতে লাগিল। এই সকল সামান্য দ্রব্য পাইলে তাহারা বড়ই আনন্দিত হয় ; যাত্রীরা অনেকেই হরিদ্বার বা টেরি হইতে এই সকল দ্রব্য কিছু কিছু খরিদ করিয়া আনিয়া ইহাদের দিয়া থাকে।

আমাদের পূর্ব্বে আগত সেই সাধুদের মধ্যে একজন ইহাদের নিকট দুগ্ধের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। আমরাও এ পথে অনেক দিন দুগ্ধ পাই নাই, (কারণ গ্রাম বাসীদেব মধ্যে 'দুধ পুত' বেচিতে নাই বলিযা একটি প্রবাদ থাকায় কেহই দুগ্ধ বেচিতে চায না ; তবে অমনি দেয়) সে জন্য আমরা সেই সাধুকে আমাদের জন্য চেষ্টা করিয়া /১ সের দুধ খরিদ করিতে বলিলাম ; সেই সাধুটী মন্ত্র তন্ত্র ঔষধ দিয়া এবং বর বা শাপের লোভ বা ভয় দেখাইয়া একজনের নিকট হইতে আমাদের জন্য /১ সের দুধ ক্রয় করিয়া দিল এবং নিজেরও দুধ দধিব যোগাড় করিয়া লইল। আমরা পর দিনের জন্য রাত্রে খান কতক রুটী করিয়া রাখিয়া দিলাম এবং গ্রাম হইতে কিছু যবের ছাতু ও মধু খরিদ করিয়া লইলাম। পর দিন প্রাতে উক্ত সাধুদের সঙ্গে পাহাড় চড়াই করিতে লাগিলাম ; কিন্তু তাহারা ২।৩ দিনে এই পাহাড়টী পার হইব বলায আমরা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলাম কেবল তাহাদের মধ্য হইতে একজন ব্রহ্মচারী তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে।]

শ্রীম—কথিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(ডাক্তার ও মাষ্টার)

আজ বৃহস্পতিবার, আশ্বিন কৃষ্ণা ষষ্ঠী, ২৯শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। বেলা দশটা বাজিয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পীড়িত। কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামপুকুরে রহিযাছেন। ডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছেন। ডাক্তারের বাড়ী শাঁখারিটোলা, এখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটী সেবক ডাক্তারের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর রোজ রোজ কেমন থাকেন, সেই সংবাদ লইয়া তিনি প্রায় প্রত্যহ আসেন।

ডাক্তার। দেখ, বিহারীর (ভাদুড়ী) এক কথা। বলে, Goethe's spirit (সূক্ষ্ম শরীর) বেরিয়ে গেল, আবার Goethe তাই দেখ্‌ছে। কি আশ্চর্য্য কথা!

(সার কি ?)

মাষ্টার। পরমহংসদেব বলেন, ওসব *কথায় আমাদের কি দরকার? আমরা পৃথিবীতে এসেছি, যাতে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি হয়। তিনি বলেন, একজন একটা বাগানে আঁব খেতে গিছ্‌লো। সে একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা, গুণে গুণে লিখ্‌তে লাগ্‌লো। বাগানের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো।

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲ টাকা। বাঁধান মূল্য পাঁচ সিকা। ৫৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীশান্তি-রাম ঘোষের নিকট অথবা ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলি-কাতায় শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য।

সে বল্লে, তুমি কি কোর্‌ছো আর এখানে এসেছই বা কেন? তখন সে লোকটী বল্লে, এখানে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা, তাই গুন্‌ছি—এখানে আঁব খেতে এসেছি। বাগানের লোকটী বল্লে, আঁব খেতে এসেছ ত আঁব খেয়ে যাও, তোমার অত শত, কত পাতা, কত ডাল, এ সবে কাজ কি?

ডাক্তার। পরমহংস সারটা নিয়েছে দেখ্‌ছি।

অতঃপর ডাক্তার তাঁহার হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতে লাগিলেন—কত রোগী রোজ আসে, তাদের ফর্দ্দ দেখালেন, বল্লেন, ডাক্তার সালজার এবং অন্যান্য অনেকে তাঁহাকে প্রথমে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিতেন ইত্যাদি।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, মাষ্টারও সঙ্গে উঠিলেন। ডাক্তার নানা রোগী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে চোরবাগান, তার পর মাথাঘসার গলি, তার পর পাথুরিয়াঘাটা। সব রোগী দেখা হইলে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন।

ডাক্তার পাথুরেঘাটার ঠাকুরদের একটী বাড়ীতে গেলেন। সেখানে কিছু বিলম্ব হইল। গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার গল্প করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার। এই বাবুটীর সঙ্গে পরমহংসের কথা হলো। থিয়সফির কথা—কর্ণেল অলকটের কথা হলো। পরমহংস ঐ বাবুটীর ওপর চটা। কেন জান? এ বলে, আমি সব জানি।

মাষ্টার। না, চটা হবেন কেন? তবে শুনেছি, একবার দেখা হয়েছিল। তা পরমহংসদেব ঈশ্বরের কথা বল্‌ছিলেন। তখন ইনি বলেছিলেন বটে যে, হাঁ, ওসব জানি।

ডাক্তার। এ বাবুটী Science Association এ ৩২৫০০ টাকা দিয়েছে।

গাড়ী চলিতে লাগিল। বড় বাজার হইয়া ফিরিতেছে। ডাক্তার ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন।

ডাক্তার। তোমাদের কি ইচ্ছা এঁকে দক্ষিণেশ্বর পাঠান?

মাষ্টার। না, তাতে ভক্তদের বড় অসুবিধা। কল্‌কাতায় থাক্‌লে সর্ব্বদা যাওয়া আসা যায়—দেখ্‌তে পারা যায়।

ডাক্তার। এতে ত অনেক খরচ হচ্ছে।

মাষ্টার। ভক্তদের সে জন্য কোন কষ্ট নাই। তাঁরা যাতে সেবা করতে পারেন, এই চেষ্টা করছেন। খরচ ত এখানেও আছে, সেখানেও আছে। সেখানে গেলে সর্ব্বদা দেখতে পাবেন না, এই ভাবনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও 'উত্তমভক্ত')

ডাক্তার ও মাষ্টার শ্যামপুকুরে আসিয়া একটী দ্বিতল গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহের বাহিরের উপরে বারাণ্ডাওয়ালা দুটী ঘর আছে। একটী পূর্ব্বপশ্চিমে ও অপরটী উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘ। তাহার প্রথম ঘরটীতে গিয়া দেখেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। ঠাকুর সহাস্য। কাছে ডাক্তার ভাদুড়ি ও অনেকগুলি ভক্ত।

ডাক্তার হাত দেখিলেন ও পীড়ার অবস্থা সমস্ত অবগত হইলেন। ক্রমে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কথা হইতে লাগিল।

ভাদুড়ি। কথাটা কি জান? সব স্বপ্নবৎ।

ডাক্তার। সবই delusion (ভ্রম)! তবে কার delusion আর কেন delusion? আর সব্বাই কথাই বা কয় কেন, delusion জেনেও? I cannot believe that God is real and creation is unreal (ঈশ্বর সত্য, আর তাঁর সৃষ্টি মিথ্যা, এ বিশ্বাস আমি করিতে পারি না।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ বেশ ভাব—তুমি প্রভু, আমি দাস। যতক্ষণ দেহ সত্য বলে বোধ আছে, আমি তুমি আছে, ততক্ষণ সেব্যসেবক ভাবই ভাল, আমি সেই, এ বুদ্ধি ভাল নয়।

"আর কি জান? এক পাশ থেকে ঘরকে দেখছি, এও যা, আর ঘরের মধ্যে থেকে ঘরকে দেখছি, সেও তাই।

ভাদুড়ি (ডাক্তারের প্রতি)। এ সব কথা যা বল্লুম, বেদান্তে আছে। শাস্ত্র টাস্ত্র দেখ, তবে ত।

ডাক্তার। কেন, ইনি কি শাস্ত্র দেখে বিদ্বান্ হয়েছেন? আর ইনিও ত ঐ কথা বলেন। শাস্ত্র না পড়লে হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি শুনেছি কত!

ডাক্তার। শুধু শুন্‌লে কত ভুল থাক্‌তে পারে। তুমি শুধু শোন নাই।

আবার অন্য কথা চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। আপনি না কি বলেছো, 'ইনি পাগল'? তাই এরা (মাষ্টার ইত্যাদির দিকে দেখাইয়া) তোমার কাছে যেতে চায় না।

ডাক্তার (মাষ্টারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)। কই, তবে অহঙ্কার বলেছি। তুমি লোককে পায়ের ধুলা নিতে দাও কেন?

মাষ্টার। তা না হলে লোকে কাঁদে।

ডাক্তার। তাদের ভুল বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

মাষ্টার। কেন, সর্ব্বভূতে নারায়ণ?

ডাক্তার। তাতে আমার আপত্তি নেই। সব্বাইকে কর।

মাষ্টার। কোন কোন মানুষে বেশী প্রকাশ। জল সব জায়গায় আছে, কিন্তু পুকুরে, নদীতে, সমুদ্রে প্রকাশ। আপনি Faradayকে যত মান্‌বেন, নূতন Bachelor of Science কে কি তত মান্‌বেন?

ডাক্তার। তাতে আমি রাজি আছি। তবে God বল কেন?

মাষ্টার। আমরা পরস্পর নমস্কার করি কেন? সকলের হৃদয়মধ্যে নারায়ণ আছেন। আপনি ওসব বিষয় বেশী দেখেন নাই; ভাবেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। কোন কোন জিনিষে বেশী প্রকাশ। আপনাকে ত বলেছি, সূর্য্যের রশ্মি মাটীতে এক রকম পড়ে, গাছে এক রকম পড়ে আবার আর্শিতে আর এক রকম। আর্শিতে কিছু বেশী প্রকাশ। "এই দেখ না, প্রহ্লাদাদি আর এরা কি সমান? প্রহ্লাদাদির মন প্রাণ সব তাঁতে সমর্পণ হয়েছিল।

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। আর তোমার এখানের ওপর টান আছে। তুমি আমাকে বোলোছো, তোমায় ভালবাসি!

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সংসারী জীব।)

ডাক্তার। তুমি Child of nature, তাই অত বলি। লোক পায় হাত দিয়ে নমস্কার করে, এতে আমার কষ্ট হয়। মনে করি, এমন

ভাল লোকটাকে খারাপ করে দিচ্ছে। কেশব সেনকে তার চেলারা ঐ রকম করেছিল। তোমায় বলি শোন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার কথা কি শুন্‌বো? তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী।

ভাদুড়ি। অর্থাৎ তোমার জীবত্ব আছে। জীবের ধর্ম্মই ওই, টাকা কড়ি, মান সম্ভ্রমেতে লোভ; কাম, অহঙ্কার।

ডাক্তার। তা বল ত তোমার গলার অসুখটি কেবল দেখে যাব। অন্য কোন কথায় কায নেই। আর তর্ক কর্‌তে হয় ত সব ঠিক্ ঠাক্ বোল্‌বো।

সকলে চুপ করিয়া রহিলেন।

(অনুলোম ও বিলোম)
(Involution and Evolution
in vedantic Cosmology.)

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভাদুড়ির প্রতি)। কি জানো? ইনি (ডাক্তার-সরকার) এখন নেতি নেতি করে অনুলোমে যাচ্ছে। ঈশ্বর জীব নয়, জগৎ নয়, সৃষ্টির ছাড়া তিনি, এই সব বিচার ইনি কচ্ছে। যখন বিলোমে আসবে, তখন সব মান্‌বে।

"খোল একটা আলাদা জিনিষ, মাঝ একটা আলাদা জিনিষ। মাঝ কিছু খোল নয়, খোলও মাঝ নয়। কিন্তু শেষে মানুষ দেখে যে, খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল। তিনি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, তিনিই মানুষ হয়েছেন।

"কলাগাছের খোলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গেলে মাঝ পাওয়া যায়।

"খোল কিছু মাঝ নয়। কিন্তু শেষে দেখা যায়, খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।

(ডাক্তারের প্রতি)। "ভক্ত তিন রকম। অধম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, উত্তম ভক্ত।

"অধম ভক্ত বলে, ঐ ঈশ্বর। তার মতে, সৃষ্টি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা

"মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর অন্তর্যামী। তিনি হৃদয় মধ্যে আছেন। সে হৃদয় মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে।

"উত্তম ভক্ত দেখে, তিনি এই সব হয়েছেন। তিনিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। সে দেখে, ঈশ্বর অধো উর্দ্ধে পরিপূর্ণ।

"তুমি গীতা, ভাগবত, বেদান্ত এ সব পড়, তবে এ সব বুঝ্‌তে পার্ব্বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর কি সৃষ্টি মধ্যে নাই ?

ডাক্তার। না,তিনি সব জায়গায় আছেন আর আছেন বলে খোঁজা যায় না।

কিয়ৎক্ষণ পরে অন্য কথা পড়িল। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় ভাব সর্ব্বদা হয়, তাহাতে অসুখ বাড়িবার সম্ভাবনা।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি। ভাব চাপ্‌বে। আমার খুব ভাব হয়। তোমাদের চেয়ে নাচ্‌তে পারি।

ছোট নরেন। ভাব যদি আর একটু বাড়ে, কি কর্‌বেন ?

ডাক্তার। Controlling Powerও (ভাব চাপ্‌বার শক্তি) বাড়্‌বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাষ্টার। সে আপনি বোল্‌ছো (বল্‌ছেন)। ভাব হলে কি হবে, আপনি বল্‌তে পারো (পাবেন)?

শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্।

গৌরাঙ্গিনীং সুবর্ণাভাং কোটিসূর্য্যসমপ্রভাম্।
বন্দে ত্বাং পরমানন্দাং সানন্দাং গিরিনন্দিনীম্॥
সনাতনীং সতীং সত্যাং সুরাসুরসমর্চ্চিতাম্।
পশুপক্ষিপতঙ্গাদিপূজিতাং পরমাং পরাম্॥
কোটিকোটিসহস্রানাং ব্রহ্মাণ্ডাণামধীশ্বরীম্।
নির্লিপ্তামপি লিপ্তাঞ্চ সগুণামপি নির্গুণাম্॥
পরাত্মিকাং পরাংশক্তিং ত্রিলোকস্য পরাংগতিম্।
সংসারকূপমগ্নৈতৎ মনুজাতপরাশ্রযাম্॥
অখিলবিশ্বচিচ্ছক্তিং বিশ্বাখিললয়ালয়াম্।
শিবশবসমাসীনাং সৌন্দর্য্যসকলাকরাম্॥
যোগীন্দ্রপরমারাধ্যাং সাধকহৃদয়স্থিতাম্।
কামাদিরিপুহন্ত্রীঞ্চ সংসারপাশনাশিনীম্॥
সর্ব্বভয়াপহন্ত্রীঞ্চ সর্ব্বসঙ্কটতারিণীম্।
বিঘ্নবিধ্বংসিনীং দেবীং জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনীম্॥

স্বাগতা স্বাগতা দেবি সুপ্রসন্নে দয়াবতি !
নিবসায়সুখং মাত হৃদয়েন্দীবরে মম ॥
গৃহান কৃপয়া মাত ভক্তবাঞ্ছিতসাধিকে !
কর্ম্মপুষ্পং ময়া দত্তং জ্ঞানদীপং সমুজ্জ্বলম্ ॥
সুগন্ধিসত্যধূপঞ্চ ভক্তিতোয়ং সুনির্ম্মলম্ ।
অনুরাগমলক্তঞ্চ শ্রীমৎপাদারবিন্দয়োঃ ॥
প্রেমবিল্বং মনোর্ঘ্যোঞ্চ সুনৈবেদ্যমিদং বপুঃ ।
সর্ব্বং তুভ্যং দদাম্যম্ব করুণাং কুরু মে শিবে ॥

শ্রীহা—

সামগান ।

ওঁ

অনন্ত ভুবন বিশাল বিশ্ব,
তাহার সবিতা ওঁ ;
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারী,
বিশ্ব বিধাতা ওঁ ;
যাঁহার বীর্য্যে, প্রকাশ বিশ্ব,
জঙ্গম স্থাবর ওঁ,
তপন তারকা আকাশ চন্দ্রিমা
সাগর ভূধর ওঁ,
যাঁহার তেজে, শকতি ভুবনে
বিশ্ব-বিলোড়ন ওঁ,
চলিছে ঘুরিছে, অনন্ত তারকা,
অযুত তপন ওঁ
বহিছে পবন, জাগিছে জঙ্গম
স্থিতি স্থাবরে ওঁ,
যাঁহার শকতি মহান লহরী
অনন্ত সাগরে ওঁ,
যাঁহার চেতনে মানব চেতন
করিছে করম ওঁ

যাঁহার জ্যোতিঃ ভাতিছে ভুবনে,
বিনাশিছে তমঃ ওঁ,
ওই যে পূরবে, তাঁহারি জ্যোতিঃ
পাইয়া ভুবনে ওঁ,
নাশিছে তিমির, জগত সবিতা,
প্রণম তপনে ওঁ।

শ্রীক্ষিরোদ বিহারী রায় চৌধুরী।

স্বামীজির কথা।

আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনির্ভার্সিটিতে স্বামীজির সঙ্গে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে গুটিকতক দেওয়া গেল।

ভারতে দার্শনিক বিষয়ে বর্ত্তমানকালে কিরূপ আলোচনা হইয়া থাকে।

ভারতে অধিকাংশই দ্বৈতবাদী; অল্পই অদ্বৈতবাদী। মায়া ও জীবাত্মা সম্বন্ধেই ভারতে খুব আলোচনা হইয়া থাকে। আমি এদেশে আসিয়া দেখিলাম, শ্রমজীবীরা পর্য্যন্ত রাজনৈতিক ব্যাপারের অনেক খবর রাখে, কিন্তু তাহাদিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মতামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বিশেষ কিছুই বলিতে পারে না। তাহারা শুধু বলে,—আমরা চর্চ্চে গিয়া থাকি মাত্র। ভারতে কিন্তু কোন চাষাকে যদি রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, সে কিছুই বলিতে পারিবে না, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারিবে। সে হয়ত লেখাপড়ার কিছু ধার ধারে না, কিন্তু সাধুদের কাছে এই সকল শিক্ষা পাইয়াছে। সারাদিনের খাটুনির পর তাহারা গাছতলায় বসিয়া এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে।

'নিষ্ঠাবান্' হিন্দু বলিতে এখন কি বুঝায়? আজকাল পানাহার ও বিবাহের সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম মানিলেই 'নিষ্ঠাবান্' হিন্দু হওয়া যায়। তার পর সে যে মতই মানুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভারতে কখন রীতিমত প্রণালীবদ্ধ চর্চ্চ ছিল না, সুতরাং এই এই মত মানিলেই 'নিষ্ঠাবান্' হওয়া যায় এমন কেহ কখন বলে না। মোটামুটি আমরা বলি, বেদবিশ্বাসী হইলেই 'নিষ্ঠাবান্' হইল। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়,

অনেক দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় বেদ মত না মানে, তাহা অপেক্ষা পুরাণ বেশী মানে।

স্টোয়িক দর্শনের উপর হিন্দু দর্শন কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

খুব সম্ভব যে, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার লোকে হিন্দুদর্শনের ভাব অনেক গ্রহণ করিলে তাহাদের দ্বারা এই স্টোয়িকদের ভিতরেও হিন্দু-দর্শনের ভাব অনেক প্রবেশ করিয়াছিল। পিথাগোরাস সাংখ্যদর্শনের ভাব অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ ভাবিবার যথেষ্ট হেতু আছে। যাহা হউক, আমাদের ধারণা, এই সাংখ্য দর্শনই বেদনিবদ্ধ দর্শনকে যুক্তিসহায়ে সামঞ্জস্য করিবার প্রথম চেষ্টা। বেদেও এই কপিলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—'ঋষিং কপিলং প্রসূতং যস্তমগ্রে'।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত হিন্দুদর্শনের বিরোধ কোথায়?

কোন বিরোধ নাই। হিন্দুদর্শনের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। আমাদের 'পরিণামবাদ' এবং আকাশ ও প্রাণতত্ত্ব ঠিক আধুনিক মতের মত। তোমাদের পরিণামবাদ (Evolution Theory) আমাদের যোগ ও সাংখ্য দর্শনে রহিয়াছে। পতঞ্জলি বলেন,—'জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।' তাঁহার মতভেদ কেবল ঐ মতের ব্যাখ্যায়। তাঁহার পরিণামবাদের ব্যাখ্যা 'আধ্যাত্মিক', তিনি বলেন,—'নিমিত্তম-প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'—যখন কোন কৃষক নিজ ক্ষেত্রে জলসেচন করিতে ইচ্ছা করে, তখন সে কেবল নিকটবর্ত্তী জলাশয়ের সঙ্গে তাহার ক্ষেত্রের যে ব্যবধান আছে, তাহা ভঙ্গ করিয়া দেয় মাত্র। এইরূপ সকলেই সেই অনন্তস্বরূপ, কেবল নানারূপ বাধায় উহার স্বরূপ প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। কিন্তু ঐ বাধা অপসারিত হইলেই উহার সেই অনন্তস্বরূপ প্রকাশিত হয় পশুতে মনুষ্য গূঢ়ভাবে এবং নরে আবার দেবত্ব গূঢ়ভাবে অবস্থিত। সুতরাং আমাদের এই সকল নূতন মতের সহিত কোন বিশেষ বিরোধ নাই। এই দেখুন না,—বিষয় জ্ঞানসম্বন্ধে সাংখ্যের মত আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মত হইতে অতি অল্পই তফাত।

———

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলুড় মঠ এবং তাহার শাখাস্বরূপ মান্দ্রাজ, কাশী প্রভৃতি স্থানের মঠে, এবং রেঙ্গুন, কটক প্রভৃতি স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একসপ্ততিতম জন্মোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে ভক্তগণের সম্মিলন, ভগবন্নামকীর্ত্তন, হরিকথা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি হইয়াছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় যেন আমরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন রূপ মহান্ আদর্শের পথে দিন দিন অগ্রসর হই। সেই মহাপুরুষের 'ব্রহ্মই সত্য বস্তু আর সব অবস্তু,' এই বাণী যেন আমাদের হৃদয়ে দিবারাত্রি জাগরূক থাকে। কাম, কাঞ্চন, মান এসকলকে কাকবিষ্ঠা জ্ঞান করিয়া যেন আমরা শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমভক্তিসম্পন্ন হইতে শিক্ষা করি।

বিগত ১৯ শে ফাল্গুন, বুধবার দোল পুর্ণিমার দিন জেলা যশোহরের অন্তর্গত সিঙ্গিয়া ও নওয়াপাড়া রেলওয়ে ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী চেঙ্গাটিয়া গ্রামের ধর্ম্মাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ৪।৫টি সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় প্রাতঃ হইতে প্রায় দশটা পর্য্যন্ত হরিনাম করিয়া সভাস্থ সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রায় ১০০ নরনারী প্রসাদ ধারণ করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি রবিবার দিবস ঢাকা উকিল্স্ ইনষ্টিটিউশনে (Ukil's Institution) এক সভার অধিবেশন হয়। একটী সঙ্গীতের পর জুবিলী স্কুলের শিক্ষক বাবু মথুরা মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইংরেজী ভাষায় লিখিত স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন ও বাবু হরপ্রসন্ন মজুমদার স্বামীজী কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ ও চিঠি হইতে কতক অংশ পড়েন। পরে অত্রস্থ জজ্ কোর্টের উকিল বাবু গোবিন্দ চন্দ্র ভাওয়াল ও ইম্পিরিয়েল সেমিনেরীর (Inperial Seninary) হেড্ মাষ্টার বাবু দিনবন্ধু মজুমদার স্বামীজীর সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। তৎপর একটী গান গাহিয়া সভার কার্য্য শেষ হয়।

গত ৬ই ফাল্গুন পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিবস ৺ মোহিনী মোহন দাস মহাশয়ের গৃহে আসনোপরি পরমহংসদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন

করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি হইতে ঠাকুরের স্তোত্র ও জন্ম কথা এবং জীবনী হইতে উপদেশ পাঠ করা হয়। পরে ২টী গান করিয়া কার্য্য সমাধা করা হয়। পরে ৯ই ফাল্গুন রবিবার দিবস পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আসনোপরি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমে ৩টী গান হইলে অযোধ্যা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শত্রুঘ্ন দাসজী ২টী বৈদিক স্তোত্র পাঠ করেন। তৎপরে উদ্বোধন পত্রিকা হইতে ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু পড়া হয় এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া হরিসংকীর্ত্তন হইলে পর উপস্থিত ব্যক্তিগুলিকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া উৎসবের কার্য্য সমাধা করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (Ramkrishna home of Service) সাহার্য্যার্থ সিরাজগঞ্জ হইতে এ, পি, কর দ্বারা প্রেরিত ৯৭৸৴০ প্রাপ্তি স্বীকাব কবিতেছেন।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সংবাদ আমরা নিযমিত রূপে পাইতেছি। স্থানাভাবে উদ্বোধনে সমুদয় বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা মায়াবতী,লোহাঘাট পোঃ, আলমোড়া জেলা অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রে অনুসন্ধান করিবেন।

সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে একটী 'বিবেকানন্দ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য,—যুবকগণের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের শিক্ষা বিস্তার। এই সমিতি ধর্ম্ম বক্তৃতা, নিয়মিত ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মপুস্তকাগার স্থাপন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। অনেক গণ্যমান্য লোক এই সদুদ্দেশ্যে যোগ দিয়াছেন। আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

আমরা India's Mission to the World ও The Iudian Cong: ress নামক দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাইয়াছি। ১৩৫ নং বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে এস, কে, ব্যানার্জ্জি দ্বারা প্রকাশিত। গ্রন্থকারের নাম প্রকাশ নাই। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তাঁহার মতে পাশ্চাত্য দেশকে ধর্ম্মপ্রাণ করিবার চেষ্টাতেই আমাদের সর্ব্ব প্রকার সমস্যার মীমাংসা হইবে। স্বামী বিবেকানন্দেরও ইহাই মত ছিল। প্রেম ও ধর্ম্মবলে পাশ্চাত্য অসুরের মধ্যে দেবত্ব সঞ্চারই ভারতের Missiob,—

ইহা অতি সত্য কথা। আমাদের স্বদেশিগণ এখনও এ কথা বুঝুন ও একমাত্র যে বিষয়ে এখনও আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ আছে, সেই ধর্ম্মকে সহায় করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। Congress সম্বন্ধে পুস্তিকাকারের মত এই,—ভিক্ষা দ্বারা কখনও বড় হওয়া যায় না। Congress Agitatin ভিক্ষাবৃত্তি মাত্র। পাশ্চাত্যগণকে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করাইতে হইবে—তবেই সকল উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইবে। আমরা বলি,—শুধু তাহাই নহে,—সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যেরা যে কারণে এত উন্নতি লাভ করিয়াছে,—সেই জড় বিজ্ঞানে আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে, তবেই আমরা সর্ব্ববিধ উন্নতির অধিকারী হইব।

প্রাপ্তি স্বীকার।

কমলা। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। ৭নং বাঞ্ছারাম অক্রুরের গলি, বহুবাজার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

শিল্প ও সাহিত্য। ১৭ নং, শ্রীনাথ দাসের গলি, বহুবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

কোহিনূর। হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত মাসিক পত্র। কোহিনূর আফিস, পাংশা (ফরিদপুর) এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংবাদ পাইয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের নাম লইয়া অনেক ব্যক্তি নানাস্থানে সাধারণকে প্রতারণা করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছে। তিনি বিশেষ বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের (Ramkrishna Home Of Service) নাম লইয়া অনেক ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিতেছে ও সেই অর্থ সেবাশ্রমের কার্য্যে ব্যবহার না করিয়া তদ্দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে। এই কারণে তিনি বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সাধারণের বিশেষ অবগতির জন্য ঘোষণা করিতেছেন যে, যদি কোন ধর্ম্মপ্রচারক বা সাধারণের হিতার্থ কোন শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই সন্ন্যাসীই হউন বা গৃহীই হউন রামকৃষ্ণ মিশনের শীলমোহর ও বেলুড়মঠের গোপনীয় শিলমোহরযুক্ত, বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষরিত পত্র দেখাইতে না পারেন, তবে বুঝিতে হইবে, তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সংস্রব নাই এবং তাঁহার উপর উক্ত মিশনের জন্য কোন রূপ অর্থ বা চাঁদা সংগ্রহের ভার নাই।

স্বামীজির সহিত দুই চারিটা দিন।

হে পাঠক, আমার স্মৃতির দুই এক পৃষ্ঠা যদি পড়িতে চাও ত একটু অপেক্ষা করিয়া প্রথমতঃ পূজনীয় স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বোধাবোধ, বিদ্যাবুদ্ধি, স্বভাব প্রকৃতি, কিরূপ ছিল তাহার আভাষ একটু জানা আবশ্যক নতুবা তাঁহার সহিত বসবাস ও কথোপকথনের যে কত দাম তাহা বুঝিতে পারিবে না। প্রথম জ্ঞানোদয় হইতে এন্ট্রেন্স পাশ করা পর্য্যন্ত (৫-১৮ বৎসর) ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বুঝিতাম না। কিন্তু চতুর্থ ক্লাসে উঠিতে না উঠিতে ইংরাজী শিক্ষার ছিটে ফোঁটা জল গায়ে লাগিতে না লাগিতেই প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত অনাস্থা জন্মিল। তবুও মিশনারী স্কুলে আমায় পড়িতে হয় নাই। এন্ট্রেন্স পাশ করার পর প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব হইল। তারপর কলেজে পড়িবার সময়, অর্থাৎ উনিশ হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে ফিজিক্‌স (Physics) কেমিষ্ট্রী (Chemistry) জিওলজী (Geologyo) বট্যানী (Botany) প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্র একটু আধটু পড়িলাম ও হক্‌স্লে ডারউইন, মিল, টিনডল, স্পেনসার প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিদ্বানগণের সহিত সম্বন্ধও একটু আধটু হইল। ফলে জ্ঞানের বদহজমে যাহা হয়, ঘোর নাস্তিক হইলাম। কিছুতেই বিশ্বাস নাই, ভক্তি কাহাকে বলে জানি না এবং তখনকার আমি যে একটা হস্তপদবিশিষ্ট অতি গর্ব্বিত কিম্ভূত-কিমাকার জীব বিশেষ ছিলাম এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন সকল ধর্ম্মেই দোষ দেখিতাম ও সকলকেই আপনাপেক্ষা হীন মনে করিতাম—এ ভাবটা অবশ্য মনে মনে থাকিত; প্রকাশ্যে কিন্তু, অন্যরূপ দেখাতাম।

খৃষ্টান মিশনারীরা এই সময়ে আমার নিকটে যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন। অন্য ধর্ম্মের নিন্দাবাদ অনেক তর্ক, যুক্তি, দাঁও প্যাঁচের সহিত করিয়া অবশেষে তাঁহারা বুঝাইলেন যে বিশ্বাস ভিন্ন ধর্ম্মরাজ্যে কিছুই হইবে না। খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করাটা পূর্ব্বে আবশ্যক তবেই ইহার নূতনত্ব ও অন্য সকল ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাইবে। অদ্ভুত গবেষণা ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ

সে কথায় কিন্তু পাষাণের মন গলিল না। পাশ্চাত্য বিদ্যার কৃপায় শিখিয়াছি, "প্রমাণ কিছুতেই ভিন্ন বিশ্বাস করিবে না," মিশনারী প্রভুরা এখন বলেন, অগ্রে বিশ্বাস পরে প্রমাণ। মন বুঝিবে কেন? কথার জোরে কোন মতে বিশ্বাস জন্মাইতে অক্ষম হইলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন "বাইবেল্ মন দিয়া সমস্ত পড়া আবশ্যক; তাহা হইলেই বিশ্বাস হইবে।" আচ্ছা, তাহাই করিলাম। ভাগ্যক্রমে ফাদার রিভিংটন্, বেভারেণ্ড লেট্‌ওয়ার্ড, গোরে ও বোমেণ্ট প্রভৃতি কতকগুলি সুবিদ্বান নিস্পৃহ ও বাস্তবিক ভক্ত মিশনারীরও সাক্ষাৎ লাভ হইল, কিন্তু কোন ক্রমেই খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন আমার অনেক উন্নতি হইয়াছে, ঈশার ধর্ম্মে বিশ্বাসও হইয়াছে, কিন্তু জাতি যাইবার ভয়ে খৃষ্টান হইতেছি না। তাঁহাদের সে কথার ফলে ক্রমে আত্মবিশ্বাসের উপরও সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। অবশেষে এই স্থির হইল যে তাঁহারা আমার দশটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন প্রত্যেক প্রশ্ন যথাযথ সমাধানের পর আমার সাক্ষর লইবেন। এইরূপে যখন ১০ম প্রশ্নের উত্তরে আমি সাক্ষর করিব তখনই আমার হার হইবে এবং তাঁহারা আমাকে বাপতিস্‌ম্ (Baptism) দিবেন বা তাঁহাদের ধর্ম্মে অভিষিক্ত করিবেন। বলা বাহুল্য ৩টীর অধিক প্রশ্নের সমাধান হইবার পূর্ব্বেই কালেজ ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশ করিলাম। সংসারে ঢুকিবার পরেও সকল গ্রন্থাদিই পড়ি। কখন বা চার্চে, কখন বা ব্রাহ্মমন্দিরে, কখন বা দেবালয়ে যাই, কিন্তু কোন্ ধর্ম্ম সত্য, কোন্‌টি বা অসত্য, কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টিই বা মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে স্থির হইল যে, পরলোক আছে কি না, আত্মা অমর কিংবা মর, এ সকল কথা কেহ জানে না। তবে যে কোন ধর্ম্মেই হউক না কেন দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারিলে ইহ জন্মে অনেকটা সুখ শান্তি থাকে। আর সেই বিশ্বাসটা মানুষের অভ্যাসেই দৃঢ় হইয়া থাকে। তর্ক, বিচার বা বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্মের সত্যাসত্য বুঝিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। ভাগ্য অনুকূল,— প্রচুর বেতনের চাকুরীও জুটিল। তখন আমার অর্থেরও অনাটন নাই, দশ জন লোকেও ভাল বলে; সুখী হইতে গেলে সাধারণ মানুষের যাহা যাহা আবশ্যক তাহার কিছুরই অভাব থাকিল না। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও মনে সুখ শান্তির উদয় হইল না। কি একটা অনির্ব্বচনীয় অভাবের ছায়া প্রাণে সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিল। এইরূপে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল।

সোলাপুর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত। উকিল বন্ধুটী বলিলেন, "ইনি একজন বিদ্বান বাঙ্গালি সন্ন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ মানসে আসিয়াছেন।" ফিরিয়া দেখিলাম—প্রশান্ত মূর্ত্তি, দুই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে, গোঁপ দাড়ি কামান, অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটি জুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ী, সন্ন্যাসীর সে অপরূপ মূর্ত্তি স্মরণ হইলে এখনও যেন চক্ষুর সামনে দেখি। দেখিয়া আনন্দ হইল—তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম। কিন্তু তখন উহার কারণ জানিতে পারিলাম না। কিছু ক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটী ভিন্ন হুঁকা নাই। আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।" তিনি বলিলেন "তামাক চুরুট যখন যাহা পাই তখন তাহাই খাইয়া থাকি. আর আপনার হুঁকায় খাইতে কিছুই আপত্তি নাই।" তামাক সাজাইয়া দিলাম। তখন আমার বিশ্বাস, গেরুয়া বেশ-ধারী সন্ন্যাসী মাত্রেই জুয়াচোর। ভাবিলাম, ইনিও কিছু প্রত্যাশা করিয়া আমার কাছে আসিয়াছেন। তা ছাড়া আমার উকিল বন্ধু মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, ইনি বাঙ্গালি। বাঙ্গালিদের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত মিল হওয়া কঠিন; তাই বোধ হয় আমার বাটীতে থাকিবার জন্যও আসিয়াছেন। মনে এইরূপ নানা তোলপাড় করিয়া তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিষপত্র আমার বাসায় আনাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি উকিল বাবুর বাড়ীতে বেশ আছি। আর বাঙ্গালি দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে দুঃখ হইবে, কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন—অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।" সে রাত্রে বড় বেশী কথা বার্ত্তা হইল না, কিন্তু দুই চারি কথা যাহা কহিলেন তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমা অপেক্ষা হাজার গুণে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান; ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকা কড়ি ছোন না ও সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমার অপেক্ষা সহস্র

গুণে সুখী। বোধ হইল তাঁহার কিছুরই অভাব নাই কারণ স্বার্থ সিদ্ধির ইচ্ছা নাই! আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম যদি চা খাইবার আপত্তি না থাকে তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব। তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন ও উকিলটীর সহিত তাঁহার বাটী ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম; মনে হইল এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদা সন্তুষ্ট, প্রফুল্ল-মুখ পুরুষত কখন দেখি নাই। মনে করিতাম "যাহার পয়সা নাই তাহার মরণ ভাল"; "বাস্তবিক নিস্পৃহ সন্ন্যাসী জগতে অসম্ভব"; কিন্তু সে বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া এতদিনে তাহাকে শিথিল করিল।

পর দিন ১৯শে অক্টোবর ১৮৯২ প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়া স্বামীজির পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্বামীজির দেখা নাই। আর অপেক্ষা না করিয়া আমি একটী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজি যেখানে ছিলেন তথায় গেলাম। দেখি, তথায় মহা-সভা; স্বামীজি বসিয়া আছেন ও নিকটে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান লোক বসিয়া কথাবার্ত্তা চলিতেছে। স্বামীজি কাহারও সহিত ইংরাজীতে, কাহারও সহিত সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্থানীতে, তাহাদের প্রশ্নের উত্তর, একটু মাত্র চিন্তা না করিয়াই, একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেহ কেহ হক্‌স্লের ফিজিওলজিকে ভারি জ্ঞান মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামীজির সহিত তর্ক করিতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে, কাহাকেও গম্ভীর ভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রনাম করিয়া, অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি মনুষ্য না দেবতা? কাজেই তাঁহার সমুদয় কথা মনে রহিল না। যাহা মনে আছে তাহার কয়েকটি লিখিলাম।

কোন গণ্য মান্য ব্রাহ্মণ উকিল প্রশ্ন করিলেন "স্বামীজি সন্ধ্যা, আহ্নিক প্রভৃতির মন্ত্রাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত, আমরা তাহা বুঝি না। আমাদের ঐ সকল মন্ত্রোচ্চারণে কিছু ফল আছে কি?" স্বামীজি উত্তর করিলেন "অবশ্যই উত্তম ফল আছে; ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া ঐ কয়টা সংস্কৃত মন্ত্রাদি ত অনায়াসে, ইচ্ছা হইলে বুঝিয়া লইতে পার? তথাপি লওনা, ইহা কাহার দোষ? আর যদি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝিতে পার তথাপি যখন সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বস, তখন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছি

মনে কর, না কিছু পাপ করিতেছ মনে কর? যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছি মনে করিয়া বস, তাহা হইলে; উত্তম ফল লাভ করিতে উহাই যে যথেষ্ট।" অন্য একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বলিল ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন, ম্লেচ্ছ ভাষায় করা উচিত নহে; অমুক পুরাণে এইরূপ লেখা আছে। স্বামীজি উত্তর করিলেন—যে কোন ভাষাতেই হউক ধর্ম্ম চর্চ্চা করা যায় এবং এই বাক্যের সমর্থনে শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণ স্বরূপ দিয়া বলিলেন "হাইকোর্টের নিষ্পত্তি নিম্ন আদালত দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে না।"

এইরূপে নয়টা বাজিয়া গেল। যাঁহাদের অফিস বা কোর্টে যাইতে হইবে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। কেহ বা তখনও বসিয়া রহিলেন। স্বামীজির দৃষ্টি আমার প্রতি পড়ায়, পূর্ব্বদিনের চা খাইতে যাইবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, "বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুণ্ণ করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না"। পরে আমি তাঁহাকে আমার বাসায় আসিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় অবশেষে বলিলেন "আমি যাঁহার অতিথি তাঁহার মত করিতে পারিলে, আমি তোমারই নিকট থাকিতে প্রস্তুত।" উকিলটীকে বিশেষ বুঝাইয়া স্বামীজিকে সঙ্গে লইয়া আমার বাসায় আসিলাম। সঙ্গে মোটের মধ্যে একটী কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা একখানি পুস্তক! স্বামীজি তখন ফ্রান্স দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। পরে বাসায় আসিয়া দশটার সময় চা খাওয়া হইল; তাহার পরেই আবার এক গ্লাস শীতল জলও চাহিয়া খাইলেন। আমার নিজের মনে যে সমস্ত কঠিন সমস্যা ছিল সে সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সহসা ভরসা হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজেই আমার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দুই কথাতে বুঝিয়া লইলেন।

ইতিপূর্ব্বে টাইমস্ সংবাদপত্রে একজন, একটী সুন্দর পদ্যে, ঈশ্বর কি, কোন ধর্ম্ম সত্য,—প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন, লিখিয়াছিলেন; সেই পদ্যটী আমার তখনকার ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত ঠিক মিল হওয়ায়, আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম; তাহাই তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন "লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।" আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। খৃষ্টান মিশনরীদের সহিত "ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান্, এককালে দুইই হইতে পারেন না।" এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই, মনে করিলাম, এ সমস্যা পূরণ স্বামীজিও করিতে পারিবেন না।

স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "তুমিত Science (বিজ্ঞান) অনেক পড়িয়াছ দেখিতেছি। প্রত্যেক জড় পদার্থে দুইটী opposite forces centripetal and centrifugal কি act করে না ? যদি দুইটী opposite forces জড় বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ন্যায় দুই opposite হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভবে না ? All I can say is that you have a very poor idea of your God।" আমিত নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, সত্য is absolute। সমস্ত ধর্ম্ম কখন এককালে সত্য হইতে পারে না। তিনি সে সব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে আমরা যে বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব সে সকলই আপেক্ষিক সত্য বা relative truths Absolute সত্যের ধারণা আমাদের সীমাবদ্ধ মন বুদ্ধির অসম্ভব। অতএব সত্য absolute হইলেও বিভিন্ন মন বুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি, নিত্য (absolute) সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সে সকল গুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর। যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান হইতে Photograph লইলে একই সূর্য্যের ছবি নানারূপ দেখায়, মনে হয়—প্রত্যেক ছবিটাই এক একটী ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্যের—তদ্রূপ। আপেক্ষিক সত্য (Relative truth) সকল, নিত্য সত্যের (absolute truth) সম্বন্ধে ঠিক ঐ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্ম্মই সেই জন্য সেই নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য।

বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল বলায় স্বামীজি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "রাজা হইলে আর খাওয়া পরার কষ্ট থাকে না, কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন, বিশ্বাস কি কখন জোর করিয়া হয়! অনুভব না হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব।" কোন কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে আমি "সাধু" বলায় তিনি উত্তর করিলেন "আমরা কি সাধু? এমত অনেক সাধু আছেন যাঁহাদের দর্শন বা স্পর্শ মাত্রেই দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়।" "সন্ন্যাসীরা এরূপ অলস হইয়া কেন কালক্ষেপ করেন? অপরের সাহায্যের উপর কেন নির্ভর করিয়া থাকেন—সমাজের হিতকর কোন কাজকর্ম্ম কেন করেন না" প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজি বলিলেন "আচ্ছা বল দেখি—তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ। তাহার যৎসামান্য অংশ কেবল নিজের জন্য খরচ করিতেছ; বাকি কতক অন্য কতকগুলি লোককে আপনার ভেবে তাহাদের জন্য খরচ করিতেছ।

তাহারা তজ্জন্য না তোমার কৃত উপকার মানে, না যাহা ব্যয় কর তাহাতে সন্তুষ্ট। বাকি যক্ষের মত প্রাণপণে জমাইতেছ; তুমি মরিয়া গেলে অন্য কেহ তাহা ভোগ করিবে, আর হয়ত—আরো টাকা রাখিয়া যাও নাই বলিয়া গালি দিবে। এই ত গেল তোমার হাল। আর আমি, ওসব কিছু করি না। ক্ষুধা পাইলে পেট চাপড়াইয়া, হাত মুখে তুলিয়া দেখাই; যাহা পাই তাহা খাই, কিছুই কষ্ট করি না; কিছু সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর কে বুদ্ধিমান, তুমি কি আমি?" আমি ত শুনিয়া অবাক্, ইহার পূর্ব্বে আমার সম্মুখে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিতে ত কাহারও সাহস দেখি নাই!

আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রামের পর, পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটীর বাসায় যাওয়া হইল ও তথায় অনেক বাদানুবাদ ও কথোপকথন চলিল। রাত্রি নয়টার সময় স্বামীজিকে লইয়া পুনরায় আমার বাসায় ফিরিলাম। আসিতে আসিতে বলিলাম "স্বামীজি! আপনার আজ তর্ক বিতর্কে অনেক কষ্ট হইয়াছে।" তিনি বলিলেন "বাবা! তোমরা যেরূপ utilitarian যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে একমুঠা খাইতে দাও? আমি এইরূপ গল্ গল্ করিয়া বকি, লোকের শুনে আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেন, যে সকল লোক সভায় তর্ক বিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহারা বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় ওরূপ করে না। আমিও বুঝিতে পারি, কে, কি ভাবে কি কথা বলে ও তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাল, স্বামীজি! সকল প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কি রূপে?" তিনি বলিলেন "ঐ সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন; কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করেছে, আর তাহার কতবার উত্তর দিয়াছি।" রাত্রে আহার করিতে বসিয়া আবার কত কথা কহিলেন। পয়সা না ছুঁইয়া দেশ ভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটনা হইয়াছিল সে সব বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল—আহা ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত না জানি সহ্য করিয়াছেন! কিন্তু তিনি—সে সব যেন কত মজার কথা, এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে সমুদয় বলিতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন স্থানে লঙ্কা খাইয়া এমন

পেট জ্বালা—যে এক বাটী তেঁতুল গোলা খাইয়াও থামে না, কোথাও এস্থানে সাধু সন্ন্যাসী জায়গা পায়না এই বলিয়া অপরের তাড়না, বা গুপ্ত পুলিশের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়, যাহা শুনিলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, সে সব ঘটনা "তাঁহার পক্ষে যেন তামাসা মাত্র।

রাত্র অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে নিদ্রার জন্য বিছানাদি দিয়া, আমিও ঘুমাইতে গেলাম ; কিন্তু সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। ভাবিতে লাগিলাম, এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বামীজিকে দেখিয়া ও তাঁহার দুই চার কথা শুনিয়াই সমস্ত দূর হইল। আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল আমাদের কেন--আমাদের চাকরবাকরের ও তাঁহার প্রতি এত ভক্তি শ্রদ্ধা হইল যে তাহাদের সেবার ও আগ্রহে স্বামীজিকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতে হইত ;

২০শে অক্টোবর ১৮৯২। সকালে উঠিয়া স্বামীজিকে নমস্কার করিলাম। এখন সাহস বাড়িয়াছে, ভক্তিও হইয়াছে। স্বামীজিও অনেক বন, নদী, অরণ্যের বিবরণ আমার নিকট শুনিযা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সঙ্গে আজ তাঁহার চার দিন বাস হইল। পঞ্চম দিনে তিনি বলিলেন "সন্ন্যাসীদের নগরে তিন দিনের বেশি ও গ্রামে একদিনের বেশি থাকিতে নাই। আমি শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।" কিন্তু আমি ওকথা কোন মতেই শুনিব না, উহা তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই। পরে অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন "এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে মায়া মমতা বাড়িয়া যায়। আমরা গৃহ ও আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়াছি, সেইরূপ মায়ায় মুগ্ধ হইবার যত উপায় আছে তাহা হইতে দূরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।" আমি বলিলাম যে, তিনি কখনই মুগ্ধ হইবার নন। পরিশেষে আমার অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া আরও দুই চারি দিন থাকিতে স্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে আমার :মনে হইল যে স্বামীজি যদি সাধারণের জন্য বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার লেক্‌চার শুনি এবং অপর কত লোকেরও কল্যাণ হয়। অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু লেক্‌চার দিলে, হয ত 'নাম', যশের ইচ্ছা হইবে এই বলিয়া তিনি কোনমতে উহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে সভায় প্রশ্নের উত্তর দান (conversational meeting) করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, এ কথা জানাইলেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে স্বামীজি Picwick Papers হইতে দুই তিন পাতা মুখস্থ বলিলেন। আমি উহা অনেকবার পড়িয়াছি, বুঝিলাম—পুস্তকের কোন্ স্থান হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া আমার বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হইল। ভাবিলাম, সন্ন্যাসী হইয়া সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মুখস্থ করিলেন? পূর্ব্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "দুইবার পড়িয়াছি। একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও আজ পাঁচ ছয় মাস হইল একবার।" অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবে কেমন করিয়া স্মরণ রহিল? আমাদের কেন থাকে না?' স্বামীজি বলিলেন, "একান্ত মনে পড়া চাই, আর খাদ্যের সার ভাগ হইতে প্রস্তুত রেতের অপচয় না করিয়া পুনরায় উহা assimilate করা চাই।"

আর একদিন স্বামীজি মধ্যাহ্ণে একাকী বিছানায় শুইয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন। আমি অন্য ঘরে ছিলাম। হঠাৎ এরূপ উচ্চস্বরে হাঁসিয়া উঠিলেন যে আমি, এ হাঁসির বিশেষ কোন কারণ আছে ভাবিয়া তাঁহার ঘরের দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বিশেষ কিছুই হয় নাই। তিনি যেমন বই পড়িতেছিলেন, তেমনি পড়িতেছেন। প্রায় ১৫মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলাম, তথাপি তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন না! বই ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁহার মন নাই। পরে আমাকে দেখিয়া আসিতে বলিলেন এবং আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি শুনিয়া বলিলেন, "যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা এক মনে, এক প্রাণে, সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাজিপুরের পওহারী স্বামী ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ যেমন একমনে করিতেন; তাঁহার পিতলের ঘটিটী মাজাও ঠিক তেমনি একমনে করিতেন। এমনি মাজিতেন যে, সোনার মত দেখাইত।"

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজি! চুরি করা পাপ কেন? সকল ধর্ম্মে চুরি করিতে নিষেধ করে কেন? আমার মনে হয়, ইহা আমাদের, উহা অপরের ইত্যাদি মনে করা কেবল কল্পনা মাত্র। কৈ, আমায় না জানাইয়া, আমার আত্মীয় বন্ধু কেহ আমার কোন দ্রব্য ব্যবহার করিলে ত উহা চুরি করা হয় না? তাহার পর পশু পক্ষী আদি আমাদের কোন জিনিষ নষ্ট করিলে তাহাকেও ত চুরি বলি না?" স্বামীজি

বলিলেন, "অবশ্য, সর্ব্বাবস্থায়, সকল সময়ে মন্দ এবং পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এমন কোন জিনিষ বা কার্য্য নাই। আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেক জিনিষ মন্দ এবং প্রত্যেক কার্য্যই পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে যাহাতে অপর কাহারও কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয় এবং যাহা করিলে, শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার দুর্ব্বলতা আসে, সে কর্ম্ম করিবে না। উহাই পাপ ; আর তদ্বিপরীত কর্ম্মই পুণ্য। মনে কর, তোমার কোন জিনিষ কেহ চুরি করিলে তোমার দুঃখ হয় কি না? তোমার যেমন, সমস্ত জগতেরও তেমনি জানিবে। এই দুই দিনের জগতে সামান্য কিছুর জন্য যদি তুমি এক প্রাণীকে দুঃখ দিতে পার, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে তুমি কি মন্দ কর্ম্ম—না করিতে পারিবে। আবার পাপ পুণ্য না থাকিলে সমাজ চলে না। সমাজে থাকিতে হইলে তাহার নিয়মাদি পালন করা চাহি। বনে গিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচ, ক্ষতি নাই—কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না ; কিন্তু সহরে করিলে পুলিশের দ্বারা ধরাইয়া তোমায় কোন নির্জ্জন স্থানে বন্ধ করিয়া রাখাই উচিত।"

স্বামীজি অনেক সময় ঠাট্টা বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাষ্টারের কাছে বসার মত ছিল না। খুব রঙ্গ রস চলিতেছে, বালকের মত হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন ; আবার তখনই এমনি গম্ভীর ভাবে জটিল প্রশ্ন সমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক্ হইয়া ভাবিত—"ইহাঁর ভিতর এত শক্তি! এইত দেখিতেছিলাম, আমাদের মতনই একজন।" সকল সময়েই তাঁহার নিকট লোকে শিক্ষা লইতে আসিত। সকল সময়েই তাঁহার অবারিত দ্বার ছিল। তাহার ভিতর নানা লোকে নানা ভাবেও আসিত—কেহবা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে, কেহবা খোসগল্প শুনিতে, কেহবা তাঁহার নিকট আসিলে অনেক ধনী বড়লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে বলিয়া, আবার কেহবা সংসার তাপে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার নিকট দুই দণ্ড জুড়াইবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিবে বলিয়া। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল যে, যে যে ভাবেই আসুক না কেন, তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন এবং

তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টির হাত হইতে কাহারই এড়াইবার বা কিছু গোপন করিবার সাধ্য ছিল না! এক সময়ে কোন সম্রান্ত ধনীর একমাত্র সন্তান ইউনিভারসিটীর পরীক্ষার হস্ত এড়াইবে বলিয়া স্বামীজির নিকট ঘন ঘন আসিতে লাগিল এবং সাধু হইবে, এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। সে আবার আমার এক বন্ধুর পুত্র। আমি স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ ছেলেটী আপনার কাছে কি মতলবে এত বেশী বেশী আসে? উহাকে কি সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দেবেন? উহার বাপ আমার একজন বন্ধু। স্বামীজি বলিলেন, "উহার পরীক্ষা কাছে, পরীক্ষা দিবার ভয়ে সাধু হইবার ইচ্ছা। আমি উহাকে বলিয়াছি—এম্, এ, পাশ করিয়া সাধু হইতে আসিও, বরং এম্, এ, পাশ করা সহজ কিন্তু সাধু হওয়া তদপেক্ষা কঠিন।"

স্বামীজি আমার বাসায় যত দিন ছিলেন, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার কথোপকথন শুনিতে সভা বসিয়া যাইত, এতই অধিক লোক সমাগম হইত। ঐ সময় এক দিন আমার বাসায় একটী চন্দন গাছের তলায় তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া তিনি যে কথা গুলি বলিয়াছিলেন, জন্মেও তাহা ভুলিতে পারিব না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথা বলিতে হইবে। সেইজন্য অন্য সময়ের জন্য রাখাই যুক্তিযুক্ত। এস্থলে আপনার কথা আর একটু বলিব। কিছু পূর্ব্ব হইতে আমার স্ত্রীর ইচ্ছা হয়, গুরুর নিকট মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করে। আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। তবে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "এমন লোককে গুরু করিও, যাঁহাকে আমিও ভক্তি করিতে পারি। গুরু বাড়ী ঢুকিলেই যদি আমার ভাবান্তর হয়, তাহা হইলে তোমার কিছুই আনন্দ বা উপকার হইবে না। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহা হইলে উভয়ে মন্ত্র লইব, নতুবা নহে।" তিনিও তাহাতে স্বীকার পান্। স্বামীজির আগমনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তাহা হইলে তুমি শিষ্যা হইতে ইচ্ছা কর কি?" তিনিও আগ্রহে বলিলেন, "উনি কি গুরু হইবেন? হইলে ত আপনাদের কৃতার্থ মনে করি।" স্বামীজিকে এক দিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "স্বামীজি, আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?" স্বামীজি প্রার্থনা জানাইবার আদেশ করিলে আমাদের উভয়কে দীক্ষা দিবার জন্য বলিলাম। স্বামীজি

বলিলেন, "গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল। গুরু হওয়া বড় কঠিন। শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হয়। দীক্ষার পূর্ব্বে গুরুর সহিত শিষ্যের অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক" প্রভৃতি নানা কথা কহিয়া আমায় নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। যখন দেখিলেন, আমি কোন প্রকারে ছাড়িবার নহে, তখন অগত্যা স্বীকার করিলেন ও (২৫ অক্টোবর, ১৮৯২ সালে) আমাদের উপযুক্ত দীক্ষা প্রদান করিলেন। এখন আমার ভারি ইচ্ছা হইল, স্বামীজির ফটো তুলিয়া লই। তিনি সহজে স্বীকার করিলেন না। পরে অনেক বাদানুবাদের পর আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ২৪শে তারিখে ফটো তোলাইতে সম্মত হইলেন ও ফটো লওয়া হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি একজনের আগ্রহ সত্ত্বেও ফটো তুলিতে দেন নাই বলিয়া আমাকে দুই কপি ফটো তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। আমিও সে কথা আনন্দে স্বীকার করিলাম। কথা প্রসঙ্গে এক দিন স্বামীজি বলিলেন, "তোমার সহিত অরণ্যে তাঁবু খাটাইয়া আমার কিছু দিন থাকিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু, চিকাগোয় ধর্ম্মসভা হইবে, যদি তাহাতে যাইবার সুবিধা হয় ত তথায় যাইব।" আমি চাঁদার লিষ্ট করিয়া টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করায় তিনি কি ভাবিয়া স্বীকার করিলেন না। এই সময় স্বামীজির ব্রতই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ করিবেন না। আমি অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহার মারহাট্টি জুতার পরিবর্ত্তে এক যোড়া জুতা ও এক গাছি বেতের ছড়ি দিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে কোলাপুরের রাণী অনেক অনুরোধ করিয়াও স্বামীজিকে কিছুই গ্রহণ করাইতে না পারিয়া অবশেষে দুইখানি গেরুয়া বস্ত্র পাঠাইয়া দেন। স্বামীজিও তাহা গ্রহণ করিয়া যে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা সেইখানেই ত্যাগ করেন এবং বলেন "সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই ভাল।"

ইতিপূর্ব্বে আমি ভগবদ্গীতা অনেক বার পড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বুঝিতে না পারায় পরিশেষে উহাতে বুঝিবার বড় কিছু নাই, মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। স্বামীজি গীতা লইয়া আমাদিগকে একদিন বুঝাইতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, উহা কি অদ্ভুত গ্রন্থ। গীতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে তাঁহার নিকটে যেমন শিখিয়াছিলাম, তেমনি আবার অন্যদিকে Jules Verne এর Scientific novels এবং Carlyle এর Sartor Resartus পড়িতে তাঁহার নিকটে শিখি।

তখন স্বাস্থ্যের জন্য ঔষধাদি অনেক ব্যবহার করিতাম। সে কথা জানিতে পারিয়া একদিন তিনি বলিলেন, "যখন দেখিবে কোন রোগ এত প্রবল হইয়াছে যে শয্যাশায়ী করিয়াছে, আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই ঔষধ খাইবে, নতুবা নহে। Nervousness, debility প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টাকা কাল্পনিক। ঐ সকল রোগের হাত হতে ডাক্তারেরা যত লোককে বাঁচান, তার চেয়ে বেশী লোককে মারেন! আর ওরূপ সদা রোগ রোগ করিয়াই বা কি হইবে? যত দিন বাঁচ আনন্দে কাটাও। তবে যে আনন্দে একবার সন্তাপ আসিয়াছে, তাহা আর করিও না। তোমার আমার মত একটা মরিলে পৃথিবীও আপনার কেন্দ্র হইতে দূরে যাইবে না বা জগতের কোন বিষয়ের কিছু ব্যাঘাত হইবে না।" এই সময়ে আবার অনেক কারণ বশতঃ, উপরিস্থ কর্ম্মচারী সাহেবদের সহিত আমার বড় একটা বনিত না। তাঁহারা সামান্য কিছু বলিলে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিত, এবং এমন ভাল চাকুরী পাইয়াও এক দিনের তরে সুখী হই নাই। তাঁহাকে এ সমস্ত কথা বলায় তিনি বলিলেন, "কিসের জন্য চাকুরী করিতেছ? বেতনের জন্য ত? বেতন ত মাসে মাসে ঠিক পাইতেছ, তবে কেন মনে কষ্ট পাও? আর ইচ্ছা হইলে যখন চাকরী ছাড়িয়া দিতে পার, কেহ বাঁধিয়া রাখে নাই, তখন 'বিষম বন্ধনে পড়িয়াছি' ভাবিয়া দুঃখের সংসারে আরও দুঃখ বাড়াও কেন? আর এক কথা, বল দেখি, যাহার জন্য বেতন পাইতেছ, আফিসের সেই কাজ গুলি করিয়া দেওয়া ছাড়া তোমার উপরওয়ালা সাহেবদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য কখনও কিছু করিয়াছ কি? কখনও সে জন্য চেষ্টা কর নাই, অথচ তাহারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন বলিয়া তাহাদের উপর বিরক্ত! ইহা কি বুদ্ধিমানের কাজ? জানিও, আমরা অন্যের উপর হৃদয়ের যে ভাব রাখি, তাহাই কাজে প্রকাশ পায়; আর প্রকাশ না করিলেও তাহাদের ভিতরে আমাদের উপর, ঠিক সেই ভাবের উদয় হয়। আমাদের ভিতরকার ছবিই আমরা জগতে প্রকাশ রহিয়াছে দেখি। 'আপ্ ভাল তো জগৎ ভাল' একথা যে কত দূর সত্য তাহা কেহই জানে না। আজ হতে মন্দটা দেখা, একেবারে ছেড়ে দিতে চেষ্টা কর, দেখিবে, যে পরিমাণে তুমি উহা করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তাহাদের ভিতরের ভাব এবং কার্য্যও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।" বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে আমার ঔষধ খাইবার বাতিক

দূর হইল এবং অপরের উপর দোষ দৃষ্টি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করায় ক্রমে জীবনের একটা নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল।

স্বামীজির নিকট একবার, ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হওয়ায় তিনি বলিলেন, "যাহা অভীষ্ট কার্য্যের সাধনভূত তাহাই ভাল; আর যাহা তাহার প্রতিরোধক তাহাই মন্দ, ভাল মন্দের বিচার, আমরা জায়গা উঁচু নিচুর বিচারের ন্যায় করিয়া থাকি। যত উপরে উঠিবে তত দুই, এক হয়ে যাবে। চন্দ্রেতে পাহাড় ও সমতল আছে বলে; কিন্তু আমরা সব এক দেখি—সেইরূপ।" স্বামীজির এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল যে, যে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভিতর হইতে এমন যোগাইত যে, মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইত।

আর এক দিনের কথা—কলিকাতায় একটী লোক অনাহারে মারা গেছে, খবরের কাগজে এ কথা পড়িয়া এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, তাহা বলিবার নহে; বার বার বলিতে লাগিলেন, "এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়।" কেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "দেখিতেছ না, অন্যান্য দেশে কত poor house, work house, charity fund প্রভৃতি সত্ত্বেও শত শত লোক প্রতি বৎসর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশে কিন্তু এক মুষ্টি ভিক্ষার পদ্ধতি থাকায় অনাহারে লোক মরিতে কখন শোনা যায় নাই। আমি এই প্রথম কাগজে এ কথা পড়িলাম যে, দুর্ভিক্ষ ভিন্ন অন্য সময়ে, কলিকাতায় অনাহারে লোক মরে!"

ইংরাজী শিক্ষার কৃপায় আমি দুই চারি পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করিতাম। মনে হইত, ঐরূপে যৎসামান্য যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাতে তাহাদের কোন উপকার তো হয়ই না; বরং বিনা পরিশ্রমে পয়সা পাইয়া, তাহা মদ গাঁজায় খরচ করিয়া তাহারা আরো অধঃ-পাতে যায়। লাভের মধ্যে দাতার কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায়! সে জন্য আমার মনে হইত—লোককে কিছু কিছু দেওয়ার চেয়ে একজনকে বেশী দেওয়া ভাল। স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "ভিখারী আসিলে যদি শক্তি থাকে তো যাহা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তো দুই একটি পয়সা, তজ্জন্য সে কিসে খরচ করিবে, সদ্ব্যয় হবে কি

অপব্যয় হবে, এসব লইয়া এত মাথা ঘামাবার দরকার কি? আর সত্যই যদি সেই পয়সা গাঁজা খেয়ে উড়ায়, তাহা হইলেও তাহাকে দেওয়াও সমাজের লাভ বৈ লোক্সান নাই। কেন না, তোমার মত লোকেরা তাহাকে দয়া করিয়া কিছু কিছু না দিলে, সে উহা তোমাদেরই নিকট হইতে চুরি করিয়া লইবে। তাহার চেয়ে দুপয়সা ভিক্ষা করে, গাঁজা টেনে, সে চুপ করে বসে থাকে, তাহা কি তোমাদেরই ভাল নহে? অতএব ও প্রকার দানেও সমাজের উপকার বৈ অপকার নাই।"

প্রথম হইতেই স্বামীজিকে বাল্য বিবাহের উপর ভারি চটা দেখিয়াছি। সর্ব্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্যোগী ও সন্তুষ্টচিত্ত হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুরাগও কোন মানুষের দেখি নাই! বিলাত হইতে ফিরিবার পর যাঁহারা স্বামীজির প্রথম দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন না, বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন করিয়া কাঞ্চন মাত্র স্পর্শ না করিয়া কত কাল, ভারত-বর্ষের সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মত শক্তিমান্ পুরুষের এত বাঁধা বাঁধি নিয়মাদির আবশ্যক নাই—কোন লোক একবার একথা বলায় তিনি বলেন, "দেখ, মন বেটা বড় পাগল, ঘোর মাতাল, চুপ করে কখনই থাকে না; একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাবে। সে জন্য সকলেরই বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্য নিয়মে চলতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর তাঁর খুব দখল আছে। তবে ইচ্ছা করিয়া কখন একটু আল্‌গা দেন মাত্র। কিন্তু কার কতটা দখল হয়েছে, তা একবার ধ্যান কর্‌তে বস্‌লেই টের পাওয়া যায়! এক বিষয়ের উপর চিন্তা করিব মনে করিয়া বসিলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না! সকলেই মনে করে, সে স্ত্রৈণ নয়, তবে আদর করিয়া স্ত্রীকে আধিপত্য করিতে দেয় মাত্র। মনকে বশে রাখিয়াছি মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করিয়া কখন নিশ্চিন্ত থাকিও না।"

একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম, স্বামীজি! দেখিতেছি, ধর্ম্ম ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক লেখা পড়া জানা আবশ্যক। তিনি বলিলেন— "নিজে ধর্ম্ম বোঝ্‌বার জন্য লেখাপড়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্যকে

বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, 'বামকেষ্ট' বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্ম্মের সার তত্ত্ব তাঁর চেয়ে কে বুঝিয়াছিল?" আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু সন্ন্যাসীর স্থূলকায় ও সদা সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব। এক দিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলায় তিনিও বিদ্রূপ ছলে উত্তর করিলেন, "ইহাই আমার Famine insurance fund; যদি পাঁচ সাত দিন খাইতে না পাই, তবু আমার চর্ব্বি আমাকে জীবিত রাখিবে। তোমরা এক দিন না খাইলেই সব অন্ধকার দেখিবে। আর যে ধর্ম্মে মানুষকে সুখী করে না, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে, dyspepsia প্রসূত রোগ বিশেষ বলিয়া জানিও।" স্বামীজি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এক দিন একটী গান আরম্ভও করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি "ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস"; তার পর শুনিবার আমার অবসরই বা কোথায়? তাঁহার কথা ও গল্পই আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই যথা Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই চার কথায় বুঝাইয়া দিতেন। আবার ধর্ম্ম বিষয়ক মীমাংসা সকল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের একই লক্ষ্য, একই দিকে গতি, দেখাইতে তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় ক্ষমতা আর কাহারও দেখা যায় নাই।

লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় এক দিন বলেন যে, "পর্য্যটন কালে সন্ন্যাসীদের দেশ বিদেশের নানা প্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়; তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ নিবারণের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকে। আমিও সেই জন্য এত লঙ্কা খাই।"

ক্ষেত্রির রাজা, কোলাপুরের ছত্রপতি প্রভৃতি রাজোয়ারা ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা রাজড়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিত; তাঁহাদেরও তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। অসামান্য ত্যাগী হইয়া, রাজা রাজড়ার সহিত অত মেশামিশি তিনি কেন করেন, একথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইত না। কোন কোন নির্ব্বোধ লোক এজন্য তাঁহাকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না।

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিলেন, "হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়া ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে লওযাইয়া যে ফল হইবে, একজন শ্রীমান্ রাজাকে সেই দিকে লওযাইতে পারিলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হইবে, ভাব দেখি। গরিব প্রজার ইচ্ছা হইলেও সৎকার্য্য করিবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গল বিধানের ক্ষমতা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোন রূপে তাহার ভিতর একবার জাগাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধীনস্থ সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং জগতের কত বেশী কল্যাণ হইবে।"

বাগ্‌বিতণ্ডায় ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম অনুভব প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটী বুঝাইবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেন, "Test of pudding lies in eating, অনুভব কর, তাহা না হইলে কিছুই বুঝিবে না।" তিনি কপট সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বলিতেন, "ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল; নতুবা নবানুরাগটুকু কমিবার পর প্রায় গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়।" আমি বলিলাম, কিন্তু ঘরে থাকিয়া সেটি হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন; আপনি, সর্ব্বভূতকে সমান চোখে দেখা, রাগ দ্বেষ ত্যাগ করা প্রভৃতি যে সকল কায ধর্ম্ম লাভের প্রধান সহায় বলেন, তাহা যদি আমি আজ হইতে অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তাহা হইলে কাল হইতে আমার চাকর ও অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শান্তিতে থাকিতে দিবে না। উত্তরে তিনি পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্প ও সন্ন্যাসীর গল্পটী বলিয়া বলিলেন, "কখন ফোঁস ছেড়ো না আর কর্ত্তব্য পালন করিতেছ মনে করিযা সকল কর্ম্ম করিও। কেহ দোষ করে, দণ্ড দিবে, কিন্তু দণ্ড দিতে গিয়া কখন রাগ করিও না।" পরে পূর্ব্বের প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া বলিলেন, এক সময়ে আমি এক তীর্থ স্থানের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের অতিথি হইয়াছিলাম, লোকটীর বেশ ধর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁহার বেতন ১২৫ টাকা, কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার বাসার খরচ মাসে ২।৩ শত টাকা হইবে। যখন বেশী জানাশুনা হইল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ত আয় অপেক্ষা খরচ বেশী দেখিতেছি—চলে কি রূপে? তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনারাই চালান্। এই তীর্থ স্থলে

যে সকল সাধু সন্ন্যাসী আসেন, তাঁহাদের ভিতর সকলেই কিছু আপনার মত নয়। সন্দেহ হইলে তাঁহাদের নিকট কি আছে না আছে, তল্লাস করিয়া থাকি। অনেকের নিকট প্রচুর টাকা কড়ি বাহির হয়। যাহাকে চোর সন্দেহ করি, তাহারা টাকা কড়ি ফেলিয়া পালায় আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুস ঘাস কিছু লইনা।"

স্বামীজির সহিত, একদিন অনন্ত (Infinity) পদার্থ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হয়। সেই কথাটী বড়ই সুন্দর ও সত্য; তিনি বলিলেন, "There can be no too infinities" আমি সময় অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলেন, আকাশ অনন্তটা বুঝিলাম কিন্তু সময় অনন্তটা বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ অনন্ত, একথা বুঝি, কিন্তু দুইটা জিনিষ অনন্ত হইলে কোন্‌টা কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখ্‌বে, সময়ও যাহা, আকাশও তাহাই, আরো অগ্রসর হইয়া বুঝিবে, সকল পদার্থই অনন্ত, ও সেই সকল অনন্ত পদার্থ একটা বই দুইটা দশটা নয়।"

এইরূপে স্বামীজির পদার্পণে ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত আমার বাসায় আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল। ২৭ তারিখে বলিলেন, "আর থাকিব না; রামেশ্বরে যাইব মনে করিয়া অনেক দিন হইল এই দিকে চলিতেছি। যদি এই ভাবে অগ্রসর হই, তাহা হইলে এ জনমে আর রামেশ্বর পৌঁছান হইবে না।" আমি অনেক অনুরোধ করিয়াও আর রাখিতে পারিলাম না। ২৭শে অক্টোবর মেল ট্রেনে, তিনি মরমাগোয়া যাত্রা করিবেন, স্থির হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম ও বলিলাম, "স্বামীজি! জীবনে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই! আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।"

শ্রীহরিদাস মিত্র, ফরেষ্ট অফিসার, শোলাপুর।

অজামিল ও নামমাহাত্ম্য।

জগতে যত ভাব আছে, যত মত আছে, সবই সত্য। ভগবান সত্যস্বরূপ; তাঁহার সৃষ্ট জগতে বাস্তবিক অসত্য কিছুই থাকিতে পারে না। যাহাকে আমরা ইন্দ্রজাল, মিথ্যা বা ভ্রম বলি, তাহাও বাস্তবিক অসত্য নহে; কোন না কোন সত্যের আচ্ছাদিত প্রকাশমাত্র। তবে যে আমাদের দৃষ্টিতে অনেক জিনিষ অসত্য বা সত্যাসত্যমিশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহা আমাদেরি দৃষ্টিহীনতার জন্য। যে দৃষ্টি অবলম্বনে দেখিলে তাহাদের সত্যতা ও সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারা যায়, তাহা আমাদের নাই বলিয়াই আমরা তাহাদের বুঝিতে পারি না। যে প্রথম সেই বিষয় বিশেষে সত্য বুঝিয়াছিল, যে প্রথম সেই বিষয়বিশেষে সত্য দেখিয়াছিল—সেই সে মন্ত্রের দ্রষ্টা। তাহার ন্যায় দৃষ্টি তোমার আমার নাই বলিয়াই আমরা এখন সেই তত্ত্বে ভ্রম দর্শন করিয়া থাকি। নতুবা আমরা জানি বা নাই জানি, প্রত্যেক অনুভবে সত্য পদার্থই স্পর্শ করিয়া থাকি এবং আমাদের প্রত্যেক ভাব, মত এবং কল্পনাও কোন না কোন সত্যাবলম্বনেই উঠিয়া থাকে। উহাদের প্রত্যেকটিই সেই সেই সত্যের বিকৃত দর্শনমাত্র—এ বিষয়ে ভ্রম নাই।

জ্ঞানী ব্যক্তি দেখেন, জগৎ ভাবময়—সুতরাং তিনি এখানে সম্পূর্ণ অসৎ বলিয়া কিছুই দেখিতে পান না। কুৎসিৎ পাপাচারীর চেষ্টার ভিতরেও এইরূপে তাঁহারা দৃষ্টিহীনতাপ্রসূত বিকৃতভাবাপন্ন সত্যানুরাগই দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের ন্যায় দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেই সমুদয় বস্তু সহানুভূতির চক্ষে দেখিবার শক্তি হয়। যাঁহাদের এ দৃষ্টির বিকাশ হয় নাই, তাঁহারা জগতের প্রতি ভাব বা মতের ভিতরের সত্য ও সৌন্দর্য্য সম্ভোগে বিশেষ বঞ্চিত, সন্দেহ নাই।

সর্ব্ব দেশের ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিয়াই দেখা যায়, তাহার মধ্যে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা আমাদের এখনকার দৃষ্টি ও বুদ্ধির সঙ্গে কোন মতে মিলাইতে পারা যায় না। আমাদের সঙ্গে মেলে না বলিয়া সেইগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দিবার কোন কারণ দেখি না। হয়ত

যিনি প্রথমে সেই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, তিনি উহাকে যে দৃষ্টিতে, যে ভাবে দেখেন, আমরা যদি উহাকে সেই ভাবে দেখিতে পারি, তাহা হইলে উহাতে যুক্তির বিরোধী কিছুই দেখিতে পাইব না! হয়ত দেখিব, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—হৃদয়ের কোন সৌন্দর্য্য দেখান, বুদ্ধির নয়। বুঝিব হয়ত পরবর্ত্তী টীকাকারগণ ক্রমশঃ উহাকে হৃদয়ের রাজ্য হইতে বুদ্ধির রাজ্যে লইয়া যাইবার অসম্ভব চেষ্টা করিয়া অসঙ্গতি দোষে পড়িয়াছেন।

উদাহরণ স্বরূপ এখানে পুরাণের অজামিল উপাখ্যান লওয়া যাউক। চলিত কথায় আমরা সচরাচর শুনিতে পাই, অজামিল পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম লইয়া উদ্ধার হইয়াছিলেন। ইহাতে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, সাধনভজন কিছুমাত্র না করিয়া মরণের পূর্ব্বে কোন মতে একবার ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে পারিলেই তাঁহাদের সবকাজ হইবে—ঈশ্বর লাভ হইবে। কিন্তু একবার ভাগবত খানা খুলিয়া দেখিলে অন্য রূপ দেখিতে পাই। প্রথম দেখিতে পাই, অজামিল ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার রীতিমত শাস্ত্র জ্ঞান ছিল এবং স্বভাবও পূর্ব্বে অতি সুন্দর ছিল। তিনি সদাচারীও যমাদি নানাগুণসম্পন্ন ছিলেন। সর্ব্বদা ব্রত আচরণ করিতেন এবং মৃদুস্বভাব, সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ ও শুচি ছিলেন। তিনি অহঙ্কারশূন্য হইয়া সর্ব্বদা গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধগণের সেবা করিতেন। সকল প্রাণীর সঙ্গে তাঁহার সৌহার্দ্দ্যভাব ছিল। তিনি অতি সাধু ও পরিমিতভাষী ছিলেন, কাহারও প্রতি কখন হিংসা করিতেন না।

পূর্ব্ব অবস্থায় তাঁহার এত সদ্‌গুণ ছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অজামিল পদের প্রয়াসী হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সদ্‌গুণগণের একটীরও দাবী করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। যাউক, অসৎসঙ্গে ইহাঁর পতন হইল। দাসীগর্ভে যে দশপুত্র হইল, তাহার কনিষ্ঠটীর নাম রাখা হইল নারায়ণ। এটী ব্রাহ্মণের অতিপ্রিয় ছিল। পুত্রের নাম নারায়ণ রাখাতে বুঝা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ অসৎসঙ্গে পড়িয়া অসৎমার্গাবলম্বী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ভগবন্নিষ্ঠা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই।

তার পর ইহাঁর মুমূর্ষু অবস্থায় পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম স্মরণ। ভাগবতে লিখিত আছে, প্রথমে যমদূত ইহাঁকে লইতে আসিয়াছিল, তার পর নারায়ণ নাম উচ্চারিত হইবামাত্র বিষ্ণুদূত আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে সন্দেহ এই, অজামিলের হৃদয়ে কি নারায়ণ শব্দ দ্বারা ভগবদ্ভাব কিছুমাত্র উদয় হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, তবে আমরাও ত অনেক সময় নানা

কারণে ভগবানের নামাত্মক বিস্তর শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকি, আমাদের কাছেই বা বিষ্ণুদূত আসেন না কেন? ইহাতে বোধ হয়, যদি এই গল্পটি একটী প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা হয়, তবে নিশ্চয় পুত্রচ্ছলে নারায়ণ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ভাবযোগে (Association of ideas) তাঁহার মনে নারায়ণের ভাবও আসিয়াছিল, আর খুব সম্ভব যে, রোগের বিকারগ্রস্ত তাঁহার নিজের মনেরই দুই প্রকার বৃত্তি সাকার রূপ ধারণ করিয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া তর্ক করিয়াছিল। যেমন স্বপ্নাবস্থায় অনেক সময় আমাদের সকলেরই ঘটিয়া থাকে। যমদূত বলিতেছেন, "অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, শাস্তি পাইতেই হইবে।" বিষ্ণুদূত বলিতেছেন, "ভগবদুপাসনায় সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়।

সাধারণের একটী সংস্কার আছে, অজামিল এই অবস্থায় মরিয়া বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক বিষ্ণুলোকে নীত হন। কিন্তু ভাগবত অন্যরূপ বলিতেছেন। তাঁহার বিকার ছুটিয়া চেতনা হইল! কিন্তু যমদূত বিষ্ণুদূতদিগের সেই কথোপ-কথন কথন ভুলিতে পারিলেন না, উহা তাঁহার প্রাণে লাগিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি আপন পূর্ব্বকৃত অসদাচারের জন্য অতিশয় অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন যে, পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম স্মরণ করিয়া আমার এইরূপ সিদ্ধপুরুষগণের দর্শন ও এত সদুপদেশ শ্রবণ হইল। না জানি, প্রকৃত ভাবে ভগবানের উপাসনা করিলে কতদূর উন্নতি হয়। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, 'আমি যাহাতে আবার ঘোর পাপে নিমগ্ন না হই, তজ্জন্য প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সংযমন করিব। অবিদ্যা ও কামকর্ম্মজনিত এই বন্ধন মোচন করিয়া সর্ব্ব প্রাণীর সুহৃদ্, শান্ত, দয়াবান্ ও আত্মবান্ হইয়া স্ত্রীরূপিণী নিজমায়াগ্রস্ত আপনার আত্মাকে মুক্ত করিব। এক্ষণে সত্যবস্তুতে আমার বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইয়াছে। দেহাদিতে আমি আমার বলিয়া যে অভিমান আছে, তাহা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক চিত্তকে ভগবৎকীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া সেই ভগবানেই স্থাপন করিব।'

এই বলিয়া তিনি সর্ব্বত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে গমন করিলেন। তথায় আসন কল্পনা পূর্ব্বক যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে মনঃসংযোগ করিলেন। তৎপরে চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় হইতে আত্মাকে বিযুক্ত করিয়া জ্ঞানময় পরম ব্রহ্মস্বরূপ ভগবানে সংযোগ করিলেন।

এই সময়ে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল।

যাঁহারা একবার মাত্র ভগবানের নাম করিয়াই ভগবানকে পাইতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন অজামিলের ন্যায় সর্ব্বত্যাগ ও যোগ সাধনে প্রস্তুত আছেন ?

এই রূপে ভাগবত লিপিবদ্ধ অজামিলের জীবনেতিহাস চলিত কথার সহিত অনেক বিরোধী হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নামমাহাত্ম্যের উপর যে চলিত বিশ্বাস আছে, তাহাও ভাগবতকারের দৃষ্টিতে পরিবর্ত্তনের যোগ্য বলিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু যে যে দৃষ্টি অবলম্বনে শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলা হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করে কে ? সুখপ্রিয় মানব কষ্টের দিকে তাকাইতে চাহে না! আমাদের দেশের পণ্ডিতকুল, যাঁহাদের উপর সাধারণে ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন! সকল জানিয়া শুনিয়াও সাধারণের বিশ্বাস যাহাতে যথার্থ শাস্ত্রদৃষ্টির উপর স্থাপিত হয়, তজ্জন্য তাঁহারা কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না। তাহার উপর গ্রহাচার্য্যগণের ভ্রমসঙ্কুল যুক্তিবিরোধী গণনা এবং কথক মহাশয়দিগের যথার্থ শাস্ত্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত মূর্খের মনোরঞ্জনকারী অপরূপ শাস্ত্রব্যাখ্যা, সাধারণের বিশেষতঃ হিন্দু মহিলাদের বিশ্বাসকে যে কি ভীষণ আবর্ত্তে ফেলিয়াছে, তাহা দেখে কে ? এখন সাধারণের শিক্ষার প্রসার ভিন্ন এই আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইবার আর অন্য উপায় দেখি না।

দেখা গেল, ভগবানের নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস করায় যুক্তিবিরোধী কিছুই নাই। কিন্তু সাধারণে উহা যে ভাবে দৃষ্টি করে, তাহা ঠিক নহে। অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে আর কত বহুকালাভ্যস্ত হৃদয়ের প্রিয় বিশ্বাসনিচয়, আমরা যে ভাবে সত্য বলিয়া দেখি, সে ভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া, অন্য এক ভাবে, অন্য এক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। পাঠক কি জানিবামাত্র সেই সেই নূতন দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সে গুলির জীবনে অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত আছেন ?

শুদ্ধানন্দ।

স্বামী-শিষ্য-সংবাদ।

(ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত)

শিষ্য। স্বামীজি! আপ্‌নি এদেশে লেক্‌চার্ দেন না কেন? ইউরোপ আমেরিকা মাতিয়ে এলেন, এদেশে এসে চুপ্।

স্বামীজি। এদেশে আগে Ground তৈয়ারি কর্‌তে হবে। তবে বীজ ফেল্লে গাছ হবে। পশ্চিমের (Europe America) প্রভৃতির মাটী খুব উর্ব্বরা, বীজ ফেল্‌বার উপযুক্ত। ওদেশ ভোগের শেষসীমায় উঠেছে। ভোগে তৃপ্ত হয়ে এখন ওদের মন তাতেও শান্তি পাচ্ছে না। যেন কিছু চাই এরূপ হয়েছে। তোদের দেশে না আছে ভোগ, না আছে যোগ। ভোগের তৃপ্তি হলে যোগের কথা শুন্‌বে ও বুঝ্‌বে। অন্নাভাবে ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, রোগশোক পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেক্‌চার্ ফেকচার্ দিয়ে কি হবে?

শিষ্য। কেন, আপনিই বলেন এদেশ ধর্ম্মভূমি। এতে লোক যেমন ধর্ম্ম বোঝে, অন্যদেশে সেরূপ নয়। তবে আপনার উদ্দীপক বাগ্মি-তায় কেন না দেশ মেতে উঠ্‌বে—কেননা ফল হবে?

স্বামীজি। ধর্ম্ম কর্ম্ম কি জানিস্? আগে কূর্ম্মঅবতারের পূজা চাই; পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম্ম। একে ঠাণ্ডা না কল্লে, তোর ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা কেউ নিবে না। পেটের চিন্তায় ভারত অস্থির। বিদেশীয় শোষণ, অবাধ বাণিজ্য রপ্তানি, সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত দাসসুলভঈর্ষ্যা তোদের দেশের অস্থি মজ্জা খেয়ে ফেল্‌ছে। যাদের ধর্ম্মকথা শুনাবি, আগে তাদের পেটের চিন্তা দূর কর্ত্তে হবে। নতুবা লেক্‌চার ফেক্‌চারে কোন ফল হবে না।

শিষ্য। সে জন্য আমাদের কি কত্তে হবে?

স্বামীজি। প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন। যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। তাই আমি মঠ করে কতকগুলি বাল সন্ন্যাসীকে ঐরূপ তৈয়িরি করব—যারা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে নিজেদের

শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বল্‌বে—ও তাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের মহান্ সত্যগুলি জলের মত সোজা কথায় বুঝিয়ে দেবে। তোদের দেশের Mass of People (জন সাধারণ) যেন Sleeping Leviathan (এক বিরাট জানোয়ার) ঘুমিয়ে আছে। এই যে দেখ্‌ছিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে দেশের এক কি দুই per cent লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে—তারাও দেশের হিতের জন্য কিছু করে উঠ্‌তে পাচ্চে না। কি করেই বা বেচারি কর্‌বে ? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে, সে সাত ছেলের বাপ্। যা তা করে একটা কেরাণীগিরি, বড় জোর একটা ডেপুটী-গিরি জুটিয়ে নেয়। ঐ হল শিক্ষার পরিণাম! সংসারের ভারে উচ্চকর্ম্ম উচ্চচিন্তা কর্‌বার তাদের সময় নাই। স্বার্থই সিদ্ধ হয় না,—পরার্থে আবার কি কর্‌বে ?

শিষ্য। তবে কি আমাদের উপায় নাই ?

স্বামীজি। অবশ্য আছে। এ সনাতন ধর্ম্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে। কিন্তু নিশ্চয়ই আবার উঠ্‌বে, যে জগৎ দেখে অবাক্ হয়ে যাবে। তরঙ্গ যত নামে তার পর তত জোরে উঠে।

শিষ্য। কি করে উঠ্‌বে ?

স্বামীজি। দেখ্‌ছিস্ না, পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য্য উঠ্‌বার বিলম্ব নাই। তোরা লেগে যা। সংসার সংসার করে কি হবে ? তোদের এখন কার্য্য হচ্ছে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয় গিয়ে দেশের লোক-দের বুঝিয়ে দেওয়া যে আর আলিস্যি করে বসে থাক্‌লে চল্‌ছে না ; তাদের নিজের অবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে বল্‌গে—"ভাই সব উঠ, জাগ, কত দিন আর ঘুমুবে ;" তাদের নিজেদের অবস্থা উন্নতি কত্তে—পরামর্শ দিগে ; আর শাস্ত্রের মহান্ সত্য গুলি সরল করে বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এ দেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মটা একচেটে করে বসে-ছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিক্‌লো না, তখন সেই ধর্ম্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায়, তার ব্যবস্থা কর্‌গে। সকলকে বুঝাগে, ব্রাহ্মণদের ন্যায় তোমাদেরও ধর্ম্মে সমানাধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্। আর সোজা কথায় তাদের

ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থ জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখা পড়াকেও ধিক্—আর তোদের বেদ বেদান্ত পড়াকেও ধিক্।

শিষ্য। আমাদের সে শক্তি কই? আপনার শতাংশের একাংশ শক্তি থাক্‌লে ধন্য হতেম্।

স্বামীজি। দূর মূর্খ। শক্তি ফক্তি আপনি এসে যাবে। তুই কাযে লেগে যা না; দেখ্‌বি, এত শক্তি আসবে যে, সাম্‌লাতে পারবি না। পরার্থে এতটুকু কায কর্‌লে শক্তি জেগে ওঠে; পরের জন্য এতটুকু ভাব্‌লে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি; কিন্তু ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্য খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুসী হই।

শিষ্য। যারা আমার উপর নির্ভর কর্‌ছে, তাদের কি হবে?

স্বামীজি। তুই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হস্ ত ভগবান তাদের একটা উপায় কর্‌বেনই। "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি", গীতায় পড়েছিস্ ত?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজি। আসল কথা হচ্ছে ত্যাগ—ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কায কর্ত্তে পারে না। ত্যাগী সকলকেই সমভাবে দেখে—সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। তোর বেদান্তও ত বলে, সকলকে সমান ভাবে দেখ্‌তে; তবে মাগ্ ছেলেটা বেশী আপনার, এ ভাবটা রাখিস কেন? তোর দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঙ্গাল বেশে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন! তাঁকে কিছু না দিয়ে খালি নিজের ও নিজের মাগ ছেলের নানা প্রকার চর্ব্য চোষ্য দিয়ে উদর পূর্ত্তি করবি? ও ত পশুর কায।

শিষ্য। পরার্থে কার্য্য করিতে ত সময়ে সময়ে বহু অর্থের দরকার হয়। তা কোথা পাব?

স্বামীজি। বলি যতটুকু ক্ষমতা ততটুকু কেন কর্ না? আর পয়সার অভাবে যদি আর কিছু নাই দিতে পারিস—একটু ভাল কথা বা দুটো সৎ উপদেশও ত তাদের শুনাতে পারিস্! না—তাতেও তোর টাকার দরকার?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ তা পারি।

স্বামীজি। হাঁ পারি বল্লে হচ্ছে না। কি পারিস কাজে আমায় দেখা, তবে ত জানব আমার কাছে আসা সার্থক। লেগে যা—কয়দিনের জন্য জীবন? যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ্ রেখে যা। নতুবা গাছ পাথরও হচ্ছে মরছে। সে রূপ জন্মাতে মরতে ইচ্ছা হয়ত তা কর্‌গে। আমায় কাজে দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে শুনাগে—তোদের ভিতর সেই অনন্ত শক্তি আছে; তা জাগাতে যত্ন কর্। নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? ও ত মহাস্বার্থপরতা। ফেলে দে তোর ধ্যান—ফেলে দে তোর মুক্তি ফুক্তি। আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।

শিষ্য অবাক হয়ে শুনিতে লাগিল। স্বামীজি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

স্বামীজি। তোরা আগে জমি তৈয়ারি করগে। আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা কত্তে নরলোকে শরীর ধারণ করবে। তার জন্য ভাবনা কি? এই দেখ্ না অনাথ আশ্রম, দুর্ভিক্ষ ফণ্ড কত কি খুল্‌ছি। দেখ্‌ছিস্ না—তোদের নিবেদিতা, ইংরেজ হয়ে তোদের গু মুত ফেল্‌তে পর্য্যন্ত শিখেছে? আর তোরা দিশিলোক হয়ে, তোদের নিজের দেশের লোকের জন্য তা পার্‌বিনি? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সে দিকে। নয়—মরেই যাবি। তোর মত কত কীট হচ্চে মরচে। তাতে জগতের কি আসচে যাচ্চে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা—মরে ত যাবিই; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর্, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা ভরসা। তোদের কর্ম্মহীন দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা—লেগে যা। দেরি করিস্ নি—মৃত্যু ত দিন দিন নিকটে আস্‌ছে! আর পরে কর্‌বি বলে বসে থাকিস্‌নি—তা হলে কিছুই হবে না।

ক্রমশঃ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মহাক্ষোভকরী ধর্ম্মশক্তি।

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার কলিকাতা টাউনহলে সিষ্টার নিবেদিতা উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতা সাগ্রহে উহা শ্রবণ করেন। নিম্নে উহার সারাংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

সিষ্টার নিবেদিতা 'শিবগুরু' নাম কীর্ত্তনান্তর বলিলেন—

ভারতের পূর্ব্ব গগনে এক মহাযুগের উষা আজ ধীরে ধীরে উদিত—এক মহান্ আদর্শ এই পবিত্র ভূমে আবির্ভূত। যে দিন হইতে ইংরাজি ভাষা ভারতের তীর ভূমি স্পর্শ করিয়াছে, সেই দিন হইতে যেন কত নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন আশা, নূতন চেষ্টা, ভারতবাসীর চিত্ত অধিকার করিয়াছে। সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলে ঐ সকল বিভিন্ন ভাব এবং চেষ্টার ভিতর একটী লক্ষ্য বিদ্যমান দেখা যায়; এই ঘোর সংগ্রাম যে ঐ একমাত্র গুপ্ত ধন লাভের চেষ্টায়, ইহা বুঝা যায়। উহা—সেই একতা এবং জাতীয় ভাবের বিকাশ, যাহাতে সমগ্র ভারত একদিন পরিপূর্ণ হইবে। কিন্তু গত একশত বৎসর ধরিয়া ভারতের অগ্রণী মনিষিগণ যে সকল উপায় অবলম্বনে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা কেবল লক্ষ্যভ্রষ্টই হইয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন, ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে ভারত বুদ্ধিবিকাশবিহীন, নিশ্চেষ্ট, জাতীয়-জীবনশূন্য ছিল, তাঁহাদের ভারতের ইতিহাস পাঠ ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, ইউরোপীয় চিন্তাতরঙ্গ ভারতের চিত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া, পূর্ব্বপ্রবাহিত ভাবস্রোতে নূতন আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র।

ইংরাজি শিক্ষার প্রথম ফল—একদল সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব, যাঁহারা কেবল সামাজিক আচারের পরিবর্ত্তনেই ভারতের ভাবী কল্যাণ দেখিতে-ছিলেন। ইঁহাদিগের পশ্চাৎ, রাজনৈতিক দলের দৃঢ় অধ্যবসায়ে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ। কিন্তু আজ দেখা যাইতেছে, ইঁহাদিগের দ্বারা অনেক কার্য্য সম্পাদিত হইলেও ভারত যে লক্ষ্যের অভিমুখে এতকাল ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রতি কি সমাজসংস্কারক কি রাজনীতিসমা-

লোচক, কাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তাহার পর ধর্ম্মসম্বন্ধে, অনেক পুনর্বোধন দেখা যাইতেছে। কিন্তু যেখানে যেখানে ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস, প্রকৃত ধর্ম্ম কি সেইখানে আছে? অবশ্য ধর্ম্মই ভারতের একমাত্র সমস্যা। চিরকাল ভারত ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সকল সমস্যা পূরণ করিয়াছে ও করিবে। কারণ, চরিত্রগঠন, কর্ম্মশীলতা ও বহুজনহিতায় কার্য্যের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মেরই অন্তর্ভূত। আপনারা সকলে যে মহান্ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ধরিয়া এতকাল অগ্রসর হইতেছেন, তাহা প্রকৃত কি, তাহা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন? উহা সেই মহান্ আদর্শ, যাহা "জাতিত্ব বোধ" এই বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। এই সত্য লাভ করিতে নানা বিষয় পরীক্ষিত হইয়াছে; অনেক বস্তু অসার ভাবিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু দেখিতেছেন না, যাহার অন্বেষণে গত শত বৎসরে এত শক্তি ব্যয় হইল, তাহার লাভ, কখনই ঐ সকল অনুষ্ঠিত কার্য্যের দ্বারা হইবার নহে?

বার বার নিষ্ফল হইয়া এখন উপলব্ধি হইতেছে, কোন মহাভাব ভারতকে পুনরুত্থিত করিবে। ভারতবাসীর মনে এতদিনে উহা বিকশিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ইংরাজশাসনের ফলস্বরূপ ভারতে রেলপথ প্রভৃতি যাতায়াতের উপায়, ডাক বিভাগ, ও বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতি যেমনি প্রবর্ত্তিত হইল, অমনি সমগ্র ভারতবাসী, তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যে ভাব এবং অবস্থা প্রবাহিত ছিল, সেই ভাব এবং অবস্থার সহসা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আবার এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এই একতার ভাব ভারতে পূর্ব্ব হইতে জীবিত না থাকিলে সহস্র ভাবে ভারত পূর্ব্ব হইতে এক না থাকিলে, কেবল পঞ্চাশ বৎসরে এরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব কথা। প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতবাসীর একতা এতদিন কোথায় লুক্কায়িত ছিল?

উত্তরে বলা যাইতে পারে, এই একতার ভাব, 'স্বর্গাদপি গরীয়সী,' জন্মভূমির স্নেহে আবদ্ধ, প্রজাকুলের মনোমধ্যেই অজ্ঞাতসারে অবস্থান করিতেছিল। স্বদেশ-বৎসল মানবমনই যে চিরকাল অসীম শক্তির আধার, একথা মহাসত্য। কেহ কেহ বলেন—একতা যে ভারতবাসীর নিতান্ত আবশ্যক, একথা সত্য হইলেও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রভাবেই যে ভারত নিতান্ত ছিন্ন ভিন্ন। জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি প্রকৃত কথা? তাঁহাদের কি বিশ্বাস, ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে বিভিন্ন রাখিয়াছে, তাঁহাদিগকে পরস্পর বিরোধী করিয়াছে? প্রকৃত ধর্ম্ম কথন

মতবিশেষে আবদ্ধ থাকে না। যতক্ষণ লোকে মতবিশেষের দাসত্ব করে, ততক্ষণই তাহারা অসত্য হইলেও উহাকে সত্য ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু যে ধর্ম্ম মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক্ করে, মানুষকে মানুষের শত্রু করে, উহা কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না।

মুসলমান ধর্ম্মবক্তা হজরত মহম্মদের নিকট ভারতের একটি বিষয় শিক্ষা করা প্রয়োজন। সেই আরবোষবের উষ্ট্রপরিচালক প্রচারিত ধর্ম্ম মধ্যে, জগতে অনুপম যে এক মহাজাতিপ্রস্তুতকারী শক্তি নিহিত রহিয়াছে—তাহাই। এক্ষণে জাতিত্ব বোধ রূপ যে আদর্শের জয়লাভে, সমস্ত ভারতবাসী জয়যুক্ত হইবে, কি করিলে উহা ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, ইহাই জিজ্ঞাস্য। ভারত নিজের হস্তেই নিজের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট ধারণ করিয়া রহিয়াছে! ভারতের মঙ্গল ভারতেরি হস্তে, একথা এক্ষণে যেরূপ নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বে কখন সেরূপ বলিবার সম্ভাবনা ছিল না। বর্ত্তমান বিদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধীয় আন্দোলনে ভারতের জাতিত্বভাব আজ সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশিত। ভারতবাসী কি তাঁহাদের নিজের বিদ্যা শিক্ষার ভার নিজের হস্তে লইতে সক্ষম? মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কি ত্যাগ স্বীকার ও আপনাকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত? জাতীয় ভাবের নূতন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়া, ভারতকে কি একরূপ ভাবে গঠন করিতে প্রস্তুত; যাহা দেখিবার জন্য জগৎ অপেক্ষা করিতেছে? ভারত কখন উপযুক্ত সন্তানের অভাব বোধ করেন নাই। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহাদিগের ভিতর নিজের শক্তি প্রকাশ করিবার উত্তেজক কারণের অভাব ছিল। এতদিনে সেই অবসর উপস্থিত। ভারতসন্তানগণের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা এখন যেন আর মাসিক বিশ পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরি দ্বারা শোচনীয় জীবন ধারণ রূপ কার্য্যে পর্য্যবসিত না হয়। জ্ঞান লাভই বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য—উহা ভিন্ন তাঁহাদের ভিতর জ্ঞান লাভের যেন অন্য কোন স্বার্থপর উদ্দেশ্য না থাকে। জ্ঞানই জীবন্ত শক্তি। সকলে, জ্ঞানের জন্য যেন জ্ঞান লাভ করেন: এই শিক্ষার ফলে ভারত পরে কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা বলা অসম্ভব। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, প্রবুদ্ধ পুরুষদিগের সাহায্যে, ভারতের স্ত্রীলোকগণের ভিতরই প্রথম এই বোধ তীব্রভাবে সঞ্চারিত হইবে এবং পরে তাঁহাদের দ্বারাই দেশময় জাতিত্ব বোধের সম্যক্ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইবে।

স্বাধ্যায়ের এই ফল উপলব্ধি করাইবার জন্য দেশময় এই যে উদ্বোধন ধ্বনি, উহাকে নিজ নিজ স্বার্থপ্রসূত প্ররোচনা বলিয়া জ্ঞান করিবে না। অথবা ভারতের অভাব অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া সেই অভাব মোচনের জন্য সমুত্থিত, তাহাও নহে। ভারত মধ্য হইতে যে এই উদ্বোধন গীতি, উহা ভারতের নিকট জগতের প্রার্থনা। জগৎ চাহিতেছে সেই জ্ঞান, সেই মহানুভূতি, সেই ভাবরাশি সমন্বিত মহা প্রতিভা, সেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপলব্ধি, যাহা ভারতবাসীর অবিনশ্বর পৈতৃক ধন। এশিয়া যেমন ধর্ম্মে ও নীতি সম্বন্ধে সমগ্র পৃথিবীর মাতৃস্বরূপা; ভারত, আবার সেইরূপ মনুষ্যজীবনের উচ্চ আদর্শ শিখান সম্বন্ধে এশিয়ার মাতৃস্বরূপা। যদি ভারত এখন আপনার সেই পদের সম্মান না রাখিতে পারে, তাহা হইলে জগতকে গভীর শ্রুতি-জ্ঞান শুনাইতে আর কেহই থাকিবে না। ঐ জ্ঞান শুনিবার এবং জীবনে পরিণত দেখিবার জন্য জগৎ প্রতীক্ষা করিতেছে। হে ভারতসন্তান, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দাও এবং জ্ঞানলাভে অগ্রসর হও। স্বার্থ-সাধনের দিকে লক্ষ্য করিও না। কিন্তু উচ্চ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর। সত্যলাভের জন্য জ্ঞানান্বেষণ কর, প্রেমের জন্য প্রেমের অনুসরণ কর। এইরূপে শক্তিলাভ করিয়া বীর কার্য্য সাধন কর।

তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছেন যে, যখন ইহ সংসারের সকলই মিথ্যা, জগৎই মায়া, তখন কার্য্য করা নিষ্প্রয়োজন। কেহ কেহ আবার হয়ত বিশ্বাস করেন যে কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করাই একমাত্র যোগ। আমার মতে মায়া, যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য সকলের এরূপ মায়াত্মক অপব্যবহার করা অপেক্ষা তাঁহাদের পক্ষে ও সকল কথা একেবারেই না শোনাই ভাল। যিনি সুখ দুঃখ হর্ষ শোকাদি দ্বন্দ্ব সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া শাস্ত্রকথিত সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন, যিনি মহা তপস্যা, ত্যাগ ও আত্মজয়ের মধ্য দিয়া আমিত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাঁহারই কেবল মায়া সম্বন্ধে ভাবিবার অধিকার আছে। যত দিন না এশিক্ষা লাভ হয় যে, লোকহিতকর, স্বজাতির কল্যাণকর যত প্রকার কর্ম্ম আছে, সে সকলের অনুষ্ঠানেই যোগ সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে, ততদিন যোগ সম্বন্ধে কোন কথাই তাঁহারা যেন না উচ্চারণ করেন।

আজ হইতে সকলে অবধারণ করুন যে, এই জাতিধর্ম্মই অন্তর্বিহিত শক্তি প্রভাবে জাতীয় জীবনে মহাক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া উহাকে উন্নতির পথে,

সত্যের দিকে মহাবেগে লইয়া যাইতেছে। ভারতের স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই উহা প্রধানতঃ উদ্‌যাপিত হইবে। অতএব প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্বন্ধে এই মহা দায়িত্ব রহিয়াছে—তাঁহারা যেন স্বকীয় পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে এরূপ শিক্ষা দান করেন, যাহা হইতে ভারতে এই জাতিত্ব মহাশক্তির শীঘ্র শীঘ্র পুনরভ্যুদয় হয়! এই মহাশক্তির পুনরুদয় যে অতি সন্নিকট, তাহাও আমরা আজ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। "ওয়া গুরুকি ফতে" অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের জয় উচ্চারণ পূর্ব্বক বক্তৃতার সমাপ্ত হইয়াছিল।

সংবাদ।

স্বামী অখণ্ডানন্দের যত্ন ও পরিশ্রমে, কিছুকাল হইল একটি নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয়, 'ভাবদা রামকৃষ্ণ অনাথাশ্রমে'র সঙ্গে খোলা হয়—একথা আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। ঐ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, শুধু যে আশ্রমের বালকদিগকেই শিক্ষা দেওয়া তাহা নহে; কিন্তু গ্রামস্থ সকল গরিব বালকেই যাহাতে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়। ঐ বিদ্যালয় হইতে এই বৎসরে প্রথম তিনটি ছাত্রকে নিম্ন প্রাথমিক (Lower Primary) পরীক্ষা দিতে পাঠান হয়। তিনটি বালকই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে আবার আশ্রমভুক্ত অনাথ বালকটি পরীক্ষায় সমাগত সমগ্র জেলার বালকদের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ বালকটি মাসিক ১, টাকা হারের দুই বৎসরের জন্য একটি বৃত্তিও পাইয়াছে।

আশ্রমের অপর কার্য্যাদি পূর্ব্বের ন্যায় সুচারুরূপে চলিতেছে। গত মাঘ মাসে ৺সরস্বতী পূজা এবং ফাল্‌গুনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পূজা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ গরিব কৃষাণদের অশেষ উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল।

জেলা বরিশালের অন্তর্গত নরোত্তমপুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হয়। তদুপলক্ষে পূজা, সঙ্কীর্ত্তন ও সহস্রাধিক লোককে প্রসাদ বিতরিত হয়।

বর্দ্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির সেক্রেটারি বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ প্রণীত ১ম ও ২য় ভাগ 'বিজয়গীতিকা' সমালোচনার্থ পাঠাইয়াছেন। আমরা পুস্তিকা দুইখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া মহারাজের তরুণ বয়সেই অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে সঙ্গীতটী উদ্ধৃত হইল।

কামোদ—ধামার।

পরম রতন, পেয়েছে যে জন, কখন যতন, কাচে কি করে।
সুধার সুরসে, যে রসনা রসে, সদা সে বিরসে সহিতে নারে।
(সুধার সুতার, রসনায় যার, বিরসে কি তার, মানস সরে ?) ॥
মাতৃ মহাভাব ধ্যানে, যে ধন্য করেছে প্রাণে,
পশুতা কি তার মনে, পারে কভু পশিবারে।
তাই ত সাধকবর, বিভুপ্রেমে নিরন্তর,
ডুবায়ে রেখে অন্তর, তরেছ ভবদুস্তরে।
বসি জননীর কোলে, মহানন্দে হেঁসে খেলে,
কুশলে কাল যাপিলে, ভাবি তাঁরে ভক্তিভরে।
ক্ষেপা মার ক্ষেপা ছেলে, মাযে পেয়ে সব ভুলে,
বাসনায় পদে দলে, শিখালে জ্ঞান সবারে।
বিষম বিষয় বিষে, লোকে যাহা ভালবাসে,
ত্যজিলে জ্ঞানের বশে, থাকিয়া ধরা মাঝারে।
মিশি ভববাসী সনে, নিষ্পাপ হলে কেমনে,
সরল খলসদনে, দেবতা মানবাকারে।
তোমার চরণ স্মরি, দুষ্কৃতিরে পরিহরি,
বিজয় যেন তোমারি, দর্শিত পথে বিচরে॥

উত্তরাখণ্ডে গঙ্গোত্রি ও যমুনৌত্রি।

(শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মল্লিক।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

আমরা ক্রমাগত চড়াই করিতেছি, শরীর দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে, শ্বাস খুব জোরে বহিতেছে; অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হইলে বসিয়া বিশ্রাম লইতেছি, কিন্তু আমাদের মুটে আমাদিগকে বসিতে নিষেধ করিতে লাগিল ও বলিল, হাতের লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জিরিয়ে নাও। তাহার কথা সত্য, কারণ, চড়াই করিতে করিতে বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা করে না এবং শারীরবিজ্ঞানমতেও ইহা নিষিদ্ধ। আমরাও তাহার কথামত লাঠিতে ভর দিয়া মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া লইতে লাগিলাম। ৩৷৪ মাইল চড়াই করিয়া আমরা একটী কাষ্ঠের ফলকে রাস্তার নির্দ্দেশ দেখিতে পাইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট দিকে চলিতে লাগিলাম। আরও ২৷৩ মাইল যাইয়া আমরা পর্ব্বতপার্শ্বে অনেক নিম্নে একটী গ্রাম দেখিয়া সেইটী দাঙ্গর গ্রাম বলিয়া নিশ্চিত করিলাম। কিন্তু পাহাড়ি মুটে বলিল যে, ওটী দাঙ্গর গাঁ নয়, এখন আরও পাহাড় চড়াই করিতে হইবে। আমার সঙ্গীরা সে কথায় বিশ্বাস করিল না, সকলেই সেই গাঁয়ে যাইবার ইচ্ছা করিল এবং আমাকেও জেদ করিতে লাগিল। আজ এই পথে একটীও লোক দেখিতে পাই নাই যে, তাহার নিকট পথ নিশ্চিত করিয়া লইব, শেষে আমি সঙ্গীদিগকে বলিলাম যে, পাহাড়ের পথে পাহাড়ির অনুমানের উপর নির্ভরই শ্রেয়স্কর; এবং সকলকে বুঝাইয়া মুটিয়ার নির্দ্দিষ্ট পথে চড়াই করিতে লাগিলাম।

পাহাড়ে এতদিন জল ও কাষ্ঠ এই দুটির সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু এই পাহাড়ে উপস্থিত প্রথমটীর, পরে দ্বিতীয়টীর কষ্ট বেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। পুনরায় চড়াই করিতে করিতে পথে দুই এক স্থানে বরফ পাইলাম এবং অত্যন্ত পিপাসা লাগায় সেই বরফ খাইয়া পিপাঁসা শান্তি করিলাম। কিন্তু এরূপে বরফ খাওয়া উচিত নয়, খাইলে অসুখ হয়। যাহা হউক, শেষে অনেক কষ্টে সর্ব্ব সমেত ৭ মাইল চড়াই করিয়া একটী প্রস্রবণের (Surface stream) নিকট আসিয়া পৌছিলাম। এই স্থানে বৃক্ষাদি খুব কম। আমরা অনেক কষ্টে কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া সকলে

তাপিতে লাগিলাম, কারণ, এখানে অতিশয় ঠাণ্ডা। পরে স্নানাদি করিয়া পূর্ব্ব দিনের প্রস্তুত সেই রুটী এবং ছাতুর সহিত মধু মাখিয়া খাইয়া লইলাম। ব্রহ্মচারী স্নানান্তে পূজাদি করিয়া লইলেন। তাঁহাকে ছাতু খাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন, আমি দাল ভিন্ন অপর অন্ন খাওয়া ত্যাগ করিয়াছি, অতএব সন্ধ্যার সময় দাল রাঁধিয়া খাইব।

আমরা সকলে এই স্থানে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া পার্শ্বের তৃণাদিশূন্য (Barren) পর্ব্বত বামে রাখিয়া ২।৩ বশি পথ ওৎরাই করিলাম; কিন্তু মুটে বলিল, আমরা রাস্তা ভুলিতেছি। এটা জঙ্গলের পথ, এদিকে যাওয়া হইবে না, বাম পার্শ্বের ঐ তৃণাদিশূন্য পাহাড় চড়াই করিলে তবে ঠিক পথ পাওয়া যাইবে, অতএব ঐ পথে চল। সঙ্গীরা কেহই আর উক্ত পাহাড়ে চড়াই করিতে চাহিল না, সকলেই বলিল, আমরা নিশ্চয়ই পথ ভুলিয়াছি। যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে, আর অনর্থক কষ্ট করিব না। এরূপ করিয়া বিপদের সময় বৃথা অতিবাহিত করা উচিত নয়, এবং দিনমানের মধ্যে যাহাতে দাঙ্গর গাঁয়ে পৌঁছিতে পারি, সেই চেষ্টায় শেষে আমি মুটের সহিত ঐ পূর্ব্বোক্ত বাম পার্শ্বের তৃণাদিশূন্য পর্ব্বতে চড়াই করিতে লাগিলাম। সঙ্গীরা ঐ স্থানে বসিয়া রহিল, আমরা খানিকটা চড়াই করিলে, তবে সঙ্গীরা উঠিয়া আমাদের সহিত যোগ দিল। আমরা দেড় মাইল চড়াই করিয়া পাহাড়ের শিখরে যাইয়া পৌঁছিলাম।

এই স্থান এত উচ্চ যে, চতুষ্পার্শ্বস্থ আর সকল পাহাড় খুব নিচু; কেবল উত্তর দিকে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশিখর গুলি আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দেখা যাইতে লাগিল। যাহা হউক, আমরা এই পাহাড়ের উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে বরফ পার হইয়া অর্দ্ধ মাইল গিয়া পাহাড়ের শেষ সীমায় পৌঁছিলাম। এখান হইতে ওৎরাই করিতে হইবে; ওৎরায়ে প্রথম খানিকটা বরফ আছে। আমাদের মুটে একটা স্থানে কম বরফ থাকায় পছন্দ করিয়া প্রথম ২।৩ বশি যে স্থান টুকু হইতে বরফ গলিয়া গিয়াছে, সেই স্থান টুকু ছোট ছোট গাছের গোড়া ধরিয়া বসিয়া বসিয়া নামিয়া গেল। কারণ, এই স্থানটি অত্যন্ত ঢালু; দাঁড়াইয়া নামিলে পদস্খলিত হইবার সম্ভাবনা। তাহার পরে আমরাও একে একে ঐ পথ টুকু সেইরূপে নামিয়া সকলে একত্রিত হইলাম। পরে এই স্থান হইতে দেখিলাম যে, টেরচা ভাবে ২০।২৫ হাত নামিয়া যাইলে একটী

উচ্চ বরফশূন্য ভূমিখণ্ডে পৌঁছান যায় এবং সোজা ঢালু দিয়া নামিলে ৫০।৬০ হাত নীচে তুষারময় সমতল ক্ষেত্র পাওয়া যায়। আমাদের মুটে সর্ব্ব প্রথমে পা টিপিয়া টিপিয়া বরফের উপর দিয়া টেংচা ভাবে নামিয়া সেই উচ্চ বরফশূন্য ভূমিতে গেল। তাহার পশ্চাৎ বিনোদ যাইয়া সেখানে পৌঁছিল। বিনোদের পরে আমি নিজ হাতের লাঠিতে ভর দিয়া টেব্‌চা ভাবে নামিতে লাগিলাম, মধ্য পথে আমার একবার পা হড়কাইয়া গেল, কিন্তু সাম্‌লাইয়া লইলাম, এবং অতি কষ্টে সেই স্থানে পৌঁছিলাম। আমার পরে ব্রহ্মচারী নামিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার পা পিছলাইয়া যাওয়ায় তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং সাম্‌লাইতে না পারিয়া একেবারে গড় গড় করিয়া ৫০ হাত নীচে সেই বরফময় সমতল স্থানে গিয়া পড়িলেন. মুটে তৎক্ষণাৎ যাইয়া সে স্থান হইতে তাঁহাকে হাত ধরিয়া আমাদের নিকট লইয়া আসিল; তাঁহার কোনরূপ আঘাত লাগে নাই। সর্ব্ব শেষে উড়িয়া ব্রাহ্মণ নামিতে লাগিল, কিন্তু তাহারও পদস্খলিত হওয়ায়, সে একেবারে ধরাশায়ী হইল; এবং গড়াইতে গড়াইতে সেই নীচের তুষারময় সমতল স্থানে গিয়া পড়িল। তথায় সে শীঘ্র উঠিয়া না বসায় আমাদের মনে তাহার প্রাণনাশের আশঙ্কা হইল। কিন্তু মুটে যাইয়া তাহাকে তোলায় সে মুটের হাত ধরিয়া আমাদের নিকট আসিল, ঈশ্বর কৃপায় তাহারও বিশেষ কোন চোট্ লাগে নাই। আমরা এই স্থানে অতি কষ্টে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগুনে শরীর সেঁকিয়া পুনরায় ওৎরাই করিতে লাগিলাম; নিকটে আরও দুই স্থানে বরফ পার হইতে হইল, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় কোন বিপদ্ হয় নাই।

যাহা হউক, এইরূপে ৩।৪ মাইল ওৎরায়ের পর পাহাড়ের সর্ব্ব নিম্নে দাঙ্গর গাঁ একটী ক্ষুদ্র ছবির ন্যায় ও পার্শ্বস্থ যমুনা নদী একটী শুভ্র রেখার ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। আরও খানিক নামিলে পর নদীর অবিশ্রান্ত কল্লোলধ্বনি সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় শুনা যাইতে লাগিল। পাহাড়ে নদীর শব্দ অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, আমরা সর্ব্ব সমেত ৯ মাইল ওৎরাই করিয়া সন্ধ্যার সময় দাঙ্গর গাঁয়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমি এত উচ্চ ও দুরারোহ পর্ব্বত হিমালয়ের আর কোন পথে, কি কাশ্মিরে অমরনাথের পথে, কি গাড়োয়াল ও কুমাউনের রাস্তায়, কি হিমালয়ের অপরাপর অংশের রাস্তায়, কোথাও দেখি নাই। বদ্রি-নারায়ণের পথে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ চড়াই তুঙ্গনাথ, কিন্তু তাহাতে উঠিবার

বাঁধা রাস্তা আছে, উহাও ৭ মাইল মাত্র। দাঙ্গর গাঁয়ে একটী পাহাড়ির বাটীতে বাসা করিলাম। এখানে ব্রহ্মচারী দাল রন্ধন করিয়া খাইল। এখান হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন সন্ধ্যার সময় খরশালা গাঁয়ে পৌছিলাম। এই গ্রামটী যমুনার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। ইহারই পরপারে পাণ্ডা গাঁয়ে ছত্র আছে। যমুনোত্রির পাণ্ডাদের সেখানে বাস বলিয়া গাঁয়ের নাম পাণ্ডাগাঁ; গ্রামের একটু তফাতে পোল আছে, তদ্দ্বারা উভয় গ্রামে যাওয়া আসা যায়। এখান হইতে যমুনোত্রি ৫।৬ মাইল মাত্র। এখান হইতে একজন পাণ্ডা আমাদের সঙ্গ লইল। সে আমাদিগকে বলিল যে, বস্তুয়ের বাসনকোসন এবং অপরাপর দ্রব্য কতক এই স্থানে রাখিয়া দিয়া অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্গে লউন, কারণ, যমুনোত্রির নিকট ওৎরায়ের পথ না থাকায় ভয়ানক বিপদ্‌জনক, আর সেখানে বস্তুয়ের বাসন আমি যমুনা মাতার মন্দির হইতে দিব। আমরা পরদিন প্রাতে খরশালা গাঁয়ে যাহার বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহার নিকট অধিকাংশ দ্রব্য রাখিয়া দিয়া কেবল মাত্র আহারীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদি লইয়া সেই পাণ্ডার সহিত যাত্রা করিলাম।

এই গ্রাম হইতে যমুনোত্রি পর্য্যন্ত একটী রাস্তা অনেক কাল হইল কোন রাজা তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার অনেক স্থান এখন ভাঙ্গিয়া বা ধসিয়া যাওয়ায় পাণ্ডারা সেই সকল স্থানে গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া দিয়া যাইবার উপায় করিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার উপর দিয়া যাইবার সময় নীচের দারুণ খড় দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। পথে যাইতে যাইতে যমুনোত্রি হইতে ফেরৎ ৩।৪ জন সাধুর সহিত দেখা হইল; এবং শেষে আমরা যমুনোত্রির নিকট আসিয়া দেখি যে, যমুনা পর্য্যন্ত ২০।২৫ হাত খাড়া ওৎরাই; এই স্থানের জন্য পাণ্ডা বোঝা লইতে নিষেধ করিয়াছিল। এই ওৎরাইটী আমরা অতি কষ্টে বৃক্ষাদির শিকড় ধরিয়া নামিয়া যমুনার দক্ষিণ পারে আসিলাম। এখানে যমুনার গভীরতা এক হাত মাত্র ও উহা ৮।১০ হাত মাত্র প্রশস্ত। জলে বড় বড় পাথর পড়িয়া আছে, তাহাদের উপর দিয়া আমরা পরপারে অবস্থিত একটী খুব উচ্চ চিরতুষারাচ্ছন্ন (Ever-lasting snow) পাহাড়ের নীচে পৌছিলাম। এই স্থানকে যমুনোত্রি বলে।

যমুনোত্রির দৃশ্য অতি রমণীয়, সম্মুখে চিরতুষারাচ্ছন্ন শুভ্র বর্ণের পর্ব্বত আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে ও পশ্চাতে বৃক্ষাদিপূর্ণ শ্যামল বর্ণের পর্ব্বত বিরাজিত (যাহা এই মাত্র আমরা পার হইয়া আসিয়াছি)।

উভয় পর্ব্বত পাশাপাশি থাকায় ঠিক যেন ভগবানের হরিহর মূর্ত্তির ন্যায় দেখাইতেছে। সম্মুখের চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতটীকে এখানকার লোকে সুমেরু বলে; আমাদের সমভিব্যাহারী পাণ্ডা দুই জন সাহেবের সহিত এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়াছিল। তাহার মুখে শুনিলাম, নীচে হইতে পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উঠিতে প্রায় ৭ মাইল পথ চড়াই করিতে হয়। তাহার মধ্যে প্রথম ২।৩ মাইল বরফ নাই, তাহার পরের সমুদায় পথ চিরদিন বরফে আচ্ছন্ন থাকে। উপরে ভয়ানক শীত, যেন সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে বোধ হয়, সাহেবেরা উপর হইতে দূরবীণ সাহায্যে নিবাটের ছাউনি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিল। এই পাহাড়টী একদিনেই উঠিয়া ফের নামিয়া আসিতে হয়। আমরা নীচে হইতে এই সুমেরুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, ইহার তলদেশ হইতে ঊর্দ্ধদিকে খানিকটা পর্য্যন্ত বরফ নাই, তাহার পর সমুদায় বরফে আচ্ছন্ন। সূর্য্যকিরণে বরফ গলিয়া ছোট ছোট ধারায় নীচে নামিয়া আসিতেছে এবং পরে ঐ ধারা সমুদায় একত্র হইয়া যমুনা নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে শাস্ত্রে যমুনাকে সূর্য্যতনয়া বলিয়া শুনিয়াছিলাম, আজ এখানে আসিয়া সূর্য্যতেজে বরফ গলিয়া যমুনার জন্ম বা উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া যমুনাকে যথার্থই সূর্য্যতনয়া বলিয়া জানিলাম।

যমুনোত্রিতে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আছে। কিন্তু পাণ্ডা বা পূজারি কেহই থাকে না, প্রত্যহ পূজাও হয় না, তবে সময় সময় যাত্রীদের সঙ্গে কোন পাণ্ডা আসিলে সেই দিন সেই পাণ্ডাই পূজা করে। আমাদের সঙ্গের পাণ্ডা সে দিন পূজা করিল। মন্দিরাভ্যন্তরে সাদা পাথরের যমুনা মাতার মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরের পার্শ্বেই তপ্ত কুণ্ড আছে, জল অত্যন্ত গরম। ইহার জলে কাপড়ে চাউল বাঁধিয়া রাখিলে ভাত তৈয়ারি হয় এবং রুটী করিয়া ফেলিয়া দিলে আপনি তৈয়ারি হইয়া ভাসিয়া উঠে। যাত্রিগণের এখানে এইরূপে আহারীয় তৈয়ারি করিয়া খাইবার নিয়ম আছে। আমরাও সেকারণ কিছু কিছু দ্রব্য এই রূপে তৈয়ারি করিয়াছিলাম, বাকি দ্রব্য অগ্নিতে তৈয়ারি করি।

এখানে আমরা পাণ্ডার সহিত বসুধারা, ত্রিবেণী, গৌরীধারা, সহস্রধারা, সূর্য্যকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, গোরক ঢিপি, সূর্য্যমুখী, মুখারবিন্দ, চন্দ্রমুখী প্রভৃতি স্থানে আচমন, স্নান বা দর্শন করিলাম। এখানে কাষ্ঠ না

পাওয়ায় আমাদের মুটে অনেক দূর হইতে কাষ্ঠ যোগাড় করিয়া আনিলে, আমরা মন্দিরের পার্শ্বে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত ধরমশালায় রন্ধন করিতে লাগিলাম। পাণ্ডাকে সিদা দিলাম, সেও রসুই করিতে লাগিল। রসুয়ের বাসন পাণ্ডা মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। একজন সাধু এখানে পূর্ব্ব দিনেই আসিয়াছিলেন, তিনি নিকটে একটী গুফা দেখাইয়া দিয়া এবং গুফা বেশ গরম বলিয়া সেই থানে রাত্রে থাকিতে পরামর্শ দিয়া পাণ্ডাগাঁয়ে চলিয়া গেলেন। আমরা আহারাদি করিলে পর পাণ্ডা আমাদের নিকট হইতে দক্ষিণা লইয়া এবং রসুয়ের বাসনাদি মন্দিরে রাখিয়া দ্বারে শিকল লাগাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া খরশালা গাঁয়ে ফিরিয়া গেল। আমরা সেই রাত্রে সেখানে থাকিতে অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু সে শুনিল না।

আমরা আহারাদির পর সেই গুফায় গিয়া আশ্রয় লইলাম। গুফাটী উচ্চে ২।৩ হাত, ভিতরে ৪।৫ জন লোক থাকিবার স্থান আছে, বেশ গরম; মেজে হইতে তাপ উঠিতেছে,— বোধ হয় নীচে কোন উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। গুফার সম্মুখে ৪।৫ টী উষ্ণ প্রস্রবণের গরম জল পিচকারির ন্যায় ভূমি হইতে ১০।১৫ হাত উচ্চে উঠিতেছে। পাণ্ডারা বলে যে, ইহার নীচে মহাত্মারা তপস্যা করিতেছেন। এখানে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আরও ৩।৪ জন সাধু আসিয়া ধরমশালায় আশ্রয় লইল। আমরা রাত্রে গুফায় থাকিয়া পরদিন প্রাতে মন্দিরে রসুয়ের বাসনাদি রাখিয়া, দরজায় শিকল লাগাইয়া দিয়া এই স্থান হইতে পূর্ব্বাগত পথে যাত্রা করিলাম।

পথে খরশালা গ্রামে আমরা সেই পাহাড়ির নিকট হইতে আমাদের গচ্ছিত দ্রব্যাদি লইয়া উত্তরকাশীর দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম। রাস্তায় প্রথমে সেই উপরিকোট গাঁয়ে মিলিত সাধুদের সহিত দেখা হইল। তাহারা উপরিকোট হইতে দাঙ্গর গাঁয়ে আসিতে সেই উচ্চ পাহাড়ে বড়ই কষ্ট পাইয়াছে এবং তাহাদের ২।৩ দিন সময় লাগিয়াছে। পরে দাঙ্গর গাঁয়ের নিকট সেই মসৌরীর যাত্রীদের সহিত দেখা হইল, তাহারাও ঐ উচ্চ পাহাড়ে বড়ই কষ্ট পাইয়াছে। আমাদের আটা ফুরাইয়া যাওয়ায় দাঙ্গর গাঁয়ে একজন পাহাড়ীর বাটী হইতে এক টাকায় /৪ সের আটা খরিদ করিয়া লইলাম। দাঙ্গর গাঁ হইতে উপরি কোট আসিতে সেই উচ্চ পাহাড়ে সে দিন কোন বিপদ্ হয় নাই, তবে পাহাড়ের উপর অত্যন্ত

কুজ্ঝটিকা (Fog) হওয়ায় খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। যমুনোত্রি ত্যাগ করিয়া চতুর্থ দিনে উত্তরকাশী আসিয়া পৌঁছিলাম। যমুনোত্রির পথে অনেক ভূর্জ্জ পত্রের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথ অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদ্‌জনক বলিয়া সাধুরা বলে, 'যম্নোত্রি নয় যেন যমপুরী।'

আমরা উত্তরকাশীতে একদিন বিশ্রামের জন্য রহিলাম এবং এখানকার দোকান হইতে একটী টিনের কুপি গঙ্গোত্রির জল লইবার জন্য দ্বিগুণ মূল্যে খরিদ করিলাম, কারণ, আমরা পূর্ব্বে টেরি হইতে উহা খরিদ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমরা পর দিবস প্রাতে গঙ্গোত্রি যাত্রা করিলাম। পথে প্রথম রাত্রে বাটারি নামক স্থানে রহিলাম, এখানে ধরমশালা ও একটী দোকান আছে।

দ্বিতীয় দিবস পথে একটী দ্বিতল ভাল বাঙ্গলা দেখিতে পাইয়া তথাকার লোকদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, এই বাঙ্গলাটী ঠিকাদার সাহেবের; ইনি গভর্ণমেণ্টের বনবিভাগ হইতে এই অঞ্চলের অধিকাংশ চিড় বা দেবদারু গাছ খরিদ করেন এবং সেই সকল গাছ সেই স্থানেই চেরাই করিয়া রেলওয়ে স্লিপার বানাইয়া ও প্রত্যেক স্লিপারের দুইমুখে লোহার মোহর গরম করিয়া ছাপ মারিয়া দিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দেন। হরিদ্বারের নিকট উক্ত সাহেবের এক শাখা কুটী আছে, তথায় ঐ সকল কাষ্ঠ জল হইতে উঠাইয়া লইয়া রেলযোগে চালান দেওয়া হয়। পথে মধ্যে মধ্যে চৌকিদার বা Ranger আছে, প্রত্যেকের ১৫।২০ মাইল করিয়া হল্কো (Beat)। তাহারা নদীপ্রবাহিত ঐ সকল কাষ্ঠের তদারক করে। এই চিড় বা দেবদারু গাছ হইতে টারপিন তৈল ও রজন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠ বেশ মশালের ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জলে। গাড়োয়াল জেলার লোকেরা এইরূপ প্রদীপ্ত কাষ্ঠ হাতে লইয়া রাত্রে পরস্পরের বাটীতে যাতায়াত করে।

আমরা এই বাঙ্গলা ছাড়াইয়া ১ মাইল যাইয়া দেখি, কতকগুলি তিব্বতবাসী তাঁবু খাটাইয়া রহিয়াছে, সঙ্গে ভুটিয়া অনুচর ও তিন চারি হাজার মালবাহী ছাগল ও ভেড়া। ইহারা সকলে তিব্বতীয় মহাজন; টেরি ও মসৌরি হইতে মাল খরিদ করিয়া তিব্বতে লইয়া যাইতেছে; এই স্থান হইতে বা হাতি পাহাড়ের মধ্য দিয়া

তিব্বত যাইবার একটী পথ আছে। আমরা এই স্থানে দুপর বেলা আহারাদি করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। খানিক দূর যাইয়া ৪।৫টী চমরীগো (যে গরুর ল্যাজে চামর হয়) দেখিতে পাইলাম; এই গরু গুলি সাধারণ গরু হইতে ক্ষুদ্রাকার, মাথায় শিং নাই এবং ইহাদের ল্যাজের প্রান্তভাগে চামর ঝুলিতেছে। আমরা এখানে একটী পোল পার হইয়া পরপার দিয়া চলিতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যার সময় গঙ্গার বামতটে, একটী গাঁয়ে আসিয়া রাত্রে ধরমশালায় রহিলাম, এখানেও একটী দোকান আছে। ইহারই পরপারে গঙ্গোত্রির পাণ্ডাদের গ্রাম ও গ্রামের মধ্যে একটী মন্দির আছে। শুনিলাম, এই মন্দিরে শীতকালে গঙ্গা মাতার উদ্দেশে পূজা হয়।

পরদিন প্রাতে এখান হইতে রওনা হইয়া বৈকালে ভৈরব ঝোলা নামক একটী ভয়ানক উচ্চ পোল পার হইয়া পরপারে অবস্থিত ভৈরবজীর মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী ধরমশালায় রাত্রে রহিলাম। এই পোলটী গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে, গঙ্গায় আসিয়া পতিত অপর একটী নদীর উপর অবস্থিত ও নদীজল হইতে ৪০০।৫০০ হাত উচ্চে নির্ম্মিত। নদীর দুই পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত দুইটী পরস্পর ৪০।৫০ হাত ব্যবধানে পোল পর্য্যন্ত প্রায় খাড়া (perpendicular) ভাবে অবস্থিত। হিমালয়ের আর কোন স্থানে এত উচ্চে অবস্থিত পোল নাই। পোল পার হইবার সময় নীচে নদীর দিকে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া আসে। পাহাড়ি ও সাধুদের মুখে শুনিলাম, আসল ভৈরবজী উক্ত নদীর উত্তর পারস্থিত খাড়া পর্ব্বত গাত্রে একটী ছোট গুফায় অবস্থিত। কোন কোন সাধু অনেক কষ্টে উক্ত ভৈরবজী দেখিতে যায়, উপবিস্থিত মন্দিরটী নকল মাত্র।

আমরা রাত্রে এই স্থানে থাকিয়া পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া বেলা ১১ টার সময় গঙ্গার দক্ষিণ পারে অবস্থিত গঙ্গোত্রি আসিয়া পৌছিলাম। এখানে ৩।৪টী ধরমশালা আছে, কিন্তু সকলগুলিই লোকপূর্ণ থাকায় আমরা শেষে গঙ্গোত্রি মন্দিরের পাণ্ডাকে স্থানের জন্য বলিলাম; তিনিও তাঁহার মন্দিরস্থ ঘরে আমাদিগকে থাকিতে দিলেন। এখানকার ধরমশালা ও মন্দির সকলগুলিই কাষ্ঠনির্ম্মিত; এখানে একটী দোকানও আছে, কিন্তু দ্রব্যাদি অতি দুর্মূল্য।

আমরা পাণ্ডার সহিত প্রথমে গঙ্গায় স্নান করিতে যাইলাম। এখান-

কার গঙ্গার বিস্তার ১২।১৪ হাত মাত্র। জল ভয়ানক ঠাণ্ডা, ডুব দিবার সময় যেন মাথা খসিয়া যাইতে লাগিল। ২।৩টির অধিক ডুব দিতে পারিলাম না, পাণ্ডারাও অধিক ডুব দিতে সকলকে নিষেধ করিল। একজন গোঁয়ার সাধু ১০।১২টি ডুব দিয়া পারে উঠিবা মাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল, অপরাপর সাধুরা আগুন জ্বালাইয়া তাহাকে সেকিতে লাগিল। স্নান করিয়া আসিয়া আমরা মন্দিরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত সাদা পাথরের গঙ্গামাতার মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এই মূর্ত্তির চতুষ্পার্শ্বে সরস্বতী, যমুনা, শঙ্করাচার্য্য, ভগীরথ, অন্নপূর্ণা, ভৈরব, গণপতি প্রভৃতি মূর্ত্তি আছে এবং মন্দিরের বাহিরে গঙ্গেশ্বর মহাদেব (একটী স্ফটিকের শিবলিঙ্গ) ও গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি আছে। এই মন্দিরে গ্রীষ্মকাল যাবৎ পাণ্ডারা থাকে ও নিত্য পূজা হয়। শীতে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইলে পাণ্ডারা মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া পূর্ব্বকথিত তাহাদের গাঁয়ে ফিরিয়া আসে এবং তথাকার মন্দির হইতে গঙ্গা মাতার উদ্দেশে পূজা করিয়া থাকে।

গঙ্গোত্রি হইতে গোমুখী প্রায় ২২ মাইল, কিন্তু সেখানে যাইবার কোনরূপ রাস্তা নাই এবং গঙ্গোত্রির পর আর কোন গ্রাম নাই, এই সকল কারণে কেহই প্রায় গোমুখী যাইতে পারে না। আমরা গোমুখী যাইবার জন্য পথপ্রদর্শক লোকের (Guide) অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু এই স্থানে কোন পথপ্রদর্শক পাওয়া গেল না। মন্দিরের পাণ্ডা বলিল যে, যদ্যপি আপনারা এখানে ৫।৬ দিন থাকেন, তাহা হইলে দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে পথপ্রদর্শক আনাইয়া দিতে পারি, তাহারাও ৪।৫ জনা একত্র না হইলে যাইবে না এবং প্রত্যেকে ১৫।২০ টাকা হিসাবে লইবে। এই সকল অসুবিধার জন্য আমরা গোমুখী যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। পাণ্ডার মুখে আরও শুনিলাম যে, কেবলমাত্র সাহেবেরা মধ্যে মধ্যে অনেক পথপ্রদর্শক একত্রে সঙ্গে লইয়া গোমুখী যায়, সাধারণ যাত্রী বা সাধুরা কেহই প্রায় যায় না। গঙ্গোত্রি তীর্থ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত, মহাত্মা শঙ্কর সাধারণের গোমুখী যাওয়া অসাধ্য জানিয়া এবং গোমুখী হইতে যে পবিত্র জলধারা নির্গত হইয়াছে, তাহা এই স্থান পর্য্যন্ত আর কোন জলধারার সহিত মিলিত হইয়া অপবিত্র হয় নাই দেখিয়া এই স্থানে গঙ্গোত্রি তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই স্থানের ২।৩ হাত নিচে গঙ্গার বাম তটে অপর একটী ঝরণা আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইযাছে; এবং ঐ সংযোগের নিচে হইতে গঙ্গার জল আর বিশুদ্ধ নহে। গঙ্গোত্রির বিশুদ্ধ গঙ্গাজল সাধুরা অনেকেই লইয়া গিয়া সেতুবন্ধে রামেশ্বর মহাদেবের মাথায় চড়ায়, আমরাও রামেশ্বরের জন্য টিনের কুপিতে গঙ্গাজল ভরিযা লইযা পাণ্ডার দ্বারা মন্দিরস্থ গঙ্গামাতার নিকট পূজা দিযা, জল চড়াইবার অনুমতি মাগিয়া লইলাম; এবং রাত্রে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বশতঃ প্রায় অনিদ্রায় কাটাইয়া পর দিন প্রাতে উঠিযা টেরির দিকে ফিরিলাম।

গঙ্গোত্রি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বাটারি আসিয়া শুনিলাম যে, এখান হইতে জঙ্গলপথে একটী রাস্তা কেদারবদ্রি রাস্তায় অবস্থিত ত্রিযুগী-নারায়ণ নামক স্থান পর্য্যন্ত আছে, এই পথে ত্রিযুগীনারায়ণ ৬।৭ দিনে পৌঁছান যায়। কিন্তু বাঁধা পথে টেরি ও দেবপ্রযাগ হইযা উক্ত ত্রিযুগী-নারায়ণ পৌঁছিতে ২০।২৫ দিন লাগে। আরও শুনিলাম যে, এখান হইতে আজ ২৫।৩০ জন সাধু ও ৫।৭ জন গৃহস্থ যাত্রী এই জঙ্গল পথে ত্রিযুগী-নারায়ণ যাত্রা করিবে। এখান হইতে আমরা ৫।৬ দিনের আহারীয় সঙ্গে লইযা ও সকলে একত্র হইযা বেলা ২।৩টার সময এই জঙ্গল পথে যাত্রা করিলাম। প্রায এক মাইল পথ গঙ্গোত্রির বাঁধা রাস্তায় টেরির দিকে চলিযা আসিযা একটী পোল দেখিতে পাইলাম। পরে গঙ্গোত্রির রাস্তা ত্যাগ করিযা এই পোল পার হইযা গঙ্গার বাম পারে অবস্থিত পাহাড়ের মধ্য দিযা চলিতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যার সময একটী গ্রাম পাইযা সেই স্থানে রাত্রে রহিলাম। পরদিন এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিলাম; কিন্তু আজ আর পথ ঠিক করিতে পারা যাইতেছে না। অতি কষ্টে পথ নির্ণয় করিযা সকলে চলিতে লাগিলাম, এবং সন্ধ্যার সময় কোন গ্রামাদি না পাওযায় পাহাড়ের উপর অনাবৃত স্থানে রাত্রে পড়িযা রহিলাম।

আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, একটু বৃষ্টি হইযা গেল। যাহা হউক, আমরা কষ্টে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, পরদিন প্রাতে পুনরায় আগে চলিতে লাগিলাম, এবং সেই দিন সন্ধ্যার সময বুড়োকেদার আসিযা পৌঁছিযা একজন পাহাড়ির বাটীতে বাসা লইলাম। এই স্থানটী নদীর তটে অবস্থিত; অনেক লোকের বাস ও ২।৩ খানি দোকান আছে।

এই স্থান পঞ্চ কেদারের মধ্যে একটী বলিয়া অনেক সাধু এখানে আসিয়া থাকে। আমাদের মুটে এখানে আটা খরিদ না করিয়া গম ক্রয় করিল এবং ঝরণার পার্শ্বে একটী ঘরে জাঁতা চলিতেছিল; সেই স্থান হইতে গম পিষিয়া আনিল। পাহাড়ের সকল গ্রামেই নিকটবর্ত্তী ঝরণার উপর একটী ঘর থাকে, তাহাতে জাঁতা বসান আছে। ঝরণার জলের মধ্যে একটী বড় চাকা থাকে, সেটী জলের বেগে ক্রমাগত ঘুরিতেছে; এবং উক্ত চাকা ও জাঁতার মধ্যে আর একখানি চাকা এমন কৌশলে লাগান থাকে, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত চাকার তেজে মধ্যবর্ত্তী চাকা ঘোরায়, তাহার সাহায্যে জাঁতা ঘুরিতে থাকে, সেই ঘরে গ্রামের সকলেই আসিয়া আপন আপন শস্য পিষিয়া লয়। আমরা সন্ধ্যার সময় বুড়ো কেদারনাথ দেখিতে যাইলাম। মন্দিরটী কাষ্ঠনির্ম্মিত, ধরমশালার ন্যায়। ৫।৬টী ঘর আছে, একটী ঘরে বুড়ো কেদারনাথ বিরাজিত। কোন মূর্ত্তি নয়, কেবল খুব বড় একটী পাথর মাত্র, ঠিক প্রসিদ্ধ কেদারনাথের ন্যায়, তবে তাহা অপেক্ষা বড়।

যাঁহারা হিমালয়ে পঞ্চ কেদার দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য এখানে সংক্ষেপে পঞ্চ কেদারের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম (১) এই স্থানে বুড়ো কেদার (২) প্রসিদ্ধ কেদারনাথ (৩) বদ্রীনারায়ণের পথে ওখী মঠ হইতে উত্তরে ২দিন দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে যাইলে তৃতীয় কেদার পাওয়া যায়; এই স্থানে যাইবার ইচ্ছা থাকিলে ওখী মঠ হইতে পথপ্রদর্শক লওয়া উচিত (৪) বদ্রিনারায়ণের পথে তুঙ্গনাথ (৫) বদ্রিনারায়ণ হইতে কাটগুদাম আসিতে মেল চটীর নিকট আদ্ কেদার বা আদি কেদার। আমরা পর দিবস বুড়ো কেদার হইতে যাত্রা করিয়া চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় ত্রিযুগীনারায়ণ আসিয়া পৌঁছিলাম; বুড়ো কেদার হইতে ত্রিযুগীনারায়ণ পর্য্যন্ত রাস্তা, বাটারি হইতে বুড়ো কেদার পর্য্যন্ত রাস্তার অপেক্ষা অনেক ভাল। কেদার বদ্রির পথের যাত্রিগণের মধ্যে প্রায়ই ২।৪ জন যাত্রী মধ্যে মধ্যে বুড়ো কেদার দেখিতে আসে বলিয়া এই পথে দুইটী চটী আছে; এবং একটী দোকান ও ২টী ধরমশালা পাওয়া যায়; ইহা ভিন্ন অনেকগুলি গ্রামও আছে। বাটারি হইতে ৭ দিনে আমরা ত্রিযুগীনারায়ণ আসিয়াছিলাম, পথ প্রায় ৮০।৮৫ মাইল হইবে। এই পথটী যদিচ জঙ্গলের রাস্তা এবং যদিও এই পথের মধ্যে মধ্যে বরফ আছে, কিন্তু তথাপি ইহা

যমুনোত্রি পথের ন্যায় দুর্গম নহে। ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে কেদার বদ্রির বাঁধা রাস্তা পাওয়া যায় এবং সেই পথের সমাচার অনেকেই জ্ঞাত আছেন বলিয়া এই স্থানে ভ্রমণ বিবরণ শেষ করিলাম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—কথিত।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে।

শ্রীযুক্ত অধর সেনের প্রথম দর্শন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ রবিবার ৮ই এপ্রেল, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। ছোট খাট্‌টিতে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট। আজ কলিকাতা হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়াছেন; আর শ্রীযুক্ত অধর সেন তাঁহার কয়টি বন্ধু সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন। অধর ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট। ঠাকুরকে এই প্রথম দর্শন করিতে আসিয়াছেন। অধরের বয়স ২৯।৩০ হইবে। অধরের বন্ধু পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়াছেন। তিনি ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার অফ স্কুল্‌স্ ছিলেন, পেন্সন লইয়াছেন। পেন্সন লইয়া (এবং আগেও) সাধন ভজন করিতেন। বড় ছেলেটি মারা যাওয়াতে কোন রূপে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাই অধর ঠাকুরের নাম শুনিয়া তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিজেরও ঠাকুরকে দেখিবার অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল।

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲ টাকা। বাঁধান মূল্য পাঁচ সিকা। ৫৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীশান্তিরাম ঘোষের নিকট অথবা ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতায় শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য।

(গৃহস্থের প্রতি উপদেশ)

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এক ঘর লোক তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন; তখন তিনি আপনাপনি কি বলিতেছেন।

"বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখন কখন দেখা দেয়। এক এক বার। দীপশিখার ন্যায়। না, না, সূর্য্যের একটী কিরণের ন্যায়। ফুটো দিয়ে যেন কিরণটী আস্‌ছে।

"বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম করা। অনুরাগ নাই। বালক যেমন বলে, তোর পরমেশ্বরের দিব্যি। খুড়ি জেঠির কোঁদল শুনে পরমেশ্বরের দিব্যি শিখেছে।

"বিষয়ী লোকদের রোক নাই। হোলো হোলো, না হোলো না হোলো। জলের দরকার হয়েছে, কূপ খুঁড়্‌ছে। খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে যেমন পাথর বেরুল, তেমনি সেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুড়্‌তে খুঁড়্‌তে বালি পেয়ে গেল, কেবল বালি বেরোয়। সেখানটাও ছেড়ে দিলে। যেখানে খুঁড়্‌তে আরম্ভ করেছ, সেইখানেই খুঁড়্‌বে, তবে ত জল পাবে।

"জীব যেমন কর্ম্ম করে, সেইরূপ ফল পায়। তাই গানে আছে।

গান।

দোষ কারু নয় গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥
ষড়্‌রিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে বেড়িল কালরূপ জল,
কাল মনোরমা॥
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী,
বিগুণ করেছ সগুণে;
ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে,
জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে,
ওমা আছি তোর অপিক্ষে,
(মাগো) দে মা মুক্তি ভিক্ষে,
কটাক্ষেতে কর পার॥

"আমি আর আমার অজ্ঞান। বিচার কর্‌তে গেলে যাকে আমি, আমি কোর্‌চো, তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার কর, তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু। তখন দেখ্‌বে, তুমি কিছু নও। তোমার কোন উপাধি নেই।

"এটা সোনা, এটা পেতল, এর নাম অজ্ঞান। সব সোনা, এর নাম জ্ঞান।

"ঈশ্বর দর্শন হলে বিচার বন্ধ হযে যায়। তবে ঈশ্বর লাভ করেছে অথচ বিচার কোর্‌চে, তাও আছে। কি কেউ ভক্তি নিযে তাঁর নাম গুণ গান কোর্‌চে।

"ছেলে কাঁদে কতক্ষণ? যতক্ষণ না স্তন পান কোর্‌তে পারে। তার পরই কান্না বন্ধ হযে যায়; কেবল আনন্দ। আনন্দে মার দুধ খায়। তবে একটী কথা আছে। খেতে খেতে মাঝে মাঝে খেলা করে আবার হাঁসে।

(অবতারতত্ত্ব।)

"তিনিই সব হয়েছেন। তবে, মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব বালকের স্বভাব, হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, সেখানে তিনি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর অধরের পরিচয লইলেন। অধর তাঁহার বন্ধুর পুত্রশোকের কথা নিবেদন করিলেন।

ঠাকুর আপনার মনে গান গাহিতেছিলেন।

গান।

জীব সাজ সমরে।
রণ বেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে॥
ভক্তিরথে চড়ি লয়ে জ্ঞানতূণ,
রসনাধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।
আর এক যুক্তি রণে চাই না রথ রথী,
শত্রুনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি,
রণভূমি যদি করে দাশরথি,
ভাগীরথী তীরে।

"কি করবে? এই কালের জন্যে প্রস্তুত হও। কাল ঘরে প্রবেশ করেছে। তাঁর নামরূপ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

"তিনি কর্ত্তা। আমি বলি মা, যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও, তেমনি বলি। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। আমি ঘর, তুমি ঘরণী। আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার।

"তাঁকে আম্ মোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর ভার দিলে অমঙ্গল হয় না। তিনি যা হয় করুন।

"তা শোক হবে না গা! আত্মজ! রাবণ যখন বধ হল, লক্ষ্মণ দৌড়ে গিয়ে দেখ্লেন। দেখেন যে, হাড়ের ভেতরে এমন জায়গা নাই, যেখানে ছিদ্র নাই। তখন বল্লেন, রাম, তোমাব বাণের কি মহিমা! রাবণের শরীরে এমন স্থান নাই, যেখানে ছিদ্র না হয়েছে। তখন রাম বল্লেন, হাড়ের ভেতব যে সব ছিদ্র দেখ্ছ, ও বাণের জন্য নয়। পুত্রশোকে হাড় জর জর হয়েছে। ঐ ছিদ্রগুলি সেই শোকেব চিহ্ন। হাড় বিদীর্ণ করেছে।

"তবে এ সব অনিত্য। গৃহ, পবিবার, সন্তান দু দিনের জন্য। তাল গাছই সত্য। দু একটা তাল খসে পড়েছে। তার আর দুঃখ কি? ঈশ্বর তিনটি কায কোর্চেন,—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।

"মৃত্যু আছেই। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছুই থাক্বে না। মা কেবল সৃষ্টিব বীজ গুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন। আবার নূতন সৃষ্টির সময় সেই বীজ গুলি বার কোর্বেন।

"গিন্নীদের যেমন ন্যাতা ক্যাতাব হাঁড়ী থাকে; তাতে শশার বিচি, সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি ছোট ছোট পুঁটলিতে বাঁধা থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(অধরের প্রতি প্রথম উপদেশ)

ঠাকুর অধরের সঙ্গে তাঁর ঘরের উত্তরের বারাণ্ডায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি)। তুমি ডিপুটী। এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলো না।

"কিন্তু জেন সকলের এক পথে যেতে হবে।* এখানে দুদিনের জন্য।

* শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেন দেড় বৎসর পরে দেহ ত্যাগ করেন। ঠাকুর ঐ সংবাদ শুনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মার কাছে কাঁদিয়াছিলেন। অধর ঠাকুরের পরম ভক্ত। ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি আমার আত্মীয়।

"সংসার কর্ম্মভূমি। এখানে কর্ম্ম কোর্ তে আসা, যেমন দেশে বাড়ী, কল্‌কাতায় গিয়ে কর্ম্ম করে।

"কিছু কর্ম্ম করা দরকার। সাধন। তাড়াতাড়ি কর্ম্ম গুলি শেষ করে নিতে হয়। সেক্‌রারা সোণা গলাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ সব দিয়ে হাওয়া করে, যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোণাটা গলে। সোণা গল্‌বার পর তখন বলে, তামাক সাজ্। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়্ ছিল। তার পর তামাক খাবে।

"খুব রোক চাই, তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

"তাঁর নাম বীজের খুব শক্তি, অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

"কামিনী কাঞ্চনের ভিতর থাক্‌লে মন বড় টেনে নেয়। তাই সাব-ধানে থাক্‌তে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী, তারা কামিনী কাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে, তাই সাধন থাক্‌লে ঈশ্বরে সর্ব্বদা মন রাখ্‌তে পারে।

"ঠিক ঠিক ত্যাগী, যারা সর্ব্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে, তারা মৌমাছির মত। কেবল ফুলে বসে, মধু পান করে। সংসারে কামিনী কাঞ্চনের ভিতর থাক্‌লে ঈশ্বরে মন হতে পারে, আবার কখন কখন কামিনী কাঞ্চ-নেতে মন হয়, যেমন সাধারণ মাছি। সন্দেশেও বসে আবার পচা ঘায়েও বসে, বিষ্ঠাতেও বসে।

"ঈশ্বরেতে সর্ব্বদা মন রাখ্‌বে। প্রথমে একটু খেটে দিতে হয়। তার পর পেন্সন ভোগ কোর্‌বে।"

———

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,

চিকাগো।

২রা, মে,' ৯৫।

ভাই,

তোমার অনুকম্পাপূর্ণ সুন্দর পত্রখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তুমি যে আমাদের কার্য্য আদর পূর্ব্বক অনুমোদন করিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ। নাগ মহাশয় একজন মহাপুরুষ। এরূপ মহাত্মার দয়া যখন তুমি পাইয়াছ, তখন তুমি অতি সৌভাগ্যবান্। এই জগতে মহাপুরুষের কৃপালাভই জীবের সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্য। তুমি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছ। "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমামতাঃ," তুমি যখন তাঁহার একজন শিষ্যকে তোমার জীবনের পথপ্রদর্শক রূপে পাইয়াছ, তখন তুমি তাঁহাকেই পাইয়াছ জানিবে।

তুমি সংসার ত্যাগের কল্পনা করিতেছ। তোমার এই ইচ্ছায় আমার সহানুভূতি আছে। স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা জগতে বড় কিছু নাই। কিন্তু তোমার বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, প্রভু যাহাদিগের ভার তোমার উপর দিয়াছেন, তাহাদের কল্যাণোদ্দেশে তোমার মনের প্রবল আবেগ দমন করা বড় কম স্বার্থত্যাগ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, বিশেষতঃ, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক জীবনী প্রচার কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারবর্গেরও তত্ত্বাবধান করিও। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়া যাও, আর যাহা কিছু, তাঁহার ভার।

প্রেমে বাঙ্গাল বাঙ্গালী, আর্য্য ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, এমন কি, নর নারী পর্য্যন্ত ভেদ নাই। প্রেম সব এক করিয়া দেয়। যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু উহা অবার্থ। বাঙ্গালা দেশের এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের যুবকদলের উপর সব নির্ভর করিতেছে। এই সকল যুবকদের—বিশেষতঃ অবিবাহিত যুবকদের মধ্যে কার্য্য কর। তাহাদিগকে জাগাও; এইরূপ শত শত যুবক ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একত্রিত হউক।

---

* ইংরাজীর অনুবাদ। কদিশাডাস্থ জনৈক ব্যক্তিকে এই পত্র লিখিত হয়।

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর—কেবল নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস ছাড়া। পরস্পরের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখন শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না। আর এইরূপ কেন্দ্রীভূত শক্তি ব্যতীত কোন বড় কায হইতে পারে না। বরাহনগরের মঠ এই কেন্দ্র। অন্যান্য সকল স্থানের ভক্তগণের এই কেন্দ্রের সহিত একযোগে কার্য্য করা উচিত।

অহংভাব ও ঈর্ষ্যা তাড়াইয়া দাও—অপরের সহিত একযোগে এবং অপরের জন্য কার্য্য করিতে শিখ। আমাদের দেশে এইটীর বিশেষ অভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিরন্তর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

তোমার

বিবেকানন্দ।

পুঃ—নাগ মহাশয়কে আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানাইবে।

বি—

পণ্ডরপুর তীর্থ।

[চিত্রের বিবরণ। বড় চিত্র। নদীর অপর দিক্ হইতে পণ্ডরপুর সহরের দৃশ্য। ২। বিষ্ণুপদ। ৩। পদ্মাবতীর মন্দির। ৪। বাম দিক্ হইতে যথাক্রমে পুণ্ডলিকের সমাধি, আম্বরনেকর স্বামীর সমাধি, গুজরাথি লোকের বৈঠক, চোপড়কর স্বামীর সমাধি। ৫। শ্রীশ্রীইঠোবা ও রুক্মিণীদেবীর মন্দির। ৬। বাম দিকে গোপাল পুরের তীর্থ্যক্ষেত্রের ও দক্ষিণে মুরলীধরের মন্দির। ৭। শ্রীশ্রীইঠোবাদেবের মন্দির।]

পণ্ডরপুর একটী মহারাষ্ট্র দেশের প্রধান তীর্থস্থান। এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইঠোবা নাম্নী মূর্ত্তি এবং রুক্মিণী দেবীর মূর্ত্তি আছে। মথুরা বৃন্দাবনের ন্যায় এখানেও যাত্রীদিগকে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকাণ্ড সমুদয় করিতে হয়। বাঙ্গলা দেশের লোক, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্বারিকা, পঞ্চবটী প্রভৃতি এ দেশীয় তীর্থস্থানের কথাই জানেন, পণ্ডরপুর তীর্থের কথা প্রায় কেহই অবগত নহেন। এজন্য এ স্থানের বিবরণ লোকের রুচিকর হইবারই সম্ভাবনা।

পণ্ডরপুর বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত শোলাপুর জেলার অন্তর্গত একটী সবডিভিজন। এখানে আসিবার দুইটী পথ। একটীতে আসিতে হইলে, জি, আই, পি, রেলে পুনা হইতে শোলাপুর আসিবার পথে বার্সিরোড
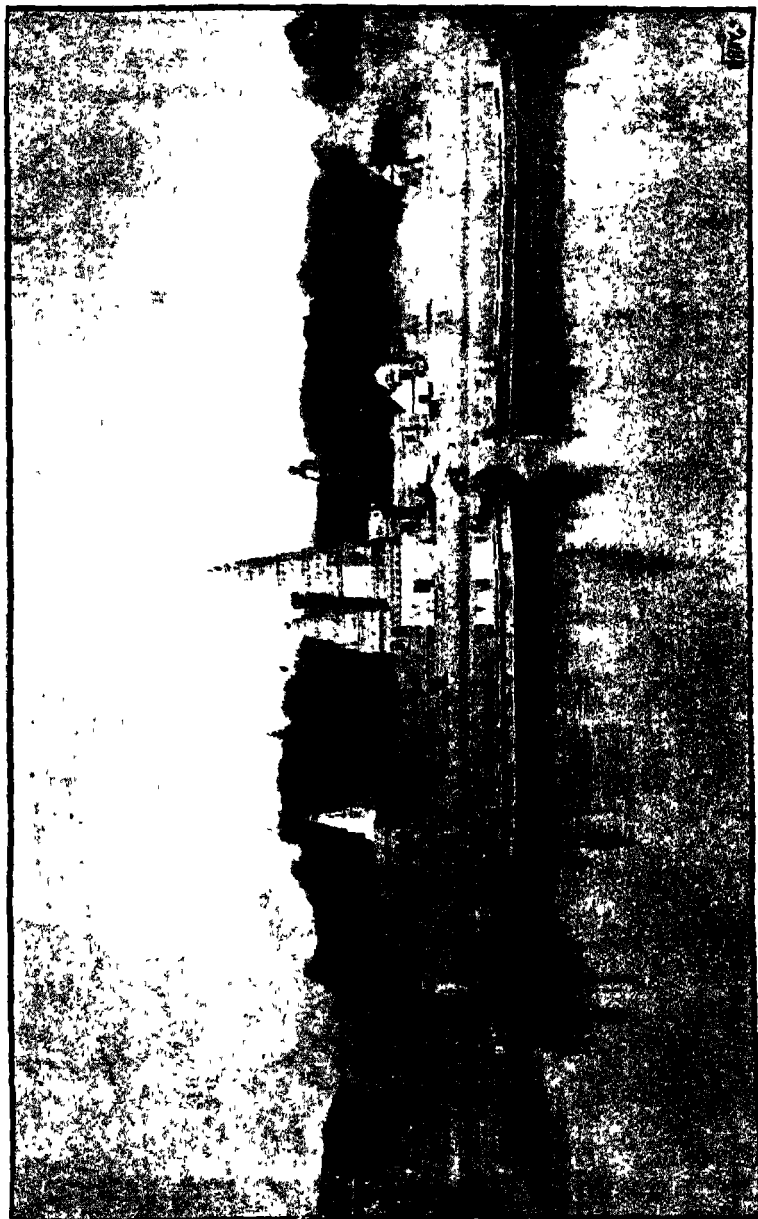
ষ্টেসনে নামিতে হয়। দ্বিতীয়টীতে, ওয়াডি জংসন হইতে শোলাপুর হইয়া বার্সিরোড অথবা মোহল নামে মধ্যের একটী ষ্টেসনে নামিয়াও পণ্ডরপুরে আসা যায়। মোহল হইতে ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায় না, রাস্তাও তত ভাল নহে। গরুর গাড়ি পাওয়া যায়, পথ ২২ মাইল—যাইতে ৯ ঘণ্টা সময় লাগে। বার্সিরোডে নামিলে, খুব ভাল রাস্তা এবং দুই ঘোড়ার টাঙ্গা গাড়ি পাওয়া যায়। যাত্রীরা প্রায় এই রাস্তা দিয়াই যাতায়াত করে। মেশ টাঙ্গায় প্রত্যেক জনের ভাড়া ১৲ টাকা; স্বতন্ত্র টাঙ্গার ভাড়া ৪।৫ টাকা; পথ ৩১ মাইল—৪।৫ ঘণ্টায় আসা যায়। রাস্তায় মাঝে মাঝে ধর্ম্মশালা এবং ট্র্যাভলার্স্ বাঙ্গলা আছে।

পণ্ডরপুর আসিতে হইলে ভীমা নদী পার হইয়া আসিতে হয়। বর্ষাকালে নৌকায় পার হইতে হয়, অন্যান্য সময় নদীতে জল খুব কম থাকে, হাঁটিয়া কিম্বা গাড়ি সহিত পার হওয়া যায়। নদীর পরপার হইতে পণ্ডরপুরের দৃশ্য অতি মনোরম।

যাত্রীদের আনিতে পাণ্ডারা কেহ কেহ ষ্টেসনে কেহবা অৰ্দ্ধেক রাস্তায় আবার কেহবা নদীর তীরে অপেক্ষা করে। ইহারা মথুরা প্রভৃতি স্থানের ন্যায়, লোকের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া নিজেদের খাতা পত্র খুলিয়া আপন আপন যজমান বাহির করে এবং যাত্রীদের সঙ্গে আনিয়া তাহাদের থাকিবার ও সমুদয় দেখাইবার বন্দোবস্ত করে। নূতন লোক কেহ আসিলে সে কোন পাণ্ডার সহিত ইচ্ছামত আসেন।

এখানে কোন্ কোন্ স্থানে কি করিতে হয় এবং কোন্ কোন্ দেবালয় আছে, তৎসমুদয় পরে বলিতেছি। অগ্রে, এ স্থানটি তীর্থস্থান কিরূপে হইল এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এখানে ইঠোবা নামই বা কেন হইল, তাহার বিবরণ কিছু বলিব। এই দেবমূর্ত্তি অতিশয় পুরাতন, এরূপ প্রমাণ আছে, কিন্তু কখন কোন্ সনে প্রতিষ্ঠিত, তাহা কেহ বলিতে পারে না। যে স্থানটি এখন শ্রীক্ষেত্র পণ্ডরপুর নামে বিখ্যাত, উহা প্রাচীন কালে ভয়ানক অরণ্য ছিল। মনুষ্যের সমাগম মাত্র ছিল না এবং সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুগণের বাসভূমি ছিল। ঐ বনে দিণ্ডির নামে প্রবলপ্রতাপশালী এক রাক্ষস ছিল; তাহার ভয়ানক উৎপাতে দেবগণ ভীত হইয়া তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। স্তবপ্রীত ভগবান্, দেবগণের দুঃখ নিবারণের জন্য

প্রতিশ্রুত হইয়া বলিলেন, আমি, মল্লিকার্জ্জুন নামে চন্দ্রসেন রাজার পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইব এবং দিণ্ডির রাক্ষস বধ করিব। কিছুকাল পরে ভগবান্ ঐরূপে অবতীর্ণ হইয়া গদাঘাতে দিণ্ডির রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মৃত্যুর সময় ঐ রাক্ষস, প্রভুর নিকট এই বর চাহিয়াছিল যে, যে স্থানে গদাঘাতে আমার প্রাণ বধ হইবে, সেস্থানের নাম আজি হইতে গদাতীর্থ হউক এবং যে বনে এতকাল পরম সুখে বাস করিয়াছি, উহা দিণ্ডির বন নামে বিখ্যাত হউক। ভগবান্ তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

দিণ্ডির বনের উত্তরে প্রায় চারি পাঁচ মাইল দূরে, ভীমা নদীর পর পারে, গুরশালা নামক একটি গ্রাম ছিল। তথায় জানুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সত্যবতী। তাঁহাদের পুণ্ডলিক নামে একটী পুত্র ছিল। পুত্রের স্বভাব অতি নম্র ছিল। গ্রামের সকলেই তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন; কিন্তু সে পিতামাতাকে অতিশয় কষ্ট দিত! সংসারের সমুদয় কর্ম্ম বৃদ্ধ মাতা পিতা করিতেন, তথাপি পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা অশেষ প্রকারে লাঞ্ছনা করিত—এমন কি, উদর পুরিয়া খাইতেও দিত না। সাতিশয় মনকষ্ট পাইয়া অবশেষে স্ত্রী পুরুষে কাশী যাইবার পরামর্শ স্থির করিলেন এবং পুণ্ডলিকের অনুমতি লইয়া, এখনকার নবীন বাবুদের প্রবীণ পিতামাতার ন্যায়, জন্মের মত গৃহত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু পুণ্ডলিকের স্ত্রী এখনকার অনেক শিক্ষিতা স্ত্রী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। যাত্রাকালে স্বামীকে বলিলেন, গ্রামের সকলে কাশী যাইতেছে, আমরাও যাই চল। পুণ্ডলিকের কাজেই তাহাতে মত হইল। তখন দুইটী ঘোড়া কিনিয়া উভয়ে দুইটী ঘোড়ায় চড়িয়া (এ দেশে স্ত্রীলোকে ঘোড়ায় চড়ে) পিতামাতার সহিত কাশী যাইতে লাগিলেন।

পথিমধ্যে একদিন কুক্কুট স্বামীর আশ্রমে সকলে রাত্রি যাপন করিবার জন্য রহিলেন। অর্দ্ধরাত্রে পুণ্ডলিকের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে দেখিল—তিনটী স্ত্রীলোক মলিন বসন পরিধান করিয়া, অবসন্নপ্রায়শরীরে সেই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইল এবং আশ্রমের মার্জ্জন লেপনাদি সমুদয় কর্ম্ম শেষ করিল। অনন্তর সেই মুনিবরের দর্শন ও বন্দনাদি করিয়া যাইবার সময় তিন জনেই দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল! দেখিয়া পুণ্ডলিকের অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হইল। সে মনে মনে স্থির করিল,

2
3
4
5
6
7

"আর একদিন এখানে থাকিয়া ইহার যথার্থ কারণ জানিতে হইবে।" দ্বিতীয় রাত্রে পুণ্ডলিক জাগরিত থাকিয়া পূর্ব্ববৎ সমস্ত ঘটনা দেখিল এবং যখন সেই স্ত্রীলোকেরা দিব্যরূপ ধারণ করিয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন সে তাহাদের সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে এবং কি নিমিত্ত প্রত্যহ মলিন বেশে এই আশ্রমে আসিয়া এইরূপ কর ও কেমন করিয়াই বা যাইবার সময় দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যাও, ইহা আমাকে বলিতে হইবে।" নারীগণ উত্তর করিল, "আমরা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। পাতকীরা অশেষবিধ পাপ করিয়া আমাদের জলে স্নান করিয়া উদ্ধার হয়। ইহাদের ভিতর পিতৃদ্রোহী ও গুরুদ্রোহীর পাপভার আমাদের সহ্য হয় না; উহা আমাদিগকে নিতান্ত অবসন্ন ও মলিন করে। এইজন্য আমরা এই পবিত্র পুরুষের দর্শন ও সেবা করিয়া প্রত্যহ শুদ্ধ হইতে আসি। তুই মহাপাতকী, পিতামাতার সেবা না করিয়া তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া তীর্থ যাইতেছিস্? তোর তীর্থ সফল হইবে না, তোর মুখ দেখিলেও পাপ হয়।" এই কথা শুনিয়া পুণ্ডলিকের অতিশয় পরিতাপ হইল এবং সে সেই দেবীদের চরণ ধারণ করিয়া বলিল, "আমার পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যফলেই আপনাদের দর্শন পাইয়াছি! এখন কি উপায়ে এই পাপ হইতে উদ্ধার হইব, তাহার উপায় বলিয়া দিন।" তাঁহারা বলিলেন, "আজ হইতে তুই একনিষ্ঠ মনে পিতামাতার সেবা কর্, তাহা হইলেই উদ্ধার হইবি।" এই বলিয়া তাঁহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরদিবস পুণ্ডলিক আপন পিতামাতাকে সেই দুইটী ঘোড়ায় বসাইয়া আপনারা স্ত্রী পুরুষে তাঁহাদের সহিত পদব্রজে চলিয়া কাশী তীর্থ দর্শন করাইল। পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের গ্রামে না গিয়া, দিণ্ডির বনে, ভীমা নদী তীরে একটী পর্ণ কুটীরে বাস করতঃ একমনে পিতামাতার সেবা করিতে লাগিল। পুণ্ডলিকের ভক্তিপ্রভাবে ঐ স্থান পবিত্রতাময় হইল এবং ভীমা নদীর ঐ স্থানের নাম চন্দ্রভাগা হইল। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্র শাপগ্রস্ত হইয়া নদীর ঐ স্থানে স্নান করিয়া কলঙ্কমুক্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্যই ভীমার এখানে চন্দ্রভাগা নাম হইয়াছে। আবার কেহ বা বলেন, এই স্থানে নদী অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বাঁকিয়া গিয়াছে, তাই ঐ নাম হইয়াছে।

রুক্মিণীদেবীর এখানে আগমন সম্বন্ধেও একটি পূর্ব্বেতিহাস আছে। কথিত আছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারিকাবাসকালীন একদিন শ্রীরাধিকাকে স্মরণ করিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলে শ্রীরাধিকা তথায় আসিয়া দর্শন দিলেন। রাধিকাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় প্রীত হইয়া বহুসম্মানে তাঁহাকে নিজ সমীপে বসাইলেন। ইতি মধ্যে রুক্মিণী দেবী সেই স্থানে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন কারণ, রুক্মিণীদেবীর সম্মুখে অপর কোন স্ত্রীরই শ্রীকৃষ্ণবামে বসিবার অধিকার ছিল না। দেবীকে দেখিয়াও যখন শ্রীরাধা উঠিলেন না, তখন রুক্মিণী দেবী রাগিয়া সেথান হইতে চলিয়া গেলেন এবং এই দিণ্ডির বনে আসিয়া একস্থানে গুপ্তভাবে থাকিয়া মহা তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

শ্রীমতী চলিয়া যাইলে শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীদেবীর ক্রোধের বিষয় স্মরণ হইল। তিনি তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন এবং তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে মথুরা ও বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে গিরি গোবর্দ্ধন, গাভী ও গোপালকুল সঙ্গে লইয়া এই দিণ্ডির বনে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। নদীতীরে গাভী এবং গোপালগণকে রাখিয়া নিজে বনের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে একস্থানে দেবীকে দেখিতে পাইলেন। পরে ভ্রমণ করিতে করিতে পুণ্ডলিকের পর্ণকুটীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুণ্ডলিক তখন এক-মনে, হেঁট মস্তকে মাতাপিতার সেবা করিতেছিল—ভগবান্‌কে দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহার পিতা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পুণ্ডলিককে বলিলেন, "অরে পুণ্ডলিক। সাক্ষাৎ ভগবান্ তোকে দর্শন দিবার জন্য তোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তুই দেখিতেছিস্ না!" তখন পুণ্ডলিক ভগবান্‌কে দেখিয়া আসনাভাবে একখানি ইঁট ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "আপনি ইহার উপর দাঁড়ান।" ভগবানও তাহার পিতৃভক্তির আতিশয্য দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া সেবা সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেই ইঁটের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতামাতার সেবা সমাপ্ত করিয়া পুণ্ডলিক ভগবানের নিকট জোড় হস্তে আসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া "ইঠল" বলিয়া সম্বোধন করিয়া (কারণ, ইঁটের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন) বলিল, "প্রভু, আমার অপরাধ ক্ষমা করি-বেন; আমি মাতাপিতার সেবা করিতেছিলাম—পাছে নিয়ম ভঙ্গ হয় এবং সেবার ত্রুটি হয়, তাই আপনার অভ্যর্থনা করিতে পারি নাই।"

এই বলিয়া সে অনেক স্তুতি করিয়া দেবের চরণে মস্তক রাখিয়া দণ্ড-বৎ হইল, এজন্য এখনও যে কেহ এখানে দেব দর্শন করিতে আসে, তাহারা সকলেই ঐ মূর্ত্তির চরণে মস্তক রাখে। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া পুণ্ডলিককে বলিলেন, "তোর একনিষ্ঠমনে পিতামাতার সেবা দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। যাহা ইচ্ছা বর লও।" পুণ্ডলিক তখন ভগবানের নিকট এই বর চাহিল,—"প্রভু, আপনি এইখানে এই রূপে চিরকাল থাকিয়া পাতকী জনের ত্রাণ করুন।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলি-লেন, "আচ্ছা, যে কেহ এই চন্দ্রভাগায় স্নান করিয়া তোর দর্শন করিবে এবং আমার ইঠোবা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে, তাহার আর জন্ম মরণের ভয় থাকিবে না।" এই বলিয়া ভগবান্ রুক্মিণী দেবী গাভী ও গোপালগণসহ এখানে বাস করিতে লাগিলেন। যেখানে প্রথমে গাভী ও গোপালদল রাখিয়াছিলেন, সেখানে এখন গোপালপুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইয়াছে। উহা পণ্ডরপুর হইতে ১মাইল পূর্ব্বে। ঐ গ্রামের সন্নিকটে পুষ্পবতী নদী চন্দ্রভাগা নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই পুষ্পবতী নদীকে এখানে সকলে যমুনা কহে। গিরি গোবর্দ্ধন সহিত যমুনা আসিয়া পুষ্পবতী নামে এখানে প্রবাহিত রহিয়াছে, ইহাই এখান-কার লোকে বলিয়া থাকে।

পুণ্ডলিকের মাতাপিতার মৃত্যুর পর চন্দ্রভাগানদীতীরে তাঁহাদের সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পুণ্ডলিকের মৃত্যুর পর তাঁহারও সমাধি তাঁহার পিতামাতার সমাধিমন্দি-রের নিকট নির্ম্মিত হয়। উহাতেও মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। পুণ্ড-লিকের সমাধিমন্দিরটী দেখিবার যোগ্য। ঐ মন্দির দীর্ঘে ৬৫ ও প্রস্থে ২৬ ফিট। উহার সম্মুখে সভামণ্ডপ। এখানে মাঘ মাসে শুক্ল দ্বাদশী হইতে পাঁচ দিবস উৎসব হয়। এই মন্দির ১৪০০ শকাব্দায় নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নিকট আরো কতকগুলি সাধুদের সমাধিমন্দির আছে।

পুণ্ডলিকের সমাধির পূর্ব্বে একটি চতুষ্কোণ কুণ্ড আছে; উহা পাথর দিয়া বাঁধান। উহাতে একটি পাথরের ছোট নৌকা আছে, যাহা জলে ভাসে। এই কুণ্ডকে লোহদণ্ড তীর্থ কহে। এইখানে পুণ্ডলিকের সহিত ভগবানের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।' উহা বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায়। চন্দ্র-

ভাগা নদীর অপর পারে পুণ্ডলিকের মন্দিরের সামনে গুজরাথী লোক-দের গুরু বল্লভাচার্য্যের মঠ। উহাকে গুজরাথী লোকের বৈঠক কহে। উহার ভিতরে একটী ভূতলগৃহ আছে, চারিদিকে কেল্লার মত প্রাচীর এবং নদীতে ঘাট বাঁধান; দেখিতে সুন্দর। পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলপূর্ণ থাকাতে যাত্রীদের যাতায়াতের বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, প্রায় কেহই আসিতে পারিত না। একান্ত ভক্তেরাই কেবল সকল কষ্ট সহ্য করিয়াও আসিত। ইহার উপর আবার দস্যু ও ব্যাঘ্রাদির তাড়না অতি ভয়ঙ্কর ছিল। সে সময়ে ঐ স্থান শালিবাহন রাজার রাজ্যভুক্ত ছিল। চতুষ্পার্শ্বের গ্রামের লোকে পরামর্শ করিয়া রাজার নিকট ইহার প্রতি-কারের জন্য প্রার্থনাপত্র পাঠাইল। শালিবাহন রাজা সেই আবেদন গ্রাহ্য করিলেন এবং লোক লাগাইয়া জঙ্গল কাটাইয়া ঐস্থানে গ্রাম বসা-ইলেন এবং পণ্ডরিনাথের রীতিমত পূজা নৈবেদ্যাদিরও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ক্রমে ঐ গ্রাম একটী সহরে পরিণত হইয়াছে, এবং সেখানে সবজজের কোর্ট, ফৌজদারী, মিউনিসিপ্যাল অফিস, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, হাই স্কুল, অর্ফানেজ, বালহত্যা-প্রতিবন্ধক-গৃহ, অনাথ-সংগোপন-গৃহ প্রভৃতি সভ্যসমাজের উন্নতি পরিচায়ক সমুদয় অঙ্গই বর্ত্তমান আছে।

শ্রীশ্রীইঠোবাদেবের মন্দিরটি ৩৫০ ফিট লম্বা এবং ১৭০ ফিট চওড়া; উহার চারিদিকে পাথরের উচ্চ প্রাচীর। ভিতরে যাইবার জন্য ঐ প্রাচীর-সংলগ্ন ৮টী দরজা আছে। সম্মুখের যে বড় দরজা, তাহাকে মহাদ্বার কহে। ঐ দরজার সোজাসুজী যে রাস্তা নদী পর্য্যন্ত গিয়া নদীর ঘাটের সহিত যোগ হইয়াছে, তাহাকে মহাদ্বার ঘাট কহে। এই মহাদ্বার দিয়া মন্দিরে যাইতে ১২টী সিঁড়ি চড়িয়া যাইতে হয়। ১ম সিঁড়িতে ইঠোবা দেবের ভক্ত, নামদেবের পিতলের মুখ বসান আছে। মহাদ্বারের উপরেই নহবৎখানা। ভিতরে শ্রীইঠোবাদেবের মন্দির। ইহা অতি সুন্দর কারুকার্য্যে নির্ম্মিত, দেখিতে অতি সুন্দর। শ্রীরুক্মিণী দেবীর মন্দিরের কার্য্যও সুন্দর, কিন্তু মন্দিরটি একটু ছোট। ইহা ভিন্ন সত্যভামা, শ্রীরাধা, লক্ষ্মীদেবী এবং ভ্যাঙ্কটরমণ (শ্রীকৃষ্ণ), চৌরাশি দেবী, তেত্রিশ কোটি দেবতা, কাশী বিশ্বেশ্বর, রামেশ্বর, অমৃতেশ্বর, অন্নপূর্ণা দেবী, গরুড়, গণেশ ইত্যাদি অন্যান্য দেব দেবীর মন্দির এবং মূর্ত্তিও স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীইঠোবার মন্দিরের সম্মুখে পাথরের একটী দালান। উহার মেজে

মারবেল পাথরে বাঁধান, এবং ছাদ পাথরের ষোলটী থামের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহার ভিতর একটী থাম আবার সোণা ও রূপার পাতে মোড়া এবং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গরুড়ের মূর্ত্তি আঁকা আছে। উহাকে গরুড়-স্তম্ভ কহে। শ্রীইঠোবা দর্শন করিতে যাইবার সময় গরুড়স্তম্ভ স্পর্শ করিয়া দক্ষিণা দিতে হয়। দক্ষিণার কোন হার বাঁধা নাই। যাহার যেমন ক্ষমতা সে সেইরূপ দেয়, কেহবা এক পয়সাও দিয়া থাকে। তাহার পরেই আট ফুট লম্বা, আট ফুট চওড়া একটী ছোট ঘর। ঐ ঘরের দরজা রূপার পাতে মোড়া। এখানে রূপার সিংহাসনের উপর শ্রীইঠোবা দেবের মূর্ত্তি, কানে মকর কুণ্ডল, দুই হাতে শঙ্খ চক্র, কোমরে হাত রাখিয়া ইটের মত চৌকোনা একখানি পাথরের উপর দণ্ডায়মান আছেন।

ঘরের ভিতর হাওয়া প্রবেশের কোন উপায় না থাকায় দেয়ালে একটী ছিদ্র করিয়া লোহার নল বাহির হইতে ভিতরে আনা হইয়াছে; গ্রীষ্মকালে যখন খুব যাত্রীর ভিড় হয়, তখন বাহিরে ঐ নলের মুখে হাওয়া করিয়া ভিতরে হাওয়া প্রবেশ করান হয়। ভিড়ের সময় লোকের ধাক্কা পাছে ঠাকুরকে লাগে, এইজন্য মাঝখানে একটী রূপা মোড়া আড়-গড়া আছে। ঐ আড়গড়ার নীচে দিয়া মানুষ যাইয়া দেব দর্শন করে। একজনের দর্শন শেষ হইলে সে বাহিরে আসে এবং অন্যে যায়। এখানে সমস্ত দিন রাত্র ছয়টী প্রদীপ জ্বলে। ইঠোবাজীর পোশাক মহারাষ্ট্রদেশীয় লোকের মত, মাথায় পাগড়ী, ধুতি পরান এবং গলায় চাদর, এইরূপ পোশাক রোজ থাকে। উৎসবের সময় রকম রকম পোশাক, সোণার মুকুট ইত্যাদি পরান হয়। শ্রীইঠোবা দেবকে অনেক রাজা ও ধনিলোকে মণিমুক্তার অনেক অলঙ্কারাদি দিয়াছেন। শুনিলাম, ঐ সব অলঙ্কারের মূল্য দুই তিন লক্ষ টাকা হইবে। দেব দর্শনে পূজার উপকরণ—ধূপ, কর্পূর, নারিকেল বুকনি, (এক রকম কাল গুঁড়া সুবাসিত), ফুলের মালা তুলসীপত্রের মালা, মিষ্টান্ন (পেঁড়া কিম্বা মিছরি) ইত্যাদি লইয়া যাইতে হয়। ঐ সমুদয় দ্রব্য মহাদ্বারে পাওয়া যায়। পূজার পর দক্ষিণা দুই দফা দিতে হয়, কারণ, পূজারীরা দুই দল আছে।

ইঠোবাজীর দর্শনের পর রুক্মিণী দেবীর দর্শন। সেখানেও পূজার উপকরণ ঐরূপ, কেবল বেশীর ভাগ সিন্দূর ও কুঙ্কুম লইয়া যাইতে হয়।

দক্ষিণা পূর্ব্বের ন্যায় দুই স্থানে দিতে হয়। এখানেও রূপার আডগড়াও আছে। বাকি যত দেবমন্দির আছে, তাহাতে এক এক পয়সা দিয়া দর্শন করিলেই হয়। চৌরাশি দেবীর নিকট পাণ্ডারা যাত্রীদের পিঠ ঘসিতে বলে। বলে, ঐখানে পিঠ ঘসিলে চৌরাশি নরক হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

ইঠোবা দেবের সাতজন সেবাইত আছে, ইঁহারা ব্রাহ্মণ। ভোরে চারিটার সময় প্রথমে দুধে স্নান। তারপর গরমজলে স্নান, (কারণ এ দেশে কেহ ঠাণ্ডাজলে স্নান করে না) নাহাইয়া, মাখন মিছরি ভোগ এবং মঙ্গল আরতি হইয়া থাকে। বেলা দশটার সময় পূজা এবং দুপুর বেলা ভোগ ও আরতি হয়। সন্ধ্যার সময়, সন্ধ্যা আরতি, ভোগ ও শয়ন আরতি হয়। রাত্রে শয়ন আরতি হইলে, শ্রীইঠোবা দেবের মন্দির হইতে শয়ন ঘর পর্য্যন্ত একখানি কাপড় বিছায়। একজন একটি মশাল লইয়া শয়ন ঘর পর্য্যন্ত যায়। ইহাই ঠাকুরের শয়ন। রুক্মিণী দেবীতে ঐরূপ সমুদয় পূজা হয়। ভোর তিনটা হইতে রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত মন্দিরে কীর্ত্তন, ভজন, পুরাণ পাঠ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

এখন তীর্থযাত্রীদের কর্ত্তব্য নিয়মগুলি বলি। প্রথমে আসিয়া নদীতীরে কেহ কেহ শ্রাদ্ধ তর্পণ, ক্ষৌর কর্ম্ম, গোদান প্রভৃতি করিতে ইচ্ছা করেন। ঐ সকল সমাপন করিয়া বিষ্ণুপাদে পিণ্ডদান করেন। পরে, চন্দ্রভাগায় স্নান করিয়া পুণ্ডলিকের দর্শন করিয়া পণ্ডরিনাথ ইঠোবার দর্শন করেন এবং ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি করাইয়া থাকেন।

গোপালপুরে মুরলীধর এবং ভীষ্মকরাজের মন্দির আছে। এখানে জন্মাষ্টমীতে উৎসব হয়। প্রত্যেক মাসের শুক্ল একাদশীতে প্রায় ৮।৫ হাজার যাত্রী আসে। তার মধ্যে আবার মাঘ ও কার্ত্তিক মাসে বেশী উৎসব ও ভিড় হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসের শয়ন একাদশীতেও এখানে মহোৎসব হয়। শুনিলাম, ঐ সময় প্রায় দেড় লক্ষ যাত্রী জমা হইয়া থাকে। এখানে তিন চার স্থানে অন্নসত্র ও সদাব্রত আছে। অনুসন্ধানে জানিলাম, ঐ সকল সিন্ধের সরকার, হোলকর, সাঙ্গলিকর প্রভৃতি অন্যান্য ধনী লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যাত্রীদের থাকিবার জন্য ২০০ শতের অধিক ধর্ম্মশালা আছে।

এখানে আরো অনেক দেবালয় আছে। যথা, দত্তাত্রেয়, রামসীতা, মুরলীধর, মল্লিকার্জ্জুন, ব্যাসদেব, কোটেশ্বর, গণপতি, পঞ্চমুখী মারুতি, উদ্ধব, ও অম্বাদেবীর মন্দির। লখুবাই এর মন্দিরটি, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যেখানে রুক্মিণী

দেবীর দেখা হয়, সেইখানে স্থাপিত। ইহাকে লক্ষ্মীতীর্থও কহে। কুণ্ডল তীর্থটি কূয়ার মত একটী কুণ্ড। এইখানে শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিবার জন্য কাণের কুণ্ডল খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাদের ভিতর পদ্মাবতী দেবীর মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা, ১২০০ ফিট লম্বা ও ৪৫০ ফিট চওড়া একটী পুষ্করিণীর মধ্যে নির্ম্মিত। পুষ্করিণীর চারি দিকে ঘাট বাঁধান। মন্দিরে যাবার রাস্তা, পুলের মত বাঁধা। ইহা ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তৈয়ার হইয়াছে। পুকুরে এখন বারমাস জল থাকেনা, কেবল বর্ষাকালে জলে পূর্ণ হয়। এখানে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় ৯দিন ধরিয়ামেলা হয়। এখানে রামানুজ মতের শ্রীবৈষ্ণবদের একটি মঠও আছে। তথায় অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। যাঁহার মঠ, সেই সাধুর বয়স ১০০ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মঠের ভিতরে একটী মন্দিরে শ্বেত পাথরের রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি আছে। ঐ মঠেও একটি সদাব্রত ও অন্নছত্র আছে, কিন্তু উহা কেবল রামানুজমতাবলম্বী বৈষ্ণব বাবাজীদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত।

বিবেকানন্দাষ্টকম্।

স্বামিনং শ্রীগুরুং নত্বা বিবেকানন্দমব্যয়ং।
স্তোত্রমেতৎ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥

ওঁকার-পবিত্রা-বিশুদ্ধ মূর্ত্তিং
বন্দে নিরস্কেন্দুবিনোদ-কান্তিম্।
বিবেকসংমোদহৃতাবিরদ্বং
ভবাব্ধি-পোতং প্রণমামি দেবম্॥১॥

নটবর-নিভরূপং নন্দি-নাথ-প্রশান্তং
নলিন-নয়নমগ্রাং মোক্ষসংসর্গহেতুম্।
নিখিল-মনুজপালং সংশরণ্যং দয়ালুং
তমহমজবিবেকানন্দ-দেবং প্রপদ্যে॥২॥

মোহান্ধতমসচ্ছেদং শারদেন্দু-শত-প্রভম্।
ভাস্বরং হৃদয়াকাশে বন্দে সত্য-সনাতনম্॥৩॥

বিষম-বিষয়-বাণৈর্বিদ্ধ-সংলুপ্তবুদ্ধিং
সকল-ভবজনং যশ্চাবলোক্যার্দ্রচিত্তঃ।
জনন-মরণ-দুঃখং প্রাপ্তবোধঃ প্রসেহে,
তমহমজবিবেকানন্দ-দেবং প্রপদ্যে ॥৪॥

বেদাদি শব্দ-সামগ্রী-বস্তুবাজী-মহোদধিম্।
স্মরামি সংস্থিতি-শ্রেয়ঃসম্পত্তিমক্ষরং গুরুম্ ॥৫॥

কারুণ্যকল্পদ্রুম-চারু-রূপং
গুরুং প্রপদ্যে ভব-তাপ-নাশম্।
বিরাজমানং হৃদি রম্য-বেশং
মূর্ত্তং বিবেকং শরণং চ নাথম্ ॥৬॥

নং দ-শ্রীরামকৃষ্ণাখ্য-ব্রহ্মশিষ্যং মুদাকরম্।
দাসোঽহং সততং বন্দে বিবেকানন্দমক্ষরম্ ॥৭॥

যম-ভয়-লয়-কারী যো বিভর্ত্তৈবমূর্ত্তিং
বহুরপি ভুবনে যঃ সর্ব্ব লোকৈক-বন্ধুঃ।
অচল-গুরু-স্নমেরোর্ধীরতা যত্র ভাতি
তমহমজ-বিবেকানন্দ-দেবং প্রপদ্যে ॥৮॥

শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ-স্বামিপাদ-শিষ্যেণ
শ্রীশরচ্চন্দ্রদেবশর্ম্মণা বিরচিতমেতৎ
স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

বঙ্গানুবাদ।

অব্যয় বিবেকানন্দ গুরু কবি নমস্কার।
সর্ব্বপাপপ্রণাশন বলিব এ স্তোত্রসার ॥
পবিত্র-প্রণব-শুদ্ধ-প্রকটিত-কলেবর।
বন্দি সে বিনোদকান্তি নিষ্কলঙ্ক শশধর ॥
ষড়রিপু হীনবল বিবেকবিচারে যাঁর
ভবসিন্ধুপোতরূপী গুরুদেবে নমস্কার ॥১॥
নটবর নিভরূপ সদাশিব শান্তিময়
প্রধান, নলিননেত্র মুক্তিহেতু অসংশয় ॥

নিখিল পালক যিনি শরণ্য দয়ালু অতি
জন্মহীন শ্রীবিবেকানন্দ পদে মোর নতি ॥২॥
শারদেন্দুশতপ্রভ উদ্ভিন্ন মোহ আঁধার
হৃদাকাশে দীপ্ত সত্য সনাতনে নমস্কার ॥৩॥
বিষম বিষয় বাণে বিদ্ধ লুপ্তবুদ্ধিবল
ক্ষুণ্ণমন— হেরি যিনি নিখিল এ ভূমণ্ডল
জ্ঞানরূপ তবু সহে জন্মমৃত্যুদুঃখভার
জন্মহীন হেন গুরু পদে কোটি নমস্কার ॥৪॥
বেদাদি অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারের রত্নাকর।
সংসারের সার যিনি নমি সে গুরু অক্ষর ॥৫॥
করুণার কল্পতরু মোহন মূরতি যাঁর।
ভবতাপবিনাশন গুরুদেবে নমস্কার ॥
হৃদিশতদলে তিনি দীপ্তিমান্ রম্যবেশ।
বিবেক সুমূর্ত্তিমান শরণ্য মম প্রাণেশ ॥৬॥
সদানন্দ রামকৃষ্ণব্রহ্মশিষ্য রাঙ্গাপায়
এ দাসের কোটিনতি যিনি ভূমানন্দকায় ॥৭॥
বহুরূপ হয়ে যিনি নিত্য একমূর্ত্তিধর
নিখিল জনের বন্ধু দূরকারী যমডর
অচল গুরু সুমেরু ধীরতা যাঁহাতে স্থিতি
জন্মহীন হেন গুরু পদে মোর কোটিনতি ॥৮॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ভাগলপুরে ভয়ানক প্লেগের প্রকোপ হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির কয়েকজন যুবক মিলিয়া ভাগলপুরে যাইয়া প্লেগ নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যেখানে যেখানে কার্য্য করিতেছেন, তথায়ই প্লেগের প্রকোপ অনেক কমিয়া যাইতেছে।

স্বামী ত্রিগুণাতীত ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সান্‌ফ্রান্সিস্কো হইতে লিখিতেছেন,—

"গত ২০শে ফেব্রুয়ারিতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মমহোৎসব হইয়া গিয়াছে। অনেকেই ভাল ভাল ফুল পাতা প্রভৃতি আনিয়াছিলেন। দুইটী হল-ঘর ভক্তবৃন্দের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তদ্ব্যতীত অনেককে স্থানাভাবে বাহিরে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। এই দিন সকলেই বাটীতে বিশেষ ভাবে ধ্যানজপাদি করিয়াছিলেন। সভায় আমি Psychic powers অর্থাৎ যোগবল সম্বন্ধে এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করি। এখানকার যাবতীয় ভক্তকে সংস্কৃত নাম দেওয়া হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মমহোৎসব উপলক্ষে (যাঁহারা সংস্কৃত নাম পান নাই) তাঁহাদিগকে সংস্কৃত নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এখানকার প্রায় সকল ভক্তই রুদ্রাক্ষ মালা জপ করিয়া থাকেন এবং প্রত্যহ প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া আমাদের মত ধ্যান করিয়া থাকেন। অনেক ভক্ত এখানে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন।

সংস্কৃত নাম দেওয়ার পর পরমহংসদেব যে সকল গান গাহিতেন, তাহার মধ্যে একটী গান এখানকার একটী ভক্ত পিয়ানোর সঙ্গে গান। পরে সুমধুর সঙ্গীতস্বরে প্রণবধ্বনি করা হয়। তাহার পর ধ্যান, পরে পুনরায় প্রণবধ্বনি। তৎপরে 'The life of the great Indian prophet of the Age'. অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের মধ্যে ভারতের প্রধান অবতারের জীবনী সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করি।

এখানে এই মহোৎসব উপলক্ষে অনেকে পূর্ব্ব দিবসের বেলা দ্বি-প্রহর হইতে পরদিবস বেলা ৯ টা পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস করিয়াছিলেন।"

বিগত ১২ই মাঘ তারিখে আলোচনা সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সিটিকলেজ হলে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ধর্ম্মপ্রচার" নামধেয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা বিগত চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটীর মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুর ব্যাকুলতা এবং ধর্ম্ম-সমাজের কৃত্রিমতা ও অনুদারতার আবেগময় প্রতিবাদধ্বনি দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীমুখনির্গত অনেক বাণীর প্রতিধ্বনিও ইহাতে দেখিতে পাইলাম। আমরা কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ প্রবন্ধটী পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

"প্রচার করিলেই তবে ধর্ম্মরক্ষা হইবে, তাহা নহে, ধর্ম্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।"

"আধ্যাত্মিক সত্যকে যে ব্যক্তি সাধনার দ্বারা জীবনের মধ্যে লাভ না করিতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি এই সত্য প্রচারের ভার লইলে কেবল যে প্রচারকার্য্য ব্যর্থ হয়, তাহা নহে; সত্য ম্লান হয়, সত্য অসত্য হইয়া উঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে ধর্ম্মপ্রচারের অধিকার সম্বন্ধে আমরা বড় অধিক চিন্তাই করি না।"

"ব্রাহ্ম সমাজও কি প্রাচীন নামের সহিত আধুনিক অসঙ্গতি যোগ করিয়া আর এক নূতন প্রহসনের অবতারণা করিবেন?"

"আমরা যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মনামে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া হিন্দু সমাজের অপর অংশকে সেই চিহ্নের সাহায্যেই ব্রহ্মের স্থান হইতে বঞ্চিত করি, তবে ব্রহ্মের নাম লইয়া ব্রহ্মকেই দূরবর্ত্তী করিয়া রাখি।"

"ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে আজকাল যে অপরিতৃপ্তি, যে অসন্তোষের ভাব সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ,—ব্রাহ্ম সমাজ দীর্ঘকাল ভাঙনের কাজেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছে, গড়নের কাজে মন দিতে পারে নাই।"

"আমি জানি, হিন্দুসমাজে যাঁহারা ব্রাহ্মনাম ধারণ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রীতির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মঙ্গলকর্ম্ম দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা, পবিত্র জীবনের দ্বারা সংসারের মধ্যে ব্রহ্মকে সত্য ভাবে স্বীকার ও উপলব্ধি করিতেছেন।"

ইত্যাদি। ইত্যাদি।

এই পক্ষ হইতে উদ্বোধন মাসে দুইখানি একত্রে প্রেরিত না হইয়া প্রতিপক্ষে একখানি করিয়া পাঠান হইতেছে। একখানি ১লা ও অপরখানি ঠিক ১৫ই তারিখে প্রকাশিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইবে। উদ্বোধন পাক্ষিক পত্র হইলেও উহা 'Registered Newspaper' শ্রেণীতে পরিগণিত না থাকায় পোষ্টেজ বেশী লাগিত। এক্ষণে পোষ্টমাষ্টার জেনেরাল মহাশয়ের অনুগ্রহে উহা উক্ত সুবিধা ভোগে সমর্থ হওয়ায় আমরা উদ্বোধন প্রতিপক্ষে গ্রাহকগণকে দিতে সমর্থ হইব। ইহাতে আমাদের আর্থিক সুবিধা কিছুই হইবে না। বরং আমাদের পরিশ্রমের কিছু বৃদ্ধি হইল। আরও, এই সংখ্যায় গ্রাহকগণের দেশ ভ্রমণের ঔৎসুক্য

বৃদ্ধির জন্য পণ্ডরপুর নামক একটী বোম্বাই প্রদেশস্থ অপরিচিত তীর্থের বিবরণ এবং তথাকার মন্দিরাদির চিত্র বহুব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়া সন্নিবেশিত করিলাম। আশা করি, আমাদের গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে তাঁহাদের এই প্রিয় পত্রিকার প্রচার করিয়া বাধিত করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংবাদ পাইয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের নাম লইয়া অনেক ব্যক্তি নানাস্থানে সাধারণকে প্রতারণা করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছে। তিনি বিশেষ বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের (Ramkrishna Home of Service) নাম লইয়া জনৈক ব্যক্তি অর্থসংগ্রহ করিতেছে ও সেই অর্থ সেবাশ্রমের কার্য্যে ব্যবহার না করিয়া তদ্দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে। এই কারণে তিনি বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সাধারণের বিশেষ অবগতির জন্য ঘোষণা করিতেছেন যে, যদি কোন ধর্ম্মপ্রচারক বা সাধারণের হিতার্থে কোন শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনি সন্ন্যাসীই হউন বা গৃহীই হউন, রামকৃষ্ণ মিশনের শিলমোহর ও বেলুড়মঠের গোপনীয় শিলমোহরযুক্ত, বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষরিত পত্র দেখাইতে না পারেন, তবে বুঝিতে হইবে, তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সংস্রব নাই এবং তাঁহার উপর উক্ত মিশনের জন্য কোন রূপ অর্থ বা চাঁদা সংগ্রহের ভার নাই।

স্বামী-শিষ্য-সংবাদ।

(ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত)

শিষ্য। স্বামীজি, এক ব্রহ্মই যদি সত্য হয়, তবে জগতে এই বিচিত্রতা কেন?

স্বামীজি। সৃষ্টি দেখে ত বিচার কচ্ছিস? সৃষ্টির দিক্ দিয়ে চেয়ে দেখ্‌লে বিচারপথে ক্রমে একত্বমূলে পৌঁছান যায়। আর যদি একত্বে অবস্থিত হইয়া থাকিস, তবে সে দিক্ দিয়ে চেয়ে দেখ্‌লে বিচিত্রতা কি রূপে দেখ্‌বি, বল দিকি।

শিষ্য। যদি একত্বেই অবস্থিত হতেম, তবে 'কেন' এই প্রশ্নই বা কর্‌ব কিরূপে? আমি বিচিত্রতা দেখে যখন 'কেন' এই প্রশ্ন কচ্ছি, তখনি অবশ্য মেনে নিচ্ছি।

স্বামীজি। বেশ কথা। সৃষ্টির বিচিত্রতা দেখে, একত্বের মূলানুসন্ধান করাকে শাস্ত্রে ব্যতিরেকী বিচার বলে। অর্থাৎ অভাব বা অসত্য বস্তুকে ভাব বা সত্য বস্তু বলে ধরে নিয়ে বিচারযোগে দেখান যে, সেটা ভাব নয়, অভাব বস্তু। তুই ত মিথ্যাকে [illegible] ধরে সত্যে পৌঁছানোর কথা বল্‌ছিস্—না?

শিষ্য। আমি ত ভাবকেই সত্য বল্‌ছি, আমার পক্ষে নানাত্বই বরং মিথ্যা বোধ হচ্ছে।

স্বামীজি। তোর বেদও বল্‌ছে,—একমেবাদ্বিতীয়ম্। যদি বস্তুতঃ এক ব্রহ্মই আছেন, তবে তোর নানাত্ব ত মিথ্যা হচ্ছে। বেদ মানিস্ ত?

শিষ্য। বেদের দোহাই আমি দি বটে। কিন্তু যদি কেউ না মানে, তাকেও ত নিরস্ত কর্ত্তে হবে।

স্বামীজি। তাও হয়। দেখ্, এই তুই যাকে বিচিত্রতা বল্‌ছিস, তা এক সময় লুপ্ত হয়ে যায়, অনুভব হয় না। আমি নিজের জীবনে তা প্রত্যক্ষ করেছি।

শিষ্য। কখন করেছেন?

স্বামীজি। এক দিন ঠাকুর বাগানে আমায় ছুঁয়ে দিয়েছিলেন; তা প্রথম দেখ্‌লুম, ঘরবাড়ী, দোর, দালান, গাছপালা, চন্দ্র, সূর্য্য সব উড়ে

যাচ্ছে—চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে—অণু পরমাণু হয়ে আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও লয় পেয়ে গেল—তার পর আর কিছুই স্মরণ নাই ; ভয় হয়েছিল—ক্রমে আবার দেখ্‌লুম,—ঘরবাড়ী, দোর, দালান। আর একদিন—আমেরিকায় একটা lake এর ধারে ঠিক ঐরূপ হয়েছিল।

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল—"আচ্ছা এ অবস্থা মস্তিষ্কের বিকারেও তো হতে পারে ; আর ঐ অবস্থাতে আনন্দই বা কি?"

স্বামীজি। ইহা মস্তিষ্কের বিকার? বিকার কি করে বল্‌বি? যখন রোগের খেয়াল নয়, নেশা করে নয়, রকমবিরকমের দম টেনেও নয়, সহজ মানুষের সুস্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে? আবার এ কথা বেদের সঙ্গেও মিল্‌ছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য ও ঋষিগণের আপ্ত-বাক্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমায় কি শেষে তুই বিকৃতমস্তিষ্ক ঠাওরালি?

শিষ্য। না, তা আমি বল্‌ছি না। যখন শাস্ত্রে শতশঃ এরূপ একত্বানু-ভূতির দৃষ্টান্ত রয়েছে ও আপনি যখন বল্‌ছেন যে, ইহা করা-মলকবৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং আপনার অপরোক্ষানুভূতি, যখন ইহা বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বাক্যের অবিসম্বাদী, তখন ইহাকে মিথ্যা বল্‌তে সাহস হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—ক্ব গতং কেন বা নীতং ইত্যাদি।

স্বামীজি। জান্‌বি,—এই একত্বজ্ঞান—যাকে তোদের শাস্ত্রে বলে ব্রহ্মানুভূতি—তা হলে জীবের আর ভয় থাকে না—জন্মমৃত্যুর পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। এই হেয় কামকাঞ্চনে বদ্ধ হয়ে জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ কত্তে পারে না। সেই পরমানন্দ পেলে জগতের সুখ দুঃখে জীব আর অভিভূত হয় না।

শিষ্য। যদি তাই হয়, এবং আমরা যদি যথার্থ পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপই হয়ে থাকি, তা হলে সে সুখলাভে আমাদের যত্ন হয় না কেন? আমরা সামান্য কামকাঞ্চনের প্রলোভনে পড়ে বার বার মৃত্যুমুখে ধাবমান্ হচ্ছি কেন?

স্বামীজি। তুই মনে কচ্ছিস, জীবের বুঝি সে শান্তিলাভে আগ্রহ নাই?

ভেবে দেখ্, যে যা কচ্ছে, তা সেই ভূমা সুখের আশায়। তবে সকলে তা বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছে না। সে পরানন্দ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে পূর্ণভাবে রয়েছে। তুইও সেই পূর্ণব্রহ্ম। এই মুহূর্ত্তে ঠিক ঠিক ভাব্‌লেই অনুভূতি হয়। কেবল অনুভূতির অভাব মাত্র। তুই যে চাক্‌রী করে মাগের জন্য এত খাট্‌ছিস্, তার উদ্দেশ্যও সেই সচ্চিদানন্দলাভ। ক্রমশঃ এই মোহের মার খেঁচে পড়ে পড়ে স্ব স্বরূপে নজর আস্‌বে। বাসনা আছে বলেই ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়্‌বে। সকলেরি এক সময় পড়্‌বেই পড়্‌বে। কারো এজন্মে কারো বা লক্ষ জন্মে।

শিষ্য। আপনার আশীর্ব্বাদ ও ঠাকুরের কৃপা না হলে হবে না।

স্বামীজি। ঠাকুরের কৃপা-বাতাস্ ত বইছেই। তুই পাল তুলে দেনা। যখন যা করবি, খুব একান্তমনে কর্‌বি। দিনরাত ভাব্‌বি, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আমার আবার ভয় ভাবনা কি? এই দেহ মন বুদ্ধি সবিই ক্ষণিক—এর পারে যা, তাই আমি।

শিষ্য। এই ভাব ক্ষণিক আসে; আবার তক্ষুনি উড়ে যায়—ছাই ভস্ম ভাবি।

স্বামীজি। ও রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে। ক্রমে শুধ্‌রে যাবে। তবে মনের খুব তীব্রতা চাই। এই ভাব্‌বি যে, আমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব, আমি কি আবার অন্যায় কার্য্য কত্তে পারি? আমি কি সামান্য কামকাঞ্চনলোভে পড়ে সাধারণ জীবের ন্যায় মুগ্ধ হতে পারি? মনে এমনি জোর কর্‌বি। এতে ঠিক কল্যাণ হয়ে যাবে।

শিষ্য। এক একবার মনের বেশ জোর হয়। আবার ভাবি, ডেপুটি পরীক্ষা দিব—ধন মান হবে, বেশ মজায় থাক্‌ব।

স্বামীজি। মনে যখন ওসব আস্‌বে, তখুনি বিচার করবি, তুইত বেদান্ত পড়েছিস্। ঘুমাবার সময়ও বিচারের তরোয়ালখানা শিয়রে রেখে ঘুমুবি, যেন স্বপ্নেও লোভ সাম্‌নে না এগুতে পারে। এইরূপ জোর কত্তে কত্তে ক্রমেই বৈরাগ্য আস্‌বে—তখনি দেখ্‌বি, স্বর্গের দ্বার খুলে গেছে।

শিষ্য। আচ্ছা স্বামীজি। ভক্তিশাস্ত্রে যে বলে, বেশী বৈরাগ্য হলে ভাব থাকে না?

স্বামীজি। আরে ফেলে দে তোর সে ভক্তিশাস্ত্র, যাতে ও রকম কথা আছে। বৈরাগ্য—বিষয়বিতৃষ্ণা—না হলে কাকবিষ্ঠার ন্যায় কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না কর্‌লে, "ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি", ব্রহ্মার কোটিকল্পেও জীবের মুক্তি নাই। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপস্যা কেবল বৈরাগ্য আন্‌বার জন্য। তা যার হয়নি, তার জান্‌বি,— নোঙ্গর ফেলে নৌকার দাঁড় টানার মত হচ্চে। "ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ত্বমানশুঃ"।

শিষ্য। কামকাঞ্চন ত্যাগ হলেই কি সব হ'ল ?

স্বামীজি। ও দুটো ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন। তার পর আসেন লোকখ্যাতি। সেটা যে সে লোক সাম্‌লাতে পারে না। লোক মান দিতে থাকে, নানা ভোগ এসে জোটেন। এতেই ত্যাগীদের মধ্যে ১২ আনা বাঁধা পড়েন। এই যে মঠ মঠ কর্‌ছি, কে জানে, আমাকেই বা আবার আস্‌তে হয়।

শিষ্য। আপনিই এ কথা বল্‌ছেন্—তবে আমরা ত গিছি।

স্বামীজি। ভয় কি ? "অভীরভীরভীঃ"। নাগ মহাশয়কে দেখেছিস ত ? এত সংসার চালে চলেও সন্ন্যাসীর বাড়া। এমনটা বড় দেখিনি। গেরস্থ যদি কেউ হয় ত, যেন নাগ মহাশয়ের মত হয়। তোদের পূর্ব্ববঙ্গ আলো করে বসে আছে। ওদেশের লোক্‌দের বল্‌বি, যেন তাঁর কাছে যায়। তা হ'লে তাদের কল্যাণ হবে।

শিষ্য। নাগ মশায় রামকৃষ্ণলীলার জীবন্ত দীনতা।

স্বামীজি। তা একবার বলতে!!! আমি তাঁকে একবার দর্শন কত্তে যাব—তুইও যাবি ? আমি জলে জলে ভেসে গেছে, এমন মাঠ দেখ্‌ব। তুই লিখিস।

শিষ্য। আমি লিখে দিব। আপনার কথা শুনে তিনি উন্মাদ। বলেন, পূর্ব্ববঙ্গ আপনার চরণধূলিতে তীর্থ হয়ে যাবে।

স্বামীজি। জানিস, নাগ মহাশয়কে ঠাকুর বল্‌ত জ্বলন্ত আগুণ।

শিষ্য। তা শুনেছি।

স্বামীজি। অনেক রাত হয়েছে, তবে এখন আয়। না—কিছু খেয়ে যা।

শিষ্য। যে আজ্ঞে।

কিছু প্রসাদ পাইয়া শিষ্য কলিকাতা যাচ্ছেন আর ভাব্‌ছেন, 'আমি

মুক্ত', এ অভয়বাণী যিনি শুনালেন, ইনিই কি সেই জ্ঞানমূর্ত্তি সাক্ষাৎ শঙ্কর?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গে অকালমৃত্যু।

মসূরিকা বা বসন্তরোগ।

(ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ, এম, বি।)

নরকুলক্ষয়কর রোগ সকলের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। ইহার স্পর্শে সুন্দর দেহ কুৎসিতাকার ধারণ করে, জীবিত শরীরে মৃতের পূতিগন্ধ নিঃসৃত হয়; ব্যাধিচিহ্নিত পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে জননীরও বিভীষিকা উপস্থিত হয়। ভারতের ইতিহাসে ইহার ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী মহামারীর কথা আর শুনা যায় না। পূর্ব্বে যখন ইহার আবির্ভাব হইত,

হাহাকারা অথোর্ব্বী মনুজভয়করী ফেরুরাবশ্চ ভীমৈঃ
শূন্যগ্রামাভবেয়ুঃ নরপতিরহিতা ভূবিকঙ্কালমালা।

তখন পৃথিবীতে হাহাকার ধ্বনি, ফেরুপালের নরভীতিকর ভীষণ রব চতুর্দ্দিকে শুনা যাইত এবং গ্রামসকল লোকশূন্য, রাজ্য নরপতিশূন্য ও দেশ কঙ্কালমালায় পরিপূর্ণ হইত। কি দোষে মনুষ্যকুল এরূপ মহারোগে অভিভূত হয়? কি অপরাধেই বা বিস্তীর্ণ জনপদ ইহার স্পর্শে লোকশূন্য হইয়া যায়, এই মৃত্যুসহচরের দারুণ ক্ষুধানলই বা কিসে নির্ব্বাপিত হইতে পারে, সাধারণ মানববুদ্ধিতে এই সকল প্রশ্নের কেবল এক মীমাংসাই সম্ভব। এই অপ্রতিহতশক্তি মহারোগের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও নিবারণ একমাত্র দেব-ইচ্ছার অধীন। যাহা মানুষের আয়ত্তাধীন নহে, দেবশক্তি ভিন্ন তাহার নিয়ামক আর কে হইতে পারে? সাধারণ বিশ্বাস সমর্থন করিয়া শাস্ত্র বলিলেন,

দেব্যা শীতলয়া কান্ত্যা মসূরৈর হি শীতলা।
জ্বরায় চ যথা ভূতাধিপতো বিষমজ্বরঃ॥

বিষমজ্বর—ম্যালেরিয়া মহামারী—যেরূপ ভূতাধিষ্ঠিত, তদ্রূপ মসূরিকা-গ্রস্ত রোগী শীতলা দেবী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

স্কন্দপুরাণে শীতলা ধ্যান বর্ণিত আছে। কার্ত্তিকেয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

ভগবন্দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটকভয়াপহম্॥

হে দেবের দেব ভগবন্, বিস্ফোটকের ভয়নাশক, মনুষ্যের কল্যাণকারী শীতলাস্তব বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করুন।

ঈশ্বর উবাচ।

বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাম্ দিগম্বরীম্।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥
শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি॥
যস্তামুদকমধ্যে তু ধৃত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং কুলে তস্য ন জায়তে॥
শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধগতস্য চ।
প্রণষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহুর্জীবিতৌষধম্॥
নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥

অস্য শ্রীশীতলাস্তোত্রস্য মহাদেব ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শীতলা দেবতা শীতলোপদ্রবশান্ত্যর্থে জপে বিনিযোগঃ।

শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্তরান্।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥
গলগণ্ডগ্রহারোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্।
তদনুধ্যানমাত্রেন শীতলে যান্তি তে ক্ষয়ম্॥
ন মন্ত্রং নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমকা শীতলে ধাত্রি নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্॥
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্।
যস্তাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি তস্য মৃত্যুর্ণ জায়তে॥
অষ্টকং শীতলাদেব্যা যঃ পঠেন্মানবঃ সদা।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং কুলে তস্য ন জায়তে॥

শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ নরৈর্ভক্তিসমন্বিতৈঃ।
উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥
শীতলাষ্টকমেতদ্ধি ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
কিন্তু তস্মৈ প্রদাতব্যং ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ ॥

স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড।

ঈশ্বর বলিতেছেন,—যাহাকে প্রাপ্ত হইলে বিস্ফোটকের মহাভয় নিবার্ত্তিত হয়, সেই গর্দ্দভবাহিনী দিগম্বরী শীতলা দেবীকে নমস্কার করি। যে শীতলা শীতলা উচ্চারণ করে, তাহার দাহসংযুক্ত ঘোর বিস্ফোটক ভয় শীঘ্র নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি জলমধ্যে ধারণ করিয়া শীতলা পূজা করে, তাহার বংশে বিস্ফোটক ভয় থাকে না। হে শীতলে, যে ব্যক্তি জ্বরদগ্ধ ও পূতিগন্ধযুক্ত, যাহার (স্ফোটকদ্বারা) চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, তুমিই তাহার জীবন রক্ষার একমাত্র ঔষধ। যিনি মস্তকে শূর্প (কুলা) ধারণ করিয়াছেন, সেই সমার্জ্জনী ও কলসীধারিণী গর্দ্দভস্থা দিগম্বরী শীতলা দেবীকে নমস্কার। শীতলা উপদ্রব প্রশমনার্থ নিম্নোক্ত শীতলা স্তোত্র জপ করিতে হয়।

হে দেবী শীতলে, মানবগণের দেহজাত কঠিন রোগ সমস্ত তুমি হরণ কর এবং বিস্ফোটক দ্বারা বিশীর্ণদেহবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একমাত্র তুমিই অমৃতবর্ষিণী। গলগণ্ডাদি অন্য যে কোন কঠিন রোগ হউক, তোমাকে স্মরণ করিলেই বিনষ্ট হয়। এই পাপ রোগের অন্য কোন প্রকার ঔষধ বা মন্ত্র নাই, হে মাতঃ শীতলে। তুমিই একমাত্র উপায়; অন্য কোন দেবতা দেখা যায় না, যিনি ইহার প্রতীকার করিতে পারেন। হে দেবি, তোমাকে মৃণালতন্তুর ন্যায় নাভি ও হৃদয়ের মধ্যদেশে স্থিতা মনে করিয়া যে ব্যক্তি ধ্যান করে, তাহার মৃত্যু হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শীতলাষ্টক পাঠ করে, তাহার বংশেও বিস্ফোটক ভয় উপস্থিত হয় না। উপসর্গ বিনাশের জন্য শীতলাষ্টক ভক্তির সহিত শ্রবণ ও পাঠ করিবে, কারণ, ইহাই পরম স্বস্ত্যয়ন। ভক্তিশ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিকে এই শীতলাষ্টক দিবে, সর্ব্বসাধারণকে দিবে না।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুযায়ী সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেও স্কন্দপুরাণের বর্ত্তমান আকার প্রচলিত ছিল। সুতরাং ভারতে শীতলা পূজার প্রাচীনতা সহজে অনুমান হইতে পারে। ইহার কত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে,

এ দেশ ভীষণ বসন্ত মহামারী কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছে, কে বলিতে পারে ?

দেবী শীতলা অধিষ্ঠিত শীতলা রোগ সাত প্রকার বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত আছে ; এবং সাধারণেরও বিশ্বাস,—শীতলা বা বসন্ত চণ্ডী এক নহেন, আদ্যাশক্তির সহচরী সপ্ত যোগিনী। বিহার অঞ্চলে ইঁহার সপ্ত ভগিনী,—ফুল মাতা, কাঁকর মাতা, বাদি মাতা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধা। ইহার মধ্যে কাঁকর মাতা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্করা। ফুল মাতা সপ্ত বর্ষের অনধিক-বয়স্ক শিশুদিগকে এবং বাদি মাতা সপ্ত হইতে পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক বালক-দিগকে পীড়া দিয়া থাকেন। অনেক স্থানে গ্রামের বহির্ভাগে একটী মণ্ডপ নির্ম্মিত ও তন্মধ্যে সাতটি মৃত্তিকাপিণ্ড সপ্ত ভগ্নীর অধিষ্ঠান স্বরূপ স্থাপিত হইয়া থাকে। দেবীর পূজায় মিষ্টান্ন ও পুষ্পাদি নিবেদিত হয়। উচ্চবর্ণে দেবীর প্রীত্যর্থ ছাগ বা কপোত ও নিম্নশ্রেণীর লোকে শূকর বলি দেয়। মারীভয় উপস্থিত হইলে কি উচ্চ কি নীচ সকল বর্ণ শূকর বলি প্রদান করে। পূজাকার্য্য দোসাদ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে শীতলাপূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া দ্বারে দ্বারে শীতলার গান গাহিয়া পূজার জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। পূজা সংগ্রহ হইলে দেবীস্থানে সকলে সমাগত হইয়া থাকে এবং পৌরোহিত্যকার্য্য স্ত্রীলোকের দ্বারাই নির্ব্বাহ হয়। এই দেশীয় চাষারেরা গোবসন্তের বিস্তৃতির জন্যও সপ্ত ভগ্নীর পূজা করিয়া থাকে।

এইরূপ মিলিত ভাবে সপ্তভগ্নী পূজিতা হইলেও শীতলা চণ্ডীর পূজাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সর্ব্বত্র ইঁহাকেই বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া স্বীকার করা হয়। বর্দ্ধমান অঞ্চলে ইনি চতুর্হস্তা ও সিংহবাহিনী। কোথাও কাষ্ঠ বা প্রস্তরখোদিত মুখমণ্ডল, তৈল ও সিন্দূর লিপ্ত এবং স্বর্ণাদি ধাতুদ্বারা স্ফোটকের অনুকরণে চিহ্নিত। যশোহরে দেবী শ্বেতবর্ণা, দিগ্‌বসনা ; উড়িষ্যায় ঘটচিহ্নে পূজিতা। খুলনার পোদজাতির ইনিই প্রধান উপাস্যা দেবী। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দেবীমূর্ত্তি মন্দিরে বিরাজিত দেখা যায় কিন্তু এ দেশে মুচি ডোম বাগ্দি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর গৃহেই প্রতিষ্ঠিতা। ইহারা মূর্ত্তি বহন করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বঙ্গদেশে অনেক আচার্য্য ব্রাহ্মণ, কুম্ভকার ও মালাকারেরা গৃহে দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিত্য পূজা

করিয়া থাকে। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্বপ্রচলিত বসন্তের টীকা দিত এবং বর্ত্তমান সময়েও পীড়ার চিকিৎসায় নিযুক্ত আছে। শীতলার পণ্ডিতেরা মসুরি, মুগ, কুলটে, বইচি, পুকুরে, বাতাসি প্রভৃতি ৬৪ প্রকার বসন্ত রোগ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহারা যেরূপ রোগ চিকিৎসায় ঝাড়ি, পাঁচন, ছোপ, নিম্বপত্রের ব্যজনাদির ব্যবস্থা করে, তদ্রূপ রোগীর শয্যার পার্শ্বে গোময়লিপ্তস্থানে শীতলামূর্ত্তি স্থাপন এবং পূজা, স্বস্ত্যয়ন, হোম, শীতলাগান প্রভৃতিও করিয়া থাকে। পূজার সাধারণ উপকরণ ব্যতীত দেবীর তুষ্টির জন্য ছাগবলি প্রদত্ত হয়। উচ্চবর্ণেরা শীতলাপূজার সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করেন।

পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসাগ্রন্থ চরক সংহিতায় মসূরিকার বর্ণনা আছে।

যাঃ সর্ব্বগাত্রেষু মসুরমাত্রা মসুরিকাঃ পিত্তকফাৎ প্রদিষ্টাঃ।
বিসর্পশান্তৌ বিহিতা ক্রিয়াযা তাং তাসু কুষ্ঠে চ হিতাং বিদধ্যাৎ॥

পিত্তকফ হইতে সর্ব্বগাত্রে মসুরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এক প্রকার পীড়কা হয়, উহার নাম মসূরিকা। ইহার চিকিৎসা বিসর্প ও কুষ্ঠের ন্যায়। মহর্ষি সুশ্রুতও মসূরিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—তাম্রবর্ণ, দাহজ্বর ও তীব্র বেদনাযুক্ত যে সকল ব্রণ সর্ব্বাঙ্গে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মসূরিকা।

কিন্তু এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে মসূরিকার ঈদৃশী বর্ণনা থাকিলেও ইহা বিস্ফোটক, রণাদি ক্ষুদ্র রোগের সমশ্রেণীতে গণিত হইয়াছে। "ন মন্ত্রং নৌষধং কিঞ্চিং পাপরোগস্য বিদ্যতে" এই নিরাশাবাক্য একালে শুনিতে পাই না এবং রোগশান্তির জন্য দেবী শীতলার আবির্ভাবেরও কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদকর্ত্তাগণ মসূরিকার বিশ্বব্যাপী সংক্রামক ও নিদারুণ সংহার মূর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণে কি অক্ষম ছিলেন বা পরবর্ত্তী কালের ন্যায় ভীষণ বসন্ত রোগ তৎকালে ছিল না? যাহা হউক, অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত মাধব করের নিদান গ্রন্থে মসূরিকার যেরূপ লক্ষণ ও ভেদাদি বর্ণিত আছে, আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে তাহারই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। নিদানকর্ত্তা লিখিয়াছেন, অপরাপর কারণের মধ্যে—দুষ্টনিষ্পাবশাকাদৈঃ প্রদুষ্টপবনোদকৈঃ—দূষিত অন্ন, বায়ু ও জল সেবনে, বাতাদি দোষ প্রকুপিত ও দুষ্ট রক্তের সহিত মিলিত হইয়া দেহে মসুরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট পীড়কা উৎপাদন করে। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাশাস্ত্র ইহাপেক্ষা এই সংক্রামক রোগের কারণ অবধারণে বড় অধিক

দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। নিদানে কফ, পিত্ত, রস রক্তস্রাব প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার মসূরিকার ভেদ বর্ণিত আছে। আয়ুর্ব্বেদমতানুযায়ী বসন্ত-রোগের এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহামারীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নরকুলের অকালমৃত্যু সাধন করিতে বসন্ত রোগের ন্যায় দ্বিতীয় আর নাই। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীনের হানরাজবংশের রাজত্ব কালে মধ্য আসিয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত, বিজয়ী সৈন্যদলের পথানুসরণ করিয়া চীনসাম্রাজ্যে ঘোর মহামারী উৎপাদন করে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে যেমেনের হাব্‌সি সম্রাট্ আবরাহেমের মক্কাঅবরোধকারী সৈন্য মধ্যে আবির্ভূত হইয়া বিজয়দীপ্ত বাহিনীকুল নির্ম্মূল করিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে হজরত মহম্মদের নবধর্ম্মদীক্ষিত আরবজাতি ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যখন ইউরোপ অভিমুখে ধাবিত হয়, খৃষ্ট ইউরোপ সে তেজে যেরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, তৎসহ সমাগত দারুণ মহামারীর আক্রমণে ততোধিক অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমেরিকা মহাদেশে বসন্তের উৎপীড়নে জাতিকে জাতি উৎসন্ন গিয়াছে। এক সময়ে মেক্‌সিকো দেশে ৩৫ লক্ষ অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৫৬৩ সালে ব্রাজিল প্রায় মনুষ্যশূন্য হইয়াছিল। যখন নৃশংস সমরানল প্রজ্বলিত ও দুর্ভিক্ষের হৃদয়ভেদী হাহাকার উত্থিত, সেই সময়ে বসন্ত চণ্ডীও লোকসংহারক লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া থাকেন। ইহার প্রভাবে রাজ্যেশ্বরের প্রাসাদ হইতে, দরিদ্রের পর্ণকুটীর সমভাবে নিপীড়িত হইয়াছে। ১৭৭০ সালের (ছিয়াত্তরের) মন্বন্তরে, বসন্ত মহামারী এরূপ প্রবলাকার ধারণ করে যে, মুরসিদাবাদের রাজপথে মৃতদেহ স্তূপাকারে ইতস্ততঃ পতিত দৃষ্ট হইয়াছিল এবং নবাবঅন্তঃপুর আক্রান্ত হওয়াতে অতিযত্নসেবিত নবাবপুত্র সাইফুদ্দ্ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ইংলণ্ডের অমর সন্তান জেনারের গোবীজটীকা প্রবর্ত্তন হইতে এই মহামারীর বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছে। যেখানে গোবীজটীকা রীতিমত প্রচলিত, বসন্ত রোগের ভয় সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। জর্ম্মাণ রাজ্যে ১৮৯৯ সালে ৪৫ লক্ষ অধিবাসীর ভিতর ২৮ জন মাত্র এই রোগে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু বঙ্গদেশে ঐ বৎসর বসন্তের প্রাবল্য না থাকিলেও ২১০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উভয়দেশের লোক সংখ্যা তুলনা করিলে, গোবীজ টীকা সত্ত্বেও বঙ্গ-দেশে জর্ম্মাণি অপেক্ষা বসন্তের মৃত্যু সংখ্যা পাঁচশত গুণ অধিক। সংক্রা-

মক রোগের নিবারণোপায় পর্য্যালোচনার সময় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

রাজপুতনার অন্তর্গত খেতড়ির মহারাজের অভিনন্দনপত্রের উত্তর।

'যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি ধর্ম্ম পুনঃস্থাপনার জন্য আবির্ভূত হই।' হে মহারাজ, এ কথাগুলি পবিত্র গীতাশাস্ত্রে সেই সনাতন ভগবানের বাক্য; এই বাক্য জগতে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রবাহের সনাতন উত্থান পতন নিয়মের মূলমন্ত্রস্বরূপ।

এই সকল পরিবর্ত্তন বার বার নূতন তালে, নূতন ছন্দে জগতে প্রকাশিত হইতেছে আর যদিও অন্যান্য মহান্ পরিবর্ত্তনের ন্যায়, তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যগত প্রত্যেক ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম বস্তুর উপর তাহারা প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তথাপি অনুকূল স্থানেই তাহাদের কার্য্যকারিতা অধিক প্রকাশ পায়।

সমষ্টিভাবে যেমন জগতের আদিম অবস্থা ত্রিগুণের সাম্যভাব, (এই সাম্যভাবের বৈষম্য ও তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সমুদয় চেষ্টা লইয়াই এই প্রকৃতির বিকাশ বা ব্রহ্মাণ্ড, যতদিন না এই সাম্যাবস্থা পুনরায় আসে, ততদিন এই ভাবেই চলিতে থাকে) ব্যষ্টিভাবে তেমনি আমাদের এই পৃথিবীতে যতদিন মনুষ্যজাতি বর্ত্তমান আকারে থাকিবে, ততদিন এই বৈষম্য ও তাহার নিত্যসহচর এই সাম্যলাভের চেষ্টা দুই পাশাপাশি বিরাজ করিবে। তাহাতে সমুদয় পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর, জাতির উপবিভাগগুলির ভিতর ও এমন কি, প্রত্যেক ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, প্রবল বিশেষত্ব থাকিবে, যাহাতে একটী হইতে আর একটাকে পৃথক্রূপে জানা যাইবে।

অতএব নিরপেক্ষভাবে যেন তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া সকলকে সমান শক্তি প্রদত্ত হইলেও প্রত্যেক জাতিই যেন কোন বিশেষ প্রকার শক্তিসংগ্রহ ও বিতরণের উপযোগী এক একটা অদ্ভুত যন্ত্র স্বরূপ আর সেই জাতির অন্যান্য অনেক শক্তি থাকিলেও সেই বিশেষ শক্তিটিই সেই জাতির বিশেষ

লক্ষণরূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়। মনুষ্যপ্রকৃতির কোন বিশেষ ভাবের বিশেষ বিকাশ ও উদ্দীপনা হইলে, তাহার প্রভাব অল্পবিস্তর সকলেই অনুভব করিলেও যে জাতির উহা বিশেষ লক্ষণ এবং সাধারণতঃ যাহাকে কেন্দ্র করিয়াই উহা উৎপন্ন হয়, তাহা সেই জাতির অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত করে। এই কারণেই ধর্ম্মজগতে কোন আন্দোলন উপস্থিত হইলে, তাহার ফলে ভারতে অবশ্যই নানাপ্রকার গুরুতর পরিবর্ত্তন হইতে থাকিবে, যে ভারতরূপ কেন্দ্র হইতে বহুবিস্তৃত ধর্ম্মতরঙ্গসমূহ বারম্বার উত্থিত হইয়াছে, কারণ, ধর্ম্মভূমি বলিয়াই ভারতের বিশেষত্ব।

প্রত্যেক ব্যক্তি তাহাকেই কেবল সত্য বলে, যাহা তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করে। সাংসারিকভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের নিকট যাহা কিছুর বিনিময়ে টাকা হয়, তাহাই সত্য, যাহার বিনিময়ে টাকা হয় না, তাহা অসত্য। প্রভুত্ব যাহার আকাঙ্ক্ষা, যাহাতে সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনা চরিতার্থ হয়, তাহার নিকট তাহাই সত্য, বাকি কিছুই নয়। এইরূপে যাহা কোন ব্যক্তির জীবনের বিশেষ প্রিয় আকাঙ্ক্ষারূপ হৃদয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি না করে, তাহাতে সে কিছুই দেখিতে পায় না।

যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য জীবনের সমুদয় শক্তির বিনিময়ে কাঞ্চন, নাম বা অপর কোনরূপ ভোগসুখের অর্জ্জন, যাহাদের নিকট সমরসজ্জায় সজ্জিত সৈন্যদলের যুদ্ধযাত্রাই একমাত্র শক্তির বিকাশের লক্ষণ, যাহাদের নিকট ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের একমাত্র সুখ, তাহাদের নিকট ভারত [illegible] একটা প্রকাণ্ড মরুর ন্যায় প্রতীয়মান হইবে; তাহারা যাহাকে জীবনের বিকাশ বলিয়া বিবেচনা করে, উহার এক এক বায়ুপ্রবাহই যেন তাহার পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ।

কিন্তু যাঁহাদের জীবনতৃষ্ণা ইন্দ্রিয়জগতের অতি দূরে অবস্থিত অমৃতনদীর সলিলপানে একেবারে মিটিয়া গিয়াছে, যাঁহাদের আত্মা সর্পের জীর্ণত্বক্‌মোচনের ন্যায় কাম, কাঞ্চন ও যশঃস্পৃহারূপ ত্রিবিধ বন্ধনকে দূরে ত্যাগ করিয়াছে, যাঁহারা চিত্তস্থৈর্য্যের উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়া তথা হইতে, ইন্দ্রিয়বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ দ্বারা 'ভোগ' নামে নির্দ্দিষ্ট মাকাল ফলের জন্য নীচজনোচিত কলহ, বিবাদ, দ্বেষহিংসার প্রতি প্রীতি ও প্রসন্নতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, যাঁহাদের সঞ্চিত পূর্ব্ব সৎকর্ম্মের দ্বারা চক্ষু হইতে অজ্ঞানের আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে, এবং যাঁহাদিগকে অসার নামরূপ

ভেদ করিয়া প্রকৃত সত্য দর্শনে সক্ষম করিয়াছে, তাঁহারা যেখানেই থাকুন না কেন, আধ্যাত্মিকতার জননী ও অনন্তখনি স্বরূপ ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকট ভিন্নাকারে—মহিমাময় উজ্জ্বলতরভাবে—প্রতীত হয়, ছায়াবাজিপ্রায় জগতে যিনি একমাত্র প্রকৃত সত্তা, তাঁহার অনুসন্ধানপরায়ণ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উহা আশার আলোকরূপে প্রতীত হয়।

অধিকাংশ মানবই তখনই শক্তিকে শক্তি বলিয়া বুঝিতে পারে, যখন উহা তাহাদের অনুভবের উপযোগী হইয়া স্থূল আকারে তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ পায়। তাহাদের নিকট প্রবল সমরোৎসাহ লুণ্ঠনাদিই, খুব স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ শক্তির বিকাশ বলিয়া প্রতীত হয়; আর যাহা কিছু ঝড়ের মত আসিয়া সম্মুখে যাহা কিছু পায়, তাহাকেই উল্টিয়া পাল্টিয়া দেয় না, তাহাই তাহাদের দৃষ্টিতে মৃত্যুস্বরূপ। সুতরাং শত শত শতাব্দী ধরিয়া কোনরূপ বাধা দিবার চেষ্টাশূন্য হইয়া বিদেশী বিজেতৃগণের পদতলে পতিত, একতাহীন, স্বদেশহিতৈষণালেশশূন্য ভারতবর্ষ তাহাদের নিকট গলিত অস্থিপূর্ণ ভূমি বলিয়া, প্রাণহীন পচনশীল পদার্থরাশি বলিয়া প্রতীত হইবে।

কথিত হয় যে, যোগ্যতমই কেবল জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া থাকে। তবে সাধারণ ধারণানুসারে যে জাতি সর্বজাতির মধ্যে অযোগ্যতম, সে জাতি দারুণ জাতীয় দুর্ভাগ্যচক্রে নিষ্পেষিত হইলেও কেন তাহার বিনাশের কিছুমাত্র চিহ্ন দেখা যাইতেছে না? তথা-কথিত বীর্য্যশালী ও কর্ম্মপরায়ণ জাতিসমূহের শক্তি যেমন একদিকে প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে, তেমনি এদিকে দুর্নীতিপরায়ণ (?) হিন্দুর সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তির বিকাশ হইতেছে, ইহা কিরূপে হয়? যাঁহারা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে জগৎকে শোণিতসাগরে প্লাবিত করিয়া দিতে পারেন, তাঁহারা খুব প্রশংসা পাইবার যোগ্য বটেন. যাঁহারা জগতের কয়েক লক্ষ লোককে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোককে শুকাইয়া মারিতে পারেন, তাঁহাদেরও মহৎ গৌরব প্রাপ্য বটে কিন্তু যাঁহারা অপর কাহারও অন্ন না কাড়িয়া লইয়াই শত শত লক্ষ লোককে শান্তি ও সুখস্বচ্ছন্দে রাখিতে পারেন, তাহারা কি কোনরূপ সম্মান পাইবার যোগ্য নহেন? শত শত শতাব্দী ধরিয়া অপরের উপর বিন্দুমাত্র অত্যাচার না করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের অদৃষ্টচক্রকে পরিচালনা করাতে কি কোনরূপ শক্তির বিকাশ লক্ষিত হইতেছে না?

সকলি প্রাচীন জাতব পুবাণেই বীরগণের উপাখ্যানে দেখা যায়,—তাঁহাদের প্রাণ তাঁহাদের শবীরেব কোন বিশেষ ক্ষুদ্র অংশে আবদ্ধ ছিল। যতদিন উহাব উপর হাত পড়ে নাই, ততদিন তাঁহারা অজেয় ছিলেন। এইরূপ বোধ হয়, যেন প্রত্যেক জাতিবই এইরূপ বিশেষ বিশেষ স্থানে জীবনীশক্তি সঞ্চিত আছে; তাহাতে হাত না পড়িলে কোন দুঃখবিপদেই সেই জাতিকে নাশ করিতে পাবে না।

ধর্ম্মই ভাবতেব এই জীবনীশক্তি। যতদিন হিন্দুজাতি তাঁহাব পূর্ব্ব-পুরুষগণেব নিকট উত্তবাধিকাব সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান না বিস্মৃত হইতেছেন, ততদিন জগঁতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা উহাকে ধ্বংস করিতে পাবে।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই স্বজাতিব অতীত কার্য্যকলাপের আলোচনা করে, আজকাল সকলেই তাহাকে নিন্দা কবিবা থাকেন। তাঁহাবা বলেন, এইরূপ ক্রমাগত অতীতেব আলোচনাতেই হিন্দুজাতিব নানারূপ দুঃখদুর্বিপাক ঘটিযাছে। কিন্তু আমাব বোধ হয়, ইহাব বিপরীতটাই সত্য। যতদিন হিন্দুজাতি তাহার অতীতেব গৌবব, অতীতের ইতিহাস ভুলিযাছিল, তত দিন উহা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িযাছিল। যতই অতীতেব আলোচনা হইতেছে, ততই চাবিদিকে পুনরুজ্জীবনেব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ভবিষ্যৎকে এই অতীতেব ছাঁচে ঢালিতে হইবে, অতীতই ভবিষ্যৎ হইবে।

অতএব হিন্দুগণ যতই তাঁহাদেব অতীত ইতিহাসেব আলোচনা করিবেন, তাঁহাদেব ভবিষ্যৎ ততই উজ্জ্বলতব হইবে আব যে কেহ এই অতীতকে প্রত্যেক ব্যক্তিব আযত্ত কবিবাব চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই স্বজাতিব পবম হিতকাবী। আমাদেব পূর্ব্বপুরুষগণেব আচার ও নিযমগুলি মন্দ ছিল বলিযা ভাবতেব অবনতি হয নাই কিন্তু এই অবনতি হইবাব কারণ এই যে, ঐগুলির যেরূপ ন্যাযতঃ পবিণাম হওযা উচিত ছিল, তাহা হইতে দেওযা হও নাই।

ভাবতেতিহাসের প্রত্যেক বিচাবশীল পাঠকই জানেন, ভাবতেব সামাজিক বিধানগুলি যুগে যুগে পবিবর্ত্তিত হইযাছে।

প্রথম হইতেই এই নিয়মগুলি কালে ধীবে ধীবে ক্রমাভিব্যজ্যমান এক বিরাট্ উদ্দেশ্যেব তদানীন্তন সমাজে প্রতিফলনেব চেষ্টাস্বরূপ ছিল। প্রাচীন ভাবতেব ঋষিগণ এত দূবদর্শী ছিলেন যে, জগৎকে তাঁহাদের

জ্ঞানের মহত্ত্ব বুঝিতে এখনও অনেক শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইবে। আর তাঁহাদের বংশধরগণের, এই মহান্ উদ্দেশ্যের পূর্ণভাব ধারণার অক্ষমতাই ভারতের অবনতির একমাত্র কারণ।

প্রাচীন ভারত শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহার সর্ব্বপ্রধান দুই জাতির—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির—উচ্চাভিলাষপূর্ণ অভিসন্ধি সাধনের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল।

একদিকে ব্রাহ্মণগণ, সাধারণ প্রজাগণের উপর ক্ষত্রিয়গণের অবৈধ সামাজিক অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর ছিলেন—এই প্রজাগণকে ক্ষত্রিয়গণ আপনাদের ধর্ম্মসঙ্গত খাদ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতেন। অপর দিকে, ক্ষত্রিয়ই ভারতে একমাত্র শক্তিসম্পন্ন জাতি ছিলেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের আধ্যাত্মিক অত্যাচার ও লোকগণকে বন্ধন করিবার জন্য তাঁহারা যে ক্রমবর্দ্ধমান নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ করাইতেছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

উভয় জাতির এই সংঘর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই আরব্ধ হইয়াছিল। সমুদয় শ্রুতির ভিতরেই ইহা অতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতে পারে। এক মুহূর্ত্তের জন্য এই বিরোধ মন্দীভূত হইল, যখন ক্ষত্রিয়দল ও জ্ঞানকাণ্ডের নেতা শ্রীকৃষ্ণ উভয় দলের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে, দেখাইয়া দিলেন। তাহার ফল গীতার শিক্ষা, যাহা ধর্ম্ম, দর্শন ও উদারতার সারস্বরূপ। কিন্তু বিরোধের কারণ তখনও বর্ত্তমান ছিল সুতরাং তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ দরিদ্র মূর্খ প্রজার উপর প্রভুত্ব করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বোক্ত দুই জাতিরই বর্ত্তমান ছিল সুতরাং আবার প্রবলভাবে বিরোধ জাগিয়া উঠিল। আমরা সেই সময়কার যৎসামান্য সাহিত্য যাহা প্রাপ্ত হই, তাহা সেই প্রাচীনকালের প্রবল বিরোধের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র কিন্তু অবশেষে ক্ষত্রিয়ের জয় হইল, জ্ঞানের জয় হইল, স্বাধীনতার জয় হইল আর কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য রহিল না, কর্ম্মকাণ্ডের অধিকাংশ একেবারে চিরকালের জন্য গেল।

এই উত্থানের নাম বৌদ্ধ সংস্কার। ধর্ম্মের দিকে উহাতে কর্ম্মকাণ্ড হইতে বিমুক্তি সূচনা করিতেছে আর রাজনীতির দিকে ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা ব্রাহ্মণপ্রাধান্য বিনাশ সূচিত হইতেছে।

ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রাচীন ভারত যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুইজন ব্যক্তিকে প্রসব করিয়াছিল, তাঁহারা উভয়েই ক্ষত্রিয় ছিলেন—

কৃষ্ণ ও বুদ্ধ—আর ইহা আরো বেশী লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই দুই অবতারই লিঙ্গজাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকেই জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের অদ্ভুত নীতিবলসত্তেও উহার অধিকাংশ শক্তিই ধ্বংসকার্য্যে নিয়োজিত হওয়াতে উহাকে উহার জন্মভূমিতেই মৃত্যুলাভ করিতে হইল আর উহার যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহাও, উহা যে সকল কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ড নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা শতগুণ ভয়ানক কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ডে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যদিও উহা আংশিকভাবে বৈদিক পশুবলি নিবারণে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু উহা সমুদয় দেশকে মন্দির, প্রতিমা, যন্ত্র ও সাধুগণের অস্থিতে পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

বিশেষতঃ, উহা দ্বারা আর্য্য, মঙ্গোলীয় ও অসভ্য জাতির যে একটী কিম্ভুত মিশ্রণ হইল, তাহাতে অজ্ঞাতসারে কতকগুলি বীভৎস বামাচার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। প্রধানতঃ এই কারণেই সেই মহান্ আচার্য্যের উপদেশাবলির এই বিকৃত পরিণতিকে শ্রীশঙ্কর ও তাঁহার সন্ন্যাসিসম্প্রদায়কে ভারত হইতে তাড়াইতে হইয়াছিল।

এইরূপে মনুষ্যদেহধারিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত সঞ্জীবন শক্তিপ্রবাহও পূতিগন্ধময় রোগবীজপূর্ণ ক্ষুদ্র আবদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হইল এবং ভারতকেও অনেক শতাব্দী ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইল, যতদিন না ভগবান্ শঙ্কর এবং তাহার কিছু পরে পরেই রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের অভ্যুদয় হইল।

ইতিমধ্যে ভারতেতিহাসের এক সম্পূর্ণ নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী আর্য্যভূমি, যাহা কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে প্রসব করিয়াছিল, যাহা মহামান্য রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের ক্রীড়াভূমি ছিল, তাহা নীরব রহিল আর ভারত উপদ্বীপের সর্ব্বনিম্নদেশ হইতে, ভাষা ও আকারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি হইতে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের বংশধর বলিয়া গৌরবকারী বংশসমূহ হইতে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল।

আর্য্যাবর্ত্তের সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কোথায় গেলেন? তাঁহাদের একেবারে লোপ হইল, কেবল, এখানে ওখানে ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বাভিমানী কতকগুলি মিশ্র জাতি রহিল। আর তাঁহাদের ‘এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশা-

দগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥' (মনু) এই এই দেশ (ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ) প্রসূত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সকল মানুষ আপন আপন চরিত্র শিক্ষা করিবে, এইরূপ অহঙ্কৃত, আত্মশ্লাঘাময় উক্তি সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অতি বিনয়ের সহিত দীনবেশে দাক্ষিণাত্যবাসিগণের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ ভারতে পুনরায় বেদের অভ্যুদয় হইল—বেদান্তের যে পুনরুত্থান হইল, এরূপ বেদান্তের চর্চ্চা আর কখন হয় নাই, গৃহস্থেরা পর্য্যন্ত আরণ্যকপাঠে নিযুক্ত হইলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে ক্ষত্রিয়েরাই প্রকৃত নেতা ছিলেন, দলে দলে তাঁহারা বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। সংস্কার ও ধর্ম্মান্তরকরণের উৎসাহে সংস্কৃত ভাষা উপেক্ষিত হইয়া লোকপ্রচলিত ভাষাসমূহের চর্চ্চা প্রবল হইয়াছিল। আর অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ই বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত শিক্ষার বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং দাক্ষিণাত্য হইতে যে এই সংস্কারতরঙ্গ আসিল, তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণেরই উপকার হইল। কিন্তু ভারতের অবশিষ্ট লক্ষ লক্ষ লোকের পদদেশে উহা পূর্ব্ব হইতেও অধিক শৃঙ্খল পরাইল।

ক্ষত্রিয়গণ চিরকালই ভারতের মেরুদণ্ড স্বরূপ; সুতরাং তাঁহারাই বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার সনাতন রক্ষক। দেশ হইতে কুসংস্কার তাড়াইবার জন্য চিরকাল তাঁহারা বজ্রবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন আর ভারতেতিহাসের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলের অত্যাচার হইতে সাধারণকে রক্ষা করিবার অভেদ্য প্রাচীরস্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান আছেন।

যখন তাঁহাদের অধিকাংশ ঘোর অজ্ঞানে নিমগ্ন হইলেন আর অপরাংশ মধ্য এসিয়ার বর্ব্বর জাতির সহিত শোণিতসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ভারতে পুরোহিতগণের অপ্রতিহত শক্তি স্থাপনে তরবারি নিয়োজিত করিলেন, তখনই ভারতের পাপের মাত্রা পূর্ণ হইয়া আসিল আর ভারতভূমি একেবারে ডুবিয়া গেল,—কখনও আর উঠিবেও না, যতদিন না ক্ষত্রিয় নিজে জাগরিত হইয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া অবশিষ্ট জাতিগণের চরণশৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া দেন। পৌরোহিত্যই ভারতের সর্ব্বনাশের মূল। মানুষ নিজ ভ্রাতাকে হীনাবস্থ করিয়া স্বয়ং কি কখন হীনভাবাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারে?

জানিবেন, রাজাজী, আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের দ্বারা আবিষ্কৃত সত্য সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য—এই ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব। কোন ব্যক্তি কি আপনার কিছুমাত্র অনিষ্ট না করিয়া অপরের অনিষ্ট করিতে পারে? এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের অত্যাচারসমষ্টি চক্রবৃদ্ধির নিয়মে তাঁহাদের মস্তকে এই সহস্রবর্ষব্যাপী দাসত্ব ও অবনতি আনয়ন করিয়াছে—তাঁহারা অনিবার্য্য কর্ম্মফলই ভোগ করিতেছেন। আপনাদেরই একজন পূর্ব্বপুরুষ বলিয়াছিলেন, 'ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ,' 'যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা জীবদ্দশাতেই সংসারজয় করিয়াছেন।' তাঁহাকে লোকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে, আমরা সকলেই ইহা বিশ্বাস করি। তবে কি তাঁহার এই বাক্য অর্থহীন প্রলাপমাত্র? যদি না হয়, আর আমরা জানি তাহা নয়, তবে জন্ম, লিঙ্গ, এমন কি, গুণ পর্য্যন্ত বিচার না করিয়া সমুদয় সৃষ্ট জগতের এই সম্পূর্ণ সাম্যের বিরুদ্ধে যে কোন চেষ্টা, তাহা ভয়ানক ভ্রমপূর্ণ আর যতদিন না কেহ এই সাম্যজ্ঞান লাভ করিতেছে, ততদিন সে কখনই মুক্ত হইতে পারে না।

অতএব হে রাজন্, আপনি বেদান্তের উপদেশাবলি পালন করুন,—অমুক ভাষ্যকার বা টীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে নহে, আপনার অন্তর্য্যামী আপনাকে যেরূপ বুঝাইয়াছেন, সেইরূপ ভাবে। সর্ব্বোপরি, এই সর্ব্বভূতে, সর্ব্ববস্তুতে সমজ্ঞানরূপ মহান্ উপদেশ প্রতিপালন করুন—সর্ব্বভূতে সেই এক ভগবান্‌কে নিরীক্ষণ করুন।

ইহাই মুক্তির পথ; বৈষম্যই বন্ধনের পথ। কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি বাহ্য একত্ব জ্ঞান ব্যতীত বাহ্য স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না, আর সকলের মানসিক শক্তির একত্বজ্ঞান ব্যতীত মানসিক স্বাধীনতাও লাভ করিতে পারে না।

অজ্ঞান, ভেদবুদ্ধি ও বাসনা, এই তিনটীই মানবজাতির দুঃখের কারণ, আর উহাদের মধ্যে একটীর সহিত অপরটীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একজন মানুষের আপনাকে অপর কোন মানুষ হইতে, এমন কি, পশু হইতেও শ্রেষ্ঠ ভাবিবার কি অধিকার আছে? বাস্তবিক ত সর্ব্বত্রই এক বস্তু বিরাজিত। 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী,' তুমি স্ত্রী তুমি পুরুষ, তুমি কুমার আবার তুমিই কুমারী।

অনেকে বলিবেন, 'এরূপ ভাব সন্ন্যাসীর শোভা পায়, তাঁহাদের পক্ষে

ইহাই ঠিক বটে, কিন্তু আমরা যে গৃহস্থ! অবশ্য গৃহস্থকে অন্যান্য অনেক কর্ত্তব্য করিতে হয় বলিয়া সে ততটা এই সাম্যভাবে অবস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু তাহাদেরও ইহা আদর্শ হওয়া উচিত। এই সমত্বভাব লাভ করাই সমুদয় সমাজের, সমুদয় জীবের ও সমুদয় প্রকৃতির আদর্শ। কিন্তু হায়, লোকে মনে করে, বৈষম্যই এই সমজ্ঞান লাভের উপায়, এ যেন অন্যায় কায করিয়া ন্যায পথে পঁহুছানর ন্যায হইল।

ইহাই মনুষ্যপ্রকৃতির ঘোর দুর্ব্বলতা, মনুষ্যজাতির উপর অভিশাপ স্বরূপ, সকল দুঃখের মূলস্বরূপ,—এই বৈষম্য। ইহাই ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ বন্ধনের মূল।

'সমম্ পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং॥
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং॥'

ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিযা তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরম গতি লাভ করেন। এই একটী শ্লোকের দ্বারা, অল্প কথার মধ্যে মুক্তির সার্ব্বভৌমিক উপায বলা হইযাছে।

রাজপুত আপনারা প্রাচীন ভারতের গৌরবস্বরূপ। আপনাদের অবনতি হইতে আরম্ভ হইলেই জাতীয অবনতি আরম্ভ হইল। আর ভারত তাহা হইলেই কেবল উঠিতে পারে, যদি ক্ষত্রিযগণের বংশধরগণ ব্রাহ্মণের বংশধরগণের সহিত সমবেত চেষ্টায বদ্ধপরিকর হন, লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা ভাগ করিযা লইবার জন্য নহে, অজ্ঞানগণকে জ্ঞানদানের জন্য ও পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র বাসভূমির বিনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য।

আর কে বলিতে পারে, ইহা শুভ মুহূর্ত্ত নহে? আবার কালচক্র ঘুরিয়া আসিতেছে, পুনর্ব্বার ভারত হইতে সেই শক্তিপ্রবাহ বাহির হইয়াছে, যাহা অনতিদীর্ঘকালমধ্যে নিশ্চযই জগতের চরম প্রান্তে পৌঁছিবে। এক বাণী উচ্চারিত হইযাছে, যাহার প্রতিধ্বনি প্রবাহিত হইযা চলিয়াছে, প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতর শক্তিসংগ্রহ করিতেছে, আর এই বাণী ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল বাণী হইতেই অধিক শক্তিশালী, কারণ, উহা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাণীগুলির সমষ্টিস্বরূপ। যে বাণী একদিন সরস্বতীতীরে ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত হইযাছিল, যাহার প্রতিধ্বনি নগরাজ হিমালযের চূড়ায় চূড়ায প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্যের ভিতর দিযা সমতল প্রদেশে নামিযা দেশ প্লাবিত করিযা ফেলিযাছিল, তাহা আবার উচ্চারিত

হইয়াছে। আবার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সকলে আলোর রাজ্যে প্রবেশ কর—দ্বার আবার উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

আর হে প্রেমাস্পদ মহারাজ, আপনি সেই জাতির বংশধর, যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত অবলম্বনস্তম্ভস্বরূপ, ইহার অঙ্গীকারবদ্ধ রক্ষা ও সাহায্যকারী; আপনিই কি ইহা হইতে দূরে থাকিবেন? আমি জানি, তাহা কখন হইতে পারে না। আমার নিশ্চয় ধারণা, আপনারই হস্ত আবার প্রথমেই ধর্ম্মের সাহায্যার্থ প্রসারিত হইবে। আর যখনই হে রাজা অজিৎ সিং, আমি আপনার সম্বন্ধে চিন্তা করি, যাঁহাতে আপনাদের বংশের সর্ব্বপরিচিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সহিত এমন পবিত্র চরিত্রের (যাহা থাকিলে একজন সাধুও গৌরবান্বিত হইতে পারেন), এবং সর্ব্ব মানবে অসীম প্রেমের যোগ হইয়াছে, যখন এইরূপ ব্যক্তিগণ সনাতন ধর্ম্ম পুনর্গঠন করিতে ইচ্ছুক, তখন আমি উহার মহাগৌরবময় পুনরুদ্ধারে বিশ্বাসী না হইয়া থাকিতে পারি না।

চিরকালের জন্য আপনার উপরে ও আপনার স্বজনগণের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক আর আপনি পরের হিত ও সত্যপ্রচারের জন্য দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন, ইহাই সর্ব্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ।

জেরুসালেম।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

জেরুসালেম দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমটী নূতন--ইহা নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে, ইহার বাটীগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত, ছাদে লোহার কড়ি। বাটীগুলি প্রায় দ্বিতল, দুই একটী ত্রিতল। সব বাড়ীগুলিই ইউরোপীয় প্রণালীতে গঠিত। এই স্থানে অনেকগুলি জর্ম্মণ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। পুরাণ সহরটী প্রাচীরের ভিতর। এই সহরটীতে প্রধানতঃ তিনটী দ্বার আছে—প্রথম—জাফাদ্বার, ২য় ডামাস্কাস বা শ্যামদ্বার, তৃতীয় ষ্টিফেনদ্বার। বিষ্ঠাদ্বার নামক একটী দ্বার আছে। ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, কেবল গরীব ইহুদীরাই এখানে বাস করিয়া থাকে।

আর কয়েকটী পুরাতন দ্বার ছিল, তাহা এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জাফা দ্বার অতি উচ্চ, উহা প্রকাণ্ড কপাট দ্বারা রাত্রে আবদ্ধ হয়। গেটগুলিতে সান্ত্রী থাকে। নবাগত লোক হইলে কখন কখন সান্ত্রীদিগকে passport (ছাড়পত্র) বা তজ্‌কারা দেখাইতে হয়। এই দ্বারের নিকট অনেকগুলি আঙ্গুর, রুটি, তামাক, নাপিতের দোকান প্রভৃতি আছে। এই গেট পার হইয়া কিছুদূর গমন করিলে রাস্তা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়। দক্ষিণ রাস্তাটী দাউদের দুর্গের ও অপরটী হারেমের দিকে গিয়াছে।

জেরুসালেম ইহুদী, মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানদের তীর্থস্বরূপ। এই তিন সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক লোক এই স্থান দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। আরবদেশীয় ইহুদী বা খ্রীষ্টিয়ানেরা এখানে আসিলে আপনাদিগকে হাজি (পুরাতন ইংরাজী Palmer) কহিয়া থাকে। অনেক সময় এখানে নামের পূর্ব্বে হাজি শব্দ থাকায় ইহারা ইহুদী, খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান জানা বড় কঠিন। যদিও ইহুদীদিগকে দেখিলে শীঘ্রই বুঝিতে পারা যায় কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান প্রভেদ করা সুকঠিন। পরিচ্ছদ, আচারব্যবহার ও অনেক সময় নাম একই রকমের। যথা—ফারিশ, আবদাল্লা, দাউদ, ঈশা, মুশা প্রভৃতি নাম খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান উভয়েই রাখে।

সম্ভবতঃ দাউদ বা ডেভিড এই সহর নির্ম্মাণ করিয়া যান। অদ্যাপি দুর্গটী দাউদের নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সহরের সর্ব্বোচ্চস্থানে এই দুর্গটী নির্ম্মিত, উহার নিম্নাংশ অতিশয় পুরাতন ও দাউদের নির্ম্মিত বলিয়া জনপ্রবাদ। সম্প্রতি তুর্কিরা সাময়িক কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছে। তাহারা আপনাদের সিপাহীদিগকে এই স্থানে রাখে। দাউদের পুত্র সলিমান এই সহরে নানাপ্রকার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া এই সহরটীকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। লিবানন পাহাড়ের জঙ্গল হইতে কাষ্ঠাদি আনিয়া ইনি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ভারতবর্ষ হইতে চন্দনকাষ্ঠ ও গন্ধাদি দ্রব্য সলিমানকে পাঠান হয়। সলিমানের বহুসংখ্যক নানাধর্ম্মাবলম্বিনী পত্নী ছিল। অন্য ধর্ম্মাবলম্বিনী পত্নীগণের অনুরোধে তিনি অন্যান্য ধর্ম্মসংক্রান্ত মন্দিরও অনেক করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময় ইহুদীরাজ্য অতিশয় বিস্তীর্ণ হয়। সলিমানের লোকান্তর গম-

নের পর তাঁহার অযোগ্য পুত্র পিতৃসিংহাসন অধিকার করে, তাহাতে দেশে নানাপ্রকার বিপ্লব হয় ও ড্যান হইতে বীরশেবা পর্য্যন্ত রাজ্য ক্রমে ক্ষীণবল হইয়া যায়। কতিপয় বৎসর পরে আলেকজাণ্ডার এই সহরে সসৈন্যে আসেন। সম্ভবতঃ তিনি জাফা গেট দিয়া সহরে প্রবেশ করেন ও মন্দির দর্শনে যান। ইহুদীরা নিতান্ত ভীত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় ও প্রধান যাজক বহুসংখ্যক অনুচর লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। ড্যানিয়েলের পুস্তক হইতে এক অংশ পাঠ করিয়া, পুরোহিতেরা প্রমাণ করেন যে, আলেকজাণ্ডার ঈশ্বরপ্রেরিত।

আলেকজাণ্ডার নিতান্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। সেই সময় পারস্যদেশের সহিত তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। আলেকজাণ্ডার ইসাস ও গ্রীনিকাস যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ডেরায়স পলাইয়া যান ও পূর্ব্বদেশে আসিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আলেকজাণ্ডারের সহিত আরবেলায় লড়িবার নিমিত্ত কৃতচেষ্ট হন। এই স্থান আধুনিক কারবেলার নিকট। এই সময়ে আলেকজাণ্ডার ফিনিসীয় (আধুনিক সিরিয়া) রাজ্য আক্রমণ করেন ও টায়র বা শূর নগর অবরোধ করেন। শূর শব্দ হইতে দেশের নাম শূরীয় বা শিরিয়া হইয়াছে। শূর অবরোধ কালে তিনি নিজ সেনাপতিকে তথায় রাখিয়া মিসর জয় করিতে যান ও মিসর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জেরুসালেম নগরে আসেন।

(ইহুদী জাতির ইতিহাস।)

জেরুসালেম সহর দেখিলে ইহুদীদিগের পুরাতন ইতিহাস মনে উদয় হয়। ইহুদীরা অতি পুরাতন জাতি ও সিমাইট বা সেমেটিক বংশীয়। ভগবান্ ঈশার ৪২ পুরুষ পূর্ব্বে ইব্রাহিম নিনিভা (আধুনিক মোসেল) নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তথায় নিমরড বা নামরুদ নামক রাজা ছিলেন। নামরুদ মূর্ত্তিপূজা করিতেন। ইব্রাহিম পারস্যদেশীয় (Zoroaster) জরতুস্ত হইতে অনেক ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। জরতুস্ত মতানুযায়ী তিনি অগ্নিকে পূজা করিতে শিখেন ও দ্বৈতবাদ অবলম্বন করেন। জরতুস্ত মতে আঙ্গারামান্যু ও সাপান্দামান্যু নামক দুইজন ভগবান্ আছেন, একজন শুভ ও অপরজন অশুভের বিধাতা। ইব্রাহিম এই মতের অনুকরণে জিহোভা ও শএ-তান নামক দুই দেবতার বিষয় প্রচার করেন। জিহোভা স্রষ্টা ও শএ-তান অরি। এই নূতন ধর্ম্ম অবলম্বন ও প্রচারের জন্য নামরুদ তাঁহাকে

দেশ হইতে বাহির করিয়া দেন। ইব্রাহিম স্বীয় পত্নী সারা ও দাসী হ্যাগারকে লইয়া উর্‌ফা (মোসেল ও হালাবের বা বর্ত্তমান আলিপোর মধ্যস্থান) নগরে উপস্থিত হন। উর্‌ফা নগরে তাঁহাকে নানাপ্রকার নির্য্যাতন করা হয়। অদ্যাপি এখানে ইব্রাহিমের নামের সহিত বিশেষভাবে সংসৃষ্ট একটী মৎস্যপুর্ণ পুষ্করিণী আছে। লোকে এখানে তীর্থ করিতে যায়। কথিত আছে, কোন সময়ে এখানে এক মোল্লা বাস করিতেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, ইব্রাহিম আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, মোল্লা ভিন্ন এপুষ্করিণীর মৎস্য আর কেহ খাইতে পারিবেন না, খাইলে সবংশে নির্ব্বংশ হইবেন। তদবধি ইহা পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ইব্রাহিমের অশীতিবর্ষ বয়স হইলেও তিনি অপুত্রক ছিলেন। অবশেষে একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, জিব্রাইল (Gabriel) নামক ঈশ্বরদূত আসিয়া তাঁহাকে কহিতেছেন, তুমি খিৎনা বা ত্বক্‌চ্ছেদ কর ; তাহা হইলে তোমার পুত্র হইবে। সারা তখন বৃদ্ধা হইয়াছিল। দাসী হ্যাগারের গর্ভে তাঁহার এক সন্তান হইল। তাহার নাম ইশ্মায়েল। ইশ্মায়েলের জন্ম হইলে সারা নিতান্ত হিংসাপরবশ হইল এবং হ্যাগার ও তাহার পুত্রকে কয়েকটী উট দিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহার পর জিহোভাদেবের বিশেষ কৃপায় সারার গর্ভে ইস্রায়েল নামে এক পুত্র হয়। ইব্রাহিমের এই দুই পুত্র হইতে দুই জাতি উৎপন্ন হয়। ইশ্মায়েলের বংশধরেরা বেনি-ইশ্মায়েল (ইশ্মায়েল-সন্তান) বা আরব নামে পরিচিত। ইস্রায়েলের পুত্রগণ বেনি-ইস্রায়েল বা ইহুদী। ইশ্মায়েল বড় হইলে যখন সে বিমাতা কর্ত্তৃক পিতৃগৃহ হইতে দূরীকরণ প্রভৃতি সকল বৃত্তান্ত অবগত হইল, তখন সে ইস্রায়েলবংশীয়গণের প্রতিহিংসার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। (My hand shall be against men and men against me for ever and ever.)

যদিও সাধারণতঃ ইব্রাহিম নামই প্রসিদ্ধ, তথাপি শ্রদ্ধাবান লোকেরা এনাম বলিতে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হয়। তাহারা ইব্রাহিমকে খলিল রহমান বা দয়াময়সখ (দয়াময় ভগবান যাঁহার বন্ধু) বলিয়া থাকে। অদ্যাপিও যাহার নাম ইব্রাহিম রাখা হয়, তাহাকে অনেক সময় লোকে খলিল বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। ইব্রাহিম সপত্নীক উর্ফা হইতে জেরুসালেমের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে আসিয়া বাস করেন। সেই স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয় ও তথায় তাঁহার সমাধিমন্দির আছে। এই স্থানের নাম খলিল রহমন।

মুসলমানদিগের প্রচলিত কোর্ব্বান বা বাৎসরিক বলিদানপ্রথা ইব্রাহিম প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। ইহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে যে, ভগবান ইব্রাহিমের বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বলেন যে, তিনি যদি নিজ পুত্র ইসাহাক বা ইস্রায়েলকে বলি দিতে পারেন, তবে তিনি প্রীত হইবেন। ইব্রাহিম এই ভগবদ্বাক্যানুসারে যখন আপনার পুত্রকে বন্ধন করিয়া প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হন, সেই সময় দেখেন যে, কয়েকটী বৃক্ষের মধ্যে খুব বড় শৃঙ্গযুক্ত একটী মেষ রহিয়াছে। ইব্রাহিম সেই মেষটী লইয়া বলিদান করেন। তাহাতে তাঁহার পুত্রের প্রাণরক্ষা হয়। মুসলমানধর্ম্মের মতে তীর্থ হিসাবে মক্কা মেদিনার পর জেরুসালেমের স্থান। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীরা এখানে তীর্থ করিতে আসিয়া একটী বিশাল প্রস্তর দর্শন করে ও তাহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। এই প্রস্তরকে আরবী ভাষায় তক্ত রাব্বেল আলমীন (জগৎপতির সিংহাসন) বলিয়া থাকে। মুসলমানদিগের মধ্যে প্রবাদ এই, কেয়ামৎ বা শেষ দিনে ভগবান্ এই প্রস্তরের উপর বসিয়া জগদ্বাসী সকলের বিচার করিবেন ও সকলের যথাযোগ্য পুরস্কার বা দণ্ড দিবেন। এই জন্য ইহারা এই প্রস্তরকে এত পবিত্র বলিয়া মানে। কিন্তু জেরুসালেম বাস কালে হিব্রীয় (ইহুদী) ভাষাপারদর্শী কয়েকটী পণ্ডিতের এরূপ মত শুনা গেল যে, পূর্ব্বকালে ইব্রাহিম স্বীয়পুত্র ইসাহাককে এই প্রস্তরের উপর বলিদান করিতে গিয়াছিলেন। তদবধি ইহা অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত।

ইব্রাহিমের কতিপয় পুরুষ পরে তাঁহার বংশে অনেক গুলি সন্তান হয়। তন্মধ্যে কোন পরিবারে ইউসিফ (যোসেফ) ও বিন্নাবিন (বেঞ্জামিন) নামে দুইটী সহোদর ভ্রাতা ছিল। ইহাদের দশজন বৈমাত্র ভ্রাতাও ছিল।

বিমাতাপুত্রেরা শিশু ইউসিফকে মিসরদেশীয় এক বণিকের নিকট বিক্রয় করে ও কপট রোদন করিতে করিতে বৃদ্ধ পিতার নিকট আসিয়া কহে যে, ব্যাঘ্র আসিয়া শিশুকে খাইয়া গিয়াছে। ইউসিফ মিসর দেশে গিয়া কর্ম্ম করিতে লাগিল এবং বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বিধায় রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া ক্রমশঃ প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইল। অদ্যাপি কাইরো নগরে ইউসিফের নামে পরিচিত এক অদ্ভুত কূপ (বির-ইউসিফ অর্থাৎ ইউসিফের কূপ) আছে। তথায় পাহাড়ের উপর যে একটী দুর্গ আছে, (এখন যেখানে ইংরাজসৈন্য বাস করে,) তথায় উহা অবস্থিত। পাহাড়ের উপর হইতে একটী সুড়ঙ্গের ভিতর

দিয়া স্ক্রুপের পেঁচের ন্যায় খনন করিয়া প্রাপ্ত করিয়াছে ও ৪২০ ফুটের নীচে জল।

ক্রমশঃ।

সাবিত্রী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যে কাল ঘটায় হেন চিত্তের প্রসাদ,
হেরি বরতনুখানি, অতি প্রীতিভরে,
সাজাইলা রুচির যৌবনভূষা দিয়া;
সাজান যতনে যথা শচীর সুতনু
(অনন্তযৌবনা ধনী) কন্দর্পরমণী
বিবিধ কুসুম রত্নে;—অথবা যেমতি
উজলেন উপবন ঋতুকুলপতি।
পূর্ণিমার নিশাকালে সুধাকর যথা
শোভে সুষমায় পূর্ণ,—যৌবন মিলনে
সহজ সুন্দর দেহ শোভিল তেমনি।
লাবণ্য নির্ম্মল জলে বিশেষ মার্জ্জিত
করি দিল তনুখানি, হেরে লোক তায়
নিজদেহ বিম্বখানি দর্পণে যেমতি।
রবি শশী কর বিভা সে অঙ্গে ফলিয়া
ঝলমলে, স্ফুরে যেন তড়িৎ অস্থির।
রমণীয় রূপখানি, নিমিষে নিমিষে
নূতন মাধুরী ধরি, না দেয় ধরিতে
হৃদয়ে, সে ছবি খানি কেমন প্রকার।
ক্ষরিত সতত অঙ্গে সৌরভ সুন্দর,
(সুলক্ষণবতী কন্যা) বাস পেয়ে যার
উড়ে কাছে কাছে অলি গুঞ্জরি মধুর।
কণ্ঠের সুস্বনে ভ্রম জনমায় সদা,
কুহরে কি পিকবর? বাজিল কি বীণা?

সুধীর মন্থর গতি পায় পায় তার
ললিত লাবণ্য ছটা বিকীর্ণ চৌধার।
নীলপদ্ম দুটী আঁখি সহজ তরল
উজ্জ্বল কিরণ মাখা—অনুমিত তায়
স্ফুটিতঃ জ্ঞানের জ্যোতি নিকলিছে যেন।
ভ্রু-দুখানি চিত্রে লেখা ফুলধনু হেন।
ললাট অপূর্ণ ইন্দু উজ্জ্বল বিকাশ,
দ্যুতিমান্ রত্নে যেন হয়েছে গঠিত,
ষড়ঙ্গ বৈভব ভোগ করিছে সূচিত।
গঞ্জি খগচঞ্চু নাসা, অধর পল্লব
বঙ্কিম, তরল অতি, চিক্কণ সুন্দর।
দন্ত কুন্দফুল গুলি, মুকুতার মত
ঝলমলে, সুরঞ্জিত প্রশস্ত কপোল।
গ্রীবা শ্বেতকম্বু যথা, মৃণালগঠিত
ভুজযুগ, অঙ্গুলি চম্পক কলি চারু।
সুধাংশুর অংশু লয়ে, দিয়াছে রঞ্জিয়া
নখগুলি অর্দ্ধাকৃতি। স্ফটিকরচিত
সুন্দর বেদিকা হেন পৃষ্ঠ সুবিস্তৃত।
আলুথালু পড়িয়াছে চারিপাশে তার,
কুঞ্চিত সুকেশগুচ্ছ কৃষ্ণ ঘনতর
পরশি নিতম্ব দেশ, কাল মেঘে যেন
ঢেকেছে নির্ম্মল নভঃ। স্বচ্ছ সরোবর
পীন বক্ষ, সুপেশল উন্নত উরজ।
ডম্বরুর মাঝা জিনি ক্ষীণ কটিদেশ
মুষ্টিগ্রহ অনায়াসে। কদলী নিন্দিয়া
গুরু উরু। অসামান্য সে রূপ বিকাশ!
এরূপ সেরূপ নহে উদ্দীপিত যাহে
কামক্ষুধা নরহৃদে—এরূপ দর্শনে
জাগায় সম্ভ্রম মনে—জ্ঞান হয় তায়,
স্বর্গ তাজি দেবী কোন্ ভূতলে উদয়!!

ক্রমশঃ।

উপনিষদের গল্প।

উপনিষদে যে সকল উপাখ্যান আছে, তাহা আধুনিক ভাষায় প্রকাশ করিলে তাহা দ্বারা অনেকের উপকারের সম্ভাবনা। উহাতে যেমন নানা উপদেশ নিহিত, তদ্রূপ উহা দ্বারা অনেক প্রাচীন আচার ব্যবহার জানিতে পারা যায়। আরও ঐ সকল গল্প পাঠ করিলে মূল উপনিষদ্ পাঠেও অনেকের কৌতূহল হইতে পারে, এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা উপনিষদের প্রধান প্রধান গল্প গুলি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

দেবগণের ব্রহ্মদর্শন।

কেনোপনিষদে এই উপাখ্যান আছে। ব্রহ্ম দেবতাদের হইয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। আমরা যে কোন উচ্চকার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা যেমন বাস্তবিক ব্রহ্মশক্তিবলে হইলেও তাহা নিজেতে আরোপিত করিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া থাকি, দেবগণেরও ঠিক সেই দশা হইল। দেবগণও ব্রহ্মকে ভুলিলেন, ভুলিয়া আপনারাই অভিমান করিতে লাগিলেন, আমাদেরই কৃত এ বিজয়, আমাদেরই এ মহিমা। বাস্তবিক কি সকল জাতির জীবনেও এই ব্যাপার ঘটে না? মহাশক্তির কৃপায় তাঁরই শক্তিবলে এক জাতি জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করে। কিন্তু যখন সে বিজয়লক্ষ্মী ও ধন ধান্য সম্পদ্ প্রাপ্ত হয়, তখন সে সেই বিজয়লক্ষ্মী কোথা হইতে আসিল, তাহা ভুলিয়া আপনিই আপনার গৌরবে স্ফীত হইয়া অপরকে আপনার গৌরব, আপনার মাহাত্ম্য দেখাইতে যায়। তখনই সেই জাতির পতনের সূচনা হয়।

দেবগণের প্রতি তাহার বিশেষ কৃপা। তাই তিনি তাহাদের এই অভিমান জানিতে পারিয়া তাহাদের নিকট নিজ যোগমাহাত্ম্যনির্ম্মিত অত্যদ্ভুত বিস্ময়জনক রূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও পূজ্য বলিয়া স্থির করিলেন, কিন্তু তিনি কে, তাহা সবিশেষ জানিতে পারিলেন না।

তখন তাঁহারা অগ্নিদেবকে বলিলেন, জাতবেদঃ, এই পূজনীয় স্বরূপ কে, আপনি জানিয়া আসুন। অগ্নি তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি

অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি উত্তর দিলেন, 'আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা।' 'আচ্ছা তোমার কি শক্তি আছে?' 'আমি সব দগ্ধ করিতে পারি—এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সবই মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ করিতে পারি।' 'এই তৃণগাছটী দগ্ধ কর দেখি।' হায়, হায়, অগ্নে, কাহার সম্মুখে অভিমান করিতেছ? অভিমানভরে বুঝিতেছ না, যাঁহার এককণা শক্তি পাইয়া তোমার এই অস্তিত্ব, তাঁহার ইচ্ছায় কোটি কোটি অগ্নির সৃজন হইতে পারে। অগ্নির যত শক্তি, সব সেই তৃণদাহে নিয়োজিত হইয়া বিফল হইল, তখন তিনি মানে মানে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেবগণকে নিবেদন করিলেন, জানিতে পারিলাম না, পূজনীয় স্বরূপ ইনি কে?

তখন তাঁহারা বায়ুকে প্রেরণ করিলেন। বায়ুকেও সেই প্রশ্ন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসিত হইল। বায়ুও অগ্নির ন্যায় নিজের বড়াই করিয়া বলিলেন, 'আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা'। 'আচ্ছা তোমার কি শক্তি আছে?' 'আমি ইচ্ছা করিলে জগতের সব জিনিষ একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি।' তাঁহাকেও সেই তৃণ প্রদত্ত হইল। তিনি অনেক চেষ্টায়ও তাহাকে তাহার স্থান হইতে এক বিন্দুও বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন হেটমস্তকে দেবগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তিনিও আপনার অক্ষমতা জানাইলেন।

এইবার দেবদেব ইন্দ্র প্রেরিত হইলেন। কিন্তু একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। কোথায় সেই জ্যোতির্ময়? এ যে বহুশোভমানা হৈমবতী উমাদেবী আকাশে আবির্ভূতা। ইন্দ্র ভক্তিভরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, মা, যিনি এইমাত্র ছিলেন, বিদ্যুতের মত প্রকাশ হইয়া ক্ষণপরেই লুকাইলেন, তিনি কে? তখন জগজ্জননী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'স্বয়ং ব্রহ্ম তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তোমরা ইঁহারই শক্তিতে যুদ্ধে জয় করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা উঁহাকেই তোমাদের সর্ব্ববিজয়ের মূলীভূত কারণ জানিয়া অভিমানশূন্য হও।'

হায়, হায়, কবে ব্রহ্ম আমাদের ঘাড় ধরিয়া এইরূপে অভিমানশূন্য হইতে শিখাইবেন? কবে আমাদের এই এক ছটাকের আমি অনন্ত ব্রহ্ম সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়া আত্মহারা হইয়া থাকিব? যখন ভাবি, তখন ত হাসি পায়। হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। তুই কে রে,

তা কর্‌বি ? যে কর্‌বার, সে ত কচ্ছে। তুই কেবল আপনাকে চিনে নে। হে অনন্ত আকাশের অনন্ত বাণী, নিত্য গম্ভীরস্বরে তুমি বল, 'আমি আছি,' 'আমি আছি'। ভুলে যাই দেহ, ভুলে যাই মন—ভুলে যাই সংসার, ভুলে যাই কর্ম্ম—প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তোমার নাম গেয়ে বেড়াই। নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে। এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার, আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।

সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বামী সারদানন্দ বিগত ১৯শে চৈত্র, ১লা এপ্রেল তারিখে চাংড়িপোতা গ্রামে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইযাছিল।

ঐ তারিখেই সিষ্টার নিবেদিতা ক্লাসিক থিয়েটারে অগণ্য শ্রোতার সমক্ষে 'বুদ্ধগয়া ও হিন্দুধর্ম্মে উহার স্থান' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন।

বিগত ৩রা এপ্রেল তারিখে নিমৃতা হিতকরী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। হিন্দুধর্ম্মের চর্চ্চা ও সাধারণের হিতানুষ্ঠান এই সভার উদ্দেশ্য। স্বামী শুদ্ধানন্দ ঐ সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া 'আমাদের কর্ত্তব্য কি' এই সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন,"কোন মহাপুরুষকে একবার জনৈক জিজ্ঞাসু ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের কর্ত্তব্য কি ? সেই মহাপুরুষ তাঁহার গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া বলেন, ইঁহাকে পূজা করুন। প্রথমতঃ এই কথা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল, এ ভয়ানক গোঁড়ামি। কিন্তু যতই জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই দেখিতেছি, এ কথার ভিতর কত অর্থ আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই, কোন উন্নত মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন

হইলেই আমাদের জীবনের সমুদয় কার্য্য বুঝিবার ও সেই সমুদয় সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিবার শক্তি আসে। জীবন্ত মহাপুরুষ অভাবে আমাদের কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশক শাস্ত্র। শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত,—শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতিতে আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ এবং সার্ব্বভৌমিক সত্য সকলের উপদেশ আছে। স্মৃতিতে সেই সকল উপদেশ বিভিন্নযুগে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই স্মৃতির আলোকে আমরা জানিতে পারি, এই কলিযুগে দানই একমাত্র তপস্যা (মনু)। দান চতুর্ব্বিধ—অন্নদান, প্রাণদান, বিদ্যাদান ও জ্ঞানদান। এই সকল দানের জন্যই কঠোর স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন।' জ্ঞান লাভের জন্য বালক নচিকেতার কঠোর স্বার্থত্যাগের কথা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলিলেন, দেশের উন্নতিবিধান করিতে হইলে যুবকবৃন্দকে এই নিঃস্বার্থ ব্রতে দীক্ষিত হইতে হইবে। জগন্মাতার নিকট আপনাদিগকে দেশের জন্য বলি দিতে হইবে। মানুষ চাই। মানুষ না হইলে কোন কার্য্যই স্থায়ী হইবে না। টাকায় মানুষ করে না, মানুষই টাকা উপার্জ্জন করে। দেশের উন্নতির জন্য তিনটী জিনিষের প্রয়োজন,—দেশের দুরবস্থা প্রাণে প্রাণে অনুভব করা, ইহার প্রতীকারের কোন উপায় আবিষ্কার এবং উপায় আবিষ্কৃত হইলে—তাহাতে সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া লাগিয়া থাকা।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত চিদম্বরমে একটী 'বিবেকানন্দ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা। সভাপতি টি, এন, দেশিকাচার্য্য ও সম্পাদক—সদাশিব আয়ার।

নিউইয়র্ক হইতে কোন সংবাদদাতা বিগত ২৭শে নবেম্বর তারিখে লিখিতেছেন,—

স্বামী অভেদানন্দ ইউরোপে পাঁচমাস ভ্রমণের পর এখানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন এবং নূতন উৎসাহে বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। তাঁহার প্রচারফলে এখানকার বেদান্তসমিতির খুব উন্নতি হইয়াছে। উহার আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল,—সভ্যসংখ্যাও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকে কার্য্যে ইহার প্রতি সহানুভূতি দেখা-

তেছেন। তাঁহার বেদান্ত প্রচারে সাধারণ লোকের ভিতর এত উদার ভাব প্রবেশ করিয়াছে যে, চর্চ্চের পুরোহিতগণ গোঁড়া হইলেও তাঁহাদের শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন ও চাঁদা সংগ্রহের জন্য তাঁহাদের একটু সুর ফিরাইয়াছেন। তাঁহার রবিবাসরীয় বক্তৃতায়ও খুব লোক সমাগম হইতেছে। নবেম্বর ও ডিসেম্বরে (১৯০৩) তাঁহার বক্তৃতার তালিকা এই—

নবেম্বর।

১। বেদান্তে দ্বৈতবাদ—ভক্তিযোগ।

২। ভক্তি ও প্রেম।

৩। কৃষ্ণ (খৃষ্টিয়ানের নিকট খৃষ্ট যেমন, হিন্দুর নিকট কৃষ্ণ তেমন) ও তাঁহার উপদেশ।

৪। ভারতে কৃষ্ণপূজা।

৫। বুদ্ধ উপাসনা।

ডিসেম্বর।

১। তিব্বতীয় লামাধর্ম্ম।

২। বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বেদান্ত।

৩। হিন্দু ও খৃষ্টিয়ানগণের মধ্যে প্রতিমাপূজা।

৪। খৃষ্টোপাসনা ও খৃষ্টমাস।

স্বামী নির্ম্মলানন্দ বিগত বুধবারে এখানে আগমন করিয়াছেন। এখানকার সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেছে এবং সকলেরই স্থিরবিশ্বাস, তিনি এখানে বেদান্তপ্রচারে কৃতকার্য্য হইবেন।

বিগত ৩রা এপ্রেল এঁটালি আনন্দ কাননে এঁটালি রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। কীর্ত্তন, প্রসাদ বিতরণাদি হইয়াছিল। মিশনের সভ্যগণের সাদর সম্ভাষণে ও অভ্যর্থনায় সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন।

নিবেদন।

উদ্বোধন পাঠকগণের নিকট আজ আমাদের একটী নিবেদন আছে। **উদ্বোধনপাঠকগণের** মধ্যে অনেকের বোধ হয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অথবা

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ এবং অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ে কথোপকথন হইয়া থাকিবে। এই সকল কথোপকথন এখন হইতেই লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে তাহা দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। সাক্ষাদ্দর্শী ব্যক্তিগণের সাক্ষ্যে ইঁহাদের জীবনীর এমন অকাট্য উপাদানের সংগ্রহ হইবে, যাহাতে ইঁহাদের ভাবী ইতিবৃত্তলেখকেরও বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। অতএব যাঁহারা উক্ত দুই মহাপুরুষের মধ্যে কাহারও সঙ্গরূপ সৌভাগ্যলাভের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি অথবা ডায়েরি হইতে এই অমূল্য কথোপকথন লিখিয়া পাঠাইবেন। ইহাতে লিপিনৈপুণ্যের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। চিত্রের খসড়া অঙ্কিত হইলে মসলা বার্ণিশের জন্য আটকাইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বেলুড়মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংবাদ পাইয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের নাম লইয়া অনেক ব্যক্তি নানাস্থানে সাধারণকে প্রতারণা করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছে। তিনি বিশেষ বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের (Ramkrishna Home of Service) নাম লইয়া জনৈক ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিতেছে ও সেই অর্থ সেবাশ্রমের কার্য্যে ব্যবহার না করিয়া তদ্দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে। এই কারণে তিনি বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সাধারণের বিশেষ অবগতির জন্য ঘোষণা করিতেছেন যে, যদি কোন ধর্ম্মপ্রচারক বা সাধারণের হিতার্থ কোন শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনি সন্ন্যাসীই হউন বা গৃহীই হউন, রামকৃষ্ণ মিশনের শিলমোহর ও বেলুড়মঠের গোপনীয় শিলমোহরযুক্ত, বেলুড়মঠের প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষরিত পত্র না দেখাইতে পারেন, তবে বুঝিতে হইবে, তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সংস্রব নাই এবং তাঁহার উপর উক্ত মিশনের জন্য কোন রূপ অর্থ বা চাঁদা সংগ্রহের ভার নাই।

স্বামীজির কথা।

(শ্রীহরিদাস মিত্র লিখিত।)

স্বামীজির সহিত আমার তিনবার মাত্র দেখা হয়। প্রথম আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে। সেবারকার দেখার কথা অনেকটা আপনাদের বলিয়াছি। উহাতে আমার সহিত শোলাপুরে সাক্ষাৎ হয়, লেখা হইয়াছে, কিন্তু সেটী ছাপার ভুল; বেলগামে আমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ। দ্বিতীয়, যখন তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত এবং আমেরিকা যাত্রা করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে। তৃতীয় এবং শেষবার দেখা হয়, তাঁহার দেহত্যাগের ছয় সাত মাস পূর্ব্বে। এই কয়বারে তাঁহার নিকট যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। অনেক কথা আমার নিজের সম্বন্ধে বলিয়া বলিবার নহে, আবার অনেক কথা ভুলিয়াও গিয়াছি। যাহা মনে আছে, তাহার ভিতর সাধারণ পাঠকের উপযোগী বিষয়গুলি জানাইতে চেষ্টা করিব।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি হিন্দুদিগের জাতিবিচার সম্বন্ধে ও কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যবহারের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া যে বক্তৃতাগুলি মান্দ্রাজে করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, স্বামীজির ভাষাটা একটু বেশি কড়া হইয়াছে। তাঁহার নিকট সে কথা প্রকাশও করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"যাহা কিছু বলিয়াছি, সমস্ত সত্য। আর যাঁহাদের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহাদের কার্য্যের তুলনায় উহা বিন্দুমাত্রও অধিক কড়া নহে। সত্য কথার সঙ্কোচ বা গোপন করার আমার তো কোন কারণ দেখি না, তবে ঐরূপ কার্য্যের ঐরূপ সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া মনে করিও না যে, তাঁহাদের উপর আমার রাগ ছিল বা আছে অথবা কেহ কেহ যেমন ভাবিয়া থাকেন, কর্ত্তব্যবোধে যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য এখন আমি দুঃখিত। ও কথার একটাও সত্য নহে। আমি রাগিয়াও ঐ কাজ করি নাই এবং করিয়াছি বলিয়াও দুঃখিত নহি। এখনও যদি ঐরূপ কোন অপ্রিয় কার্য্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এখনও ঐরূপ নিঃসঙ্কোচে উহা নিশ্চয় করি!"

ভণ্ড সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে তাঁহার মতামত পূর্ব্ববারে কিছু বলিয়াছি। আর একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উঠায় বলিলেন, "অবশ্য অনেক বদমায়েস লোক ওয়ারেণ্টের ভয়ে কিংবা উৎকট দুষ্কর্ম্ম করিয়া লুকাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশ করিয়া বেড়ায় সত্য; কিন্তু তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কর, কেহ সন্ন্যাসী হইলেই তাহার ঈশ্বরের মত ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই। সে পেট ভরিয়া ভাল খাইলে দোষ, বিছানায় শুইলে দোষ, এমন কি, জুতা বা ছাতি পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহার করবার যো নাই। কেন, তারাও তো মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস না হলে তাহার আর গেরুয়া বস্ত্র পরিবার অধিকার নেই। ইহাও ভুল। এক সময়ে আমার একটী সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হয়। তাঁহার ভাল পোষাকের উপর ভারি ঝোঁক। তোমরা তাঁহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করিবে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী।"

স্বামীজি বলিতেন, "দেশ, কাল, পাত্র ভেদে মানসিকভাব ও অনুভবের অনেক তারতম্য হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রত্যেক মানুষেরই আবার একটা না একটা বিষয়ে বেশি ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। জগতে সকলেই আপনাকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করে। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমিই কেবল বুঝি, অন্যে বুঝে না, ইহাতেই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। সকলেই চায়, প্রত্যেক বিষয়টা অপর সকলে তাহারই মত দেখুক ও বুঝুক। সে যেটা সত্য বুঝেছে বা জেনেছে, সেটা ছাড়া আর কোন সত্য থাক্‌তে পারে না। সাংসারিক বিষয়েই হউক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই হউক, ওরূপ ভাব কোন মতে মনে আসতে দেওয়া উচিত নয়।"

জগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন খাটে না। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে মানুষের নীতি এবং সৌন্দর্য্য বোধও বিভিন্ন দেখা যায়। তিব্বত দেশের এক স্ত্রীলোকের বহু পতি থাকা প্রথা প্রচলিত আছে। হিমালয় ভ্রমণ কালে তাঁহার ঐরূপ একটী তিব্বতীয় পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পরিবারে ছয়জন পুরুষ এবং ঐ ছয়জনের একমাত্র স্ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয়ের গাঢ়তা জন্মিলে স্বামীজি একদিন তাহাদের ঐ কুপ্রথা সম্বন্ধে বলায় তাহারা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, "তুমি সাধু, সন্ন্যাসী হইয়া লোককে স্বার্থপরতা শিখাইতে চাহিতেছ?

'এটী আমারই উপভোগ্য, অন্যের নয়' এরূপ ভাব কি অন্যায় নহে?" স্বামীজি শুনিয়া অবাক্।

নাসিকা এবং পায়ের খর্ব্বতা লইয়াই চীনের সৌন্দর্য্য বিচার, একথা সকলেরই জানা আছে। আহারাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইংরাজ আমাদের মত সুবাসিত চাউলের অন্ন ভাল বাসে না। এক সময়ে কোন স্থানের জজ সাহেবের অন্যত্র বদ্‌লি হওয়ায় তথাকার কতকগুলি উকিল মোক্তার, তাঁহার সম্মানার্থ উত্তম সিধা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েক সের সুবাসিত চাউল ছিল। জজ্ সাহেব সুবাসিত চাউলের ভাত খাইয়া উহা পচা চাউল মনে করেন এবং উকিলদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলেন, তোমাদের পচা চাউল গুলো আমাকে উপঢৌকন দেওয়া ভাল হয় নাই। (You ought not to have given me rotten rice.)

কোন এক সময়ে ট্রেনে যাইতেছিলাম, সেই কামরায় ৪।৫টী সাহেব ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তামাকের বিষয়ে আমি বলিলাম, সুবাসিত গুড়ুক তামাক জলপূর্ণ হুঁকায় ব্যবহার করাই তামাকু সেবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ। আমার নিকট খুব ভাল তামাক ছিল, তাহাদিগকে উহা দেখিতেও দিলাম। তাহারা আঘ্রাণ লইয়াই বলিল, 'এ ত অতি দুর্গন্ধ। ইহাকে তুমি সুগন্ধ বল?' এইরূপে গন্ধ আস্বাদ সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমাজ দেশ কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত।

কোন সময়ে শীকার করা আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কোন পশু পক্ষী দেখিলে কতক্ষণে উহাকে বধ করিব, এই জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করিত। বধ করিতে না পারিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। এখন ওরূপে প্রাণি-বধ একেবারেই ভাল লাগে না। কোন জিনিসটা ভাল লাগা বা মন্দ লাগা কেবল অভ্যাসের কাজ।

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জেদ দেখা যায়। ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজি এ সম্বন্ধে একটী গল্প বলিতেন। এক সময়ে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিবার জন্য অন্য এক রাজা সদলবলে উপস্থিত হইল। কাজেই, শত্রুর হাত হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায় স্থির করিবার জন্য সেই রাজ্যে এক মহা সভা আহূত হইল। সভায় ইঞ্জিনীয়ার, সূত্রধর, চর্ম্মকার, কর্ম্মকার, উকিল, পুরো-হিত প্রভৃতি সভাসদ্‌গণ উপস্থিত হইলেন। ইঞ্জিনীয়ার বলিলেন, সহরের

চারিদিকে বেড়া দিযে এক বৃহৎ খাল খনন কর। সূত্রধর বলিল, কাঠের দেওয়াল দেওযা যাক্। চামাব বলিল, চাম্ড়ার মত মজবুত কিছুই নাই ; চাম্ড়ার বেড়া দাও। কামাব বলিল, ও সব কাযের কথা নয ; লোহার দেওযালই ভাল ; ভেদ কবে গুলি গোলা আস্তে পার্বে না। উকিল বলিলেন, কিছুই কবিবাব দরকাব নেই ; 'আমাদের বাজ্য লইবার শত্রুদের কোন অধিকাব নাই', এই কথাটী, তাহাদের তর্ক যুক্তি দ্বারা বুঝাইযা দেওযা যাউক। পুরোহিত বলিলেন, তোমবা সকলেই বাতুলের মত প্রলাপ বকিতেছ। হোম, যাগ কব, স্বস্ত্যযন কর, তুলসী দাও, শত্রুবা কিছুই কবিতে পারিবে না। এইরূপে বাজ্য বাচাবার কোন উপায় স্থির না কবিযা তাহাবা নিজ নিজ মত লইযা মহা হুলস্থূল তর্ক আবম্ভ করিল। এই বকম কবাই মানুষেব স্বভাব !

এই গল্পটী শুনিয়া আমাবও মানুষেব মনেব একঘেযে ঝোঁকসম্বন্ধে একটী কথা মনে পড়িল। স্বামীজিকে বলিলাম, স্বামীজি, আমি ছেলে বেলায পাগলেব সহিত আলাপ কবিতে ভাবি ভাল বাসিতাম। একদিন একটী পাগল দেখিলাম, বেশ বুদ্ধিমান , ইংবাজীও একটু আধটু জানে ; তাব চাই কেবল জল খাওযা। সঙ্গে একটী ভাঙ্গা ঘটী। যেখানে জল পায়, খাল হউক, হোউজ হউক, নুতন একটা জলেব জাযগা দেখ্‌লেই সেখানকাব জল পান কব্‌ত। আমি তাহাকে এত জল খাবার কাবণ জিজ্ঞাসায় বলিল, 'Nothing like water sir !' (জলের মত কোন জিনিষই নাই, মশাই !) তাহাকে আমি একটা ভাল ঘটী দিবাব ইচ্ছা প্রকাশ কবিলাম, সে উহা কোন মতে লইল না। কারণ জিজ্ঞাসায বলিল, এটি ভাঙ্গা ঘটী বলিযাই এতদিন আছে। ভাল হইলে অন্যে চুবি কবিয়া লইত। স্বামীজি গল্প শুনিযা বলিলেন, "সে ত বেশ মজাব পাগল। ওদের Monomaniac বলে। আমাদেব সকলেবই ঐ বকম এক একটা ঝোক আছে। আমাদেব সেটা চেপে বাখ্‌বাব ক্ষমতা আছে। পাগলের তা নাই। পাগলেব সহিত আমাদেব এই টুকু মাত্র প্রভেদ। বোগে, শোকে, অহঙ্কাবে, কামে, ক্রোধে, হিংসায বা অন্য কোন অত্যাচার বা অনাচাবে মানুষ দুর্ব্বল হযে ঐ সংযম টুকু হাবালেই মুস্কিল। মনের আবেগ আব চাপ্‌তে পাবে না। আমরা তখনি বলি, ও ব্যাটা খেপেছে। এই আব কি।"

স্বামীজির স্বদেশানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল; এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক দিন ঐ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের আপন আপন দেশের প্রতি অনুরাগ নিত্যকর্ত্তব্য হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের উপর সমদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সকল দেশের কল্যাণচিন্তা হৃদয়ে রাখা ভাল। ঐ কথার উত্তরে স্বামীজি যে জ্বলন্ত কথাগুলি বলেন, তাহা কখন জন্মেও ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিলেন,—"যে আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষ্‌বে?" আমাদের প্রচলিত ধর্ম্মে, আচার ব্যবহারে, সামাজিক প্রথায় যে অনেক দোষ আছে, স্বামীজি এ কথা স্বীকার করিতেন। বলিতেন, "সে সকল সংশোধন করিবার চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কিন্তু তা বলিয়া সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সে সকল ঘোষণা কর্‌বার আবশ্যক কি? ঘরের গলদ্ বাহিরে যে দেখায়, তার মত গর্দ্দভ আর কে আছে? Dirty linen must not be exposed in the street." (ময়লা কাপড় চোপড় রাস্তার ধারে, লোকের চোখের সাম্‌নে রাখাটা উচিত নয়।)

খৃষ্টান মিশনরীগণের সম্বন্ধে একদিন কথাবার্ত্তা হয়। তাঁহারা আমাদের দেশে, কত উপকার করেছেন ও কর্‌ছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথা বলি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু অপকারও বড় কম করেন নাই। দেশের লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গোল্লায় দেবার বিলক্ষণ যোগাড় করেছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও নাশ হয়। এ কথা কেউ কি বোঝে? আমাদের দেব দেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্ম্মের কুৎসা না করিয়া কি তাহাদের নিজের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান যায় না? আর এক কথা, যিনি যে ধর্ম্মমত প্রচার কর্‌তে চান, তাঁর তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কায করা চাই। অধিকাংশ মিশনরী মুখে এক, কাযে আর। আমি কপটতার উপর ভারি চটা।"

একদিন ধর্ম্ম ও যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা অতি সুন্দর ভাবে বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম যত দূর মনে আছে, এইখানে লিখিলাম,—

"সকল প্রাণীই সতত সুখী হইবার চেষ্টায় বিব্রত। কিন্তু খুব কম লোকেই সুখী। কায কর্ম্মও সকলে অনবরত করিতেছে, কিন্তু তাহার অভিলষিত ফল পাওয়া প্রায় দেখা যায় না। এরূপ বিপরীত ফল পাই-

বার কারণ কি, তাহাও সকলে বুঝিবার চেষ্টা করে না। সেই জন্যই মানুষ দুঃখ পায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হউক না কেন, কেহ যদি ঐ বিশ্বাসবলে আপনাকে যথার্থ সুখী বলিয়া অনুভব করে, তাহা হইলে তাহার ঐ মত পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করা কাহারও উচিত নহে, এবং করিলেও তাহাতে সুফল ফলে না। তবে, মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, যখন দেখিবে, কাহারও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শুনিবার বাস্তবিক আগ্রহ আছে, তখনই জানিবে যে, তাহার কোন একটা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই।

"ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুখী করা। পরজন্মে সুখী হইব বলিয়া ইহ জন্মে দুঃখ ভোগ করাও বুদ্ধিমানের কায নহে। এই জন্মে, এই মুহূর্ত্ত হইতেই সুখী হইতে হইবে। যে ধর্ম্ম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইবে, তাহাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবী দুঃখও অনিবার্য্য। শিশু, অজ্ঞানী ও পশুপ্রকৃতির লোকেরাই ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখমিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে করিয়া থাকে। যদি ঐ সুখকেও কেহ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া চিরকাল সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিন্ত ও সুখী থাকিতে পারে, তাহাও মন্দ নহে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এরূপ লোক দেখা যায় নাই। সচরাচর ইহাই দেখা যায়, যে, যাহারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই সুখ মনে করে, তাহারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান্, বিলাসী লোকদের অধিক সুখী মনে করিয়া দ্বেষ করিয়া থাকে এবং তাহাদের বহুব্যয়সাধ্য উচ্চশ্রেণীর ইন্দ্রিয়ভোগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া অসুখী হইয়া থাকে। সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, পৃথিবীতে আর জয় করিবার দেশ নাই ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য বুদ্ধিমান্ মনীষীরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া ভোগ বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্ম্মে যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হইতে পারে!

"বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিই ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেই জন্য তাহাদের উপযোগী ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক; নতুবা কিছুতেই উহা তাহাদের সন্তোষপ্রদ হইবে না—কিছুতেই তাহারা উহার অনুষ্ঠান করিয়া যথার্থ সুখী হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্ম্মমত, তাহাদের নিজেকেই ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেখিয়া ঠেকিয়া, বাছিয়া লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায়

নাই। ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, গুরূপদেশ, সাধুদর্শন, সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি ঐ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করে মাত্র।

"কর্ম্ম সম্বন্ধেও জানা আবশ্যক যে, কোন না কোন প্রকার কর্ম্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না এবং কেবল ভাল বা কেবল মন্দ, জগতে এরূপ কোন কর্ম্মই নাই। ভালটা করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু মন্দ করিতেই হইবে। আর সেজন্য কর্ম্ম দ্বারা যেমন সুখ আসিবে, কিছু না কিছু দুঃখ এবং অভাববোধও সেই সঙ্গে আসিবেই আসিবে; উহা অবশ্যম্ভাবী। সে দুঃখটুকু যদি না লইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিষয়-ভোগ-জনিত আপাত সুখ লাভের আশাটাও ছাড়িতে হইবে। অর্থাৎ স্বার্থ-সুখ অন্বেষণ না করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সকল কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। উহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। গীতাতে ভগবান্ অর্জ্জুনকে উহারই উপদেশ করিবার জন্য বলিতেছেন, 'কাজ কর, কিন্তু ফলটা আমাকে দাও; অর্থাৎ আমার জন্যই কাজ কর।'"

কোন বিষয়ের ইতিহাসটা যে কতদূর ঠিক ঠিক লেখা হয়, সে বিষয়ে আমার বড়ই সন্দেহ। তাহার কারণ অনেক। গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কোন সহরে পদার্পণ হইতে সেই সহর ত্যাগ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা যতদূর সম্ভব স্বচক্ষে দেখার এবং পরে তাহারই বিবরণ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সকলে পাঠ করার আমাদের মত চাকুরে লোকের অনেক সুবিধা। সচরাচর আমাদের দৃষ্ট ঘটনাবলির সহিত ঐ সকল বিবরণের এত বিভিন্নতা দেখা যায় যে, অবাক্ হইতে হয়। চারিদিন পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তাহাই যথাযথ লিপিবদ্ধ করা যদি এত কঠিন হয়, তাহা হইলে চারি শত, চারি সহস্র বা চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে ঘটনা হইয়াছে, তাহার ইতিহাস কতদূর যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতেই পারা যায়!

আর এক কথা, খৃষ্টান মিশনরীদের মধ্যে অনেকে বলেন, তাঁহাদের বাইবেলের প্রত্যেক ঘটনাটী যে সালে, যে তারিখে, যে ঘণ্টায় এবং যে মিনিটে ঘটিয়াছিল, তাহা একেবারে ঘড়ি ধরিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু একদিকে Conflict between religion and Science প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তকে বাইবেলের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদেরই দেশের এখনকার পণ্ডিতদের মতামত পাঠ করিয়া বাইবেলের ঐতিহাসিকত্ব একদিকে যেমন বেশ বুঝা যায়, সেইরূপ অন্যদিকে মিসনরীদলের দ্বারা অনুবাদিত হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র সকলের অপূর্ব্ব

বিবরণ পাঠ করিয়া তাঁহাদের লিখিত ইতিহাসও যে কতদূর ঠিক হইবে, তাহাও বুঝিতে বাকি থাকে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মানবজাতির সত্যানুরাগ এবং ইতিহাসে লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর হরিভক্তি প্রায় একেবারে উড়িয়া যায়!

গীতা বাইবেল্ কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ নিবদ্ধ ঘটনাবলীর যথাযথ ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সেজন্য আমার আদৌ বিশ্বাস হইত না। স্বামীজিকে একদিন জিজ্ঞাসা করি যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অনতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম উপদেশ, যাহা ভগবদ্গীতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা কি না? উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বড়ই সুন্দর। তিনি বলিলেন, "গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন কালে ইতিহাস লেখার বা পুস্তকাদি ছাপার এখনকার মত এত ধূমধাম ছিল না; সে জন্য তোমাদের মত লোকের কাছে ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু গীতোক্ত ঘটনা যথাযথ ঘটিয়াছিল কিনা, তজ্জন্য তোমাদের মাথা ঘামাবার কারণও দেখিতেছি না। কেন না, যদি কেহ, শ্রীভগবান্ সারথি হইয়া অর্জ্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন, ইহা অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে তোমাদের বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই কি তোমরা গীতাতে যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা বিশ্বাস করিবে? সাক্ষাৎ ভগবান্ যখন তোমাদের নিকট মূর্ত্তিমান্ হইয়া আসিলেও তোমরা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ছোট ও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে বল, তখন গীতা ঐতিহাসিক কিনা, এ বৃথা সমস্যা লইয়া কেন ঘুরে বেড়াও? পার যদি তো গীতার উপদেশ গুলি যতটা পার, জীবনে পরিণত করিয়া কৃতার্থ হও। পরমহংসদেব বলিতেন, আম খা, গাছের পাতা গুনে কি হবে? আমার বোধ হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর বিশ্বাস অবিশ্বাস করা is a matter of personal equation. মানুষ কোন এক অবস্থা বিশেষে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধারকামনায় পথ খুঁজিতে থাকে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কোন ঘটনার সহিত তাহার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিতে পাইলে ঐ ঘটনা ঐতিহাসিক বলিয়া নিশ্চিত বিশ্বাস করে। আর ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ঐ অবস্থার উপযোগী উপায়ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে।"

স্বামীজি একদিন শারীরিক এবং মানসিকশক্তি অভীষ্ট কার্য্যের নিমিত্ত সংরক্ষণ করা যে প্রত্যেকের কতদূর কর্ত্তব্য, তাহা অতি সুন্দর ভাবে

আমাদের বুঝাইয়াছিলেন,—"অনধিকার চর্চ্চায় বা বৃথা কাযে যে শক্তি ক্ষয় করে, অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধির জন্য পর্য্যাপ্ত শক্তি সে আর কোথায় পাইবে? The sum total of the energy which can be exhibited by an ego is a constant quantity. প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে নানাভাবে প্রকাশিত হইবার যে শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা সসীম, সেই শক্তির অধিকাংশ একভাবে প্রকাশিত হইলে ততটা আর সুতরাং অন্যভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। ধর্ম্মের গভীর সত্য সকল জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অনেক শক্তির প্রয়োজন; সেই জন্যই ধর্ম্মপথের পথিকদিগের প্রতি বিষয়ভোগ ইত্যাদিতে শক্তি ক্ষয় না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা শক্তি সংরক্ষার উপদেশ সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।"

স্বামীজি বাঙ্গলাদেশের পল্লিগ্রাম ও তথাকার লোকদের উপর বড় একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। পল্লিগ্রামের একই পুষ্করিণীতে স্নান, জলশৌচ প্রভৃতি এবং সেই পুকুরের জলই পান করা প্রথার উপর তিনি ভাবি বিরক্ত ছিলেন। প্রায়ই বলিতেন, "যাহাদের মস্তিষ্ক মলমূত্রে পরিপূর্ণ, তাহাদের আশা ভরসা আর কোথায়? আবার ঐ যে পাড়াগেঁয়ে লোকেদের অনধিকার চর্চ্চা করা, উহা অত্যন্ত খারাপ। সহরের লোকেরও যে অনধিকার চর্চ্চা নাই, তাহা নহে। তবে তাহাদের সময় কম, কারণ, সহরে খরচ বেশী; কাযেই খাটুনিও বেশি। সে খাটুনি খেটে আর বড় টেপা, তামাক খাওয়া ও পরনিন্দা করবার সময় থাকে না। নইলে সহরে ভূতগুলো ঐ বিষয়ে পাড়াগেঁযে ভূতের ঘাড়ে চড়ে বেড়াত।"

স্বামীজির এক এক দিনের এইরূপ কথাবার্ত্তা ধরিয়া রাখিতে পারিলে এক এক খানি বৃহৎ পুস্তক হইত। একই প্রশ্নের বারবার একইভাবে উত্তর দেওয়া এবং একই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝান তাঁহার রীতি ছিল না। যতবারই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ততবারই উহা নূতন ভাবে নূতন দৃষ্টান্ত সহায়ে এমনি বলিবার ক্ষমতা ছিল যে, উহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া লোকের বোধ হইত এবং তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে ক্লান্তি বোধ দূরে থাকুক, আগ্রহ ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। বক্তৃতা করা সম্বন্ধেও তাঁহার ঐ প্রথা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবার বিষয় গুলি (points) লিখিয়া তিনি কোন কালে বক্তৃতা করিতে পারিতেন

না। বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হাসি তামাসা, সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা, বক্তৃতার সঙ্গে কিছুমাত্র সম্বন্ধহীন বিষয় সকল লইয়াও অনবরত চর্চ্চা করিতেন। বক্তৃতায় কি যে বলিবেন, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। আমরা যে কয়টা দিন তাঁহার সংস্পর্শে থাকিয়া ধন্য হইয়াছিলাম, সেই কয়টা দিনের তাঁহার কথাবার্ত্তার বিবরণ আরও যত দূর পারি, বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

নূতন জাপান।

স্বামী সদানন্দ] [পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

জাপানি গৃহস্থ বাড়ী তৈয়ারি করবার আগে গণককার ডেকে গণাবে, বাড়ীর সদর দরজা কোন্ মুখে করলে মঙ্গল হবে। সহরেও, রাস্তার উপর সদর দরজার সুমুখ থাকে না। সহরে এরকমে বাড়ী করা সুবিধা নয়, সেই জন্য সকল বাড়ীর সামনে রাস্তার ধারে, উঁচু কাঠের বেড়া— প্রবেশের জন্য একটা গেট (gate) আছে। গেট দিয়ে ঢুকে সদর দরজায় পৌছান যায়। প্রত্যেক বাড়ীর সদর সুতরাং ভিন্নদিকে। তিথি নক্ষত্র মিলিয়ে, ভাল দিন দেখে বাড়ী আরম্ভ হয়। তারপর যেদিন চাল ছাওয়া হবে—জাপানে সবই কাঠের বাড়ী—সর্দ্দার ছুতর বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করে শুভদিনে ছাইতে আরম্ভ করে। বাড়ী তৈয়ারি হলে পর কারিকর মজুর সকলকে পেটভরে খাওয়াতে হয়, কিছু কিছু বক্‌সিস্‌ও দিতে হয়। চালের উপর থেকে একজন নীচে কেক (cake) ছড়িয়ে দেয়; পাড়ার ছেলেরা এদেশে হরির লুটের মত কুড়ুতে থাকে।

বাড়ী প্রস্তুত হলে, জানলার ফ্রেমে (frame) পাতলা কাগজ বসিয়ে ঢেকে দেয়—জাপানে সার্সি খড়খড়ির ব্যবহার নাই। কাগজের ভিতর দিয়ে আলো প্রবেশের কোন বাধা থাকে না; হাওয়ার দরকার হলে ফ্রেমখানা— শোজি—কাটের দেয়ালে ঢুকিয়ে দেয়। সকল ঘরের সামনে বারান্দা— ইয়েন—আছে, কলিকাতার দোকানের মত কাটের পরদা—আমাদো—দিয়ে ঢাকা। ঝড় বৃষ্টির সময় ও রাত্রে পরদা বন্ধ থাকে, দিনের বেলায় খোলা থাকে। কাটের মেজের উপর মাদুরের গদি পাতা —উপর নীচে মাদুর,

ভিতরে খড় পোরা, চারিধারে কাল কাম্‌বিস দিয়ে মোড়া। বসা, শোয়া, খাওয়া, কাজ কর্ম্ম সমস্ত এই মাদুরের উপর।

জাপানিরা পশ্চিমে ধরণে হাঁটু মুড়ে বসে, বসবার সময় মাদুরের উপর ছোট আসন পেতে দেয়, আহারের সময় ছোট কাটের চৌকিতে কাটের বা চীনে মাটির রেকাব, বাটী মাদুরের উপরই সাজিয়ে দেয়; কাটের "হিবা-চিতে" আগুণ রেখে মাদুরের উপরই আগুণ পোয়ায়; ছেলেরা মাদুরের উপরই খেলা করে, রাঁধুনি বাঁশের নলে ফুঁ দিয়ে মাদুরের উপর উনুনে আগুণ ধরায়। জাপানি ঘরে কোন রকম আসবাব রাখে না, শোবার খাট, বসবার চেয়ার, লেখ্‌বার টেবিল, দেয়ালে ছবি আয়না প্রভৃতি দিয়ে ঘর জোড়া করে না। কেবল একটা কাটের দেয়ালে আলমারি বা শেল্‌ফ (shelf) তার ভিতর কাপড় চোপড় বিছানাপত্র পর্য্যন্ত সব পুরে রেখে দেয়। আসবাবের মধ্যে বসবার ঘরে সুন্দর কাজকরা কুলুঙ্গির (তোকোনোমার) ভিতর ফুলদানে সাজান ফুলের তোড়া।

এই ফুলের তোড়া তৈয়ারি করিবার জন্য জাপানি মেয়েরা বিশেষ শিক্ষালাভ করে। তোড়ায় ফুটন্তফুল, কুঁড়ি, ডাল, পাতা এমন করে সাজায়, যেন স্বাভাবিক অবস্থায় ফুল ফুটে রয়েছে। এ ছাড়া জাপানি ঘরে অন্য কোন আসবাব দেখা যায় না। সকল বাড়ীতেই একটা ভাণ্ডার ঘর (কুরা), এমন তইরি যে, আগুণ লাগ্‌বার ভয় নাই, এই ঘরে যত দামি জিনিষ তোলা থাকে, ক্রিয়া কলাপের সময় বার ক'রে ঘর সাজায়। সকল গৃহস্থের বাড়ীতে একটা করে ঠাকুর ঘর আছে—সিন্তোরা কামিদানা, বৌদ্ধেরা বুত্‌সুদানা বলে। একটা কাষ্ঠাসনে সিন্তো গৃহস্থ হলে ঠাকুরের চিহ্ন একখানি আরসি, অসি ও সাদা কাগজ দান (গোহি) প্রতিষ্ঠা করে এবং নানাবিধ আহারীয় নিবেদন ও পুরাকালিক একটী দীপদানে তৈল দিয়া একখণ্ড সোলা প্রজ্ব-লিত করে। বৌদ্ধ গৃহস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপনা করে ও ধূপদীপ নৈবেদ্য দিয়া নিত্যপূজা করিয়া থাকে। জাপানি গৃহস্থ যেমন অবস্থাপন্ন হক না, সক-লেরই বাড়ীর সঙ্গে একটু করে বাগান থাকে, তাতে ফুল, ফল, তরি-তরকারি সকল রকম গাছই বিশেষ যত্নে রোপণ করে। এরা নিজে যেমন খর্ব্বকায়, খর্ব্বকায় গাছ তৈয়ারি কর্‌তে তেমনি সিদ্ধহস্ত। আমরা যে বাড়ীতে অতিথি হইলাম, তাহার বাগানে একটি লাউগাছে

একগাছ লাউ ধবেচে, কিন্তু লাউগুলি ছোট জল খাবার ঘটির চেয়ে বড় হবে না।

জাপানি ঘরের ব্যবস্থা মত বারান্দায় জুতা রাখিয়া আমরা ঘবে প্রবেশ কবিলাম। আমাদের বস্‌বাব জন্য মাদুরের উপর আসন পাতা হল। গৃহস্বামিনী—জাপানে অতিথি সংকারের ভার তাঁরই উপর,—ছোট কাটের চৌকি সামনে পেতে দিযে চা এনে দিলেন। আমাদের দেশের পান তামাকের মত এটি সাধাবণ অতিথিসৎকার। হাস্য বদন, অমাযিকতা, সাদব সম্ভাষণ, আর মাথা নীচু, গৃহকর্ত্রীর সকল কাজের সঙ্গে যেন জড়িয়ে রয়েছে। আমরা ইন্দোজেন (হিন্দুস্থানেব লোক) জাপানে বেড়াতে এসেছি শুনে বিশেষ প্রীতি প্রকাশ ক'র্‌লেন। আমাদেব জাপানি বন্ধু তাঁর পিতৃ-বন্ধুর সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌লেন। কিন্তু অতিথি বাড়ী এসে কথা কবার লোকাভাবে চুপ করে বসে থাকবে, এটা অত্যন্ত অভদ্রতা। গৃহস্বামিনী জাপানি ছাড়া অন্যভাষা জানেন না, তাতে ক্ষতি কি? তিনি নানা-প্রকার ছবিব বই এনে আমাদেব সঙ্গে এক বকমে মনের ভাব প্রকাশ করে সমযটা কাটিযে দিলেন।

জাপানের মেযেবা ছেলে বযস থেকে এই সকল শিষ্টাচাব শিক্ষা করে। এটা তাদের প্রধান শিক্ষা। কেবল দেখে শুনে এ শিক্ষা লাভ হয না। লেখাপড়া শেথার মত বিশেষ শিক্ষকের কাছে ইহা শিখ্‌তে হয়। যে এই শিক্ষায বিশেষ উন্নত, সমাজে তার খুব মান, সকলে তার গুণ গায। যার ভাল শিষ্টাচাব শিক্ষা হয নাই, সমাজে তার নিন্দা। অভ্যর্থনাব সময় কি ভাবে মাতা নিচু ক'র্‌তে হয়, কি ভাবে দাঁড়াতে হয, হাত দুখানি কিভাবে বাখ্‌তে হয, কি নিযমে দরজা খুল্‌তে ও বন্ধ কর্‌তে হয, দাঁড়াতে বস্‌তে হয়, আহারের বেকাব ও বাটি এগিয়ে দিতে হয়, কিরূপে আহারের দ্রব্য পরিবেশন কর্‌তে হয, অতিথি, আত্মীয-কুটুম্বের সঙ্গে, পিতা মাতা, ভাইভগিনী, দাস দাসীব সঙ্গে কিরূপে অভ্যর্থনা ও সদালাপ কর্‌তে হয, সংসারের সামান্য কাযে, চা খাবার চৌকি পাতা থেকে, চার বাটি মাজা পর্য্যন্ত কিরূপ আচারে নির্ব্বাহ কবতে হয, জাপানি সমাজে এ সকলেব আইন বাঁধা। সমস্ত আচারেব ভিতব জাপানি, সৌন্দর্য্যেব বিকাশ, প্রীতিব স্ফুরণ দেখ্‌তে চায। জাপানি মেযে গুরুজনেব বাধ্য হবে, হাস্যমুখে তাঁদেব আজ্ঞা পালন কর্‌বে, কোন

কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করবে না, সদাচারপরায়ণ, সৌম্যদর্শন, শুচি ও পরিচ্ছন্ন থাক্‌বে, এইটী তাদের জাতীয় আদর্শ। মনু লিখেচেন, স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন; কোন কালে স্বাধীন থাক্‌বে না। এ আইন ভারতে যেমন, জাপানেও তেমনি। আত্মসংযম অভ্যাস জাপানি স্ত্রীলোকের প্রধান অলঙ্কার। শোক, যন্ত্রণা, ক্রোধ, বিরক্তিতে অন্তর্দ্দাহ হলেও, সাবধান যেন বাহিরে প্রকাশ না পায়। মনের আগুণ মনে লুকিয়ে, যদি হাস্যমুখে ও প্রিয় ব্যবহারে অপরকে সুখী করতে না পার্‌লে, তাহলে তোমার শিষ্টাচার শিক্ষা হয় নাই। জাপানি স্ত্রীলোকে নিত্য এরূপ অগ্নিপরীক্ষা দিবা থাকে। জাপানি স্ত্রীলোকের জীবনাদর্শ, ধৈর্য্য ও সম্পূর্ণ আত্মবলিদান। নিজের স্বার্থ এত টুকু থাক্‌বে না। পিতা, মাতা, স্বামী, আত্মীয়, অতিথি, অভ্যাগত সকলকে সুখী কর্‌বার ভার তার উপর, নিজের সুখচিন্তার সময় তার নাই। জাপানি শিষ্টাচারের ইহাই নিগূঢ় রহস্য। জাপানি মেয়ে জন্ম হতে এই শিষ্টাচার শিক্ষায বৰ্দ্ধিত। সে অবগুণ্ঠনবতী, অশ্রুতবাক্, লজ্জাসঙ্কুচিতদেহ অবশ্য নয় কিন্তু প্রগলভতা ও স্বাধীন চেষ্টা তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাহার স্বভাব সরল, মধুর, আত্মীয় স্বজনকে সুখী কর্‌তে সদা ব্যস্ত। অপরিচিত অতিথি অভ্যাগতকে যেরূপ আদরে গ্রহণ করে, বিদেশীর চক্ষে তাহা লীলাবিলাস বলে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু মনে রাখ্‌বে, জাপানি স্ত্রীলোক হাবভাবপরায়ণা নয়, ইহা তাহার আজন্ম শিক্ষার ফল। জাপানি তোমার নিকট এইরূপ মধুর শিষ্টাচার প্রার্থনা করে। তোমার অযথা রসিকতা বা বিলাস প্রকাশ, তাহার চক্ষে কদর্য্য অভদ্রতা; তাহা অমার্জ্জনীয়। পূর্ব্বে বলেছি, অতিথি অভ্যাগত বা নিমন্ত্রিত বাটী আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনার ভার গৃহিণীর, তাঁর অবর্ত্তমানে এ কার্য্য কন্যারা গ্রহণ করে। আহারাদির পরিবেশন গৃহিণী বা তাঁর কন্যাকে স্বহস্তে কর্‌তে হয়। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, দশটা চাকর চাকরাণী রাখ্‌লেও, সপরিবারে সেবা করে থাকেন।

অতিথি সৎকার শেষ হলে আমরা সিমেণ্টের কারখানা দেখ্‌তে যাই। আট দশটা বৃহদাকার অগ্নিকুণ্ডে রাশি রাশি পাতর পোড়ান হচ্চে। বড় বড় চিম্নিতে ঐ আগুণ তাতিয়ে রাখ্‌চে। পোড়া পাতর গুঁড় করে, চুন ও অন্যান্য মসলা মিসিয়ে, ইটের মত করে গড়ে, গরম ঘরে সেগুলকে

শুষ্ক করা হচ্চে। শুষ্ক হলে আবার কলে গুঁড়িয়ে সিমেণ্ট প্রস্তুত হচ্চে। এই সিমেণ্টের কারখানা, ইউরোপীয নকলে প্রস্তুত। জাপানি গভর্ণমেণ্ট ১৮৭৬ সালে প্রথম কারখানা নির্ম্মাণ ক'রে, বিদেশী কারিকর রেখে সিমেণ্টের কায আরম্ভ করেন। যখন দেশের লোক সিমেণ্ট প্রস্তুত কর্‌বার প্রণালী শিখ্‌লে, মানুষ তৈযারি হল, লাভের ব্যবসায হ'যে দাঁড়াল; তখন দেশের লোকের হাতে ফেলে দিলেন। বিদেশী ধরণের যত কল কারখানার ব্যবসায এই কৌশলে জাপানিরা শিখেচে। বাপ যেমন ছেলে মানুষ করেন, জাপানি গভর্ণমেণ্ট, বর্ত্তমান সম্রাটের সুশাসনে, সেই রকম করে জাপানকে গ'ড়ে তুল্‌চে। কিন্তু রাজার চেষ্টা যদি এক গুণ, প্রজার চেষ্টা দশগুণ। জাপানের রাজা প্রজা এক মন হযে, দেশের কল্যাণের জন্য আপনাদের উৎসর্গ ক'রেচে। তাই আজ, ত্রিশ বৎসর অতীত হতে না হতে অসভ্য জাপানের কার্য্যকৌশলে, সভ্য জগৎ স্তম্ভিত। যদি মন মুখ এক হয, নিজের উপর বিশ্বাস আর সত্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে, তা'হলে মুষ্টিমেয লোক যে জগৎ টলিযে দেবে, তার আর আশ্চর্য্য কি।

অনেক প্রাচীন কাল হতে জাপানে সুতর ও রেসমি কাপড়, চিকন কায, নানাবর্ণের বার্নিস কায, ধাতু, কাট ও বাঁশের গড়ন জিনিষ, খোদাই কায, কর্পূর প্রস্তুত প্রভৃতি ব্যবসায প্রচলিত ছিল। এগুলি যদিও চীনের কাছে জাপানের শেখা, কিন্তু এ সকলের যথেষ্ট উন্নতি জাপানিরা করেচে। এ সমস্তই হাতের কাজ, অতি সামান্য ও স্থূল যন্ত্রের সাহায্যে, বহু সময়ে যৎসামান্য প্রস্তুত হইলেও, ইহাতে যেরূপ শিল্পনৈপুণ্য, সুন্দর রুচি ও বিচিত্র কারুকার্য্য জাপানিরা দেখিযেচে, তা দেখ্‌লে অবাক্ হতে হয। এগুলি জাপানের আদি ব্যবসায, ইহার শিল্পচাতুর্য্য জাপানের নিজের সম্পত্তি। এ সকল কারুকার্য্যের প্রত্যেক বর্ণে, প্রত্যেক গঠনে, জাপানি মনের সৌন্দর্য্যস্পৃহা ফুটে বেরুচ্চে। কিন্তু যখন থেকে ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞান, লোকের ঐহিক সুখ সাধনে নিযুক্ত হল,—মানবমনের এই সকল অতুলনীয সৃষ্টি, প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন হযে রইল। কিন্তু ইহাও মহাসত্য, এই বৈজ্ঞানিক যুগে, যে দেশ বা যে জাতি, বিজ্ঞান-শিক্ষারূপ যুগধর্ম্ম অবলম্বন না কর্‌বেন, সে জাতির পরিণাম নিশ্চিত শোচনীয। জাপান এ সত্যটা সমযে বুঝ্‌লে—মহা উদ্যমে, অটল অধ্যবসাযে, সকল বিঘ্ন বিপত্তি তুচ্ছ করে, এই জ্ঞান উপার্জ্জনে মন দিলে।

১৮৬৮ সালে বর্ত্তমান সম্রাটের পুনরভিষেক হ'তে, জাপানে নূতন যুগের সূত্রপাত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে কোনরূপ কলকারখানা ছিল না। ১৮৫৩ সালে প্রথম কামান তৈয়ারির কারখানা স্থাপিত হয়, ১৮৬৩ সালে একটা সুতার কল বিলাত হ'তে আনা হয়, তার পর ১৮৭৩ সালে একটা রেসমের কারখানা খোলা হয়। ক্রমে ১৮৭৬ সালে সিমেন্টের কারখানা, ১৮৭৭ সালে কাচ ও কাগজ প্রস্তুত, সাবান, চীনে বাসন, রঙ্গের কারখানা এবং ঢালাই ও কল নির্ম্মাণ কারখানা, ১৮৭৮ সালে রেসমি ও পশমি কাপড়ের কল, ১৮৮২ সালে সুত ও কাপড়ের কল জাপানি গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেন। এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত ক'র্‌বার ও কল চালাবার শিক্ষা দেশীয় লোকের ছিল না। কাজেই সমস্ত বিদেশী লোকের হাতে রাখ্‌তে হয়েছিল। ১৮৭৩ সালে গভর্ণমেণ্ট প্রথম কলেজ স্থাপন করে, বিজ্ঞান, শিল্প ও কল চালান সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে লোক তৈয়ারি হতে লাগ্‌ল। দেশ বিদেশে জাপানি ছেলেরা নানা কষ্ট ও অত্যাচার সহ করে, বিশেষ বিদ্যা শিখে, দেশে ফিরে, সেই সব বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগ্‌ল। এখন জাপানে নানাস্থানে ৮৩টি টেক্‌নিকাল স্কুল, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে সকল রকম কায শিক্ষা দিচ্চে। সাধারণ লোক এই সকল নূতন শিক্ষায় ও নূতন ব্যবসায়ে নিজের ও জাতির উন্নতি বুঝে নূতন পথে আপনাদের উপযোগী কর্‌চে। ১৮৮১ সালে গভর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকের দ্বারা নানা রকম কল ও ব্যবসায় বেশ চল্‌চে দেখে, নিজের স্থাপিত কল কারখানা প্রজাদের বিক্রয় করেচেন। এখন পশমের কারখানা ছাড়া গভর্ণমেণ্ট অন্য ব্যবসায় চালান না। এখন জাপানে নানাবিধ ব্যবসায় ছয় সাত হাজার কল চ'ল্‌চে, তার মধ্যে অর্দ্ধেক হাতে চালান, অপরার্দ্ধ ষ্টিম, তাড়িত বা অন্য উপায়ে চালিত। প্রায় আড়াই হাজার জয়েণ্টষ্টক ও লিমিটেড্ কোম্পানি বত্রিশ কোটী টাকা মূল ধনে এই সমস্ত কল চালাচ্চে। সর্ব্বসুদ্ধ প্রায় চার লক্ষ লোক কলে কাজ করে, তার মধ্যে আড়াই লক্ষ স্ত্রীলোক। ১৮৫৮ সালে জাপানের বাণিজ্য ব্যাপারে চার কোটী টাকা কেনা বেচা ছিল, ১৯০২ সালে আশী কোটী—চৌত্রিশ বৎসরে বিশগুণ বৃদ্ধি হয়েছে।

এই বিস্তৃত বাণিজ্য চল্‌চে, জাপানের অর্থে, জাপানিদের চেষ্টায়; ইহার ফলভাগী জাপান। কিন্তু হে ভারত! যে কোটী কোটী টাকার সদা-

খরি প্রতি বৎসর তোমার নামে সম্পন্ন হয়, তার কত অংশ তোমার সন্তানদের অর্থে? ইহার লাভাংশের ভোক্তা কে? যে বণিকের বেশ ধরে ইউরোপ, এসিয়ায় প্রবেশ করে, তার ভিতর বিজ্ঞানবলরূপ এক মহাতেজ প্রচ্ছন্ন ছিল। ইহা বোধ কর্‌বার শক্তি এসিয়ার ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এসিয়া ক্রমে ক্রমে এই মহাশক্তি প্রভাবে, খৃষ্ট ইউরোপের পদানত। এসিয়ার এই কালরাত্রির ঘোরান্ধকারে কেবল একটী আলো জ্বল্‌ছে, কেবল একটী আশাবাণী এই নীরব শ্মশানে শোনা যাচ্ছে। জাপান নিজের শক্তি আধারে এই বিজ্ঞান বল সঞ্চয় করে, এসিয়ার মুমূর্ষু দেহে, জীবন সঞ্চার কর্‌তে প্রস্তুত। বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানই একমাত্র মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। আমার মাতৃভূমি! এই মহামন্ত্র কি সাধন কর্‌বে?

(ক্রমশঃ।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। *

শ্রীম—কথিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের চৈতন্যলীলা দর্শন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(ভক্ত-মন্দিরে।)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যের গাড়ি করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতা যাইতেছেন।

আজ রবিবার। ৫ই আশ্বিন, ২১ শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ; আশ্বিনের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি। বেলা ৫টা বাজে। গাড়ির মধ্যে মহেন্দ্র মুখুয্যে,

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲ টাকা। বাঁধান মূল্য পাঁচ সিকা। ৫৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীশান্তিরাম ঘোষের নিকট, অথবা ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতায় শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ২য় ভাগ যন্ত্রস্থ।

মাষ্টার ও আরও দু একজন আছেন। একটু যাইতে যাইতে ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে ঠাকুর ভাব সমাধিতে মগ্ন হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন ঠাকুর বলিলেন, 'হাজরা আবার আমায় শেখায়। শ্যালা!' কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, আমি জল খাব। বাহ্য জগতে মন নামাইবার জন্য ঠাকুর ঐ কথা প্রায় সমাধির পর বলিতেন।

মহেন্দ্র মুখুয্যে (মাষ্টারের প্রতি)। তাহলে কিছু খাবার আন্‌লে হয় না?

মাষ্টার। ইনি এখন খাবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। আমি খাবো—বাহ্যে যাবো।

মহেন্দ্র মুখুয্যের হাতিবাগানে ময়দার কল আছে। সেই কলেতে ঠাকুরকে লইয়া যাইতেছেন। সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন। মহেন্দ্রের বাড়ী বাগবাজার ৺মদনমোহনজীর মন্দিরের কিছু উত্তরে। তাঁহার পিতা ঠাকুর পরমহংস-দেবকে জানেন না। তাই মহেন্দ্র ঠাকুরকে বাড়িতে লইয়া যান নাই। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রিয়নাথও একজন ভক্ত।

মহেন্দ্রের কলে তক্তোপোষের উপর সতরঞ্চি পাতা। তাহারই উপরে ঠাকুর বসিয়া আছেন ও ঈশ্বরের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও মহেন্দ্রের প্রতি)। চৈতন্যচরিতামৃত শুন্‌তে শুন্‌তে হাজরা বলে, এ সব শক্তির লীলা—বিভু এর ভিতর নাই। বিভু ছাড়া শক্তি কখন হয়? এখানকার মত উল্‌টে দেবার চেষ্টা!

"আমি জানি, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন জল আর জলের হিম-শক্তি। অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। তিনি বিভুরূপে সর্ব্বভূতে আছেন; তবে কোনও খানে বেশী শক্তির প্রকাশ, কোনও খানে কমশক্তির প্রকাশ। হাজরা আবার বলে যে, ভগবানকে পেলে তাঁর মত ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হয়, ষড়ৈশ্বর্য্য থাকবে, কিন্তু ব্যবহার করুক আর না করুক।

মাষ্টার। ষড়ৈশ্বর্য্য হাতে থাকা চাই। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ, হাতে থাকা চাই! কি হীনবুদ্ধি! যে ঐশ্বর্য্য কখন ভোগ করে নাই, সেই ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্য করে অধৈর্য্য হয়। যে শুদ্ধ ভক্ত, সে কখন ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে না।

কলবাড়ী পান সাজা ছিল না। ঠাকুর বলিলেন, পানটা আনিয়ে নেও।

ঠাকুর বাহ্যে যাইবেন। মহেন্দ্র গাড়ু করিয়া জল আনাইলেন ও নিজে

গাড়ু হাতে করিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে মাঠের দিকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর মণিকে সম্মুখে দেখিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, তোমার নিতে হবেনা, এঁকে দাও। মণি গাড়ু লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে কলবাড়ীর ভিতরের মাঠের দিকে গেলেন।

মুখ ধোয়ার পর ঠাকুরকে তামাক সেজে দেওয়া হইল। ঠাকুর মাষ্টারকে বলিলেন, সন্ধ্যা কি হয়েছে ? তা হলে আর তামাকটা খাইনা। সন্ধ্যা হলে সব কর্ম্ম ছেড়ে হরি স্মরণ কর্‌বে :

এই বলিয়া ঠাকুর হাতের লোম দেখিতে লাগিলেন—গোনা যায় কিনা। লোম যদি গোনা না যায়, তা হলে সন্ধ্যা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(নাট্যালয়ে—সমাধিমন্দিরে।)

ঠাকুরের গাড়ি বিডন্ ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। রাত প্রায় সাড়ে আটটা হইয়াছে। সঙ্গে মাষ্টার, মহেন্দ্র মুখুয্যে ও আরও দু একটি ভক্ত। টিকিট কিনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নাট্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ কয়েকজন কর্ম্মচারী সঙ্গে ঠাকুরের গাড়ির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও অভিবাদন করিয়া সাদরে উপরে লইয়া গেলেন। গিরীশ পরমহংসদেবের নাম শুনিয়াছেন। তিনি চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ পশ্চিমের Boxএতে বসান হইল। ঠাকুরের পার্শ্বে মাষ্টার বসিলেন। পশ্চাতে আরও দু একটি ভক্ত।

নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ হইয়াছে। নীচে অনেক লোক। ঠাকুরের বামদিকে ড্রপ সিন (Drop Scene) দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি Boxএ লোক হইয়াছে। এক একজন বেহারা নিযুক্ত আছে, তাহারা Box এর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছে। ঠাকুরকে হাওয়া করিবার জন্য গিরীশ একটী বেহারা নিযুক্ত করিয়া গেলেন।

ঠাকুর নাট্যালয় দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)। বাঃ এখান বেশ! এসে বেশ হলো!

"অনেক লোকে এক সঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন।

মাষ্টার। আজ্ঞে হা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে কত নেবে?

মাষ্টার। আজ্ঞে কিছু নেবেনা। আপনি এসেছেন, ওদের খুব আহ্লাদ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব মার মাহাত্ম্য।

ড্রপ সিন উঠিয়া গেল। এককালে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের উপর পড়িল।

প্রথমে পাপ আর ছয় রিপুর সভা। তারপর বনপথে বিবেক বৈরাগ্য ও ভক্তির কথাবার্তা।

ভক্তি বলিতেছেন, গৌরাঙ্গ নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই বিদ্যাধরীগণ আর মুনিঋষিগণ ছদ্মবেশে দর্শন করিতে আসিতেছেন।

"ধন্য ধরা নদীয়ায় এলো গোরা,
দেখ দেখনা বিমানে বিদ্যাধরীগণে
আসিতেছে হরি দরশনে।
দেখ প্রেমানন্দে হইয়ে বিভোল
মুনি ঋষি আসিছে সকল।"

বিদ্যাধরীগণ আর মুনিঋষিরা গৌরাঙ্গকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে স্তব করিতেছেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাদের দেখিয়া ভাবে বিভোর হইতেছেন। মাষ্টারকে বলিলেন, আহা! কেমন দেখো।

বিদ্যাধরীগণ ও মুনিঋষিগণ গান করিয়া স্তব করিতেছেন।

গীত।

পুরুষগণ।—কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
স্ত্রীগণ।—মাধব মনমোহন মোহন মুরলীধারী।
সকলে—হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার।

পুরুষগণ।—ব্রজ-কিশোর কালীয়হর কাতর-ভয়-ভঞ্জন।

স্ত্রীগণ।—নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখি পাখা,

রাধিকাহৃদিরঞ্জন॥

পুরুষগণ।—গোবৰ্দ্ধন ধারণ, বনকুসুম-ভূষণ

দামোদর কংস-দর্পহারী।

স্ত্রীগণ।—শ্যাম রাসরসবিহারী॥

সকলে—হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার।

বিদ্যাধরীগণ যখন গাহিলেন,

"নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখি পাখা

রাধিকাহৃদিরঞ্জন"

তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ গভীর সমাধি মধ্যে মগ্ন হইলেন।

তাহার পর Concert (ঐক্যতান বাদ্য) হইতে লাগিল। কিন্তু ঠাকুরের কোন হুঁস নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ।)

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে অতিথি আসিয়াছেন। বালক নিমাই সদানন্দে সমবয়স্কদের সহিত গান গাহিয়া বেড়াইতেছেন।

নিমাইএর গান।

কাহা মেরা বৃন্দাবন কাঁহা যশোদা মাই

কাঁহা মেরা নন্দ পিতা কাঁহা বলাই ভাই।

কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী,

কাঁহা মেরি মোহন মুরলী

শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা মে পাই॥

কাঁহা মেরি যমুনাতট,

কাঁহা মেরি বংশীবট,

কাঁহা গোপনারী মেরি কাঁহা হামারা রাই॥

অতিথি চক্ষু বুজিয়া ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিতেছেন। নিমাই দৌড়িয়া গিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন। অতিথি তাঁহাকে ভগবান

বলিয়া জানিতে পারিলেন ও দশাবতারের স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতেছেন। মিশ্র ও শচীর কাছে বিদায় লইবার সময় তিনি আবার গান করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

গান।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় জয় ভব তারণ।
অনাথত্রাণ জীবপ্রাণ ভীত ভয় বারণ।
যুগে যুগে রঙ্গ, নবলীলা নব রঙ্গ,
নব তরঙ্গ, নব প্রসঙ্গ ধরাভারবধারণ।
তাপহারী প্রেমবারি বিতর রাসরঙ্গবিহারী,
দীন আশ কলুষ নাশ দুষ্টত্রাসকারণ।

স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবে বিভোর হইতেছেন।

* * *

নবদ্বীপের গঙ্গাতীর। গঙ্গাস্নানের পর ব্রাহ্মণেরা মেয়ে পুরুষ ঘাটে বসিয়া পূজা করিতেছেন। নিমাই নৈবিদ্দি কাড়িয়া খাইতেছেন। এক জন ব্রাহ্মণ ভারি রেগে গেলেন আর বল্লেন, আরে বেল্লিক! বিষ্ণু-পূজার নৈবিদ্দি কেড়ে নিচ্ছিস্—সর্ব্বনাশ হবে তোর। নিমাই তবুও কেড়ে নিলেন আর পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। অনেক মেয়েরা ছেলে-টিকে বড় ভালবাসে। নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তাদের প্রাণে সইলনা। তারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, নিমাই ফিরে আয়, নিমাই ফিরে আয়। নিমাই শুনিলেন না।

একজন নিমাইকে ফিরাইবার মহামন্ত্র জানিতেন। তিনি হরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিলেন। অমনি নিমাই হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে ফিরিলেন।

মণি বলিলেন, আহা!!

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মণির দিকে "আহা।" বলিতে বলিতে তাকাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, যদি আমার ভাব কি সমাধি হয়, তা হলে তোমরা গোলমাল করোনা। ঐহিক লোকেরা ঢং মনে কোর্‌বে।

* * * *

নিমাইএর উপনয়ন হইয়াছে। নিমাই সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। শচী ও প্রতিবাসিনীগণ চতুর্দ্দিকে রহিয়াছেন। নিমাই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছেন।

গান।

দে গো ভিক্ষা দে,
আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে।
ওগো ব্রজবাসী, তোদের ভালবাসি,
ওগো তাইতো আসি, দেখ্ মা উপবাসী।
দেখ্ মা দ্বারে যোগী বলে 'রাধে রাধে'।
বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,
একাকী থাকি মা যমুনা তীরে,
আঁখি নীর মিশে নীরে,
চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃদু নাদে॥

সকলে চলিয়া গেলেন। নিমাই একাকী আছেন। দেবগণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বেশে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।

গীত।

পুরুষগণ।—চন্দ্র কিরণ অঙ্গে, নম বামনরূপধারী।
স্ত্রীগণ।—গোপীগণ মনমোহন, মঞ্জুকুঞ্জচারী,
নিমাই।—জয় রাধে শ্রীরাধে।
পুরুষগণ।—ব্রজবালক সঙ্গ, মদন মান ভঙ্গ,
স্ত্রীগণ।—উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ,
পুরুষগণ।—দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, সুরগণভয়হারী,
স্ত্রীগণ।—ব্রজবিহারী গোপনারী মান ভিখারী।
নিমাই।—জয় রাধে শ্রীরাধে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন।
যবনিকা পতন হইল। Concert (কনসার্ট) বাজিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(প্রেমোন্মাদ ও সংসার ত্যাগ।)

অদ্বৈতের বাটীর সম্মুখে শ্রীবাসাদি কথা কহিতেছেন। মুকুন্দ মধুর কণ্ঠে গান গাইলেন।

গান।

আর ঘুমাইও না মন।
মায়া ঘোরে কতদিন রবে অচেতন॥
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে,
চাহরে নয়ন মেলে ত্যজ কুস্বপন।
রয়েছ অনিত্যধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের তরুণ তপন।

মুকুন্দ বড় সুকণ্ঠ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মণির নিকট তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছেন।

* * * *

নিমাই বাড়িতে আছেন। শ্রীবাস দেখা করিতে আসিয়াছেন। আগে শচীর সঙ্গে দেখা হইল। শচী কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, পুত্র আমার গৃহধর্ম্মে মন দেয় না।

যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ
প্রাণ মম কাঁপে নিরন্তর
পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী

এমন সময় নিমাই আসিতেছেন। শচী শ্রীবাসকে বলিতেছেন—

আহা দেখ দেখ পাগলের প্রায়
আঁখি নীরে বুক ভেসে যায়
বল বল এ ভাব কেমনে যাবে?

নিমাই শ্রীবাসকে দেখিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন—

কই প্রভু
কই মম কৃষ্ণ ভক্তি হলো
অধম জনম বৃথা কেটে গেল

বল প্রভু,
কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কোথা পাব
দেহ পদধূলি বনমালী যেন পাই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে যাইতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। গদ গদ স্বর। গণ্ডদেশ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন, নিমাই শ্রীবাসের পা জড়াইয়া রহিয়াছেন আর বলিতেছেন, কই প্রভু কৃষ্ণভক্তি ত হলোনা।

এদিকে নিমাই পড়ুয়াদের আর পড়াইতে পারিতেছেন না। গঙ্গাদাসের কাছে নিমাই পড়িয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে বুঝাইতে আসিয়াছেন। শ্রীবাসকে বলিলেন—

"শ্রীবাস ঠাকুর, আমরাও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু পূজা করে থাকি ; কিন্তু আপনারা মিলে দেখ্‌ছি, এই সংসারটা ছারখার কর্‌লেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। এ সংসারীর শিক্ষা। এও কর ওও কর। সংসারী লোক যখন শিক্ষা দেয়, তখন দুদিক রাখ্‌তে বলে।

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

গঙ্গাদাস নিমাইকে আবার বুঝাইতেছেন—

"ওহে নিমাই, তোমার ত শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে। তুমি আমার সঙ্গে তর্ক কর। সংসার ধর্ম্ম অপেক্ষা কোন্ ধর্ম্ম প্রধান আমায় বোঝাও। তুমি গৃহী, গৃহীর মত আচার না করে অন্য আচার কেন কর?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখ্‌লে? দুদিক রাখ্‌তে বল্‌ছে।

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

নিমাই বলিলেন, আমি ইচ্ছা করে সংসার ধর্ম্ম উপেক্ষা করি নাই। আমার বরং ইচ্ছা যাতে সব বজায় থাকে। কিন্তু—

প্রভু কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি
প্রাণ টানে কি করি কি করি
ভাবি কূলে রই,
কূলে আর রহিতে না পারি
প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(নিত্যানন্দ বংশ ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের উদ্দীপন।)

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, তিনি নিমাইকে খুঁজিতেছেন, এমন সময় নিমাইএর সহিত দেখা হইল। নিমাইও তাঁহাকে খুঁজিতেছিলেন। মিলনের পর নিমাই বলিতেছেন,—

সার্থক জীবন, সত্য মম ফলেছে স্বপন
লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি গদ্গদ স্বরে)। নিমাই বল্‌চেন, স্বপ্নে দেখেছি।

*　　*　　*　　*

শ্রীবাস ষড়্‌ভুজ দর্শন কর্‌ছেন আর স্তব কর্‌ছেন।

জয় জয় ষড়ভুজধারী
রূপে অনুপম
দুই করে ধর ধনুর্ব্বাণ
দশস্কন্ধ দর্পচূর্ণ যায়,
আহা মরি মরি গোপী মনোহারী
দুই করে ধ'রেছ বাঁশরী,
কি হেরি—কি হেরি—
দুই করে দণ্ড কমণ্ডলু—

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ষড়্‌ভুজ দর্শন করিতেছেন।

গৌরাঙ্গের ঈশ্বর আবেশ হইয়াছে। তিনি অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস ইত্যাদির সহিত ভাবে কথা কহিতেছেন। নিতাই, গৌরাঙ্গের ভাব বুঝিতে পারিয়া গান গাহিলেন।

গান।

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণসই।
দেরে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে,
রাধা জানে কিগো কৃষ্ণ বই।

ছি ছি করে মান সখি মরি মরি
এল কোথা গেল, এনে দে লো হরি,
আমার কালাচাঁদ, প্রাণের প্রাণের সাধ,
সই কি জান না, কৃষ্ণ আন না,
বলো বলো তারে, রাধা প্রাণে মরে,
কালা বিনে রইতে পারি কই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন ও অনেকক্ষণ ঐ ভাবে রহিলেন।

কনসার্ট চলিতে লাগিল। ঠাকুরের সমাধিও ভঙ্গ হইল। ইতিমধ্যে খড়দার নিত্যানন্দ গোস্বামীর বংশের একটি বাবু আসিয়াছেন ও ঠাকুরের চেয়ারের পশ্চাতে দাড়াইয়া আছেন। বয়স ৩৩।৩৫ হইবে। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। তাহার হাত ধরিয়া কত কথা কহিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তাহাকে বলিতেছেন, "এখানে বোসোনা, তুমি এখানে থাকলে খুব উদ্দীপন হয়।" আবার সস্নেহে তাঁহার হাত ধরিয়া যেন খেলা করিতে লাগিলেন। সস্নেহে তাঁহার মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন। গোস্বামী চলিয়া গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন, "ও বড পণ্ডিত। বাপ বড ভক্ত। আমি খড়দার শ্যামসুন্দর দেখ্তে গেলে যে ভোগ এক শ টাকা দিলে পাওয়া যায় না, সেই ভোগ আনিয়ে আমায় খাওয়ায়।

"এর লক্ষণ বড ভাল। একটু নেড়েচেড়ে দিলে চৈতন্য হয়। ওকে দেখ্তে দেখ্তে বড উদ্দীপন হয়। আর একটু হলে আমি দাঁড়িয়ে পড্তুম।"

আর একটু হলে গোস্বামীকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের ভাব সমাধি হইত, এই কথা বলিতেছেন।

* * * * *

যবনিকা উঠিয়া গেল। রাজপথে নিত্যানন্দ মাথায় হাত দিয়া রক্তস্রোত [illegible] করিতেছেন। মাধাই কলসির কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। নিতাইএর [illegible] নাই। গৌরপ্রেমে গরগর মাতোয়ারা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ [illegible]বিষ্ট হইয়া দেখিতেছেন। নিতাই, জগাই মাধাইকে কোল দিবেন।

[illegible]াই বলিতেছেন,—

গীত।

প্রাণ ভ'রে আয় হরি বলি,
নেচে আয় জগাই মাধাই।
মেরেছ বেশ ক'রেছ হরি বলে নাচ ভাই।
বল্‌রে হরিবোল,
প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোলরে তোল হরিনামের রোল;
পাওনি প্রেমের সাধ,
ওরে হরি ব'লে কাঁদ,
হেরবি হৃদয় চাঁদ,
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব,
প্রেমে নিতাই ডাকে তাই।

*   *   *   *   *   *

এইবার নিমাই শচীকে বলিতেছেন, "মাগো হরিপ্রেমে হইব সন্ন্যাসী।" শচী মূর্চ্ছিতা হইলেন। শচীর মূর্চ্ছা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অনেকে হাহাকার করিতেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন, কেবল নয়নের কোণে একবিন্দু জল দেখা দিয়াছে।

*   *   *   *   *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(গৌরাঙ্গপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ।)

অভিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়িতে উঠিতেছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখ্‌লেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আসল নকল এক দেখলাম।

গাড়ি মহেন্দ্র মুখুয্যের কলে যাইতেছে। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমভরে আপনাপনি বলিতেছেন,—

"হা কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! জ্ঞান কৃষ্ণ! প্রাণ কৃষ্ণ! মন কৃষ্ণ! আত্মা কৃষ্ণ! দেহ কৃষ্ণ!"

আবার বলিতেছেন—

"প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন।"

গাড়ি মুখুয্যেদের কলে পৌঁছিল। অনেক যত্ন করিয়া মহেন্দ্র ঠাকুরকে খাওয়াইলেন। মণি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি কিছু খাওনা। ঠাকুর হাতে করিয়া মেঠাই প্রসাদ দিলেন।

*　　*　　*　　*

এইবারে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে যাইতেছেন। গাড়িতে মহেন্দ্র মুখুয্যে আরও দু তিনটি ভক্ত আছেন। মহেন্দ্র তাঁহাকে খানিকটা এগিয়ে দিবেন।

ঠাকুর আনন্দে যাইতেছেন ও গান আরম্ভ করিলেন—

গান।

গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পরম দয়াল হে প্রভু,

(আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ)

আমি গিয়েছিলেম কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলে কাশী-বিশ্বেশ্বরে

সে পরব্রহ্ম শচীর ঘরে।

তোমরা নাকি আচণ্ডালে দেও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল।

(ওহে পরম করুণ)

(গৌর হে, প্রাণ গৌর!)

ছিল ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি, এখন নদের খেলা ধূলায় গড়াগড়ি।

(প্রেমে মত্ত হয়ে।)

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র তীর্থে যাইবেন। ঠাকুরের সহিত সেই সব কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)। প্রেমের অঙ্কুর না হ'তে হ'তে সব শুকিয়ে যাবে।

"কিন্তু শীঘ্র এস। আহা, তোমার বাড়িতে অনেক দিন থেকে যাবো মনে করেছিলাম, তা একবার দেখা হলো, বেশ হলো।

মহেন্দ্র। আজ্ঞে, জীবন সার্থক হলো—

শ্রীরামকৃষ্ণ। সার্থক ত আছেনই। আপনার বাপও বেশ। সেদিন দেখ্‌লাম, অধ্যাত্মে বিশ্বাস।

মহেন্দ্র। আজ্ঞে, কৃপা রাখ্‌বেন, যেন ভক্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি খুব উদার, সরল। উদার, সরল না হলে ভগবানকে পাওযা যায না। কপটতা থেকে তিনি অনেক দূর।

মহেন্দ্র শ্যামবাজারের কাছে বিদায় লইলেন। গাড়ি চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। যদু মল্লিক কি কর্‌লে?

মাষ্টার (স্বগত)। ঠাকুর সকলের মঙ্গলের জন্য ভাবিতেছেন। ইনি কি লোকদের ভক্তি শিখাইবার জন্য দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন?

সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বামী অভেদানন্দের দ্বারা পরিচালিত নিউইযর্ক বেদান্তসমিতিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইযা গিযাছে। এই বার হইতে স্থির হইয়াছে, স্বামীজির জন্মোৎসব ও সমিতির সাম্বৎসরিক উৎসব একত্রে ১২ই জানুযারি তারিখে সম্পন্ন হইবে। এবারে ঐ ১২ই তারিখ মঙ্গলবারে পড়িয়াছিল। সাধারণতঃ মঙ্গলবারের অপরাহ্নে যে বক্তৃতা হইয়া থাকে, তাহা উৎসব উপলক্ষে বন্ধ রহিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতির নিম্নে স্বামী বিবেকানন্দের একখানি প্রতিকৃতি রক্ষিত হইযা ভক্তগণের দ্বারা আনীত পুষ্প, মালা, লতা পাতা প্রভৃতি দ্বারা সজ্জীকৃত করা হইল। অপরাহ্ণ চারিটার সময ভক্তবৃন্দ সমবেত হইলে স্তবাদি পাঠের পর ধ্যান হইতে লাগিল। ধ্যানের মধ্যে মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের মাহাত্ম্য প্রকাশক দুই চারিটী উদ্দীপক বাক্য এবং স্বামী নির্ম্মলানন্দ স্বামীজির প্রিয বৈদিক শ্লোকাংশসমূহ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ছয় ঘটিকার সময় ধ্যান সমাপ্ত হইল—অনেকে কিন্তু বেদীর সমক্ষে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত বসিযা উপাসনা করিতে লাগিলেন।

আটটার সময় আরও অনেক ভক্তের সমাবেশ হইলে পুনর্ব্বার কিয়ৎক্ষণ ধ্যান হইল। পরে স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্য সম্বন্ধে তেজোময়ী ভাষায় সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করিলে স্বামী নির্ম্মলানন্দ স্বামীজির জীবনচরিত সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। স্বামী নির্ম্মলানন্দের প্রবন্ধ শ্রোতৃবর্গের অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি স্বামীজির ধর্ম্মপ্রচারক রূপে সাধারণের সমক্ষে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্ব-জীবনের অনেক অজ্ঞাত ঘটনা এবং ভারতে ধর্ম্মপ্রচার ও সাধারণ হিতো-

দেশে যে সকল শুভকর অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে সমিতির সভাপতি প্রোফেসার পার্কার বলিলেন,—স্বামীজির সহিত যাহার সাক্ষাৎ হইত, সেই তাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইত। তাঁহার এই মোহিনীশক্তিই আমেরিকানগণের মনকে প্রথম বেদান্তের দিকে আকর্ষণ করে। তৎপরে স্বামীজির একজন পরম ভক্ত শিষ্য গুডইয়ার সাহেব বলেন,—"স্বামীজিকে এখানে প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সকল কষ্টই আনন্দের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রতি সপ্তাহে আটটী করিয়া বক্তৃতা দিতে হইত। ইহা ব্যতীত একদিন প্রশ্নোত্তর দ্বারা শঙ্কাসমাধান ও একদিন সাধারণের জন্য বক্তৃতা দিতে হইত। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়েই তিনি তাঁহার প্রতি এবং বেদান্তের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ, গ্রীষ্মাবকাশের সময় আমরা কয়েকজন যখন সেণ্ট লরেন্স নদীর তীরে স্বামীজির সহিত এক গৃহে বাস রূপ সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হইয়াছিলাম, তখন তাঁহার পবিত্র জীবনের শক্তিতে আমরা এতদূর উপকৃত হইয়াছিলাম যে, যাঁহারা যাঁহারা সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা কখন আর তাঁহার প্রাণপ্রদ প্রভাব ভুলিতে পারিবেন না।"

স্বামী অভেদানন্দ সর্ব্বশেষে বলিলেন, আমরা সকলেই জানি, স্বামী বিবেকানন্দ একজন শক্তিশালী ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। কিন্তু তিনি কাহার শক্তিতে এত শক্তিমান্ হইলেন? তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তিতে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও অটল শ্রদ্ধাবশতই তিনি মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরাও যদি সকলে তাঁহার অনুসরণ করিয়া যথার্থ ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হই, তবে আমরাও মহৎ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব। সর্ব্বশেষে স্বামীজির 'সন্ন্যাসীর গীতি' নামক কবিতা পাঠের পর সভাভঙ্গ হয়।

বিগত ১৪ই জানুয়ারি তারিখে সমিতিগৃহে সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বাৎসরিক অধিবেশন হয়। সমিতির আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল চলিতেছে। লাইব্রেরিতে আলোচ্য বৎসরে একশত খানি পুস্তক বাড়িয়াছে। পুস্তকপ্রকাশবিভাগের কার্য্যও সুন্দররূপে চলিয়াছে। সমিতির

সেক্রেটারি মিস্ ফার এবং কোষাধ্যক্ষ গুডইয়ার সাহেব তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় মিসেস এমিলি পামার কেপ সেক্রেটারি ও এইচ, সি, মাস সাহেব কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অন্যান্য পদে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তিগণই রহিলেন। স্বামী অভেদানন্দ, যাঁহারা পদত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নিঃস্বার্থ কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন—বিভিন্ন বিভাগের সভ্যগণের প্রতি, সমিতির কার্য্যে তাঁহাদের অদম্য অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য পরিচালনার কথা বলিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, স্বামী নির্ম্মলানন্দের আগমনে এখানকার কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিস্তৃত ও সুন্দরভাবে চলিবে। এক্ষণে তিনি এখানে প্রত্যহ ধ্যানশিক্ষা দিতেছেন এবং কয়েকটী ছাত্রকে সংস্কৃত ভাষা পড়াইতেছেন।

তৎপরে কতকগুলি পত্র পাঠ করা হইল। তন্মধ্যে একখানি কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিরাম কর্ষণ সাহেবের প্রেরিত। তিনি ঐ পত্রে লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে দর্শন ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ প্রণীত গ্রন্থাবলিই সর্ব্বোত্তম। যাঁহারা এই বেদান্তের শিক্ষা দিতেছেন, সেই সন্ন্যাসিগণও বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি—তাঁহারা তাঁহাদের উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইতেছেন। তিনি সেই কারণে বেদান্ত সমিতির একজন সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, আর ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী অভেদানন্দ যাহাতে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া বক্তৃতা দেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত আমন্ত্রণ করিতেছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বানিয়ামবাড়ি নামক স্থানে কিছু দিন পূর্ব্বে বন্যা হয়। তথায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ রামকৃষ্ণ সাহায্যভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে।

স্বামী সারদানন্দ গত ১৬ই এপ্রেল তারিখে শিবতলা রামকৃষ্ণ সমিতিতে 'ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্ম ও মুক্তির লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহা দ্বারা আমাদের ঐহিক পারত্রিক উন্নতি হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। ইহা প্রবৃত্তি-

লক্ষণ। আমরা এক্ষণে ধর্ম্ম বলিতে সচরাচর মুক্তিই বুঝিয়া থাকি এবং আমরা মুক্তির অধিকারী কি অনধিকারী, তাহার বিচার না করিয়াই মুক্তি লইবার জন্য ছুটিয়া থাকি। আর মনে করি, মুক্তি লাভ করিতে হইলে শরীরকে কৃশ করিতে হইবে, মস্তককে দুর্ব্বল করিতে হইবে, বিচার-শক্তিকে পদদলিত করিতে হইবে, এক কথায়, মনুষ্যত্বকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু আমরা শাস্ত্রপাঠে দেখিতে পাই, যাঁহারা ধার্ম্মিক বা মুমুক্ষু বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা দৈহিক, মানসিক সর্ব্ববিধ শক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।" মহাভারতপ্রসিদ্ধ অর্জ্জুন ভীষ্মাদির অপূর্ব্ব বীরত্ব ও মানসিক বলের বর্ণনা করিয়া তিনি বলিলেন, এই সকল মহাপুরুষকে আমাদের জীবনের আদর্শ করিতে হইবে। যাহা কিছু দুর্ব্বল করে ও যাহা কিছু আমাদিগকে মনুষ্যত্বহীন করে, তাহাই অধর্ম্ম—যাহা কিছু আমাদিগকে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সবলতাসম্পন্ন করে, তাহাই ধর্ম্ম।

আমরা দেওঘরের রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের ১৯০৩ সালের রিপোর্ট পাইয়াছি। সম্পাদক মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৈদ্যনাথের মোহন্ত মহারাজ আশ্রমবাসিগণের আহারের ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেন নাই। ইহা অতি দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। যতদিন না আমরা জীবসেবাকে ঈশ্বরোপাসনার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে প্রাণে জানিব, ততদিন জীবসেবায় আমাদের এইরূপ ঔদাস্যই থাকিবে। সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্ববারে যে আশ্রমগৃহের উন্নতিকল্পে সাধারণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারও আশানুরূপ কোন ফল হয় নাই। যদি এই আশ্রমকে স্থায়ী করিতে হয়, তবে ইহা ছাড়াও প্রায় ৭০০০৲ টাকা আবশ্যক। আমাদের বক্তব্য এই, যতদিন না দেশের যুবকগণ দেশের গরিব দুঃস্থ পতিতদের জন্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন এবং তাহাদের জন্য নিজেদের সুখস্বচ্ছন্দ, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি একেবারে গঙ্গাজলে ভাসাইতে পারেন, ততদিন আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত কোন সৎকার্য্যেরই স্থায়িত্বের আশা নাই। মা নরবলি চান—নরবলি ব্যতীত মা প্রসন্না হবেন না।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।]   [৫ম বর্ষ, ৩৯৭ পৃষ্ঠার পর।

শ্রীমদ্‌যামুনাচার্য্যের অদর্শনের পর শ্রীরঙ্গমস্থিত মঠ প্রকৃত পক্ষে এক প্রকার নেতৃশূন্য হইয়া রহিয়াছিল। যদিও মহাপূর্ণ ও বররঙ্গ সেই অতুলনীয় মহাপুরুষের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন, তথাপি তাঁহারা ও তদীয় অন্যান্য শিষ্যগণ সর্ব্বদাই সেই সর্ব্বশাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ, ঈশ্বরানুরাগময়বিগ্রহ, সৌম্যদর্শন মহানুভবের অভাব স্ব স্ব হৃদয়ে অনুভব করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে উক্ত অভাব পূরণের এক বলবতী আশা জাগরূক ছিল। গুরুমুখে সকলেই শ্রীমদ্‌রামানুজের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছিলেন। রামানুজ যে অবতার পুরুষ, ইহা তিনি বার বার স্বীয় শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন। তাঁহাকে আনয়নের জন্য মহাপূর্ণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই ভক্তাগ্রগণ্য বহু দিবস রামানুজালয়ে বাস করিয়া তাঁহাকে তামিল প্রবন্ধমালায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি সস্ত্রীক শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, রামানুজকে সমভিব্যাহারে লইয়া আইসেন। কিন্তু সহসা স্থান ত্যাগ করায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ইতিমধ্যে লোকমুখে যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার দেবপ্রতিম শিষ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখনই তিনি শেষশায়ী শ্রীমদ্‌রঙ্গনাথের পাদমূলে গমন পূর্ব্বক করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "হে শরণাগতপালক, পরিপূর্ণ, পরব্রহ্ম, তুমি সকলেরই পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাক। শ্রীমদ্‌রামানুজকে আপনার পাদমূলে আনয়ন করিয়া আমাদের মহান্ অভাব পূর্ণ কর।" প্রেমগদ্‌গদচিত্তে এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর তিনি শ্রীমদ্ভগবৎকর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইলেন, "বৎস মহাপূর্ণ, তুমি দেবগানবিশারদ বররঙ্গকে কাঞ্চীপুরপতি শ্রীমদ্‌-বরদরাজের নিকট পাঠাও। তিনি নিরতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। বররঙ্গের গানে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলে সে যেন তাঁহার নিকট

শ্রীরামানুজকে ভিক্ষা চায়। তদীয় অনুমতি ব্যতিরেকে যতিরাজ * কখনও তাঁহার পাদমূল পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।"

মহাপূর্ণ এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া অনতিবিলম্বে বররঙ্গকে কাঞ্চীপুরে পাঠাইলেন। তথায় গমন করিয়া বররঙ্গ শ্রীমদ্‌বরদরাজকে সঙ্গীত দ্বারা এরূপ সন্তুষ্ট করিলেন যে, গায়কবর শ্রীরামানুজকে ভিক্ষাস্বরূপ চাহিলে, ত্রিলোকপতি প্রিয়ভক্তের বিরহ নিরতিশয় দুঃসহ হইলেও, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। বররঙ্গ যখন রামানুজকে শ্রীরঙ্গনাথের পাদমূলে আনয়ন করিলেন, মঠবাসী বিশুদ্ধস্বভাব বৈষ্ণবগণ ও যাবতীয় নগরবাসীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। শ্রীরঙ্গনাথ শেষশায়ী তাঁহারে উভয়-বিভূতি-পতি করিলেন, অর্থাৎ সন্তাপের সন্তাপ-নিবারণ এবং ভক্তপ্রতিপালনক্ষমতা তাঁহাকে দান করিলেন। এই বিভূতিদ্বয়যুক্ত হইয়া যতিরাজ শ্রীরামানুজ এক অপূর্ব্ব দিব্য শোভায় শোভান্বিত হইলেন। দলে দলে বৈষ্ণবগণ দেশদেশান্তর হইতে আসিয়া তাঁহার পদযুগল স্পর্শকরতঃ আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার বদন হইতে শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সকলে তাঁহাকে আদর্শ বৈষ্ণব বলিয়া ধারণা করিলেন।

এই সময় তাঁহার মন পরম আত্মীয় গোবিন্দের জন্য চঞ্চল হইল। যে গোবিন্দ তাঁহাকে প্রাণনাশকর যাদবপ্রকাশের দুরভিসন্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, যাঁহার সরলতা, ভগবদ্ভক্তি ও পাণ্ডিত্য সহপাঠিগণ ও স্বীয় গুরুকে মুগ্ধ করিয়াছিল, যাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া ভূতনাথ বাণলিঙ্গাকারে সেবা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই প্রাণের বন্ধুকে আপনার দিব্য সুখের ভাগী করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। কিরূপে তাঁহাকে কালহস্তী হইতে আনয়ন করিবেন, ইহাই তিনি ধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার স্মরণ হইল যে, পরম বৈষ্ণব শ্রীশৈলপূর্ণ কালহস্তীর অনতিদূরে শ্রীশৈলে ভগবৎসেবার্থ বাস করিতেছেন। তদ্দ্বারা গোবিন্দকে বৈষ্ণব মতে আনয়ন করিতে পারিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প করতঃ, তিনি শ্রীশৈলপূর্ণকে লিপি প্রেরণ করিলেন। সেই পরম ভাগবত পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া সশিষ্যে তখনই কালহস্তিসমীপবর্ত্তী এক বিপুল সরোবর তীরে অবস্থান করিলেন।

গোবিন্দ প্রতিদিন পুষ্পাবচয়ন ও স্নানার্থ উক্ত সরোবর তীরে আসিতেন। সুতরাং পরদিবস যথারীত্যনুসারে আসিয়া দেখেন যে, এক দিব্যকান্তি শ্বেত-

* শ্রীরামানুজাচার্য্য।

শ্মশ্রু বৈষ্ণব কতিপয় শিষ্যের সহিত তথায় শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। তিনি তৎশ্রবণমানসে পুষ্পচয়নার্থ সমীপবর্ত্তী পাটলি বৃক্ষে আরোহণ করিলেন, এবং যাহা শুনিলেন,তাহাতে তাঁহার মনে উক্ত বৈষ্ণবের উপর বিশেষ ভক্তির সঞ্চার হইল। বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া স্নানার্থ গমন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীশৈলপূর্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্, কাহার সেবার জন্য কুসুম চয়ন করিলে, জানিতে পারি কি ?" শিবপূজার্থে চয়ন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মতিমন্, যিনি সংসার সর্ব্বদুঃখের মূল জানিয়া যাবতীয় ভোগবাসনাকে ভস্মে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারাই আপনাকে ভূষিত করিয়া বিভূতিভূষণ নাম ধারণ করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বান্তর্যামী নারায়ণের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্মশানকেই আপনার আবাসভূমি করিয়াছেন, কুসুমাদি ভোগসামগ্রী সমুদয় তাঁহার কিরূপে প্রিয় হইতে পারে ? যিনি স্বাভাবিক অনন্ত কল্যাণগুণসমূহের আকর, যাঁহার পরম পবিত্র হৃদয়কমল হইতে এই পবিত্র সর্ব্বকল্যাণকর আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় জীবনিবহের নিবাসভূমি সংসার জন্মলাভ করিয়াছে, সেই অনাদি বিষ্ণুরই শ্রীপাদপদ্মে ঐ সকল সুন্দর কুসুম শোভা পায়। তুমি বুদ্ধিমান্ হইয়াও শিবসেবার্থ পুষ্পাহরণ করিয়াছ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।" গোবিন্দ ইহাতে উত্তর করিলেন, "মহাত্মন্, আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমার এতদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। ভগবানের সেবাদ্বারা আমরা আপনাদেরই উপকার করি, তদ্দ্বারা তাঁহার কোনও উপকার সংসাধিত হয় না। যিনি সমস্ত জগতের অধিনায়ক, তাঁহাকে আমরা কি দিতে পারি ? সমস্তই তাঁহার অধিকৃত। অতএব যিনি ত্রিলোকের মঙ্গল বিধানার্থ স্বয়ং বিষপান করিয়া চরাচর নিখিল জগৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পরম মঙ্গলনিধান সদাশান্তমূর্ত্তি শঙ্কর নিজ দাসের নিকট হইতে কি দ্রব্য অভিলাষ করিবেন ? ভক্তিই তাঁহার একমাত্র আদরের ধন। তিনি অস্মদাদির নিকট হইতে ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই চাহেন না। সচন্দন কুসুমদাম দিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অর্চ্চনা করিলে আমাদের ভগবদ্বিষয়িনী প্রীতি প্রবর্দ্ধিতা হয়, এই জন্যই পূজা প্রভৃতির আবশ্যকতা। শ্রীশৈলপূর্ণ ইহাতে কহিলেন, "হে মহাত্মন্, তোমার ভক্তি ও নম্রতায় যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিলাম। তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য। সর্ব্বাধিকারী সর্ব্বস্বামীকে কে কি দান করিতে পারে ? দৈত্যরাজ বলির

দাতৃত্বাভিমান যিনি বামনরূপে নাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কিছুই সমর্পণ করা যায় না। এই সর্ব্বাঙ্গীন আত্মসমর্পণই পরা পূজা। ইহার বলেই তিনি বামনরূপী ভগবানকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বল দেখি, ভগবানের এ লীলা কেমন? তুমি এই লীলাময় হরির উপাসনা ছাড়িয়া লীলাদ্বেষী শঙ্করের উপাসনা করিলে এই মধুর রস হইতে বঞ্চিত হইবে। এতদ্ভিন্ন তোমার বৈষ্ণব বংশে জন্ম, সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মই তোমার অনুসরণীয়। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ,' এই ভগবদুক্তি স্মরণ কর।" ইহাতে গোবিন্দ উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আপনি হরিহর ভেদজ্ঞান করিতেছেন কেন? ঘণ্টাকর্ণের ন্যায় ভক্তি কখনও প্রশস্ত নহে, শাস্ত্রের এইরূপ অভিপ্রায়।"

প্রতিদিনই প্রাতঃকালে এইরূপ বাদানুবাদ চলিত। কথিত আছে যে, অবশেষে গোবিন্দ শৈবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষিত হইয়া গোবিন্দ রামানুজ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহারই নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্যে শৈব বৈষ্ণবের নিত্য কলহ। বৈষ্ণব দর্শন বা সম্ভাষণ করিলে শৈব স্নান করিয়া আপনাকে শুদ্ধ জ্ঞান করেন। বৈষ্ণবেরও ঐ রীতি। ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গেলে এরূপ বোধ হয় যে, নৈষ্ঠিকী ভক্তি সাধন করিতে গিয়া অনেকে মতিবৈষম্য বশতঃ এই শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হয়েন। নৈষ্ঠিকী ভক্তি না হইলে ভগবদ্দর্শন হয় না। শ্রীমহাভারতে * উপমন্যুর উপাখ্যান পাঠ করিলে ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

উপমন্যু ঋষিতনয়। একদা স্বীয় অনুজ ও অন্যান্য ঋষিবালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে দুগ্ধবতী ধেনুকে দোহন করিতে দেখিয়া তাঁহার দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন ভোজনে ইচ্ছা জন্মিল। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মাতাকে দুগ্ধান্নের কথা কহিলে সন্তানবাৎসল্যহেতু মাতা দুগ্ধ না থাকিলেও পিষ্টতণ্ডুলসমন্বিত অন্ন দুগ্ধান্ন বলিয়া ভোজনার্থ দিলেন। উপমন্যু তাহা আস্বাদন পূর্ব্বক দুগ্ধের মধুর স্বাদ না পাইয়া কহিলেন, "মা, ইহা তো দুগ্ধান্ন নহে, আমি পূর্ব্বে একবার পিতার সহিত কোনও যজ্ঞস্থলে গিয়া দুগ্ধ পান করিয়াছিলাম। আহা, তাহা কতই মধুর! ইহা তো

* অনুশাসনপর্ব্ব চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সেরূপ নহে।" মাতা ইহা শুনিয়া কহিলেন, "বৎস, আমরা তপস্বিনী, কোথায় ক্ষীর পাইব? যদি তোমার দুগ্ধান্ন ভোজনের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ভূতনাথ দেবদেব শঙ্করের শরণাগত হও। তাঁহার প্রসাদে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়।" তচ্ছ্রবণে উপমন্যু কহিলেন, "সেই শঙ্করের দর্শন কোথায় পাওয়া যাইবে? তাঁহার রূপই বা কি প্রকার?" মাতা কহিলেন, "বৎস, নিবিড় বনে তপস্যা আশ্রয় করিযাই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। চরাচর বিশ্বই তাঁহার স্বরূপ। তিনি বৃষভবাহন, শ্বেতকায়, প্রসন্নবদন। তাঁহাকে দর্শন করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তিনিই শঙ্কর, কারণ, তিনি স্বপ্রকাশ। সূর্য্য যেরূপ যুগপৎ আপনাকে ও জগৎকে প্রকাশ করেন, তিনিও সেই রূপ আপনাকে ভক্ত সমক্ষে প্রকাশ করেন।" ইহা শুনিয়া উপমন্যু তৎক্ষণাৎ মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার পাদদ্বয় বন্দনা করিয়া বনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। নির্জ্জন শান্তরসময় প্রসন্নসলিল বনান্তরে উপনীত হইয়া তিনি কঠোর তপস্যায় বহুবৎসর কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার ঐকান্তিকতায় তুষ্ট হইয়া দেবদেব ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্রের রূপে তাঁহার দর্শন পথে উপনীত হইলেন ও তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস, আমি দেবরাজ ইন্দ্র, তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদানার্থ আগমন করিয়াছি। যথেপ্সীত বর প্রার্থনা কর।" ইহাতে উপমন্যু সবিনযে সসম্ভ্রমে কহিলেন, "হে দেবরাজ, আমি শিবদর্শনকামনায় তপস্যা করিতেছি। শিব ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট বর প্রার্থনা করি না। আপনাকে নমস্কার, আপনি স্বর্গে প্রতিগমন করুন।

পশুপতিবচনাৎ ভবামি সদ্যঃ কৃমিরথবা তরুরপ্যনেকশাখঃ।
অপশুপতিবরপ্রসাদজা মে ত্রিভুবনরাজ্যবিভূতিরপ্যনিষ্টা॥
অপি কীটপতঙ্গো বা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়া।
ন তু শক্র ত্বযা দত্তং ত্রৈলোক্যমপি কাময়ে॥

ভূতপতি শঙ্করের আদেশে আমি এখনই কৃমি বা বহুশাখ বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও বরপ্রসাদে ত্রিভুবনের রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য পাইতে ইচ্ছা করি না। শঙ্করাদেশে কীট পতঙ্গ হইতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু হে ইন্দ্র, ত্বদ্দত্ত ত্রৈলোক্যও কামনা করি না।"

ভূতপতি এইরূপে পরীক্ষা করিয়া যখন তাঁহার ঐকান্তিকী নৈষ্টিকী ভক্তির বিষয় অবগত হইলেন, তখন তিনি স্বীয় বিশ্বমোহনরূপে তাঁহাকে

দর্শন দিয়া যথেপ্সীত বরদান করিলেন। অধিকন্তু তাঁহাকে অমরত্ব, চিরযৌবনত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। এই আখ্যায়িকাটি দ্বারা একনিষ্ঠ ভক্তির মহীয়সী শক্তি অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। পুরাণেতিহাস প্রভৃতিতে এরূপ ভূরি ভূরি ঘটনা বর্ণিত আছে। নিরাকার সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের উপাসনা করিতে গেলে যে ভক্তির আবশ্যক হয়, তাহা জ্ঞানমিশ্রাভক্তি নামে অভিহিত। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা; তাঁহার স্বরূপ জানিবার জন্য যে প্রবল অনুরাগ বা জিজ্ঞাসা হয়, তাহাই জ্ঞানমিশ্রাভক্তি। বেদাদি শাস্ত্র তাঁহা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে এবং তিনি বেদাদি শাস্ত্র দ্বারাই বেদ্য। স্বাধ্যায়, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতির অভ্যাসপূর্ব্বক উপাসনাপর হইলে কালক্রমে তাঁহার মোহ বিদূরিত হইয়া যায় এবং তিনি ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করেন।

সাকার উপাসকের ভক্তি অন্য প্রকার। ইহা শুদ্ধাভক্তি নামে অভিহিত। এই শুদ্ধাভক্তি দুই প্রকার,—বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বহুবিধ উপচার দ্বারা পূজা, জপ, হোম, ধ্যানাদি দ্বারা যে ভক্তির বিকাশ হয়, তাহা বৈধী। এই বৈধী ভক্তি ক্রমে গাঢ় অনুরাগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে রাগানুগা নামে কথিত হয়। এই ভক্তির বিকাশে উপাস্য পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য ভাব একবারে তিরোহিত হইয়া যায়, ভগবান্‌কে পরমাত্মীয় জ্ঞান হয়। ঈদৃশ ভক্ত তাঁহাকে, প্রভুভাবে, পুত্রভাবে, সখাভাবে বা স্বামিভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহাপেক্ষা মহত্তরা ভক্তি আর নাই। ইহার চরমাবস্থা প্রেমা নামে অভিহিত। ভক্তের হৃদয় যখনই প্রেমদ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তখনই তিনি আপনার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। যশোদা বাৎসল্য ভাবের, মারুতি দাস্যভাবের, ব্রজবালকগণ সখ্যভাবের এবং গোপবালাগণ মধুরভাবের আদর্শ। এই প্রেমভক্তিবলে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ বিগ্রহবান্ হইয়া নরাকার ধারণ করতঃ কখনও কখনও বা পুত্ররূপে, কখনও বা প্রভুরূপে কখনও বা সখারূপে, কখনও বা পতিরূপে ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করেন। ঐকান্তিকতা, অব্যভিচারিতা, প্রগাঢ় নিষ্ঠাই ইহার জীবনীশক্তি। সাধকভক্ত যদি প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া আপনাকে কৃতকৃত্য করিতে চাহেন,

তাহা হইলে তাঁহাকে মনের যাবতীয় বৃত্তিগুলি নিরোধ করিয়া একমাত্র স্বীয় হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরেই তন্ময়তা লাভ করিতে হইবে। তাঁহার ভিন্ন, অন্য কাহারও রূপ যেন উক্ত সাধককে আকর্ষণ না করে। প্রেমভক্তি লাভের ইহাই একমাত্র পথ।

যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সাধক যদি গাঢ় অনুরাগবিশিষ্ট না হইয়া এই ভক্তিলাভের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত দাক্ষিণাত্যের শৈব বা বৈষ্ণব তুল্য হইতে হইবে। ধাবমান মত্তহস্তীর পদতলে প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী শিবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করা বৈষ্ণবোচিত কর্ম্ম নহে, ইহাই দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক বৈষ্ণবের ধারণা। যে প্রেমভক্তি ভগবৎসাক্ষাৎকারের একমাত্র উৎকৃষ্টতম দ্বার, তাহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক কত লোক যে অজ্ঞান-তমঃসমাচ্ছন্ন হিংসাদ্বেষসঙ্কুল উৎপীড়ন, অত্যাচার, নরশোণিতপাত প্রভৃতি বীভৎস ও ভয়ঙ্কর রৌদ্ররসময় রাক্ষসাচারের অবতারণা করিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি বশতঃ মানবসন্তান পিশাচের ন্যায়, হিংস্র পশুর ন্যায় আচরণ পূর্ব্বক দুঃখময় সংসারকে আরও দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে।

অজ্ঞান নিবন্ধন এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা, তৎসম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণের প্রতি অত্যাচার করা ইত্যাদিকে ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া মনে করে। বর্ত্তমান শতাব্দীর মানবগণ আপনাদিগকে প্রাচীন লোক-দিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত মনে করেন, কিন্তু ধর্ম্মের নাম করিয়া নরশোণিতে ধরিত্রীবক্ষ কলঙ্কিত করা পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। সুতরাং তাঁহাদের যে কি বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, ইহা স্থির করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবপ্রদর্শিত পথের পথিক হইলে মানবসন্তানকে আর হিংস্রপশুর ন্যায় আচরণ করিতে হইবে না। এই মহানুভব, সকল ধর্ম্মকেই ভগবৎপাদমূলে লইয়া যাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মজিজ্ঞাসু মাত্রেরই শ্রীগীতোক্ত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" এই শ্রীকৃষ্ণবাক্যটি বিশেষ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণোক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে

পারে, যদি সর্ব্বধর্ম্মই সত্য, তাহা হইলে যে কোন ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে উক্ত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একবাক্যে বলেন, একমাত্র স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারাই গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায়।

ইহা সহজে বোধগম্য করাইবার জন্য তিনি কূপখনকের আচরণ দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলেন। একজন কূপখনন করিতেছে। কূপটি প্রায় দশ হস্ত পরিমিত গভীর হইয়াছে, এমন সময়ে অন্য একজন আসিয়া কহিল, "কেন মিথ্যা পরিশ্রম করিতেছ? এখানে শত হস্ত গভীর করিলেও কূপ হইতে জল পাইবে না। আইস, আমি অন্য স্থান দেখাইতেছি। খনক তদীয় বাক্যানুসারে তন্নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিল, কিন্তু কূপ বিংশ হস্ত গভীর হইলেও, জলবিন্দু লক্ষিত হইল না। ইত্যবসরে অন্য একজন আসিয়া কহিল, "ভাই, এখানে খনন করিবার কুপরামর্শ কে তোমায় দিল? সমস্ত জীবন ধরিয়া যদি খনন কর, তাহা হইলেও জলবিন্দু লাভের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমায় অন্য এক সুন্দর স্থান দেখাইতেছি আইস। অত্যল্প পরিশ্রম করিলেই সেখানে সফলকাম হইবে।" তদ্বাক্যানুসারে সে তৎকথিত স্থানে গমন পূর্ব্বক খনন আরম্ভ করিল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, যাইতে লাগিল। কূপ ত্রিংশৎ হস্ত গভীর হইয়াছে, কিন্তু জল কোথায়? হতাশ হইয়া আপনার অদৃষ্টকে বারম্বার ধিক্কার পূর্ব্বক সেই দুর্ম্মন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তি খনন কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তাহার পরিশ্রমই সার হইল, কোনও ফল হইল না। এতাবৎ কালে সে প্রায় ষাট হস্ত খনন করিয়াছে; যদি একস্থানে ঐরূপ করিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাহার পরিশ্রম সফল হইত।

ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশেরও এই নিয়ম। একটি ধর্ম্ম বা মতকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলে কালে তদ্দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। স্বধর্ম্ম আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ, কারণ, তাহা প্রকৃতিগত বলিয়া তদ্দ্বারা সহজে স্বীয় উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া পরধর্ম্মে দোষদর্শন করা মহা ক্ষুদ্রচিত্তের লক্ষণ। হীনবুদ্ধিগণ অহঙ্কার-সমাচ্ছন্ন হইয়া মহামোহবশতঃ স্ব স্ব সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় সমূহে কোনও উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই সঙ্কীর্ণমনা নরপশুগণই জগতের যাবতীয় উৎপাতের কারণ। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করিবেন? তদুত্তরে উক্ত মহাত্মা বলেন, শ্বশুর-গৃহে

থাকিয়া বধূ যেরূপ স্বীয় শ্বশুর, শ্বশ্রু, দেবর প্রভৃতিকে ভক্তি, মান্য ও শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু স্বীয় পতির সহিতই অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধা থাকেন, সেইরূপ প্রকৃত ধার্ম্মিক অন্যান্য ধর্ম্মসমুদয়কে ভক্তি, মান্য ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, কিন্তু স্বধর্ম্মের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ আর কোনও ধর্ম্মের সহিত হইতে পারে না। এরূপ করিলেই তাঁহার শুদ্ধা-ভক্তি লাভ হইবে ও তদ্দ্বারা তিনি ভগবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিবেন।

এই অব্যভিচারিণী নৈষ্ঠিকী ভক্তি স্বধর্ম্মপ্রতিপালন দ্বারা গোবিন্দের হৃদয়ে বিকসিত করাইবার জন্যই শ্রীরামানুজ শ্রীশৈলপূর্ণ দ্বারা তাঁহাকে স্বীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করাইয়াছিলেন। অতএব রামানুজ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির বশবর্ত্তী হইয়া যে উক্ত কর্ম্ম করেন নাই, ইহা স্পষ্ট। গোবিন্দকে স্বপার্শ্বে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি অচিরকাল মধ্যেই স্বীয় বন্ধুকে শান্তির অমৃতময় সাগরে নিমজ্জিত করিলেন। প্রেমভক্তিপরিশুদ্ধ গোবিন্দহৃদয়ে অনতিবিলম্বেই সর্ব্বলোকললামভূত শ্রীমন্নারায়ণের দিব্য রূপ উদিত হইল। তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া বিশুদ্ধানন্দের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলেন।

শ্রীরঙ্গমস্থ মঠ স্বর্গদ্বারস্বরূপ হইয়া এইরূপে যে কত শত সন্তপ্ত-হৃদয়ে শান্তি-বারি সিঞ্চন পূর্ব্বক দেবদুর্লভ আনন্দের তরঙ্গে তাহাদিগকে ভাসাইয়াছিল, তাহা গণনা করা যায় না। শ্রীরামানুজের জীবহিতচিকীর্ষা কিরূপ বলবতী ছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ক্রমশঃ।

জগৎ সত্য কি মিথ্যা ?

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

সাধারণ পাঠক এই প্রবন্ধের নাম দেখিয়াই প্রবন্ধরচয়িতাকে বহুমানের সহিত বাতুলাশ্রমে পাঠাইবার জোগাড় করিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু যাঁহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট 'জগৎ সত্য কি মিথ্যা' এই প্রশ্নটী নিতান্ত অপরিচিত নহে। সাধা-

রণ পাঠক যাহাতে এই প্রশ্নের যথার্থ মর্ম্ম ও প্রকৃত মীমাংসা জানিতে পাবেন, তজ্জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। আশা করি, দার্শনিক পাঠকগণও এতৎপাঠে উপকৃত হইবেন, কারণ, ইহাতে জটিল দার্শনিক তত্ত্ব সাধকজীবনের প্রত্যক্ষানুভূতির আলোকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

প্রথমে প্রশ্নটা একটু বিশদতর ভাষায় ব্যক্ত করা যাউক। এই যে বাহ্য জগৎ সম্মুখে দেখিতেছি, যাহাতে মনোহর কোকিলকাকলির মধ্যে ভীষণ বজ্রধ্বনি, সুঠামরূপের পার্শ্বেই ভূতভীতি উৎপাদক বীভৎস আকৃতি, দুগ্ধফেন শয্যার কোমল স্পর্শের সঙ্গে আততায়ীর খড়্গাঘাতজনিত বেদনা, চন্দন অগুরুর সুঘ্রাণের সহিত বিষম পূতিগন্ধ এবং দেবতারও রসনাপ্রীতিকর মধুর স্বাদের সঙ্গে একত্রে তিক্তৌষধের ঘোর বিস্বাদ বর্ত্তমান, এই যে অনুকূল প্রতিকূল উভয়বিধ বিষয়ের নিবাসভূমি, রাগদ্বেষ উৎপন্নকারী পাঞ্চভৌতিক জগৎ, ইহার কি মনোনিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? মনে করুন, আমি একটী সুগন্ধ পুষ্প আঘ্রাণ করিতেছি। এই পুষ্পের অস্তিত্বটী কিংস্বরূপ, ইহা যদি আমি বিশেষ বিচার করিয়া দেখি, তবে দেখিব, উহার সুন্দর রূপ, দিব্য সুবাস প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলিই আমার অনুভব হইতেছে, কিন্তু ঐ সকল গুণসমষ্টি ছাড়া পুষ্প যে কি বস্তু, তাহা জানিতে পারিতেছি না। জগতে যে কোন বস্তু 'আছে' বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়া থাকি, তাহা ঐ রূপে আমাদের এক, দুই, তিন, চার বা পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন বলেন, জগতের যাবতীয় পদার্থই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। কোন বিষয়টী কোন ইন্দ্রিয়বিশেষের স্থূলভাবে গ্রাহ্য না হইলেও উহা কেবল ঐ ইন্দ্রিয়বিশেষের ক্ষমতাহীনতার পরিচায়কমাত্র। যন্ত্রবিশেষের সহায়ে ঐ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারিলে ঐ পদার্থের ঐ গুণ ঐ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। নানা পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থনিচয়ের তো কথাই নাই, অবিমিশ্র পদার্থনিচয়, যথা হাইড্রোজেন গ্যাসাদিকেও ঐরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। সাংখ্যাদি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনকার সকলের এ বিষয়ে ভিন্ন মত। তাঁহারা বলেন, স্থূলেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমগ্র পদার্থ নিচয়ই পাঁচটী অবিমিশ্র পদার্থের সংযোগে বা মিশ্রণে উৎপন্ন। ঐ পাঁচটী অবিমিশ্র পদার্থের প্রত্যেকটি মানবের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কোনটী একে-

ন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কোনটী দুই এবং কোনটী বা তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণীয়। একমাত্র কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দগুণ আকাশ। দুই অর্থাৎ কর্ণ ও ত্বক্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ বায়ু, তিন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য (কর্ণ, ত্বক্ ও চক্ষু) তেজঃ, চার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য (কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা) জল ও পাঁচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকে তাঁহারা পৃথিবী বলেন।

যাহা হউক, মোটামুটি দেখা যাইতেছে, সমুদয় জড় জগৎই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদির সমষ্টিরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত। ঐ সকল বিভিন্নরূপরসাদি ছাড়া হয় জড়জগতের পশ্চাতে কিছু নাই বা যদি থাকে তো তাহা আমাদের গোচর নহে। এখন প্রশ্ন এই, এই সকল রূপরসাদির সমষ্টি, যাহার প্রত্যেকটীকে আমরা এক একটী ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া থাকি এবং যাহাদিগকে আমা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া স্থূলতঃ অনুভব করিয়া থাকি, বাস্তবিক কি তাহার আমা হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? গুণ সকল তো মনের বিষয় অথবা বিভিন্ন মানসিক পরিবর্ত্তনের নামই আমরা গুণ দিয়া থাকি। তবে প্রত্যেক গুণানুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতরে একটা প্রবল বিশ্বাস বিদ্যমান থাকে যে, ঐ প্রকার মানসিক পরিবর্ত্তন আমার বাহিরে বর্ত্তমান, আমা হইতে স্বতন্ত্র ঐ পদার্থবিশেষের দ্বারা উৎপাদিত হইল। অতএব মনে ঐ প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটন করা ঐ পদার্থের গুণ। আমার মনের ভিতর ঐ প্রকার পরিবর্ত্তনবিশেষ উৎপন্ন হওয়ার সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্যই যথেষ্ট, কিন্তু বাহিরে যে একটা পদার্থবিশেষ রহিয়াছে, যাহার দ্বারা আমার মন ঐ রূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সেটা আমার বিশ্বাস মাত্র। সত্য কি না, কে বলিতে পারে? সেই জন্যই দার্শনিকদের ভিতর পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উৎপত্তি—জগৎটা কি আমার মনছাড়া অন্য কিছু অথবা মনের ভিতরেরই একটা জিনিষ?

সাধারণতঃ উত্তর এই পাওয়া যায়, এই জগতেরই বাস্তবিক সত্তা আছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহার উপলব্ধি হয় মাত্র। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা গভীর ভাবে এই প্রশ্নের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন না বা চাহেন না। যাঁহারা একটু সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা বলেন, বাহির এবং ভিতর অর্থাৎ মন ও বাহ্যবস্তু উভয়ের সংযোগেই জগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ। যখন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই জ্ঞান কেবল মনোজন্য হইতে পারে না. আবার মন ব্যতীত বাহ্যবস্তুরও কোন জ্ঞান হইতে পারে না, একথাও সত্য।

কোন কোন মতাবলম্বী বলেন, জগৎবোধটা সমুদয়ই আমার মনের বিকার, কারণ, তুমি যে বাহ্যবস্তু দ্বারা মনে আঘাত লাগিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হয়, বলিতেছ, সে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বই যে আমার মনে—আমার মন না হইলে কে উহার অস্তিত্বে সাক্ষ্যদান করিবে? যদি বল, আমরা সকলে দেখিতেছি, এই বস্তুর অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, তুমিও আমার নিকট বাহ্যবস্তু মাত্র; তুমি যে আছ, আমার নিকট তাহার প্রমাণও আমি। আমি তোমায় দেখিতেছি, তাই তুমি আছ। যদি বল, তবে সকলেই জগৎ একরূপ দেখে কেন, ইহার উত্তর,—সকলেই জগৎ একরূপ দেখে, ইহার প্রমাণাভাব। আমি, তুমি না হইলে কখনই বুঝিতে পারিব না যে, আমিও যে জগৎ দেখিতেছি, তুমিও সে জগৎ দেখিতেছ। যদি বল, তবে সমুদয় ব্যবহার নির্ব্বাহ হইতেছে কি রূপে? ইহার উত্তর একটী উদাহরণ দিয়া বলি শুন। মনে কর আমি বলিলাম, 'সন্দেশ খাবো' অর্থাৎ আমি মুখযন্ত্র এ রূপে নাড়িলাম যে, উহাতে বায়ু-সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া আমার কর্ণে লাগিল। সেই ভিন্ন ভিন্ন আঘাতসমূহ আমার কর্ণে লাগিয়া 'সন্দেশ খাবো' এই শব্দাকারে আমার অনুভবগোচর হইল। ঐ তরঙ্গনিচয় তোমার কর্ণেও ঠিক ঐ ভাবে যে আঘাত করিল, তাহার প্রমাণাভাব! অতএব আমার অনুভবের বিষয় 'সন্দেশ খাবো' এই শব্দ তোমার কর্ণযন্ত্রে কি আকারে প্রতিভাত হইল, তাহা আমার জানিবার কোন উপায় নাই। তুমি হয়ত শুনিলে, 'সাপ ব্যাং।' তার পর তুমি মুখের একরূপ বিকৃতি করিলে, হয়ত তাহার ফলস্বরূপ তুমি শুনিলে একরূপ, কিন্তু আমি শুনিলাম, 'আচ্ছা, খাও'। এইরূপে একটু গভীর প্রণিধান করিলেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ অনুভূতি হইলেও যে ব্যবহার চলিতে পারে, তাহা প্রমাণিত হয়। এইরূপ ভয়ানক গোঁড়া মনোবাদীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, মন কি পদার্থ, বাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ হইয়া সম্পূর্ণ রূপে ঐ পদার্থ থাকিতে পারে কি না এবং যদি পারে ত তখন ঐ স্বাধীন মনের মনত্ব থাকে কি না, তবে তাঁহার বড় গোল বাধিয়া যায়।

এ সম্বন্ধে আমি যুক্তি চিন্তা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমার ধারণা,—স্বাধীন বাহ্য জগৎ ইন্দ্রিয়পথে মনের উপর আঘাত করিয়া অথবা মন স্বতন্ত্রভাবে বাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ হইয়া জগৎসৃষ্টি করে না। বিচার করিলে দেখিতে পাই, বাহ্যবস্তু ও মন এই দুইটির অস্তিত্বই সাপেক্ষ। অর্থাৎ দুইটী

বস্তু হয যুগপৎ অবস্থান করিবে নয় যুগপৎ লীন হ'বে। বাহ্যবস্তু আছে, মন নাই, ইহা হইতে পারে না, অথবা মন আছে, বাহ্যবস্তু নাই, তাহাও হইতে পারে না। তবে ইহাদের উৎপত্তি কোথা হইতে ও কিরূপে হইল? আমার বোধ হয়,—কোন অজ্ঞাত অনির্ব্বচনীয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ নিজ শক্তির অলৌকিক ইন্দ্রজাল প্রভাবে মন ও বহির্জ্জগৎ রূপে প্রতিভাত হইতেছে। সেই পদার্থের স্বরূপ অনুমানের দ্বারা এইটুকু মাত্র বোধ হয় যে, তাহাতে আপন স্বরূপ হইতে অপর বস্তু নিচয়ের পৃথক্ অস্তিত্বরূপ পার্থক্য বোধ নাই। সজাতীয-বিজাতীয-স্বগত-ভেদ-রহিত ঐ বস্তুকেই কি শাস্ত্র নাম দেন ব্রহ্ম?

এখানে আর এক প্রশ্ন আসিতেছে,—পূর্ব্বে যে ইন্দ্রজালশক্তির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কি জীবে অর্থাৎ প্রত্যেক শরীরিগত ভেদজ্ঞানাশ্রয়ে বর্ত্তমান পদার্থনিচয়ে অবস্থিত অথবা পূর্ব্বোক্ত অনির্ব্বচনীয ব্রহ্মপদার্থে? এ প্রশ্নের কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখিলেও মস্তিষ্ক আলোড়িত হইযা যায়। জীবে যদি ঐ শক্তি থাকে, তবে জীবভাব উৎপাদন কাহার কার্য্য? আর ব্রহ্মে এ মায়া স্বীকার করিলে ব্রহ্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হওযাতে নিজকৃত সিদ্ধান্তহানিরূপ দোষ উপস্থিত হইল।

এই পর্য্যন্ত যুক্তিগম্য, তার পর যুক্তির অনধিকার। সাধনালোকে এই সকল তত্ত্ব অতি পরিস্ফুট। সাধক বলেন, পূর্ব্বে যে বিভিন্ন মতের কথা বলিলে, ওর কোনটীই মিথ্যা নহে। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে এই সকল বিভিন্ন বুদ্ধি মানবের আসিয়া থাকে। যখন মন নিতান্ত তমোভাবাপন্ন থাকে, তখন বাহ্য জগৎকে একটী স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ বস্তু বোধ হয়। একটু উন্নত হইলে মনে হয, বাহ্যবস্তু ও মন উভয়ের মিশ্রণে জগতের উৎপত্তি, আরও উচ্চাবস্থায মনকে সর্ব্বস্ব বলিযা ধারণা হয; আবার ইহা হইতেও উন্নত অবস্থায যখন সাধক চলিযা যান, তখন তিনি সমুদয় জগৎকে এক অনির্ব্বচনীয বস্তুর মাযাবিলাস বলিযা দেখিতে পান। তদতীত অবস্থায় মাযা পর্য্যান্তের জ্ঞান থাকে না। এক ব্রহ্ম চৈতন্য আপনাকে আপনি অনুভব করেন, কথায এইটুকু মাত্র বলা যায।

কল্পনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষযটী একবার অনুভব করিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রথমে কোন ব্যক্তির অনুভবে যেন সর্ব্ববস্তুর এবং নিজের অস্তিত্বের বা আমি জ্ঞানের যুগপৎ অনুভূতি হইতেছে। কল্পনার পক্ষকে আর একটু প্রসারিত কর, দেখ, অনুভবকর্ত্তা ও অনুভূত বস্তুর যেন কোন ভেদ নাই। তিনিই

যেন আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া একদিকে বিষয়ী অপরদিকে বিষয় সাজিয়া ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের ব্যবধান দিয়া আপনাকে আপনি অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন! এরূপ কল্পনা করিবার আবশ্যকতা এবং পরিণাম কি? ঐরূপে কল্পনাসহায়ে চেষ্টা করিতে করিতেই এই অনাদি অনন্ত সংসারপ্রবাহের পরপারে যাইয়া সেই "আদিনাথ প্রণবরূপ সম্পূরণ" পদার্থের জ্ঞান নহে, অনুভূতি হইয়া থাকে। যে পদার্থ বুদ্ধিগম্য নহে, তাহার আবার জ্ঞান হইবে কিরূপে? এইরূপে দৈবাৎ কাহারও ঘুম ভাঙ্গে, দৈবাৎ কেহ আপনার ও জগতের যথার্থ স্বরূপ 'সেই এক প্রথম সূর্য্যে' পর্য্যবসিত দর্শন করিয়া এবং ঐ দর্শনের ফলস্বরূপ 'সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ' এই বোধে জীবন্মুক্ত ও ধন্য হইয়া থাকে!

তবেই সিদ্ধান্ত এই, এই অনন্ত জগতে যে সেই এক পদার্থকে উপলব্ধি করিয়াছে, সেই জানিয়াছে, জগৎটা কি ব্যাপার। তাহার পক্ষে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। আর যে উপলব্ধি করে নাই, তাহার পক্ষে জগৎ এবং তন্মধ্যস্থ রূপরসাদিই সত্য আর ব্রহ্ম নাস্তি! যাঁহারা দেখেন,জগতে কেবল সুখই রহিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু রোগ শোক মৃত্যু চারিদিকে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, কেহ নানা সৎকার্য্য করিয়া অতুলকীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে বলিয়া মনে স্থির করিলেও হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইতেছে, ভোগ ঐশ্বর্য্য সুখ মান অট্টালিকা আত্মীয় বিভব মানুষকে সুখী করিলেও তাহা দুই দিনের জন্য, যাঁহাদের এ সকল চিন্তা মনে উদয় হয়, তাঁহাদিগকে বিবেকবৈরাগ্যবান্ বলে—তাঁহারাই তত্ত্বালোচনার অধিকারী, তাঁহারা জগৎকে ছায়াবাজি বলিয়া থাকেন। তুমি আমি উহাকে সত্য বলিয়া প্রবল নিষ্ঠার সহিত ধরিয়া রাখিলেও জ্ঞানীর চক্ষে উহার সত্যত্ব কখনই প্রতিপাদিত হইতে পারে না। জগৎকে সত্য বলিলে সত্যের অবমাননা করা হয়। ব্যবহারিক জগৎ আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। জগৎ দেখিতেছি সত্য, তথাপি উহা মিথ্যা, ইহা যদি লোককে বুঝাইতে পার, তবে লোকের মন প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে আকৃষ্ট হইবে।

জগতের মিথ্যাত্ব পরোক্ষজ্ঞানে বোধ হইলেও কি রূপে জাগতিক সমুদয় কর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে—পূর্ব্বাপেক্ষা ভালরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

স্বামী-শিষ্য-সংবাদ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

ডায়েরি হইতে উদ্ধৃত।

শিষ্য। স্বামীজি! জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য কিরূপে হতে পারে? দেখ্‌তে পাই, ভক্তিপথাবলম্বিগণ শঙ্করের নাম শুনে কাণে হাত দেয় আবার জ্ঞানমার্গীরা ভক্তদের আকুল ক্রন্দন উল্লাস নৃত্য গীতাদি দেখে বলেন, ওরা (Fanatic) পাগলবিশেষ।

স্বামীজি। কি জানিস্, গৌণজ্ঞান ও গৌণভক্তি নিয়েই কেবল বিবাদ। ঠাকুরের সেই ভূতবানরের গল্প শুনেছিস্ ত? *

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজি। কিন্তু মুখ্যাভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নাই। মুখ্যাভক্তি মানে হচ্চে ভগবান্‌কে প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি করা। তুই যদি সর্ব্বত্রই ভগবানের প্রেমমূর্ত্তি দেখিস্ ত কাকে আর হিংসা দ্বেষ কর্‌বি? সেই প্রেমানুভূতি এতটুকু বাসনা বা ঠাকুর যাকে বল্‌তেন কামকাঞ্চনাসক্তি—থাক্‌তে হবার যো নাই। সম্পূর্ণ প্রেমানুভূতিতে দেহবুদ্ধি পর্য্যন্ত থাকে না। আর মুখ্য জ্ঞানের মানে হচ্ছে সর্ব্বত্র একত্বানুভূতি, আত্মস্বরূপের সর্ব্বত্র দর্শন। তাও একটু অহংবুদ্ধি থাক্‌তে হবার যো নাই।

শিষ্য। তবে আপনি যাকে প্রেম বলেন, তাই কি পরমজ্ঞান?

স্বামীজি। তা বই কি। পূর্ণপ্রজ্ঞ না হলে কারো প্রেমানুভূতি হয় না। তোদের বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলে না?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজি। ঐ সচ্চিদানন্দ শব্দের মানেই হচ্ছে, সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব; চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান; আর আনন্দ বা প্রেম। ভগবানের

---

*। শিবরামের যুদ্ধ হয়েছিল। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হলো, দুজনে ভাবও হলো! কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো, ওদের ঝগড়া কিচকিচী আর মেটে না।

সৎ ভাবটী নিয়ে ভক্ত ও জ্ঞানীর কোন বিবাদ বিসম্বাদ নাই। কিন্তু জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মের চিৎ বা চৈতন্য সত্তাটীর দিকে বেশী ঝোক দেয় আর ভক্তগণ আনন্দ সত্তাটীই বেশী করে নজরে রাখে। কিন্তু চিৎ স্বরূপ অনুভূতি হবামাত্র তখনি আনন্দ স্বরূপেরও উপলব্ধি হয়। কারণ, যাহা চিৎ, তাহাই যে আনন্দ।

শিষ্য। তবে ভারতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল কেন; এবং ভক্তি ও জ্ঞান শাস্ত্রেই বা এত বিরোধ কেন?

স্বামীজি। কি জানিস্, গৌণভাব নিয়েই অর্থাৎ যে ভাবগুলো ধরে মানুষ ঠিক জ্ঞান বা ঠিক ভক্তি লাভ করে, সেই গুলোর ভিতরেই যত লাটালাটি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু তোর কি বোধ হয়, end (উদ্দেশ্য) বড় কি means (উপায়গুলো) বড়? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য হতে কখন উপায় বড় হতে পারে না। কেননা অধিকারী ভেদে একই উদ্দেশ্য লাভ কর্‌বার উপায় নানাবিধ হয়। এই যে দেখ্‌ছিস্ জপ ধ্যান পূজা হোম ইত্যাদি ধর্ম্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। আর পরাভক্তি বা পরমব্রহ্ম স্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বি, বিবাদ হচ্ছে কি নিয়ে। একজন বল্‌ছেন, পূবমুখো হয়ে বসে ভগবান্‌কে ডাক্‌লে তবে তাঁকে পাওয়া যায় আর একজন বল্‌ছেন, না, পশ্চিমমুখ হয়ে বস্‌তে হবে, তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে। হয়ত একজন বহুকাল পূর্ব্বে পূর্ব্বমুখ হয়ে বসে ঈশ্বর লাভ করেছিলেন; তাঁর চেলারা তখনি ঐ মত চালিয়ে দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, পূর্ব্বমুখ না হয়ে বস্‌লে ঈশ্বর লাভ হবে না। আর একদল বল্লে, সে কি কথা? পশ্চিমমুখে বসে অমুক ভগবান লাভ করেছে, আমরা শুনেছি যে। এইরূপে সব দল বেঁধেছে। একজন হয়ত হরিনাম জপ করে পরাভক্তি লাভ করেছিলেন; অমনি শাস্ত্র তৈয়িরি হল, "ন্যাস্ত্যেব গতিরন্যথা"। কেউ আবার আল্লা বলে সিদ্ধ হলেন, তখনি তার আর এক মত চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু দেখ্‌তে হবে, এই সকল জপ পূজাদির খেই কোথায়। খেই হচ্ছে শ্রদ্ধা; সংস্কৃতভাষার 'শ্রদ্ধা' কথাটি বুঝাবার মত শব্দ আমাদের ভাষায় নাই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করে-

ছিল। 'একাগ্রতা' কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা কথার সমুদায় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। একাগ্রনিষ্ঠা বল্‌লে শ্রদ্ধা কথাটার খানিকটা মানে হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্র মনে যে কোন তত্ত্ব হোক না, ভাব্‌তে থাক্‌লেই দেখ্‌তে পাবি, মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলেছে বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অনুভূতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভক্তি বা জ্ঞান শাস্ত্র উভয়েই ঐরূপ এক একটী নিষ্ঠা জীবনে আন্‌বার জন্য মানুষকে বিশেষ উপদেশ কর্‌ছে। যুগপরম্পরায় বিকৃত ভাব ধারণ করে সে সকল মহান্ সত্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত হচ্ছে। শুধু যে তোদের ভারতবর্ষে হচ্ছে, তা নয়—পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই ঐরূপ হচ্ছে। আর বিচারবিহীন সাধারণ জীব সে গুলো নিয়ে বিবাদ করে মর্‌ছে। খেই হারিয়ে ফেলেছে; তাই লাটালাটি চলেছে।

শিষ্য। তবে এর উপায় কি?

স্বামীজি। পূর্ব্বের মত ঠিক্ ঠিক্ শ্রদ্ধা আন্‌তে হবে। আগাছাগুলো উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে হবে। সকল মতে সকল পথেই দেশকালাতীত সত্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জ্জনা পড়ে গেছে। সে গুলি সাফ্ করে ঠিক্ ঠিক্ তত্ত্বগুলি লোকের সাম্‌নে ধর্ত্তে হবে; তবেই তোদের ধর্ম্মের ও দেশের মঙ্গল হবে।

শিষ্য। কেমন করে তা হবে?

স্বামীজি। কেন? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেই সব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে গেছেন—তাঁদের লোকের কাছে Ideal রূপে খাড়া কর্ত্তে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি। বৃন্দাবন লীলা ফিলা এখন রেখে দে। গীতাসিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা; শক্তিপূজা চালা।

শিষ্য। কেন, বৃন্দাবনলীলা মন্দ কি?

স্বামীজি। এখন ঐ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বাঁশী বাজিয়ে দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই তোপ্ তাপ্ গোলাগুলি, ঢাল তরোয়াল্ নিয়ে খেলা। মার্ মার্ কাট্ কাট্ করে সকল বিষয় ঠিক্ ঠিক্ জান্‌বার জন্য উঠে পড়ে লাগ্‌তে হবে।

শিষ্য। তবে বৃন্দাবনলীলা কি সত্যি নয়?

স্বামীজি। তা কে বল্‌ছে? সে বড় উচ্চ সাধনা। এই ঘোর কামকাঞ্চনাসক্তির সময় ও সব উচ্চ ভাব কেউ ধারণা কত্তেই পার্‌বে না।

শিষ্য। তবে যারা মধুরসখ্যাদি ভাবে সাধনা কর্‌ছে, তারা কি কেউ ঠিক্ পথে যাচ্ছে না?

স্বামীজি। আমার ত বোধ হয না; দুই একটী থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। বাকী জান্‌বি ঘোর তমোভাবাপন্ন। অধিকাংশই full of morbidity, অস্বাভাবিক দুর্ব্বলতা সমাচ্ছন্ন! দেশটাকে তুল্‌তে হবে; মহাবীরের পূজা চালাতে হবে; শক্তিপূজা চালাতে হবে; শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে কত্তে হবে। তবেই তোদের কল্যাণ; দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নাই।

শিষ্য। শুনেছি ত, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব খুব সংকীর্ত্তন কত্তেন?

স্বামীজি। হাঁ; তাঁর কথা স্বতন্ত্র। জীবের সঙ্গে তাঁর তুলনা? তিনি সব মতে সাধন করে দেখিয়েছেন, সকলগুলিই এক তত্ত্বে পৌঁছে দেয়। তিনি যা করেচেন, তাই কি তুই আমি কত্তে পার্‌ব? তাঁকে আমরা কেহ বুঝ্‌তে পারিনি। এজন্য আমি তাঁর কথা যেথানে সেথানে বলি না। তিনি যে কি ছিলেন, তা তিনিই জান্‌তেন, দেহ মাত্র মানুসের মত ছিল; কিন্তু আর সব স্বতন্ত্র।

শিষ্য। আচ্ছা আপনি তাঁকে অবতার বলে মানেন কি?

স্বামীজি। তোর অবতার কথার মানেটা কি আগে বল্ দেখি?

শিষ্য। কেন, যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি।

স্বামীজি। তুই যাঁদের নাম কর্‌লি, আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি—মানা ত ছোট কথা—জানি।

শিষ্য অবাক্ হইযা শুনিতে লাগিল।

স্বামীজি। থাক্ এখন সে সব কথা। সময় ও সমাজ উপযোগী এক এক মহাপুরুষ আসেন; ধর্ম্ম উদ্ধার কত্তে। চাই তাঁদের মহাপুরুষ বল্, চাই তাঁদেব অবতাব বল্। তাতে কিছু আসে যায না। তাঁরা Ideal দেখিয়ে যান্; তাঁদেব ছাঁচে ক্রমে গড়ন চল্‌তে থাকে; মানুষ তৈয়েরী হয়। সম্প্রদায চল্‌তে থাকে। কালে ঐ সকল সম্প্রদায় বিকৃত হলে, আবার ঐরূপ অন্য সংস্কারক আসেন; এই প্রথা প্রবাহ রূপে চলে আস্‌ছে।

শিষ্য। আপনি ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণা করেন না কেন? আপনার ত শক্তি, বাগ্মিতা সব আছে।

স্বামীজি। আমি ঠিক্ বল্‌ছি, আমি তাঁকে অল্পই বুঝেছি। তাঁকে এত বড় মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলে আমার ভয় হয়, পাছে সত্যের অপলাপ হয়; পাছে আমার এই অল্পশক্তিতে না কুলায়; বড় কর্‌তে গিয়ে পাছে তাঁর ছবি আমার ঢঙে এঁকে তাঁকে ছোট করে ফেলি!

শিষ্য। কেন, অনেকে ত তাঁকে অবতার বলে প্রচার কচ্ছে।

স্বামীজি। তা করুক্। যে যেমন বুঝেছে, সে তেমন কর্‌ছে। তোরও বিশ্বাস হয় ত তুইও কর্‌না।

শিষ্য। আমি আপনাকেই ধত্তে পাচ্ছি না। তা আবার ঠাকুরকে? আপনার কৃপাকণা পেলেই আমি এ জন্মে ধন্য হইব।

এই বলিয়া শিষ্য স্বামীজির পদধূলি লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।*

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

যস্য বীর্য্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।

রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্ব্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরং॥

"প্রভবতি ভগবান্ বিধি"রিত্যাগমিনঃ অপ্রয়োগনিপুণাঃ প্রয়োগনিপুণাশ্চ পৌরুষং বহুমন্যমানাঃ। তয়োঃ পৌরুষাপৌরুষেয়প্রতীকারবলয়োঃ বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ কলহ ইতি মত্বা যতস্বায়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র আক্রমিতুম্ জ্ঞানগিরিগুরোর্গরিষ্ঠং শিখরং।

যদুক্তং "তত্ত্বনিকষগ্রাবা বিপদিতি" উচ্যেত তদপি শতশঃ "তৎত্বমসি" তত্ত্বাধিকারে। ইদমেব তন্নিদানং বৈরাগ্যরঞ্জঃ। ধন্যং কস্যাপি জীবনং তল্লক্ষণাক্রান্তস্য। অরোচিষ্ণু অপি নির্দ্দিশামি পদং প্রাচীনং,—"কালঃ

---

* এই পত্রখানি স্বামীজি প্রথম বার আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর আলমোড়া হইতে ৩রা জুলাই (১৮৯৭) তারিখে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিয়াছিলেন।

কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্” ইতি। সমারূঢক্ষেপণীক্ষেপণশ্রমঃ বিশ্রাম্যতাং তন্নির্ভরঃ। পূর্ব্বাহিতো বেগঃ পারং নেষ্যতি নাবং। তদেবোক্তং,—“তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।” “ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ” ইত্যত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমেব লক্ষ্যতে। তদ্বৈরাগ্যং বস্তুশূন্যং বস্তুভূতং বা। প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোঽপি কীটভক্ষিতমস্তিষ্কেন বিনা; যদ্যপরং, তদেদং আপততি,—ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনং, অন্যস্মাৎ বস্তুনঃ পিণ্ডীকরণঞ্চ ঈশ্বরে বা আত্মনি। সর্ব্বেশ্বরস্তু ব্যক্তিবিশেষো ভবিতুং নার্হতি, সমষ্টিরিত্যেব গ্রহণীয়ং। আত্মেতি বৈরাগ্যবতো জীবাত্মা ইতি নাপদ্যতে, পরন্তু সর্ব্বগঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বস্যাত্মরূপেণাবস্থিতঃ সর্ব্বেশ্বর এব লক্ষীকৃতঃ। স তু সমষ্টিরূপেণ সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষঃ। এবং সতি জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতঃ অভেদভাবাৎ তয়োঃ সেবাপ্রেমরূপকর্ম্মণোরভেদঃ। অয়মেব বিশেষঃ,—জীবে জীববুদ্ধ্যা যা সেবা সমর্পিতা, সা দয়া, ন প্রেম, যদাত্মবুদ্ধ্যা জীবঃ সেব্যতে, তৎ প্রেম। আত্মনো হি প্রেমাস্পদত্বং শ্রুতিস্মৃতিপ্রত্যক্ষপ্রসিদ্ধত্বাৎ। তদ্‌যুক্তমেব যদবাদীৎ ভগবান্ চৈতন্যঃ,—প্রেম ঈশ্বরে, দয়া জীবে ইতি। দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্র ভগবতঃ সিদ্ধান্তঃ জীবেশ্বরয়োর্ভেদবিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ। অস্মাকন্তু অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ধির্বন্ধনায় ইতি। তদস্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া। জীবে প্রযুক্তঃ দয়াশব্দোঽপি সাহসিকজল্পিত ইতি মন্যামহে। বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে; নানুকম্পানুভূতিরস্মাকং অপি তু প্রেমানুভবঃ স্বানুভবঃ সর্ব্বস্মিন্।

সৈব সর্ব্ববৈষম্যসাম্যকরী ভবব্যাধিনীরুজকরী প্রপঞ্চাবশ্যম্ভাব্যত্রিতাপহরণকরী সর্ব্ববস্তুস্বরূপপ্রকাশকরী মায়াধ্বান্তবিধ্বংসকরী আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তস্বাত্মরূপপ্রকটনকরী প্রেমানুভূতির্বৈরাগ্যরূপা ভবতু তে শর্ম্মণে শর্ম্মণ্।

ইত্যনুদিবসং প্রার্থয়তি

ত্বয়ি শ্বতচিরপ্রেমবন্ধঃ বিবেকানন্দঃ।

ঐ বঙ্গানুবাদ।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

যাঁহার শক্তিতে আমরা এবং সমুদয় জগৎ কৃতার্থ, সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।

হে আয়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র, যে সকল শাস্ত্রকার কর্ম্মপটু নহেন, তাঁহারা বলেন, ভগবান্ বিধাতাই প্রবল, তিনি যাহা করেন, তাহাই হয়, আর যাঁহারা কর্ম্মকুশল, তাঁহারা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই যে কেহ পুরুষকারকে দুঃখ প্রতীকারের উপায় মনে করিয়া সেই বলের উপর নির্ভর করেন, আবার কেহ কেহবা দৈববলের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের বিবাদ কেবল অজ্ঞানজনিত, ইহা জানিয়া তুমি জ্ঞানরূপ গিরিবরের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণের জন্য যত্ন কর।

যদিও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—বিপদে পড়িলেই তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা হয়, দুঃখ কষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের কষ্টিপাথরস্বরূপ, কিন্তু শাস্ত্রের যেখানে তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, সেখানে শতশত বার ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'সেই ব্রহ্ম তুমিই। ইহাই বৈরাগ্য রোগের ঔষধ স্বরূপ। যাঁহার জীবনে বৈরাগ্যের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি ধন্য। তোমার ভাল না লাগিলেও আমি সেই প্রাচীন উক্তি তোমায় বলিতেছি, "কিছু সময় অপেক্ষা কর।" দাঁড় চালাইতে চালাইতে শ্রম হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর; পূর্ব্বের বেগই নৌকাকে পারে লইয়া যাইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "যোগে সিদ্ধ হইলে কালে আত্মায় আপনা আপনি সেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে।" আর এই যে কথিত হইয়াছে.—"ধন বা সন্তান দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়," এখানে ত্যাগ শব্দের দ্বারা বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার হইতে পারে,—হয় লক্ষ্যহীন নয় উদ্দেশ্যযুক্ত। যদি বৈরাগ্য লক্ষ্যহীন হয়, তবে কীটভক্ষিতমস্তিষ্ক ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তল্লাভে যত্ন করিবে না। আর যদি বৈরাগ্য কোন উদ্দেশ্যযুক্ত হয়, তবে এই দাঁড়ায় যে, ত্যাগ অর্থে অন্যবস্তুসমূহ হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া ঈশ্বর বা আত্মায় সংলগ্ন করা। সর্ব্বেশ্বর যিনি, তিনি

ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন না, তিনি সকলের সমষ্টিস্বরূপ। বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট আত্মা বলিতে জীবাত্মা বুঝায় না, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলের আত্মা রূপে অবস্থিত সর্ব্বেশ্বরই বুঝিতে হইবে। তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয়, তাহা দয়া, প্রেম নহে; আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয়, তাহা প্রেম। আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। এই জন্যই ভগবান্ চৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত; তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন, অতএব তাঁহার এই সিদ্ধান্ত, যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সূচনা করে, তাহা সমীচীনই হইয়াছে। অদ্বৈতনিষ্ঠ আমাদের কিন্তু জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ। অতএব আমাদের অবলম্বন—প্রেম, দয়া নহে। জীবে প্রযুক্ত দয়া শব্দও আমার বোধ হয় জোর করিয়া বলা মাত্র। আমরা দয়া করি না, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ অনুভব আমাদের নাই, তৎপরিবর্ত্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি এবং আত্মানুভব করিয়া থাকি।

হে শর্ম্মণ্ (ব্রাহ্মণ) সেই বৈরাগ্যরূপ প্রেমানুভব, যাহাতে সমস্ত বৈষম্যের সমতা সাধন করে, যাহা দ্বারা ভবরোগ আরোগ্য হয়, যাহা দ্বারা এই জগতে যাহার হাত এড়াইবার উপায় নাই, সেই ত্রিতাপ নাশ হয়, যাহা দ্বারা সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, যাহা দ্বারা মায়ারূপ অন্ধকার একেবারে নাশ হইয়া যায়, যাহা দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তোমার কল্যাণের জন্য তোমার হৃদয়ে উদিত হউক। ইহাই তোমার প্রতি চিরপ্রেমে আবদ্ধ বিবেকানন্দ দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেছে।

নচিকেতার ব্রহ্মজ্ঞানলাভ।

এই পতিত ভারতভূমিকে জাগাইতে একবার এস নচিকেতঃ! আমরা এখন এমন দুর্ব্বল হয়েছি যে, অন্ধকারেও যেতে আমাদের ভয় হয়, আর তুমি বালক হয়ে সেই মহা অন্ধকার, পরম রহস্যের নিলয় যমসদনে সাহস-

পূর্ব্বক গিয়েছিলে—আর তাঁর কাছে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা গভীর সমস্যা যে মৃত্যুরহস্য—যাহা সকলের কাছেই মহাতমসে আচ্ছাদিত, দেবতারাও যার তত্ত্ব নির্ণয়ে বিহ্বল হয়েছিলেন, সেই প্রশ্ন করেছিলে আর তার সম্যক্ তত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে আমাদের জ্ঞানের পথ খুলে দিয়েছ। আর হে গভীর রহস্যের আকার যমরাজ, হে সাধু বো, তোমার কাছে কোন্ তত্ত্ব অবিদিত, কোন্ তত্ত্ব না তোমার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়? তবে এস সদ্‌গুরুরূপে তোমার প্রিয় শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে, যাঁকে পেয়ে আনন্দে বলেছিলে, হে নচিকেতঃ, তোমার মত প্রশ্নকর্ত্তা যেন আরও পাই।

বাজশ্রবা ব্রাহ্মণ—যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিবেন পণ করিয়াছেন। কিন্তু কোথায় সে হৃদয়, যাহাতে এই সর্ব্বত্যাগব্রতের প্রকৃত উদ্‌যাপন করেন? মনের ইচ্ছা ষোল আনা, লোকে বল্‌বে, ইনি সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ করেছেন; কিন্তু প্রাণ যে, ভোগ চায়। প্রাণ ভালজিনিষে মমতা ত্যাগ কত্তে চায় না। তাই ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেওয়া হচ্চে, যত বৃদ্ধ, আতুর গাভী, যারা কাল শমনের দ্বারে অতিথি হবে। নচিকেতা সমুদয় দেখিতেছেন, তাঁহার হৃদয়ে কত চিন্তাতরঙ্গ খেলিতেছে—হঠাৎ হৃদয়ে শ্রদ্ধা আবিষ্ট হইল।

এই শ্রদ্ধা ব্যাপারটা কি? আমরা শ্রদ্ধার কি ধার ধারি যে, শ্রদ্ধা বুঝ্‌বো বা বোঝাবো? আমাদের ত শ্রদ্ধার ঘরে একেবারে শূন্য বল্লেই হয়। ধর্ম্মের প্রসঙ্গ হতে না হতে পাঁচশো বাজে কথা কয়ে হেঁসে উড়িয়ে দিই। এ হতেই পারে না—ও হতেই পারে না; এই আমাদের বুলি। আমাদের মন একটা অনন্ত 'না' এর সমষ্টি। আমরা হাঁ কিছুতে বল্‌তে শিখ্‌ছিনি, নেই নেই বল্‌তে বল্‌তে যে সাপের বিষও উড়ে যায়, একথা আমরা ভুলে গেছি। 'আছে,' 'হাঁ,' এস দেখি, জোর করে এই কথা বলি। একায পার্‌বে? হাঁ, পারবো। না শব্দ মুখে এনো না, অসম্ভব শব্দ মুখে এনো না। জীবনে পূর্ণ ত্যাগ সম্ভবে—পূর্ণ বৈরাগ্য সম্ভবে? বল, হাঁ, সম্ভবে; নিশ্চয়ই সম্ভবে। নিশ্চয় নিশ্চয়! বিশ্বাস, বিশ্বাস! যার যতটা এই শ্রদ্ধা আছে, সে ততটা মানুষ। মানুষে মানুষে তফাত এই শ্রদ্ধার ভাবাভাব নিয়ে।

নচিকেতা ভাব্‌ছেন, সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দেবার কথা—কই সর্ব্বস্ব ত ঠিক দেওয়া হচ্ছে না। তবে কি সর্ব্বত্যাগ হয় না? আমিও বাপের ধনের মধ্যে—কই আমাকে ত্যাগের কথা ত কিছুই হচ্ছে না। তবে কি এ একটা কথার কথা? তবে কি ইহা অসম্ভব? অন্তরাত্মা বলিল, না, না, অসম্ভব নয়—

সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, সর্ব্বস্ব ত্যাগ না হলে কিছুই হবে না—সত্যতত্ত্বই জান্‌তে পার্ব্বে না। এই শ্রদ্ধা—এই শ্রদ্ধার বলেই ঋষিরা যোগীরা সিদ্ধ হইতেন, এই শ্রদ্ধাবলেই নেপোলিয়ন জগৎকে বিস্মিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই শ্রদ্ধাবলেই জগতের যত বড় লোকের উৎপত্তি।

যাহা হউক, এই শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে আবির্ভূতা হইলেন। এই শ্রদ্ধাবলে তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসিলেন, পিতঃ, আমায় কাহাকে দিবেন? পিতা ভাবিলেন, ছেলেটা পাগল হল নাকি? বাপ আবার নাকি ছেলেকে প্রাণ ভরে অপর কাকেও দিতে পারে? তিনি ছেলের বালসুলভ চাপল্য মনে করিয়া তূষ্ণীম্ভূত রহিলেন। কিন্তু নচিকেতা ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহার হৃদয়ে ত কপটতার লেশমাত্র নাই, তাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আগুন জ্বল্‌ছে। তিনি বাপকে বারবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লেন। দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার—বাপ আর থাক্‌তে পার্লেন না, রেগে বল্লেন, তোকে যমকে দোব। নচিকেতা যেন নূতন কথা শুনিলেন। যম? মৃত্যুর অধিপতি, পাপপুণ্যের বিচারক, পরলোকের বিধাতা! নচিকেতার হৃদয়ে অপূর্ব্ব চিন্তালহরী খেলিতে লাগিল। মৃত্যু? মৃত্যুই কি দেহের পরিণাম? এর আগে কি? পরে কি? কোথায় চলেছে? অপূর্ব্ব ভাবে হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। পিতাকে সত্য পালনে বার বার জেদ করিতে লাগিলেন, পিতা কি কর্‌বেন, সত্যভঙ্গভয়ে পুত্রকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

নচিকেতা যমের বাড়ী গেলেন, কিন্তু যম তখন বাড়ী ছিলেন না। যমের বাড়ী তাঁর অন্যান্য পরিবারাদিও ত ছিল, তাঁরাও কি নচিকেতাকে যত্ন করেন নাই? কে জানে? এখানটা উপনিষদে বড় অস্ফুট ভাবে আছে। আর যমের বাড়ীর ব্যাপার—অত খোলাখুলিও ভাল নয়। অমর নটরাজ শেক্‌সপীয়র তাঁহার হ্যাম্‌লেট গ্রন্থে পরকালের ভয়ঙ্কর রহস্যময় ছবি এঁকেছেন। হ্যামলেটের মনের দুঃখে আত্মহত্যার ইচ্ছা হচ্ছে। 'To be or not to be that is the question' বল্‌ছেন, মরাই কি ভাল! মরণটা কি? মহানিদ্রা কি? হয়ত শুধু নিদ্রা নয়, তাতে নানা স্বপ্ন দেখ্‌তে হবে। ঐ ত মুস্কিল। নিশ্চিত যদি জানা যেত, কিছু থাক্‌বে না, তবে ত আত্মহত্যা কল্লেই চুকে যেত। কিন্তু মহা নাস্তিকের মনেও এ ধোঁকা যায় না যে, হয়ত কিছু আছে। এর সংবাদ কে দেবে? 'From whose bourne no

traveller returns.' কেউ ত ফেরে না যে, সংবাদ দেবে! তার পর হ্যাম্‌লেটের পিতার প্রেতাত্মার সঙ্গে দেখা হোলো। পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকটা সংশয় ঘুচ্‌লো। কিন্তু সেখানকার ব্যাপার কি? সেখানে মানুষ কি ভাবে থাকে? প্রেতাত্মা বল্‌ছেন, যদি সেই দেশের কথা বলা আমার নিষেধ না থাক্‌তো, তবে

> I could a tale unfold, whose lightest word
> Would harrow up thy soul ; freeze thy young blood ;
> Make thy two eyes, like stars, start from their spheres,
> Thy knotted and combined locks to part,
> And each particular hair to stand on end,
> Like quills upon the fretful porcupine ,
> But this eternal blazon must not be
> To ears of flesh and blood

আমি এমন কথা শোনাতে পার্‌তুম, যাতে তোমার রক্ত জল হয়ে যেত, কিন্তু মর্ত্ত্যলোকের এ শোন্‌বার অধিকার নেই।

যা হক, নচিকেতা ত যমের বাড়ী গেলেন। যম তিন দিন বাড়ী ছিলেন না, নচিকেতার আতিথ্যসংকার কিছু হোলো না। যম বাড়ী আস্‌তেই তাঁর কোন আত্মীয় তাঁকে বল্‌ছেন, ব্রাহ্মণ অতিথি অগ্নির ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন, লোকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর শান্তি কোরে থাকে। হে যম, তুমি জল আহরণ কর। যাঁর বাড়ীতে ব্রাহ্মণ উপবাসী থাকেন, তাঁর ইহ পরলোকে সর্ব্বনাশ হয়। তখন যম যোড়হস্তে নচিকেতার নিকট আসিয়া বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্, হে নমস্য অতিথি, তিন রাত্রি আমার গৃহে না খেয়ে বাস করেছো, তোমাকে নমস্কার, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার যেন কল্যাণ হয়। আর তোমার তিনরাত্রি উপবাসী থাকবার ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমার নিকট তিনটী বরগ্রহণ কর। পিতৃভক্ত নচিকেতা প্রথমবরে পিতার কল্যাণ চাইলেন। পিতা রোষভরে বলে ফেলেছেন, যমকে দেব, কিন্তু নিশ্চয় তাঁর মন আমায় না দেখে চঞ্চল হয়েছে—তিনি হয়ত মনে উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন; তাঁর যেন মনের সে চঞ্চলতা, সে অশান্তি যায় আর তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে তিনি যেন আমায় চিনতে পেরে সাদরসম্ভাষণ করেন। যম বল্লেন, তথাস্তু। দ্বিতীয় বরে নচিকেতা চাইলেন, স্বর্গলোকপ্রাপক অগ্নির সাধন। 'শুনেছি, স্বর্গলোকে কোন ভয় নেই, সেখানে তুমিও নেই, লোকে জরা

হতেও সেথা ভয় পায় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয় অতিক্রম কোরে শোকশূন্য হয়ে, শুনেছি, স্বর্গলোকে আমোদ কোরে বেড়ায ; সেই স্বর্গলোক প্রাপ্তির সাধন অগ্নির সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান্ আমাকে উপদেশ দাও।'

স্বর্গ ব্যাপারটা কি ? স্বর্গ বোলে কিছু আছে কি ? কে জানে ? কিন্তু চিরকাল মানুষে একটা স্বর্গের কল্পনা কোরে এসেছে। সংসারে দেখ্‌তে পাই, সব বাসনার তৃপ্তি হয না। দুঃখ সুখের পিছনে ছায়ার মত ঘুর্‌ছে। এখানে আলোয আঁধার, ভালোয মন্দ, জীবনে মৃত্যু লেগে আছে। যত বড লোক হোক না কেন, সব বাসনার তৃপ্তি এখানে হতে পারে না। তাই হযত মানুষ ভেবেছিল, এখানকার চেয়ে ভাল কোন জায়গা নিশ্চয আছে, যেখানে গেলে অখণ্ড, অবিচ্ছেদ সুখ পাব। কিন্তু সুখের ধারণা প্রত্যেক জাতের, প্রত্যেক মানুষের বিভিন্ন, তাই স্বর্গকল্পনাও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রকম হযেছে। এই স্বর্গ আবার কোথায়, সশরীরে সেখানে যাওয়া যায, কি শরীর ত্যাগ কোরে, এই নিযে বিষম সমস্যা। এক এক জাযগা এক এক জাতির পক্ষে অতি দুর্গম ছিল, এমন কি, অগম্যও ছিল। তারা হয়ত সেই সব স্থানই স্বর্গ বোলে নির্দ্দেশ কোরেছে। ক্রমশঃ যত সেই সব স্থানে লোক যেতে লাগ্‌লো, ততই সেই গুলিকে ভৌমস্বর্গ নাম দিযে স্বর্গকে আকাশের উপরে কোন এক গ্রহে বা নক্ষত্রে ঠেলে দেওয়া হল। মানুষ মরে সেখানে যাবে। কিন্তু যে সে ত যেতে পার্‌বে না। যে বিধিমত যাগহোম কোর্‌বে, সেই সেখানে যাবে। তাই নচিকেতা এই অগ্নিবিদ্যার উপদেশ চাচ্ছেন। আজকাল অনেকে বোলে থাকেন যে, স্বর্গ নরক আর কিছুই নয, মনের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। এ কথা সত্য হলেও বাস্তবিক স্থানবিশেষে স্বর্গ নরকের মত কোন স্থান নাই, কি কোরে বলা যাবে ? বৈজ্ঞানিক অজ্ঞেয়বাদী, এ সম্বন্ধে হাঁ বা না কিছুই বোল্‌তে পারেন না। অনেক সম্প্রদায় আছেন, তাঁরা বলেন, তাঁরা যোগী মহাত্মাদের নিকট এই স্বর্গনরকাদি সম্বন্ধে সঠিক খবর জেনে ঠিক বোল্‌তে পারেন। কোন কোন লোক দেখাও যায, যাঁরা নিজেরা স্বর্গাদি দেখেছেন বোলে ঘোষণা করেন। কিন্তু যতক্ষণ না তোমার আমার যোগদৃষ্টির বিকাশ হয়, যতক্ষণ না আমরা প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাই, ততক্ষণ ত আমাদের সংশয একেবারে মেট্‌বার নয়।

(ক্রমশঃ।)

আত্ম-নিবেদন।

কি ছিনু কি হয়েছি এখন।
মনে পোড়ে এই বাণী,
কাঁদিয়ে উঠেগো প্রাণী,
মুখে মোর সরে না বচন।

কি কহিব, ভাষা না যুয়ায়,
বাল্যের সে পবিত্রতা,
প্রেমে মাখা সরলতা,
আর কভু হৃদি নাহি পায়!

উৎসাহ সে অসীম অপার,
মনে নিত্য নব আশা,
প্রতি জীবে ভালবাসা,
প্রতি কার্য্যে আশার সঞ্চার।

নব নব বিদ্যা উপার্জ্জন,
সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ,
হ'ত পূর্ণ মনোরথ,
যে সঙ্কল্প করেছি যখন।

নাহি কিছু ছিল গো গোপন।
ছিনু এক মুখে মনে,
সমভাব জনে জনে,
সকলেরে হেরেছি আপন!

ফুল্ল ফুল কোমল পরাণ,
মধু গন্ধে হৃদি ভরা,
মন মম মাতোয়ারা.
এবে সব করেছে পয়ান।

এবে হৃদি শূন্য চারিধার,
নাই সে সরল মন,
নাই সে সন্তোষ ধন,
এবে তথা দৈত্যের সংসার!

হা বিধাতঃ হল এ কেমন!
হৃদয়ের দেব-বৃত্তি,
কেন নাহি পায় স্ফূর্ত্তি,
যাহে সব হেরিছি আপন!

এবে ক্ষুদ্র 'আমি' করি সার,
আত্ম-সুখ অন্বেষণে,
মন রত প্রাণপণে,
নাহি বিন্দু উদারতা তার।

বাসনায় বিকল পরাণ!
সাগর-লহরী মত,
উঠে পড়ে অবিরত,
অন্বেষণে পেয়েছি সন্ধান!

যত কিছু এবে ভাবে মন
নব নব বাসনায়,
যে দিকে যে দিকে ধায়,
মূলে তার কামিনীকাঞ্চন!

এই যুগ্ম নাগ-পাশে বাঁধা,
ইচ্ছা করি শতবার
যাই চলে এর পার,
নাহি পারি, কি বিষম ধাঁধাঁ!

বার বার সুধাইছি মনে,
এই কি প্রাণের আশ,
নাহি অন্য অভিলাষ?
মন তাহা স্বীকার না মানে।

মন কহে, নাই এ বাসনা,
শুধু সংস্কার বশে,
আজীবন নানারসে,
ঘুরিতেছি, একি বিড়ম্বনা!

কোথা গুরু জ্ঞানের আধার!
এস প্রভু দয়াময়!
নাশ সংস্কার চয়,
করি শুধু ভরসা তোমার!

দাও শক্তি ওহে শক্তিধর!
হে বিবেকানন্দ স্বামী!
তুমি দেব অন্তর্য্যামী,
তব কাছে মুক্ত এ অন্তর!

হৃদয়ের তম করি নাশ,
দাও খুলে জ্ঞান পথ,
হ'ক পূর্ণ মনোরথ,
চলে যাই কৈবল্য নিবাস!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ২২ শে এপ্রেল শুক্রবার দিবস স্বামী সারদানন্দ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীটস্থ Friday club এ 'ছাত্রজীবনে ধর্ম্ম' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিগত ২৪শে এপ্রেল রবিবার বেহালা হিতকরী সভায় স্বামী সারদানন্দ প্রায় একঘণ্টা কাল ব্যাপী এক বক্তৃতা করেন।

আদিতে ও অন্তে সঙ্গীত হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় সভার উদ্দেশ্যাদি পাঠ করিলে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে স্বামী সারদানন্দ প্রথমেই সভাসমিতি, বক্তৃতা ও বক্তৃতার ভাষাসম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "অনেক সভাসমিতি দেখলুম, ইউরোপ আমেরিকায়ও

দেখ্‌লুম, এদেশেও দেখ্‌লুম। আজকাল একটা হুজুক উঠেছে,—ইংরাজীতে বক্তৃতা কর্ত্তে হবে। যাঁরা শ্রোতা, তাঁর হয়ত অনেকেই ইংরাজী জানেন না, আর যিনি বক্তা, তিনি হয়ত বিদেশী ভাষাবশতঃ তাঁর মনের ভাব অধিকাংশ প্রকাশ কর্ত্তে পাল্লেন না। তারপর বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষার উপর শ্রদ্ধা না হলে আমাদের উন্নতি কোথা থেকে হবে?" অতঃপর শাস্ত্রোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের কথা এবং বর্ত্তমান কালে প্রবৃত্তিমার্গ, কর্ম্মযোগ বা ধর্ম্মের বিশেষ আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া এবং মহাভারতোক্ত ভীষ্মার্জ্জুনাদি কর্ম্মবীরের ও বর্ত্তমানকালের জাপান-বাসিগণের আদর্শ দেখাইয়া বলিলেন, 'যদি এই সভার সভ্যগণ কেবল বক্তৃতাদিতে শক্তিক্ষয় না কোরে সেই শক্তি কাজের দিকে লাগান, যদি সকলে এক মন এক প্রাণ হয়ে একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করেন, তা হলে এখনি কত কল্যাণ হতে পারে। তোমাদের পাড়ার কে খেতে পাচ্ছে না, কে চিকিৎসাভাবে কষ্ট পাচ্ছে, এ খবর কি তোমরা নিয়েছো? তোমরা বোলছো, টাকা না হলে, ফণ্ড না হলে লোকের উপকার কর্ত্তে পারা যাবে না, কিন্তু আগে দরকার মানুষ—স্বার্থত্যাগী মানুষ। পরমহংসদেব বোল্‌তেন, একরকম আছে মানুষ আর একরকম আছে মানহুঁস—যার হুঁস অর্থাৎ চৈতন্য আছে। এই মানহুঁস হতে হবে।' বক্তৃতান্তে সমাগত সভ্যগণের মধ্যে অনেকে এবং সভাপতি মহাশয় সভার উদ্দেশ্য কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলেন।

বিগত ১লা মে তারিখে আহিরিটোলার জনৈক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে অনেক ভক্তের সমাগম হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, ধর্ম্মসঙ্গীত, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি হইয়াছিল।

কনখল রামকৃষ্ণসেবাশ্রমের কথা অনেক বার পাঠকবর্গের গোচর করিয়াছি। যাঁহারা জীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং উহা সাধনার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই জানেন, সংসারে বাস করিয়া সাধনা করিতে চেষ্টা করিলে কত বিঘ্ন প্রতিপদে ভোগ করিতে হয়। এই কারণে যাঁহারা একটু বিশেষভাবে সাধনার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সংসারের সংস্রব ত্যাগ করিয়া থাকেন।

এই অবস্থায় অবশ্য সেই সন্ন্যাসী সাধক সাধারণ গৃহীর কল্পিত 'একেবারে ত্রিগুণাতীত ও সমাধিস্থ' মানুষ মত হইতে পারেন না। তাঁহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগাদি সব থাকে। ক্ষুধাব্যাধির ঔষধের জন্য অনেক সহৃদয় লোকের প্রতিষ্ঠিত অনেক অন্নসত্র আছে। কিন্তু তাহাতে যে খাদ্য পাওয়া যায়, তাহা অধিক দিন খাইলে রোগের খুব সম্ভাবনা—অনেক সাধুর রোগও হইয়া থাকে। এই রোগের সময় সাহায্য করিতে পারিলে বাস্তবিক এক জনকে সাধনপথে সাহায্য করা হয়। কনখলের নিকট অনেক সাধুসন্ন্যাসী তপস্যা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এবং যাঁহারা এই সকল তীর্থ দর্শন করিতে যান, সেই সকল যাত্রীদেরও পীড়ার সময় সাহায্যার্থ এই সেবাশ্রম ১৯০১ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জনসাধারণের দানের দ্বারা এই সেবাশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। কিছু দিন হইল, কলিকাতাবাসী জনৈক সহৃদয় ব্যক্তি এই সেবাশ্রমের জন্য প্রায় ১৫ বিঘা জমি কিনিয়া দিয়াছেন; এক্ষণে তথায় কুটীর নির্ম্মিত হইয়া সেবাশ্রমের কার্য্য চলিতেছে। এই সেবাশ্রমকে স্থায়ী ও বহুশুভফলপ্রদ করিতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। আমাদের দেশের লোক কি এই কার্য্যে বিশেষরূপ সাহায্য করিবেন না?

১৯০৩ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৫২ জন সাধু ও ১২৭৭ জন গরীব গৃহস্থ আশ্রম হইতে ঔষধ লইয়া যান। আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিলেন ৭৩ জন সাধু। পূর্ব্ব বর্ষের জের লইয়া এই বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ জমা হয় ৮১৯॥৶১২॥ ও খরচ হয় ৫০৮॥৶৫। হস্তে স্থিত ৩১১ ৷৭॥০। এতদ্ব্যতীত অনেক বন্ধু ও ভদ্রমহোদয় চাল ডাল, ঔষধাদি অনেক বস্তু দান করিয়াছেন এবং কলিকাতার বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানি সস্তা দরে ঔষধ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই কার্য্যে এক পয়সা দান পর্য্যন্ত সাদরে গৃহীত হইবে। এই দান—হয় স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কনখল (সাহারাণপুর) বা সম্পাদক, প্রবুদ্ধ ভারত, লোহাঘাট (আলমোড়া) ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। প্রবুদ্ধভারতপত্রে সমস্ত দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হয় এবং নিয়মিত ভাবে প্রতিমাসে খরচ পত্রের হিসাব দেওয়া হয়। উদ্বোধনে স্থানাভাবে সববারে ইহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না।

Is there any difference between a Christian and a Hindu? মূল্য ১০ সেণ্ট, Vedanta Society, 40 Steiner street, San Fran-

cisco, California, U. S. A তে প্রাপ্তব্য। স্বামী ত্রিগুণাতীতের এই বক্তৃতাটী সুন্দর পুস্তিকাকারে আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্যে এবং অনেক সাধনপ্রণালীতেও যে অদ্ভুত ঐক্য আছে, তাহা ইনি সুন্দর ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। হিন্দুর মতে খ্রীষ্টধর্ম্ম বাস্তবিক সেই সনাতন বেদান্ত ধর্ম্মের এক সম্প্রদায় বিশেষ, সুতরাং প্রকৃত হিন্দু শুধু খ্রীষ্টকে মান্য করেন, তাহা নহে, তাঁহাকে অবতার-স্থানে পূজাও করিয়া থাকেন। কিন্তু এখনও অনেক হিন্দুনামধারী আছেন, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের এই উদার ভাবের মর্ম্মজ্ঞ নহেন, তাঁহারা এই পুস্তিকা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

Vedanta and Sankhya—স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি বক্তৃতার পুস্তকাকারে সংগ্রহ। এগুলি আর পূর্ব্বে একত্র সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য বার আনা। অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতার হিন্দী অনুবাদ বারাণসী রাম-কৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য এক আনা। ম্যানেজার, ভারতজীবন প্রেস, বেনারস সিটি ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

এলাহাবাদ ব্রহ্মবাদিন্ ক্লব হইতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পরমহংসদেবের জীবনচরিত ও উপদেশ হিন্দী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য এক টাকা। এই পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা—ব্রহ্মবাদিন্ ক্লব, ষ্টেশন রোড, এলাহাবাদ।

১৫ই বৈশাখের উদ্বোধনে পাঠকগণের নিকট নিবেদন করা হইয়াছিল যে, যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন রূপ সৌভাগ্যলাভের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহা-দের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলে আমাদের এবং সাধারণের বিশেষ উপকার করা হয়। আমরা জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে ইতি-মধ্যেই একটী কথোপকথন পাইয়াছি—উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এ বিষয়ে সাধারণের আরও মনোযোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(উত্তর বিভাগ।)

শ্রীম—কথিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের নরেন্দ্রাদি সাঙ্গোপাঙ্গ ও বরাহনগর মঠে তাঁহাদের সাধন ও তীব্র বৈরাগ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(বরাহনগরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রথম মঠ।)

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। ৭ই মে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। শনিবার অপরাহ্ণ।

নরেন্দ্র মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কলিকাতা, গুরুপ্রসাদ চৌধুরির লেন একটি বাড়ীর নীচের ঘরে তক্তাপোষের উপর উভয়ে বসিয়া আছেন।

মাষ্টার সেই ঘরে পড়াশুনা করেন। Merchant of Venice, Comus, Blackie's Self-culture এই সব পড়িতেছিলেন। পড়া তৈয়ার করিতেছেন। স্কুলে পড়াইতে হইবে।

কয়মাস হইল, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তদের অকূল পাথারে ভাসাইয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন; অবিবাহিত ও বিবাহিত ভক্তেরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেবাকালে যে স্নেহসূত্রে বাঁধা হইয়াছেন, তাহা আর ছিন্ন হইবার নহে। হঠাৎ কর্ণধারের অদর্শনে আরোহিগণ ভয় পাইয়াছেন বটে কিন্তু সকলেই যেন একপ্রাণ, পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন। এখন পরস্পরকে না দেখিলে আর তাঁহারা বাচেন না। অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ আর ভাল লাগে

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৲ টাকা। বাঁধান মূল্য পাঁচ সিকা। ৫৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীশান্তিরাম ঘোষের নিকট, অথবা ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতায় শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত দ্বিতীয় ভাগ যন্ত্রস্থ।

না। তাঁহার কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। সকলে ভাবিবেন, তাঁকে কি আর দেখ্‌তে পাবনা? তিনি ত বলে গেছেন, ব্যাকুল হযে ডাকলে আন্তরিক ডাক শুন্‌লে ঈশ্বর দেখা দেবেন। বলে গেছেন, আন্তরিক হলে তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। যখন নির্জ্জনে থাকেন, তখন সেই আনন্দময় মূর্ত্তি মনে পড়ে। রাস্তায় চলেন, উদ্দেশ্যহীন, একাকী কেঁদেকেঁদে বেড়ান। ঠাকুর তাই বুঝি মণিকে বলেছিলেন, তোমরা রাস্তায় কেঁদেকেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ত্যাগ কর্‌তে একটু কষ্ট হচ্ছে। কেউ ভাব্‌ছেন, কই তিনি চলে গেলেন, আমি এখনও বেঁচে রইছি। এই অনিত্য সংসারে এখনও থাক্‌তে ইচ্ছা। নিজে মনে করলে ত শরীর ত্যাগ কর্‌তে পারি, তা কই কর্‌ছি!

ছোকরা ভক্তেরা কাশীপুরের বাগানে থাকিয়া রাত্রিদিন সেবা করিযাছিলেন। তাঁহার অদর্শনের পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলের পুত্তলিকার ন্যায় নিজের নিজের বাড়ী ফিরিযা গেলেন। দু তিন জনের ফিরিয়া যাইবার বাড়ী ছিলনা। সুরেন্দ্র তাঁহাদের বলিলেন, ভাই, তোমরা আর কোথা যাবে, একটা বাসা করা যাক্। তোমরাও থাক্‌বে আর আমাদেরও জুড়াবার একটা স্থান চাই, তা না হলে সংসারে এরকম করে রাতদিন কেমন করে থাক্‌বো। সেই খানে তোমরা গিযা থাক। সুরেন্দ্র প্রথম প্রথম দুই এক মাস টাকা ত্রিশ করিযা দিতেন। ক্রমে যেমন মঠে অন্যান্য ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, পঞ্চাশ ষাট করিয়া দিতে লাগিলেন, শেষে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতেন। বরাহনগরে যে বাড়ী লওয়া হইল, তাহার ভাড়া ও tax ১১, টাকা। পাচক ব্রাহ্মণের মাহিনা ৬৲ টাকা, আর বাকি ডালভাতের খরচ। বুড়ো গোপাল, লাটু ও তারকের যাইবার বাড়ী নাই। ছোট গোপাল প্রথমে কাশীপুরের বাগান হইতে ঠাকুরের গদি ও জিনিষপত্র লইয়া সেই বাসা বাড়ীতে গেলেন। সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ শশী। রাত্রে শরৎ আসিযা থাকিলেন। তারক বৃন্দাবনে গিযাছিলেন; কিছুদিনের মধ্যে তিনিও আসিয়া জুটিলেন। নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, বাবুরাম, নিরঞ্জন, কালী এঁরা প্রথমে মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে আসিতেন। রাখাল, লাটু, যোগীন ও কালী ঠিক ঐ সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। কালী এক মাসের মধ্যে ফিরিলেন। রাখাল কয়েক মাস পরে ও যোগীন এক বৎসর পরে ফিরিলেন।

কিছুদিন মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, যোগীন,

কালী, লাটু, রহিয়া গেলেন আর বাড়ীতে ফিরিলেন না। ক্রমে প্রসন্ন ও সুবোধ আসিয়া রহিলেন।

ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া! তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল! তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চনত্যাগ মূর্ত্তিমান্ করিলেন! কৌমারবৈরাগ্যবান্ শুদ্ধাত্মা নরেন্দ্রাদি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন! ভাই, তোমার ঋণ কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিতেন, কখন তুমি আসিবে। আজ বাড়ীভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে—আজ খাবার কিছু নাই—কখন তুমি আসিবে—আসিয়া ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। তোমার অকৃত্রিম স্নেহ স্মরণ করিলে কে না অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(নরেন্দ্রাদি ভক্তদের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা ও প্রায়োপবেশন প্রসঙ্গ।)

কলিকাতার সেই নীচের ঘরে নরেন্দ্র মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র এখন ভক্তদের নেতা। মঠের সকলের অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য সকলে ছট্‌ফট্ করিতেছেন।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)। আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছেনা। এই আপনার সঙ্গে কথা কচ্চি, ইচ্ছা হয় এখনই উঠে যাই।

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন,—

"প্রায়োপবেশন কর্‌বো?

মাষ্টার। তা বেশ! ভগবানের জন্য সবই ত করা যায়।

নরেন্দ্র। যদি ক্ষিধে সাম্‌লাতে না পারি?

মাষ্টার। তাহলে খেয়ো, আবার লাগ্‌বে।

নরেন্দ্র আবার কিয়ৎক্ষণ চুপ করিলেন—

নরেন্দ্র। ভগবান্ নাই বোধ হচ্ছে। যত প্রার্থনা করিছি, একবারও জবাব পাই নাই।

"কত দেখ্‌লাম, মন্ত্র সোনার অক্ষরে জল্ জল্ কর্‌ছে।

"কত কালীরূপ ; আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম। তবু শান্তি হচ্ছেনা।

"ছয়টা পয়সা দেবেন ?

নরেন্দ্র শোভাবাজার হইতে সেয়ারের গাড়িতে বরাহনগরের মঠে যাইতেছেন, তাই ছয়টা পয়সা।

দেখিতে দেখিতে সাতু (সাতকড়ি) গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাতু নরেন্দ্রের সমবয়স্ক। মঠের ছোকরাদের বড় ভালবাসেন ও সর্ব্বদা মঠে যান। তাঁহার বাড়ী বরাহনগরের মঠের কাছে। কলিকাতার আপিসে কর্ম্ম করেন। তাঁদের ঘরের গাড়ী আছে। সেই গাড়ী করিয়া আফিস হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্র মাষ্টারকে পয়সা ফিরাইয়া দিলেন ; বলিলেন, আর কি, সাতুর সঙ্গে যাব। আপনি কিছু খাওয়ান্। মাষ্টার কিছু জলখাবার খাওয়ালেন।

মাষ্টারও সেই গাড়ীতে উঠিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে মঠে যাইবেন। সন্ধ্যার সময় সকলে মঠে পৌঁছিলেন। মঠের ভাইরা কিরূপে দিন কাটাইতেছেন ও সাধন করিতেছেন, দেখিবেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ষদদের হৃদয়ে কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, তাহা দেখিতে মাষ্টার মাঝে মাঝে মঠ দর্শন করিতে যান।

* * *

মঠে নিরঞ্জন নাই। তাঁহার একমাত্র মা আছেন। তাঁহাকে দেখিতে বাড়ী গিয়াছেন। বাবুরাম, শরৎ, কালী ৺পুরীক্ষেত্রে গিয়াছেন। সেখানে আরও কিছুদিন থাকিয়া ৺রথযাত্রা দর্শন করিবেন।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিদ্যার সংসার ও নরেন্দ্রের তত্ত্বাবধান।)

নরেন্দ্র মঠের ভাইদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। প্রসন্ন কয়দিন সাধন করিতেছিলেন। নরেন্দ্র তাঁহার কাছেও প্রায়োপবেশনের কথা তুলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছেন দেখিয়া সেই অবসরে তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্র আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। 'রাজা' কেন তাহাকে যাইতে দিয়াছেন ? কিন্তু রাখাল ছিলেন না। তিনি মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একটু বেড়াইতে গিয়াছিলেন। রাখালকে সকলে রাজা বলিয়া ডাকিতেন। অর্থাৎ 'রাখালরাজ' শ্রীকৃষ্ণের আর একটী নাম।

নরেন্দ্র বলিতেছেন—"রাজা আসুক, একবার বোকবো। কেন তারে যেতে দিলে?"

(হ'র প্রতি)। তুমি ত পা ফাঁক করে লেকচার দিচ্ছিলে, তাকে বারণ করতে পার নাই?

হ। (অতি মৃদু স্বরে)। তারকা দা বলেছিলেন, তবু সে চলে গেল।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)। দেখুন আমার বিষম মুস্কিল। এখানেও এক মায়ার সংসারে পড়েছি! আবার ছোঁড়াটা কোথায় গেল!

*　　　*　　　*

রাখাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন; ভবনাথ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

রাখালকে নরেন্দ্র প্রসন্নের কথা বলিলেন। প্রসন্ন নরেন্দ্রকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন; সেই পত্র পড়া হইতেছে। পত্রে এই মর্ম্মে লিখিতেছেন, 'আমি হাঁটিয়া বৃন্দাবনে চলিলাম। এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ্। এখানে ভাবের পরিবর্ত্তন হচ্ছে; আগে বাপ, মা, বাড়ীর সকলের স্বপন দেখতাম। তার পর মায়ার মূর্ত্তি দেখলাম। দুবার খুব কষ্ট পেয়েছি; বাড়ীতে ফিরে যেতে হয়েছিল। তাই এবার দূরে যাচ্ছি। পরমহংসদেব আমায় বলেছিলেন, তোর বাড়ীর ওরা সব করতে পারে; ওদের বিশ্বাস করিস্ না।'

রাখাল বলিতেছেন, সে চলে গেছে ঐ সব নানা কারণে। আবার বলেছে, 'নরেন্দ্র প্রায় বাড়ী যায়—মা ও ভাই ভগিনীদের খপর নিতে; আর মোকদ্দমা করতে। তাই আমার ভয় হয়, পাছে তার দেখাদেখি আমার বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয়'।

নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাখাল তীর্থে যাইবার গল্প করিতেছেন। 'এখানে থাকিয়া ত কিছু হলো না। তিনি যা বলেছিলেন, ভগবান্ দর্শন কই হলো?' রাখাল শুইয়া আছেন। নিকটে ভক্তেরা কেহ শুইয়া কেহ বসিয়া আছেন।

রাখাল। চল নর্ম্মদায় বেরিয়ে পড়ি।

নরেন্দ্র। বেরিয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়? তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস্।

একজন ভক্ত। তাহলে সংসার ত্যাগ করলে কেন?

নরেন্দ্র। রামকে পেলামনা বলে শ্যামের সঙ্গে থাকবো আর ছেলে মেয়ের বাপ হবো, এমন কি কথা!

এই বলিয়া নরেন্দ্র একটু উঠিয়া গেলেন।

রাখাল শুইয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আবার আসিয়া বসিলেন।

একজন ভাই শুইয়া শুইয়া রহস্য ভাবে বলিতেছেন—যেন ঈশ্বরের অদর্শনে বড় কাতর হয়েছেন—"ওরে, আমায় একখানা ছুরি এনে দে রে!—আর কাজ নাই!—আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না!

নরেন্দ্র (গম্ভীরভাবে)। ঐ খানেই আছে, হাত বাড়িয়ে নে (সকলের হাস্য)।

* * *

প্রসন্নের কথা আবার হইতে লাগিল।

নরেন্দ্র। এখানেও মায়া! তবে আর সন্ন্যাস কেন?

রাখাল। 'মুক্তি ও তাহার সাধন' সেই বইখানিতে আছে, সন্ন্যাসীদের একসঙ্গে থাকা ভাল নয়। সন্ন্যাসী 'নগরের' কথা আছে।

শশী। আমি সন্ন্যাস ফন্ন্যাস মানিনা। আমার অগম্য স্থান নাই। এমন জায়গা নাই, যেখানে আমি থাকৃতে না পারি।

ভবনাথের কথা পড়িল। ভবনাথের স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছিল।

নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি)। ভবনাথের মাগটা বুঝি বেঁচেছে; তাই সে ফূর্ত্তি করে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিছিল।

কাঁকুড়গাছির বাগানের কথা হইল। রাম মন্দির করিবেন।

নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি)। রামবাবু মাষ্টার মহাশয়কে একজন ট্রাষ্ট (trustee) করেছেন।

মাষ্টার (রাখালের প্রতি)। কই, আমি কিছু জানিনা।

* * *

সন্ধ্যা হইল। শশী ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে ধূনা দিলেন ও অন্যান্য ঘরে যত ঠাকুরের পট ছিল, সেখানে গিয়া ধূনা দিলেন ও মধুর স্বরে নাম করিতে করিতে প্রণাম করিলেন।

এই বার আরতি হইতেছে। মঠের ভাইরা ও অন্যান্য ভক্তেরা সকলে করযোড়ে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। ভক্তেরা সমস্বরে আরতির গান সেই সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন—

জয় শিব ওঁকার

ভজ শিব ওঁকার

ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব হর হর হর মহাদেব।

নরেন্দ্র এই গান ধরাইয়াছেন। কাশীধামে ৺বিশ্বনাথের সম্মুখে এই গান হয়।

মণি * মঠে আসিয়াছেন। মঠের ভক্তদের দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। মঠে খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে ১১টা বাজিল। ভক্তেরা সকলে শয়ন করিলেন। তাঁহারা যত্ন করিয়া মণিকে শয়ন করাইলেন।

রাত্রি দুই প্রহর হইল। মণির নিদ্রা নাই। ভাবিতেছেন। সকলেই রহিয়াছে; সেই অযোধ্যা; কেবল রাম নাই। মণি নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। মণি একাকী গঙ্গাপুলিনে বিচরণ করিতেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটি কথা ভাবিতেছেন—"তুমি একটি, আর আমি একটি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইদের বৈরাগ্য ও যোগবাশিষ্ঠ পাঠ। কীর্ত্তন ও নৃত্য।)

মাষ্টার শনিবারে আসিয়াছেন। বুধবার পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৫ দিন মঠে থাকিবেন।

আজ রবিবার। গৃহস্থ ভক্তেরা প্রায় রবিবারেই মঠ দর্শন করিতে আসেন। আজকাল যোগবাশিষ্ঠ প্রায় পড়া হয়। মাষ্টার ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে যোগবাশিষ্ঠের ব্যাপারটা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া উহা তিনি যতটুকু বুঝিয়াছিলেন, তাহার সহিত মঠের ভাইদের মেলে কি না জানিবার জন্য যোগবাশিষ্ঠ সম্বন্ধেই কথা পাড়িলেন।

মাষ্টার। (রাখালের প্রতি)। আচ্ছা, যোগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কিরূপ আছে?

রাখাল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, দুঃখ এ সব মায়া। মনের নাশই উপায়।

মাষ্টার। মনের নাশের পর যা থাকে, তাই ব্রহ্ম। কেমন?

রাখাল। হাঁ।

মাষ্টার। ঠাকুরও ঐ কথা বল্‌তেন। ন্যাংটা তাঁকে ঐ কথা বলেছিলেন।

---

* মণি—ঠাকুরের একটী ভক্ত। কোন বিশেষ কারণে তিনি তাঁহার চলিত নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে, 'মণি' এই নামে তাঁকে ডাকা যাইবে।

"আচ্ছা, রামকে কি বশিষ্ঠ সংসার কর্‌তে বলেছেন, এমন কিছু দেখ্‌লে ?

রাখাল। কই, এ পর্য্যন্ত ত পাই নাই। রামকে অবতার বলেই মান্‌ছে না।

এইরূপে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় নরেন্দ্র, তারক ও আর একটি ভক্ত গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের কোন্নগরে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু নৌকা পাইলেন না। তাঁহারা আসিয়া বসিলেন। যোগবাশিষ্ঠের কথা চলিতে লাগিল।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)। বেশ সব গল্প আছে। লীলার কথা জানেন ?

মাষ্টার। হাঁ, যোগবাশিষ্ঠে আছে, একটু একটু দেখিছি। লীলার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল, না ?

নরেন্দ্র। হাঁ। আর ইন্দ্র অহল্যা সংবাদ ? আর বিদূরথ রাজা চণ্ডাল হলো ?

মাষ্টার। হাঁ, মনে পড়্‌ছে।

নরেন্দ্র। বনের বর্ণনাটি কেমন চমৎকার। *

---

* কোন দেশে পদ্মনামে রাজা ও লীলা নামে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। লীলা পতির অমরত্ব আকাঙ্ক্ষায় ভগবতী সরস্বতীর আরাধনা করিয়া তাঁহার পতির জীবাত্মা তদীয় দেহত্যাগের পরও গৃহাকাশে অবরুদ্ধ থাকিবে, এই বর লাভ করিয়াছিলেন। পতির মৃত্যুর পর লীলা সরস্বতী দেবীকে স্মরণ করিলে তিনি আবির্ভূতা হইয়া লীলাকে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ইহা সুন্দররূপে ধারণা করাইয়া দিলেন। সরস্বতী দেবী বলিলেন, 'তোমার পদ্মনামক স্বামী পূর্ব্বজন্মে বশিষ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁহার আটদিন মাত্র দেহত্যাগ হইয়াছে আর এক্ষণে তাঁহার জীবাত্মা এই গৃহে অবস্থিত আছেন আবার অন্য একস্থলে বিদূরথ নামে রাজা হইয়া অনেক বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়াছেন। এ সকলই মায়াবলে সম্ভবে। বাস্তবিক দেশকাল কিছুই নহে।' পরে সমাধিবলে সরস্বতী দেবীর সহিত তিনি সূক্ষ্মদেহে প্রোক্ত বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বিদূরথ রাজার রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। সরস্বতী দেবীর কৃপায় বিদূরথের পূর্ব্ব স্মৃতি উদিত হইল। পরে তিনি এক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার জীব পদ্মরাজার শরীরে প্রবেশ করিল।

বিদূরথ রাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয় নাই। লবণ রাজার হইয়াছিল। তিনি এক ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালপ্রভাবে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সারা জীবন চণ্ডালত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। অহল্যা নামে কোন রাজার মহিষী ইন্দ্রনামক কোন যুবকের আসক্তিতে পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে কামে একরূপ তন্ময় হইয়াছিলেন যে, নানাপ্রকার অত্যাচারেও তাঁহারা সঙ্কল্পিত কার্য্যে বিরত হন নাই।

(মঠের ভাইদের প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও গুরুপূজা।)

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন। মাষ্টারও স্নান করিবেন। রৌদ্র দেখিয়া মাষ্টার ছাতি লইয়াছেন। বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রও এই সঙ্গে স্নান করিতে যাইতেছেন। ইনি সদাচারনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক। মঠে সর্ব্বদা আসেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছেন।

মাষ্টার (শরতের প্রতি)। ভারি রৌদ্র।

নরেন্দ্র। তাই বল, ছাতিটা লই। (মাষ্টারের হাস্য।)

ভক্তেরা গামছা স্কন্ধে মঠ হইতে রাস্তা দিয়া পরামাণিক ঘাটের উত্তরের ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন। সকলে গেরুয়া পরা। আজ ২৬শে বৈশাখ। প্রচণ্ড রৌদ্র।

মাষ্টার (নরেন্দ্রের প্রতি)। সর্দ্দি গর্ম্মি হবার উদ্যোগ।

নরেন্দ্র। আপনাদের শরীরই বৈরাগ্যের প্রতিবন্ধক। না? আপনার, দেবেন বাবুর—

মাষ্টার হাসিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, "শুধু কি শরীর?"

* * * * *

স্নানান্তে ভক্তেরা মঠে ফিরিলেন ও পা ধুইয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রণাম পূর্ব্বক এক এক জন ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

নরেন্দ্রের পূজার ঘরে আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। গুরুমহারাজকে প্রণাম করিয়া ফুল লইতে যান, দেখেন যে, পুষ্পপাত্রে ফুল নাই। তখন বলিয়া উঠিলেন, ফুল নাই? পুষ্পপাত্রে দু একটি বিল্বপত্র ছিল, তাই চন্দনে ডুবাইয়া নিবেদন করিলেন। একবার ঘন্টাধ্বনি করিলেন। আবার প্রণাম করিয়া দানাদের ঘরে গিয়া বসিলেন।

(দানাদের ঘর, ঠাকুর ঘর ও কালী তপস্বীর ঘর।)

মঠের ভাইরা আপনাদের দানা দৈত্য বলিতেন ও যে ঘরে সকলে একত্র বসিতেন, সেই ঘরকে দানাদের ঘর বলিতেন। সর্ব্ব দক্ষিণের ঘরটিতে যাঁরা নির্জ্জনে ধ্যান ধারণা কি পাঠাদি করিতেন, তাঁহারাই থাকিতেন। কালী (স্বামী অভেদানন্দ) ঐ ঘর দ্বাররুদ্ধ করিয়া অধিকাংশ সময় থাকিতেন বলিয়া

মঠের ভাইরা বলিতেন, 'কালী তপস্বীর ঘর।' 'কালী তপস্বীর ঘরের' উত্তরেই ঠাকুর ঘর। তাহার উত্তরে ঠাকুরদের নৈবিদ্যের ঘর। ঐ ঘরে দাঁড়াইয়া আরতি দেখা যাইত ও ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেন। নৈবেদ্যের ঘরের উত্তরে দানাদের ঘর। ঘরটি খুব লম্বা। বাহিরের ভক্তেরা আসিলে এই ঘরেই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হইত। দানাদের ঘরের উত্তরে একটি ছোট ঘর। ভাইরা 'পানের ঘর' বলিতেন। এখানে ভক্তেরা আহার করিতেন।

দানাদের ঘরের পূর্ব্বকোণে দালান। উৎসব হইলে এই দালানে খাওয়া দাওয়া হইত। দালানের ঠিক উত্তরে রান্নাঘর।

ঠাকুর ঘরের ও কালীতপস্বীর ঘরের পূর্ব্বে বারাণ্ডা। বারাণ্ডার দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে বরাহনগরের একটি সমিতির লাইব্রেরী ঘর। এ সমস্ত ঘর দুতলার উপর। কালীতপস্বীর ঘর ও সমিতির লাইব্রেরী ঘরের মাঝখানে একতালা হইতে দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। ভক্তদের আহারের ঘরের উত্তর দিকে দোতলার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি। নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইরা ঐ সিঁড়ি দিয়া সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে ছাদে উঠিতেন। সেখানে উপবেশন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা বিষয় কথা কহিতেন। কখনও ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা ; কখনও বা শঙ্করাচার্য্যের, রামানুজের বা যীশুখৃষ্টের কথা ; কখনও হিন্দু দর্শনের কথা, কখনও বা ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্রের কথা, বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের কথা।

দানাদের ঘরে বসিয়া নরেন্দ্র তাঁহার দেবদুর্ল্লভ কণ্ঠে ভগবানের নাম-গুণ গান করিতেন। শরৎ ও অন্যান্য ভাইদের গান শিখাইতেন। কালী বাজনা শিখিতেন।

এই ঘরে নরেন্দ্র ভাইদেরসঙ্গে কতবার হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দ করিতেন ও আনন্দে একসঙ্গে নৃত্য করিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(নরেন্দ্র ও ধর্ম্মপ্রচার। ধ্যানযোগ ও কর্ম্মযোগ।)

নরেন্দ্র দানাদের ঘরে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা বসিয়া আছেন। চুনিলাল, মাষ্টার ও মঠের ভাইরা। ধর্ম্মপ্রচারের কথা পড়িল।

মাষ্টার (নরেন্দ্রের প্রতি)। বিদ্যাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কাককে বলিনা।

নরেন্দ্র। বেত খাবার ভয়?

মাষ্টার। বিদ্যাসাগর বলেন, মনে কর, মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর, কেশব সেনকে যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপ টাপ করেছে। যখন প্রমাণ হলো, তখন ঈশ্বর হয়ত বল্‌বেন, ওকে পঁচিশ বেত মার। তার পর মনে কর, আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করিছি। তার জন্য বেতের হুকুম হলো। তখন আমি হয়ত বল্‌লাম, কেশব সেন আমাকে এইরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কাজ করিছি। তখন ঈশ্বর দূতদের আবার হয়ত বল্‌বেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয়ত তাকে বল্‌বেন, তুই একে উপদেশ দিছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু জানিসনা, আবার পরকে উপদেশ দিছিলি? ওরে কে আছিস, এরে আর পঁচিশ বেত দে।

"তাই বিদ্যাসাগর বলেন, নিজেই সাম্‌লাতে পারিনা, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া (সকলের হাস্য)। আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝিনা, আবার পরকে কি লেক্‌চার দেবো।

নরেন্দ্র। যে এটা বোঝেনি, সে আর পাঁচটা বুঝ্‌লে কেমন করে?

মাষ্টার। আর পাঁচটা কি?

নরেন্দ্র। যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া পরোপকার বুঝ্‌লে কেমন করে? স্কুল বুঝ্‌লে কেমন করে? স্কুল করে ছেলেদের বিদ্যা শিখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেলে মেয়ের বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝ্‌লে কেমন করে।

"যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে"।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। ঠাকুর বল্‌তেন বটে, 'যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব বোঝে'। আর সংসার করা, স্কুল করা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন যে, 'ও সব রজোগুণে হয়।' বিদ্যাসাগরের দয়া আছে বলে বলেছিলেন, 'এ রজোগুণের সত্ত্ব। এ রজোগুণে দোষ নাই।'

* * *

খাওয়া দাওয়ার পর মঠের ভাইরা বিশ্রাম করিতেছেন। মাষ্টার

ও চুনিলাল নৈবেদ্যের ঘরের পূর্ব্বদিকে যে অন্দরমহলের সিঁড়ি আছে, তাহার চাতালের উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন। চুনিলাল বলিতেছেন, কি প্রকারে তাঁহার ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শন হইল। সংসার ভাল লাগে নাই বলিয়া তিনি একবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন ও তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সকল গল্প করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আসিয়া কাছে বসিলেন। যোগবাশিষ্ঠের কথা হইতে লাগিল।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)। আর বিদূরথের চণ্ডাল হওয়া?

মাষ্টার। কি, লবণের কথা বোল্‌ছো?

নরেন্দ্র। ও! আপনি পড়েছেন?

মাষ্টার। হাঁ, একটু পড়িছি।

নরেন্দ্র। কি, এখানকার বই পড়েছেন?

মাষ্টার। না, বাড়ীতে একটু পড়েছিলাম।

নরেন্দ্র ছোট গোপালকে তামাক আনিতে বলিতেছেন। ছোট গোপাল একটু ধ্যান করিতেছিল।

নরেন্দ্র (গোপালের প্রতি)। ওরে তামাক সাজ্। ধ্যান কি রে! আগে ঠাকুর ও সাধুসেবা করে preparation কর্। তার পর ধ্যান। আগে কর্ম্ম, তার পর ধ্যান (সকলের হাস্য)।

মঠের বাড়ীর পশ্চিমে সংলগ্ন অনেকটা জমি আছে। সেখানে অনেকগুলি গাছপালা আছে। মাষ্টার গাছতলায় একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রসন্ন আসিয়া উপস্থিত। বেলা ৩টা হইবে।

মাষ্টার। এ কয়দিন কোথায় গিছিলে? তোমার জন্যে সকলে ভাবিত হয়েছে। ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে? কখন এলে?

প্রসন্ন। এই এলাম, এসে দেখা করিছি।

মাষ্টার। তুমি বৃন্দাবনে চল্লুম বলে চিঠি লিখেছ! আমরা মহা ভাবিত। কতদূর গিছিলে?

প্রসন্ন। কোন্নগর পর্য্যন্ত গিছিলাম। (উভয়ের হাস্য)।

মাষ্টার। বসো একটু গল্প বলো, শুনি। প্রথমে কোথায় গিছিলে?

প্রসন্ন। প্রথমে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে গেলাম, সেখানে একরাত্রি ছিলাম।

মাষ্টার (সহাস্যে)। হাজরা মশায়ের এখন কি ভাব?

প্রসন্ন (সহাস্যে)। হাজরা মশায় বলে, তুমি আমাকে কি ঠাওরাও? (উভয়ের হাস্য)।

মাষ্টার (সহাস্যে)। তুমি কি বল্‌লে?

প্রসন্ন। আমি চুপ করে রইলাম।

মাষ্টার। তার পর?

প্রসন্ন। আবার বলে, আমার জন্যে তামাক এনেছ? (উভয়ের হাস্য)। খাটিয়ে নিতে চায়।

মাষ্টার। তার পর কোথায় গেলে?

প্রসন্ন। ক্রমে কোন্নগরে গেলাম। একটা জায়গায় রাত্রে পড়েছিলাম। আরো চলে যাবো ভাব্‌লাম। পশ্চিমের রেলভাড়ার জন্য ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা কর্‌লাম যে, এখানে পাওয়া যেতে পারে কিনা?

মাষ্টার। তারা কি বল্‌লে?

প্রসন্ন। বলে, টাকাটা সিকেটা পেতে পার। অত রেলভাড়া কে দিবে? (উভয়ের হাস্য।)

মাষ্টার। সঙ্গে কি ছিল?

প্রসন্ন। এক আধখানা কাপড়। পরমহংসদেবের ছবি ছিল। ছবি কারুকে দেখাই নাই।

(পিতা-পুত্র-সংবাদ। আগে মা বাপ না আগে ঈশ্বর?)

মঠের একটি ভাইয়ের বাবা আসিয়াছেন। বাবা মঠ থেকে ছেলেকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অসুখের সময় প্রায় ৯ মাস ধরিয়া অনন্যচিত্ত হইয়া এই ভাইটি তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ইনি কলেজে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এণ্ট্রান্সে জলপানি পাইয়াছিলেন। বাপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু সাধক ও নিষ্ঠাবান্। ইনি বাপ মায়ের বড় ছেলে। তাঁহাদের বড় আশা যে, ইনি লেখা পড়া শিখিয়া রোজগার করিয়া তাঁদের দুঃখ দূর করিবেন। কিন্তু ভগবান্‌কে পাইবার জন্য ইনি সব ত্যাগ করিয়াছিলেন। বন্ধুদের কাছে কেঁদে কেঁদে বল্‌তেন, 'কি করি, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনা। হায়! মা বাপের কিছু সেবা কর্‌তে পারলাম না! তাঁরা কত আশা করেছিলেন! মা আমার গয়না পর্‌তে পান নাই, আমি কত সাধ করেছিলাম, আমি তাঁকে গয়না পরাব। কিছুই হলোনা! বাড়ীতে ফিরে

যাওয়া যেন বাঘ বোধ হয়! গুরুমহারাজ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর্‌তে বলেছেন, আর যাবার জো নাই।'

ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্বধামে গমন করিবার পর এই ভাইটির পিতা ভাবিলেন, এবারে বুঝি বাড়ী ফিরিবে! কিন্তু কিছুদিন বাড়ী থাকার পর, মঠ স্থাপিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই, মঠে কিছুদিন যাতাযাতের পর আর মঠ হইতে ফিরিলেন না। তাই পিতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে লইতে আসেন। তিনি কোন মতে যাবেন না। আজ বাবা আসিয়াছেন শুনিয়া আর একদিক্‌ দিয়া পলায়ন করিলেন, যাতে তাঁহার সঙ্গে দেখা না হয়।

পিতা মাষ্টারকে চিনিতেন। তাঁর সঙ্গে উপরের বারাণ্ডার উপর বেড়া-ইতে বেড়াইতে কথা কহিতে লাগিলেন।

পিতা। এখানে কর্ত্তা কে? এই নরেন্দ্রই যত নষ্টের গোড়া। ওরা ত বেশ বাড়ীতে ফিরে গিছিল। পড়াশুনা আবার কচ্ছিল।

মাষ্টার। এখানে কর্ত্তা নাই; সকলেই সমান। নরেন্দ্র কি কর্‌বেন? নিজের ইচ্ছা না থাক্‌লে কি মানুষ চলে আসে? আমরা কি বাড়ী একেবারে ছেড়ে আস্‌তে পেরেছি?

পিতা। তোমরা ত বেশ কর্‌ছো গো। তোমরা যা কচ্ছো, এতে কি ধর্ম্ম হয় না? তাইত আমাদের ইচ্ছা। এখানেও থাকুক, সেখানেও থাকুক। দেখ দেখি, ওর গর্ভধারিণী কত কাঁদ্‌ছে।

মাষ্টার দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পিতা। আর সাধু খুঁজে খুঁজে এত বেড়ান। আমি ভাল সাধুর কাছে নিয়ে যেতে পারি। ইন্দ্রনারায়ণের কাছে একটি সাধু এসেছে, চমৎকার লোক! সেই সাধুকে দেখুক না!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

('আয় মা সাধন সমরে।' রাখালের বৈরাগ্য; সন্ন্যাসী ও নারী।)

রাখাল ও মাষ্টার কালীতপস্বীর ঘরের পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় বেড়াইতেছেন ও ঠাকুর ও ভক্তদের বিষয় গল্প করিতেছেন।

রাখাল (ব্যস্ত হইয়া, মাষ্টারের প্রতি)। মাষ্টার মশায়, আসুন আমরা সব সাধন করি।

"তাইত আর বাড়িতে ফিরে গেলাম না। যদি কেউ বলে, ঈশ্বরকে পেলেনা, তবে আর কেন; তা নরেন্দ্র বেশ বলে, রামকে পেলুম না বলে কি শ্যামের সঙ্গে ঘর কর্‌তেই হবে আর ছেলেপুলের বাপ হতেই হবে! আহা, নরেন্দ্র এক একটি বেশ কথা বলে। আপনি বরং জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।

মাষ্টার। তা ঠিক কথা! রাখাল বাবু, তোমারও দেখ্‌ছি, মনটা খুব ব্যাকুল হয়েছে।

রাখাল। মাষ্টার মশায়, কি বল্‌বো? দুপুর বেলায় নর্ম্মদায় যাবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল।

"মাষ্টার মশায়, সাধন করুন, তা না হলে কিছু হচ্ছেনা, দেখুন্ না শুকদেবেরও ভয়। জন্মগ্রহণ করেই পলায়ন। ব্যাসদেব দাঁড়াতে বল্‌লেন, তা দাঁড়ায় না।

মাষ্টার। তুমি বুঝি যোগোপনিষদের কথা বল্‌ছো? মায়ার রাজ্য থেকে শুকদেব পালাচ্ছিলেন। হাঁ, ব্যাস আর শুকদেবে বেশ কথাবার্ত্তা আছে। ইনি সংসারে থেকে ধর্ম্ম কর্‌তে বল্‌ছেন। শুকদেব বল্‌ছেন, হরিপাদপদ্মই সার। আর সংসারীদের বিবাহ করে মেয়ে মানুষের সঙ্গে বাস, এতে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

রাখাল। অনেকে মনে করে, মেয়ে মানুষ না দেখ্‌লেই হলো। মেয়েমানুষ দেখে ঘাড় নিচু কর্‌লে কি হবে? নরেন্দ্র কাল রাত্রে বেশ বল্লে, 'যতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণই স্ত্রীলোক, তা না হলে স্ত্রীপুরুষ ভেদ বোধ হয় না।'

মাষ্টার। ঠিক কথা। ছেলেদের ছেলেমেয়ে বোধ নাই।

রাখাল। তাই বল্‌ছি, আমাদের সাধন চাই।

"মায়াতীত না হলে কেমন করে জ্ঞান হবে! চলুন বড় ঘরে যাই; বরাহনগর থেকে কতকগুলি ভদ্রলোক এসেছে। নরেন্দ্র তাদের কি বল্‌ছে, চলুন শুনি গিয়ে।

(নরেন্দ্র ও শরণাগতি [Resignation])

নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন। মাষ্টার ভিতরে গেলেন না। বড় ঘরের পূর্ব্বদিকের দালানে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছু কিছু শুনিতে পাইলেন।

নরেন্দ্র বলিতেছেন—সন্ধ্যাদি কর্ম্মের স্থান, সময় নাই।

একজন ভদ্রলোক। আচ্ছা মশায, সাধন কর্‌লেই তাঁকে পাওয়া যাবে ?

নরেন্দ্র। তাঁর কৃপা। গীতায বলছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢাণি মাযযা॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

"তাঁর কৃপা না হলে সাধন ভজনে কিছু হয় না। তাই তাঁর শরণাগত হতে হয়।

ভদ্রলোক। আমরা মাঝে মাঝে বিরক্ত কর্‌বো।

নরেন্দ্র। তা যখন হয় আসবেন।

"আপনাদের ওখানে গঙ্গার ঘাটে আমরা নাইতে যাই।

ভদ্রলোক। তাতে আপত্তি নাই, তবে অন্য লোক না যায়।

নরেন্দ্র। তা বলেন ত আমরা নাই যাবো।

ভদ্রলোক। না তা নয়—তবে যদি দেখেন, পাঁচজন যাচ্ছে, তাহলে আর যাবেন না।

(আরতি ও নরেন্দ্রের গুরুগীতা পাঠ।)

সন্ধ্যার পর আবার আরতি হইল। ভক্তেরা আবার কৃতাঞ্জলি হয়ে 'জয় শিব ওঁকার' সমস্বরে গান করিতে করিতে ঠাকুরের স্তব করিতে লাগিলেন।

আরতি হইয়া গেলে ভক্তেরা দানাদের ঘরে গিয়া বসিলেন। মাষ্টার বসিয়া আছেন। প্রসন্ন গুরুগীতা পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। তখন নরেন্দ্র নিজে আসিয়া সুর করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র গাহিতে লাগিলেন,—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতম্ গগনসদৃশম্ তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

আবার গাহিলেন—

ন গুরোরধিকম্ ন গুরোরধিকম্।
শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ॥
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি॥
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি॥

নরেন্দ্র সুর করিয়া গুরুগীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। আর ভক্তদের মন যেন নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির হইয়া গেল। সত্য সত্যই ঠাকুর বলিতেন, সুমধুর বংশীধ্বনি শুনে সাপ যেমন ফণা তুলে স্থির হয়ে থাকে, নরেন্দ্র গাইলে হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, তিনিও সেইরূপ চুপ করে শোনেন। আহা! মঠের ভাইদের কি গুরুভক্তি!

(ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভালবাসা ও রাখাল।)

কালীতপস্বীর ঘরে রাখাল বসিয়া আছেন। কাছে প্রসন্ন। মাষ্টারও সেই ঘরে আছেন।

রাখাল সন্তান পরিবার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য, কেবল ভাবছেন, একাকী নর্ম্মদাতীরে কি অন্য স্থানে চলিয়া যাই। তবু প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন।

রাখাল (প্রসন্নের প্রতি)। কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস্? এখানে সাধুসঙ্গ। এ ছেড়ে যেতে আছে? আর নরেনের মত লোকের সঙ্গ। এ ছেড়ে কোথায় যাবি?

প্রসন্ন। কলিকাতায় বাপ মা রয়েছে। ভয় হয় পাছে তাঁদের ভালবাসা আমাকে টেনে নেয়, তাই দূরে পালাতে চাই।

রাখাল। গুরু মহারাজ যেমন ভালবাসতেন, তত কি বাপ মা ভালবাসে? আমরা তাঁর কি করেছি যে, এত ভালবাসা! কেন তিনি আমাদের দেহ, মন, আত্মার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন? আমরা তাঁর কি করেছি?

মাষ্টার (স্বগতঃ)। আহা, রাখাল ঠিক বলেছেন। তাই তাঁকে বলে অহেতুককৃপাসিন্ধু।

প্রসন্ন। তোমার কি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না?

রাখাল। আমার মনে খেয়াল হয় যে, নর্ম্মদাতীরে গিয়ে কিছুদিন থাকি।

"এক একবার ভাবি, ঐ সব জায়গায় কোন বাগানে গিয়ে থাকি, আর কিছু সাধন করি। খেয়াল হয়, তিন দিন পঞ্চতপা করি। তবে সংসারীর বাগানে যেতে আবার মন হয় না।

(ঈশ্বর কি আছেন ?)

দানাদের ঘরে তারক ও প্রসন্ন কথা কহিতেছেন। তারকের মা নাই। পিতা রাখালের পিতার ন্যায় দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। তারকও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। মঠই তারকের এখন বাড়ী। তারকও প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন।

প্রসন্ন। না হলো জ্ঞান, না হলো প্রেম , কি নিয়ে থাকা যায়?

তারক। জ্ঞান হওয়া শক্ত বটে, কিন্তু প্রেম হলোনা কেমন করে?

প্রসন্ন। কাঁদ্‌তে পার্‌লুম না, তবে প্রেম হবে কেমন করে? আর এত দিনে কি বা হলো?

তারক। কেন, পরমহংস মশায়কে ত দেখেছ। আর জ্ঞানই বা হবে না কেন?

প্রসন্ন। কি জ্ঞান হবে? জ্ঞান মানে ত জানা। কি জান্‌বে? ভগবান্‌ আছেন কিনা তারই ঠিক নাই।

তারক। হাঁ তা বটে, জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। আহা, প্রসন্নের যে অবস্থা, ঠাকুর বল্‌তেন, যারা ভগবান্‌কে চায়, তাদের ওরূপ অবস্থা হয়। কখনও বোধ হয়, ভগবান্‌ আছেন কি না। তারক বুঝি এখন বৌদ্ধমত আলোচনা কর্‌ছেন, তাই জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই বল্‌ছেন। ঠাকুর কিন্তু বল্‌তেন, জ্ঞানী আর ভক্ত এক যায়গায় পৌঁছিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(ভাই সঙ্গে নরেন্দ্র; নরেন্দ্রের অন্তরের কথা।)

ধ্যানের ঘরে অর্থাৎ কালীতপস্বীর ঘরে, নরেন্দ্র ও প্রসন্ন কথা কহিতে-ছেন। ঘরের আর এক ধারে রাখাল, হ—,ও ছোট গোপাল আছেন। শেষাশেষি বুড়ো গোপাল আসিয়াছেন।

নরেন্দ্র গীতাপাঠ করিতেছেন ও প্রসন্নকে শুনাইতেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহন্ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ।

নরেন্দ্র। দেখ্‌ছিস 'যন্ত্রারূঢ়'।

'ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।'

"ঈশ্বরকে জান্‌তে চাওয়া! তুই কীটস্য কীট, তুই তাঁকে জান্‌তে পাব্‌বি"?

"একবার ভাব্‌ দেখি, মানুষটা কি। এই যে অসংখ্য তারা দেখ্‌ছিস, শুনেছি এক একটি Solar system (সৌরজগৎ)। আমাদের পক্ষে একটি Solar system এতেই রক্ষা নাই। যে পৃথিবীকে সূর্য্যের সঙ্গে তুলনা কর্‌লে অতি সামান্য একটি ভাঁটার মত বোধ হয়, সেই পৃথিবীতে মানুষটা বেড়াচ্ছে যেন একটা পোকা। নরেন্দ্র গান গাইয়া বলিতেছেন—

গান।—'তুমি পিতা আমরা অতি শিশু।'
পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের জনম।
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন॥
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে, খেলা করি ধূলি লয়ে,
মোদের অভয় দাও দুর্ব্বল শরণ॥
একবার ভ্রম হলে, আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন?
তা হলে যে আর কভু, উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন॥
আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন।
পদে পদে হয় পিতা চরণ স্খলন॥
রুদ্রমুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে,
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ॥
ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিওনা রোষ।
স্নেহ বাক্যে বল পিতা কি করেছি দোষ॥

শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে,
কি আর করিতে পারে দুর্ব্বল যে জন ॥

"পড়ে থাক্। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক্।

নরেন্দ্র যেন আবিষ্ট হইয়া আবার গাইতেছেন :—

গান। উপায়—শরণাগতি।

প্রভু ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম ম্যায় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা ॥
দো রোটি এক লেঙ্গটি তেরে পাস্ মো পাওয়া।
ভকতি ভাও দে আরোগ নাম তেরা গাওয়াঁ ॥
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেযা।
দাস কবীরা শরণে আযা চরণ লাগে, তারেয়া ॥

"তাঁর কথা কি মনে নাই? ঈশ্বর যে চিনির পাহাড়! তুই পিঁপড়ে, একদানায় তোর পেট ভরে যায়! তুই মনে কচ্ছিস্, সব পাহাড়টা বাসায় আন্‌বি। শুক মহারাজ বলেছেন, মনে নাই, শুকদেব হদ্দ একটা ডেয়ো পিঁপড়ে।

"তাইতো কালীকে বল্‌তুম্, শ্যালা, গজ্ ফিতে নিয়ে ঈশ্বরকে মাপ্‌বি?

"ঈশ্বর দয়ার সিন্ধু, তাঁর শরণাগত হয়ে থাক্; তিনি কৃপা কর্‌বেন; তাঁকে প্রার্থনা কর্—'যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'—

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতঙ্গময়।
আবিরাবির্ম এধি ॥
রুদ্র যত্তে দক্ষিণম্ মুখম্।
তেন মাং পাহি নিত্য ॥

প্রসন্ন। কি সাধন করা যায়?

নরেন্দ্র। শুধু তাঁর নাম কর্! ঠাকুরের গান মনে নাই?

নরেন্দ্র পরমহংসদেবের সেই গানটী গাইতে লাগিলেন—

গান। উপায়—তাঁর নাম।

নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশা কুশি দেতোর হাঁসি লোকাচার ॥

নামেতে কাল পাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে,
আমি ত সেই জটের মুটে হয়েছি আর হব কার ?
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিতান্ত করেছি শিবে শিবেরি বচন সার।

(ঈশ্বর কি আছেন ? ঈশ্বর কি দয়াময় ?)

প্রসন্ন। তুমি বল্‌ছ ঈশ্বর আছেন। আবার তুমিই তো বল্লো,চার্ব্বাক আর অন্যান্য অনেকে ব'লে গেছেন যে, এই জগৎ আপনি হয়েছে।

নরেন্দ্র। Chemistry (কেমিষ্ট্রি) পড়িস্‌নি ? আরে, combination কে কর্‌বে ? যেমন জল তৈয়ের কর্‌বার জন্যে Oxygen, Hydrogen আর Electricity, human handএ একত্র করে।

"Intelligent Force সব্বাই মান্‌ছে। জ্ঞান স্বরূপ একজন যে এই সব ব্যাপার চালাচ্ছে।

প্রসন্ন। দয়া আছে কেমন করে জান্‌লে ?

নরেন্দ্র। 'যত্তে দক্ষিণম্ মুখম্'। বেদে বলেছে।

"John Stewart Millও * ঐ কথা বলেছে। যিনি মানুষের ভিতর এই দয়া দিয়েছেন, না জানি তাঁর ভিতরে কত দয়া! Mill এই কথা বলেন। তিনি (ঠাকুর) তো বল্‌তেন, 'বিশ্বাসই সার'। তিনি তো কাছেই রয়েছেন! বিশ্বাস কর্‌লেই হয়!

এই বলিয়া নরেন্দ্র আবার মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগিলেন।

গান। উপায়—বিশ্বাস।

মোকো কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে মায়তো তেরে পাশ মো।
হোঁয়ে মো ঝগ্‌ড়ি বিগ্‌ড়ি ন ময় ছুড়ি গড়াস মো ॥
ন হোঁয়ে মো খাল রোমমো; ন হাড্‌ডি ন মাস মো।
ন দেবাল মো ন্ মস্‌জেদ মো ন কাশী কৈলাস মো।
ন হোঁয়ে ময় আউধ দ্বারকা, মেরা ভেট বিশ্বাস মো ॥
ন হোঁয়ে মে ক্রিয়া করম মো ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো।
খোঁজেগা তো আও মেল্‌গা, পল ভরকে তলাস মো ॥

* Mill's Posthunus Works

সহরসে বাহার ডেরা হ্যায়াম্মি কুঠিয়া মেরি মৌয়াস মো।
কহত কবীর শুন ভাই সাধু সব সন্তান কি সাথ মো॥

(বাসনা ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস।)

প্রসন্ন। তুমি কখন বল, ভগবান্ নাই; আবার এখন ঐ সব কথা বল্‌ছো। তোমার কথার ঠিক নাই, তুমি প্রায় মত বদ্‌লাও। (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র। একথা আর কখনো বদ্‌লাবো না—যতক্ষণ কামনা, বাসনা; ততক্ষণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস। একটা না একটা কামনা থাকেই। হয়ত ভিতরে পড়্‌বার ইচ্ছা আছে—পাশ কর্‌বে কি পণ্ডিত হবে—এই সব কামনা।

নরেন্দ্র ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া গান গাইতে লাগিলেন। 'তিনি শরণাগত-বৎসল, পরম পিতা মাতা'।

গান।

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা।
সঙ্কটভয়দুখত্রাতা, বিশ্বভুবনপাতা জয় দেব জয় দেব॥
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা প্রভু, নাহি তব উপমা।
প্রভু বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু চিন্ময় পরমাত্মা জয় দেব জয় দেব॥
জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে।
পরম শরণ তুমি হে, জীবনে, মরণে, জয় দেব জয় দেব॥
কি আর যাচিব আমরা, করি হে এ মিনতি, প্রভু করিহে এ মিনতি।
এ লোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি, জয় দেব জয় দেব॥

নরেন্দ্র আবার গাইলেন—ভাইদের হরিরস পিয়ালা পান করিতে বলিতেছেন—ঈশ্বর খুব কাছেই আছেন—কস্তুরী যেমন মৃগের—

পিলেরে অবধু হো মাতুযারা।
পেয়ালা প্রেম হরি রসকা রে॥
বাল অবস্থা খেল গোয়াঞি তরুণ ভেযো নারী বশকারে।
বৃদ্ধ ভেয়ো কফ বায়ুনে ঘেরা খাট পড়া রহ যা মষ্‌কারে॥
নাভ কমলমে হ্যায় কস্তবী, ক্যায়সে ভরম টুটে পশুকা রে।
বিন্ সদ্‌গুরু নর এয়সা হি ভোলে, য্যায়সে মৃগ ফেরে বনকা রে॥

মাষ্টার বারান্দা হইতে এই সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন।

নরেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। ঘর হইতে চলিয়া আসিবার সময় বলিতে লাগিলেন, মাথা গরম হলো বকে বকে।

বারান্দাতে মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, মাষ্টার মহাশয়, কিছু জল খান।

মঠের একজন ভাই নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, 'তবে যে বল ভগবান্ নাই?' নরেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

(নরেন্দ্র ও তীব্র বৈরাগ্য ; নরেন্দ্র ও গৃহস্থাশ্রম।)

পরদিন সোমবার ৯ই মে। মাষ্টার সকাল বেলা মঠের বাগানের গাছতলায় বসিয়া আছেন। মাষ্টার ভাবিতেছেন, ঠাকুর মঠের ভাইদের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এরা কেমন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল! স্থানটি যেন সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। মঠের ভাইগুলি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। ঠাকুর বেশীদিন চলিয়া যান নাই ; তাই সেই সমস্ত ভাবই প্রায় বজায় রহিয়াছে!

সেই অযোধ্যা! কেবল রাম নাই।

এঁদের তিনি গৃহত্যাগ করালেন। আমাদের তিনি গৃহে রেখেছেন কেন? এর কি কোন উপায় নাই?

নরেন্দ্র উপরের ঘর হইতে দেখিলেন,—মাষ্টার একাকী গাছতলায় বসিয়া আছেন। তিনি নামিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কি মাষ্টার মহাশয়, কি হচ্ছে? কিছু কথা হইতে হইতে মাষ্টার বলিলেন, আহা, তোমার কি সুর! একটা কিছু স্তব বল।

নরেন্দ্র সুর করিয়া অপরাধভঞ্জন স্তব বলিতে লাগিলেন—গৃহস্থেরা ঈশ্বরকে ভুলে রয়েছে—কত অপরাধ করে—বাল্যে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে! কেন তারা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা ও চিন্তা করে না!—

বাল্যে দুঃখাতিরেকান্মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা
নো শক্যঞ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি।
নানারোগাদিদুঃখাদ্রোদনপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥
প্রৌঢ়েঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্মর্ম্মসন্ধৌ
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতীস্বাদুসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।

শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং
ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥
বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদিতাপৈঃ
পাপৈ রোগৈর্বিয়োগৈস্ত্বনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনং চ দীনম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জ্জটের্ধ্যানশূন্যং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥
স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিৎ পৃথুতরুগহনাৎ খণ্ডবিল্বীদলানি।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৌ ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যোঽমেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥
গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধণি
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ॥ ইত্যাদি

স্তব পাঠ হইয়া গেল। আবার কথাবার্ত্তা হইতেছে।

নরেন্দ্র। 'নির্লিপ্ত সংসার' বলুন, আর যাই বলুন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না কর্‌লে হবেনা। লোকেদের ঘৃণা করেনা, কামিনী-সঙ্গে সহবাস কর্‌তে ? যে স্থানে কৃমি, কফ, মেদ, দুর্গন্ধ—

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে
স্বভাবদুর্গন্ধিনিরন্তরান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

"বেদান্তবাক্যে যে রমণ করেনা, হরিরস-মদিরা যে পান করেনা, তাহার বৃথাই জীবন।

ওঙ্কারমূলং পরমং পদান্তরং
গায়ত্রীসাবিত্রীসুভাষিতান্তরং।
বেদান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে
বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনম্ ॥

"একটা গান শুনুন—

গান।

ছাড় মোহ—ছাড়রে কুমন্ত্রণা
জান তারে তবে যাবে যন্ত্রণা।
চারিদিনের সুখের জন্য, প্রাণ সখারে ভুলিলে,
একি বিড়ম্বনা।

"কৌপীন না পর্‌লে আর উপায় নাই। সংসার ত্যাগ!

এই বলিয়া আবার সুর করিয়া কৌপীনপঞ্চক বলিতে লাগিলেন—

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমামন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

নরেন্দ্র আবার বলিলেন, মানুষ কেন সংসারে বদ্ধ হবে, কেন মায়ায় বদ্ধ হবে? মানুষের স্বরূপ কি? 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং'।

আবার সুর করিয়া শঙ্করাচার্য্যের স্তব বলিতে লাগিলেন—

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন বা শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমির্ণ তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥
ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু-
র্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।

ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং।
ন চাসংগতং নৈব মুক্তির্নমেয়-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥

নরেন্দ্র আর একটি স্তব বাসুদেবাষ্টক স্তব করিয়া বলিলেন—হে মধুসূদন! আমি তোমার শরণাগত, আমাকে কৃপা করে কামনিদ্রা, পাপ, মোহ, স্ত্রীপুত্রের মোহজাল, বিষয়তৃষ্ণা থেকে ত্রাণ কর। আর পাদপদ্মে ভক্তি দাও।—

ওমিতি জ্ঞানরূপেণ রাগাজীর্ণেন জীর্য্যতঃ।
কামনিদ্রাং প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥
ন গতির্বিদ্যতে নাথ ত্বমেকঃ শরণং প্রভো।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥
মোহিতো মোহজালেন পুত্রদারগৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽহং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥
গতাগতেন শ্রান্তোঽহং দীর্ঘসংসারবর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥
বহবোঽপি ময়া দৃষ্টা যোনিদ্বারং পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥
তেন দেব প্রপন্নোঽস্মি নারায়ণ পরায়ণ।
জগৎসংসারমোক্ষার্থং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥
বাচয়ামি যথোৎপন্নং প্রণমামি তবাগ্রতঃ।
জরামরণভীতোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥

সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসারে পাপপঙ্কেঽস্মিন্ ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
দেহান্তরসহস্রাণামন্যোন্যঞ্চ কৃতং ময়া।
কর্ত্তৃত্বঞ্চ মনুষ্যাণাং ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
বাক্যেন যৎ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা নোপপাদিতং।
সোঽহং দেব দুরাচারস্ত্রাহি মাং মধুসূদন॥
যত্র যত্র হি জাতোঽস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু বা।
তত্র তত্রাচলা ভক্তিস্ত্রাহি মাং মধুসূদন॥

মাষ্টার (স্বগতঃ)। নরেন্দ্রের ভিতর তীব্র বৈরাগ্য। তাই মঠের ভাইদের সকলেরই এই অবস্থা। ঠাকুরের ভক্তদের ভিতর যাঁরা সংসারে এক্ষণেও আছেন, তাঁদের দেখে এদের কেবল কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা উদ্দীপন হচ্চে। আহা, এদের কি অবস্থা। আমাদের তিনি সংসারে এখনও কেন রেখেছেন? তিনি কি কোন উপায় করবেন? তিনি কি তীব্র বৈরাগ্য দিবেন, না, সংসারেই ভুলাইয়া রাখিয়া দিবেন?

আজ নরেন্দ্র আরও দুই একটি ভাই আহারের পর কলিকাতায় গেলেন আবার রাত্রে নরেন্দ্র ফিরিবেন। নরেন্দ্রের বাটীর মোকদ্দমা এখনও চোকে নাই।

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

একবারকার রোগী আর একবার রোজা।

চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট সবডিভিজনস্থ ঝিকরা চট্‌কাবেড়ে গ্রামে উপেন্দ্র নাথ নাথ নামক ৩০।৩১ বৎসর বয়স্ক জনৈক যুবকের বাস। পিতলের তালা প্রস্তুত করিয়া তাহা বিক্রয়ের দ্বারা বেশ দশটাকা উপায় করিত। বহুদিন হইতে সে ম্যালেরিয়া জ্বরে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। ক্রমাগত জ্বরভোগে বিরক্ত হইয়া প্রায় তিন বৎসর হইল, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া অবিমুক্তপুরী কাশীধামে দেহত্যাগ মানসে উপস্থিত হয়। এখানে গঙ্গাস্নান, বিশ্বেশ্বরঅন্নপূর্ণাদর্শন, সত্রে ভিক্ষা দ্বারা কথঞ্চিৎ

উদরপূরণ ও সত্রের ছাদবিহীন বারাণ্ডায় শয়ন করিয়া কোনরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। 'ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ' এই শাস্ত্রবাক্যটীই এই সময়ে যেন তাহার জীবনের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল।

উপেন্দ্রের শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। অন্নসত্র ৺বারাণসীতে যথেষ্ট বটে, কিন্তু সে সকল ব্রাহ্মণের জন্য; ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি ৺কাশীধামে ভিক্ষাজীবী হইয়া থাকিলে তাহার নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্তির অধিক বিলম্ব হয় না। গঙ্গাতীরে বা শ্রীবিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার দ্বারে কাপড় বিছাইয়া বেলা একটা দুইটা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিলে অন্নপূর্ণার কৃপায় একজনের বা ততোধিক লোকের উদরান্নের জন্য যথেষ্ট চাল ভিক্ষা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমাদের উপেন্দ্রের এমন শক্তি ছিল না যে, ঐরূপে চাল ভিক্ষা করিয়া তাহা আবার রাঁধিয়া খায়। রাঁধিবার স্থানই বা তাহার কোথায়? সুতরাং সত্রে ব্রাহ্মণদের আহারের পর যে অন্ন বাঁচিত, তাহাই ভিক্ষা করিয়া খাইয়া কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

এইরূপে কয়েকমাস যায়, একদিন কোন ভদ্রলোক দয়াপরবশ হইয়া উপেন্দ্রকে রামকৃষ্ণসেবাশ্রমের কথা জানান এবং বলেন, সেখানে গেলে বিনা ব্যয়ে ঔষধ, পথ্য এবং থাকিবার স্থান সমস্তই পাওয়া যায়। উপেন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া প্রথম প্রথম সেবাশ্রম হইতে ঔষধ লইয়া যাইত, কিন্তু সেবাশ্রমের অধ্যক্ষেরা দেখিলেন, ইহাতে রোগের কিছু উপশম হইতেছে না। তখন তাঁহারা তাহাকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাহাদের যত্ন ও শুশ্রূষায় প্রায় ৭।৮ মাস রোগভোগের পর উপেন্দ্র সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল ও ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল।

সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে আশ্রমাধ্যক্ষেরা তাহাকে বলিলেন, আপনি যদি আপনার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনাকে আশ্রম সাহায্য করিতে প্রস্তুত। উপেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া বলেন, আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই, আপনারা যদি দয়া করিয়া আশ্রমে রাখিয়া উহার কোন কার্য্য করিতে অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি চিরবাধিত হই। আশ্রমাধ্যক্ষেরা সম্মত হইলে উপেন্দ্র অতি আনন্দের সহিত জীবসেবা-রূপ মহৎ কর্ম্মে ব্রতী হইল। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, পাগল, পঙ্গু, অন্ধ ও অন্যান্য রোগি-গণকে সে যে কিরূপ যত্নের সহিত সেবা করিত, তাহা বর্ণনাতীত। তাহার

সেবা দেখিয়া বোধ হইত, সে যেন নিজেরই বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিতেছে। পাগল রোগী খেতে চায না, নিজে হাতে তুলে তাদের খাওযাইযা দিত। তাহারা মারিতেছে, গালি দিতেছে, উপেন্দ্র তাহাতে কর্ণপাত না করিযা আপনার কায করিযা যাইতেছে। উপেন্দ্র অল্পদিনের মধ্যে সেবাশ্রমের একজন উপযুক্ত সেবক হইয়া দাঁড়াইল।

সেবাশ্রমের সেবকগণ প্রায সকলেই শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির ব্রহ্মচারী শিষ্য। তাঁহারা সকলেই সেবাকার্য্য হইতে অবসর পাইলে, শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও পরমহংসদেবের অন্যান্য ভক্তদের জীবনী ও উপদেশ চর্চ্চা করিতেন,—উপেন্দ্রও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিল। স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের কর্ম্মযোগের উপদেশগুলি তাহার হৃদয়ের গভীর স্তরে প্রবেশ করিল। ক্রমশঃ সেবাকার্য্যে তাহার নিষ্ঠা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে, দিনরাত রোগীদের পার্শ্বে বসিযা থাকে—অনেক সময় তাহাদের ভাবনায রাত্রে ঘুম হয না। এইরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার কঠিন শিরঃপীড়া হইল। ডাক্তারগণের আদেশমত তাহাকে কিছুদিন রোগীদের নিকট যাইতে দেওয়া হইল না। কিছুদিন বিশ্রাম ও শুশ্রূষায সে আরোগ্য লাভ করিল।

পাঠক মহাশযদের জানা উচিত যে, সেবাশ্রমের সাহায্যের জন্য এখানে কাশীবাসী অনেক সহৃদয ব্যক্তিদের বাটীতে একটী করিয়া হাঁড়ি দিযা আসা হইযাছে। তাঁহারা প্রত্যহ পাকের পূর্ব্বে এক মুষ্টি চাল ঐ হাঁড়িতে ভিক্ষার হিসাবে ফেলিযা রাখেন এবং সপ্তাহে একদিন আশ্রমস্থ একজন ব্রহ্মচারী বাড়ী বাড়ী গিযা তাহা সংগ্রহ করিযা আনেন। এই উপাযে মাসে প্রায ৫।৬ মণ চাল সেবাশ্রমে আসে এবং তদ্দ্বারা অনেক দীন দরিদ্র পীড়িতের সেবা হয। উপেন্দ্রনাথ এখন এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তিনি নিজের চেষ্টায হাঁড়ির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায দুই শত বৃদ্ধি করিলেন। তদ্দ্বারা আশ্রমের যথেষ্ট উপকার হইতে লাগিল।

সম্প্রতি প্রায় এক মাস হইল, সেবাশ্রমের জনৈক তত্ত্বাবধারক এক বসন্ত রোগীর সেবা করিয়া নিজে ঐ রোগে আক্রান্ত হন। উপেন্দ্র তাঁর শুশ্রূষা করিয়া তাঁকে সুস্থ করিয়া তুলিল কিন্তু নিজে ঐ রোগে আক্রান্ত হইযা ৬ই মে শুক্রবারে ⁄কাশী লাভ করিয়াছে।

উপেন্দ্র আশ্রমস্থ যে সকল রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিত এবং বাড়ী

বাড়ী গিয়া যে সকল দরিদ্র অনাথ অসক্ত রোগীদের ঔষধ পথ্য নিত্যই দিয়া আসিত, সকলেই তাহার এই অকালে কালগ্রাসে দিবারাত্র তাহার গুণাবলি স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছেন। ধন্য উপেন্দ্রনাথ! তুমি যে মূল মন্ত্র পাইয়াছিলে, সে মন্ত্র সিদ্ধির জন্য তুমি যথার্থ অকপট ভাবে প্রাণের মায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া সতত যত্নবান্ ছিলে। পাঠক, সে মন্ত্রটী কি শুনিবেন? ঈশ্বরই জীবরূপে জগতে বিচরণ করিতেছেন, নিঃস্বার্থ ভাবে জীব সেবা করিলে স্বয়ং ঈশ্বরেরই সেবা হয়, নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরের ধ্যান, জপ, পূজা পাঠ, তপস্যা ইত্যাদিতে মনুষ্য যে ফল লাভ করে, নিষ্কাম জীবসেবাতেও সেই ফল হয়; বরং কাহারও কাহারও মতে আরো অধিক। উপেন্দ্র যখন সেবাশ্রমের সেবক রূপে গৃহীত হয়, তখন এই মন্ত্র পাইয়াছিল এবং জীবনটী এই মন্ত্র সিদ্ধির জন্যই উৎসর্গ করিয়াছিল। যে সেবাশ্রমে রোগী হইয়া প্রবিষ্ট হইল, সেই খানেঁ আবার রোজা হইয়া ভগবানের কার্য্য নিঃস্বার্থ ভাবে করিতে করিতে এই অবিমুক্ত পুরী কাশীধামে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। ধন্য শ্রীমদ্বিবেকানন্দ স্বামী কথিত কর্ম্মযোগ উপদেশ, ধন্য তাঁহার গুরুদেব, যিনি লোকহিত-সাধক জীবন্ত মহামন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা আবার স্বামীজি দ্বারা এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

গভীর শোকের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২৭শে বৈশাখ তারিখে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী নিরঞ্জনানন্দ হরিদ্বারে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি অতি বাল্যকাল হইতেই ভগবান্ শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের সঙ্গ ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নির্ভীক, তেজস্বী ও বালকবৎ সরলস্বভাব ছিলেন। কয় বৎসর যাবৎ দুরারোগ্য রক্তামাশয় রোগে ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি কতকটা সুস্থ হইয়া হরিদ্বারে বায়ু পরি-বর্ত্তনার্থ গিয়াছিলেন। তথায় হঠাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার শরীর ত্যাগ হয়।

কালিফোর্ণিয়া শান্তি আশ্রমের কথা সম্ভবতঃ পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। এই আশ্রম আমেরিকার কোলাহলপূর্ণ নগরীসমূহ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির অনুগ্রহে প্রাপ্ত এই স্থানে স্বামী তুরীয়ানন্দ এই আশ্রম স্থাপন করেন এবং কয়েকজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীকে সাধন ভজন শিক্ষা দেন। এই আশ্রম চতুর্দ্দিকে উচ্চ শৈলমালায় বেষ্টিত এবং যেন সাক্ষাৎ শান্তিদেবীর নিবাসস্থান। তথায় গুরুদাস নামক একজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী নিয়ত বাস করেন।

বিগত ২৯শে অক্টোবর স্বামী ত্রিগুণাতীত সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতির দ্বাদশ জন ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া এই আশ্রমে সাধনার্থ গিয়াছিলেন। এখানে প্রায় এক মাস কাল ক্রমাগত ধ্যান ভজন পাঠাদি হয়। ইহার দ্বারা ছাত্রগণ বেদান্তের উপদেশ সমূহ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলেন। কর্ম্মময় আমেরিকান জীবনে ইহা এক নূতন ব্যাপার! সকলেই আপনাদিগকে এই নির্জ্জন বাসের দ্বারা আশাতীত উপকৃত বোধ করিয়াছেন এবং কবে আবার সেই শান্তিনিকেতনে গিয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া জগৎপিতার ধ্যান ধারণায় দিন কাটাইবেন, সেই শুভ দিনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন।

বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পূজা ও তৎপরের রবিবারে সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসব হয়। এই উৎসব উপলক্ষে স্বামী অভেদানন্দ 'প্রকৃত মহাত্মা' বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তিনি এমন জ্বলন্ত ভাষায় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনী ও উপদেশ বিবৃত করেন যে, তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার সমুদয় কথা শ্রবণ করেন।

তিথিপূজার দিন স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য ও বন্ধুগণ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পূজা করিবার জন্য এত অধিক পরিমাণে পুষ্প ফলাদি আনয়ন করিয়াছিলেন যে, পরমহংসদেবের প্রতিকৃতির নিম্নস্থিত বেদিতে সকল গুলির স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন হইয়াছিল। ধ্যান, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও জগদম্বার স্তোত্রাদি পাঠ ও পূজায় সারাদিন কাটিল। ভক্তগণের অনেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত বেদীসমীপে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

পরে স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও তাঁহার কিছু কিছু উপদেশ পাঠ করিয়া এই আলোচনায় আমাদের কতদূর উপকার হইতে পারে, তাহা সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিলেন।

সাধারণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ এরূপ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছে যে, ব্রুকলিনে একটি শাখা সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে। স্বামী অভেদানন্দ 'তথায় সার্ব্বভৌমিক বেদান্ত ধর্ম্ম' এবং 'আত্মরহস্য' নামক দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামী অভেদানন্দ কর্ণেল ইউনিভার্সিটির প্রায় তিন শত ছাত্র ও অধ্যাপকের সম্মুখে এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সকলেরই এতদূর হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল যে, তৎপরদিন কর্ণেলের গৃহে কথোকথন সভায় যোগ দিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। স্থানীয় সংবাদপত্রসকলও তাঁহার বক্তৃতার খুব প্রশংসা করিতেছে।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] [২০৭ পৃষ্ঠার পর।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক রামানুজ মহাপূর্ণকে আপনার গুরুরূপে পাইয়া শ্রীযামুনাচার্য্য জনিত শোক বিস্মৃত হইলেন। তিনি আদর্শ শিষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়া শিষ্যকর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শরীরং বসু বিজ্ঞানং বাসঃ কর্ম্ম গুণান্ অসূন্।
গুর্ব্বর্থং ধারয়েদ্ যস্তু স শিষ্যো নেতরঃ স্মৃতঃ॥

যিনি শরীর, ধন, জ্ঞান, বসন, কর্ম্ম, গুণ ও প্রাণ স্বীয় গুরুর জন্যই ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য, অন্যে নহে। রামানুজ এইরূপ শিষ্যই ছিলেন। মহাপূর্ণের নিকট ন্যাসতত্ত্ব, গীতার্থসংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়, ব্যাসসূত্র, পঞ্চরাত্রাগম প্রভৃতি অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভায় মহাপূর্ণ মোহিত হইয়া স্বীয় সন্তান পুণ্ডরীককে তাঁহার শিষ্য করিয়া দিলেন; এবং তাঁহাকে কহিলেন, বৎস, এখান হইতে কিছুদূরে তিরুকোট্টির বা গোষ্ঠিপুর নামে এক বৰ্দ্ধিষ্ণু নগর আছে। তথায় গোষ্ঠিপূর্ণ নামে এক পরম ধার্ম্মিক পণ্ডিত বাস করেন। তাঁহার ন্যায় পরম বৈষ্ণব আর এ অঞ্চলে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি তুমি অর্থসহিত বৈষ্ণবমন্ত্র অবগত হইতে চাও, তাহা হইলে তিনি ভিন্ন আর কেহ তোমায় তাহা শিক্ষা দিতে পারিবেন না। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া যাহাতে অচিরে মন্ত্রলাভ করিতে পার, তাহার জন্য যত্নশীল হও। ইহা শুনিয়া শ্রীরামানুজ তৎক্ষণাৎ গোষ্ঠিপুরে গমন করিলেন, এবং গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দন করতঃ স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি কহিলেন, "অন্য এক দিন আসিও, দেখা যাইবে।" ইহাতে রামানুজ ক্ষুণ্ণ হইয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। ইহার দুই একদিন পরে শ্রীরঙ্গমে মহান্ উৎসব উপলক্ষে গোষ্ঠিপূর্ণ ভগবদর্চ্চনার্থ তথায় উপনীত হইলেন। কথিত আছে যে, কোনও রঙ্গনাথের সেবক ভগবদাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি রামানুজকে সরহস্য মন্ত্র উপদেশ দিও। কারণ, তাহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আধার আর কুত্রাপি পাইবে না।" ইহাতে গোষ্ঠিপূর্ণ উত্তর করিলেন, "হে প্রভো, আপনিই নিয়ম করিয়াছেন যে,

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।

ন চাশুশ্রূষবে দেয়ং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥

অগ্রে কিঞ্চিৎ কাল তপস্যাদি না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। অশুদ্ধ চিত্তের মন্ত্রধারণক্ষমতা কিরূপে সম্ভবে?" ইহাতে এই উত্তর হইল, "পূর্ণ, তুমি ইঁহার পবিত্রতার বিষয় অবগত নহ, তাই এরূপ বলিতেছ। ইনি সর্ব্বজন-পাবন, ইহা পরে জানিতে পারিবে।"

শ্রীরামানুজ ইহার পর পুনরায় গোষ্ঠিপূর্ণের পদমূলে উপনীত হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। এইরূপে তিনি অষ্টাদশ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। ভাবিলেন, "আমার ভিতর নিশ্চয়ই কোন মালিন্য আছে, এই জন্যই দেশিকেন্দ্র কৃপা করিতেছেন না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কতিপয় লোক আসিয়া এই বার্ত্তা গোষ্ঠিপূর্ণকে জানাইলে তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি রামানুজকে লোকদ্বারা আনাইয়া তাঁহাকে সরহস্য মন্ত্রবীজ দান করিলেন, এবং কহিলেন, "এক শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন ইহার মাহাত্ম্য আর কেহ অবগত নহে। আমি তোমায় মহান্ আধার বলিয়া জানি, সেই জন্যই ইহা তোমায় দান করিলাম। কলিকালে ইহার অধিকারী আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিতে পাই না। যে কেহ ইহা শ্রবণ করিবে, সে নিশ্চয়ই দেহান্তে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে। সুতরাং ইহা আর কাহাকেও দিও না।" শ্রীরামানুজ শ্রীগুরুবাক্য শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র বাসনা পূর্ণ হইল। মন্ত্রশক্তিতে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তাঁহার বদনসুধাকর একপ্রকার অলৌকিক কান্তি ধারণ করিল। পরম নির্বৃতিলাভ পূর্ব্বক তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন ও স্বীয় গুরুদেবের চরণে বার বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক আপনাকে পরম ভাগ্যবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া তিনি শ্রীরঙ্গমের দিকে যাইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি গোষ্ঠিপুরস্থ শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের মহোচ্চ দ্বার লক্ষ্য করিয়া, তদভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; এবং পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকে এই বলিয়া আমন্ত্রণ করিলেন, "মন্দির সমীপে আইস, আমি তোমায় এক অমূল্য রত্ন দান করিব।" তাঁহার উল্লসিত মুখশ্রী, অমানুষীভাব, সারল্যময় বচনবিন্যাস,

ব্রহ্মণ্যতেজোময়ী দিব্য কান্তি দর্শন পূর্ব্বক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার অনুগামী হইলেন। ক্রমে সমস্ত নগরে এই জনরব উঠিল যে, এক মহাপুরুষ স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া মন্দির সমীপে অবস্থান করিতেছেন এবং যে যাহা চাহিতেছে, তাহাকে তাহাই দিতেছেন। এই জনরবে আকৃষ্ট হইয়া যিনি যেরূপ অবস্থাতে ছিলেন, তিনি সেই অবস্থাতেই মন্দিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এক দণ্ডের মধ্যে নগরস্থ ও নগরপার্শ্বস্থ যাবতীয় নরনারী উপস্থিত। সেই মহতী জনতা সন্দর্শনে রামানুজের হৃদয়ে অসীম প্রেমসিন্ধু আনন্দবাত্যাবিতাড়িত হইয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল; তিনি সমাগত শিষ্যদ্বয়, দাশরথি ও কুরেশকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকেও উক্ত আনন্দের অংশী করিলেন। পরে গোপুর বা মন্দিরদ্বারে আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তম ভাই ভগিনীগণ, তোমরা যদি এই মুহূর্ত্তে সংসারের যাবতীয় জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে চিরকালের জন্য মুক্তি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাদের জন্য আমি যে মন্ত্ররত্ন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তাহা আমার সহিত বারত্রয় উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হও।" ইহাতে সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "বলুন, কৃতার্থ করুন, আমরা প্রস্তুত।" তখন, যামুন মুনির হৃদ্গতভাবের একমাত্র মর্ম্মজ্ঞ, উভয়বিভূতিপতি, সর্ব্বসন্তাপহারী, সর্ব্বজনপ্রিয়, বাৎসল্যাপযোনিধি, জীবদুঃখাসহিষ্ণু, হতাশ তমসাচ্ছন্নের ভাস্বর স্বরূপ, লক্ষ্মণাবতার শ্রীরামানুজ স্বীয় আনন্দময় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে বজ্রনির্ঘোষে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মহামন্ত্রের অবতারণা করিলেন। নিরতিশয় ক্ষুধাতুর যদ্রূপ আগ্রহের সহিত অন্নরস গ্রহণ করে, সেই মহতী জনতা তদ্রূপ আগ্রহের সহিত সেই সর্ব্বসুখনিধান মহামন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কোটি বজ্রনির্ঘোষে এককালে তাহা উচ্চারণ করিল। শ্রীরামানুজের সহিত এইরূপ আর দুইবার বলিয়া সকলে স্থির হইল। অহো! মন্ত্রের কি প্রভাব! তৎকালে অবনী যেন বৈকুণ্ঠের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দ্বারা এরূপ বোধ হইতেছিল, যেন দুঃখ-মালিন্য চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। যাঁহারা অর্থাগম, বা অন্য কোন সাংসারিক বাসনার পরিপূর্ত্তি প্রত্যাশায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কাচখণ্ডসংগ্রহেচ্ছুর সহসা হীরকখণ্ড লাভ জনিত মহানন্দের ন্যায় নিত্যানন্দ লাভ করিয়া অর্থ বা সংসারের কথা একবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। দিব্যা-

নন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলে দেবতুল্য হইয়াছিলেন। এইজন্য পৃথিবীও সেই সময় স্বর্গতুল্য হইয়াছিল। রামানুজ শ্রীচরণোদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করতঃ জনতা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন শিষ্যদের সমভিব্যাহারে গোপুর হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক শ্রীরামানুজ গোষ্ঠিপূর্ণের শ্রীপাদপদ্ম পূজা মানসে তদ্গৃহোদ্দেশে গমন করিলেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য শিষ্যের মুখে গোষ্ঠিপূর্ণ রামানুজবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং শিষ্যদ্বয়ের সহিত যতি-রাজ যখন তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, তিনি ক্রোধবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তারস্বরে কহিলেন, "দূর হও নরাধম, মহারত্ন তোমার ন্যায় নর-পশুকে দিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি, আবার কেন তোমার মুখদর্শন-জনিত মহাপাপে আমায় লিপ্ত করিতে আসিয়াছ? তোমার ন্যায় পিশাচের নরকেও স্থান হওয়া দুষ্কর।" রামানুজ ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া অতিবিনীত ভাবে কহিলেন, "মহাত্মন্, নরকবাসের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আমি আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি। আপনার বাক্যানুসারে যে কেহ উক্তমন্ত্র শ্রবণ করিবে,তাহার পরমাগতি লাভ হইবে। উক্ত বাক্যের উপর নির্ভর করি-য়াই আমি নগরের যাবতীয় নরনারীকে মোক্ষপথের পথিক করিয়াছি। দেহান্তে তাহারা সকলেই পরমপদ লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে। যদি আমার ন্যায় একজন তুচ্ছলোক নরকে গমন করে ও তৎপরিবর্ত্তে সহস্র সহস্র নরনারী বৈকুণ্ঠ গমনের অধিকার পাইয়া কৃতকৃত্য হয়, তাহাহইলে এরূপ নরকগমন আমার প্রার্থনীয়। আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি, সুতরাং আমার নরক হউক। এবং আপনার বাক্যানুসারেই সহস্র সহস্র পাপী তাপীর পরমাগতি লাভ হউক। ইহাপেক্ষা ক্ষেমকর ও লাভজনক আর কি আছে?"

দুর্দ্দিনসারথি কৃষ্ণবর্ণ মেঘবাজি তড়িৎরূপ মুখভঙ্গিমা দ্বারা ভয়োদ্দীপক বদন বিস্ফারিত করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকিলে আবালবৃদ্ধবনিতা যেরূপ ত্রস্ত হইয়া উঠে, এবং পরক্ষণেই বিপরীত বায়ু সবেগে প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করতঃ প্রকৃতির মুখ নির্ম্মল করিলে যেরূপ ত্রাস দূর হইয়া হর্ষের সঞ্চার করে, সেইরূপ গোষ্ঠিপূর্ণের ক্রোধম্লান ভ্রূকুটিভীষণ কঠোরবাক্যবিকীর্ণ-কারী বদন অবলোকন করিয়া সকলে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু শ্রীরামানুজের

তীক্ষ্ণযুক্তিসমন্বিত প্রেমগর্ভ বিনয়পূর্ণ রুচির বাগ্‌বিন্যাস তদীয় গুরুর বদন ক্রোধলেশপরিশূন্য ও নির্ম্মল করিল, সকলের হৃদয় হইতে ত্রাস দূর হইল। আপনার সঙ্কীর্ণতা ও রামানুজের পরমোদারতা উপলব্ধি করিয়া গোষ্ঠিপূর্ণ যখন তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত আলিঙ্গন করিলেন, তখন এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, আনন্দাতিরেকে কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। ভুজবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া যুক্তকরে গোষ্ঠিপুরপতি রামানুজকে কহিলেন, হে মহানুভব, অদ্য হইতে তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য। যাঁহার এরূপ বিশাল হৃদয়, তিনি লোকপিতা বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। আমি সামান্য জীব। তোমার মাহাত্ম্য কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব? আমার অপরাধ ক্ষমা কর। লজ্জাবনত মস্তকে গুরুর পাদদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীরামানুজ কহিলেন, "হে মহাত্মন্, আপনি আমার নিত্যগুরু। আপনার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়াই মন্ত্রের এতাদৃশ মাহাত্ম্য হইয়াছে। আপনার অসীম প্রভার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র উক্তমন্ত্রে সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার সর্ব্বলোকপাবনকারী শক্তির উদয় হইয়াছে, যাহার বলে অদ্য শত শত নর নারীর দুঃখসন্তাপরাশি দগ্ধ হইয়া গেল, যাহার বলে আমি গুরুবাক্য লঙ্ঘনরূপ মহাপাতক করিলেও, আপনার দেবদুর্লভ আলিঙ্গন লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হইলাম। সন্তান বলিয়া দাস বলিয়া চিরকাল শ্রীচরণে স্থান দিবেন, ইহাই আমার ঐকান্তিকী প্রার্থনা"।

শ্রীরামানুজের মাধুর্য্য ও বিনয়ে পরমপ্রীত হইয়া গোষ্ঠিপূর্ণ স্বীয় তনয় সৌম্যনারায়ণকে তাঁহার শিষ্যরূপে অর্পণ করিলেন। গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরামানুজ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহাকে সকলেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মণাবতার বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

রক্তাক্ষ-গৌরীধ্বজ-মিলন।

নৈনিসর ও চম্পাবত দুই নাতিদূরস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্য। রক্তাক্ষ নৈনিসরের, গৌরীধ্বজ চম্পাবতের অধিপতি। উভয় রাজ্যের রাজধানীতে দেবী রণ-বিজয়ী মূর্ত্তির প্রত্যহ মহা সমারোহে পূজা হয়। কিংবদন্তী যে, মূর্ত্তিদ্বয় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। নৈনিসর ও চম্পাবতের অধিপতিগণ আপনা-দিগকে রণবিজয়ীর বরপুত্র মনে করিতেন। কিন্তু উভয় রাজ্যের অধিপতিই বংশপরম্পরাক্রমে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। রক্তাক্ষ সঙ্কল্প করিয়াছেন, গৌরীধ্বজের বিনাশ ও চম্পাবতরাজ্য স্বরাজ্যভুক্ত করিবেনই।

প্রত্যূষে রক্তাক্ষ চম্পাবত রাজ্য আক্রমণে যাত্রা করিলেন! রণবিজয়ীর মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আজ মা তোমাকে প্রণাম করিব না। পারি যদি, গৌরীধ্বজের ছিন্নমস্তকে শ্রীচরণ অলঙ্কৃত করিয়া প্রণাম করিব।"

সসৈন্য রক্তাক্ষের আগমন সংবাদে গৌরীধ্বজ সংগ্রামের বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। ভক্তিসহকারে রণবিজয়ীর পূজা করিলেন, চরণামৃত, নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন, "দুর্গতিনাশিনি, দেখো যেন যুদ্ধে তোমার অভয়পদাশ্রয়ী সন্তানের কোন অমঙ্গল না ঘটে।"

যুদ্ধ হইল। রক্তাক্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত গৌরীধ্বজ নৈনিসর-কারা-গারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কুসুমকোমলশয্যাশায়ী রক্তাক্ষ কারাগারধূলিশয্যা-শায়ী গৌরীধ্বজের দুর্ভাগ্য নিজ সৌভাগ্যের সহিত তুলনা করিতে-ছেন, "রক্তাক্ষ, স্ববংশ উজ্জ্বল করিলে, চিরশত্রুকুলোদ্ভব গৌরীধ্বজ তোমার হস্তগত; কাল তাহাকে রণবিজয়ী পূজায় বলি দিয়া তুমি যে বীরজননীর যথার্থ বরপুত্র, একথা সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণ করিবে। গৌরীধ্বজ, সামান্য প্রহরীর ইঙ্গিতে তুমি এখন চালিত; তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবার রক্তাক্ষের দাসত্বে নিযুক্ত। ধিক্ তোমাকে! এ অপমান স্বচক্ষে দেখা অপেক্ষা রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ শতগুণ শ্রেয়ঃ ছিল না? অচিরে তোমার পিতৃপিতামহাগত রাজ্যে রক্তাক্ষের পতাকা সগর্ব্বে নৃত্য করিবে। আমি যদি তুমি হইতাম, উঃ, তা হলে এক মুহূর্ত্তও জীবন আমার পক্ষে অসহ্য হইত।"

"রাজা ছিলাম, বন্দী হইয়াছি। জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়ম পরিবর্ত্তন। কোন্ অবস্থা চিরস্থির? সম্পদের পশ্চাৎ বিপদ পদে পদে; ধন, মান, বল, রূপ,

এই আছে, এই নাই। আমার বলিবার কি আছে? আমার রাজ্য, আমার বনিতা, আমার আত্মজ, এক্ষণে রক্তাক্ষের। আমার শরীর, এ ভ্রমও জল্লাদ অনতিবিলম্বে দূর করিবে। সংসার দুদিনের পান্থনিবাস, তার জন্য সকলের ছুটাছুটি কেন! জীবনের পরিণাম মৃত্যু, এ নিশ্চিত সত্য কালপুরুষ জ্বলন্ত অক্ষরে দশদিকে বিজ্ঞাপিত করিতেছে; মানুষ তা দেখিয়াও কেন দেখে না?" সংসারের অনিত্যতা চিন্তন করিতে করিতে গৌরীধ্বজ নিদ্রিত হইলেন। রক্তাক্ষও নিদ্রিত।

রক্তাক্ষ স্বপ্ন দেখিলেন, মা রণবিজয়ী বলিতেছেন, "গৌরীধ্বজের দুর্গতিতে তোর এত আহ্লাদ! জানিস, তুই যে, আমার গৌরীধ্বজও সেই।"

"কখনই না। আমি রক্তাক্ষ, গৌরীধ্বজ গৌরীধ্বজ। আমি নৈমিসরের অধিপতি, গৌরীধ্বজ ছিল চম্পাবতের। আমি বিজয়ী, সে পরাজিত বন্দী। রক্তাক্ষ কেন গৌরীধ্বজ হতে যাবে?"

"দেখ্‌বি?"

রক্তাক্ষ দেখিলেন, তাঁহার আমি ক্ষুদ্র মানবদেহধারী রক্তাক্ষ জ্ঞান ক্রমশঃ প্রসার হইয়া 'আমি বৃহৎ, অতি বৃহৎ' জ্ঞানে পরিণত হইতেছে। দেখিলেন, তিনি মহাম্বুনিধির ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, একরূপ, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। আবার দেখিলেন, এক তিনি, বহু হইয়া বহুরূপে বিরাজিত। একরূপে তিনি বিশ্বনিয়ন্তা, অপরিমেয় চৈতন্য, শক্তি, আনন্দ, ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, অসীম বিশ্ব তাঁহার শরীর; অন্য অগণ্য রূপ সমূহে তিনিই বিশ্ববাসী হইয়া স্বীয় বিশ্বনিয়ন্তারূপের বিশ্বরূপ শরীরে কীটাণুসম ক্রীড়া করিতেছেন। পরক্ষণে এ জ্ঞান সঙ্কুচিত হইল। দেখিলেন, তিনি গৌরীধ্বজ, চম্পাবতের রাজা, রক্তাক্ষ কর্তৃক লাঞ্ছিত, মনদুঃখে কারাগারে রাত্রিযাপন করিতেছেন। নিশাবসানে রক্তাক্ষপূজিত রণবিজয়ীর বলি উদ্দেশ্যে আনীত হইলেন। উত্থিত কৃপাণ ক্ষণমাত্রমধ্যে তাঁহার ইহলীলার অন্ত করিবে। তিনি ভয়বিহ্বল, রুদ্ধশ্বাস, দারুণ যাতনা অনুভব করিতেছেন।

সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। অদ্ভুত স্বপ্ন স্মরণে রক্তাক্ষের বারংবার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। বিলম্বব্যতিরেকে গৌরীধ্বজের কারাগার অভিমুখে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

প্রহরীকে কারাগারের দ্বার মুক্ত করিতে বলিলেন। নিদ্রিত গৌরীধ্বজকে জাগ্রত করিলেন। গৌরীধ্বজ প্রেমগদগদস্বরে বলিলেন, ভাই, আমরা

ভাই, আমরা এক মা রণবিজয়ীর বরপুত্র, আমাদের বিদ্বেষ ভাব কেন ? বলিতে বলিতে রক্তাক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুধারাস্নাত করিলেন। বলিলেন, স্বপ্নে মা আসিয়া বলিলেন, তুইও বলিস্, রক্তাক্ষও বলে, তোরা আমার বরপুত্র। তবে ভাই ভাইয়ের মত থাকিস্ না কেন ? তোদের ও সব মুখের কথা।

আজ মহানন্দে রণবিজয়ীর পূজা হইল। রক্তাক্ষ ও গৌরীধ্বজ একমন্ত্রে এককালে দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। নৈনিসর ও চম্পাবতের প্রজাগণ একত্রে মহাসুখে, মার প্রসাদ পাইল। গৌরীধ্বজ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কত দিনের বিবাদ এক রাত্রের বিস্মৃতির অগাধ গর্ভে চিরকালের জন্য মগ্ন হইল। গৌরীধ্বজ সত্য বলিয়াছিলেন, পরিবর্ত্তন জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

"সন্ন্যাসী।"

সৃষ্টিতত্ত্ব। *

(শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল।)

যঃ পুমান্ সাংখ্যদৃষ্টীনাম্ ব্রহ্ম বেদান্তবাদিনাম্।
বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞানবিদামেকান্তনির্ম্মলম্॥
যঃ শূন্যবাদীনাম্ শূন্যো ভাসকো যোঽর্কতেজসাম্।
শুদ্ধসত্ত্বমমুং দেবং নমামি জ্ঞানদং বিভুং॥

মাননীয় সভাপতি মহাশয়। বিবিধশাস্ত্রপারদর্শী মহোদয়গণ!

অদ্য আমি একটী দুরূহ বিষয় অবলম্বন করিয়াছি, যে বিষয় মহর্ষি কপিল দেব কর্তৃক ভূয়োভূয়ঃ আলোচিত হইয়াছে, যে বিষয় জানিবার নিমিত্ত ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান-কুশল মহর্ষিগণ গ্রহোপগ্রহ-সমন্বিত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। যে সৃষ্টিতত্ত্ব বশিষ্ঠপ্রমুখ

---

* হৃষীকেশ বাবু বারাণসীর অন্তর্গত মদনপুরার মিত্রগোষ্ঠীসভার (Friend's Association) এক অধিবেশনে সংস্কৃত ভাষায় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ তাহারই উক্ত হৃষীকেশ বাবু কৃত বঙ্গানুবাদ।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, ব্রহ্মা সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও যাহা অবগত হইতে পারেন নাই, আমি আজ সেই সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে উৎসুক হইয়াছি। ইহা আমার পক্ষে চপলতার বিষয়, সন্দেহ নাই। সত্য সত্যই মনোরথের অগম্য স্থান কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন যে, আপনাদিগের ন্যায় পবিত্রহৃদয় জ্ঞানিগণসমক্ষে আমি শিক্ষার্থিরূপে উপস্থিত হইয়াছি; আজ আমার বড়ই আনন্দ যে, মহর্ষিদিগের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে এক একটি বস্ত্বাহরণ পূর্ব্বক যে একটী অভিলষিত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহাই আজ আপনাদিগকে দেখাইব।

সভ্য মহোদয়গণ। যখনই এই জীবকোলাহলপরিপূর্ণ নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সায়াহ্নে নির্জ্জনে বসিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, যখনই দেখি, পুঞ্জীকৃত নক্ষত্রমালা নীলাম্বরে মুক্তাফলের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে, তখনই হৃদয় বিস্ময়রসে অভিভূত হয়, তখনই মনে হয়; এই দৃশ্যমান নক্ষত্রপুঞ্জের প্রত্যেকটী ত এক একটী জগৎ। ইহাদের মধ্যে কোনটী পৃথিবীর ন্যায়, কোনটী বা পৃথিবী হইতেও বৃহৎ, কোনটী সূর্য্যতুল্য, কোনটী সূর্য্য হইতে প্রকাণ্ড। গ্রহোপগ্রহসমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড কি বিশাল! কোথায় বিশালা সৃষ্টি, আর কোথায় বা আমার স্বল্পবিষয়গ্রাহিণী বুদ্ধি! তবে কিরূপে সৃষ্টিতত্ত্ব নিরূপণ করিব? কে বলিয়া দিবে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কি রূপে উৎপন্ন হইল?

মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় যাঁহা হইতে সমস্ত জ্ঞান ক্ষরিত হইয়াছে, সমস্ত শাস্ত্রেরই যিনি উৎপত্তিস্থান, সেই শব্দব্রহ্ম বেদ বলেন—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমোপরোযৎ
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভ
কিমাসীদ্‌গহনং গভীরং

অর্থাৎ যাহা অসৎ, তাহা তখন ছিল না, যাহা সৎ তাহাও ছিল না, পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, তাহা হইতে উন্নত স্থানও ছিল না, আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? গহন ও গভীর জল তখন ছিল কি? যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে—জগত সৎও ছিলনা অসৎও ছিলনা, তাহা হইলে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল? স্বল্পায়াসেই ইহা উপলব্ধি হয় যে, জগৎ একটী কার্য্য। যাহা যাহা আবি-

ভাব তিরোভাবাত্মক, যাহা যাহা সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক, তাহাই কার্য্য। জগতও সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক, জগৎ ও উৎপত্তিবিনাশশীল, সুতরাং জগৎও কার্য্য। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, কারণ বিনা আমরা কখনই কার্য্যের উৎপত্তি দেখি নাই। সুতরাং একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জগতেরও কারণ আছে। জগৎ যখন উৎপত্তিবিনাশশীল, তখন এই উৎপত্তিবিনাশশীল অনিত্য জগতের কারণও অনিত্য হইতে পারে না। অসৎ কারণ হইতে কখনও কার্য্যোৎপত্তি হয় না, কে কবে শশশৃঙ্গের আঘাতে ব্যথিত হইয়াছে? কোন্ মধুমক্ষিকা আকাশকুসুম হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? তাই বলি, অসৎ বস্তু হইতে কোন সৎ বস্তুর উৎপত্তি হয় না, তাই বলিতেছি, নিয়তপরিবর্ত্তনশীল এই অনিত্য জগতের পশ্চাতে কোন এক নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় কারণ বিদ্যমান আছে। এখন কারণ বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহাই দেখিব। নৈয়ায়িকেরা কারণকে 'অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্থনিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা' বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যাহার যাহার উৎপত্তি অসম্ভব, যে যাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, সেই তাহার কারণ। বীজ ব্যতীত কখনও অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তন্তু ব্যতিরেকে পটোৎপত্তি অসম্ভব; এইজন্য বীজ অঙ্কুরের এবং তন্তু পটের কারণ। আবার যখনই আমরা কোনও একটি কার্য্যের স্বরূপ চিন্তা করি, তখনই কর্তৃকরণের প্রতিকৃতি আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যেরই নিমিত্ত ও উপাদান ভেদে দুইটী করিয়া কারণ আছে। যেমন মৃত্তিকা ব্যতীত ঘটোৎপত্তি অসম্ভব, সেইরূপ মৃত্তিকা বিদ্যমান থাকিলেও কুলালাদি বিনা ঘটোৎপত্তি কখনও সম্ভব হয় না, অতএব প্রত্যেক কার্য্যেরই নিমিত্ত উপাদান ও কারণ আছে। আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে ইহাই বুঝিতে পারিয়াছি যে, কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, জগতও একটী কার্য্য; সুতরাং জগতেরও কারণ আছে। আরও দেখিয়াছি যে, অভাব পদার্থ হইতে কখনও কোন পদার্থের উৎপত্তি হয় না, অনিত্য বস্তু কখনও অনিত্য বস্তু অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং এই নিয়তপরিবর্ত্তনশীল অনিত্য জগৎ কোনও এক অপরিবর্ত্তনীয় কারণ অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন আমরা দেখিব, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণে বিদ্যমান থাকে কিনা, অঙ্কুরোদ্গমের পূর্ব্বে অঙ্কুর রূপ কার্য্য বীজে বিদ্যমান থাকে কি না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে বস্তুর অভাব,

তাহারই উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, অঙ্কুরোদ্গমের পূর্ব্বে—অঙ্কুরকার্য্য বীজে কখনও বিদ্যমান থাকিতে পারে না। যদি ঘটোৎপত্তির পর্ব্বে ঘট মৃত্তিকায় বিদ্যমান থাকে,তাহা হইলে ঘট নির্ম্মাণে মনুষ্যের চেষ্টা হয় কেন? মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, 'প্রাগুৎপত্তেরুৎপত্তিধর্ম্মকমসৎ' অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ অসৎ থাকে, ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকায় ঘট কখনও ঘটাকারে থাকে না, মৃত্তিকার ঘটোৎপাদিকা শক্তি আছে জানিযা কুম্ভকাব ঘটনির্ম্মাণের নিমিত্ত মৃত্তিকা আহরণ করিয়া থাকে। কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যদি সৎ হয়, তাহা হইলে কার্য্যের উৎপত্তি বিনাশ দেখিতে পাই কেন? কার্য্যের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে ভাবরূপ কার্য্যে কখনও উৎপত্তিযোগ সম্ভব হয় না, কিন্তু ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? প্রত্যেক বিভিন্ন কার্য্যেরই উপাদান কারণ স্বতন্ত্র! সুতরাং কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যদি কাবণে না থাকে, তাহা হইলে সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদনার্থ ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সংগ্রহেরই বা প্রয়োজন কি? কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যদি অসৎ থাকে, তাহা হইলে কেহই তাহার সত্ত্ব সম্পাদনে সমর্থ হয় না। শিল্পী সহস্র দ্বারাও নীলকে পীত করিতে পারা যায় না। আরও দেখা যায়, কার্য্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ আছে। কার্য্য যদি অসৎ হয়,. তাহা হইলে অসৎ কার্য্যের সহিত সৎকারণের সম্বন্ধ কি রূপে হইতে পারে? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তন্তুধর্ম্মত্ব হেতু পট বস্তুতঃ তন্তু হইতে ভিন্ন নহে অতএব কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। যদি কারণ সৎ হয়, তাহা হইলে কার্য্য কারণের অভেদ হেতু কার্য্যও সৎ হইবে, অতএব সৎ বস্তু হইতেই সৎবস্তুব উৎপত্তি হয়, সৎবস্তু হইতে কখনও অসৎবস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু যাহা সৎ, তাহার আবার উৎপত্তি কি? যাহা নিত্য, তাহার আবার উৎপত্তি বিনাশ কি রূপে হইতে পারে? অতএব এখন আমরা সংক্ষেপে উৎপত্তি বিনাশের স্বরূপ চিন্তা করিব। অভিব্যক্তিই উৎপত্তি। অভিব্যক্তি কি? শক্তিরূপে কারণে লীন কার্য্যের নিমিত্ত কারণ সংযোগে স্থূল রূপে প্রকটনই অভিব্যক্তি। যাহা যাহাতে শক্তিরূপে লীন থাকে, তাহা হইতেই তাহার উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয়। বীজে অঙ্কুরশক্তি বিদ্যমান থাকে, এই জন্য বীজ হইতে অঙ্কুরেব এবং মৃত্তিকার ঘটশক্তি আছে বলিযা মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়। মহর্ষি কপিল 'শক্তস্য শক্যকারণাৎ।'

এই সূত্র দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন। এখন বিনাশ কাহাকে বলে, তাহাই দেখিব। কারণে লয়ের নামই বিনাশ,কার্য্যের অত্যন্তাভাবকে বিনাশ বলে না, কার্য্যের শক্তিরূপে কারণে স্থিতির নামই কার্য্যের বিনাশ। কিন্তু কার্য্য যদি বিনষ্ট হইয়াও সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? যাঁহারা মূঢ়, তাহারাই ইহা দেখিতে পায় না; যাহারা বিবেচক, তাঁহারা দেখেন, তন্তু বিনষ্ট হইলে মৃদ্রূপে তাহার পরিণাম হয়, পরে তাহাই আবার কার্পাস বৃক্ষরূপে, এবং ক্রমে ফল পুষ্প তন্তুরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপে কার্য্য মাত্রেই সৎ, কার্য্য মাত্রেই প্রবাহরূপে নিত্য। সদ্বস্তু হইতেই যে সতের উৎপত্তি, একই বস্তু যে অবস্থা-ভেদে কখনও সৎ কখনও অসৎ হইয়া থাকে, ইহা ভগবান্ কণাদের অভিমত। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে অসৎকার্য্যবাদীদিগের সহিত সৎকার্য্য-বাদীদিগের বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। অসৎকার্য্যবাদীরা যাহাকে কার্য্যের প্রাগভাব এবং প্রধ্বংসাভাব বলিয়া থাকেন, সৎকার্য্য বাদীরা তাহাকে কার্য্যের অনাগত এবং অতীত অবস্থা বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এইরূপে শক্তিরূপে লীন কার্য্যের স্থূলরূপে প্রকাশ হইতে থাকিলেই, সৃষ্টিকার্য্য হইতে থাকে। প্রথমে সৃষ্টি, তাহার পর স্থিতি, তাহার পর লয়। এই-রূপে সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক জগৎকার্য্য তালে তালে হইয়া থাকে; পবন-হিল্লোলে নৃত্যপর কুসুমের ন্যায় সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক জগৎকার্য্য তালে তালে হইয়া থাকে। আমরা যতদূর পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে ইহাই জানিতে পারিয়াছি যে, কার্য্য কারণের অভেদ হেতু কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান থাকে,কারণে লীন কার্য্যের প্রকাশই কার্য্যের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি এবং কারণে লয় অথবা শক্তিরূপে স্থিতিই কার্য্যের বিনাশ বা তিরোভাব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কার্য্যের অত্যন্তাভাব কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং এই জগৎকার্য্য অনাদি। এই জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া যাহাতে লীন হয়,তাহাই ইহার উপাদান কারণ। এই উপাদান কারণকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মায়া, কেহ পরমাণু বলিয়া থাকেন। অতএব সাংখ্যাচার্য্যদিগের প্রকৃতি, বৈদান্তিকদিগের মায়া, নৈয়া-য়িকদিগের পরমাণু বস্তুতঃ একই। ইহাদের সকলেই শক্তির সূক্ষ্মাবস্থা। এই শক্তির স্থূলাবস্থায় প্রকাশই জগৎ। সুতরাং জগৎ শক্তির বিরাট মূর্ত্তি, জগৎ শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র। যে দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করি না কেন, সেই

দিকেই শক্তির বিষম প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই। কি আদিত্য, কি বায়ু, কি তেজ, কি বহ্নি, সকলই এই শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহা কর্তৃক পরিচালিত হইয়াই পদার্থসমূহ পরস্পরের প্রতি পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত করিয়া থাকে, ইহাকেই অবলম্বন করিয়া পদার্থসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই শক্তি দ্বারাই শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের অনুভূতি হইয়া থাকে, বাস্তবিকই সমস্ত জগৎ এই শক্তি দ্বারা আলোড়িত হইতেছে। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, এই শক্তি দুইভাবে বিরাজিতা। ইহার এক মূর্ত্তি প্রশান্তা, সনাতনী, না জানি কাহাকেও অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া স্থিরভাবে আপন মহিমায় আপনি প্রকাশিতা রহিয়াছে; অপর এক মূর্ত্তি-জনয়িত্রী, না জানি কতকাল এই কোটী জগতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, এই সত্বগুণশালিনী চিচ্ছক্তির উপর রজস্তমোময়ী বিক্ষেপ শক্তির ক্রীড়াই জগৎ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে
ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি
কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥

এই মহাবাক্য দ্বারা অর্জ্জুনকে শক্তির দ্বিবিধ মূর্ত্তির কথাই বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক Herbert Spencer ও Persistence of Force ও Energy' শক্তির এই দ্বিবিধ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

জ্ঞানলাভ।

(স্বামী পরমানন্দ।)

ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিশীথে অরণ্যস্থিত পথভ্রান্ত পথিকের উদ্যম অনিশ্চিত ফলপ্রদ। হয়ত নিজপথান্বেষণ করিতে গিয়া কোন কণ্টকময় স্থানে উপনীত হয়েন অথবা কর্দ্দমাকীর্ণ অন্ধকূপে নিমগ্ন হইয়া ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করেন, কিন্তু নিশাবসানে সূর্য্যদেব যখন তমোবিনাশী কিরণমালা বিস্তার করিয়া জগৎকে পুনঃ প্রকাশিত করেন, তখন আর পথিকের ক্লেশ পাইতে হয় না।

অনায়াসে যথার্থ পথাবলম্বনে নিজ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করেন, এবং অনভিজ্ঞ পথিকদিগকে তাহাদিগের গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিতেও সমর্থ হন।

এই সংসারারণ্যের মধ্যেও যাহাদের হৃদয় অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাদের বিশ্রাম ও শান্তিলাভের উদ্যমও ঐ প্রকার অনিশ্চিত ও নিস্ফল কিন্তু যাঁহাদের হৃদয় জ্ঞানসূর্য্যালোকে প্রতিভাত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি পদসঞ্চালন পাষাণসদৃশ সুদৃঢ় এবং উদ্যমও অভীষ্ট ফলপ্রদ এবং কেবল মাত্র তাঁহারাই অন্যান্য অজ্ঞানান্ধদিগকে উপযুক্ত পথ দেখাইয়া লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিয়া দিতে সমর্থ।

আমরা সচরাচর তুলনায় অজ্ঞানকে অন্ধকার এবং জ্ঞানকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়া থাকি। কথা দুইটীর বাস্তবিক তাৎপর্য্য কি একবার দেখা যাক। অন্ধকারের স্বরূপ কি? আবরক, অপ্রকাশক। আলোকের? প্রকাশক আবরণ-উন্মোচনকারী। আঁধার বিপদ ও ভ্রমজনক, আলোক বিপদ ও ভ্রমনাশক। দুইটী বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট জিনিস। অতএব একের অবস্থানে অপরের বিরাম এবং অপরের আগমনে অন্যের প্রস্থান। কারণ, দ্বন্দ্বভাবাপন্ন দুইটী বিষয়ের এককালীন অবস্থান সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেখানে আলোক, সেখানে যে অন্ধকার নাই এবং যেথায় অন্ধকার, তথায় যে আলোকের অভাব, এ বিষয়ের প্রমাণ অনাবশ্যক। অন্ধকার আবরণশীল এবং ভ্রমজনক কেন? আমরা রাত্রিকালে আমাদের নিত্যপরিচিত, আলোকহীন গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘরের জিনিসপত্রগুলি যথাস্থানে সংস্থাপিত থাকা সত্ত্বেও কিছুই নয়নগোচর করিতে পারি না; কারণ, দ্রব্যসমূহের উপর এমন কোন আচ্ছাদন পড়ে, যাহাতে উহাদিগকে আমাদের নিকট হইতে অপ্রকাশিত করিয়া রাখে। ভ্রমজনক, কেন না, আঁধারে সর্পকে রজ্জু বলিয়া ভ্রম হয়, বৃক্ষকে মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়, শাদাকে কাল দেখায়; কিন্তু তজ্জন্য উহাদের স্বরূপের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। বিপদজনক এই জন্য যে, সাপকে দড়ি বলিয়া গ্রহণ করিলে পরিণাম সর্পাঘাত এবং মৃত্যু। কিন্তু আলোক ঐ আবরণ ভেদ করিয়া উহাদের স্বস্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। কাজেই আলোক থাকিলে ভ্রম বা ভ্রমজন্য কোনরূপ বিপদ হইবার আশঙ্কা থাকে না।

জ্ঞানাজ্ঞানেরও ঠিক ঐরূপ সম্বন্ধ। অজ্ঞান ঐ অন্ধকারের ন্যায় আবরণ-

শীল। আধাঁর ঘরে কোন দ্রব্য অন্বেষণ করিতে হইলে যেরূপ মনে নানাপ্রকার সন্দেহ এবং দ্বিধা উপস্থিত হয়, কিন্তু আলোকের প্রকাশে সমস্ত সংশয়ের নাশ হইয়া যায় আর প্রয়োজনীয় বস্তুটী প্রত্যক্ষ করিয়া অনায়াসে গ্রহণ করা চলে; তদ্রূপ অজ্ঞানেও আমাদের ঐরূপ সন্দেহ ও ভ্রম উপস্থিত হয় এবং জ্ঞানের বিকাশে আমরা সংশয়-রহিত এবং ভ্রম-শূন্য হই। অজ্ঞানে অনিত্য পদার্থকে নিত্য বলিয়া মনে হয়, অযথার্থকে যথার্থের ন্যায় বোধ হয়; কিন্তু তজ্জন্য তাহাদেরও স্বভাবের কোনও প্রকার ব্যত্যয় ঘটে না। অনিত্য চিরকালই মরণ-শীল এবং ভ্রম চিরদিনই মিথ্যা। অজ্ঞান-অন্ধতা বশতঃ ভ্রমে পতিত হইলে এবং সেই ভ্রমের প্রেরণায় কার্য্য করিলে বিপদ্গ্রস্ত এবং অনুতাপের ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, কিন্তু জ্ঞান আমাদিগকে আবার সকল প্রকারে বিপদ্ এবং অশান্তি হইতে উদ্ধার করেন, এই জন্য জ্ঞান আমাদের এত প্রিয়। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি, "অমুকের এ বিষয়ে বেশ জ্ঞান জন্মেছে'। ইহাতে ইহাই বুঝায় যে, ইতিপূর্ব্বে তাহার ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে যত কিছু সন্দেহ এবং ভুল ধারণা ছিল, সে সমস্তই মিটিয়া গিয়াছে এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিয়াছে। পূর্ব্বে তাহার দ্বারা ঐ বিষয়ের অজ্ঞানতা হেতু ভুল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, সন্দেহও আসিত, কিন্তু এখন জ্ঞানালোক তাহার মনের ঐ আবরণ ভেদ করিয়াছে, তাই আজ সে বিষয়টী তাহার নিকট সুস্পষ্ট। আলোক আধাঁরের যেমন একসময় একস্থানে বিরাজ করা অসম্ভব, জ্ঞানাজ্ঞানেরও ঠিক সেইরূপ। এই সমস্ত কারণেই অজ্ঞানকে অন্ধকারতুল্য এবং জ্ঞানকে আলোকসম বলা হইয়াছে।

এই অজ্ঞানই মনুষ্যমনের একমাত্র আবরণ, ইহাতে তাহার নিজের প্রকৃত অবস্থা তাহার নিকট অপ্রকাশিত করিয়া রাখে, অন্ধের ন্যায় তাহাকে বিপথে পরিচালিত করিয়া শোকসন্তপ্ত করে এবং বারবার এই রোগশোকব্যসনাদিযুক্ত সংসারে আনয়ন করে। স্বরূপদর্শী আত্মতত্ত্বজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ এই অজ্ঞানের মূলীভূত কারণ এবং ইহার হাত হইতে উদ্ধার হইবার উপায়, অতি স্পষ্টরূপে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জীবের দেহাত্মবুদ্ধিজনিত অহংকারকেই অজ্ঞান আবরণ, পাশ, বা মায়া বলিয়াছেন। উহা সাধারণ মানবের দৃষ্টিগোচর হইতে, অবিনাশী, নিষ্কলঙ্ক, শুদ্ধস্বভাব আত্মাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে! দেহাত্ম-বুদ্ধিজনিত অহঙ্কার কাহাকে বলে? আমি সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত, আমি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকুমার বা আমি নীচকুলোদ্ভব অস্পৃশ্য চণ্ডাল;

আমি রূপবান, বা কুৎসিত, ধনী বা দরিদ্র, সুস্থ বা রুগ্ন, শক্তিমান বা দুর্ব্বল, ইনি আমার মাতা, ইনি আমার পরম পিতা, ইঁহারা আমার পরম ভাই ভগিনী, ইনি আমার বন্ধু, উনি আমার শত্রু, ইঁহারা আমার আত্মজন, উঁহারা পর, এইরূপে বাল্যযৌবন-প্রৌঢ়াবস্থাধীন রোগশোক-জরাদিযুক্ত, সীমাবদ্ধ এই নশ্বর দেহকে অচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্য অবিনাশী অসীম আত্মার সহিত একীভূত করিয়া, "আমি" 'আমি' করা এবং আপনার সহিত এই বাহ্যজগতের রূপরসাদি বিষয়ের নিত্য সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া আমার আমার করার নামই দেহাত্মবুদ্ধিজনিত অহঙ্কার, অজ্ঞান আবরণ বা মায়া।

এই অহঙ্কার যে কেবল মাত্র ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ধনী ব্যক্তির ভিতরেই আছে বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুস্থকায় যুবকের ভিতরেই দেখা যায়, এমন নহে। কপর্দ্দক-শূন্য পরমুখাপেক্ষী জীর্ণকন্থামাত্রসম্বল এবং অঙ্গহীন কুৎসিৎ লোকের ভিতরেও সমানভাবে বর্ত্তমান, দেখিতে পাওয়া যায়। ধনী ব্যক্তি ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি বড়, "কোন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া" আমার সমান কে আছে? ইত্যাদি ভাবিয়া উল্লসিত হয় এবং আপনাপেক্ষা অপর কাহারও ধনসম্পৎ অধিক দেখিলে মৃত্যুতুল্য অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। দরিদ্র ভিখারিও তদ্রূপ স্বশ্রেণীয় লোকের ভিতর আপনাকে বড় মনে করিয়া অহঙ্কার করে, আবার কখন কখন আপনাকে, দরিদ্র অসমর্থ ইত্যাদি মনে করিয়া শোক-সন্তপ্ত হয়। সুশ্রী, সুস্থ যুবা পুরুষ ক্ষণস্থায়ী রূপগর্ব্বে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া অন্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখে এবং সেই শরীরের কিছুমাত্র বিকৃতি হইলেই আপনাকে মহাদুঃখী বিবেচনা করেন। আবার অঙ্গবিহীন কুৎসিত লোক ঐরূপে কখন আপনাকে শ্রেষ্ঠ এবং কখন বা শক্তি-হীন, ঘৃণ্য জীব মনে করিয়া দুঃখের অগাধ সাগরে নিমগ্ন হয়। বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, মূলে ইহাদের সকলেরই মনে সেই দেহাত্মবুদ্ধিপ্রসূত অহঙ্কার বর্ত্তমান। আত্মা অসীম অনন্ত;—"অণোরণী-য়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং", এইআত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, আবার মহান্ হইতেও মহত্তর এবং আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণীর হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

তিনি জন্মরহিত অপরিবর্ত্তনশীল চিরকাল এক অবস্থায় আছেন, শরীরের নাশ হইলেও তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন না। অতএব সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত,

উৎপত্তিবিনাশশীল দেহকে সেই জন্মমরণবিহীন আত্মার সহিত এক মনে করিয়া দেহাভিমানী হওয়া অপেক্ষা আর মারাত্মক ভ্রম কি হইতে পারে?

এই অজ্ঞান বা অহংকার রূপ আত্মাবরণ মোচনের প্রধানতঃ দুইটি উপায় দেখা যায়। তন্মধ্যে একটী এই—ক্ষুদ্র আমি ও আমার ভাব যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়া নিজের প্রকৃত স্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব, অবিনাশিত্ব, অসীমত্ব সর্ব্বদা মনে মনে স্মরণ রাখা এবং সর্ব্বভূতে সেই আত্মারই বিকাশ দেখিতে সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করিতে থাকা। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥" ঈশোপনিষৎ। "আত্মাই সর্ব্ববস্তু সর্ব্বপ্রাণী হইয়াছেন জানিয়া, যিনি সকলের ভিতরেই একের প্রকাশ দেখেন, তাঁহার আবার শোক মোহ কোথায়?" যখন সাধকের উপরোক্ত ভাবটি ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়, তখন আর তাঁহার শোক কিম্বা মোহ উপস্থিত হয় না। কারণ, শোক ও মোহের হেতু যে ভেদ-দৃষ্টি, তাহা আর তাঁহার থাকে না। তিনি আপনাকেই তখন সর্ব্বভূতে দর্শন করেন।

অপর উপায়টি হইতেছে—জগতের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া সর্ব্বশক্তিমান, জগতের নিয়ন্তা ভগবৎপদে আত্মসমর্পণ করা; "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥" "ঠাকুর! তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার বন্ধু বান্ধব, আমার বিদ্যা বুদ্ধি বিষয় বৈভব সকলই তুমি। হে সর্ব্বময় বিভো, একমাত্র তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।" তোমা বই আর আমার কেহ নাই। হে প্রভো, আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই, তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। "নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।" অথবা "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" ভাবিও না; অহঙ্কারপ্রসূত যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে আমার শরণাপন্ন হও—আমিই তোমায় সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, দেহধারী মাত্রেরই আপনাকে কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধারণা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারস্থ লোকগুলিকে আপনার আত্মীয় জ্ঞানে বিশেষ স্নেহ যত্ন করিয়া থাকেন। অপরকে সেরূপ ভালবাসিতে কুত্রাপি দেখা যায় না। সর্ব্বোপরি ভালবাসা আবার আপনার উপরে থাকে। নিজের দেহ আহত হইলে

আপনাকে আহত, ব্যাধিগ্রস্ত হইলে পীড়িত এবং শরীরের নাশে আপনাকে বিনাশপ্রাপ্ত বিবেচনা করেন। অপরের আঘাত, ব্যাধি বা বিনাশ কিন্তু কখনও সে ভাবে অনুভব করেন না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব প্রশ্ন হইতে পারে, তিনি যে সেই জরামরণরহিত সর্ব্বভূতাত্মা, তাহা কি প্রকারে জানা যাইবে? বহির্ম্মুখী সাধারণ মানবের পক্ষে—"অয়ং লোকঃ নাস্তি পরঃ" বিশ্বাসই যাহাদের আহার বিহারাদি সকল চেষ্টার মূলে বর্ত্তমান, দেহের সুখই যাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, যাহাদের দৃষ্টি বাহ্য বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সত্তা দেখিতে অক্ষম,—তাহাদের পক্ষে যে ঐ জ্ঞানলাভ করা অতি সুকঠিন, ইহা নিঃসন্দেহ। "নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষো ন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাঃ। ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ॥" "আমি মানব নহি, দেবতা বা যক্ষও নহি, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, আমি ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসব্রতাবলম্বীও নহি,আমি একমাত্র জ্ঞান স্বরূপ।" মহাপুরুষের এই আত্মতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত যে সাধারণ বিষয়বুদ্ধির অগোচর ও দুর্বোধ্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু বিশুদ্ধচিত্ত,জিতেন্দ্রিয়, অমায়িক, সদসৎ-বিচার-বিশিষ্ট পুরুষের নিকট উহা সহজ-লভ্য। যাঁহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্দৃষ্টি অজ্ঞানের আবরণ ভেদ করিয়াছে, যাঁহার বিবেকবুদ্ধি বিচারের দ্বারা সত্য-পথকে আশ্রয় করিয়াছে, তাঁহার নিকট ইহা অতি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, এবং তিনিই প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরে সর্ব্বভূতে আত্মবিকাশ দেখিতে পাইয়া মোহিত হইয়া বলেন,—"যোসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।" এইরূপ আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি বলিতে পারেন, আমায় অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল ক্লেদযুক্ত এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। তিনিই বিদেহ জনক রাজের ন্যায় স্বরাজ্য দগ্ধ হইতে দেখিয়াও বলিতে পারেন,—"মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন।" মিথিলা নগর সমস্ত পুড়ে ভস্মসাৎ হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।

নিত্যানিত্য বস্তু বিচারের দ্বারাই ক্রমে এপথে অগ্রসর হইতে পারা যায়। আমি দেহ নহি; কারণ, দেহ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, জন্ম মৃত্যুর অধীন। আমি মন নই; কেন না মন অস্থিরস্বভাব। বিষয় সকলও অনিত্য, পরিবর্ত্তন শীল; ইহাতে আমার মুগ্ধ থাকা উচিত নয়। এইরূপ নিত্যানিত্য বিচারের দ্বারা, নেতি নেতি করিয়া আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিষয় সকলকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, তিনিই একমাত্র সেই "শিবম্ শান্তম্ অদ্বৈতম্"

আত্মাকে জানিতে পারেন। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" তিনিই আপনাকে সকলের আত্মা জানিয়া হিংসাদ্বেষপরিশূন্য শান্তস্বভাব ব্রহ্মরূপত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব যাহারা দেহাভিমানী হইয়া সদা ভোগবিলাসে মত্ত এবং আপাতঃ প্রীতিকর রূপরসাদিময় জগৎকে সত্য মনে করিয়া ইহারই উপাসনা করে, তাহারা সর্ব্বতোভাবে এই অমৃত তত্ত্ব জানিবার অযোগ্য।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রচিত শ্রীমদ্ভাগবতে "আমি, আমার" ভাবটীকে পরম শত্রু জানিয়া মানুষের ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, একথা ভূয়োভূয়ঃ বলা হইয়াছে। অভিমন্যুতনয় মহাতেজা পরীক্ষিৎ একদা নিজ অজ্ঞানান্ধতা বশতঃ মহামুনি শমীককে অবজ্ঞা করায়, শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষিতের পূর্ব্ব-সুকৃত-বলে তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ শুকদেব মধুর স্বরে তমোবিনাশী ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার ঘুচাইয়াছিলেন। সেই ভগবৎমহিমা শ্রবণে পরীক্ষিৎ নিজ জীবনের নশ্বরত্ব এবং পৃথিবীর যাবতীয় সুখ স্বচ্ছন্দের ক্ষণভঙ্গুরত্ব জানিয়া আত্মবিষয়ক দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ প্রশান্ত মনে পরলোক গমনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র সমরের অনতিপূর্ব্বে শোকমোহাভিভূত অর্জ্জুন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে এই জ্ঞান লাভ করিয়াই পুনরায় চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং আপনাকে ও অপর সকলকে অবিনাশী আত্মা বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াই সত্যের প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামে অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশে সমর্থ হইয়াছিলেন! গীতায় কথিত আছে, শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শনে বীরাগ্রণী অর্জ্জুনের "আমি কর্ত্তা" এই ভাবটী সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল এবং আপনাকে বিশ্বপতির হস্তে যন্ত্র স্বরূপ নিমিত্ত মাত্র ঠিক ঠিক বোধ হওয়াতে শরীরেন্দ্রিয়কৃত কোন কর্ম্মই আর তাঁহাকে সুখী বা দুঃখী করিতে পারে নাই এবং মৃত্যুর করালছবিও আর তাঁহাকে ভীত বা ব্যথিত করিতে পারে নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সকল সময়ে সর্ব্বস্থানে অদ্ভুত চিত্তস্থৈর্য্য ও সাম্যভাবের সহিত অপূর্ব্ব কর্ম্মোদ্যম এবং বীরাগ্রণী অর্জ্জুনের জীবনে ঐরূপ "নাহং কর্ত্তা" ভাবের সম্যক্ উপলব্ধির পরেও কুরুক্ষেত্র সমরাদি চেষ্টা ইহাই বিশেষ ভাবে প্রমাণিত করে যে, ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর এবং আত্মত্যাগ করিয়াই মানুষ জড়ভাব প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু হায়! যথার্থ নির্ভরের ভাব আজ কাল কয়টা লোক বুঝে? আমরা মনে করি, ভগবানে নির্ভর করিলে মানুষ আর কোন কর্ম্মই করিবে না বা করিতে পারিবে না! আমরা আগেই দেখিতে যাই যে, যে লোক বলি-

তেছে, আমি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি, সে পূজাপাঠ ছাড়া কোন কর্ম্ম করে কিনা এবং যদি করে দেখিতে পাই, তবে তাহাকে অমনি ভণ্ড বলিয়া ধারণা করিয়া থাকি! কবে যে আমাদের ভিতর ঐরূপ ভুল ধারণা দূর হইয়া পুনরায় অর্জ্জুনের ন্যায়, মহামতি ভীষ্মের ন্যায় যথার্থ ভগবন্নির্ভর আসিবে, তাহা কে বলিবে। কিন্তু যতদিন না ঐরূপ ঠিক ঠিক নির্ভর এবং যথার্থ 'নাহং কর্ত্তা' জ্ঞানের পুনরুদয় হইবে, ততদিন দেশের দুর্ভাগ্যচক্র কখনই ফিরিবে না! ঐ জ্ঞান লাভেই মানুষ যথার্থ সুখী হইতে পারে। ঐরূপ নির্ভরই মানুষকে উন্নত করিয়া মায়ার সুদৃঢ় পাশ ছিন্ন করিবার ক্ষমতা আনিয়া দেয়। ঐ "নাহং কর্ত্তা" জ্ঞান এবং ঈশ্বর নির্ভর দুই একই পদার্থ। উহারই অনুষ্ঠানে মনুষ্যসমাজ যথার্থ সভ্যতা এবং সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতার উচ্চশিখরে আরোহণে সমর্থ হইবে।

জ্ঞানলাভের কথিত উপায় দুইটী বহির্দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু মূলে উহাদের মধ্যে কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। কারণ, উভয় পথেরই উদ্দেশ্য দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া সেই অব্যয়, অজর, অমর আনন্দ স্বরূপ অনাদি পুরুষকে লাভ করা। দুই পথাবলম্বীই এক স্থান এবং এক অবস্থা প্রাপ্ত হন। কারণ, উভয় পথাবলম্বীই পরিশেষে জগতের যাবতীয় পদার্থের মধ্যেই একের বিকাশ দেখিতে পান! জগতের সহিত ঐরূপে আপনার একত্ব উপলব্ধি করিলেই মানব আপনার সহিত ভেদজ্ঞানে উদ্ভূত ইচ্ছাদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতাবলম্বন করে। ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার নামই জ্ঞানলাভ বা ভগবদ্দর্শন। যাহা জানিলে আর কিছুই জানিতে বাকি থাকে না, যাহা জানিলে আর প্রকৃতির নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অন্ধের ন্যায় পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না, যাহা কিরণমালীর ন্যায় হৃদয়ের সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করে, তাহাই পবিত্র জ্ঞান এবং তাহাই শুদ্ধাভক্তি! এই জ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য। আমরা জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য নানাবিধ পুস্তকাদি পাঠ করিয়া থাকি। আমরা গ্রন্থাদিপাঠ করিয়া কোন কোন বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারি বটে, কিন্তু সীমাবদ্ধ জ্ঞানে মনের সন্দেহ কখনই সর্ব্বতোভাবে দূর হয় না। পূর্ব্বোক্ত একত্বজ্ঞানে উহার সম্ভাবনা আছে। ঐ জ্ঞান কেবল মাত্র অধ্যয়নের বিষয় নহে, উপলব্ধির বিষয়। কোনও অপরিচিত দেশে যাইতে হইলে যেমন সে দেশে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে শুনিয়া বা তাঁহাদের লিখিত পুস্তক

পাঠ করিয়া সে দেশ সম্বন্ধে পূর্ব্বে জানিতে হয়, তেমনি ঐ একজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যাঁহারা সে রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আগে ঐ পথের অনুসন্ধান লইতে হইবে। অজ্ঞানী পুরুষকে নিজ উন্নতি সাধন করিতে হইলে জ্ঞানীর পদতলে শ্রদ্ধার সহিত বসিয়া পূর্ব্বে শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

আত্মার অমরত্ব ভুলিয়া যাইয়া যাহারা এই দেহকেই সর্ব্বস্ব মনে করে এবং আপনাকে কর্ত্তা ভাবিয়া কামকাঞ্চনময় সংসারে মুগ্ধ হয়, আত্মদর্শী জ্ঞানিগণ বলেন, তাহারা আপনাকে আপনি হত্যা করে; তাহারা যথার্থ কৃপাপাত্র। মানুষ যদি যথার্থ কর্ত্তাই হইবে, তবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেন তাহার বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য, রোগ শোক মৃত্যু ইত্যাদি আসিয়া উপস্থিত হয়? তবে কেন তাহাকে একদিন বাড়ীঘর, পরিবার সন্তান, দাস দাসী প্রভৃতি প্রিয়পদার্থ সমুদয় ছাড়িয়া ক্রীতদাসের ন্যায় মৃত্যুর অধীন হইয়া অন্যত্র গমন করিতে হয়? অজ্ঞানী মানবই কামকাঞ্চনে মোহিত হইয়া ভোগবাসনার তৃপ্তি সাধন করিতে যাইয়া বারবার জন্মজরারূপ দুঃখপরম্পরা অনুভব করে; বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিন্তু ঋষিদিগের কথিত "নিত্যোনিত্যানাং" সনাতনগীত-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রবুদ্ধ হন এবং "আমার" ভাব পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার ইচ্ছায় এবং শক্তিতে জগতে সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে তাঁহারই উপাসনা দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন।

নূতন জাপান।

(স্বামী সদানন্দ।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

মোজি (Moji) বন্দর ছেড়ে আমাদের জাহাজ "ভিতর সমুদ্রে" প্রবেশ করলে। ভিতর সমুদ্রের কথা আগে বলেছি। ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ জলের উপর শোভা পাচ্চে, অধিকাংশ পর্ব্বতময়। পাহড়ের গায়ে ধানের চাষ, নীচে সমুদ্রের ধারে জনপূর্ণ গ্রাম; আর সমুদ্রের বুকে হাজার হাজার জঙ্ক ও জেলে ডিঙ্গি মাচ ধরে বেড়াচ্চে। এই সকল গ্রামের লোকের প্রধান উপজীবিকা মৎস্য বিক্রয়। জাপানীরা বাঙ্গালীর মত মৎস্যাহারী; এই ভিতর

সমুদ্র মাছ ধরিবার প্রধান আড্ডা। সুতরাং ইহার তীরভূমি মৎস্যজীবীদের বাসস্থান হয়েছে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক এই ব্যবসায় জীবন ধারণ করে, আর চার লক্ষ নৌকা ইহাতে নিযুক্ত আছে। খাওয়া ছাড়া জাপানীরা জমির সারে মাছ খুব ব্যবহার করে। চীনদেশেও মাছের অনেক রপ্তানি হয়। ভিতর সমুদ্র, নদনদী খালবিল ছাড়া জাপান সাগর, ওখটস্ক সাগর, এমন কি, প্রশান্ত মহাসাগরে বহুদুর ব্যাপিয়া জেলেরা মাছ ধরে বেড়ায়। জেলে নৌকাগুল প্রায় বিশহাত করে লম্বা, কিন্তু এতে পালের বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না, দাঁড়ের সাহায্যেই নৌকা চালিয়ে থাকে। বৎসরে গড়ে প্রায় সাতকোটী টাকার মাছ বিক্রয় হয়। মাচের মধ্যে হেরিং, সার্ডিন, বনিটো, কড, স্যামন প্রভৃতি সমুদ্রের লোনা মাছ এবং অয়েষ্টার ও চিংড়ি অধিক ধরা হয়। জাপানে সমুদ্র ও নদীব মাছের রীতিমত চাষ হয়। ডিম ছাড়িয়া সেই ডিম ধরে পোনা তৈযারী করে। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে জেলেদের শিক্ষা দেবার জন্য সম্রাট স্থানে স্থানে ট্রেনিংস্কুল (Training school) স্থাপন কবেছেন। আর কিসে মাছের ব্যবসায় উন্নতি হয়, তার জন্য কুড়িটা লেবরেটরিতে (Laboratory) নানা রকমের পবীক্ষা হচ্চে। প্রতিবৎসর রাজভাণ্ডাব হ'তে পাঁচলক্ষটাকা এইরূপ শিক্ষায় ও জেলেদের সাহায্যের জন্য খরচ হয়।

জাহাজ ক্রমে তার গন্তব্য স্থান কোবি (Kobe) বন্দরে পৌছিল, আমরাও পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে টোকিও (Tokio) যাবার বন্দোবস্ত করতে লাগ্‌লাম। সহরটা দেখ্‌বার ইচ্ছা হওয়াতে রেলওয়ে ষ্টেষনে (Railway Station) মালপত্র রেখে দেওয়া গেল। কুলিরা জিনিষ বুঝে লয়ে আমাদের একখান করে পিতলের চাক্তি দিলে। আমরা ঝিন্‌রিক্‌স চড়ে নগর দেখ্‌তে বাহির হইলাম। কোবি আধুনিক সহর, কিন্তু জাপানের ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা এখন জাপানেব প্রধান বন্দর। কিছু কেন্‌বার দরকার থাকাতে প্রথমে বাজারে (কন্‌কুবা) যাওয়া গেল। বাজারের চারিদিক ঘেরা। ফটক দিয়ে ঢুকে সরুপথের দুইধারেই দোকান। চাল ডাল মাছ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য ছাড়া কাঁচের বাসন, লোহা পিতল প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি, ল্যাকার করা কাটের ও চিনেমাটির বাসন, ভেস (Vase) কাগজকলম, সুতি সিল্ক কেলিকোর কাপড় চোপড়, হাতে তইরি নানাবিধ কাপড়ের ফুল খেলনা প্রভৃতি সকল রকম জিনিষই বিক্রয় হয়। দোকানদার মাত্রেই স্ত্রীলোক, পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরবেশভূষাসম্পন্না; কেহ সেলাই কর্‌ছে কেহ বা কিছু বুন্‌চে আর খরিদদার এলে জিনিষ দেখিয়ে দাম বল্‌চে। একদরে বিক্রয়, দরদস্তুরের আবশ্যক হয় না। বাজারে কলরব নাই, নিস্তব্ধ। বাজারের রাস্তাটী গোলক ধাঁধার মত ঘুরে ঘুরে আর একটী ফটকে শেষ হয়েছে, এটি বাহির হবার ফটক।

বাজার হতে বাহির হয়ে কোবির প্রসিদ্ধ দাইবুৎসু (বুদ্ধমূর্ত্তি) দর্শন করিতে যাইলাম। কোবির পাশে একটী পুরাতন সহর (হিওগো) আছে। মধ্যে সরুনদী। বর্ষাকাল ছাড়া এই নদীতে জল থাকেনা। নদীর তলদেশ পাথর ও বালিময়। বহুকাল পূর্ব্বে—প্রায় পাঁচশত বৎসর গত হল, এই নদীগর্ভে একবার রক্তস্রোত বহিয়াছিল। আসিকাগা বংশীয়গণ তখন জাপানের শাসনকর্ত্তা (সোগুন)। সম্রাট্ (মিকাদো) পক্ষীয়দের সহিত ইহাদের কোন কারণে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সোগুণের আক্রমণে সম্রাট্-পক্ষীয় সৈন্য প্রায় নির্ম্মূল হইয়া যায়। মাসাসিগি নামে এক সেনাপতি সম্রাটের সৈন্য চালনা করিতেছিলেন। বিজয়ের আশা নাই, শত্রুহস্তেও প্রাণ গেল না দেখে মাসাসিগি কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে অসম্মত হইলেন। শত্রুর হাতে বন্দী হবার পূর্ব্বে স্বহস্তে নিজ উদর ছেদ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ আত্মহত্যার নাম হারাকিরি। জাপানের সামুরাইগণ সম্মুখ সমরে শত্রুজয় করে বা যুদ্ধে আহত হয়ে জীবন বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে শত্রুহস্তে বন্দী না হয়ে, এরূপ মৃত্যুকে "অপাবৃতম্ স্বর্গাদ্বারম্" বিশ্বাস করে। বর্ত্তমান সম্রাট সিংহাসন লাভ করে, ১৮৬৮ সালে মাসাসিগির প্রভুভক্তির স্মরণচিহ্নস্বরূপ নদীতীরে এক মনোহর উদ্যানবাটিকা ও স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করেছেন।

এই সামুরাই দলই জাপানের মেরুদণ্ড। সামুরাইয়ের বাহুবলে জাপান স্বাধীন, সামুরাইয়ের বুদ্ধিবলে জাপান শিক্ষিত, জাপান উন্নত। ভারতের ন্যায় জাপানেও চারিবর্ণ, সামুরাই জাপানের ক্ষত্রিয়। নূতন যুগের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইহারা শাসনকর্ত্তা (সোগুন) ও জমিদারদিগের (দেমো) অধীনে সৈনিক কাযে নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধের সময় প্রভুর পক্ষে যুদ্ধ, অপর সময়ে প্রভুর আজ্ঞাপালন ও বিদ্যাচর্চ্চা করত। প্রভুভক্তি, স্বদেশবৎসলতা তার একমাত্র স্বধর্ম্ম। এ স্বধর্ম্মের কাছে আবশ্যক হলে

সকল বন্ধন, সকল আশা, সকল স্নেহ, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয় স্বজন বলিদান দিতে সামুরাই কুণ্ঠিত নয়। স্বধর্ম্ম তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম। সামুরাই দৈহিক নির্য্যাতন উৎপীড়ন মৃত্যুযন্ত্রণা কিছুর ভয় করে না, কেবল ইজ্জতের ভয় করে; মান রক্ষা, ইজ্জত বাঁচাতে প্রাণ তার কাছে তৃণবৎ তুচ্ছ। জীবন মৃত্যু তার সমান, যদি তার নামে কোন কলঙ্ক স্পর্শ না হয়। সংসারের দোকানদারি সে ঘৃণার চক্ষে দেখে। সে পাটোয়ারি-বুদ্ধিবিহীন। প্রভুর ভাণ্ডারের যৎকিঞ্চিৎ তার সংসার গুজরাণ করে মাত্র। কিন্তু বণিকের ঐশ্বর্য্য ও শূদ্রের অর্থোপায় দেখে কখন নীচকাযে তার প্রবৃত্তি নাই। অর্থের লোভ দেখিয়ে সামুরাইকে কেনা যায় না। সামুরাই মানের কাঙ্গাল। সে টাকা নিয়ে নিজের পরিশ্রম বা বিদ্যা বিক্রয় করে না, চাকরীর হিসাবে সে কখন কায করে না, তোমার কাছে সে তার কাযের পরিবর্ত্তে তোমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন কোন রূপ দান গ্রহণ করবে, কিন্তু মাইনে নেবে না। সামুরাই প্রাণপণে ক্ষত্রধর্ম্ম পালন করে। স্বধর্ম্ম তার অহঙ্কারের বস্তু, সে জাত্যভিমানগর্ব্বিত। তার এক কায তরবারবাজি, তার এক ধর্ম্ম প্রভুর সম্ভ্রম রক্ষা, মাতৃভূমির মানরক্ষা। যদি একাযে সামুরাই নিষ্ফল হয়, সে হারাকিরি করবে, কিন্তু স্বধর্ম্মচ্যুত হবে না। এই হারাকিরি অতিশয় কষ্টকর মৃত্যু; কিন্তু সামুরাই কিরূপ নির্ভয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা তুচ্ছ করে, কি অটল ভাবে হৃদয়ের শেষ শোণিতবিন্দু পাত করে, তা জগৎকে দেখিয়ে যায়। এই জন্য সকল সামুরাইয়ের কাছে দুখানা তরবার থাকে, বড় একখান যুদ্ধের জন্য, আর ছোট একখান নিজের রক্ষা আর আবশ্যক হলে হারাকিরি করতে। সামুরাইয়ের তীক্ষ্ণঅসি সর্ব্বক্ষণ শাণিত, ইহা তাহার গৃহে গৃহদেবতার ন্যায় পূজিত। তরবার তার নিত্য সহচর, কিন্তু বন্ধুর বাটী প্রবেশের পূর্ব্বে তার দ্বারদেশে রেখে ঘরে প্রবেশ করে। তরবারে পদস্পর্শ মহা অপরাধ। নূতন জাপানের সমস্ত উচ্চপদে আজ সামুরাই প্রতিষ্ঠিত। পুরাতন জাপানের মান ইহারাই রক্ষা করিয়াছে, নূতন জাপানের গৌরবগাথা ইহাদের দ্বারাই ঘোষিত হইতেছে।

পুরুষদের ন্যায় সামুরাই স্ত্রীলোকেরাও এই ক্ষত্রিয়তেজপূর্ণ। কখন তারা স্বামীপুত্রপরিবৃত হয়ে নীরবে স্ত্রীসুলভ সহিষ্ণুতায় নিতান্ত অধীন ভাবে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত, কখন সম্ভ্রান্ত বংশের অন্তঃপুরবর্ত্তিনী হয়ে প্রভু পরিবারের পরিচর্য্যা ও অবসর সময়ে শিল্পকার্য্যের অনুশীলনে ব্যস্ত আবার

কখন পিতা ভ্রাতা স্বামী পুত্রের স্বধর্ম্ম পালনে সহায় হইয়া সানন্দে জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। আগে জমিদারদের অন্তঃপুরে সামুরাই স্ত্রীলোকেরা নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকৃত। কিন্তু সকলকে লাঠি খেলা, শস্ত্রবিদ্যা শিখতে হত। আবশ্যক হলে স্বামী পুত্রের সঙ্গে প্রভুর অন্তঃপুর রক্ষা করতে তাদের শিরায়ও যে সামুরাই রক্ত বইচে, সেই কোমল কমনীয় কান্তির অন্তরালে যে বজ্রসদৃশ কঠোর বীরাঙ্গনাতেজ লুক্কায়িত, দেখাতে তারা পশ্চাৎপদ হত না।

১৮৬৮ সালে জাপানের শাসনদণ্ড নিজের হাতে গ্রহণ করাতে বর্ত্তমান সম্রাটের সঙ্গে শাসনকর্ত্তা সোগুণের জীবন মরণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সোগুণের পক্ষীবগণ যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে শেষে ওকামাৎসু দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। সম্রাটের সৈন্যগণ দুর্গ অবরোধ করলে, পরিখার পর পরিখা আক্রমণ ও অধিকার করতে লাগল। সোগুণের সৈন্য কতকাংশ দুর্গমধ্যে কতকাংশ স্থানাভাবে দুর্গের বাহিরে। যারা দুর্গের বাহিরে, তাদের শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। এই সঙ্কট সময়ে অজেয় সামুরাই তেজঃ প্রজ্বলিত হয়ে উঠিল। শতশত বালক বালিকা স্ত্রীপুরুষ স্বহস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হ'ল। এক একটা পরিবার চিরদিনের জন্য ইহলোক হ'তে অপসৃত হয়ে গেল। যারা নিতান্ত শিশু, কি করে হারাকিরি করতে হয় জানেনা, হাঁটু মুড়ে মাথা নিচু করে, স্থিরভাবে উপবিষ্ট হল; পিতা বা ভ্রাতা তাদের বধ কার্য্য সম্পন্ন করলে। দুর্গমধ্যে ছেলে বুড় স্ত্রী পুরুষ দুর্গরক্ষার জন্য নিঃশেষে জীবন সমর্পণ করতে দৃঢ় সংকল্পে দণ্ডায়মান। স্ত্রীলোকেরা বারুদ ও বন্দুকের টোটা তৈয়ারি করতে লাগলো, ছেলে মেয়েরা পুরুষদের এই সব জোগাতে লাগলো। অবশেষে দুর্গ অরক্ষণীয় হলে যারা অবশিষ্ট, সম্মুখযুদ্ধে পতিত হয়ে প্রভুভক্তি মহাব্রত উদ্যাপন করলে।

এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সামুরাইদের প্রকৃতিনিহিত। যখন সামুরাই দেখে প্রভুর আজ্ঞা পালন করতে অপর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে আঘাত লাগে, আর প্রভুভক্তি তাকে স্বদেশের বিরোধী বা কোন গর্হিত কাজে নিযুক্ত করে, সে এসময়ে উচ্চকর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রভুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে এবং আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে, তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হারাকিরি করবে, কিন্তু জীবিত থাকিয়া নিজের নামে বিশ্বাসঘাতকতারূপ কলঙ্ক স্পর্শ করতে দিবে না। সোগুণের পক্ষে যুদ্ধ করাতে, জাপানের চিরাগত রাজকুলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে, তাহাদের প্রভুভক্তি তাহাদিগকে স্বদেশের

শক্র করেছে বুঝতে পেরে পরাজিত সামুরাইগণ এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্তে কৃতসঙ্কল্প হল। সম্রাট্‌সৈন্য কর্তৃক ওকামাৎস্থ দুর্গ অধিকারের পর দুই-জন সোগুণ পক্ষীয় স্ত্রীলোক স্বজন সহিত নির্ব্বাসিত হয়েছিল। এই আত্ম-বিচ্ছেদের দশবৎসর পরে জাপানের দক্ষিণ প্রদেশে আবার রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহ দমন কর্তে যথেষ্ট অর্থ ও শোণিত ব্যয় হয়ে-ছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে ঐ স্ত্রীলোক দুইটী নিজেদের কৃত অপরাধ মোচন কর্তে রাজসমীপে আবেদন করে যে, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহত সৈন্যদিগকে সেবা কর্তে প্রস্তুত। রাজা সম্মত হলেন। জাপানের ইতি-হাসে এই দুই বীরাঙ্গনা যুদ্ধে আহত ও পীড়িত সৈন্যের শুশ্রূষা করে প্রথম রেডক্রস সোসাইটির (Red Cross Society) ভিত্তি স্থাপন করেন।

সামুরাই রমণীদের এই ক্ষত্রতেজ আজিও জাপানে জীবন্তশক্তি। গত চীন জাপান যুদ্ধে ইহাদের স্বদেশানুরাগ ও আত্মোৎসর্গ সমস্ত সভ্য জগতের আদর্শ। যখন চীন সমরানল প্রজ্জলিত, জাপান স্বদেশবৎসল সন্তানদের স্বধর্ম্ম পালনে আহ্বান কর্‌লে, সামুরাই ললনাকুলও সেই ভেরী নিনাদে আপনাদের কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হল। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত সংসারের এক মাত্র অন্নদাতা স্বামী বা পুত্রকে প্রসন্নবদনে মৃত্যুর মুখে সমর্পণ করেছে; স্ত্রী, মাতা, ভগিনী, প্রাণাধিকের মরণ সংবাদ অবিচলিত হয়ে শ্রবণ করেছে; অশ্রুজল প্রবাহিত হতে দেয় নাই, কারণ, ইহা রাজভক্তি, স্বদেশস্নেহের বিরোধী। পতি-পুত্র ও ভ্রাতা স্বদেশের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করেছে, ইহাতে তাহারা ধন্য, তাহাদের বংশ ধন্য, সামুরাই রমণীর ইহাই উচ্চাভিলাষ। এক বৃদ্ধার একটি মাত্র পুত্র সন্তান। সে অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল। দরিদ্রতা বশতঃ অতিশয় দুঃখে কষ্টে ছেলেটীকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছে; অল্পদিন হ'ল ছেলেটি উপার্জ্জনক্ষম হয়ে সংসারে সাহায্য কর্‌ছিল। বৃদ্ধা নূতন সংসার পেতে পুত্র পুত্রবধূ পরিবেষ্টিত হয়ে শেষদিন কটা সুখে কাটাবে মনে কর্‌ছে। হঠাৎ চীন যুদ্ধ উপস্থিত, পুত্রকে যুদ্ধে যেতে হবে কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধা মাতা শোকাতুরা হয় নাই। আনন্দে ও উৎসাহে পুত্রের যুদ্ধযাত্রার বন্দোবস্ত স্বহস্তে করে দিলে। গোপনেও একটি কাতর শ্বাস পরিত্যাগ করে নাই। স্বদেশের মান রক্ষা কর্‌তে পুত্র যুদ্ধে যাচ্চে, ইহা বৃদ্ধার পক্ষে মহা গৌরবের কথা। হাস্য বদনে আশীর্ব্বাদ করে পুত্রকে বিদায় দিলে। আর একটি বৃদ্ধা একমাত্র সন্তানকে যুদ্ধে প্রেরণ করে প্রতিদিন রাত্রিশেষ না

হতে উঠিত। অতিশয় শীতসত্ত্বেও স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করে বাটী হতে দুই ক্রোশ দূরে কোন মন্দিরে পদব্রজে গমন করে দিনমান যাবৎ পুত্রের কল্যাণার্থ ইষ্টদেবতার পূজায় নিযুক্ত থেকে সন্ধ্যার পর প্রত্যাগত হত। তাঁহার ইষ্ট মনোভিলাষ পূর্ণ করেছিলেন। বৃদ্ধার সন্তান বিজয়ী হয়ে মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করেছিল। এই চীন সংগ্রামে আকাগি নামে জঙ্গি জাহাজের সৈন্যাধ্যক্ষ সাকামতো জলযুদ্ধে হত হন। তাঁর পরিবারের মধ্যে বৃদ্ধামাতা, স্ত্রী ও তিনটি সন্তান। এই শোকসংবাদ দূত দ্বারা সাকামতোর স্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু অবিলম্বে এই নিদারুণ সংবাদ বৃদ্ধার কর্ণগোচর হল। বৃদ্ধা চলৎশক্তিহীন; কম্পিতপদে সংবাদদাতার সম্মুখীন হয়ে শুষ্কচক্ষে ও অকম্পিত স্বরে বল্‌লেন, আপনার সংবাদে বুঝেছি, এবার আমার প্রিয় পুত্রের দ্বারা দেশের কিঞ্চিৎ কাজ হয়েছে। বিশ বৎসর বয়স্কা কোন রমণী, অল্পদিন মাত্র বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়েছিল; সংবাদ এলো, স্বামী সমরক্ষেত্রে পতিত হয়েছে। ভর্ত্তার সমভিব্যাহারিণী হবার জন্য হাহাকরি করে ইহলোকের নিকট বিদায় গ্রহণ কর্‌লে। ঈদৃশ ঘটনা অনেক ঘটেছিল। যে দেশে স্ত্রী চরিত্রের এরূপ দৃষ্টান্ত, যে দেশে পারিবারিক শিক্ষা এরূপ, সে দেশ যে বীরপ্রসবিনী, সে বীর সন্তানেরা যে মৃত্যুঞ্জিৎ, স্বদেশের জন্য তাহারা যে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি!

য়াসাসিগির স্মৃতিমন্দিরের নিকটে বুদ্ধদেবের পিত্তলময়ী প্রতিমা (দাই-বুৎসু) প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ধাতুমূর্ত্তি ৩২ হাত উচ্চ, ইহার কোমরের বেড় ৫৬ হাত, বদনমণ্ডল ৬ হাত, কর্ণ ৩ হাত, নাসিকা প্রায় একহাত, মুখ একহাত, জানুর বেড় ১৬ হাত, বৃদ্ধাঙ্গুলির বেড় দেড় হাত। প্রতিমার উদরগহ্বরের ভিতর অমিতাভ বুদ্ধের ধ্যানমূর্ত্তি স্থাপিত। প্রতিমা দর্শন করে শরীর রোমাঞ্চিত হল। ধন্য সেই ভক্তবীর, যে এই বিরাট মূর্ত্তি কল্পনা করেছে; ধন্য সেই শিল্পকার, যে এই অদ্ভুত প্রতিমা নির্ম্মাণ করেছে। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অবতার প্রাচীন ভারতের যুগধর্ম্মশক্তি শাক্যবুদ্ধ, ত্রয়োদশ শতাব্দী যাবৎ জাপানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রাচীন ভারত জাপানের পারলৌকিক দীক্ষাগুরু! বর্ত্তমান ভারত কি নূতন জাপানের নিকট ইহলৌকিক শিক্ষালাভ কর্‌তে প্রস্তুত? কর্ম্মযোগ অভাবে ভারতের জ্ঞানযোগ লুপ্তপ্রায়। ইউরোপের কর্ম্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়ে নির্জীব জাপান আজ মহবলসম্পন্ন। ধর্ম্মনিষ্ঠ ভারতে কবে আবার কর্ম্মনিষ্ঠার উদয় হবে? উইক ভারতের

সর্ব্বত্র মহা উদ্বোধনধ্বনি, শুনুক তমোগুণসমাচ্ছন্ন বর্ত্তমান ভারত সেই ভগবৎ-মহাবাক্য, যাহা রণভূমি কুরুক্ষেত্রে মোহমুগ্ধ বীরশ্রেষ্ঠকে প্রবুদ্ধ করেছিল।

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে আহিরিটোলার বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করেন। তদুপলক্ষে অনেক ভক্তের সম্মিলন হয়। উপেন্দ্র বাবুর শ্রদ্ধায় ও যত্নে সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন। সারাদিন ভগবন্নাম গুণগান হয়। বিশেষতঃ, হরিনাথ মজুমদার বা ফিকির চাঁদ ফকিরের সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক সঙ্গীত গাহিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। একজন ভক্ত ফনোগ্রাফ দেখাইয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। ভক্তগণ সকলেই আনন্দের সহিত প্রসাদ ধারণ করিয়াছিলেন। বাগবাজার, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান ও আহিরীটোলায় অপর এক স্থানেও উৎসব হইয়া গিয়াছে।

উৎসবের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। উৎসব দ্বারা কতকগুলি বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। যে সকল ভক্তের নানাকারণে কখনও সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এই সকল উৎসব উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে এবং তাঁহারা ভগবানের ভজনানন্দসম্ভোগ ও প্রসাদ ভক্ষণাদিদ্বারা প্রাণ খুলিয়া নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। সাধারণেও ভক্তসমাগম দর্শন করিয়া ভক্তসঙ্গে সাত্ত্বিক আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। ইহার দোষ এই,—ইহার একটু একঘেয়েত্ব আছে। খেই খেই নৃত্য, উল্লম্ফন প্রভৃতিই যেন মহোৎসবের নিত্য আবশ্যকীয় অঙ্গের মধ্যে দাঁড়ায়। জ্ঞানালোচনা, ভগবৎপ্রসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থপাঠ প্রভৃতি যতই ইহার স্থান অধিকার করে, ততই মঙ্গল। যাহাতে এই সকল উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্ব্বজনীন ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রতিফলিত হয়, উৎসবের উদ্‌যোক্তাগণের দৃষ্টি সেই দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সুখের বিষয়, আজকাল ক্রমশঃ এই দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িতেছে।

আর এক কথা,—আমাদের দেশের লোকে এই সকল উৎসবাদিতে

অকাতরে যে পরিমাণে ব্যয় করিয়া থাকেন, দেশের কোন বাস্তবিক স্থায়ী শুভকর কার্য্যে কি এরূপ মুক্তহস্ত হইতে পারেন? ভাবোচ্ছ্বাস ক্ষণকালের জন্য। কিন্তু অদম্য দৃঢ় অধ্যবসায়ে কোন শুভকার্য্যের জন্য প্রাণপণ যত্ন আর এক জিনিষ। যাহাতে আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে বিশেষ ধাবিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

২৩শে অগষ্ট, ১৯০২ সালে কলিকাতা বিবেকানন্দসমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির উদ্যোগে স্বামী সারদানন্দ গীতাসম্বন্ধে এবং মেট্রোপলিটানের অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ পালিত এম, এ মহাশয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার কতক কতক উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমিতির যত্নে গত বৎসর 'বিবেকানন্দস্মৃতিমন্দির' নামক একটী আদর্শ ছাত্রাবাস স্থাপিত হইয়াছিল ও এক বৎসর বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। এই সমিতির যত্নে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নামক উদ্বোধনে প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধ এবং স্বামীজির রচিত কবিতা ও গীতসমূহ সংগৃহীত হইয়া প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও বীরবাণী নামক দুই খানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্লেগের সময় বস্তি পরিষ্কার করা সম্বন্ধেও সমিতি অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। বিগত ৪ঠা আষাঢ় শনিবার সমিতি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে উঠিয়া যাওয়ায় সমিতির একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজির ফটো পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। একটী ভক্ত আধ্যাত্মিক সঙ্গীত করেন ও শেষে প্রসাদ বিতরণ হয়। এই দিন স্বামীজির অনেক অনুরাগী ভক্ত নূতন সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ায় সমিতির সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, সমিতিকে আরো অধিক কার্য্যকরী করিতে হইলে ইহার নূতন গঠন আবশ্যক। তদনুসারে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমিতির সভাপতি বাবু অনাথনাথ পালিতকে এই নূতন নিয়মাবলি গঠনের ভার দেওয়া হয়। স্থির হয়, এই নিয়মাবলি প্রণীত হইলে একদিন সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সকল সভ্যগণের মতামত লইয়া সমিতির ভবিষ্যৎ গঠন নির্দ্দিষ্ট হইবে। আশা করি, সমিতি নূতন গঠনের দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা এবার অধিক কার্য্যকরী হইবে। সমিতির নিকট আমাদের একটী নিবেদন আছে। যাঁহার নামে সমিতির নামকরণ করা হইয়াছে, সেই মহাপুরুষের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনী

লিখিত হওয়া অতি আবশ্যক, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই জীবনী বিশ্বাসযোগ্য ও বহুতথ্যসমন্বিত হইতে গেলে অনেক উপাদান সংগ্রহের আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া উদ্বোধনে প্রকাশ করিতেছি। সমিতি এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

সমালোচনা।

ধম্মপদ অর্থাৎ ধম্মপদ নামক পালিগ্রন্থের মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ মান্দ্রাজনিবাসিগণের অভিনন্দন পত্রের যে উত্তর প্রদান করেন, তন্মধ্যে একস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,—

'The restless Western atheist or agnostic finds in the Gita or in the Dhammapadam the only place where his soul can anchor.' অর্থাৎ অশান্ত পাশ্চাত্য নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী কেবল গীতা বা ধম্মপদেই স্বীয় আশ্রয় পাইয়া থাকেন। গীতার মত যেরূপ বিশ্বজনীন ও উদার, ধম্মপদেরও তদ্রূপ। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের অনতিকাল পরেই প্রাচীন রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী গুহায় যে বৌদ্ধ মহাসমিতির অধিবেশন হয়, তাহাতে বুদ্ধদেবের উপদেশসমূহ প্রথম সংগৃহীত হয়। এই সংগৃহীত উপদেশসমূহের নাম ত্রিপিটক। ইহাই বৌদ্ধশাস্ত্র। ত্রিপিটক—সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ধম্মপদ গ্রন্থ সুত্ত পিটকের অন্তর্গত। ধম্মপদের অন্তর্গত সমুদয় কথাই বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ উপদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে বুদ্ধঘোষ পালিভাষায় ধম্মপদের টীকা রচনা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই গ্রন্থ পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তদবধি উহা বহুবিধ পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, যে ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, সেই ভারতের প্রচলিত কোন ভাষাতেই এ পর্য্যন্ত ধম্মপদের অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ ও কয়েকটী বন্ধুর উৎসাহে চারু বাবু প্রথম ১৩০৫ সালে ধম্মপদ মূল, টীকা ও অনুবাদ সহ উদ্বোধনে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু নানা কারণে উদ্বোধনে উহার

কয়েকটী সূত্র* ব্যতীত প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এত দিন ধরিয়া সাহিত্য সংহিতা পত্রে মধ্যে মধ্যে উহা প্রকাশিত হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে উহা সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালীর পক্ষে বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ হইয়াছে ও বাঙ্গালীর সাহিত্যভাণ্ডারে একটী অমূল্য রত্ন সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইযাছে।

বুদ্ধদেবের উপদেশ নীতিপ্রধান। নীতির মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে ধর্ম্ম সকলের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। অনিত্য পদার্থে আসক্তি ত্যাগ ও নিত্য বস্তুতে চিত্ত স্থাপন—ইহা সকল ধর্ম্মেরই মূল কথা। সুতরাং এ গ্রন্থ বৌদ্ধগণ যেরূপ ভক্তিভাবে পাঠ করিয়া থাকেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বিগণও তদনুরূপ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতে পারেন।

এই পুস্তক পালি ভাষায় রচিত। পালি ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা প্রায় সদৃশী। সংস্কৃত যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের পক্ষে পালিভাষা আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। যাঁহারা পালিভাষা শিক্ষা করিতে চান, তাঁহারা এই পুস্তক খানি হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন। পালিভাষার আবরণে যে সকল অমূল্য রত্ন লুক্কায়িত আছে, সেই সকল আমাদের দেশীয় সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত হইলে দেশের এক নূতন যুগ আরম্ভ হয়।

পুস্তকটী ছাব্বিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। শেষ অধ্যায়ের নাম ব্রাহ্মণ বগ্‌গো। বুদ্ধদেব বলিতেছেন, এই এই লক্ষণ সম্পন্ন হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

যস্‌স পুরে চ পচ্ছা চ মজ্‌ঝে চ নত্থি কিঞ্চনং।
অকিঞ্চনং অনাদানং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥

অন্বয়।—যস্‌স পুরে পচ্ছা চ মজ্‌ঝে চ কিঞ্চনং নত্থি, অকিঞ্চনং অনাদানং তং অহং ব্রাহ্মণং ব্রূমি।

সংস্কৃত।—যস্য (লোকস্য) পুরঃ (পূর্ব্বঞ্চ) পশ্চাচ্চ মধ্যে চ কিঞ্চন (কিঞ্চিৎ) নাস্তি (ন বিদ্যতে) অকিঞ্চনং (রাগাদিশূন্যং) অনাদানং (আসক্তিরহিতং) তং (লোকং) অহং ব্রাহ্মণং ব্রবীমি।

অনুবাদ।—যাঁহার পূর্ব্বে, পশ্চাতে বা মধ্যে কিছুই নাই, যাঁহার কোন বস্তুর আশা নাই এবং যিনি অনাসক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

পুস্তকখানির অনুবাদ অতি সরল, কাগজ ও ছাপাও অতি সুন্দর। আমরা বাঙ্গালী মাত্রকেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

গঙ্গাজল।

কি দিব, কি দিব, দেব? কি দিব তোমায়?
দেয় বস্তু কি আছে আমার?
জবাকুসুমের রাশি, চাহি ও চরণে দিতে
চিত্ত কিন্তু দেয় গো ধিক্কার!
তাঁহারি জিনিস্ লয়ে, তাঁরি পদসেবা।
হে পূজারি, ভুলিলে কি তিনি সেই জবা?
কর্ম্মযোগী হয়ে কর্ম্ম করিবারে চাই,
ফল করি ও পদে অর্পণ—
কে কর্ম্মী? কাহারে দান? ভেঙে যায় অভিমান,
ভাবি, এ যে বৃথা আয়োজন।
তুমি কর্ম্মী, তুমি ফল, তুমি ফলদাতা।
ক্ষম ভ্রম, ক্ষম ভ্রম, হে বিশ্ববিধাতা।
জ্ঞানযোগী হয়ে ভাবি—আমিই ঈশ্বর।
আমি আছি এ বিশ্ব ব্যাপিয়া।
অমনি সে অহঙ্কার, কর দেব চুরমার,
দুচরণ কণ্টকে বিঁধিয়া!
তখন কাঁদিয়া বলি—দোহাই! দোহাই!
কুকুর হইবে কিসে জগত-গোঁসাই?
ভক্তিযোগে ভক্ত সাজি, কণ্ঠী দিয়া গলে,
বীজমালা ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি-অগ্রে, বসি আমি মহাহর্ষে,
শ্রীপূজার নৈবেদ্য সাজায়ে।
তোমার মোহিনী মায়া, নারী-রূপ ধরি,
ভক্তি মুক্তি কাড়ি লয়!—শ্রীহরি! শ্রীহরি!
আমার আমিত্ব কোথা? তুমি দেব সব।
আমি শূন্য! আমি কিছু নই।
তুমি যবে দয়া কর, তবেই পূজিতে পারি।
নতুবা আমার সাধ্য কই?
মাতর্গঙ্গে! গঙ্গাজল দে গো, দে গো মোরে,
সেই গঙ্গাজলে ইচ্ছা পূজিবারে তোরে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

গীতাতত্ত্ব।

(৩১ শে জানুয়ারী, ১৯০৩এ কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতার সারাংশ।)

কর্ম্মযোগ বলে, মানুষকে কর্ম্ম কর্‌তেই হবে। কর্ম্ম ছেড়ে সে কখনই থাকৃতে পার্‌বে না। যতদিন শরীর থাকৃবে, মৃত্যু না হবে, ততদিন কোন না কোন, কিছু না কিছু কায কর্‌তেই হবে। মানুষের পক্ষে কায ছাড়া অসম্ভব।

আবার অন্যদিকে শাস্ত্র বল্‌চেন, "সমস্ত কায যতদিন না ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে, ততদিন মানুষের জ্ঞানলাভ ও মুক্তি অনেক দূরে।"

সাধারণ ভাবে দেখ্‌লে দুটি কথা বড়ই বিপরীত। সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন। তাই, গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ উপদেশ করে ঐ দুই বিরুদ্ধ বিষয়ের মীমাংসা করে দিচ্চেন; বল্‌ছেন—সম্পূর্ণ কর্ম্মরহিত অবস্থায় না পৌঁছিলে জ্ঞানও হবে না, শান্তিও পাবে না, সেটা ঠিক; কিন্তু সে অবস্থাটা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকৃলেই যে হ'ল, তা নয়। তাতে বরং তোমায় কপটাচারী করে তুলবে। সে অবস্থাটা লাভ হলে শরীরেন্দ্রিয়ের দ্বারা কায কর্‌লেও তোমার ভিতরে "আমি কর্ম্মরহিত—শরীরেন্দ্রিয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্"—এই ভাবটী সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকৃবে! এমন কৌশলে কায করা যায়, যাতে কায কর্‌তে কর্‌তে ধীরে ধীরে মানুষ ঐ অবস্থায় পৌঁছায়। অতএব কর্ম্মযোগের মূলমন্ত্রই হচ্চে—কর্ম্মের ভিতরে থেকেও আপনাকে কর্ম্মরহিত করে রাখ্‌তে শেখা।

শরীর মনের দ্বারা নিয়ত কায চল্‌বে অথচ নিজে কর্ম্মরহিত হয়ে থাকৃতে হবে—এইটাই হচ্চে ঠিক অকর্ম্ম বা কর্ম্মরহিতাবস্থা। হাত পা গুটিয়ে বসে আছি অথচ মনে মনে নানারকমে "অঙ্কাভাগ" কচ্চি—সেটা কর্ম্মরহিত হয়ে থাকা নয়। ঠিক্ ঠিক্ কর্ম্মরহিত হয়ে যিনি থাকৃতে পারেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "তিনিই মানুষের ভিতর বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী, তাঁর দ্বারাই সব কায ঠিক্ ঠিক সম্পন্ন হয়।" যথা—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সযুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥

কর্ম্মের ভিতরে থেকে যিনি আপনাকে কর্ম্মরহিত দেখ্‌তে পান আর অলস হয়ে কতক কর্ম্ম ছেড়ে থাকলে কর্ম্মরহিত হওয়া অনেক দূর, একথাও যিনি বোঝেন, মানুষের ভিতর তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কায যথাযথ কর্‌তে পারেন।

অতএব শরীর মন প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত রাখ্‌তে হবে; আবার সেইসঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ কর্ম্মরহিত জেনে ভিতরে যোগীর অবিরাম শান্তি নিরত প্রবাহিত রাখ্‌তে হবে। এইরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সামঞ্জস্য আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে স্থাপিত হবে। মুক্ত পুরুষের এই ভাবটী নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হলেও সাধককে অনেক যত্নে অনেক উদ্যমে সুখদুঃখজড়িত অনেক কর্ম্মের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এই অবস্থা লাভ কর্‌তে হয়।

কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য স্থাপনই গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের বিশেষ লক্ষ্য। পূর্ব্বে বলেছি, গীতাকারের সময়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্বন্ধ সাধারণে ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য গুলিয়ে ফেলেছিল। কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ—একটা কর্‌তে গেলে অন্যটা কখনই কর্‌তে পারা যাবে না—এইরূপ লোকে বুঝ্‌তো। এখনও যে আমাদের দেশে অনেক বিষয়ে ঐ প্রকার ভুল ধারণা নাই,এ কথা কে বল্‌বে ? মনে কর,ধর্ম্ম কর্‌তে গেলে বনে যেতে হবে, জগতের কোন জীবের জন্য কোন কায কর্‌লে আর ধর্ম্ম হবে না —আমাদের ভিতর পুরাণ লোকদের এই যে 'অন্ধ' বিশ্বাস ; অথবা—সংসারে স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্য—সংসার ছেড়ে, কর্ম্ম ছেড়ে জ্ঞানী হওয়া, সে আবার কি রকম জ্ঞান রে বাপ্, সে একটা কোন রকম অস্বাভাবিক উপায়ে, মাথা বিগড়ে, জড়বৎ হয়ে যাওয়া—আমাদের সুশিক্ষিত (!) নবীন ছোকরাদের ইংরাজ গুরুর পদতলে বসে এই যে অদ্ভুত 'চক্ষুষ্মান্' বিশ্বাস হয়েছে, সে গুলিকে 'পরের মুখে ঝাল না খেয়ে,' নিজে নিজে শাস্ত্র পড়ে দেখ্‌লে কি মনে হয় ? শাস্ত্রের এই কথাটী একদল একেবারে ভুলে গেছেন যে, কর্ম্মের দ্বারা প্রথমে মন বুদ্ধি পরিষ্কার না হলে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। অন্যদল একেবারে 'না পড়েই পণ্ডিত'—পরমহংসদেব যেমন বল্‌তেন, 'ও কথা খবরের কাগজেতো লেখেনি' বা 'ইংরাজেরা মানে না'—তবে শাস্ত্রকথিত জ্ঞানটাকে মানুষের উন্নতির চরম সীমা বলে তাঁরা কেমন করে মানেন।

শাস্ত্র বলেন, মানুষ প্রথমে বেদাভ্যাস কর্‌বে। তবে তার ধর্ম্মে নিষ্ঠা হবে। ধর্ম্ম হচ্চে ক্রিয়ামূল। অতএব ধর্ম্মলাভ কর্‌বে বলে সে নানা কায কর্‌বে। নানা কায কর্‌তে কর্‌তে তার নানা প্রকারে সুখ দুঃখ অনুভব হয়ে ধীরে ধীরে 'জগৎ অনিত্য' এই জ্ঞান হবে। তখন সে আর নিজে সুখী হব, বড হব বলে প্রত্যেক কায না করে, নিষ্কাম হয়ে, কর্ত্তব্য বলে কায কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। উহাতে ক্রমশঃ মন বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে সে নিজের লাভ লোকসান খতানটা একেবারে ছেড়ে দেবে। ইহারই নাম যথার্থ ত্যাগ। বিবেকবুদ্ধিপ্রেরিত এই ত্যাগ একবার জীবনে এলে সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বস্তুলাভের বিশেষ আগ্রহ প্রাণে উদয় হয় এবং সেই বিষয়ের জ্ঞানও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। তখন সকল বিষয়ে সর্ব্ব প্রকারে একত্বের অনুভব হয়। ভিতরে বাহিরে সে দেখে কেবল এক—এক—এক। একবার এই একজ্ঞান হলে আর তার লোপ হয় না। মরীচিকাকে একবার বালির উপর আলোর খেলা বলে জান্‌লে আর জল বলে বোধ হয় না।

তবে এই একজ্ঞান জীবনে অনুভব করেও কতকটা দ্বৈতবুদ্ধি,লোক-শিক্ষার জন্য বা উচ্চ উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য ফের এনে কায করা যেতে পারে। পরমহংসদেব বল্‌তেন, "যেমন সুরজ্ঞ গায়ক—অনুলোম ধরে উপর গ্রামে উঠ্‌লো, আবার বিলোম ধরে নীচের গ্রামে নাব্‌লো। যখন যে সুর ইচ্ছে, গলা দিয়ে বার কর্‌লে।" একজ্ঞানীর কায করা না করা ঠিক ঐ রকম মুঠোর ভিতর থাকে! তবে হাজার চেষ্টা করেও তিনি আর কখন সাধারণ লোকের মত, কাম কাঞ্চন যশ মানাদিকে "চিজ, বস্তু, মাল" বা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে দেখ্‌তে পারেন না! যেমন মরীচিকাটা একবার জল নয় বলে বোধ হলেও আবার তুমি যেখানে ঐ রকম ভুলবুদ্ধি হয়, সেখানে যেতে ও সেই ভুলটা বার বার দেখ্‌তে দেখাতে পার, কিন্তু আর কখন ঐ জলপান করে তৃষ্ণা মেটাতে যাবে না—সেইরূপ।

কর্ম্ম যে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়, এ কথাটা মনে না রাখ্‌তে পার্‌লে বিষম গোল লাগ্‌বে। "জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ" পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মই এই জ্ঞানলাভ রূপ উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়, যদি নিজের লাভ লোকসানটা খতিয়ে সে উহা না করে। ভারতে গৃহী ও সন্ন্যাসী লক্ষ লক্ষ লোক জ্ঞানলাভের চেষ্টা কচ্চেন—সেটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু তাদের ভিতর পনর আনা লোকই নিজের লাভ লোকসান খতানটা

আগে না ছেড়ে আগেই কর্ম্মটাকে মায়া বলে যতটা পারেন, ছাড়্বার চেষ্টায় থাকেন। তাতে হয় এই যে, খাওয়া, পরা ইত্যাদি স্বার্থের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি ঠিক বজায় থাকে, কেবল দান, দীনসেবা, দেশানুরাগ প্রভৃতি পরহিতের জন্য অনুষ্ঠিত কায গুলিই আগে ত্যাগ হয়ে যায়,— কেননা সেগুলি করায় ঢের 'বখেড়া', 'হাঙ্গাম'! কে "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়?" ফলে যা দেখ্চি, স্বার্থপরতায় দেশ পূর্ণ হয়ে সকলেই অধঃপাতে যেতে বসেচি। বিবেকানন্দ স্বামীজী যেমন বল্‌তেন, "দেশের লোক গুলোর যোগ ত হলোই না, ভোগও হলো না, কেবল পরের জুতো লাথি খেয়ে কায়ক্লেশে কোনরূপে দুটো উদরান্নের সংস্থান— তা কারুর হলো, কারুর হলো না।" ঐ সকল লোক যদি, গীতাকার যেমন বলেচেন এবং প্রতি ঘটনায় নিজের জীবনে দেখিয়েচেন, পরহিতের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য, গরিব দুঃখীর সেবা ও শিক্ষার জন্য, যার যতটুকু সাধ্য নিষ্কাম হয়ে কায করে যান, তাহলে জপ ধ্যানের ন্যায় ঐ সকল কাযই তাঁদের প্রত্যেককে জ্ঞানলাভের দিকে এগিয়ে দেয়, দেশেরও এমন দুরবস্থা থাকে না। দেখা যায়, একজনের স্বার্থত্যাগে যখন কত লোকের কল্যাণ হয়, তখন যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক স্বার্থবলি দিতে কোমর বেঁধেচে, সে দেশের কখন দুরবস্থা থাকে? অপর দিকে ইংরাজী শিক্ষিতদের ভিতর, ইংরেজ গুরুর দৃষ্টান্তে সকাম কর্ম্মে একটু আস্থা হলেও, নিষ্কাম হয়ে কায করা তাঁরা একেবারে বোঝেন না; এবং সেই সঙ্গে কর্ম্মের উদ্দেশ্যই বা কি, তাও তাঁদের প্রাণে ঢোকে না। অতএব শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানলাভের দিকে তাদের আদৌ ঝোঁক নাই— উহা লাভ কর্‌তে উদ্যম করা যে দরকার, এটাও তাঁরা বোঝেন না। বোঝেন না যে, এই জ্ঞান আমাদের ঋষিকুল হতে প্রাপ্ত বহুমূল্য জাতীয় সম্পত্তি। যুগ যুগান্তরের পরাধীনতার পেষণে ভারতের বিদ্যা, ধন, মান সব গিয়াছে—আছে বাকি যেতে কেবল ঐ জ্ঞান, একজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান, যা লাভ হলে মানুষ সকল অভাবের হাত থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হয়। প্রত্যেক হিন্দুর এই জাতীয় সম্পত্তি অতি সাবধানে রক্ষা কর্‌তে হবে। ঐ জ্ঞানের যে দিন লোপ হবে, সে দিন হিন্দুর হিন্দুত্ব যাবে, ভারতের নিজের অস্তিত্ব লোপ হবে এবং কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম সব খুইয়ে জাতটা উৎসন্ন হয়ে যাবে।

গীতোক্ত এই জ্ঞান উপলব্ধির জিনিষ। আমাদের উঠা, বসা, নাওয়া, খাওয়া, শোয়া প্রভৃতি সকল অবস্থার ভিতর, সকল রকম কাযের ভিতর ইহার অনুভব চাই। তর্ক যুক্তি বা কল্পনা সহায়ে ঐ জ্ঞানের একটু আভাস পেয়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। অবিদ্যাপ্রসূত কাম কাঞ্চনকে জীবনের উদ্দেশ্য কর্‌লে চল্‌বে না। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের চর্চ্চা কর্‌তে হবে। জ্ঞানে তন্ময় হতে হবে, উন্মাদ হতে হবে. 'মত্ত' হয়ে যেতে হবে।

কর্ম্মযোগের দ্বারা শুদ্ধ হলে, মার্জ্জিত হলে তবেই সে বুদ্ধিতে জ্ঞানের উপলব্ধি হবে। পরমহংসদেব বল্‌তেন, "ভগবান্, বিষয়বুদ্ধির বাহিরে, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।" অতএব ফলকামনা ছেড়ে কর্ম্ম করাই হচ্চে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়; আর নিজের লাভালাভটা যদি আমাদের কর্ম্মের উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে যে কাযই করিনা কেন, তার দ্বারা ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ হবেই হবে। কর্ম্মে দোষ নাই—কথনই নাই; কিন্তু দোষ রয়েছে আমাদের ভিতরে। নিজের লাভটাকে কর্ম্মের উদ্দেশ্য করেই আমরা দোষী হয়েছি, আপনার জালে আপনি বাঁধা পড়েছি, এবং মুক্ত হবার "খেই জনমের মত" হারিয়েছি। নতুবা নিজের লাভের আশাটাকে যদি চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন দিয়ে স্বার্থগন্ধহীন কোন মহান্ উদ্দেশ্য সামনে রেখে কায করে যাই, তাহলে গীতাকার বলেন,—

"হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।"

নরহত্যার স্রোত বহালেও আমরা খুনে হব না বা অপরে আমাদের খুন কর্‌লেও আমরা মর্‌বো না—এই প্রকার অনুভব হবে। পতিব্রতা উপাখ্যান, ধর্ম্মব্যাধের কথা আমরা সকলেই মহাভারতে পড়েছি বা শুনেছি। কিন্তু সেই সকল আদর্শ চরিত্রের ন্যায় কায কর্‌তে একেবারে ভুলে গেছি! তাই এ দুর্দ্দশা। গীতাকার সেজন্যই বল্‌চেন, "নিষ্কাম হয়ে কায কর, অবিরাম কায কর—কিন্তু কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে ভিতরে কর্ম্মরহিত হয়ে থাক ও যোগীর অচল শান্তি অনুভব কর!"

কথায় বলে, মানুষ হচ্চে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, তাহার সমস্তই এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে আছে—কিন্তু সমস্তই আছে। অন্য দিকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তাহার বৃহৎ প্রতিকৃতি আবার এই বহির্জগতে বর্ত্তমান। মানুষের ভিতর যেমন এই কর্ম্মের ভিতরে কর্ম্মরহিতাবস্থা রয়েছে—কেবল অনুভবের অপেক্ষা মাত্র; সেইরূপ বহির্জগতের

অনবরত পরিবর্ত্তন এবং গতির মধ্যেও অচল ক্রিয়ারহিত শান্তভাব সর্ব্বদা বর্ত্তমান। স্থূলভাবে দেখে মনে হয়, এ আবার কি কথা! নানা ভাবে অনুক্ষণ স্পন্দনশীল জগতে আবার কোথায় কখন গতিরহিত ক্রিয়ারহিত অবস্থা দেখ্‌তে পাওয়া যায়? প্রজ্ঞাচক্ষু দার্শনিক বলেন, সুখ দুঃখ, আলো আঁধার প্রভৃতি বিপরীত দ্বন্দ্বের ন্যায় ক্রিয়া ও ক্রিয়ারাহিত্য, গতি এবং বিশ্রামও জগতে সদা যুগপৎ বর্ত্তমান। ক্রিয়া, গতি প্রভৃতি, তদ্বিপরীত ক্রিয়ারাহিত্য, গতিরাহিত্য প্রভৃতি অবস্থার সহিত তুলনা করেই আমরা বুঝে থাকি। যেখানে ঐরূপ তুলনা কর্‌বার উপায় নাই, সেখানে ক্রিয়া এবং গতিও আমাদের অনুভবের সাধ্য নাই। শুধু আমাদের অনুভব হয় না তাহা নয়, কিন্তু আমরা যাহাকে ক্রিয়া গতি ইত্যাদি বলি, তাহা সেখানে বাস্তবিক নাই। জগতের ভিতরে নানা জিনিষের নানাভাবে অবস্থান দেখে, তুলনা করে আমাদের অনবরত গতি ও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হচ্চে; কিন্তু সমুদায় জগতটাকে একটা পদার্থ বলে একবার ভেবে নিয়ে তার পর তাতে গতি রয়েছে ভাব দেখি। তার যো নাই। ঐখানেই শান্ত নিস্পন্দ ক্রিয়ারহিত অবস্থা। শুনে বল্‌বে হয়তো 'ওঃ, ও তো কল্পনা!' দার্শনিক হেঁসে বলেন, না হে, কল্পনা টল্পনা নয়—ওটাই ঠিক ঠিক সত্য। তোমার বিজ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি সব শাস্ত্রই তো বলে, জগতটা একটা জিনিষ; এক বৈ দুই পদার্থ নাই—এক বৈ দুই শক্তি নাই। আবার ঐ পদার্থ ও শক্তিটাও একেরি বিকাশ। তবে তুমি আমি সর্ব্বদা নানা জিনিষে মন রেখে রেখে আর জগৎটাকে নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নখ কেশাদি সমন্বিত মনুষ্যশরীরের ন্যায় একত্র সম্বদ্ধ একটা জীবন্ত জিনিষ বলে ভাব্‌তে পারি না। ওখানে আমাদের "একঘেয়ে" প্রত্যক্ষটাই গোল কোরে, গণ্ডীর বাহিরে যেতে পারে না, আর ভাবে,—ক্রিয়ারহিত জগৎ আবার কোথায়? মানুষের আত্মাতে দ্বন্দ্বপ্রসূত ক্রিয়ারাহিত্য অনুক্ষণ বর্ত্তমান। প্রত্যেক পদার্থের শেষ স্তরেও ঐ ব্রহ্মভাব বর্ত্তমান। আবার জীবজড়াদির সমষ্টিভূত জগতটাতেও ঐ। অতএব ঐ এক ভাবটা কবিকল্পনা বা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক নয়। মূলে ঐটাকে ধরেই জগতটা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ভিতরের সদা বর্ত্তমান ঐ অবস্থাটা একবার ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌লে আর অনিত্য জন্ম, জরাদি পরিবর্ত্তন এবং তার চরম ফল মৃত্যুও আর আমাদের ভয় দেখাতে পার্‌বে না।। সেইজন্য ভগবান্ গীতাকার বার বার

অর্জ্জুনকে সাম্‌নে রেখে সমস্ত জগতকে শিক্ষা দিচ্চেন—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধ্যাদি সর্ব্বদা কায করুক; কিন্তু তুমি ঐ অকর্ম্ম ভাবটা প্রত্যক্ষ করে সব কায থেকে তফাৎ থাকতে শেখ। হে মানুষ। তুমি মান হুঁস হও, আপনার মহিমায় হুঁস রাখ, জাগ—অজর অমর আত্মার উপলব্ধি করে অচল অটল শান্তিতে অবস্থান কর। কোনরূপ দুর্ব্বলতায় গা ঢেলে দিয়ে অনিত্য জিনিষ গুলোকে নিত্য ধরে রাখ্‌বার চেষ্টা করে দুঃখ পেও না। কর্ম্ম-ফলটা ত্যাগ করে কায করে যাও। উহারই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। সন্ন্যাসও যা, কর্ম্মযোগও তাই।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।

দুই পথই এক যায়গায় পৌঁছিয়া দেয়।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগস্তু নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

অর্জ্জুনের মন থেকে কিন্তু কর্ম্মের চেয়ে জ্ঞান বড়, একথা কিছুতেই যাচ্ছে না! তিনি ভাব্‌ছেন, জ্ঞান হলে যখন কর্ম্ম থাকে না, তখন জ্ঞানটাই শেষ জিনিষ বা লক্ষ্য। অতএব কর্ম্মের চাইতে নিশ্চয় বড়। তিনি ভুলে গেছেন যে, গীতাকার যে জ্ঞানটা মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য বলে তাঁর সামনে খাড়া করচেন, সেটা দেশকালাতীত অসীম অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান। অর্জ্জুন যেটাকে জ্ঞান মনে করেন, সেটা নয়। সেটা দেশকালের গণ্ডীর ভিতর, কার্য্যকারণের শৃঙ্খলের ভিতর চির আবদ্ধ। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দেখ্‌তে পাই, ফের অর্জ্জুনের ঐ প্রশ্ন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ফের ঐ বিষয় বোঝাবার চেষ্টা, এবার কিন্তু ভগবান্ আর এক পথ দিয়ে অর্জ্জুনকে বোঝাতে চেষ্টা কচ্ছেন।

ভগবান্ বল্‌চেন, হে অর্জ্জুন। ভেবো না যে, কর্ম্মযোগটা একটা নূতন পথ। জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি পথ সমূহের ন্যায় ইহাও বহু পূর্ব্বকাল হতে মানবকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিচ্চে এবং জনকাদি বহু খ্যাতনামা রাজর্ষিগণ ঐ পথ আশ্রয় করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। বিশেষতঃ, ক্ষত্রিয় রাজারা। এই কর্ম্মযোগের কথা আমি প্রথমতঃ সূর্য্যকে উপদেশ দিয়াছিলাম। সূর্য্য তৎ-পুত্র মনুকে উহা বলেন। মনু আবার ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ দেন। এইরূপে উহা বহুকাল পর্য্যন্ত বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরুষকার-প্রধান তেজস্বী ক্ষত্রিয় রাজ-কুলের ভিতরেই জীবন্ত ছিল। সেই কর্ম্মযোগের আজ লোপ হয়েছে। নিজের সুখটুকু ছেড়ে কেহ আর বহুজনকল্যাণের

দিকে তাকিয়ে কর্ম্ম কর্‌তে চায় না। ধর্ম্মের ভিতরেও ব্যবসাদারী পাটোয়ারী বুদ্ধি ঢুকেছে; অন্য কর্ম্মাদির তো কথাই নাই। তাই তোমাকে আজ আবার সেই পুরাতন কর্ম্মযোগের কথা বল্‌ছি। হীনবুদ্ধি, কাপুরুষ, ইন্দ্রিয়দাস, রুগ্নশরীর, ভগ্নোৎসাহ লোকের পক্ষে ঐ পথ অবলম্বনে সিদ্ধি লাভ করা সুকঠিন। কিন্তু তোমার ন্যায় বহুজনকল্যাণে চিরনিবদ্ধদৃষ্টি শ্রদ্ধাবান বুদ্ধিমান তেজস্বী বীরহৃদয়ই ঐ উদার ভাব বুঝ্‌তে পেরে দৃঢ়ভাবে ধর্‌তে ও অনুষ্ঠান কর্‌তে পার্‌বে। তাই তোমাকে বলা। আপনার শরীরটিতে পাছে কোন আঁচড় লাগে, আপনার ধন, মান, যশ, প্রভুত্ব প্রভৃতি পাছে না লাভ হয়, এমন কি, আপনাব মুক্তিলাভ পাছে না হয়, এইরূপ ভাব যার হৃদয়ে সদা বর্ত্তমান, সে কখন কর্ম্মযোগী হতে পার্‌বে না। কর্ম্ম-যোগী হবে তেজস্বী উদারমনা বীর, যে সত্যের জন্য বা অপরের কিছু মাত্র কষ্টদূর কর্‌বার জন্য, স্বদেশের প্রেমের জন্য, মহাপুরুষেব গৌরবের জন্য আপনাকে এককালে ভুলতে পার্‌বে—আপনার সুখ ঐশ্বর্য্যাদির নাশ হলেও ভ্রূক্ষেপ কব্‌বে না। পুবাতন জিনিষের আদর করা মনুষ্যমনের স্বভাব। পরিবর্ত্তনের স্রোত অতিক্রম করে বহুকাল যাহা একভাবে থাকে, তাহারি মানুষের কাছে কদর। অনিত্যের ভিতর নিত্য পদার্থের অনু-সন্ধান মানবের প্রাণে প্রাণে সর্ব্বদা আছে বলেই বোধ হয় ঐরূপ হয়। সাধারণ মানবের চেয়ে, গুণী মহাপুরুষদেব হৃদয়ে আবাব ঐ ভাবটা বিশেষ প্রবল দেখা যায়। অর্জ্জুনের ন্যায় বীবাগ্রণিব হৃদয়ে ঐভাব প্রবল দেখেই ভগবান্ কর্ম্মযোগের ইতিহাস কীর্ত্তন করে তাঁকে ঐ দিকে লওয়াচ্চেন।

আর এক কথা,—ক্ষত্রিয়েরাই, বিশেষতঃ, ক্ষত্রিয় রাজারাই এই কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর্‌তেন, এবং তাঁদেব নিকট হতেই ব্রাহ্মণাদি অন্য বর্ণের ভিতর ঐ কর্ম্মযোগের প্রচার হয়েছিল। একথাটায় অনেকের আশ্চর্য্য বোধ হতে পারে, বিশেষতঃ আজকালকার ব্রাহ্মণদের তো পারেই। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস, ভারতের যত কিছু শাস্ত্রজ্ঞান ব্রাহ্মণবর্ণেরই এক-চেটে অধিকারে ছিল, আর তাঁহাবাই দয়া করে অন্য বর্ণকে উহা দিয়াছিলেন। এ কথা কোন কোন বিষয়ে সত্য হলেও সকল বিষয়ে যে নয়, তার ঢের প্রমাণ আছে। আমরা এই মাত্র দেখ্‌লাম, গীতাকার বল্‌ছেন, কর্ম্মযোগ প্রথম ক্ষত্রিয় রাজাদের ভিতরেই ছিল। এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পাঠে

দেখা যায়, আরুণি ও শ্বেতকেতু ব্রাহ্মণ পিতা পুত্রে প্রবাহণ জৈবলি রাজার এবং প্রাচীনশালাদি পঞ্চব্রাহ্মণ কৈকেয় অশ্বপতি রাজার শিষ্যত্ব স্বীকার করে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ নিচ্ছেন। এইরূপে কর্ম্মযোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম উদয় যে ক্ষত্রিয়রাজকুলের ভিতর হয়েছিল, একথা শাস্ত্রপাঠে খুব সম্ভবপর বলে বোধ হয়।

কর্ম্মযোগের ইতিহাস কীর্ত্তন হতে অর্জ্জুনের মনে আর এক প্রশ্নের উদয় হল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সূর্য্যকে তিনি প্রথমে কর্ম্মযোগ উপদেশ করেছিলেন। অর্জ্জুন ভাব্‌লেন, এ কেমন কথা? শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ত সেদিন হল, আর সূর্য্যের উৎপত্তি কতকাল পূর্ব্বে হয়েছে। তাঁকে ইনি উপদেশ দিলেন কি করে? এই সন্দেহের প্রসঙ্গেই ঈশ্বর, ঈশ্বরাবতার ও তাঁহাদের স্বরূপ সম্বন্ধীয় কথার অবতারণা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন, সূর্য্যকে আমি বহু পূর্ব্বকালে অন্য মূর্ত্তিতে ঐ উপদেশ করেছিলাম। কিন্তু আমিই যে সেই মূর্ত্তিতে ঐ উপদেশ দিয়াছিলাম, এ বিষয় আমার বেশ মনে আছে। কেননা আমি ঈশ্বরাবতার, আমার জ্ঞানের কখন লোপ হয় না। তুমি এবং আমি উভয়ে বহুবার বহুস্থানে জন্মগ্রহণ করে বহুজনহিতায় বহুকষ্টের অনুষ্ঠান করেছি ও কর্‌ব। তোমার সে সব কথা মনে নাই। আমার কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের সকল কথাই মনে আছে। অবতার সম্বন্ধে ভগবান্ গীতাকার কি শিক্ষা দেন, উহা আমরা পরবারে আলোচনা কর্‌ব।

তুমি যে আমার।

(শ্রীমতী চন্দ্রানন্দা বসু।)

তুমি যে সবার হরি তুমি যে সবার।
তোমা ছাড়া হলে বিশ্ব পোড়া ভস্ম ছার।
কে বলে গো তুমি নাই, তোমা ময় সর্ব্ব ঠাঁই,
তোমারি রচিত এই নিখিল সংসার।
তুমি যে সবার নাথ তুমি যে সবার।

এই যে সৌন্দর্য্য ভরা, সুজলা শ্যামলা ধরা,
যতই হোকনা কেন শোভার আগার,
তোমা বই কিছু নাই, তোমা বিনা দেখি ছাই,
এ ব্রহ্মাণ্ড জড় পিণ্ড সকলি অসার।
তুমি যে সবার বিভু তুমি যে সবার।
ঐ যে আকাশ মাঝে নীরদে দামিনী রেখা,
জলদ অক্ষরে নাথ তোমারি মহিমা লেখা।
কুসুমে সুষমা তব শশীতে মধুর হাসি,
তপন গগন গায় লয়ে তব তেজোরাশি।
অনলে অনিলে তুমি সকলেতে আছ হরি,
ও নহে সলিল ও যে তোমারি করুণাবারি।
তোমা ছাড়া কিছু নয়, সকলি যে তোমাময়,
তুমি পিতা মাতা ভ্রাতা তুমি সখা সবাকার।
তুমি যে আমার প্রভু তুমি যে আমার।
এই যে হতেছে দৃশ্য, অনন্ত অসীম বিশ্ব,
তোমাতে জড়িত আছে সকলি তোমার।
তুমি যে সবার হরি তুমি যে সবার।
না জানি যে কেবা তুমি আছ দেব কোন্ খানে,
সুধু বিমোহিত চিত ধায় ও চরণ পানে,
পাপে তাপে শোকে দুঃখে সতত জড়িত হরি,
তোমারি মধুর নামে ঢালে প্রাণে শান্তি বারি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান পুণ্য কিছু না জানিতে চাই,
ওই সুধামাখা নাম্ যেন গো বলিতে পাই।
পতিতপাবন তুমি পতিতে বারেক চাও,
দীননাথ দীনসখা দীন হীনে দেখা দাও।
কোথা হে জগত নাথ জগত জীবনাধার,
দুরূহ জীবন ভার বহিতে না পারি আর।
এই যে বিশাল বিশ্ব অসীম সাগর প্রায়,
আমার জীবন প্রভু ক্ষুদ্র বারি বিম্ব তায়।
মম এ জীবন বিশ্ব জীবনে মিশাবে যবে,

এ বিশ্ব সংসারে প্রভু তাহে কিবা ক্ষতি হবে?
তবে হে জীবনদীপ এখনো কেন হে রয,
অচিন্ত্য মহিমা তব কি বুঝিব দযাময?
সকলি তোমাব ইচ্ছা, ইচ্ছা পূর্ণ হক তব।
প্রকৃতি তোমারি রূপ জগতে বিদিত করে,
নব নব বেশে দেখ কিবা নব শোভা ধরে।
কভু ভযঙ্করীবেশী, যেন শ্যামা মুক্তকেশী,
নিবিড তিমিব বাশি ঢেকেছে মেদিনী।
আবাব গগন গায চপলা চমকি যায,
প্রলয পবন বয কাঁপায অবনী।
যেন রণে ঘোবাননা মহাকালী নিমগনা,
করিছে উন্মাদ নৃত্য করালবদনী।
আবার প্রকৃতি হাসে, ভাসে শশী নীলাকাশে,
কিবণ ববষি তোষে বিমল বজনী।
গগনে তাবকামালা, যেন নিশাথিনী বালা,
হাসিছে পবিযে কেশে হীবকেব ফুল,
কমলে কমলা যেন, ধবা শোভামযী হেন,
তোমারি বচিত হবি সে শোভা অতুল।
পুন দূবে যায নিশা, আসে সুখমযী ঊষা,
তরুণ অরুণ বাগে বঞ্জিত ভুবন,
গগনেতে দিনমণি, হেবি ফোটে কমলিনী,
হে বিভু সে প্রেম হবি তোমাবি সৃজন।
তুমি সাজাযেছ ধবা ফলে ফুলে মনোহরা,
বিহঙ্গ ললিত তালে তোমারি মহিমা গায়,
পীত হবিত পাতা, কুসুমিত তরু লতা,
তোমারি স্নেহের কথা লেখা যেন দেখি তায।
সৃজিযাছে কি সুন্দর, স্মিতহাসি মনোহব,
হেরিযা হরিষে প্রাণ মোহিত হইয়া যায,
সাকার কি নিরাকাব গুণাতীত গুণাধাব,
যে হও সে হও তুমি মম মতি তব পায।

তুমি বিধি বিষ্ণু হর, সৃজন পালন কর,
সংহার মূরতি ধর কখন আবার।
হও মাগো অন্নপূর্ণা, অমৃতান্নে পরিপূর্ণা,
জগত জননী রূপা দয়ার আধার।
চৈতন্য রূপিণী তারা মহামায়া ভবদারা,
আমি কি বর্ণিব তব মহিমা অপার?
তুমি যে সবার হরি তুমি যে সবার।
কখন বা রাধা বামে, মদন মোহন ঠামে,
দাঁড়াও যুগলবেশে দ্বিভুজে মুরলী ধরি,
জয় গোবর্দ্ধনধারী, নিকুঞ্জ কাননচারী,
ভুবন মোহন রূপ রাধিকারমণ হরি।
পরমা প্রকৃতি রাধা, তোমারি অঙ্গেরি আধা,
রাধা নামে, বাঁশী সাধা বাজে সদা আয় আয়।
যমুনা উজানে বহে, প্রেমেরি তরঙ্গ বহে,
পুলকে গোলোক ভাসে প্রেমে রাধাগুণ গায়।
ওহে নিত্য নিরঞ্জন, তুমি সত্য সনাতন,
জগত জীবন তুমি সকলেরি মূলাধার।
তুমি হে জীবের গতি, অখিল ভুবন পতি,
পিতা মাতা পতি পুত্র কেহ নয় আপনার।
তোমা বই কিছু নাই, শুধু নাথ এই চাই,
অচল ভকতি থাকে চরণে তোমার,
তুমি যে আমার হরি তুমি যে আমার।

পম্পাসরোবর।

(শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মল্লিক)

পম্পাসরোবর হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন তীর্থ স্থান, বিশেষতঃ, এখানে বানররাজ বালীর রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা এবং ঋষ্যমূক ও মাল্যবান পর্ব্বত থাকায় এই স্থানটী দাক্ষিণাত্যের মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ। পুরাণে

মানসসরোবর, বিন্দুসরোবর, নারায়ণসরোবর ও পম্পাসরোবর, এই চারিটী পুণ্যতোয়া সরোবরের বিষয় কথিত থাকায় এতদঞ্চলের লোকে গ্রহণাদি পর্ব্বদিনে পম্পা স্নান করিতে আইসে, এবং দূরদেশ হইতে যাত্রিগণও প্রায়ই মধ্যে মধ্যে স্নান করিতে আসিয়া থাকে। যদিও অধুনা ইহা দাক্ষিণাত্যের রামেশ্বর, বালাজী, শ্রীরঙ্গম্, বা কাঞ্চীর ন্যায় সর্ব্বদা বহুযাত্রিসঙ্কুল বা ঐশ্বর্য্যপূর্ণ তীর্থ নয় বটে, কিন্তু প্রাচীনতায় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা ঐ সকল স্থানকে পরাজিত করিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের মাইল পরিমাণ স্থান ব্যাপী বড় বড় মন্দিরের বিষয় শুনিয়া, আমি জনৈক বন্ধুর সহিত এতদঞ্চলে বেড়াইতে আসিয়া, যথার্থই এক একটী গ্রাম পরিমিত স্থান ব্যাপী মন্দির দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। এই সকল মন্দিরের মধ্যে বাজার, পুষ্করিণী, ধরমশালা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোপুর (Gate), ও উৎসবাদি হইবার পৃথক্ পৃথক্ স্থান থাকায় উত্তর ভারতবাসী লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এবং দর্শনীয়। উত্তর ভারতে পূর্ব্বকালীন মন্দির সকল খুব কারুকার্য্যখচিত ও প্রকাণ্ড ছিল বটে কিন্তু মুসলমান বাদসাগণ প্রায় সকল গুলিই ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, এখন কেবল সে সকলের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে পূর্ব্বকালীন সেই সকল মন্দির মুসলমানদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ায় এখনও অতীতের হিন্দু স্থাপত্যের পরিচয় দিতেছে।

আমরা মহীশূরের শ্রীরঙ্গপট্টম্ সহর হইতে সাউথ মারহাট্টা রেলযোগে বঙ্গলুর, গণ্টাকল জংসন ও ইংরাজ সেনানিবাসস্থান বল্লারি হইয়া হস্‌পেট (Hospet) আসিয়া পৌঁছিলাম। এ সময়ে মহীশূরে খুব প্লেগ থাকায়, রেলে আসিবার কালীন আমাদিগকে ২।৩ স্থানে প্লেগ পরীক্ষা এবং আপনাপন নাম ও গন্তব্যস্থান লেখাইয়া দিতে হইয়াছিল। হস্‌পেট ষ্টেশনে ৯।১০ টার সময় নামিয়া আমরা পম্পা যাইবার জন্য গাড়ির অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু এখানে Jutka * বা অন্য কোনরূপ ঘোড়ার গাড়ি না থাকায় অগত্যা গরুর গাড়ি ভাড়া করিলাম। আমরা উভয়েই এ দেশীয় কোন ভাষা না জানায় সময় সময় বড় মুস্কিলে পড়িতাম। তবে এতদ-

* দাক্ষিণাত্যের প্রচলিত দুইচাকার ক্ষুদ্রায়তনের পাল্কী গাড়ি। বিশেষ ইহাতে একটী ঘোড়া জোতা থাকে এবং দুই জন লোক ভিতরে স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে।

ঞ্চলের অধিকাংশ লোক ইংরাজী জানায় এবং পুলিশ ও রেল ষ্টেসনের কুলি ও গাড়োয়ানগণ কতক পরিমাণে হিন্দি শিখে বলিয়া কোন রকমে কায চালাইয়া লইতাম। আমাদের গাড়োয়ান হিন্দি জানায় তাহার মুখে শুনিলাম যে, পম্পা—ষ্টেসন হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূর, অতএব প্রথমে তাহাকে কোন একটী ব্রাহ্মণের হোটেলে লইয়া যাইতে বলিলাম। এতদঞ্চলে খুব বড় বড় সহর ভিন্ন, কি রেল ষ্টেসন সমূহে, কি অপরাপর সহরে, কোথাও পুরি কচুরির দোকান নাই; রেলযাত্রীদের তেলে ভাজা ফুলুরি ভিন্ন গতি নাই; কদাচিৎ মিষ্টান্ন পাওয়া যায়, তবে ফল মূল, দধি বা ঘোল, ও গরম দুগ্ধ প্রায় সকল ষ্টেসনে পাওয়া যায়। এ দেশে নির্জ্জলা দুধ প্রায়ই পাওয়া যায় না। ইহারা দুগ্ধে অত্যন্ত জল মেশায়, এমন কি, গ্রামাঞ্চলে পর্য্যন্ত ভাল দুধ দুর্লভ। এ দেশের আবহাওয়া প্রায় বার মাসই গরম, সে কারণ, যদিও আমরা শীতকালে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম, তথাপি গরম কাপড়ের কোট ও আলোয়ান ভিন্ন অপর গরম কাপড় কোন দিন রাত্রে ব্যবহার করিতে হয় নাই। গরম দেশ বলিয়া ইহারা বাঙ্গালির মত দুইবেলা ভাত খায়, এবং সেই কারণ প্রায় সকল সহরেই, বিশেষতঃ রেলষ্টেশনের উপবিস্থিত সহরে ব্রাহ্মণের দ্বারা চালিত ভাতের হোটেল আছে। এই সকল হোটেল বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমাদের বাঙ্গলা দেশের ভাতের আড্ডার ন্যায় নোংরা মাছিভ্যানভেনে নহে। এখানে জাতিবিচার বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক প্রবল, এই কারণ ছোট ছোট কুঠরিতে লোকে পৃথক্ পৃথক্ আহার করে। সাধারণতঃ এদেশের হোটেলে প্রবেশমুখে একটী বসিবার ঘর থাকে। এইখানে তিলক ফোঁটা করিবার সরঞ্জম ও পানের সরঞ্জম পড়িয়া আছে; আহারার্থী লোক প্রথমে এই ঘরে আসিয়া শৈব বা বৈষ্ণব ভেদে আপনারা তিলক করিয়া লয়, পরে হোটেলের মালিক তাহাকে আহারের জন্য ভিতরে স্বতন্ত্র কুঠরিতে লইয়া যায়। পরে পাতে ভাত দিয়া তাহাতে ২।৩ পলা ঘৃত দেয় এবং ২।৩ রকম তরকারি, নারিকেল কুরো, দধি ও লঙ্কা মিশ্রিত চাটনি, ডাল প্রভৃতি, শেষে তেঁতুল গোলা ও লঙ্কা বাটা একটা রসা বা ঝোল ৩।৪ হাতা ভাতের মধ্যে ঢালিয়া দেয়। এই রসা ও তরকারি এত ঝাল যে, সময় সময় খাইতে কষ্ট বোধ হয়, দুধ বা দধি খাইবার ইচ্ছা হইলে পৃথক্ পয়সা দিয়া লইতে হয়। এতদঞ্চলের আহবাওয়া গরম ও আহারীয় দ্রব্যে লঙ্কার ব্যবহার অত্যন্ত অধিক

বলিয়া, আমাদের পরিচিত জনৈক এদেশবাসী বন্ধু আমাদিগকে প্রত্যহ দধি বা ঘোল ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। আহারের পর বাহিরের ঘরে আসিয়া নিজ হস্তে পান বাটা হইতে পান সাজিয়া লইতে হয়, এদেশের হোটেলে মৎস্য, মাংস বা তামাকের ব্যবহার নাই। বিদেশী লোক থাকিতে চাহিলে ২।১ দিনের জন্য বাস করিবার স্থান দেয়। এইরূপ হোটেল ভারতের সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং সাধারণে সহানুভূতি করিলে অল্পবিত্ত হিন্দুদিগের রেলপথে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু ইহা দুরাশা মাত্র, কারণ বহুদিন পূর্ব্বে E. I. Railway এর বড় বড় ষ্টেশন সমূহে কোন একজন বাঙ্গালি বাবু হিন্দু হোটেল খুলিয়াছিলেন, উহা সাধারণের সহানুভূতির অভাবে শীঘ্রই উঠিয়া যায়।

আমরা হসপেট ষ্টেসন হইতে গরুর গাড়ী করিয়া একপোয়া পথ আসিয়া সহরের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণের হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে স্নান ও আহারাদি করিয়া পুনরায় সেই গরুর গাড়ি চড়িয়া সহর ছাড়াইয়া হাম্পি যাইবার রাস্তায় যাইতে লাগিলাম। পথে ২।৩টী গ্রাম অতিক্রম করিয়া প্রায় ৯।১০ মাইল পথ হাম্পির রাস্তায় আসিয়া, শেষে এই রাস্তা ত্যাগ করিয়া বাহাতি অপর একটী রাস্তা দিয়া প্রায় ২ মাইল পরে পম্পেশ্বর নামক স্থানে বেলা ২।৩ টার সময় আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহা তুঙ্গভদ্রানদীর দক্ষিণ উপকূলস্থ অসমতল পার্ব্বত্য ভূমির উপর অবস্থিত; পুরাকালে ইহা একটী ধনজনপূর্ণ সহর ছিল, কিন্তু এক্ষণে পম্পেশ্বর নামক মহাদেবের মন্দির ও তাহারই উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে ৩০।৪০ ঘর লোকের বসবাস ভিন্ন সমুদয় সহরটী জনশূন্য ভগ্ন অট্টালিকা স্তূপে পরিণত হইয়া অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতেছে। আমাদের গাড়োয়ান এই পম্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির সম্মুখে আমাদিগকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল যে, এই স্থানের দুই তিন ক্রোশের মধ্যে ঋষ্যমূক পর্ব্বত, মাল্যবান পর্ব্বত, কিষ্কিন্ধ্যা, পম্পা ও মাতঙ্গ সরোবর প্রভৃতি আছে, অতএব এই স্থান হইতে ঐ সকল দেখিতে হইবে। আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া গাড়োয়ানকে এই স্থানের কোন পাণ্ডার বাটীতে লইয়া যাইতে বলিলে, সে বলিল যে, এখানে কোন পাণ্ডা নাই, পূর্ব্বাহ্নে বলিলে হসপেট সহর হইতে পাণ্ডা পথপ্রদর্শক ঠিক করিয়া দিতে পারিতাম। আমরা এদেশের ভাষা জানিনা যে, স্বয়ং পথপ্রদর্শক যোগাড় করিয়া লইব, এ

কথা গাড়োয়ানকে বিশেষ করিয়া বলায় সে অনেক চেষ্টা করিয়া একজন শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুকে আমাদের পথপ্রদর্শক ঠিক করিয়া দিয়া আপন প্রাপ্য গাড়ি ভাড়া লইয়া বিদায় হইল।

আমাদের পথপ্রদর্শক সাধুটী হিন্দুস্থানী, অতএব তাহার সহিত হিন্দিতে তীর্থাদি দর্শন ও থাকিবার বাসা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইলে, সে পম্পেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের ভিতর ধরমশালার্থে যে সকল ঘর পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে একটীতে আমাদিগকে লইয়া গেল। আমরা সেই ঘরে নিজেদের আসবাব্ রাখিলে পর, আপনারা একটু বিশ্রাম করুন, আমি ঘণ্টা খানেক পরে আসিয়া অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী ২।১ টী স্থান দেখাইয়া আনিব, এবং কাল সকালে আসিয়া অপরাপর স্থান দেখাইতে লইয়া যাইব, এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। অদ্য এই স্থানে আমরা পাণ্ডা না থাকিলে যাত্রীদের যে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। যদিচ আমাদের পথপ্রদর্শক যোগাড় হইয়াছে বটে, কিন্তু পাণ্ডাদের ন্যায় তাহার যাত্রীর প্রতি যত্ন কোথায়? সে জানে, ইহাদের সহিত আমার এই একবার মাত্র সম্বন্ধ, আরও তাহার মনে সন্দেহ আছে যে, কার্য্যশেষে ইহারা পারিশ্রমিক দিবে কিনা, কারণ, এই কার্য্য তাহার পক্ষে অব্যবসায়ীর ব্যবসা করার ন্যায়। অন্য দিকে পাণ্ডারা জানে, যাত্রীদের সহিত তাহাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য সম্বন্ধ, উপস্থিত ক্ষেত্রে যাত্রীদের নিকট কিছু না কিছু পাইবই, ইহা ভিন্ন তাহারা ব্যবসায়ী বলিয়া ভবিষ্যতের আশা রাখে। পাণ্ডাদের একটী দোষ যে, তাহারা যাত্রীদের ইচ্ছা না থাকিলেও স্বল্প মূল্যে পুণ্যক্রয়ের লোভ দেখাইয়া, নানান বাবদে পয়সা আদায় করে, কিন্তু উহারা যাত্রীদিগকে যেরূপ আত্মীয়ের ন্যায় নিজ বাটীতে স্থান দেয়, রসুই বাস করিয়া খাওয়ায়, অসুখ বা বিপদাদি হইলে যেরূপ ভাবে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করে, তাহার তুলনায় পূর্ব্বোক্ত দোষটি অতি সামান্য। বিশেষতঃ পাণ্ডার আশ্রয়ে যাত্রীদের কখন চুরি যাইতে শুনা যায় না, সহায়শূন্য অপরিচিত স্থানে যাত্রীদের পক্ষে এই সকল বড় সামান্য লাভ নহে। দুঃখের বিষয়, আজ কাল কোন কোন লোককে পাণ্ডা প্রথার উপর বিশেষ চটা দেখিতে পাই। ইহার কারণ আমার বোধ হয় যে, তাঁহারা আত্মীয় বন্ধু যে সকল স্থানে আছে, তাহা ভিন্ন অপর কোন তীর্থ স্থানে না যাওয়ায় তাঁহাদের বহুদর্শিতা

নাই। তাঁহারা যদি একবার আপন ভবসায অপবিচিত তীর্থে গমন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় নিজ ভ্রম বুঝিতে পাবেন। তাঁহাদেব মনে বাখা উচিত যে, পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই ভ্রমণ করিবাব জন্য পথপ্রদর্শকের বন্দোবস্ত আছে, এবং ইহার কাবণ সর্ব্বত্রই পারিশ্রমিক দিতে হয়, অতএব আমাদেব দেশেব পাণ্ডা প্রথায দোষ কি?

আমরা মন্দিরাভ্যন্তরস্থ ধরমশালায় খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করিলাম, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সেই পূর্ব্বোক্ত পথপ্রদর্শক না আসায, আমবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে না আসে, ততক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিযা না থাকিযা এই মন্দিবটী দেখিতে লাগিলাম। মন্দিরটী দুই মহল। প্রধান গোপুরের পব বিস্তৃত প্রাঙ্গণ রহিযাছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে যাত্রীদের থাকিবাব জন্য ধরমশালা, দেবতার উৎসবাদির জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান এবং মধ্য স্থানে জলপানার্থ কুযা রহিযাছে। এখান হইতে দ্বিতীয দ্বার দিযা প্রবেশ করিলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উঠানেব মধ্যে পম্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখা যায; বাহির মন্দিবে নন্দী বা ষাঁড় ও ভিতর মন্দিরে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। উঠানের চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘবে অপরাপর দেবতার স্থান এবং পার্ব্বতী দেবীর পৃথক্ স্থান আছে। এই উঠানের পশ্চিম দিকে আর একটী দরজা আছে, এই দরজা দিযা তুঙ্গভদ্রা নদীতে যাওয়া যায়। এই মন্দিরটী খুব পুরাতন বলিয়া স্থানে স্থানে মেরামতের অভাবে ভাঙ্গিযা যাইতেছে। ইহা দাক্ষিণাত্যের অপরাপব মন্দির অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন হইলেও আর্য্যাবর্ত্তেব মন্দিবের হিসাবে খুব বড়। আমাদেব মন্দির ও পার্শ্বস্থ তুঙ্গভদ্রা নদী দেখিযা আসিবার ক্ষণেক পরে পথপ্রদর্শক আসিযা উপস্থিত হইল এবং তাহার সহায়তায় আমরা অপরাপর স্থান দেখিতে বাহির হইলাম।

মন্দির হইতে বাহির হইযা আমরা ভগ্ন অট্টালিকা সমূহের মধ্যস্থ রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে দেখিলাম যে, এই ভগ্ন স্তূপের মধ্যে এক একটী দোতলা বা তেতলা বাটী এখনও অভগ্ন অবস্থায থাকিয়া ঠিক যেন মস্তক উন্নত করিয়া দূর হইতে পথিকদিগকে বস্তু মাত্রই নশ্বর বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছে। সে যাহা হউক, আমরা একমাইল পথ এইরূপ ভগ্ন স্তূপের মধ্য দিয়া যাইয়া সহরের বাহিরে আসিলাম এবং আরও এক মাইল অসমতল পার্ব্বত্য ভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তটে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিম্নস্থ একটী গুহায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ঋষ্যমূক পর্ব্বত তুঙ্গভদ্রার উভয় তটে অবস্থিত। দুই মাইল ব্যাপী শৈলমালা, উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষলতাদিপূর্ণ পর্ব্বত মধ্য দিয়া তুঙ্গভদ্রা নদী সর্পের

ন্যায় বক্র গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রাকৃতিক দৃশ্যটী দেখিতে অতি রমণীয়। উচ্চ পাহাড়ে স্বভাবের সৌন্দর্য্য ভিন্ন যাত্রীদের দেখিবার কিছুই নাই। পথপ্রদর্শকের মুখে শুনিলাম যে, এই গুহায় সুগ্রীব, হনুমানাদি মন্ত্রিচতুষ্টয়ের সহিত বানররাজ বালির ভয়ে লুকাইয়া বাস করিত। রাক্ষসরাজ রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া আকাশমার্গ দিয়া পুষ্পক রথে লঙ্কায় লইয়া যাইতেছিল, তখন জনকনন্দিনী নিম্নে এই গুহায় অবস্থিত বানরগণকে দেখিয়া আত্মপরিচয় দিয়া নিদর্শন স্বরূপ আপন শরীর হইতে অলঙ্কার মোচন পূর্ব্বক গুহাস্থ বানরগণের সম্মুখে ফেলিয়া দেন। এখনও গুহা সম্মুখস্থ পাথরের উপর সেই সকল অলঙ্কার পতনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গুহার মধ্যে ৮।১০ জন লোক থাকিতে পারে, এই পরিমাণ স্থান আছে, কিন্তু কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি নাই। গুহার ভিতর বাহিরের স্থান সকলে মৃত্তিকার লেশ মাত্র নাই, কেবল পাথর ; একারণ বৃক্ষ লতাদি কিছুই নাই।

এই স্থান দেখিয়া আমরা তুঙ্গভদ্রার ধারে ধারে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের উপর দিয়া প্রায় এক পোয়া পথ যাইয়া একটী শ্রীবৈষ্ণবদের আখড়া বা মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই আখড়াটী খুব প্রাচীন, ভিতরে রাম সীতা মূর্ত্তি বিরাজিত। শুনিলাম, পূর্ব্বোক্ত গুহায় লুকায়িত বানরগণের মধ্য হইতে হনুমান এই স্থানে সর্ব্ব প্রথম শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহাকে জনকনন্দিনীর সমাচার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার পরিত্যক্ত অলঙ্কার সকল দেখান ; পরে এই স্থানে সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয় এবং প্রভু রামচন্দ্র বালী বধের অঙ্গীকার করেন। এই স্থানের চতুস্পার্শ্বে বৃক্ষলতাদি ও নিম্নে তুঙ্গভদ্রা নদী থাকায় স্থানটী অতি মনোরম এবং আশে পাশে গ্রাম না থাকায় একান্ত নির্জ্জন ; ঠিক যেন প্রাচীন ঋষিদিগের আশ্রম। ভজন সাধনের পক্ষে বেশ প্রশস্ত স্থান বলিয়া কয়েকজন বিরক্ত সাধু এই আখড়ার আশে পাশে ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত আছেন। আমরা এই স্থান দেখিয়া পুনরায় ঋষ্যমূক পর্ব্বতের উপর দিয়া চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পম্পেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক রাত্রে আমাদিগকে এই মন্দিরস্থ ধরমশালায় সতর্ক ভাবে থাকিতে পরামর্শ দিয়া এবং আগামী কল্য প্রাতে আসিয়া অপরাপর স্থান সকল দেখাইয়া আনিব বলিয়া আপন স্থানে চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইলে পর আমরা সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরচিন্তা করিবার জন্য মন্দির পার্শ্বস্থ তুঙ্গভদ্রা নদীতে গমন করিলাম।

তটভূমি নদীজল হইতে অনেক উচ্চ। নদীতলে নামিবার জন্য কোনরূপ বাঁধা ঘাট নাই কিন্তু পার্ব্বত্য স্থান বলিয়া অনেক পাথর পড়িয়া থাকায় তাহার উপর দিয়া জলে অবতরণ করিবার বেশ সুবিধা আছে। আমরা জলের নিকট যাইয়া দেখিলাম যে, নদী কিনারায় জল মধ্যে অনেক বড় বড় পাথর পড়িয়া আছে, সেই সকল পাথরে স্রোতজল প্রতিহত হইয়া অতি সুমধুর কল্লোল ধ্বনি উঠিতেছে এবং ঐ শব্দের সহিত পাথরে উপবিষ্ট সন্ধ্যা উপাসনা পরায়ণ ব্রাহ্মণগণের স্তোত্রধ্বনি মিলিত হইয়া যে কি শ্রুতিসুখকর শব্দ উত্থিত হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত।

আমরা নদীজলে অবস্থিত একটী পাথরের উপর বসিয়া খানিকক্ষণ ঈশ্বর চিন্তা করিবার পর এই পুণ্যতোয়ার উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহের পূর্ব্বস্মৃতি সকল মনে উদয় হইতে লাগিল। এই নদী উপকূলে বসিয়া সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের আলোচনা করেন এবং বেদান্তাদির ভাষ্য সকল রচনা ও বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি কত গ্রন্থই প্রচার করেন। এই স্থান হইতে তুঙ্গভদ্রা কুট দিয়া ২।১ দিন যাইলে উক্তনদীতীরে শৃঙ্গগিরিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সিংগেরি মঠে যাওয়া যায়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠ সকলের মধ্যে ইহাই প্রধান ও প্রথম? এইস্থানে তিনি সরস্বতী মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এই মঠে এখনও সকল প্রকার দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রগ্রন্থ ও মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী সকল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই তুঙ্গভদ্রার কূলে বিজয়নগরে দাক্ষিণাত্যের সেই প্রধান পণ্ডিত মধ্বাচার্য্য অশেষবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত এত গ্রন্থ আছে যে, ভূমণ্ডলে আর কোন ব্যক্তি এত অধিক গ্রন্থ লিখিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এইরূপ নানাবিধ চিন্তার পর আমরা পম্পেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়া সামান্য জলযোগ করিয়া রাত্রে শুইয়া রহিলাম।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া দর্শনে যাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত পথপ্রদর্শকের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম; কিন্তু সে না আসায় অগত্যা আমরা সন্ধান করিয়া তাহার ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে অপরাপর স্থান দর্শন করাইবার জন্য লইয়া যাইতে বলায় সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ভাবে বোধ হইল, তাহার মনে সন্দেহ হইতেছে যে, দর্শনাদি করিয়া পাছে শেষে আমরা তাহার পারিশ্রমিক ফাঁকি দি। তখন মনে হইল যে, পাণ্ডা না থাকায় আজ পয়সা দিয়াও লোক পাইনা। সে যাহা হউক, আমরা পারিশ্রমিক স্বরূপ

টাকা অগ্রে দেওয়ায়, সে আমাদের সঙ্গে দর্শন করাইতে বাহির হইল।

আজ আমরা অপর একটী রাস্তা দিয়া ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকাসমূহ অতিক্রম করিয়া গ্রামের বাহিরে আসিলাম; এবং প্রায় ২ মাইল অসমতল পার্ব্বত্যভূমি অতিক্রম করিয়া মাল্যবান পর্ব্বততলে আসিয়া পৌঁছিলাম। পর্ব্বতটী ফলফুলের বৃক্ষলতাদিপূর্ণ ও বেশ রমণীয়; উপরে উঠিবার জন্য পূর্ব্বে সিঁড়ি ছিল, এখন ২।১ স্থান ভিন্ন সমুদায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নিচে হইতে প্রায় এক মাইল পথ উঠিবার পর আমরা পর্ব্বতশিখরদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানে একটী প্রাচীন মন্দির আছে। আমরা প্রবেশ মুখে হনুমানজীর আস্থানা দেখিয়া, একটী বড় দরজা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরপ্রাঙ্গণ চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত; মধ্যে রাম সীতার মন্দির বিরাজিত। এই স্থানকে স্ফটিক শিলা কহে, কিন্তু রামায়ণ কথিত সে স্ফটিকমণিময় গহ্বর, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র চাতুর্ম্মাস্য সময়ে বৃষ্টি-বাত-আতপ নিবারণ জন্য বাস করিতেন, তাহার কোন চিহ্ন এখন আর নাই।

শ্রীরামচন্দ্র বানররাজ বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজা করিলে পর সুগ্রীব তাঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে থাকিতে বলেন; কিন্তু তিনি বলেন, "সখে, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর কোন নগরে প্রবেশ করিব না, আমি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতশিখরে এক বৎসর কাল বাস করিব,তুমি এই যৎকিঞ্চিৎ সময় নগর মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক রাজ্যসুখভোগ করিয়া পশ্চাৎ সীতান্বেষণে যত্নবান হইবে।" এই কথা বলিয়া এই পর্ব্বতে আসিয়া বাস করেন। পর্ব্বতোপরে জলের ঝরণা বা কুণ্ড না থাকায় জনকনন্দিনী পিপাসায় অতিশয় কাতর হইলে ভগবান্ রামচন্দ্র বাণাঘাতে পর্ব্বত বিদ্ধ করিয়া সুশীতল জল বাহির করিয়া তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করেন, এখনও মন্দিরস্থ প্রাঙ্গণে ইহার নিদর্শন স্বরূপ একটী গর্ত্ত ও তাহার মধ্যে জল দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে ভগবান্ অপর পক্ষীয় শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এখনও মন্দিরের পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রাঙ্গণে তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরটী এবং মন্দিরস্থ ৩।৪ জন শ্রীবৈষ্ণব সাধু কেবল মাত্র সেই অতীতের সমাচার জগৎকে জানাইতেছে, নচেৎ পূর্ব্বেকার সে রামও নাই আর কিষ্কিন্ধ্যা হইতে নিত্য শ্রীরাম দর্শনে আগত বানরগণের দিবারাত্র সে গগনভেদী জয় শ্রীরামধ্বনিও নাই, তবে এখনও পরিশ্রান্ত যাত্রীর মুখে এবং মন্দিরস্থ সাধুদের মুখে মধ্যে মধ্যে রাম রাম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, নচেৎ পর্ব্বতোপরে বা আশে পাশে কোন

গ্রাম না থাকায় চতুর্দ্দিক একান্ত নিস্তব্ধ, কেবল পক্ষিকুল মধ্যে মধ্যে মধুর স্বরে ও ভ্রমরেরা গুণ গুণ রবে রাম নাম গান করিয়া, এবং দূরস্থ তুঙ্গভদ্রা নদী ক্ষীণ স্বরে অবিরত রাম রাম শব্দে প্রবাহিত হইয়া এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে মাত্র।

এই সকল দর্শন করিয়া আমরা পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিলাম এবং নিম্নস্থ সমতল ভূমির উপর দিয়া কিষ্কিন্ধ্যার পারঘাটের দিকে চলিতে লাগিলাম। পথের উভয়পার্শ্বে ক্ষেত্রে কৃষকগণ কেহ শস্য কাটিতেছে, কেহ রাম নাম গান করিতেছে, কেহ শুইয়া আছে। এই সময় ইক্ষুর চাষ শেষ হওয়ায় কোথাও ইক্ষু কাটা হইতেছে, কোথাও আখ মাড়া হইতেছে। আমরা এই সকল দেখিতে দেখিতে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতটে, কিষ্কিন্ধ্যা যাইবার পারঘাটে উপস্থিত হইলাম। পার-ঘাটে নৌকা দেখিতে পাইলাম না, তবে কয়েকটা ঝাঁকা জলে ভাসিতেছে দেখিলাম। ঝাঁকাগুলি আমাদের দেশের কুমোরদের হাঁড়ি কলসী বহিবার ঝাঁকার ন্যায় বড় বড় ও উহাদের তলদেশ চামড়ার দ্বারা ভাল করিয়া ছাওয়া থাকায় জলে বেশ ভাসিতেছে। এক একটী ঝাঁকায় ৩।৪ জন লোক বসিতে পারে এবং একজন মাত্র নাবিক হস্তস্থিত দাঁড়ের সাহায্যে এই জল-যান চালাইতেছে। আমরা ৩ জনে এইরূপ একটী জলযানে বসিয়া পরপারে যাইয়া পৌঁছিলাম। এখানকার নদীর বিস্তার প্রায় সিকি মাইল।

আমরা পরপার হইতে এক পোয়া রাস্তা দূরে কিষ্কিন্ধ্যা সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম; ইহার আধুনিক নাম আনিগুন্ধি। সহরটী দেখিয়া বোধ হইল যে, ইহা পুরাকালে এতদঞ্চলের মধ্যে একটী খুব সমৃদ্ধ স্থান ছিল এবং এখনও বাজার, হাট, দোকান, স্কুল, পোষ্টাফিস সকলই আছে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সে জাঁকজমক নাই। সহরের মধ্যে পুরাকালের সেই বানররাজের রাজ-ধানীর কোন চিহ্নই নাই, এবং আধুনিক সময়ের দর্শনযোগ্যও কিছুই নাই। আমাদের পথপ্রদর্শক সহরের বাহিরে দুইটী স্থান দেখাইল, প্রথমটী পুরা-তন ছতরি, এইস্থানে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বালীবধ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় স্থানটীর সম্বন্ধে এইরূপ শুনিলাম যে, ভগবান্ বালী বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানর-রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে পর, সে রাজ্যসুখভোগে মত্ত হওয়ায় ভগ-বান্‌কে সীতা উদ্ধারে সাহায্য করিব বলিয়া যে পূর্ব্বে সত্য করিয়াছিল, তাহা প্রায় বিস্মৃত হইয়া যায়। ভগবান্ রামচন্দ্র লোকধর্ম্ম অনুসারে নির্দ্দিষ্ট

কাল অতীত হইলে একদিন লক্ষ্মণের নিকট বিলাপ করিয়া সুগ্রীবের অকৃতজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করেন। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে কিষ্কিন্ধ্যার বাহিরে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া সুগ্রীবের নিকট সম্বাদ পাঠান। সুগ্রীব সে সময় অন্তঃপুরে ছিল। তাহার নিকট লক্ষ্মণের আগমন সম্বাদ পৌঁছিলে সে ভীত হইয়া হনুমান ও অঙ্গদকে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার নিকট আনিবার জন্য পাঠান। হনুমান ও অঙ্গদ অর্ঘ্যহস্তে এই স্থানে লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার ক্রোধ শান্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে অন্তঃপুরে সুগ্রীবের নিকট লইয়া যান এবং সুগ্রীবও সীতা অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে চর সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক উক্ত চরদের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলেন। আনিগন্ধির অনতিদূরে তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে হাম্পী সহরের নিকট প্রাচীন বিজয়নগরের আশ্চর্য্য ভগ্নাবশেষ দর্শন করা অতীব প্রীতিপ্রদ। এখানকার বাজারের মধ্যস্থ শিবালয়, শ্রীরামচন্দ্রের নির্ম্মিত বিশাল মন্দির, প্রকাণ্ড বিষ্ণুমন্দির প্রভৃতি দেবস্থান, এবং পাথরের মধ্যে খোদিত পুষ্করিণী ও কূপ সকল দেখিবার যোগ্য। এই নগরের পরিধি প্রায় ৮ মাইল।

আমরা আনিগন্ধি হইতে এক ক্রোশ দূরে পূর্ব্বকথিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতের যে অংশ তুঙ্গভদ্রা নদীর বাম তটে অবস্থিত, তাহারই কোলে পম্পা সরোবরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সরোবরের পরিমাণ উপস্থিত ১৫।২০ বিঘা হইবে। ইহার চারিপাড় পাথরের সিঁড়ি দিয়া বাঁধান, এখন স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার পার্শ্বেই মাতঙ্গ সরোবর, উপস্থিত একটী ডোবার আকারে রহিয়াছে। এখনও পম্পায় সেই—রামায়ণবর্ণিত প্রফুল্ল কহ্লার কুমুদ ফুলে ভূষিত, হংস ও কারণ্ডব কুলে পরিবৃত, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষী সমূহ দ্বারা শোভিত এবং জলকুক্কুট, টিট্টিভ ও ক্রৌঞ্চদিগের কূজনে প্রতিধ্বনিত, একক্রোশ বিস্তীর্ণ অগাধ, সাধুদিগের হৃদয়ের ন্যায় স্বচ্ছ জল রাশি এবং নানাবিধ কুসুমিত লতাজালে ও বিবিধ ফলভরে নম্র তরুসমূহে আবৃত, বিবিধ কুসুম গন্ধে সুবাসিত তীরভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পূর্ব্বের শোভা এখনও সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হয় নাই। এখনও এস্থান দেখিয়া দর্শক নিশ্চয়ই প্রীতি লাভ করিবেন। ইহারই নিকট মাতঙ্গ মুনি ও অপরাপর ঋষিদিগের আশ্রম ছিল। এই স্থানেই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা নাম্নী তাপসী মহর্ষিগণের শুশ্রূষাপরায়ণা হইয়া বহুসহস্র বৎসর বাস করেন। মহর্ষিগণ সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মলোক গমন কালীন তাঁহাকে এই আদেশ করিয়া যান যে, বৎসে! তুমি সমাধি অবলম্বন

করিয়া এই স্থানে বাস কর। সনাতন পরমাত্মা রাক্ষসকুলের বিনাশ ও ঋষিগণের রক্ষার নিমিত্ত দশরথের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি স্থিরচিত্তে ধ্যানাবলম্বন করিয়া সেই বিষ্ণুর আগমন প্রতীক্ষা কর; এক্ষণে সেই প্রভু চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। যে কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ এখানে না আসিবেন, তাবৎকাল শরীর ধারণ করিও। পরে ভগবান্‌কে সমাগত দেখিবামাত্র অনলমধ্যে নিজ দেহ দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। ওদিকে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ইহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে কবন্ধ বধকালীন তাহার মুখে শবরী তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি সহকারে মনোনিবেশ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী আশ্রমে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন শুনিয়া লক্ষ্মণের সহিত শবরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ভক্তিপরায়ণা শবরী তাঁহাকে দেখিবামাত্র সানন্দে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম, পাদপ্রক্ষালন, অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা ও তাঁহার আতিথ্য সৎকার করেন। পরে ভগবান্ কর্ত্তৃক সীতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে শবরী কহিল, হে প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলই জানেন, তথাপি লোকব্যবহারানুযায়ী হইয়া আমাকে এ বিষয় যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, সুতরাং বলিতে হইল, হে ভগবন্! রাক্ষসেশ্বর রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে সীতা লঙ্কায় অবস্থিতি করিতেছেন। বানর-রাজ বালী কর্ত্তৃক পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া তাহার ভ্রাতা সুগ্রীব মন্ত্রিচতুষ্টয়ের সহিত পম্পা সমীপে, মাতঙ্গ শাপে বালীর অগম্য ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতেছে; এক্ষণে আপনি তাহার সহিত সখ্য করুন; সে আপনার সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে। শবরী শ্রীরামচন্দ্রের সহিত এইরূপ সম্ভাষণান্তর, তাঁহারই সম্মুখে অগ্নি প্রবেশ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে অবিদ্যাজনিত সংসার বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরামের প্রসাদে অতি দুর্লভ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এখন সে সকল আশ্রমের কোন চিহ্ন নাই, কেবল পম্পাকূলে একটী শ্রীবৈষ্ণবদিগের আখড়া আছে; এখানে জন কতক সাধু থাকেন। ইহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি আছে, এখানকার লোকেরা বলেন যে, এই আখড়া বা মঠই পূর্ব্বোক্ত ঋষিদিগের আশ্রমস্থান। যাহা হউক, আমরা প্রথমে মাতঙ্গ সরোবরে আচমন ও জল স্পর্শ করিয়া পম্পা প্রদক্ষিণান্তর উহাতে স্নানাদি করিলাম ও পরে পার্শ্বস্থ আখড়া বা মন্দির দর্শন করিয়া পম্পাকূলে বৃক্ষতলে আনিগন্ধি হইতে সংগৃহীত জল খাবার খাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

বিশ্রামান্তে আমরা এখান হইতে বাহির হইয়া প্রায় দেড় পোয়া পথ আসিয়া অঞ্জন গিরি বা অঞ্জন শৈলের নিকট পৌঁছিলাম। পাহাড় খুব উচ্চ নহে, তবে বৃক্ষলতাদি দ্বারায় অলঙ্কৃত। পর্ব্বত নিম্ন হইতে পোয়াটাক পথ উপরে উঠিলেই একটী গুহায় পৌঁছান যায় ; গুহার মধ্যে হনুমানের মূর্ত্তি আছে। পথপ্রদর্শকের মুখে শুনিলাম যে, এই গুহার মধ্যেই অঞ্জনাসুত হনুমান জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহারই মাতার নাম অনুসারে ইহার অঞ্জন গিরি নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে এই পর্ব্বতোপরে জলের ঝরণা আদৌ ছিল না ; হনুমান পিপাসার্ত্ত হইয়া, উক্ত গুহার বাহিরে পর্ব্বত তাড়না করায়, একটী ঝরণার উৎপত্তি হয়, এখনও গুহার বাহিরে সেই প্রস্র-বণের মুখ বা উৎপত্তিস্থান বিদ্যমান আছে। এই পাহাড়ে উক্ত গুহা ভিন্ন আর কোন দেখিবার স্থান নাই।

আমাদের পথপ্রদর্শক বলিল যে, এই স্থান হইতে তুঙ্গভদ্রার পরপারে পম্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির এক মাইল মাত্র ; কিন্তু এ স্থানে তুঙ্গভদ্রা নদী পার হইবার খেয়া নাই, জলে নামিয়া পার হইতে হইবে, আর যে রাস্তা দিয়া আসিয়াছি, সেই রাস্তা দিয়া অর্থাৎ আনিগন্ধি হইয়া পম্পেশ্বর যাইতে হইলে ৭ মাইল পথ চলিতে হইবে। অতএব আপনারা কোন্‌পথে যাইবেন ? আমরা খেয়ার জন্য অনর্থক ৭ মাইল পথ হাঁটা অপেক্ষা কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক নদী পার হইয়া প্রথমোক্ত পথে যাওয়াই প্রশস্ত বোধে সেই পথেই অঞ্জন শৈল হইতে যাত্রা করিলাম। প্রায় এক মাইল পথ ঝরণার জলসিক্ত নদী-লতাদি পূর্ণ উঁচু নিচু পার্ব্বত্যভূমি অতিক্রম করিয়া আমরা তুঙ্গভদ্রার সমীপে আসিয়া দেখিলাম, সম্মুখে পম্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে ও লোকেরা নদীজলে স্নান করিতেছে। এ পারে লোক জন কেহই ছিল না যে, জিজ্ঞাসা করিব, কোন্ স্থান দিয়া নদী পার হওয়া সুবিধাজনক ; অধি-কন্তু পথপ্রদর্শকও আমাদের আগে আগে থাকিয়া জলের পরিমাণ ঠিক করিয়া আমাদিগকে পরপারে লইয়া যাইতে ভয় পাইতে লাগিল, কারণ, নদীতল প্রস্তরসঙ্কুল ও উঁচু নিচু। যাহা হউক, আমরা পথপ্রদর্শককে নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে নদী পার করিয়া দিতে পারে, এমন লোক পয়সা দিয়া চেষ্টা করিয়া আনিতে বলিলে, সে লোকের সন্ধানে যাইলে পর আমরা নদীতীরে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ক্ষণেক পরে পরপার হইতে একজন কৃষক নদী পার হইয়া আমাদের পারে আসিল ; আমরা পথপ্র-

দর্শককে আমাদের নিকট আসিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে, সে আমাদের নিকট আসিল; তখন তাহা দ্বারায় সেই পরপার আগত কৃষককে পারিশ্রমিক দিব স্বীকার করিলে সে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া পরপারে লইয়া যাইতে সম্মত হইল। এ স্থানের নদীর বিস্তার দুই ফারলঙ হইবে। আমরা সকলে নদী জলে উপস্থিত হইলে সর্ব্ব প্রথমে সেই কৃষক জলের অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া চলিতে লাগিল, তাহার পিছু পিছু আমরা আপনাপন হস্তস্থিত লাঠির ভরে নদীর প্রবল স্রোত সহ্য করিয়া কোথাও কোমর জল, কোথাও বুক জল ভাঙ্গিয়া পরপারে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানে সেই কৃষককে কথিত পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় দিলাম এবং পথপ্রদর্শকের নিকট বিদায় লইয়া আমরা পম্পেশ্বর মহাদেবের মন্দিরস্থ ধরমশালায় আসিয়া ক্ষণেক বিশ্রামান্তে, গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া হসপেট ষ্টেসনে আসিলাম এবং রেলযোগে গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(১)

বম্বে; ২৪ মে, ১৮৯৩।

কল্যাণবরেষু,

মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজির পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। সর্ব্বদা পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না। সর্ব্বদা শ্রীহরির নিকট তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। বেলগাঁওয়ে এক্ষণে যাইতে পারি না, কারণ, ৩১ তারিখে এখান হইতে এমেরিকায় রওনা হইবার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এমেরিকা ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া প্রভুর ইচ্ছায় পুনরায় তোমাদের দর্শন করিব। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকা মাত্র। সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। কায়মনবাক্যেতেও যেন অপবিত্র না হও এবং সদা যথাসাধ্য পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। মনে রাখিও, কায়মনবাক্যেতে পতিসেবা করা স্ত্রীলোকের প্রধানধর্ম্ম। নিত্য যথাশক্তি গীতাপাঠ করিও। তুমি * * দাসী কেন লিখিয়াছ? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেব ও

দেবী লিখিবে। বৈশ্য ও শূদ্রেরা দাস ও দাসী লিখিবে। অপিচ জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ মহাত্মারা করিয়াছেন। কে কাহার দাস? সকলেই হরির দাস। অতএব আপনাপন গোত্র নাম অর্থাৎ পতির নামের শেষভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা,—অমুক মিত্র ইত্যাদি। আর কি লিখিব মা, সর্ব্বদা জানিবে যে, আমি নিরন্তর তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। এমেরিকা হইতে সেখানকার আশ্চর্য্য বিবরণ পূর্ণ পত্র আমি মধ্যে মধ্যে তোমায় লিখিব। এক্ষণে আমি বম্বেতে আছি। ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত থাকিব। খেতড়ি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি আমায় জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। কিমধিকমিতি

আশির্ব্বাদক বিবেকানন্দ।

(২)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

২৮ শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩

George W Hale,

541, Dearborn Avenue,

Chicago.

কল্যাণবরেষু,

বাবাজি, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনে রাখিয়াছ, ইহাতে আমার পরমানন্দ। ভারতবর্ষের খবরের কাগজে চিকাগো বৃত্তান্ত হাজির বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, কারণ, আমি যাহা করি, গোপন করিবার যথোচিত চেষ্টা করি। এদেশে আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক। বিশেষ, এদেশে দারিদ্র্য নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম। যে দেবী সুকৃতি পুরুষের গৃহে স্বয়ং স্ত্রীরূপে বিরাজমানা, একথা বড়ই সত্য। এদেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি, আর এরা কেমন স্বাধীন! সকল কার্য্য এরাই করে। স্কুল, কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়ে ছেলের পথ চলিবার যো নাই। আর এদের কত দয়া। যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে—লেক্‌চার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে, বলিতে

পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করিলেও এদের ঋণ মুক্ত হব না।

বাবাজি, শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্গ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে। এবং মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, "যত্র নার্য্যস্তু নন্দান্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ" যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। আর এরা তাই এত সুখী, বিদ্বান্, স্বাধীন ও উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, মহাদরিদ্র।

এদেশের ধনের কথা কি বলিব? পৃথিবীতে এদের মত ধনী জাতি আর নাই। ইংরেজরা ধনী বটে, কিন্তু অনেক দরিদ্র আছে। এদেশে দরিদ্র নাই বলিলেই হয়। একটা চাকর রাখ্‌তে গেলে রোজ ৬ টাকার খাওয়া পরা বাদ দিতে হয়। ইংলণ্ডে এক টাকা রোজ। একটা কুলী ছটাকা রোজের কম খাটেনা। কিন্তু খরচও তেমনি। চারি আনার কম একটা খারাপ চুরুট মেলেনা। ২৪ টাকায় এক যোড়া মজবুত জুতো। যেমন রোজকার, তেমনি খরচ। কিন্তু এরা যেমন রোজকার করিতে, তেমনি খরচ করিতে।

আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র। ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার হাট, রোজকার, দোকান, কলেজ, প্রোফেসর সব কাজ করে অথচ কি পবিত্র। যাদের পয়সা আছে, তারা দিন রাত্র গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে। আমরা কি মা..., বাবাজি? মনু বলেছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ",—ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করে বিদ্যা শিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি কর্‌ছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশু-জন্ম ঘুচিবে না।

দ্বিতীয় দরিদ্র লোক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচ-কুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, Opportunities আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান্ হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে

দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড় ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতে দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান্, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমার বাড়ীর চারি দিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বল্‌তে পার? তোমরা তাদের ছোঁওনা, দূর দূর কর, আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফির্‌ছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি কর্‌ছেন? খালি বল্‌ছেন, ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। এমন সনাতন ধর্ম্মকে কি করে ফেলেছে। এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা।

আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখ্‌তে নয়, তামাসা দেখ্‌তে নয়, নাম কর্‌তে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখ্‌তে। সে উপায় কি, পরে জান্‌তে পার্‌বে, যদি ভগবান্ সহায় হন।

এদের অনেক দোষও আছে। ফল এই ধর্ম্ম বিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নীচে আর সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চ। এদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব আর এদের আমাদের অদ্ভুত ধর্ম্ম শিক্ষা দিব।

কবে দেশে যাব জানিনা, প্রভুর ইচ্ছা বলবান। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি বিবেকানন্দ।

পথঘাট পরিষ্কার রাখিবার প্রস্তাব।

(নারীগণের প্রতি নারীর উক্তি)

প্রাতঃকালে ফকীরেরা আমাদের দুয়ারে আসিয়া গাহিয়া যায়,—

সকাল বেলা ছড়া ঝাঁট সন্ধ্যাবেলা বাতি।
লক্ষ্মী বলেন সেইখানেতে আমারই বসতি॥

গিন্নীরা আদর করিয়া ভিক্ষা দেন আর এই উপদেশপূর্ণ শ্লোকটি বউ ঝিকে শোনান। ঘর দোর পরিষ্কার রাখা যে কত প্রয়োজনীয়, এ কথা আমরা বাল্যকাল হইতে শিখি। ঘর সাজান, যথাস্থানে যথাযোগ্য সামগ্রী

রাখা, এখানে এটা, সেখানে সেটা না থাকে, জিনিষপত্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এ সকল আমরা নারী, আমাদের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার। ঘর দোরের পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলা দেখিতে আমরা ভালবাসি এবং আয়াস-সাধ্য ও সময়ব্যয় হইলেও, সে কার্য্যে যত্নশীল হইতে আমরা কুণ্ঠিত হই না। কেন? ইহার কি প্রয়োজন? তাহা জানি বা না জানি, পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা আমাদের প্রিয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এই কার্য্যে পারিবারিক বিশেষ মঙ্গল। রন্ধন-পাত্রে কলঙ্ক থাকিলে ভোজ্যবস্তু বিষময় হয়। এমন কি, সেই বিষে সপরিবার বিনষ্ট হইতে পারে। চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিমাত্রেই এই কথা ভূয়োভূয়ঃ বলেন। গৃহের এক পার্শ্বে জঞ্জাল থাকিলে গৃহ এরূপ দূষিত হয়, যে, তাহাতে ওলাউঠা ও প্লেগ উৎপন্ন হয়। যিনি জঞ্জাল রাখেন, তিনি তাঁহার গৃহে ঐ সকল উৎকট রোগকে যত্নপূর্ব্বক স্থান দেন। আবর্জ্জনাই উৎকট রোগের সুখশয্যা। প্রত্যূষে উঠিয়া,গৃহদ্বার গবাক্ষাদি মুক্ত করিয়া সূর্য্য দর্শন করি। গৃহে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে, ধীরে ধীরে বায়ু বহিতে থাকে, গৃহদ্রব্যাদি সূর্য্যোদ্দীপ্ত ও পরিশুষ্ক হয়, গৃহ আনন্দধাম হইয়া উঠে। যে গৃহে সূর্য্য প্রবেশ করে না, প্রভাত বায়ু বহে না, তাহার অবস্থা বড় শোচনীয়, সে গৃহ স্যাঁতসেঁতে, অপরিচ্ছন্ন ও পীড়ার আবাস-ভূমি হয়। একটী ডাকের বচন আছে,——

পূবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ।
দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে, বাড়ী করগে ভেড়ের ভেড়ে॥

বচনটীর সার্থকতা এই, পূর্ব্বদিক মুক্ত থাকিলে গৃহে আলোক প্রবেশ করিবে, পশ্চিমে পড়ন্ত রৌদ্র পীড়িত করিবে না, উত্তরে তীব্র বায়ু দেহে বিদ্ধ হইবে না, দক্ষিণ পবনে শরীর স্নিগ্ধ হইবে। পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন হইবে। যে গৃহে স্বাস্থ্য নাই, তথায় লক্ষ্মী নাই। যথায় রোগ শোক, তথায় উপার্জ্জন কোথায়? যাহাতে পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যবর্দ্ধন হয়, এরূপ কার্য্য আমাদের ভার, আমরা আহ্লাদের সহিত সে ভার বহন করি। আমাদের প্রিয়জনের মঙ্গল-সাধন ইচ্ছায় জীবন উৎসর্গ করিয়া, গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে আমরা কুলাঙ্গনা মাত্রেই প্রস্তুত।

কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজগৃহ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে যেরূপ যত্নশীল, পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যরক্ষায় যেরূপ লক্ষ্য, সাধারণের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে ও সহরের পারিপাট্য সম্বন্ধে সেরূপ যত্ন ও লক্ষ্য নাই। কিন্তু ভাবিয়া

দেখিলে বুঝা যায় যে, সাধারণের স্বাস্থ্য ও সহরের পারিপাট্যরক্ষা আমাদের ও আমাদের পরিবারবর্গেরই সম্পূর্ণ প্রয়োজন। যে পথে আমরা গঙ্গা স্নানে যাই, তাহা যদি যথানিয়মে পরিষ্কৃত না হয়, তাহা যদি আবর্জ্জনা, পূতি ও অশুচি দ্রব্যে বিকৃত ও বীভৎস অবস্থায় থাকে, তাহাতে আমাদের বিপদ্। যখন ঐ অপরিচ্ছন্নতাজনিত, পল্লীস্থিত কোনও গৃহস্থের আবাস প্লেগের কুৎসিত পক্ষাচ্ছাদিত হইয়া অন্ধকারময় হয়, তখন কি আমাদের পরিজন ও সন্তানবর্গের সঙ্কট উপস্থিত নয়? জীবনে মরণে মনুষ্যের দায়িত্ব কেবল আপনার ও আপনার পরিবারের নিমিত্ত নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল বা অমঙ্গলে, সমাজের মঙ্গল বা অমঙ্গল।

আমাদের নিজ নিজ গৃহ আমাদের প্রিয় রাজ্য। আমাদের গৃহ-রক্ষার গৌরব তথায় রাজ্ঞীর ন্যায় বিরাজিত, তথায় সকলই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু পবিত্র ব্রহ্মমূর্ত্তি উদয় কালীন যখন স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করি, তখন যদি পথ ঘাট, আমাদের গৃহের ন্যায় পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর দেখিতে পাই, তাহাতে কি আমাদের আনন্দ হয় না? যখন ইষ্টমূর্ত্তির উচ্চ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আসিতেছি, পথ ঘাট শুচি অবস্থায় থাকিলে সেই উচ্চ ধ্যানের যে সহকারী হয়, তাহা কুলস্ত্রী মাত্রেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। এই নিমিত্ত মঙ্গলময়ী জননী তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গণের ন্যায়, পথ ঘাট পরিমার্জ্জিত দেখিতে ইচ্ছা করিবেন। এ শুভ ইচ্ছা কি সুসম্পন্ন হয় না? পথ ঘাট মার্জ্জিত রাখিতে আমাদের সাহায্যের কি প্রয়োজন? যদি সরকারী সমার্জ্জনকারীদের কার্য্যের উপর আমাদের লক্ষ্য থাকে, কিরূপ কার্য্য হইতেছে আমরা দেখি, তাহা হইলে তাহারা অচিরে বুঝিতে পারিবে ও নিজকার্য্যে সমধিক মনোনিবেশ করিবে। যদি পল্লীস্থ সকলে প্রতিনিয়ত আন্দোলন করতঃ যাহা ত্রুটি হইতেছে, স্থির করি এবং মিউনিসিপাল সভায়, যাঁহাদের উপর কার্য্যভার অর্পিত, আমাদের যাহা ন্যায্য প্রয়োজন, জ্ঞাপন করি—বাধ্য হইয়া সেই মিউনিসিপাল সভা আমাদের প্রস্তাব শুনিবেন। সরকারী পথ যদি ভালরূপে সম্মার্জ্জিত না হয়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা কতক পরিমাণে আমাদের দোষে, ও সে দোষ সহজেই সংশোধিত হইতে পারে। যে সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অতি সামান্য আয়াসসাধ্য।

প্রত্যুষে ৫টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পথের আবর্জ্জনা স্থানান্তরিত করিবার জন্য ময়লা গাড়ি ঘুরিয়া যায়। গৃহস্থের রন্ধনশালার আবর্জ্জনা, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, পাতা

ডাঁটা, এটা সেটা পরিত্যক্ত ভোজ্য, ভগ্ন পাত্র প্রভৃতি প্রতিদিন গৃহের বহি-র্দ্দেশে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে নিক্ষেপ করা উচিত। কাহারও কাহারও অমনোযোগ বশতঃ ময়লাফেলা গাড়ি আসিবার অগ্রে ঐ সকল আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হয় না। প্রতি ভোজের পর উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি দাস দাসীরা পথে আনিয়া ফেলে, সুতরাং রাস্তার অবস্থাও শোচনীয় হয়। এই বীভৎস দৃশ্য দূর করা, দাস দাসীকে নিবারণ করিলে অতি সহজ হইতে পারে। আমরা অনেক ত্যজ্য বস্তু অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে পারি। দুইটী বস্তু দগ্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজন। ঐ দুইটী বস্তু কখনই রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রথম,—ছিন্ন কাগজ খণ্ড। ছিন্নকাগজখণ্ডে আবৃত পথ সমার্জ্জিত করা অতি কঠিন। যে কুলাঙ্গনা তাহা দেখেন নাই, তাঁহার বিশ্বাস হইবে না। ঐ কাগজখণ্ড একেবারে পরিষ্কার করিয়া লইয়া যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। হেতায় সেথায় ছিন্ন কাগজ গলিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, এ দৃশ্য অতি ঘৃণিত। উহা দগ্ধ করিলে এরূপ জঞ্জাল হয় না। দ্বিতীয় বস্তু চিকিৎসার আবর্জ্জনা ; ইহা দগ্ধ করা অতীব কর্ত্তব্য, যথা বাড বাঁধার চিড, পুলটীস, দেহস্থ দুষ্ট দ্রব্য। এ সকল যদি পুড়াইয়া ফেলা না হয়, অপরের বিপদের কারণ হইয়া উঠে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

দেবার্চ্চনায় অর্পিত পুষ্প, পবিত্র অগ্নিব্যতীত রাখিবার আর স্থান কোথায়? প্রতিগৃহে জ্বালানি কাষ্ঠ বা কয়লা সচ্ছল না হইতে পারে সত্য, কিন্তু অবস্থা-গত যাহা হিতকর কার্য্য, তাহা করিতে পারি নিশ্চিত। আমরা কি পরিষ্কার ছাই, চূণ ও আলকাতরা যেরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত, সেইরূপে ব্যবহার করি? অনেক গৃহের আবর্জ্জনা রাখা হইয়া রাস্তার ধারে রাখিতে হয়। যথায় শুষ্ক মৃত্তিকা, তথায় রাখিলে, তাহা পরিষ্কার করিবার সুবিধা। অনেকে তাঁহাদের আবর্জ্জনা, যে গলিতে মেথর আনাগোনা করে, সেই গলির কোণে বা যথায় জলের নল ফাটিয়া গিয়া জল বাহির হইতেছে, সেই খানে রাখে। তাহাতে ঐ জঞ্জাল হইতে দুষ্টরস মৃত্তিকায় শোষিত হয় এবং শীঘ্রই তাহা অধিকতর কদর্য্য ও দুর্গন্ধময় হয়। কিন্তু ঐ সকল অবস্থায় শুষ্ক চূণ বা ভস্ম, মৃত্তিকা ও আবর্জ্জনার মধ্যে রাখা প্রয়োজন। জঞ্জালবহনের ঝুড়ির অভ্যন্তর আলকাতরা দ্বারা কঠিন করা উচিত এবং জঞ্জাল বহনের পর প্রতিদিন তাহাতে ছাই দেওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা ঝুড়ি অপরিষ্কৃত হইতে পারে না এবং পূতিদ্রব্য তাহাতে থাকে না। আমাদের বসুপাড়ায় দুই

তিনটী আবর্জ্জনা রাখিবার আধার আছে। নিকটস্থ আধারে দৈনিক যে সকল আবর্জ্জনা জমে, তাহা সহজেই নিক্ষেপ করা যায়। এই উপায় অবলম্বনে ময়লা বহনের কার্য্য অতি সহজ হয় এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার আশা করা যায়। কিন্তু যদি ঐরূপে জঞ্জাল ফেলিবার আধার ব্যবহৃত না হয়, সকলে যদি এরূপ কার্য্য না করেন, তাহাহইলে আমাদের পরিচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপ বিফল হইবে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বৃন্দাবন বসুর লেনে, ১ নং ওযার্ডের স্বাস্থ্যরক্ষার আফিস আছে। তাহার কর্ম্মচারীরা বসুপাড়ার পরিমার্জ্জন সম্বন্ধে যাহা অভাব, তাহা শুনিতে প্রস্তুত এবং তাহা পূরণ করিতে সম্পূর্ণ সম্মত। ১৭ নং বসুপাড়া লেনে যাহার যাহা অভিপ্রায, লিখিয়া পাঠাইয়া দিলে তাহা ঐ আফিসে জানান হইবে। আমার নিশ্চিত ধারণা, যদি আমরা সাধারণের পথ-ঘাটের পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন সম্পূর্ণ অনুধাবন করি এবং যথাসাধ্য আমাদের পল্লীতে এ বিষয়ের উন্নতি সাধনের চেষ্টা পাই, তাহাতে রাস্তা ও গলি, যথায় হিন্দুর আবাস আছে, সত্বরে সমধিক পরিচ্ছন্ন হইবে এবং এরূপ অবস্থা দৃষ্টে চিত্তপ্রসাদ লাভ করিব।

নিবেদিতা। ১৭ নং বসুপাড়া লেন, কলিকাতা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে বিগত ২৫শে জুন ও ২রা জুলাই মান্দ্রাজ মঠের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

জুলাই মাসের ডন পত্রিকায় মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য জাতীয় উপায়ে সমাজসংস্কার নামক একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধলেখকের মতে নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করিলে হিন্দুসমাজের সংস্কারকার্য্য অতি সহজসাধ্য হইতে পারে। (১) প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষিত পণ্ডিত মণ্ডলীকে আধুনিক উদার শিক্ষাপ্রদান (২) নব্যশিক্ষিতগণকে প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্মে শিক্ষিত করা। (৩) প্রাচীন ও নব্য তন্ত্রের শিক্ষিতগণের মধ্যে মধ্যে সম্মিলন দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির ভাব দৃঢ়ীকরণ (৪) অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও পাশ্চাত্যজ্ঞান বিস্তারের জন্য প্রচারকমণ্ডলী গঠন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

উদ্বোধনের ৭ম নিয়মানুসারে আমরা বৎসরের যে সময়েই হউক এক মাস ছুটি লইতে পারি। তদনুসারে ১লা ভাদ্রের উদ্বোধন আপাততঃ বন্ধ থাকিল। পরে আর এক পক্ষের জন্য ছুটি লওয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। *

(শ্রীম—কথিত।)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে; কলিকাতায় চৈতন্যলীলাদর্শন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(রাখাল, নারাণ, নৃত্যগোপাল ও ছোটগোপালের সংবাদ।)

আজ রবিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৮৮৪। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন। রাম, মহেন্দ্র (মুখুয্যে), চুনিলাল, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন।

চুনিলাল সবে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে তিনি ও রাখাল, বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন। রাখাল ও বলরাম এখনও ফেরেন নাই। নৃত্যগোপালও বৃন্দাবনে আছেন। ঠাকুর, চুনিলালের সহিত বৃন্দাবনের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাখাল কেমন আছে?

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম ভাগ, মূল্য এক টাকা, বাঁধান মূল্য পাঁচ সিকা। ঠিকানা—শ্রীশান্তিরাম ঘোষ, ৫৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার বা শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্ত, ১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত দ্বিতীয় ভাগ যন্ত্রস্থ।

চুনি। আজ্ঞে, তিনি এখন আছেন ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিত্যগোপাল আসবেনা?

চুনি। এখনও সেখানে আছেন দেখে এয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার পরিবারবর্গ কার সঙ্গে আসছে?

চুনি। বলরাম বাবু বলেছেন, ভাল উপযুক্ত লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। নাম দেন নাই।

ঠাকুর মহেন্দ্র মুখুয্যের সঙ্গে নারাণের কথা কহিতে লাগিলেন। নারাণ স্কুলে পড়ে। ১৬।১৭ বৎসর বয়স। ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে আসে। ঠাকুর বড় ভালবাসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। খুব সরল, না?

'সরল' এইকথা বলিতে বলিতে ঠাকুর যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন।

মহেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, খুব সরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তার মা সেদিন এসেছিল। অভিমানী দেখে ভয় হলো। তার পর তোমরা এখানে আসো, কাপ্তেন আসে, এসব সেদিন দেখতে পেলে। তখন অবশ্য ভাবলে যে, শুধু নারাণ আসে আর আমি আসি, তা নয়। (সকলের হাস্য)।

"মিছরি এখানে ছিল, তা দেখে বল্‌লে, বেশ মিছরি। তবেই জান্‌লে, খাবার দাবার কোন অসুবিধা নাই।

"তাদের সামনে বুঝি বাবুরামকে বল্‌লুম, নারাণের জন্য আর তোর জন্য এই সন্দেশ গুলি রেখে দে।

"তার পর গণির মা ওরা সব বল্‌লে, মাগো, নৌকা ভাড়ার জন্য যা করে।

"তারপর আমায় বল্‌লে যে, আপনি নারাণকে বলুন, যাতে বিয়ে করে। সেকথায় বল্লুম, ও সব অদৃষ্টের কথা। ওতে কথা দেবো কেন? (সকলের হাস্য।)

"ভাল করে পড়াশুনো করে না; তাই বল্‌লে, আপনি বলুন, যাতে ভাল করে পড়ে। আমি বল্‌লুম, পড়িস্‌রে। তখন আবার বলে, একটু ভাল করে বলুন। (সকলের হাস্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (চুনির প্রতি)। হাঁগা, গোপাল আসে না কেন?

চুনি। রক্ত আমেশা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওষুধ খাচ্চে?

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও থিয়েটার (theatre) , মহাভাব ও বেশ্যার অভিনয়।)

ঠাকুর আজ কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন। ষ্টার থিযেটারের তখন যেখানে অভিনয় হইত, আজ কাল সেখানে ক্লাসিক থিযেটার হয। মহেন্দ্র মুখুয্যের সঙ্গে তাঁহার গাড়ি করিযা অভিনয দেখিতে যাইবেন। কোন্‌খানে বসিলে ভাল দেখা যায, সেই কথা হইতে লাগিল। কেউ কেউ বল্‌লেন, এক টাকার সিটে বস্‌লে বেশ দেখা যায়। রাম বল্‌লেন, কেন, উনি বক্সে (Box) বস্‌বেন।

ঠাকুব হাসিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, বেশ্যারা অভিনয় করে। চৈতন্যদেব, নিতাই এসব অভিনয তারা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদেব প্রতি)। আমি তাদেব মা আনন্দময়ী দেখ্‌বো।

"তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই বা। শোলার আতা দেখ্‌লে সত্যকার আতা উদ্দীপন হয়।

"একজন ভক্ত রাস্তায় যেতে যেতে দেখে, কতকগুলি বাবলা গাছ রয়েছে। সেই গাছ দেখে ভক্তটি একেবারে ভাবাবিষ্ট। তার মনে হযেছিল যে, ঐ কাটে শ্যামসুন্দরের বাগানের কোদালের বেশ বাট হয়। অমনি শ্যামসুন্দরকে মনে পড়েছে।

"যখন গড়েব মাঠে বেলুন ওঠা দেখ্‌তে আমায নিযে গিছিল, তখন একটি সাহেবেব ছেলে একটা গাছ ঠেসান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখাও যা, অমনি কৃষ্ণের উদ্দীপন হলো. অমনি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম।

"চৈতন্যদেব মেড়গাঁ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, এই গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ের হয়। যাই শোনা, অমনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন।

"শ্রীমতী মেঘ কি ময়ূরের কণ্ঠ দেখ্‌লে আর স্থির থাক্‌তে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে বাহ্যশূন্য হযে যেতেন।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন।

"শ্রীমতীর মহাভাব। গোপীপ্রেমে কোন কামনা নাই। ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করে না। কেবল শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করে; কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছু চায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(ঈশ্বরলাভ ও অষ্টসিদ্ধি। সিদ্ধাই ও অহঙ্কার।)

"সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল। ন্যাংটা আমায় শেখালে;—একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এলো। ঝড়ে তার কষ্ট হলো বলে সে বল্‌লে, ঝড় থেমে যাক। তার বাক্য মিথ্যা হবার নয়। একখানা জাহাজ পালভরে যাচ্ছিল। ঝড় হঠাৎ থামাও যা, আর জাহাজ টুপ করে ডুবে গেল। এক জাহাজ লোক সেই সঙ্গে ডুবে গেল। এখন এত গুলি লোক যাওয়াতে যে পাপ হলো, সব ওর হলো। সেই পাপে সিদ্ধাইও গেল, আবার নরকও হলো।

"একটি সাধুর খুব সিদ্ধাই হয়েছিল আর সেই জন্য অহঙ্কারও হয়েছিল। কিন্তু সাধুটি লোক ভাল ছিল আর তার তপস্যাও ছিল। ভগবান্ ছদ্মবেশে সাধুর বেশ ধরে একদিন তার কাছে এলেন। এসে তার কাছে বল্লেন, মহারাজ, শুনেছি, তোমার খুব সিদ্ধাই হয়েছে, সাধু খাতির করে তাঁকে বসালেন। এমন সময় একটা হাতি সেখান দিয়ে যাচ্ছে। তখন নূতন সাধুটি বল্‌লেন, আচ্ছা মহারাজ, আপনি মনে কর্‌লে এই হাতিটাকে মেরে ফেল্‌তে পারেন? সাধু বল্‌লেন,'য্যাসা হোনে শক্তা,' এই বলে ধূলো পড়ে হাতিটার গায়ে দেয়াতে সে ছটফট করে মরে গেল। তখন যে সাধুটি এসেছে, সে বল্‌লে, আপনার কি শক্তি! হাতিটাকে মেরে ফেল্‌লেন। সে হাঁস্‌তে লাগ্‌লো। তখন ও সাধুটি বল্‌লে, আচ্ছা, হাতিটাকে আবার বাঁচাতে পারেন? সে বল্‌লে, 'ওভি হোনে শক্তাহে।' এই বলে আবার যাই ধূলো পড়ে দিলে, অমনি হাতিটা ধড়মড় করে উঠে পড়্‌লো। তখন এ সাধুটি বল্‌লে, আপনার কি শক্তি! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি এই যে হাতি মার্‌লেন, আর হাতি বাঁচালেন, কিন্তু আপনার কি হলো? নিজের কি উন্নতি হলো? এতে কি আপনি ভগবান্‌কে পেলেন? এই বলিয়া ও সাধুটি অন্তর্দ্ধান কর্‌লেন।

"ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি। একটু কামনা থাক্‌লে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ছুঁচের ভিতর সুতো যাওয়া একটু বোঁ থাক্‌লে হয় না।

"কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, ভাই, আমাকে যদি লাভ কর্‌তে চাও, তা হলে অষ্ট সিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাক্‌লে হবেনা।

"কি জান? সিদ্ধাই থাক্‌লে অহঙ্কার হয়, তখন ঈশ্বরকে ভুলে যায়।

"একজন বাবু এসেছিল—ট্যারা। বলে, আপনি পরমহংস, তা বেশ, একটু স্বস্ত্যয়ন কর্‌তে হবে। কি হীনবুদ্ধি! পরমহংস আবার স্বস্ত্যয়ন কর্‌তে হবে।

"স্বস্ত্যয়ন করে ভাল করা, সিদ্ধাই। অহংকারে ঈশ্বর লাভ হয় না। অহংকার কিরূপ জান? যেন উঁচু ঢিপি, বৃষ্টির জল জমেনা, গড়িয়ে যায়। নীচু জমিতে জল জমে আর অঙ্কুর হয়; তারপর গাছ হয়; তারপর ফল হয়।

"হাজরাকে তাই বলি, আমি বুঝিছি, আর সব বোকা, এ বুদ্ধি করোনা।

"সকলকে ভাল বাস্‌তে হয়। কেউ পর নয়। সর্ব্বভূতে সেই হরিই আছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। প্রহ্লাদকে ঠাকুর বল্‌লেন, তুমি বর নাও। প্রহ্লাদ বল্‌লেন, আপনার দর্শন পেয়েছি আমার আর কিছু দরকার নাই। ঠাকুর ছাড়্‌লেন না। তখন প্রহ্লাদ বল্‌লেন, যদি বর দেবে, তবে এই বর দেও, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে, তাদের অপরাধ না হয়।

"এর মানে এই যে, হরি একরূপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের কষ্ট দিলে হরির কষ্ট হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও জ্ঞানোন্মাদ। জ্ঞানোন্মাদ ও জাতিবিচার।]

"শ্রীমতীর প্রেমোন্মাদ। আবার ভক্তি উন্মাদ আছে। যেমন হনুমানের। সীতা আগুনে প্রবেশ করেছে দেখে রামকে মার্‌তে যায়। আবার আছে জ্ঞানোন্মাদ। এক জন জ্ঞানী পাগলের মত দেখিছিলাম। কালীবাড়ির সবে প্রতিষ্ঠার পর। লোকে বল্‌লে, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সভার একজন। এক পায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি আর একটি ভাঁড়, আঁবচারা। গঙ্গায় ডুব দিলে। তারপর কালীঘরে গেল। হলধারী তখন কালীঘরে বসে আছে। তারপর মত্ত হয়ে স্তব কর্‌তে লাগ্‌লো।

স্তব।

ক্ষ্রোং ক্ষ্রোং খট্টাঙ্গধারিণীং ইত্যাদি।

"কুকুরের কাছে গিয়ে কা'ন ধরে তার উচ্ছিষ্ট খেলে,—কুকুর কিছু বলে নাই।

"আমারও তখন এই অবস্থা আরম্ভ হয়েছে। আমি হৃদের গলা ধরে বল্‌লাম, ওরে হৃদে, আমারও কি ওই দশা হবে?

"আমার উন্মাদ অবস্থা। নারাণ শাস্ত্রী এসে দেখ্‌লে, একটা বাঁশ ঘাড়ে করি বেড়াচ্ছি। তখন সে লোকেদের কাছে বল্‌লে, ওহ উন্মত্ত হ্যায়।

"সে অবস্থায় জাত বিচার কিছু থাক্‌তোনা। একজন নীচ জাতি, তার মাগ শাক রেঁদে আমায় পাঠাতো, আমি খেতুম।

"কালী বাড়িতে কাঙ্গালিরা খেয়ে গেল, তাদের পাতা মাথায় আর মুখে ঠেকালুম। হলধারী তখন আমায় বল্‌লে,তুই করছিস কি? কাঙ্গালীদের এঁটো খেলি; তোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে কেমন করে? আমার তখন রাগ হলো। হলধারী আমার দাদা হয়। তা হলে কি হয়? তাকে বল্‌লাম, তবেরে শালা, তুমি না গীতা, বেদান্ত পড়? তুমি না শেখাও, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যে? আমার আবার ছেলেপুলে হবে তুমি ঠাউরেছ! তোর গীতা-পাঠের মুখে আগুণ।

(মাষ্টারের প্রতি)। দেখ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বল্‌তে পারে, হাতে আনা বড় শক্ত।

ঠাকুর আবার নিজের জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

"সেজো বাবুর সঙ্গে কদিন বজরা করে হাওয়া খেতে গেলাম। সেই যাত্রায় নবদ্বীপেও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখ্‌লাম, মাঝিরা রাঁধ্‌ছে। তাদের কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি। সেজোবাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লে, বাবা, ওখানে কি কর্‌ছো? আমি বল্‌লাম, মাঝিরা বেশ রাঁধ্‌ছে। সেজো বাবু বুঝেছে যে, ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন। তাই বল্লে, বাবা, সরে এসো।

"এখন কিন্তু আর পারি না। সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাবো।

"কি অবস্থা সব গেছে! দেশে চিনে স্যাকরা আর আর সমবয়সীদের বল্‌লাম, ওরে তোদের পায়ে পড়ি, তোরা একবার হরিবোল বল্। সকলের পায়ে পড়্‌তে যাই,তখন চিনে বল্‌লে, 'ওরে, তোর এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠ্‌লে যখন ধূলা ওড়ে, তখন আম গাছ, তেঁতুল গাছ সব এক বোধ হয়। এটা আঁব গাছ, এটা তেঁতুল গাছ, চেনা যায় না।'"

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ; সংসারী ও সর্ব্বত্যাগী।)

একজন ভক্ত। এই ভক্তি উন্মাদ কি প্রেম উন্মাদ কি জ্ঞান উন্মাদ সংসারী লোকের হলে কেমন করে চল্‌বে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সংসারী ভক্ত দৃষ্টে) যোগী দুরকম। ব্যক্ত যোগী আর গুপ্ত যোগী। সংসারে গুপ্ত যোগী। কেউ তাকে টের পায় না। সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয়।

রাম। আপনার ছেলে ভুলোনো কথা। সংসারে জ্ঞানী হতে পারে, বিজ্ঞানী হতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শেষে বিজ্ঞানী হয় হবে। জোর করে সংসার থেকে চলে আসা ভাল নয়।

রাম। কেশব সেন বল্‌তেন, ওঁর (পরমহংসদেবের) কাছে লোকে অত যায় কেন? একদিন কুটুস করে কাম্‌ড়াবেন, তখন পালিয়ে আস্‌তে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কুটুস করে কেন কাম্‌ড়াব? আমি ত লোকেদের বলি, এও কর ওও কর, সংসার ও কর ঈশ্বরকেও ডাক। আমি ত সব ত্যাগ কর্‌তে বলি না।

(সহাস্যে)। "কেশব সেন একদিন লেক্‌চার দিলে, বল্লে, হে ঈশ্বর, এই কর, যেন আমরা ভক্তিনদীতে ডুব দিতে পারি আর ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে পড়ি। মেয়েরা সব চিকের ভিতরে ছিল। আমি কেশবকে বল্‌লাম, একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে? তাহলে এঁদের (মেয়েদের) দশা কি হবে? এক একবার আড়ায় উঠো আবার ডুব দিও আবার উঠো। কেশব আর সকলে হাঁস্‌তে লাগ্‌লো।

"হাজরা বলে, তুমি রজোগুণী লোক বড় ভালবাস। যাদের টাকা, কড়ি, মান সম্ভ্রম খুব আছে। তা যদি হলো, তবে* হরিশ, নটো ওদের ভালবাসি কেন? নরেন্দ্রকে কেন ভালবাসি? তার ত কলাপোড়া খাবার নুন নাই।

* * *

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঘরের বাহিরে আসিলেন ও মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ঝাউ তলার দিকে যাইতেছেন। একটী ভক্ত গাড়ু ও গামছা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। কলিকাতায় আজ চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন, সেই কথা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। রাম সব রজোগুণের কথা বল্‌ছে। এত বেশী দাম দিয়ে বস্‌বার কি দরকার !

Box এর টিকিট লইবার কোন দরকার নাই—এই কথা ঠাকুর বলিতেছেন।

সমাজ ও মনুষ্যত্ব।

(স্বামী বোধানন্দ)

মানুষ হতে হলে তিনটী জিনিষের দরকার—ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও শিক্ষা। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ঠিক ঠিক কর্ম্ম কি ও শিক্ষাই বা কি, তাহা ভাল রূপ অনেকেই জানেন না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "মানুষ মানে যার হুঁস আছে,"—হুঁস অর্থে জ্ঞান বা চৈতন্য। যার জ্ঞান আছে, চৈতন্য আছে, সেই মানুষ। আমরা তো সেই মানুষ, আমাদের সেই জ্ঞান, চৈতন্য কতদূর আছে, দেখা যাক্। জ্ঞান বল্‌তে বিষয় জ্ঞান বা ইন্দ্রিয় জ্ঞান নহে। কারণ, ইন্দ্রিয় জ্ঞান পশুদেরও আছে, তা হলে তো পশুরাও জ্ঞানী। জ্ঞান মানে নিজস্বরূপের অববোধ। 'আমি কি' ঠিক ঠিক জানার নাম জ্ঞান। সাধারণতঃ আমি বল্‌তে কি বুঝি? চক্ষুকর্ণহস্তপদাদিবিশিষ্ট চৌদ্দপোয়া একটী জীব শরীর মাত্র। এইটী হচ্চে স্থূলদৃষ্টিতে আমি দেখা। একটু তলিয়ে বা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায়, চৌদ্দপোয়া শরীরটাই আমি নয় ; মনবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবই মানুষ। এই সিদ্ধান্তটী বিচার দ্বারা লাভ হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা বলেন, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির উপর এক জিনিষ আছে, তাহার নাম আত্মা। এই আত্মাকে উপলব্ধি করাই যথার্থ জ্ঞান। 'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।' আত্মা উপলব্ধির বিষয়। আত্মজ্ঞান কথায় বলে প্রকাশ করা যায় না ; ইহা মন বুদ্ধির অতীত। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' মন বুদ্ধি সে অবস্থার ইয়ত্তা করিতে অক্ষম। এই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত অবস্থার সম্যক্ অনুভূতির নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান যার আছে, সেই মানুষ। এই জ্ঞান লাভের জন্য যে সাধন, তাহাই ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম বল্‌তে সাধারণতঃ আমরা কি বুঝি, তার একটু আলোচনা করা

যাক্। কতকগুলি আচার ব্যবহার, রীতিনীতি বা প্রথা সংস্কার পালন মাত্রকেই আমরা আপাততঃ ধর্ম্ম বলিয়া থাকি। শ্রাদ্ধ অশৌচ, প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা পালন, বারতিথিবিশেষে খাদ্যাখাদ্য স্নানদানাদির বিচার, উচ্চতর নীচতর জাতির মধ্যে ভক্ষ্য ভোজ্য সম্বন্ধে একান্ত ভেদ রক্ষা, বর্ণাশ্রমের উৎকর্ষতা অপকর্ষতানুসারে অধিকার তারতম্য সংস্থাপন, আহ্নিক জপাদির কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান, স্ত্রী শূদ্রাদিকে সেবা ভিন্ন অন্য ধর্ম্মে অধিকার না দেওয়া ইত্যাদি স্মার্ত্ত ও লৌকিক আচার ব্যবহারকেই আমরা ধর্ম্ম বলিয়া থাকি এবং যে ব্যক্তি এইরূপ ধর্ম্ম পালন না করেন, তাঁহাকেই আমরা নাস্তিক বা অধার্ম্মিক বলিয়া থাকি। আমাদের বৃত্তি এতই বহির্মুখী ও আমরা এমনই তামসিক যে, বাহ্যিক ধর্ম্মাড়ম্বর ও আন্তরিক ধর্ম্মভাবের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তির ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর নাই, তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সহৃদয় ও মহাত্যাগী হইলেও আমরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করি না। কিন্তু যে ব্যক্তি মস্তকে দীর্ঘ শিখা ও কপালে চন্দনাদির ফোঁটা ধারণ করিয়া কোশাকুশি ও ফুল ফলাদি উপচার যোগে বহু আড়ম্বরে পূজার অনুষ্ঠান করেন, তিনি কপট, দুরাচার, নিষ্ঠুর ও বিষয়াসক্ত হইলেও আমরা তাঁহাকে মহাধার্ম্মিক বলিয়া পূজা করি। আমরা স্থূলদর্শী, কাজেই বাহ্যাড়ম্বরে ভুলিয়া যাই।

ধর্ম্ম বাহিরের জিনিষ নয়। ইহা হৃদয়ের জিনিষ, প্রাণের জিনিষ, সন্তোষের জিনিষ। যিনি সত্য ধর্ম্মের আস্বাদ একবার পাইয়াছেন, তিনি ধন্য হইয়াছেন, কৃতার্থ হইয়াছেন ও অমরত্বের অধিকারী হইয়াছেন।

'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'

ধর্ম্মের তত্ত্ব হৃদয়ে নিহিত। মহাপুরুষেরা যে মার্গ অবলম্বন করেন, তাহাই যথার্থ পথ।

কোনও কালে কোনও অবস্থাবিশেষে কোনও বিশেষ রীতি, নীতি বা প্রথা সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে। কিন্তু অবস্থা ও কালের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও যে সেই প্রাচীন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে, তাহার তাৎপর্য্য কি? তাহাতে কোনও সুফল না হইয়া কুনীতি ও কুরীতির অভ্যুত্থান হইবারই বেশী সম্ভাবনা। ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, পুরাতন অর্থশূন্য রীতিনীতির উচ্ছেদ ও নূতন অবস্থা ও কালমূলক সুযোগ অবলম্বনে অভিনব আচার ব্যবহারের প্রচলনই জাতীয় উন্নতির মূল কারণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। রাম সব রজোগুণের কথা বল্‌ছে। এত বেশী দাম দিয়ে বসবার কি দরকার!

Box এর টিকিট লইবার কোন দরকার নাই—এই কথা ঠাকুর বলিতেছেন।

সমাজ ও মনুষ্যত্ব।

(স্বামী বোধানন্দ)

মানুষ হতে হলে তিনটী জিনিষের দরকার—ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও শিক্ষা। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ঠিক ঠিক কর্ম্ম কি ও শিক্ষাই বা কি, তাহা ভাল রূপ অনেকেই জানেন না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "মানুষ মানে যার হুঁস আছে,"—হুঁস অর্থে জ্ঞান বা চৈতন্য। যার জ্ঞান আছে, চৈতন্য আছে, সেই মানুষ। আমরা তো সেই মানুষ, আমাদের সেই জ্ঞান, চৈতন্য কতদূর আছে, দেখা যাক্। জ্ঞান বল্‌তে বিষয় জ্ঞান বা ইন্দ্রিয় জ্ঞান নহে; কারণ, ইন্দ্রিয় জ্ঞান পশুদেরও আছে, তা হলে তো পশুরাও জ্ঞানী। জ্ঞান মানে নিজস্বরূপের অববোধ। 'আমি কি' ঠিক ঠিক জানার নাম জ্ঞান। সাধারণতঃ আমি বল্‌তে কি বুঝি? চক্ষুকর্ণহস্তপদাদিবিশিষ্ট চৌদ্দপোয়া একটী জীব শরীর মাত্র। এইটী হচ্ছে স্থূলদৃষ্টিতে আমি দেখা। একটু তলিয়ে বা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায়, চৌদ্দপোয়া শরীরটাই আমি নয়; মনবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবই মানুষ। এই সিদ্ধান্তটী বিচার দ্বারা লাভ হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা বলেন, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির উপর এক জিনিষ আছে, তাহার নাম আত্মা। এই আত্মাকে উপলব্ধি করাই যথার্থ জ্ঞান। 'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।' আত্মা উপলব্ধির বিষয়। আত্মজ্ঞান কথায় বলে প্রকাশ করা যায় না; ইহা মন বুদ্ধির অতীত। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' মন বুদ্ধি সে অবস্থার ইয়ত্তা করিতে অক্ষম। এই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত অবস্থার সম্যক্ অনুভূতির নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান যার আছে, সেই মানুষ। এই জ্ঞান লাভের জন্য যে সাধন, তাহাই ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম বল্‌তে সাধারণতঃ আমরা কি বুঝি, তার একটু আলোচনা করা

যাক্। কতকগুলি আচার ব্যবহার, রীতিনীতি বা প্রথা সংস্কার পালন মাত্রকেই আমরা আপাততঃ ধর্ম্ম বলিয়া থাকি। শ্রাদ্ধ অশৌচ, প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা পালন, বারতিথিবিশেষে খাদ্যাখাদ্য স্নানদানাদির বিচার, উচ্চতর নীচতর জাতির মধ্যে ভক্ষ্য ভোজ্য সম্বন্ধে একান্ত ভেদ রক্ষা, বর্ণাশ্রমের উৎকর্ষতা অপকর্ষতানুসারে অধিকার তারতম্য সংস্থাপন, আহ্নিক জপাদির কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান, স্ত্রী শূদ্রাদিকে সেবা ভিন্ন অন্ত ধর্ম্মে অধিকার না দেওয়া ইত্যাদি স্মার্ত্ত ও লৌকিক আচার ব্যবহারকেই আমরা ধর্ম্ম বলিয়া থাকি এবং যে ব্যক্তি এইরূপ ধর্ম্ম পালন না করেন, তাঁহাকেই আমরা নাস্তিক বা অধার্ম্মিক বলিযা থাকি। আমাদের বৃত্তি এতই বহির্মুখী ও আমরা এমনই তামসিক যে, বাহ্যিক ধর্ম্মাড়ম্বর ও আন্তরিক ধর্ম্মভাবের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তির ধর্ম্মের বাহাড়ম্বর নাই, তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সহৃদয় ও মহাত্যাগী হইলেও আমরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করি না। কিন্তু যে ব্যক্তি মস্তকে দীর্ঘ শিখা ও কপালে চন্দনাদির ফোঁটা ধারণ করিয়া কোশাকুশি ও ফুল ফলাদি উপচার যোগে বহু আড়ম্বরে পূজার অনুষ্ঠান করেন, তিনি কপট, দুরাচার, নিষ্ঠুর ও বিষয়াসক্ত হইলেও আমরা তাঁহাকে মহাধার্ম্মিক বলিযা পূজা করি। আমরা স্থূলদর্শী, কাজেই বাহ্যাড়ম্বরে ভুলিয়া যাই।

ধর্ম্ম বাহিরের জিনিষ নয়। ইহা হৃদয়ের জিনিষ, প্রাণের জিনিষ, সম্ভোগের জিনিষ। যিনি সত্য ধর্ম্মের আস্বাদ একবার পাইয়াছেন, তিনি ধন্য হইয়াছেন, কৃতার্থ হইয়াছেন ও অমরত্বের অধিকারী হইয়াছেন।

'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'

ধর্ম্মের তত্ত্ব হৃদয়ে নিহিত। মহাপুরুষেরা যে মার্গ অবলম্বন করেন, তাহাই যথার্থ পথ।

কোনও কালে কোনও অবস্থাবিশেষে কোনও বিশেষ রীতি, নীতি বা প্রথা সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে। কিন্তু অবস্থা ও কালের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও যে সেই প্রাচীন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে, তাহার তাৎপর্য্য কি? তাহাতে কোনও সুফল না হইয়া কুনীতি ও কুরীতির অভ্যুত্থান হইবারই বেশী সম্ভাবনা। ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, পুরাতন অর্থশূন্য রীতিনীতির উচ্ছেদ ও নূতন অবস্থা ও কালসুলভ সুযোগ অবলম্বনে অভিনব আচার ব্যবহারের প্রচলনই জাতীয় উন্নতির মূল কারণ।

ভূয়োদর্শন দ্বারাও জানা যায় যে, প্রকৃতি নিরন্তর আপনাকে দেশ ও কালানুরূপিণী করিতেছে। বিজ্ঞানও বলেন, দেশ কাল ও নিমিত্তোপযোগী সমাজ ও ধর্ম্ম স্থাপনই জাতীয় উন্নতির নিদান। ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান যে মত একবাক্যে অনুমোদন করেন, তাহাই সমাজের কর্ত্তব্য ও অনুষ্ঠেয়।

শূদ্রদিগকে অধ্যয়ন ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার না দিবার কোন সাময়িক কারণ থাকিতে পারে। প্রাচীন কালে শূদ্রশব্দে হয়তো আধুনিক সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতির ন্যায় কোনও এক অতি অসভ্য, মূর্খ বন্যজাতি বুঝাইত। স্থূলবুদ্ধি, আচারহীন জাতির শাস্ত্রানুশীলন ও জ্ঞানচর্চ্চার বাস্তবিক অধিকার থাকিতে পারে না। ভারতের বর্ত্তমান শূদ্রগণ যে তাহাদেরই বংশধর, ইহারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। যদি তাহাদেরই বংশধর হন, তাহা হইলে কালে মার্জ্জিতবুদ্ধি ও আচারপূত হইলে তাঁহদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া রাখিবার কি আবশ্যকতা আছে? যদি তাঁহারা বেদাদির অর্থবোধে সক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অধিকার না দেওয়া কি নীচতা, বিদ্বেষভাব ও হীনবুদ্ধিতার পরিচায়ক নয়? উপযুক্তকে যোগ্যাধিকার দানে কৃপণতার কারণ কি? বোধ হয় স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন আর কিছু নয়।

যাঁহারা অধিকারবাদ লইয়া বিতণ্ডা করেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছি, হে শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ, আপনারা একবার নিজের দিকে চাহিয়া দেখুন। যে মহাপুরুষগণের নাম লইয়া আপনারা আপনাদের মর্য্যাদা বাড়াইতেছেন, সেই মহাপুরুষগণের তেজস্বিতা, ত্যাগ ও তপস্যার কি পরিমাণ আপনাদের ভিতর আছে? আপনাদের সজাতীয়গণ অবনতমস্তকে ৭৲ টাকা বেতনের পাচকের কার্য্য করে। যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া মুখে ঘৃণা করেন, ১০৲ টাকার জন্য আপনাদের আত্মীয়গণ তাহাদের দাসত্ব করিতে লালায়িত। দাস্যবৃত্তি শ্ববৃত্তি বলিয়া আপনাদের জানা আছে, কিন্তু তথাপি দেশকালানুরোধে তাহা পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দেন না। যে সনাতন বেদের উপর আপনাদের সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম স্থাপিত, আপনাদের সন্তানগণ সেই বেদমাতা গায়ত্রীর অর্থবোধ দূরে থাকুক, শুদ্ধ আবৃত্তি পর্য্যন্ত করিতে পারেন না। আপনারা যখন ত্যাগ তপস্যারূপ নিজবৃত্তি ছাড়িয়া দাস্যবৃত্তি অবলম্বনে কুণ্ঠিত নন, তখন আচারপূত, শুদ্ধচিত্ত, সত্যপিপাসু ব্রাহ্মণেতর জাতিকে স্বাধ্যায় ও তপস্যার অধিকার দিতে কাতর হন কেন? আপনারা মহানুভব পূর্ব্বপুরুষগণের

নামের গরিমা করেন মাত্র, তাঁহাদের মহত্ত্বের কণামাত্র আপনাদের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশ কালের অনুবোধে যে নিয়ম তাঁহারা তাৎকালিক সমাজশৃঙ্খলার জন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনারা সেই নিয়মটীকে বর্ত্তমান দেশকালানুবোধে একটু কোমল ও শিথিল করিতে অনিচ্ছুক কেন? এই সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে পূর্ব্বপুরুষগণের গুণের ভাগী হইতে পাবেন, তদ্বিষযে যত্নশীল হউন। আপনারা তো আপনাদিগকে দেশকালানুযাযী অবস্থার উপযোগী করিতে অনিচ্ছুক নন্। আপনাবা বলেন, এখন ইংবাজ রাজা—ইংবাজী ভাষা না শিখিলে ও ইংরাজের চাকরী না করিলে অর্থাভাবে ও অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে। বেশ কথা, যখন আপনারা দেশ কালের অনুরোধে অর্থোপার্জ্জনেব এই নিষিদ্ধ পথ অনুমোদন করিতেছেন, তখন অপবজাতিকেও ঐ নিযম অবলম্বনে জ্ঞানাধিকার দিতে কাতর হন কেন? আপনাদের স্বজাতিগণ, পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত বৃত্তি ছাড়িয়া অন্য বৃত্তি আশ্রয় করিলে আপনারা তাহাদিগকে দোষী মনে করেন না। কিন্তু অপরজাতি তাহাদের পূর্ব্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিলে আপনারা ধৈর্য্যচ্যুত হন—ইহার কারণ কি? আপনাদের কোহিনুর আপনারা রক্ষা করিতে অক্ষম হওযাতেই তো তাহা বিজাতির হস্তগত হইয়াছে। আপনাদেব পূর্ব্বপুরুষগণের শম দম তপস্যাদি সম্পত্তি আপনাবা যদি বক্ষা করিতে না পাবেন এবং আপনাদের দেশেব অপর কোন জাতি উহাদের রক্ষার নিমিত্ত অগ্রসব হন,তাহা হইলে আপনাদের উহাতে আনন্দিত হওযাই উচিত। যে বিষয় আপনাবা বক্ষা কবিতে অক্ষম, যদি অন্য কর্ত্তৃক তাহা সুরক্ষিত হয, তাহাকে উহা কবিতে দেওযা যুক্তি ও ন্যায সঙ্গত। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যে বিষযে যে অযোগ্য, সে বিষয কালক্রমে তাহাব হস্তান্তরিত হইবে। নিশ্চয জানিবেন, আপনাদেব পূর্ব্বপুরুষগণও এই নিযমানুসারেই ঐ সকল ধনে ধনী হইযাছিলেন। গুণ উপযুক্ত পাত্রকেই আশ্রয কবে। তাই বলিতেছি, অধিকারবাদ লইযা বৃথা তর্ক না কবিযা যাহাতে বর্ত্তমান সমযে আমরা জাতীয উন্নতি সাধন করিযা যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পাবি, তদ্বিষযে সকলের যত্নবান হওযা উচিত। কুসংস্কাব উঠিযা গিযা প্রকৃত শাস্ত্রার্থ যাহাতে প্রচারিত হয, বর্ত্তমান সময়ে তাহাই কবা আমাদের কর্ত্তব্য। শাস্ত্রার্থ বুঝিতে অক্ষম বলিয়াই আমাদের এত মালিন্য ও এরূপ হীনাবস্থা।

আপনারা পুত্রকন্যাগণকে অপরিণত বয়সে বিবাহ দিয়া থাকেন এবং

অনেক ভ্রমাত্মক যুক্তি দেখাইয়া আপনাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। আপনারা বলেন, বাল্য বিবাহে দাম্পত্যপ্রেম দৃঢ় হয় ও চরিত্র দোষ নিবারণ করে এবং এই যুক্তি সপ্রমাণ করিবার জন্য শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। কোনও সময়ে কোনও প্রযোজনবিশেষ সিদ্ধির জন্য বাল্য বিবাহের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা থাকিতে পারে, বর্ত্তমান সমাজে ইহার উপযোগিতা আছে কি? আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। অন্নাভাবে আমরা সর্ব্বদাই কষ্ট পাইয়া থাকি। আমাদের দেশে আহারীয় দ্রব্য যথেষ্ট উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু বিদেশীয় বাণিজ্য প্রভাবে তাহার অধিকাংশ দেশান্তরিত হয় এবং অল্প যাহা থাকে, তাহা দ্বারা আমাদের অন্নাভাব একেবারে দূর হয় না। উৎসাহ অভাবে ও পাশ্চাত্য পণ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের দেশীয় শিল্প ও ব্যবসা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। দেশীয় স্বর্ণ রৌপ্যের পরিবর্ত্তে আমরা বিদেশীয় তুচ্ছ বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি। এই অন্ন-ক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে উৎকট উৎকট পীড়া মধ্যে মধ্যে আসিয়া অনেককে গ্রাস করে। হতাবশিষ্টেরা সর্ব্বদা রোগাক্রমণ ভয়ে সশঙ্কিত। ইহার উপর পরাধীনতা। এই দারিদ্র্য, দুঃখ ও পরমুখাপেক্ষিতার কারণ কি জানেন? আমাদের দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বল বলিয়াই আমরা দরিদ্র, দুর্ব্বল বলিয়াই আমরা দুঃখী এবং দুর্ব্বল বলিয়াই আমরা পরমুখাপেক্ষী। এই দুর্ব্বলতার নাশই আমাদের সমাজের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। কি করিলে এই দুর্ব্বলতার নাশ হয়, একবার কেহ ভাবিয়াছেন কি? আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন ও আত্যন্তিক পবিত্রতা রক্ষা। বাল্যবিবাহে দাম্পত্যপ্রেম দৃঢ় হইতে পারে; কিন্তু সামান্য দাম্পত্যপ্রেমের জন্য সমাজের আবশ্যকীয় বিষয়ে রুদ্ধদৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। বাল্য বিবাহে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় হয় এবং ক্ষীণ-শরীর ও দুর্ব্বল মস্তিষ্ক বিশিষ্ট লোকের সন্ততিগণও ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়। যখন দুর্ব্বলতা নাশ ও শক্তিসঞ্চয় আমাদের প্রয়োজন, তখন বাল্যবিবাহটী বর্ত্তমান সমাজের পথ্য নহে।

যে দাম্পত্যপ্রেম ফল স্বরূপ দুর্ব্বলতা ও হীনবীর্য্যতা আনয়ন করে, তাহা লইয়া কি হইবে? বাল্য বিবাহে চরিত্র দোষ নিবারণ হয়, ইহাও ঐকান্তিক সত্য নহে। চরিত্রদোষ কাহাকে বলে? হীনবীর্য্য হওয়াই চরিত্রদোষ। অত-এব বাল্যবিবাহ চরিত্রদোষ নিবারণ না করিয়া বরং তাহার পোষকতা করে। বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদের সন্তান সন্ততিগণ প্রেমের পরিবর্ত্তে কামে দীক্ষিত

হয়। বাল্য বিবাহ বন্ধ রাখিয়া যাহাতে আমাদের সন্ততিগণ পবিত্র, চরিত্রবান্ ও বীর্য্যবান হইতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টিই আমাদের প্রয়োজন। বাল্য বিবাহ একদিকে যেমন শাস্ত্রানুমোদিত নহে, অপরদিকে তেমনি শারীরবিজ্ঞানবিরোধী। শরীরতত্ত্ববিদেরা বলেন, অস্থিপেশী, অস্থি ও যন্ত্র সমুদয় পরিপুষ্ট হইতে পুরুষের ২৫।৩০ বৎসর ও স্ত্রীলোকদিগের ১৮।১৯ বৎসর লাগে। ইহার পূর্ব্বে যদি সন্তান হয়, সে সন্তান নিশ্চয়ই দুর্ব্বল ও অল্পজীবী হইবে। অতএব সামাজিক ও আধ্যাত্মিক হিতসাধন যদি কর্ত্তব্য হয়, বাল্য বিবাহ অন্ততঃ কিছু কালের জন্য আমাদের দেশে বন্ধ রাখিতে হইবে।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আবার বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বিশেষ যত্নশীল নন। অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিলে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে। প্রধান অনিষ্ট এই,—স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে ভক্তি করিবে না, বিলাসিনী হইয়া গৃহকর্ম্ম উপেক্ষা করিবে, নির্লজ্জ হইবে এবং চরিত্রশালিনী হইতে পারিবে না। আজ কালের নূতন ধরণের স্ত্রীশিক্ষা দেখিয়া তাঁহারা এরূপ অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, ঐরূপ শিক্ষা আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার অনুরূপ নহে। উহা পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষার অনুকরণ মাত্র। কতকগুলি ইংরাজি পুস্তক মুখস্থ করার নাম শিক্ষা নয়। আমরা চাই,—আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববুদ্ধিতে প্রবুদ্ধা হউন। তাঁহারা মাতৃস্থানীয়া, যাহাতে পূর্ব্বতন ঋষিপত্নীগণের দৃষ্টান্ত দর্শনে প্রতিভাশালিনী ও তত্ত্বদর্শিনী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। যাহাতে তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতে মৈত্রেয়ী, গার্গী ও উভয়ভারতীর অনুসরণ করিতে পারেন; জ্ঞান জগতে খনা ও লীলাবতীর সদৃশী হন ও কর্ম্মজগতে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও অন্যান্য পতিব্রতাস্ত্রীর আদর্শের অনুগামিনী হন, এই বিষয়ে সাহায্য করাই আমাদের বর্ত্তমান সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য।

পুরুষের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সুবিধার জন্য তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত রাখা আমাদের মহা অন্যায়। আবার যাহাতে কুশিক্ষা প্রভাবে স্ত্রীজনোচিত লজ্জা ও ধীরতায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রগল্‌ভা ও অশান্তা না হন, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখাও কর্ত্তব্য। আমরা চাই যাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, পুরুষের ন্যায় তাঁহাদেরও অধ্যাত্ম বিদ্যার অধিকার আছে—তাঁহারাও বেদের অর্থবোধ ও মন্ত্র দর্শনে সমর্থা—এবং তাঁহারা সেই সচ্চিদানন্দময়ীর শক্তির বিকাশ

মাত্র। তাঁহাদের অন্তরে এই প্রত্যয় স্ফুরিত ও দৃঢ়ীকৃত করাই তাঁহাদের প্রধান শিক্ষা। এই আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া নিজ চরিত্র বলে তাঁহারা তাঁহাদের সন্ততিগণের চরিত্র গঠনে সহায় হয়েন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। যদি এই প্রণালীতে তাঁহারা শিক্ষিতা হন, তাহা হইলে আশা করা যাইতে পারে যে, কালে তাঁহাদের বংশধরগণ তাঁহাদেরই চরিত্রবলে বলীয়ান্, পূতচিত্ত ও নির্ভীক হইয়া ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধনে কৃতকার্য্য হইবে। এই প্রণালীতে স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষা দেওয়া বর্ত্তমান সমাজের নিতান্ত প্রয়োজন। যদি সমাজ এই বিষয়ের আবশ্যকতা এখনও না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ কোন কালে হইবে না। দিন দিন অধঃপতন হইবে।

বহু শতাব্দী ব্যাপী পরাধীনতা ও কুশিক্ষা আর্য্য সমাজকে হীনবীর্য্য ও মৃতকল্প করিয়াছে। যদি ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হয়, ভারতসন্তানগণকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। তাহাদিগকে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ হইতে হইবে। কুসংস্কার ও আলস্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরবলে জগতের কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। জীবন ধারণ করা 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' এই মহামন্ত্র জ্বলন্ত অক্ষরে হৃদয়ে হৃদয়ে লিখিয়া দিতে হইবে। যতদিন আমরা স্বার্থত্যাগী না হইতে পারিব, ততদিন নিজের বা অপরের কোন প্রকার কল্যাণ আমাদের দ্বারা সাধিত হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক প্রভৃতি কর্ম্মবীরগণের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই,—স্বার্থশূন্যতাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান ধর্ম্ম। কোন মহৎকার্য্যই বিনাত্যাগে সাধিত হয় না। নিঃস্বার্থ কর্ম্মই কৃতকার্য্যতার কারণ। এই নিঃস্বার্থ কর্ম্মে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হইবে। ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে লোকহিতের জন্য নিরন্তর কর্ম্ম করিতে হইবে। এইরূপ কর্ম্মে যদি প্রাণ যায়, তাহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতে হইবে। এই কর্ম্মযোগ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন। কাল প্রভাবে এই যোগের শক্তি নষ্ট হওয়ায় তিনিই বুদ্ধাদি বপুধারণ করিয়া ঐ যোগের সজীবতা সম্পাদনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে অবতীর্ণ হইয়া এই যোগ পুনঃ প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত আলোচনা করিলে গীতোক্ত কর্ম্মযোগ কিরূপে জীবনে

সাধন করিতে হয়, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণচরিতের কথা এইরূপ বলিতেন,—জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম্মের পরাকাষ্ঠার সমষ্টি স্বরূপ এরূপ অপূর্ব্ব পুরুষ আর মানব জাতির মধ্যে কখনই সমুদিত হন নাই। ঐতিহাসিক মহাপুরুষগণের জীবন আমরা পুস্তক পাঠ করিয়া ধারণা করি মাত্র, কিন্তু ইঁহার জীবন স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং তন্ন তন্ন পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি, ইহা সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লঙ্ঘন করে। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা অদ্বয় ব্রহ্মে সমাহিত থাকিত, দ্বৈতভাব অবলম্বনে অনাসক্ত ইন্দ্রিয়-গণ দ্বারা বাহিরের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইত। "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ ···ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্। ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু ···বর্ত্তএব চ কর্ম্মণি। ধ্যায়তীব লেলায়তীব। আপ্তকাম মহাপুরুষের কর্ম্মের কোন আবশ্যক ছিল না, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য এবং গীতোক্ত কর্ম্মযোগটী কিরূপ জীবনে সাধন করিতে হয়, দেখাইবার জন্যই যেন তিনি এই যুগে অবতীর্ণ। তাঁহার পুণ্য চরিত্র আদর্শ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগে দীক্ষিত হওয়াই আমাদের সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য।

সুশিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজের অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। শিক্ষা বলিতে কতকগুলি পুস্তক পাঠই আমরা বুঝিয়া থাকি। যে পুস্তক পড়ে না বা বিশ্ববিদ্যালযের উপাধিধারী নয়, তাহাকে আমরা অশিক্ষিত বোধে ঘৃণা করি। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা কাহাকে বলে? পুস্তক পাঠের নামই যদি শিক্ষা হয়, তবে স্বয়ং পুস্তক অপেক্ষা শিক্ষিত কে? চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের উপযুক্ত ব্যবহার ও বিষয়ে পরিচালনাই যথার্থ শিক্ষা। ইন্দ্রিয়গণ ঠিকঠিক শিক্ষিত হইলে উহাদের দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুভূতি হয়, মন ও বুদ্ধির স্ফুরণ হয়; ও চিত্তের উদারতা সম্পাদন হয়। বালকদিগকে ৫ বৎসর বয়সে স্কুলে পাঠাইয়া ১৪ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাস করাইতে পারিলেই যে খুব শিক্ষা দেওয়া হইল, তাহা নহে। ছেলেটী বিশ্ববিদ্যালযের একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বটে, কিন্তু হয়তো কি করিয়া বসিতে হয়, ভদ্রলোকের সহিত কিরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, কিরূপে খাইতে হয়, চলিতে হয়, দাঁড়াইতে হয়, তাহার কিছুই জানিল না। কাপড় বা জামা একটু ছিঁড়িয়া গেলে কেমন করিয়া সেইটাকে সেলাই করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, তাহা জানে না। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম একেবারেই বুঝিল না। পড়িবার ঘর, বিছানা, টেবিল, চেয়ার কিরূপে পরিষ্কার রাখিতে হয়, তাহা জানিল না। আত্মনির্ভর ও

আত্মসাহায্য সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই পাইল না। আবার অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া অতি অল্প বয়সে দৃষ্টিহীনতা, শিরোঘূর্ণন, অজীর্ণতা বা স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য রোগে আক্রান্ত হইল। এইরূপ শিক্ষার সাধারণ ফল তো এই। বালকটী সারা জীবনের জন্য একেবারে অকর্ম্মণ্য হইল। ২০৷২৫ টাকা বেতনের কেরাণীগিরির জন্য অতি আবশ্যকীয় বিষয়ে বালকটীকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হইল। এরূপ শিক্ষায় আবদ্ধ না রাখিয়া যদি আমরা তাহাদিগকে কি করিয়া চিন্তা করিতে হয়, কিরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়, কিরূপ করিয়া লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কেমন করিয়া দেখিতে হয়, বলিতে হয়, চলিতে হয়, বসিতে হয় ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে শিক্ষা দিই, তবে তাহাদের অশেষকল্যাণ হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী করিয়া তাহাদিগকে অলস, পরপ্রত্যাশী ও চিরদিনের জন্য রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য না করিয়া তাহাদিগকে শিল্পবিদ্যায় শিক্ষিত করিলে ভবিষ্যতে তাহারা নিজ বুদ্ধি খাটাইয়া মানুষ হইতে পারে ও অর্থাগমের নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে। ১৫৲ টাকা বেতনের কেরাণীর শারীরিক ও মানসিক দুঃখ দেখিয়া আমাদের চৈতন্য হওয়া উচিত। অনেকে এস্থলে বলিতে পারেন,বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বড় বড় সরকারী চাকরী করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায়। কিন্তু বলি, তাহা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, এবং যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে বড় বড় সরকারী চাকরী প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই যে অতি সুবিজ্ঞ ও দেশহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাও নহেন। ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পূর্ণতা লাভই যথার্থ শিক্ষা। হয়তো আমি মাসে ২ হাজার টাকা উপার্জ্জন করি কিন্তু যদি তাহার অষ্টমাংশও দেশহিতার্থে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হই, তাহাহইলে আমার শিক্ষা বা উপার্জ্জনে ফল কি হইল ? ঐরূপ শিক্ষা অপেক্ষা চিরকাল মূর্খ হইয়া কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া স্বাধীন চিন্তা ও আত্মনির্ভর শিক্ষা করা অনেক ভাল। এইরূপ শিক্ষার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। পুঁথিপড়া বিদ্যা তাঁহার কিছুই ছিলনা ; কিন্তু তাঁহার চক্ষের এরূপ শিক্ষা ছিল যে, কোন জিনিষ একবার দেখিলেই তাহার সমস্ত বুঝিয়া লইতেন। কোন লোককে দেখিবামাত্র তাহার সমস্ত হাব ভাব ও চাল চলন দেখিয়াই তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিতেন। স্বভাবের মধ্যে কত অভিনব বিষয় সন্দর্শন করিতেন। হয়তো একটি ফুল দেখিয়াই আনন্দে বিভোর হইতেন। নবদূর্ব্বাদল দেখিয়া কত ভাবের উদয় হইত। কোকিলের কুহুস্বর শুনিয়া, সংগীত শুনিয়া

কত ভাবরাশি জাগিয়া উঠিত। কোন জিনিষ স্পর্শমাত্র উহা কিরূপ জিনিষ ও কিরূপ আশ্রয় হইতে আসিয়াছে, জানিতে পারিতেন। এ সমস্ত কেবল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির শিক্ষার ফল মাত্র। এই শিক্ষা ছিল বলিয়াই তিনি এই সমস্ত গভীর সূক্ষ্ম ভাব সহজে বুঝিতে পারিতেন।

বহির্জ্জগতের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখিবার আবশ্যকতা না থাকিলেও লোকের সহিত কেমন শিষ্টাচরণ করিতেন ও কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন! শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তুল্য শিল্প-জ্ঞান আর তিনি কাহারও দেখেন নাই। তিনি বলিতেন, "তাঁহার চলা, বলা, শোয়া, বসা, দেখা,ঘরসাজান সমস্তই সুন্দর ও ভাবপূর্ণ।" অন্যায় বা অনাবশ্যক বোধে যে বিষয় ত্যাগ করিতেন, শরীর তাহা কদাচ স্পর্শ করিতে পারিত না। তাঁহার শ্রীমুখ দিয়া অসত্য কথা কদাচ নির্গত হয় নাই। কাম কাঞ্চন ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া শরীর তাহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। যেখানে ২।৩ জন লোকে বসিয়া কোন গোপনীয় কথা কহিত, সে দিকে গেলে পাছে তাহা শুনিয়া ফেলেন, পদ সে দিকে যাইতে পারিত না। তাঁহারই যথার্থ মনুষ্যোচিত শিক্ষা। যে শিক্ষা দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, মন ও বুদ্ধির স্বতন্ত্র পরিচালনা হয় ও অভিনব বিষয়ের অনুভূতি দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়, তাহাই যথার্থ শিক্ষা।

যদি আমরা জগতে কার্য্যক্ষম হইতে চাই, যদি নিজের কল্যাণ ও দশ জনের কল্যাণ সাধনই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হয়, যদি অমূল্য মনুষ্যত্ব লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহাহইলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া কর্ম্মজগতে অগ্রসর হওয়াই আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। তাই বলি, বাগ্‌বিতণ্ডা, ঈর্ষ্যাদ্বেষ, হীনবুদ্ধিতা ছাড়িয়া যাহাতে আমরা মানুষ হইতে পারি, যাহাতে আমরা আপনাদের অবস্থা বুঝিয়া তাহার প্রতীকার করিতে পারি, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে। আর ঘুমাইলে চলিবে না। দীর্ঘ নিদ্রা হইয়াছে। এখন উঠ, জাগো, মহাপুরুষের চরিত্র আদর্শ করিয়া মনুষ্যত্বলাভ কর। শক্তি লাভ করিতে হইবে। শক্তি ভিন্ন কার্য্য হয় না। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি। এই শক্তি লাভের প্রধান উপায়,—স্বার্থত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য। ত্যাগ আমাদের মূল মন্ত্র। বিনা ত্যাগে কোনও মহৎ কার্য্য সাধিত হয় নাই। মৃত্যুভয় দূর করিতে হইবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন,—"যে তালগাছের পাতা ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে হাত ছাড়িয়া দিতে পারে, সেই ধর্ম্মের অধিকারী।" এইরূপ দৃঢ়তা চাই,

অধ্যবসায চাই। "মন্ত্রম্বা সাধয়েযম্ শরীরম্ বা পাতযেযম্।" মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন, এইরূপ তীব্র অধ্যবসায ও সাহস চাই। মনুষ্যত্বলাভ করিতে হইবে। ইহার জন্য যদি শতজন্ম যায, তাহাও শ্রেযস্কর। লোকনিন্দা বা স্তুতি একেবারে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। হে বর্ত্তমান ভারতযুবকগণ, তোমাদের সম্মুখে এই মহাদায়িত্ব রহিয়াছে। তোমরা কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবুদ্ধ হও—মানুষ হও। তোমরা অতন্দ্রিত হও, শক্তিমান্ হও, ওজস্বী হও, বীর্য্যবান্ হও, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তোমরাও সেই সর্ব্বশক্তিমানের কাছে একান্তচিত্তে প্রার্থনা কর—"ওঁ তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি, ওঁ বলমসি বলম্ ময়ি ধেহি, ও বীর্য্যমসি বীর্য্যম্ ময়ি ধেহি, ওঁ ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি।"—হে তেজস্বরূপ বলস্বরূপ, বীর্য্যস্বরূপ, ওজঃস্বরূপ ভগবান্, আমাকে তেজ, বল, বীর্য্য, ওজঃ দান কর।

স্বামীজির কথা।

(শ্রীহরিপদ মিত্র।)

পূর্ব্বেই বলেছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে হিন্দু ধর্ম্ম বুঝাতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাতে স্বামীজির মত আর কাকেও দেখা যায নি। তারই দু চারটি কথা আজ উপহার দিবার ইচ্ছা। কিন্তু বুঝ্তে হবে, আমার যত-দূর স্মরণ আছে, তাই লিখ্ছি। অতএব যদি এতে কোন রূপ ভুল থাকে, তা আমার বোঝ্বার ভুল, স্বামীজির ব্যাখ্যার নয।

স্বামীজি বল্তেন,—"চেতন অচেতন, স্থূল, সূক্ষ্ম সবই, একত্বের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যত রকম রকম জিনিষ দেখ্তে লাগলো, তাদের প্রত্যেকটীকে বিভিন্ন জিনিষ মনে কোরে ভিন্নভিন্ন নাম দিলে। পরে বিচার কোরে ঐ সমস্ত জিনিষ গুলো ৬৩টা মূলদ্রব্য (Element) হোতে উৎপন্ন হযেছে, স্থির কল্লে।

"ঐ মূল দ্রব্য গুলোর মধ্যে আবার অনেকগুলো মিশ্র দ্রব্য (Compound) বোলে এখন তার সন্দেহ হযেছে। আর যখন রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) শেষ মীমাংসায পৌঁছুবে, তখন সকল জিনিষই এক জিনিষেরই অবস্থা ভেদ মাত্র বোঝা যাবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তাড়িত(Heat, light and elect-ricity) ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ বোলে সকলে জান্তো। এখন প্রমাণ হযেছে যে,

ওগুলো সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলো লোকে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর্‌লে। তার পর দেখ্‌লে যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে,—চেতন প্রাণীর ন্যায় গমন শক্তি নেই মাত্র। তখন খালি দুই শ্রেণী রইলো,—চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাবে, আমরা যাকে অচেতন বলি, তাদেরও স্বল্পবিস্তর চৈতন্য আছে।" তখন অধ্যাপক জগদীশ বসুর তাড়িত-প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতনত্ব (Response of inorganic matter to electric currents) পরীক্ষা প্রসিদ্ধ হয় নি।

"পৃথিবীতে যে উচ্চ নিম্ন জমি দেখা যায়, তাও সতত সমতল হয়ে এক-ভাবে পরিণত হবার চেষ্টা কচ্ছে। বর্ষার জলে পর্ব্বতাদি উচ্চ জমিগুলো ধুয়ে গিয়ে গহ্বর সকল পলিতে পূর্ণ হচ্ছে। একটা উষ্ণ জিনিষ কোন জায়গায় রাখ্‌লে উহা ক্রমে চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যের ন্যায় সমান উষ্ণভাব ধারণ কোত্তে চেষ্টা করে। উষ্ণতাশক্তি এইরূপে সঞ্চালন বিকীরণাদি (Conduction, convection ও radiation) উপায় অবলম্বনে সর্ব্বদা সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

"গাছের ফল ফুল পাতা শেকড় আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখ্‌লেও বাস্তবিক উহারা যে এক, বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করেছে। তিনপল কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখ্‌লে এক সাদা রং রামধনুকের সাতটা রঙের মত, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভক্ত দেখায়। সাদা চক্ষে দেখ্‌লে একই রং, আবার লাল বা নীল চসমার ভেতর দিয়ে দেখ্‌লে সমস্তই লাল বা নীল দেখায়।

"এইরূপ যাহা সত্য, তাহা এক। মায়া দ্বারা আমরা পৃথক্ পৃথক্ দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মনুষ্যের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজ্ঞান উপস্থিত হলেও মানুষ সেই সত্যটাকে ধত্তে পাচ্ছে না, দেখ্‌তে পাচ্ছে না।"

এই সব কথা শুনে আমি বল্লাম, "স্বামীজি, আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? দুখানা রেল এনে সমান্তরালে রাখ্‌লে দেখায় যেন ক্রমে এক জায়গায় মিলে গেছে। উহারই নাম Vanishing Point। মরীচিকা, রজ্জুতে অহিভ্রম প্রভৃতি Optical Delusion (দৃষ্টিবিভ্রম) সর্ব্বদাই হচ্ছে। Calcspar নামক পাথরের নীচে একটা রেখাকে Double refractionএ দুটো দেখায়। একটা উড পেন্সিল আধ গ্লাস জলে ডুবুলে পেন্সিলের জল-

মগ্ন অগটা উপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চক্ষুগুলা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা বিশিষ্ট এক একটা লেন্স (Lens) মাত্র। আমরা কোন জিনিষ যত বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাহাই তদপেক্ষা বড় দেখে থাকে, কেননা তাদের চোখের লেন্স ভিন্নশক্তিবিশিষ্ট। অতএব আমরা যাহা স্বচক্ষে দেখি, তাই যে সত্য, তারও ত প্রমাণ নেই! জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, মানুষ সত্য সত্য কোরে পাগল কিন্তু বাস্তবিক সত্য (Absolute truth) মানুষের বোঝ্‌বার ক্ষমতা নেই! কারণ, ঘটনাক্রমে বাস্তবিক সত্য মানুষের হস্তগত হলে তাই যে বাস্তবিক সত্য, এটী সে বুঝ্‌বে কি কোরে? আমাদের সমস্ত জ্ঞান Relative (আপেক্ষিক), Absolute বোঝ্‌বার ক্ষমতা নেই। অতএব Absolute ভগবান্ বা জগৎকারণকে মানুষ কখনই বুঝ্‌তে পার্‌বে না।"

স্বামীজি বল্‌লেন,—"তোমার বা সচরাচর লোকের Absolute জ্ঞান না থাক্‌তে পারে, তা বোলে কারো নেই, এ কথা কি কোরে বল? জ্ঞান এবং অজ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান বোলে দু রকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাকে জ্ঞান বল, বাস্তবিক উহা মিথ্যা জ্ঞান! সত্য জ্ঞানের উদয় হো'লে উহা অন্তর্হিত হয়, তখন সব দেখায় এক! দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞানপ্রসূত।

আমি বল্‌লাম,—"স্বামীজি! এ ত বড় ভয়ানক কথা! যদি জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান দুই জিনিষ থাকে, তা হোলে আপনি যাকে সত্যজ্ঞান ভাব্‌চেন, তাও ত মিথ্যাজ্ঞান হোতে পারে আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বল্‌চেন, তাও ত সত্য হোতে পারে।

তিনি বল্লেন,—"ঠিক বলেছ, তজ্জন্যই বেদে বিশ্বাস করা চাই। আমাদের পূর্ব্বকালের মুনিঋষিগণ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়ে ঐ অদ্বৈত সত্য অনুভব কোরে যা বোলে গেছেন, তাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, আমাদের বিচার কোরে বল্‌বার ক্ষমতা নেই। যতক্ষণ না ঐ দুই অবস্থার পারে গিয়ে দাঁড়িয়ে—ঐ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা কোরে দেখ্‌তে পার্‌বো, ততক্ষণ কেমন কোরে বোল্‌বো,—কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যে। শুদ্ধ দুটো বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হচ্ছে, এইটা বলা যেতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাক, তখন অন্যটাকে ভুল মনে হয়। স্বপ্নে হয়ত কল্‌কেতায় কেনাবেচা কল্লে, উঠে দেখ, বিছানায় শুয়ে আছ! যখন সত্যজ্ঞানের উদয় হবে, তখন এক ভিন্ন দুই

দেখ্‌বে না ও পূর্ব্বের দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা বোলে বুঝ্‌তে পার্ব্বে। কিন্তু এ সব অনেক দূরের কথা, হাতে খড়ি হতে না হতেই রামায়ণ, মহাভারত পড়্‌বার ইচ্ছা কোল্লে চোল্‌বে কেন? ধর্ম্ম অনুভবের জিনিষ, বুদ্ধি দিয়ে বোঝ্‌বার নয়। হাতে নাতে কোত্তে হবে, তবে এর সত্যাসত্য বুঝ্‌তে পার্ব্বে। একথা তোমাদের পাশ্চাত্য Chemistry (রসায়ন) Physics (পদার্থবিদ্যা) Geology (ভূতত্ত্ববিদ্যা) প্রভৃতিরও অনুমোদিত। আর দু বোতল Hydrogen (উদজন) আর এক বোতল Oxygen (অম্লজন) নিয়ে জল কৈ বল্লে কি জল হবে, না, তাদের একটা শক্ত জায়গায় রেখে Electric current (তাড়িত প্রবাহ) তার ভিতর চালিয়ে তাদের Combination (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) হোলে তবে জল দেখ্‌তে পাবে ও বুঝ্‌বে যে, জল Hydrogen ও Oxygen নামক গ্যাস হোতে উৎপন্ন। অদ্বৈত জ্ঞান উপলব্ধি কত্তে গেলেও সেইরূপ ধর্ম্মে বিশ্বাস চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণে যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশ বৎসরের অভ্যাসের ত কথাই নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্ম্মফল পিটে বাধা রয়েচে। একমুহূর্ত্ত শ্মশানবৈরাগ্য হল, আর বল্লে কি না, কৈ, আমি ত সব এক দেখ্‌ছি না।"

আমি বল্লাম,—"স্বামীজি, আপনার ও কথা সত্য হোলে যে Fatalism (অদৃষ্টবাদ) এসে পড়ে। যদি বহু জন্মের কর্ম্মফল একজন্মে যাবার নয়, তবে আর চেষ্টা আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হবে, তখন আমারও হবে।"

তিনি বল্লেন,—"তা নয়। কর্ম্মফল ত অবশ্যই ভোগ কত্তে হবে, কিন্তু অনেক কারণে ঐ সকল কর্ম্মফল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হতে পারে। ম্যাজিক লণ্ঠনের ৫০খানা ছবি ১০ মিনিটেও দেখান যায় আবার দেখাতে দেখাতে সমস্ত রাতও কাটান যায়। উহা নিজের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।"

সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধেও স্বামীজির ব্যাখ্যা অতি সুন্দর।—"সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই চেতন ও অচেতন (সুবিধার জন্য) দুইভাগে বিভক্ত। মানুষ সৃষ্ট বস্তুর চেতন ভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্ম্মের মতে ঈশ্বর আপনার মত রূপবিশিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্ম্মাণ করেছেন; কেহ বলেন,— মানুষ ল্যাজবিহীন বানর বিশেষ, কেহ বলেন, মানুষেরই কেবল বিবেচনাশক্তি আছে, কেহ বলেন, তাহার কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ

বেশী—যাহাই হউক, মানুষ প্রাণিবিশেষ ও প্রাণিসমূহ সৃষ্ট পদার্থের অংশ মাত্র, এ বিষয়ে মতভেদ নেই। এখন সৃষ্ট পদার্থ কি, বোঝবার জন্য একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংশ্লেষণ বিশ্লেষণরূপ উপায় অবলম্বন কোরে এটা কি, ওটা কি, অনুসন্ধান করতে লাগলেন; আর অন্যদিকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ হাওয়ায় ও উর্ব্বরা ভূমিতে শরীর রক্ষার জন্য যৎসামান্য সময় মাত্র ব্যয় কোরে কৌপীন পোরে প্রদীপের মিট্‌মিটে আলোয় বসে আদা জল খেয়ে বিচার কোর্‌তে লাগলেন, এমন জিনিষ কি আছে, যা জান্‌লে সব জিনিষ জানা যায় (What is that by knowing which everything will be known)। তাঁহাদের মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাযেই চার্ব্বাকের বস্তুসত্য মত (Ultra-materialistic theory) থেকে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মত পর্য্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্ম্মে পাওয়া যায়। দুইদলই ক্রমে এক জায়গায় উপস্থিত হচ্চেন ও এক কথাই এখন বল্‌তে আরম্ভ কচ্চেন। দুই দলই বল্‌চেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনির্ব্বচনীয় অনাদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশ মাত্র। কাল ও আকাশও (Time and space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক কাল, যাহার অনুভবে সূর্য্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়, ভাবিয়া দেখিলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য্য অনাদি নহে; এমন সময় অবশ্য ছিল, যখন সূর্য্যের সৃষ্টি হয়নি। আবার এমন সময় আস্‌বে, যখন আবার সূর্য্য থাক্‌বে না, ইহা নিশ্চিত। তা হলে অখণ্ড সময় একটা অনির্ব্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি? আকাশ বা অবকাশ বল্‌লে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎসম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র সৃষ্টির অংশমাত্র বৈ আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই। অতএব অনন্ত আকাশও তদ্রূপ সময়ের মত অনির্ব্বচনীয় একটী ভাব বা বস্তুবিশেষ। এখন সৌর-জগৎ ও সৃষ্টবস্তু কোথা হোতে কিরূপে এল? সাধারণতঃ আমরা কর্ত্তা ভিন্ন ক্রিয়া দেখ্‌তে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কর্ত্তা আছেন, কিন্তু তা হলে সৃষ্টিকর্ত্তারও ত সৃষ্টিকর্ত্তা আবশ্যক, তা থাক্‌তে পারে না। অতএব আদিকারণ, সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্ব্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ। অনন্তের ত বহুত্ব সম্ভবে না, তাই ঐ সকল কটি অনন্ত পদার্থই এক ও একই ঐ সকলরূপে প্রকাশিত।

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করি, "স্বামীজি, মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস, যাহা সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহা কি সত্য?" জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন, "সত্য না হবার ত কোন কারণ দেখি না। তোমাকে কেহ করুণ স্বরে মিষ্টভাষায় কোন কথা জিজ্ঞাসা কল্লে তুমি সন্তুষ্ট হও আর কঠোর তীব্রভাষায় কোন কথা বোল্লে তোমার রাগ হয়। তখন প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও যে সুললিত উত্তম শ্লোক (যাকে মন্ত্র বলে) দ্বারা সন্তুষ্ট হবেন না, তার মানে কি?"

এই সকল কথা শুনে আমি বোল্লুম, "স্বামীজি, আমার বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় তো আপনি সবই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন, এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য, আপনি বলে দিন।" তিনি বল্লেন,—"প্রথমে মনটাকে বশে আন্‌তে চেষ্টা কর, তা যে উপায়েই হোক, পরে সব আপনিই আস্‌বে। আর জেনো,—অদ্বৈত জ্ঞানটা ভারি কঠিন, জেনে রেখো যে, ঐটেই মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (highest ideal) কিন্তু ঐ লক্ষ্যে পৌছিবার পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা ও আয়োজনের আবশ্যক। সাধুসঙ্গ ও যথার্থ বৈরাগ্য ভিন্ন উহার অনুভবের অন্য উপায় নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম্ম।

(স্বামী প্রকাশানন্দ)

পূর্ণতাই জীবের চরম লক্ষ্য। ইহারই প্রেরণায় সংসারে এত উদ্যম ও উৎসাহ, এত দ্বন্দ্বের সংঘর্ষ, এত সুখের অতিশয্য ও এত দুঃখের পরাকাষ্ঠা। পূর্ণতালাভ করিতেই হইবে, নচেৎ বিরামও নাই, চেষ্টার অবসরও নাই। সর্ব্বান্তর্নিহিত পূর্ণ অদ্বিতীয় চৈতন্য আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত। তাঁহার সে চেষ্টা রোধ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। জীবের হৃদয়তন্ত্রীতে সতত 'অহমহমিতি' এই যে সুর বাজিতেছে, তাহার অর্থই হইতেছে,—প্রকট হইব, স্বমহিমা প্রকাশ করিব! জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে সকলের চেষ্টা সেই দিকে ধাবমান।

ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া মানুষ সেই চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর আবার প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রকাশসামর্থ্য সমান নয় বলিয়াই প্রত্যেক মানুষের ভাব ও রুচি এত বিভিন্ন। বিভিন্নভাবাপন্ন মানবমণ্ডলীকে সাধারণতঃ

চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ১ম জ্ঞানী, ২য় ভাবপ্রবণ বা ভক্ত, ৩য় যোগী ও ৪র্থ কর্ম্মী।

জ্ঞানী কেবল সত্য চাহেন। ভাবের উচ্ছ্বাস তাঁহার ভাল লাগে না। তিনি যুক্তি দ্বারা প্রত্যেক জিনিষ চুল চিরিয়া বিচার করিয়া তন্মধ্য হইতে অসার বাদ দিয়া সারগ্রহণে নিযুক্ত। জগতের অসারত্ব ও অস্থায়িত্ব দেখিয়া তিনি 'নিত্যো নিত্যানাং' বস্তুর অন্বেষণে অনুক্ষণ ব্যস্ত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পথে বিপদাশঙ্কা কম নহে! যথার্থ তত্ত্বান্বেষীর সংখ্যা অতি বিরল। অনেকেই এ পথে বহুদূর যাইতে না যাইতে শুষ্ক যুক্তিজালে জড়াইয়া পড়েন এবং শব্দজালরূপ মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপ অসম্পূর্ণ জ্ঞানাভিমানী জ্ঞানের বদহজমে ভক্তিপ্রেম ইত্যাদিকে মস্তিষ্কবিকৃতির পরিণাম মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পশ্চাৎপদ হন না।

ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ভাবরাজ্যেই বিচরণ করেন! তিনি প্রকৃতির মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং সকল সৌন্দর্য্যের আকর সৌম্যাতিসৌম্য ভগবান্‌কে দর্শন ও লাভ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ সতত কাঁদে। 'ভক্ত হাসে কাঁদে নাচে গায়।' ভক্ত বলেন, আমরা ক্ষুদ্র মানব, যুক্তি তর্ক করিয়া ভগবত্তত্ত্ব কিরূপে বুঝিব? যুক্তিতর্ক করিয়া বৃথা সময় ক্ষেপণেরই বা প্রয়োজন কি? 'বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি'—বিশ্বাসই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার একমাত্র মূলমন্ত্র। কিন্তু এমন সুগম পথেও বিপদের ভীষণ ছায়া দণ্ডায়মান এবং যথার্থ বিশ্বাসবান্ ভক্তের সংখ্যাও সংসারে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিপথের বিপদ্—যুক্তির উন্নত মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাস রূপ অনলে আপনাদিগকে চির আহুতি প্রদান করা। ভক্তির ঐরূপ বদহজমে জ্ঞানের গভীর তত্ত্বাদির অর্থ বুঝিতে পারা যায় না এবং ঐ সকল ভক্তেরাই জ্ঞানকে ঢেঁকির কচ্‌কচি ও নীরস প্রভৃতি বলিয়া কটাক্ষ করিয়া থাকেন!

চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা সমাধিলাভই যোগীর উদ্দেশ্য। তিনি অষ্টাঙ্গ-যোগ সাধন করিয়া মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াস করেন। এ পথের বিপদ্—উদ্দেশ্য ভুলিয়া মনেরই এক অংশের দাসত্ব করা। সংযম-সহায়ে মনোনিহিত গুপ্তশক্তিসমূহ একে একে জাগরিত হইয়া উঠে। ঐ সকল দূরদর্শনশ্রবণাদি শক্তির অসাধারণত্বে দুর্ব্বল মানব মোহিত হইয়া তল্লাভই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া থাকে এবং ঐ সকল শক্তির কিছুমাত্র

প্রকাশ আপনাতে দেখিতে পাইলে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনাকে কৃত-কৃতার্থ মনে করে। ফলে মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার কথা ভুলিয়া গিয়া মনের ঐ সকল শক্তির অধীনে অবনতমস্তকে দাসত্ব করিতে থাকে। ইহাই যোগের বদহজম। ইহা একবার আসিলে যাওয়া বড় কঠিন। ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতি তত্ত্বলাভের উপায় সমূহকে অতিতুচ্ছ মনে হয় এবং অহঙ্কারের আবরণে চক্ষু ঢাকিয়া যাওয়ায় বিপথে যাইয়া পড়িতে হয়।

কর্ম্মী,—জ্ঞান, যোগ বা ভক্তি কামনা করেন না। তিনি চাহেন কায। পরোপকারার্থে কায করিয়া জীবনপাতই তাঁহার উদ্দেশ্য। জীবের হিতার্থে কায করিয়া প্রাণ দিতে তিনি সতত প্রস্তুত। বিশ্বাস, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি অপূর্ব্ব জিনিষের সন্ধান তাঁহার নাই। তাই তিনি নিজ কর্ম্মরূপ গণ্ডীর বাহিরে আর কিছুই দেখিতে পান না। এ পথের বিপদ্—লক্ষ্য হারাইয়া কায করা বা স্বার্থপরতাকেই কার্য্যের উদ্দেশ্য স্থানে বসান। কর্ম্মের বদ্‌হজমে কর্ম্মটা যে একটা উপায়মাত্র উদ্দেশ্যে পৌঁছিবার, তাহা ভুলিয়া যাইয়া মানুষ কাযের ঝোঁকে পাগল হইয়া অনুক্ষণ কায করিতে থাকে। কর্ম্মরূপ ভূত তাহার ঘাড়ে চাপিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ অধীনে রাখিয়া যথা ইচ্ছা লইয়া বেড়ায়। ধ্যান জপ জ্ঞান ভক্তি এ সকলের সে একটা বড় আবশ্যকতা দেখে না।

জ্ঞানী জ্ঞানপথই জানেন। কেহ যদি তাঁহার মত ঐ পথের পথিক হন, তবেই তিনি সে পথের তত্ত্ব যতদূর নিজে বুঝেন, বুঝাইতে ও শিখা-ইতে পারেন। যোগ, ভক্তি এবং কর্ম্মের পথ দিয়াও মানুষ যে সত্যলাভ করিতে পারে, একথা তাঁহার অজ্ঞাত, অপরিচিত, অসম্বন্ধ বলিয়া বোধ হয়।

ভক্ত রূপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় অঙ্গ ভাসাইয়া তাহাদেরই সহায়ে ও শক্তিতে কেমনে মানুষ নির্ব্বিঘ্নে কূলে পৌঁছিতে পারে, তাহা যতদূর নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই লোককে বুঝাইতে ও শিখাইতে পারেন। অপরাপর পথ দিয়া ঐ ফললাভ করা তাঁহার বুদ্ধির অগম্য।

যোগী সংযম ও একাগ্রতাসহায়ে মনকে আয়ত্ত করিয়া শান্তিলাভ করার কথাই বুঝেন এবং যতদূর ঐ বিষয় নিজে বুঝিয়াছেন, তাহাই অপরকে বুঝান ও শিখান। সমষ্টিমনে যে আর কত বিচিত্র শক্তিপ্রকাশ বর্ত্তমান, তাহা এবং যে সকল পথ দিয়া ঐ সকল বিচিত্র প্রকাশের অনুভূতি হয়, তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগোচর।

কর্ম্মীও ঐরূপে কর্ম্ম সহায়ে আপন স্বার্থ চিরকালের মত ভাসাইয়া অগ্র-

সর হইতে জানেন। অপরাপর মত এবং পথসমূহ তাঁহার নিকট অমানিশার অন্ধকারপূর্ণ অরণ্যানীবিশেষ বলিয়া উপলব্ধ।

যিনি যে পথ জানেন, তাহারই সংবাদ তিনি দিতে পারেন। এক-পথদর্শীর জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ, একথা নিশ্চিত। তিনি যে একঘেযে, তাহাতে সন্দেহ নাই। একশ্রেণীব ব্যক্তিবাই কেবল তাঁহাদ্বাবা উপকৃত হইতে পারেন। আবাব আপনাব মতকেই একমাত্র কল্যাণপ্রদ পথ বলিযা মনে কবিযা অন্যান্য পথাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওযাও তাঁহার পক্ষে একপ্রকাব সুনিশ্চিত। জগতে যে এত গোঁড়ামী ও সাম্প্রদাযিক বিদ্বেষ, তাহার মূলে বর্ত্তমান এই একঘেযে ভাব।

সুতরাং যিনি চাবি পথেরই সন্ধান জানেন, তিনিই যে সকল ভাবেব, সকল শ্রেণীব লোকের যথার্থ কল্যাণ কবিতে পারিবেন, ইহা আব বলিতে হইবে না। জ্ঞানতত্ত্বের পথিক তাঁহাব নিকট জ্ঞানতত্ত্ব ভিক্ষা চাহিলে প্রত্যাখ্যাত হইবেন না, ভক্ত তাঁহাব নিকট যাইলে তাঁহার ভক্তি-উৎস খুলিযা যাইবে, যোগপিপাসু তাঁহাব কৃপায চিত্তসংযমাদি কবতলস্থ কবিবার উপাযের সন্ধান পাইযা কৃতার্থ হইবে এবং কর্ম্মীও কার্য্যক্ষেত্রে সেই রূপ তাঁহারই সমীপে "কর্ম্মেষু কৌশলম্" রূপ যোগোপদেশ লাভ কবিযা অপ্রতিহততেজে কর্ম্ম কবিযা সিদ্ধকাম হইবে, এবিষযে সন্দেহ নাই।

আব একটী প্রশ্ন হইতে পাবে, একপথ অবলম্বন করিযা গন্তব্য স্থানে পৌঁছানই যখন কত কঠিন, তখন জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মেব একত্র সমাবেশ এক মানবে সম্ভবপব কি? উত্তরে বলা যাইতে পাবে,—আদর্শ লইযা সন্দেহ উঠিলে মহাপুরুষগণেব জীবনই একমাত্র মীমাংসাব স্থল। মহাপুরুষগণ আদর্শ জীবন লইযা আসেন। তাঁহাদেব মহৎ জীবনেব দৃষ্টান্ত দেখিযাই সেই ছাঁচে জীবন গঠন কবিতে মানুষ চেষ্টা কবিযা থাকে এবং উহাব ফলে সেই উচ্চ আদর্শ অন্ততঃ কতক পরিমাণে প্রতিফলিত করিতে পারিবে বলিযা বিশ্বাস করিতে পারে।

কে সেই মহাপুরুষ, যাঁহার জ্বলন্ত জীবন ঐরূপ সমস্ত ভাবের, সমস্ত মতেব ও সমস্ত ধর্ম্মেব একত্র মিলন ভূমি? কে সেই বীরাগ্রণী, যিনি জগতের নামরূপাদির অনিত্যতা বিশেষরূপে হৃদযঙ্গম কবিয়া ত্যাগ বৈরাগ্যের চলমান বিগ্রহ হইযাও নাবাযণপ্রেমে এবং সেই নারাযণেব সাক্ষাৎ মূর্ত্তি মানবপ্রেমে লক্ষ লক্ষ বার জন্মমরণজরাব্যাধির সুদৃঢ় মন্দির রূপ দেহধারণ কবাই সুখের

পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করিয়াছিলেন? কে সেই 'অহেতুককৃপাসিন্ধু' যিনি জাতিবর্ণ দেশ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমভাবে সকল লোকের জুড়াইবার স্থল হইয়া অভয় বাণী দানে সকলের হৃদয়সন্তাপ দূর করিয়াছিলেন? পাঠক! বলিতে হইবে কি, দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে একবার দণ্ডায়মান হইলেই ঐ প্রশ্নের উত্তর স্বতই প্রাণে অনুভব করিবে।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের একত্র সমাবেশ ও পরাকাষ্ঠা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে কি অদ্ভুত ভাবেই বিকসিত হইয়াছিল! "সেই জ্যোতির্ম্ময় বৃক্ষে থোলো থোলো রাম ও কৃষ্ণ ঝুল্‌ছে! দেবর্ষি নারদাদি দূর হইতে ব্রহ্ম সমুদ্রের দর্শন করে এবং গর্জ্জনমাত্র শুনেই ফিরে এসেছিলেন এবং তাহারই ফলে আনন্দময় হয়ে দ্বারে দ্বারে হরিনামগান করে ঘুরেছিলেন, অন্য কোন কথা কহা তাঁহাদের অসম্ভব হয়েছিল! আর জ্ঞানগুরু মহাদেব সেই ব্রহ্মসমুদ্রের এক গণ্ডূষ মাত্র জল খেয়েই শবের মত হয়ে সমাধিস্থ পড়ে আছেন! শুকদেব প্রভৃতি সে ব্রহ্মরূপ চিনির পাহাড়ে পিঁপড়ের মত" প্রভৃতি জ্ঞানের কথা বলিতে বলিতে তিনি একদিকে যেমন ঘোর নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইতেন, তেমনি আবার অন্যদিকে ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া সুমধুর কণ্ঠে ভগবন্নামগুণগানে পাষণ্ডের মরুভূমি প্রাণেও ভক্তির প্রবলবন্যা বহাইয়া দিতেন! আবার কত দিনই না যোগবিভূতিমণ্ডিত সেই প্রশান্ত মহাপুরুষ প্রাতঃকাল হইতে প্রায় রাত্রিশেষ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ঈশ্বরীয় যোগের কথায় সমাগত ব্যক্তিসকলকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন! শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন চিকিৎসকেরা যখন তাঁহাকে বাক্যমাত্র উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, জীবকল্যাণে উৎসর্গীকৃতজীবন সেই মহাপুরুষের তখনই কি ঈশ্বরীয় কথার বিরাম ছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনরূপ অপূর্ব্ব ছাঁচে গঠিতপ্রাণ পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্মের কেমন একত্র সমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতার কথা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহা প্রায় সর্ব্বজনবিদিত। আবার 'সবদুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ, সপ্তলোক ভুলে শোক তোমারে হেরিয়ে, কোথা আমি দীন অতি দীন' গাহিতে গাহিতে অবিরল প্রেমধারায় প্লাবিতগণ্ডস্থল তাঁহার ভক্ত্যুচ্ছ্বাস দেখিয়া কত দিন না আপনাদের ধন্যজ্ঞান করিয়াছি! কখন বা আবার ধ্যাননিমগ্ন সেই মহাপুরুষের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া কতই না সকলে

বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মোদ্যমের কথা আবার কি বলিতে হইবে? তাঁহার আমেরিকান বন্ধু গুডইয়ার বলেন, আমেরিকায় অবস্থান কালে তাঁহাকে কি পরিশ্রমই করিতে হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে সাধারণের জন্য একটী বক্তৃতা এবং অন্যান্য উপদেশ ও প্রশ্নোত্তরদান ব্যতীত সপ্তাহে ৮টী করিয়া বক্তৃতা দিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কর্ম্ম করিতে করিতেই তাঁহার জীবন পাত হয়, এ কথাও এখন আর অনেকের জানিতে বাকি নাই।

এই মহাপুরুষদ্বয়ের অপূর্ব্ব জীবনেতিহাস দেখিয়া এবং শ্রবণ করিয়াই বোধ হয়,—জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের একত্র সমাবেশ মনুষ্যজীবনে সম্ভবপর। আমাদের পূর্ব্ব সংস্কার ও শিক্ষা উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও অভ্যাস, বৈরাগ্য ও অবিরাম চেষ্টা দ্বারা যে ঐ আদর্শে জীবন গঠন করা যাইতে পারে, ইহা এখন বিশ্বাস হয়। ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনুষ্যজীবন গঠন করিতে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদের জীবনধারণের গুপ্তরহস্য। তাঁহাদের জ্বলন্ত জীবনবেদের মহিমায় ধরিত্রী এই মহামূল্য সত্যধনে ধনী হইয়া ধন্য হইয়াছে।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ বা কর্ম্মের একটীমাত্রের অত্যধিক আলোচনায় বিপদেরও সম্ভাবনা। যেমন জ্ঞানের অধিক চর্চ্চায় হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইবার ভয় আছে, আবার ভক্তির অত্যধিক সেবনে তেমনি ভক্তির আপাতঃ উন্মত্ততা (Fanaticism) আসিয়া সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অত্যধিক কর্ম্মদ্বারা চিত্তচাঞ্চল্যাদির যে রূপ ভয় আছে, অত্যধিক যোগাদির অনুশীলনে জীবের কল্যাণকর যথার্থ কার্য ছাড়িয়া কেবল কল্পনারাজ্যে বিচরণেরও তদ্রূপ ভয় আছে। তাই মনে হয়, এই কালে ঐ মহাপুরুষদ্বয়ের শ্রীপাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাদেরই শ্রীপদানুসরণ করিয়া জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্ম্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করিতে চেষ্টা করিলে নিজের কল্যাণ হইবে এবং উহাতে অপরেরও পরম কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইয়া মানুষ ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবে।

ভক্তের জাতি।

(ভক্তমাল হইতে গৃহীত।)

ভগবানের যে প্রকৃত ভক্ত, তাহার জাতি বিচার নাই। ভক্তেরা এক স্বতন্ত্র জাতি। এই শাস্ত্রবাক্যের কার্য্যে পরিণতির অনেক উদাহরণ বৈষ্ণব ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়।

মুরারিদাস নামে এক ভক্ত ছিলেন—তিনি জাতিতে চর্ম্মকার। তাঁহার অনেক সদ্‌গুণ ছিল। তিনি অতিশয় শান্তস্বভাব, মিষ্টভাষী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। তিনি ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কথা কহিতেন না। তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম তাঁহার বশীভূত ছিল এবং তিনি সর্ব্বদা ভক্তিরসানন্দে বিভোর থাকিতেন।

সেই স্থানে রসিক মুরারি নামে একজন মোহান্ত বাস করিতেন। তিনি সেই দেশের রাজার গুরু। তিনি সদ্‌গুণের অতিশয় আদর করিতেন বলিয়া মুরারিদাসকে চর্ম্মকার জানিয়াও তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া একদিন হঠাৎ তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন। মুরারিদাস মোহান্তজীকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একবার এগিয়ে যান আবার পাছু হাঁটিয়া আসেন, ঘরে তাঁহাকে বসিতে দিবার উপযুক্ত আসন নাই। কি করিবেন, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দূরে গিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রসিক মুরারি তাঁহার দৈন্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তখন মুরারিদাস অতি কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঠাকুর, আমাকে কেন স্পর্শ করিতেছেন? আমি অতি নীচ জাতি—আমি কুকুরের অধম।' তখন রসিক মুরারি কহিলেন, 'আপনি কি বলিতেছেন? আপনি সাধুশ্রেষ্ঠ—আপনার আবার জাতি কি? আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া পবিত্রতা লাভ করিব।' এইরূপ বলিয়া কোনরূপ কৌশলে ঐ চর্ম্মকারের পাদোদক পান করিলেন ও তাঁহাকে নানারূপ স্তবস্তুতি করিয়া নিজস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে রাজা পরম্পরায় ঐ সংবাদ শ্রবণে গুরুর উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। মোহান্তজী একদিন রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সম্ভাষণাদি কিছুই করিলেন না। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, আমি আপনার গুরু, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, অথচ আপনি আমাকে সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করিতেছেন না কেন?' রাজা মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এখানে কেন আসিয়াছেন? যান, সেই মুরারিমুচির বাড়ী যান।' মোহান্তজী দেখিলেন, রাজার অতিশয় জাত্যভিমান। তাঁহার ঐ জাত্যভিমান দূর করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন, 'রাজা, আপনি অতি মূর্খ। বুঝিলাম, ভগবান্ যে আমায় মুরারিদাসের পাদোদক পান করাইয়াছেন, সে কেবল আপনার তমোনিবারণের জন্য। আপনি আপনাকে একজন ভগবদ্ভক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু জানেন

না কি, ভক্তে যে জাতিবুদ্ধি করে, তাহার কখন ভক্তিলাভ হয় না? তাহার প্রতি ভগবানের কৃপাও হয় না, তাহার সকলধর্ম্মই নষ্ট হয়। অতএব ভক্ত যে কোন বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি পরম পবিত্র।"

এই সকল উপদেশে রাজার চৈতন্য উদয় হইল।

সমালোচনা।

আমার জীবন।

শ্রীমতী রাসসুন্দরী কর্ত্তৃক লিখিত। কলিকাতা, ১২১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসরসীলাল সরকার দ্বারা প্রকাশিত।

গ্রন্থখানির নাম দেখিয়া আপাততঃ অনেকের মনে উদয় হইতে পারে যে, ইহা কোন নব্যশিক্ষিতা ইংরাজী আলোকপ্রাপ্তা বঙ্গমহিলার লিখিত। কিন্তু পুস্তকখানি খুলিলেই সেই ভ্রম দূর হয়। ১২১৬ সালের চৈত্র মাসে গ্রন্থকর্ত্রীর জন্ম হয়। অতি বৃদ্ধ বয়সে কিছুদিন হইল, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এইগ্রন্থে অতি সরল ভাষায় প্রাচীন হিন্দুরমণীর জীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীগুলিতে বিশেষত্ব না থাকিলেও প্রাণের ভাষায় লিখিত বলিয়া মর্ম্মস্পর্শী এবং পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। এই পুস্তকখানির আরও অনেক উপযোগিতা আছে। ইহা প্রাচীন হিন্দুসমাজের একখানি নিখুঁত চিত্র বলিয়া রক্ষা করিবার এবং পাশ্চাত্যভাষায় অনুদিত হইয়া পাশ্চাত্য সমাজে হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক জ্ঞান সঞ্চার করিবার উপযুক্ত। আধুনিক বধূগণ এবং নব্যতন্ত্রে শিক্ষিতা রমণীগণ এই পুস্তকপাঠে বিশেষ উপকৃতা হইবেন। বস্তুতঃ এখানি উচ্চদরের স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইবার উপযুক্ত। গ্রন্থকর্ত্রীর আত্যন্তিক ধর্ম্মপ্রাণতা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত।

যাঁহারা স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষার বিরোধী অথবা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের লেখাপড়া শিক্ষার তত আগ্রহ বা উপযুক্ততা নাই, আমাদের বিশেষ অনুরোধ,—তাঁহারা এই পুস্তকখানি একবার আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিবেন। অতি বালিকা বয়সে নিজ পিতৃগৃহস্থিত বালকবিদ্যালয়ে মেমের নিকট বসিয়া বসিয়া বিনাশিক্ষায় বালকদিগের পড়া শুনিতে শুনিতে

মনে মনে অক্ষর শিক্ষা করেন। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে শ্বশুরগৃহে অবস্থান কালীন 'আমার মনে মনে নিতান্ত চেষ্টা হইল যে, আমি লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব। কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিত না।' তখনকার লোকের ধারণা ছিল যে, স্ত্রীলোকগণের লেখাপড়া শেখা অতি গর্হিত কার্য্য। সুতরাং 'যদি একখানি লেখা কাগজ দেখিতাম, তাহাও লোকের সম্মুখে দেখিতাম না। পাছে কেহ বলে, লেখাপড়া শিখিবার জন্যই দেখিতেছে।' পরে কি করিয়া ইনি লেখাপড়া শিখিলেন, সেই বিবরণ বড় মর্ম্মস্পর্শী। আমাদের ইহা বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছাসত্ত্বেও স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তিনি বালিকাবস্থার সেই বালক বিদ্যালয়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাহাতে অক্ষর ফলা বানান সহিত তাঁহার মনে হইল। শেষে একরাত্রে স্বপ্নাবেশে দেখিলেন যে, তিনি চৈতন্যভাগবত পড়িতেছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মনে অতিশয় উৎসাহ ও আহ্লাদ হইল। কিন্তু সেই বাটীতে চৈতন্যভাগবত পুঁথি আছে কিনা এবং যদি থাকে, তাহাও তিনি কি প্রকারে চিনিবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ অতিশয় আকুল হইল। দৈবক্রমে তাঁহার স্বামী তাঁহার কর্ণগোচরে পুত্রকে বলিলেন, এই চৈতন্যভাগবত পুঁথিখানি রহিল, যখন বলিব, তখন অমুকঘরে লইয়া যাইবে। এইরূপে চৈতন্যভাগবত পুঁথির উদ্দেশ পাইয়া তিনি তাহার একখানা পাতা লুকাইয়া রান্নাঘরে রাখিলেন এবং ছেলের একখানি লেখা তাল পাত লইয়া সেই পাতার সহিত নিজ মনের অক্ষরগুলি এবং লোকের কথার সহিত মিলাইয়া অনেক কষ্টে চৈতন্যভাগবত পড়িতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইনি যদি বালিকা বয়স হইতে শিক্ষকের সাহায্য পাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই একজন অসামান্যা বিদুষী হইতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নিজ জীবন প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যে, তাহাতে মানব মনের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত এপ্রেল মাসে বারাণসীনিবাসী পরলোকগত কীর্ত্তিচন্দ্রবাগচি মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতীইচ্ছাময়ী দেবী ৫০৲ টাকা এবং মে মাসে কৃষ্ণাজেলা হইতে এন্, ভি, রঙ্গরাও বাহাদুর ৫০৲ টাকা বারাণসী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের সাহায্যার্থ এককালীন দান করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের ঢাকা শাখা হইতে ইংরাজী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। পুস্তকে ঘটনাসন্নিবেশ যদিও অল্প, কিন্তু ইহাতে একবিন্দু অসত্য বা অতিরঞ্জিত বর্ণনা স্থান পায় নাই। বিশ্বস্তসূত্রে যতদূর ঘটনা সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে, তাহা এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের কাগজ এবং ছাপা অতি সুন্দর। আমরা ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের এই কার্য্যতৎপরতায় বিশেষ সুখী হইয়াছি। আশা করি, তাঁহারা একখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জীবনীসঙ্কলনের চেষ্টা করিবেন।

পাশ্চাত্যজাতি ধীরে ধীরে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের উপর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইতেছেন, আজকাল তাহার অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে। লাহোরের ভূতপূর্ব্ব বিশপ সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—'ধর্ম্মভাব ভারতবাসীর মজ্জাগত, আধ্যাত্মিকতা তাহার প্রাণ। ভারতবাসী জড় জগতের উন্নতিকেই সভ্যতার মূলমন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করে না। আমরা তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মতত্ত্ব শিখাইতে যাইতেছি। কিন্তু তাহারা যে ধর্ম্ম বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত।'

মিষ্টার এস, এইচ, সুইনি পজিটিভিষ্ট রিভিউ পত্রিকায় হিন্দুগণের সমাজ-সংস্কার নামক প্রবন্ধে অনেক সার কথা বলিয়াছেন ;—'অনেক সংস্কারক অন্ধভাবে ইংরাজদের সবই ভাল ও ভারতের সবই মন্দ, দেখিয়া থাকেন। এই জন্যই অধিকাংশ ভারতবাসী এই সকল সংস্কারের বিরোধী। ভারত ইউরোপীয় সভ্যতার সারগুলি যথা উহার বিজ্ঞান—আপনার করিয়া লইতে পারে, কিন্তু ধীরভাবে ও বিচারের সহিত অগ্রসর হইলেই প্রকৃত উন্নতি হয়, অপরের অন্ধ অনুকরণে কিছু হয় না।'

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গত ১লা ভাদ্রের উদ্বোধন বন্ধ থাকাতে ১৫ই ভাদ্রের উদ্বোধন ১৫শ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল।

স্বামীজির স্মৃতি

(শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।

স্বামীজির বাড়ির কাছেই আমাদের বাড়ি ছিল। এক পাড়ার ছেলে আমরা ছেলেবেলা লেংটা হয়ে তাঁর সঙ্গে কত খেলাই না খেলেছি! তার পর তাঁর জীবন আর আমাদের জীবন কত তফাৎ হয়ে গেল। কত দিন কত বৎসর দেখা সাক্ষাৎই হয় নাই শুনতে পেতাম বটে, তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন, দেশ বিদেশে ঘুরছেন। আমার কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তাঁর উপর বিশেষ একটা টান ছিল। তাই বড় হয়েও তাঁর কথা একদিনও ভুলতে পারি নাই। তিনি যে একটা খুব বড় লোক হবেন, এটা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে এমন ভাবে যে জগতের পূজ্য হবেন, একথা কে ভেবেছিল বল? তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াতে এই কথাই মনে হয়েছিল যে, হায়, এত বড় শক্তিমান্ পুরুষের জীবনটা মিছেই হয়ে গেল।

শেষ পর তিনি আমেরিকায় গেলেন। চিকাগোর ধর্ম্মসভার ও আমেরিকার অন্যান্য স্থানের বক্তৃতার সারাংশ একটু আধটু কাগজে দেখতে লাগলুম। যা একটু আধটু বিবরণ পেতাম, তাতেই অবাক্ হয়ে যেতাম। ভাবলেম, আগুণ কখনও কাপড়ে ঢাকা থাকে না। এতদিনে স্বামীজির ভিতরের সেই শক্তি জ্বলে উঠেছে। ছেলেবেলাকার সেই কুঁড়ি এতদিনে ফুটেছে। যতই তার অদ্ভুত কথা কাগজে পড়তে লাগলেম, ততই সেই বাল্য-বন্ধুকে আবার দেখবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগলো।

একদিন শুনলাম, তিনি দেশে ফিরছেন। মাদ্রাজে এসেছেন, জ্বলন্ত অগ্নিময় বক্তৃতা করেছেন। সে বক্তৃতা পড়লাম, প্রাণ মেতে উঠলো। ভাবলুম, হিন্দুধর্ম্মের ভেতর এই জিনিষ আছে, আর এমন সহজ করে

[illegible] মত ধর্ম্মটা বোঝান যায়? এঁর কি অদ্ভুত শক্তি! ইনি কি মানুষ না দেবতা?

তার পর একদিন কলকেতায ভারি হৈ চৈ, স্বামীজি আসিলেন। বাগবাজারে পশুপতি বাবুর বাটীতে তাঁর অভ্যর্থনা হলো এবং শীল বাবুদের কাশীপুরের গঙ্গাব ধারের বাগানে তাঁকে সঙ্গে করে রেখে আসা গেল। কযেক দিন পরে রাজা রাধাকান্তদেবের বাটীতে বিরাট্ সভায স্বামীজির স্নিগ্ধ-গম্ভীর বক্তৃতা হলো—যে যেখান থেকে শুনলে, চিত্রার্পিত হয়ে রইল। সে সব সেদিনকার কথা—সকলেবই মনে আছে। লিখ্‌বার আবশ্যক নাই।

কলিকাতায আসা অবধি তাঁহাব সহিত নির্জ্জনে একবার দেখা কর্‌বার এবং প্রাণ খুলে ছেলেবেলাকাব মত ছুটো কথা কয়বাব জন্য মন বড় ব্যস্ত হযেছিল। কিন্তু সর্ব্বদাই লোকেব ভিড়। অনবরত বহুলোকের সহিত আলাপ চলেছে। সুবিধামত সময় আব পাই না। ইতিমধ্যে একটু অবসর পেযেই তাঁকে ধবে নিযে বাগানে গঙ্গাব ধারে বেড়াতে এলাম। তিনিও শৈশবের খেলুড়েকে পেযে আগেকার মতই কথাবার্ত্তা আরম্ভ কবলেন। দুচারটা কথা কইতে না কইতেই ডাকের উপর ডাক এলো যে, অনেক নূতন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছে। এবার একটু বিরক্ত হযে বল্‌লেন,—"বাবা একটু রেহাই দাও, এই ছেলেবেলাকার খেলুড়েব সঙ্গে ছুটো কথা কই, একটু ফাঁকা হাওযায় থাকি। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের যত্ন কবে বসাওগে, তামাক টামাক খাওযাওগে।"

যে ডাক্‌তে এসেছিল, সে চলে গেলে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, স্বামীজি, তুমি সাধু। তোমার অভ্যর্থনাব জন্য যে টাকা আমবা চাঁদা কবে তুল্‌লাম, আমি ভেবেছিলাম যে, তুমি দেশের দুর্ভিক্ষেব কথা শুনে, কলকেতায পৌঁছুবার আগেই আমাদের তার কর্‌বে যে, "আমাব অভ্যর্থনায এক পয়সা না খবচ করে দুর্ভিক্ষনিবারিণী ফণ্ডে ঐ সমস্ত টাকাগুলি চাঁদা দাও", কিন্তু দেখ্‌লুম, তুমি তা কর্‌লে না; এব কারণ কি?

স্বামীজি। হাঁ, আমি ইচ্ছাই করেছিলাম যে, আমায় নিয়ে একটা খুব হৈ চৈ হয়। কি জানিস্, একটা হৈ চৈ না হলে তাঁর (ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের) নামে লোক চেতবে কি করে? এত Ovation কি আমার জন্য করা হলো, না, তাঁব নামেরি জযজযকাব হলো? তাঁর বিষয় জান্‌বার জন্য

লোকের মনে কতটা ইচ্ছা হলো! এইবার ক্রমে তাঁকে জান্‌বে, তবে না দেশের মঙ্গল হবে। যিনি দেশের মঙ্গলের জন্য এসেছেন, তাঁকে না জান্‌লে লোকের মঙ্গল কি করে হবে? তাঁকে ঠিক ঠিক জান্‌লে তবে মানুষ তৈরী হবে আর মানুষ তৈরী হলে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাড়ান কতক্ষণের কথা? আমাকে নিয়ে এইরূপ বিরাট্ সভা করে হৈ চৈ করে তাঁকে প্রথমে মানুক, আমার এই ইচ্ছাই হয়েছিল; নতুবা আমার নিজের জন্য এত হ্যাঙ্গামের কি দরকার ছিল? তোদের বাড়ি গিয়ে যে এক সঙ্গে খেলতুম, তার চেয়ে আর আমি কি বড়লোক হয়েছি? আমি তখনও যা ছিলাম, এখনও তাই আছি। তুইই বল্‌না, আমার কি কোন পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছিস্?

আমি মুখে বলিলাম, না, সে রকম ত কিছুই দেখিনা, মনে হল সাক্ষাৎ দেবতা হয়েছ।

স্বামীজি বলিতে লাগিলেন,—"দুর্ভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের ভূষণ হয়ে পড়েছে! অন্য কোন দেশে দুর্ভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি? নাই, কারণ, সে সব দেশে মানুষ আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ কর্‌তে শিখুক, তখন দুর্ভিক্ষ নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আস্‌বে। ক্রমে সে চেষ্টাও কর্‌বো, দেখ্‌না।

আমি। আচ্ছা, তুমি এখানে খুব লেক্‌চার টেক্‌চার দেবেতো? তা না হলে তাঁর নাম কেমন করে প্রচার হবে?

স্বামীজি। তুই খেপিচিস্, তাঁর নাম প্রচারের কি কিছু বাকি আছে? লেক্‌চার করে এদেশে কিছু হবে না। বাবু ভায়ারা শুনবে, বেশ্ বেশ্ কর্‌বে, হাততালি দেবে তার পর বাড়ি গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম করে ফেল্‌বে। পচা পুরাণ লোহার উপর হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে? ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে। তাকে পুড়িয়ে লাল কর্‌তে হবে, তবে হাতুড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন কর্‌তে পারা যাবে। এদেশে জলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখ্‌লে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়ে ছুড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্‌বে। তাদের Life আগে তয়ের করে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।

আমি। আচ্ছা স্বামীজি, তোমার নিজের দেশের লোক নিজেদের ধর্ম

বুঝ্‌তে না পেরে কেউ খৃশ্চান কেউ মুসলমান কেউ বা অন্য কিছু হচ্ছে, তাদের জন্য তুমি কিছু না করে গেলে কি না আমেরিকা ইংলণ্ডে ধর্ম্ম বিলুতে ?

স্বামীজি। কি জানিস, তোদের দেশের লোকের যথার্থ ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বার ও অনুষ্ঠান কর্‌বার শক্তি কি আছে? আছে কেবল একটা অহঙ্কার যে, আমরা ভারী সত্ত্বগুণী। তোরা এককালে সাত্ত্বিক ছিলি বটে কিন্তু এখন তোদের ভারি পতন হয়েছে। সত্ত্ব থেকে পতন হলে একেবারে তমঃ আসে। তোরা তাই এসেছিস্। মনে করেছিস্ বুঝি, যে নড়েনা চড়েনা, ঘরের ভেতর বসে হরিনাম করে, সামনে অপরের উপর হাজার অত্যাচার দেখেও চুপ করে থাকে, সেইই সত্ত্বগুণী—তা নয়, তাকে মহা তমঃ ঘিরেছে। যে দেশের লোক পেট্‌টা ভরে খেতে পায় না, তার ধর্ম্ম হবে কি করে? যে দেশের লোকের মনে ভোগের কোন আশাই মেটে নি, তাদের নিবৃত্তি কেমন করে হবে? তাই আগেই যাতে মানুষ পেটটা ভরে খেতে পায় ও কিছু ভোগ বিলাস কর্ত্তে পাবে, তারই উপায় কর, তবে ক্রমে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এসে ধর্ম্ম লাভ কর্‌তে পার্‌বে। বিলাত আমেরিকার লোকেরা কেমন জানিস? পূর্ণ রজোগুণী, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল রকম ভোগ করে এলে গেছে। তাতে আবার খৃশ্চানী ধর্ম্ম মেয়েলি ভক্তির ধর্ম্ম, পুরাণের ধর্ম্ম। শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে তাতে আর তাদের শান্তি হচ্ছে না। তারা যে অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্কা দিয়ে দিলেই সত্ত্বগুণে পৌছায়। তার পর আজ কাল একটা লালমুখ এসে যে কথা বল্‌বে, তা তোরা যত মান্‌বি, একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা সন্ন্যাসীর কথা তত মান্‌বি কি?

আমি। মহারাজ, এন ঘোষও ঠিক ঐ ভাবের কথা বলেছিলেন।

স্বামীজি। হাঁ, আমার সেখানকার চেলারা সব যখন তৈরী হয়ে এখানে এসে তোদের বল্‌বে যে, "তোমরা কি কর্‌ছ, তোমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম রীতি নীতি কিসে ছোট? দেখ, তোমাদের ধর্ম্মটাই আমরা বড় মনে করি"- তখন দেখিস হুদো হুদো লোক সেকথা শুন্‌বে। তাদের দ্বারা এদেশের বিশেষ উপকার হবে। মনে করিসনি, তারা ধর্ম্মের গুরুগিরি কর্‌তে এদেশে আস্‌বে। বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবহারিক শাস্ত্রে তারা তোদের গুরু হবে আর ধর্ম্ম বিষয়ে এদেশের লোক তাদের গুরু হবে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্ম্ম বিষয়ে এই সম্বন্ধ চিরকাল থাক্‌বে।

আমি। তা স্বামীজি কেমন করে হবে? ওরা আমাদের যে রকম ঘৃণা করে, তাতে ওরা যে কখন নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের উপকার করবে, তা বোধ হয় না।

স্বামীজি। তোদের ঘৃণা করবার অনেকগুলি কারণ পায়, তাই ঘৃণা করে। একে তো তোরা বিজিত তার উপর তোদের মত হাঘোরের দল আর জগতে কোথাও নাই। নীচ জাত গুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে, উঠতে বসতে জুতো লাথি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন Professional ভিখারী হয়েছে; তাদের উপর শ্রেণীর লোকেরা দু এক পাতা ইংরাজী পড়ে আর্জী হাতে করে সকল আফিসের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্চে। একটা বিশ টাকার চাকরী খালি হলে পাঁচশো B. A., M A, দরখাস্ত করে। পোড়া দরখাস্তও বা কেমন। "ঘরে ভাত নেই, মাগ ছেলে খেতে পাচ্ছে না, সাহেব দুটী খেতে দাও, নইলে গেলাম।" চাকরীতে ঢুকেও দাসত্বের চূড়ান্ত করতে হয়। এইতো গেল নিম্নশ্রেণীর লোক। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় (!) লোকেরা দল বেঁধে "হায় ভারত গেল! হে ইংরেজ, তোমরা আমাদের লোকেদের চাকরী দেও। দুর্ভিক্ষ মোচন কর" ইত্যাদি দিনরাত কেবল "দাও দাও" করে মহা হল্লা করছে। সকল কথার ধুয়ো হচ্ছে, "ইংরেজ আমাদের দাও"! বাপ্! আর কত দেবে? রেল দিয়েছে—তারের খবর দিয়েছে রাজ্যের সুশৃঙ্খলতা দিয়েছে—ডাকাতের দল প্রায় তাড়িয়েছে—বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে—আবার কি দিবে? নিঃস্বার্থ ভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওরা তো এত দিয়েছে, তোরা কি দিয়েছিস?

আমি। আমাদের দেবার কি আছে মহারাজ? রাজ্যের কর দিই।

স্বামীজি। আমার, সে কি তোরা দিস্, না, জুতো মেরে আদায় করে—রাজ্যরক্ষা করে বলে? তোদের যে এত দিয়েছে, তার জন্য কি দিস্, তাই বল্। তোদেরও দেবার এমন জিনিস্ আছে, যা ওদেরও নাই। তোরা বিলাত যাবি, তাও ভিখারী হয়ে—কি না বিদ্যা দেও। কেউ গিয়ে বড় জোর তাদের ধর্ম্মের দুটো তারিফ করে এলি—বড় বাহাদুরী হলো। কেন—তোদের দেবার কি কিছু নেই? অমূল্য রত্ন রয়েছে—দিতে পারিস্—ধর্ম্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ, যত উচ্চ ভাব পূর্ব্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল ভারত জনসমাজে

ভাবের খনি হয়ে এসেছে; ভাব প্রসব করে সমস্ত জগৎকে ভাব বিতরণ করেছে। আজ ইংরেজ ভারতে এসেছে সেই উচ্চ উচ্চ ভাব, সেই বেদান্তজ্ঞান, সেই সনাতন ধর্ম্মের গভীর রহস্য নিতে। তোরা ওদের নিকট যা পাস্, তার বিনিময়ে তোদের ঐ সকল অমূল্য রত্ন দান কর্। তোদের এই ভিখারী নাম ঘুচাবার জন্য ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গেছিলেন। কেবল ভিক্ষে কর্বার জন্য বিলাত যাওয়া ঠিক নয়। কেন তোদের চিরকাল ভিক্ষে দেবে? কেউ কখন দিয়ে থাকে? কেবল কাঙ্গালের মত হাত পেতে লওয়া জগতের নিয়ম নয়। জগতের নিয়মই হচ্ছে আদান প্রদান। এই নিয়ম যে লোক বা যে জাত বা যে দেশ না রাখ্বে, তার কল্যাণ নাই। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। তাই আমেরিকায় গিছ্লাম। তাদের ভেতর এখন এতদূর ধর্ম্মপিপাসা যে, আমার মত হাজার হাজার লোক গেলেও তাদের স্থান হয়। তারা অনেক দিন থেকে তোদের ধন রত্ন দিযেছে, তোরা এখন অমূল্য রত্ন দে। দেখ্বি, ঘৃণাস্থলে শ্রদ্ধা ভক্তি পাবি আর তোদের দেশের জন্য তারা অযাচিত উপকার কর্বে। তারা বীরের জাত, উপকার ভোলে না।

আমি। মহারাজ, ওদেশে লেক্চারে আমাদের কত গুণপনা ব্যাখ্যা করে এসেছ; আমাদের ধর্ম্মপ্রাণতার কত উদাহরণ দিযেছ। আবার এখন বল্ছো, আমরা মহা তমোগুণী হযে গিছি। অথচ ঋষিদের সনাতন ধর্ম্ম বিলাবার অধিকারী আমাদেরই কর্ছো—এ কেমন কথা?

স্বামীজি। তুই কি বলিস্, তোদের দোষগুলো দেশে দেশে গাবিয়ে বেড়াব, না, তোদের যা গুণ আছে, সে গুণগুলোর কথাই বলে বেড়াব? যার দোষ তাকেই বুঝিযে বলা ভাল আর তার গুণ নিয়ে ঢাক বাজানই উচিত। ঠাকুর বল্তেন যে, মন্দ লোককে ভাল ভাল কর্লে সে ভাল হযে যায়; আর ভাল লোককে মন্দ মন্দ কর্লে সে মন্দ হযে যায়। তাদের দোষের কথা তাদের কাছে খুব বলে এসেছি। এদেশ থেকে যত লোক এ পর্য্যন্ত ওদেশে গেছে, সকলে তাদের গুণের কথাই গেয়ে এসেছে; আর আমাদের দোষের কথাই গাবিয়ে বেড়িয়েছে। কাজেই তারা আমাদের ঘৃণা কর্তে শিখেছে। তাই আমি তোদের গুণ ও তাদের দোষ তাদের দেখিয়েছি। তোরা যত তমোগুণী হোস্ না কেন, পুরাতন ঋষিদের ভাবটা তোদের ভেতর একটু না একটু আছে—অন্ততঃ তার কাঠামোটা আছে। তবে

হুট করে বিলেতে গিয়েই যে ধর্ম্ম-উপদেষ্টা হতে পারা যায়, তা নয়। আগে নিরেলা বসে ধর্ম্মজীবনটা বেশ করে গড়ে নিতে হবে; পূর্ণ ভাবে ত্যাগী হতে হবে; আর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে হবে। তোদের ভেতর তমোগুণ এসেছে—তা কি হয়েছে? তমোনাশ কি হতে পারে না? এক কথায় হতে পারে। ঐ তমোনাশ কর্‌বার জন্যই তো ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন।

আমি। কিন্তু স্বামীজি, তোমার মত কে হবে?

স্বামীজি। তোরা ভাবিস্ আমি মলে বুঝি আর বিবেকানন্দ হবে না। ঐ যে নেশাখোরগুলো এসে কনসার্ট বাজিয়ে গেল, যাদের তোরা এত ঘৃণা করিস্, মহা অপদার্থ মনে করিস্, ঠাকুরের ইচ্ছা হলে ওরা প্রত্যেকে এক এক বিবেকানন্দ হতে পারে। দরকার হলে বিবেকানন্দের অভাব থাক্‌বে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এসে হাজির হবে, তা কে জানে? এ বিবেকানন্দের কাজ নয় রে; তাঁর কাজ—খোদ রাজার কাজ! একটা গভর্ণর জেনারল গেলে তার যায়গায় আর একটা আস্‌বেই। তোরা যতই তমোগুণী হস্ না কেন, মন মুখ এক করে তাঁর শরণ নিলে সব তমঃ কেটে যাবে। এখন যে ও রোগের রোজা এসেছে। তাঁর নাম করে কাজে লেগে গেলে তিনি আপনিই সব করে লবেন। ঐ তমোগুণটাই মহা সত্ত্বগুণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমি। যাই বল, ও কথা বিশ্বাস হয় না। তোমার মত Philosophyতে Oratory কর্‌বার ক্ষমতা কার হবে?

স্বামীজি। তুই জানিস্‌নি। ও ক্ষমতা সকলেরই হতে পারে। যে ভগবানের জন্য বার বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য কর্‌বে, তারই ও ক্ষমতা হবে। আমি ঐরূপ ব্রহ্মচর্য্য করেছি, তাই আমার মাথার ভিতর একটা পর্দা খুলে গেছে। তাই আর আমার দর্শনের ন্যায় জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভেবে তৈয়েব কর্‌তে হয় না। মনে কর্, কাল বক্তৃতা দিতে হবে, আজ রাত্রে যা বক্তৃতা দেব, তার সমস্ত ছবি পর পর চথের সাম্‌নে যেতে আরম্ভ হয়। পরদিন বক্তৃতার সময় সেই সব বলি। অতএব বুঝ্‌লি তো এটা আমার নিজস্ব শক্তি নয়। যে অভ্যাস কর্‌বে, তারই হবে। তুই কর্, তোরও হবে। আমাদের শাস্ত্রেতেও অমুকের হবে, অমুকের হবে না, তা বলে না।

আমি। মহারাজ, তোমার মনে আছে, তখন তুমি সন্ন্যাস লও নাই, একদিন আমরা অমুকের বাড়িতে বসেছিলাম; তুমি সমাধি ব্যাপারটা আমাদের বোঝাবার চেষ্টা কর্‌ছিলে! কলিকালে ও সব হয় না বলে আমি তোমার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় তুমি জোর করে বলেছিলে, "তুই সমাধি দেখ্‌তে চাস্‌ না সমাধিস্থ হতে চাস্‌? আমার সমাধি হয়। আমি তোর সমাধি করে দিতে পারি"। তোমার এই কথা বল্‌বার পরেই একজন নূতন লোক এসে পড়্‌লো আর আমাদের ঐ বিষয়ের কোন কথাই চলিল না।

স্বামীজি। হাঁ, মনে পড়ে।

আমি তখন আমায় সমাধিস্থ করে দিবার জন্য তাঁকে বিশেষ রূপে ধরায় স্বামীজি বল্‌লেন, "দেখ্‌, গত কয় বৎসর ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আর কাজ করে আমার ভেতর রজোগুণ বড় বেড়ে উঠেছে। তাই সে শক্তি এখন চাপা পড়েছে। কিছু দিন সব কাজ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে বস্‌লে তবে আবার সে শক্তির উদয় হবে"।

ইহার দুই এক দিন পরে স্বামীজির সহিত দেখা কর্‌বো বলে আমি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় দুটী বন্ধু এসে উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, তাঁরাও স্বামীজির সঙ্গে দেখা করে প্রাণায়ামের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে চান। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কাশীপুরের বাগানে এসে উপস্থিত হলেম। দেখ্‌লাম, স্বামীজি হাত মুখ ধুয়ে বাইরে আস্‌ছেন। শুধু হাতে দেবতা বা সাধু দর্শন কর্‌তে যেতে নাই শুনেছিলাম, তাই আমরা কিছু ফল ও মিষ্টান্ন সঙ্গে এনেছিলাম। তিনি আস্‌বামাত্র তাঁকে সেই গুলি দিলাম, স্বামীজি সেগুলি নিয়ে নিজে মস্তকে ঠেকালেন এবং আমরা প্রণাম কর্‌বার আগেই আমাদের প্রণাম কর্‌লেন। আমার সঙ্গের দুটী বন্ধুর মধ্যে একটী তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁকে চিন্‌তে পেরে বিশেষ আনন্দের সহিত তাঁহার সমস্ত কুশল জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। পরে আমাদের তাঁহার নিকটে বসালেন। আমরা যেখানে বস্‌লাম, সেখানে আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজির মধুর কথা শুন্‌তে এসেছেন। অন্যান্য লোকের দুই একটী প্রশ্নের উত্তর করে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি আপনিই প্রাণায়ামের কথা কইতে লাগ্‌লেন। মনোবিজ্ঞান হইতেই জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান সহায়ে প্রথমে

উহা বুঝিযে পরে প্রাণাযাম বস্তুটা কি, তাহা বুঝাতে লাগ্‌লেন। ইহার আগে আমরা কয়জনেই তাঁহার রাজযোগ পুস্তকখানি ভাল করে পাঠ করেছিলাম। কিন্তু আজ তাঁর কাছে প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে সকল কথা শুন্‌লাম, তাতে মনে হল যে, তাঁর ভেতরে যা আছে, তার অতি অল্প মাত্রই সে পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইহাও বুঝ্‌লাম যে, তাঁহার ঐ সকল কথা কেবল পুঁথিপড়া কথা নয়। মন্ত্রদ্রষ্টা ছাড়া ধর্ম্মশাস্ত্রের কূট প্রশ্নসকলের বিজ্ঞান সহাযে ঐরূপ বিশদ মীমাংসা করা কাহারও সাধ্য নয়। জগতে পণ্ডিতের অভাব নাই; কিন্তু সত্যের দ্রষ্টা বা উপলব্ধা বড়ই বিরল। পণ্ডিতের সংখ্যা কমে তাঁর ন্যায় দ্রষ্টার সংখ্যা যদি অধিক হতো, তা হলে ভারতের এ দুর্দ্দিন হতো না।

সেদিন আমরা স্বামীজির কাছে ৩॥০ টার সময় উপস্থিত হই। তাঁহার প্রাণায়ামবিষয়িণী কথা ৭॥০ টা পর্য্যন্ত চলেছিল। পরে সভা ভঙ্গ হলে যখন বাইরে এলাম, তখন সঙ্গিদ্বয় আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন যে, তাঁদের প্রাণের ভেতরের প্রশ্ন স্বামীজি কেমন করে জান্‌তে পার্‌লেন? আমি কি তাঁকে পূর্ব্বেই এ প্রশ্নগুলি জানিযেছিলাম?

ঐ ঘটনার কিছু দিন পরে একদিন বাগবাজারের ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গিরীশ বাবু, অতুল বাবু, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ এবং আরও দু একটী বন্ধু সম্মুখে স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "স্বামীজি, সেদিন আমার সঙ্গে যে দুজন লোক তোমায় দেখ্‌তে গিয়েছিল, তারা আগে তুমি এ দেশে আস্‌বার আগেই তোমার রাজযোগ পড়েছিল আর বলে রেখেছিল যে, যদি তোমার সঙ্গে কখন দেখা হয় তো তোমাকে প্রাণায়াম বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌বে। কিন্তু সে দিন তারা কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে না কর্‌তেই তুমি তাদের ভেতরের সন্দেহগুলি আপনি তুলে ঐরূপে মীমাংসা করায় তারা আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল, আমি তোমাকে তাদের প্রশ্নগুলি আগে জানিয়েছিলুম কি না। স্বামীজি বললেন;—ওদেশেও অনেক সময়ে ঐরূপ ঘটনা হওয়ায় অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌তো, আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন কেমন করে জানতে পার্‌লেন? ওটা আমার তত হয় না। ঠাকুরের অহরহ প্রায়ই হতো।

এই প্রসঙ্গে অতুল বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন;—তুমি রাজযোগে বলেছ যে, পূর্ব্ব জন্মের কথা সমস্ত জান্‌তে পারা যায়। তুমি নিজে জান্‌তে পার?

স্বামীজি। হাঁ পারি।

অতুল বাবু। কি জান্‌তে পার, বল্‌বার বাধা আছে ?

স্বামীজি। জান্‌তে পারি—জানিও—কিন্তু details বলিব না।

তিব্বতে তিন বৎসর।

(স্বামী অখণ্ডানন্দ।)

যে তিব্বত লইয়া আজকাল চতুর্দ্দিকে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহারি সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা এই সময়ে সাধারণে প্রকাশ করিলে বোধ করি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ক্রমান্বয়ে ৩।৪ বৎসর তিব্বতের নানা স্থানে ভ্রমণ করায় তিব্বতীয়দের সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে বহুকাল তিব্বতীয়-ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে বাস করায় আমি তিব্বতীয় ভাষায় আমার মনের ভাব তাহাদিগকে সুন্দর রূপে বুঝাইতে পারিতাম এবং তাহাদেরও সকল কথা বুঝিতে পারিতাম। এইরূপে আমি তিব্বতীয়দের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ও শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে যতদূর বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আমার এই প্রবন্ধ লোকের কতদূর হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিতে পারি না, কারণ, সে আজ ১৬।১৭ বৎসরের কথা।

অতীতের একমাত্র অতি ক্ষীণ স্মৃতি ভিন্ন ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিবার উপযোগী অন্য কোন সম্বল আমার নাই। একমাত্র সেই বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতির সাহায্যেই আমাকে সকল কথা লিখিতে হইবে। ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে মনে করিয়াও আমি কোথাও ভ্রমণ করি নাই বা ভ্রমণের কোন কথাই কখনও লিখিয়া রাখি নাই। এমন কি, তখন বরং যাহা দেখিতাম, তাহাই ভুলিতে চেষ্টা করিতাম। সুতরাং এ অবস্থায় আমার তিব্বতীয় কথা সাধারণের সুখপাঠ্য হইবে বলিয়া মনে করা কেবল দুরাশা মাত্র। বিশেষ রূপে অনুরুদ্ধ হইয়াই আমি এই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি

তিব্বত সম্বন্ধে কাহারও কিছু মাত্র কৌতূহল নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তর্দ্ধান হইবার প্রায় ৭।৮ মাস পরে গোল্‌ড্‌ন্ জুবিলির বৎসর, বোধ করি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মাঘের শেষে আমাদের তদানীন্তন বরাহনগর মঠ হইতে যাত্রা করিয়া ৺গয়া, কাশী, অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য দর্শন করিয়া (পথে এই কয়েকটী তীর্থস্থান ভিন্ন কেবল লক্ষ্ণৌ ও সীতাপুরে নামিয়াছিলাম।) ৺হরিদ্বারে উপস্থিত হইলাম।

কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া ৺হরিদ্বারে পঁহুছিতে আমার পথে ২।৩ মাসের অধিক বিলম্ব হয় নাই। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বেই বোধ করি আমি ৺হরিদ্বার পঁহুছিয়াছিলাম। তাহার ৩।৪ দিন পরেই আমি ৺হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশে গিয়া পঁহুছিলাম। বহুকালের অভীপ্সিত স্থানে পঁহুছিয়া আমি পরমানন্দ অনুভব করিলাম। হিমালয়ের পাদমূলে হৃষীকেশের তুল্য পবিত্র ও রমণীয় তপোবন আর নাই। ৺বদরিকাশ্রম যাত্রার এইটী প্রধান দ্বার। কার্ত্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা পর্য্যন্ত এই হৃষীকেশ নানাসম্প্রদায়ভুক্তসাধুসমাগমে পূর্ণ হয়। বহুতর ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রতি বৎসর মাস মাসে হৃষীকেশে আসিয়া নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী করিয়া পরম পরিতোষ সহকারে সাধুভোজন করাইয়া কৃতার্থ হন।

•হৃষীকেশের সন্নিকটেই "তপোবন" নামে একটী গ্রাম আছে। সেই গ্রামের কয়েক বিঘা জমিতে উৎপন্ন "বাসুমতী" চাউল এক অপূর্ব্ব পদার্থ। চাউল গুলি দেখিতে ছোট কিন্তু রন্ধনের পর দৈর্ঘ্যে দ্বিগুণ হয়। ভাতগুলি অতি শুভ্র ও এমন সুবাসিত যে, আহারের পর সমস্ত দিন উদ্গারেও তাহার সুগন্ধ পাওয়া যায়। জনপ্রবাদ এই যে, কোন ঋষির বরে তপোবনের কেবল ঐ কয়েক বিঘা জমীতেই উক্ত দেবভোগ্য "বাসুমতী" জন্মে। হিমালয়ের সর্ব্বত্রই সুগন্ধযুক্ত •বাসুমতী চাউলের বড়ই আদর। ৺কেদার ও বদরীনারায়ণের পথে "বাসুমতী" টাকায় চারিসের হিসাবে বিক্রয় হয়। এই ১৬।১৭ বৎসরের মধ্যে যদি কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, বলিতে পারি না। যাহা হউক, উত্তরাখণ্ডের আর কোন চাউলই তপোবনের "বাসুমতীর" তুল্যগুণসম্পন্ন নহে। হৃষীকেশের ভরতজীর মন্দির সর্ব্বপ্রধান। তপোবন টিহরীরাজ কর্ত্তৃক

ভরতজীর সেবায় সমর্পিত। ভরতজীর মোহান্তের নিকটে শুনিলাম যে, তাঁহাকে প্রায় প্রতিবৎসর পঞ্জাবের কয়েক জন রাজা মহারাজাদের জন্য কিছু কিছু সেই "বাসমতী" চাউল পাঠাইতে হয়।

ত্রিলোকপাবনী ভাগীরথী হিমালয়ের অত্যুচ্চ, নিভৃত, মনুষ্যের অগম্য, চিরনীহারময় গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া প্রবলবেগে দুর্ভেদ্য পাষাণ ভেদ করিয়া ঘোর নিনাদে বিষম অরণ্যানী অবিরাম প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এই পথেই মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছেন। আমি হৃষীকেশে পঁহুছিয়াই উত্তরাখণ্ডের মাহাত্ম্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলাম। বিমল স্বর্গীয় সুখে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। মনে হইল, উত্তরাখণ্ডের প্রারম্ভেই এই, না জানি অন্তে কি আছে। মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে এই হৃষীকেশ স্বর্গ। হৃষীকেশ-মাহাত্ম্যে সিদ্ধগণও মুগ্ধ। এই হৃষীকেশে বিরক্তদের ঝাড়ীতে আমি কিছুদিন ছিলাম। এইখানে কতিপয় পঞ্জাবী ত্যাগী মহাপুরুষের সহিত আমার বিশেষ হৃদ্যতা হয়। তাঁহাদের উদার ও সরল ব্যবহারে হৃষীকেশ আমার পক্ষে মধুরতর বোধ হইল। কেবল আত্মধ্যান, আত্মচর্চ্চা ও উপনিষদাদি পাঠ ভিন্ন এই দেবদুর্লভ স্থানে অন্য কোন কথাই হইতে পারিত না। কি আনন্দে ও পবিত্র ভাবেই আমার জীবনের প্রধান কয়েকটী দিন এইখানে অতিবাহিত হইল, তাহা অবর্ণনীয়। হৃষীকেশ হইতে আমি ডেরাডুন ও মসুরী হইয়া ৺যমুনোত্রি, গঙ্গোত্রি ও ৺কেদার বদরী-নারায়ণ যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলাম। জনৈক উদারচিত্ত পঞ্জাবী সাধু আমাকে তাঁহার সহিত ৺বদরীনারায়ণ যাত্রা করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন এবং অর্থাভাবে উত্তরাখণ্ড পথে আমার বিশেষ কষ্ট হইবে বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট যথেষ্ট অর্থ ছিল এবং একজন দশনামী নাগা অনুচরও তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সেই বৎসর বহু অর্থব্যয় করিয়া হৃষীকেশে মাঘমাস যাবৎ নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া প্রত্যহ সহস্রাধিক সাধু মহাপুরুষকে খাওয়াইয়াছিলেন। যাহা হউক, আমি তাঁহার কোন কথাতেই না ভুলিয়া একাকী হৃষীকেশ হইতে ডেরাডুন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

তিব্বত যাত্রার পথে হিমালয়ের যে সকল স্থানের সন্দর্শনে আমার মন নিতান্ত মুগ্ধ ও অনুরক্ত হইয়াছিল, সেই সকল শান্তি ও পুণ্যময় স্থানের

বিষয় স্মরণ করিলেও চিত্ত স্থির হয় ও হৃদয় অতিশয় পবিত্র ভাব ধারণ করে। সুতরাং তিব্বতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমাকে বাধ্য হইয়া অতি সংক্ষেপে ৺ বদরিকাশ্রম যাত্রা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিতে হইবে।

কিছু দিন হইতে বঙ্গবাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ প্রতিবৎসর ৺ বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা খুব কম ও পঞ্জাবী যাত্রীর সংখ্যাই খুব বেশী বেশী হইত। বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ও যুবকগণ লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তও আজ কাল মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এক্ষণে হিমালয়ের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা জানিতে পারিতেছেন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সাধু মহাপুরুষ যাত্রীদের নিকট একই উত্তরাখণ্ড সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। কালের প্রভাবে এক স্থানেই কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে! আবার অবস্থভেদে ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিমাণভেদে এক সময়ে দৃষ্ট একই স্থান বিভিন্ন পর্য্যটক দ্বারা বিভিন্ন আলোকে দৃষ্ট ও তদনুযায়ী বর্ণিত হইয়া থাকে। সেই জন্য আমরা প্রত্যেক যাত্রীর নিকটেই একই উত্তরাখণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ নূতন কিছু শুনিবার আশা করিয়া থাকি। বহু পূর্ব্বে যাঁহারা "মন ভঙ্গ ও চিৎ ভঙ্গের" রাস্তায় ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করিতেন, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত আজকালকার কেদারবদ্রীযাত্রীদের বৃত্তান্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁহাদিগকে যেরূপ বিষম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ৺কেদারবদরীতে পঁহুছিতে হইত, তাহা আজকালকার যাত্রীদের কল্পনাতীত। সে পথ যে কিরূপ ভয়ঙ্কর দুর্গম ছিল, তাহা ঐ নামেই প্রকাশ পাইতেছে। এমন কি, অল্পদিনের কথা, ৺হরিদ্বারে রেল যাইবার পূর্ব্বেও যাঁহারা তথায় গিয়াছেন, তাঁহারা এখন আর হরিদ্বারের সে শোভা ও শ্রী দেখিতে পান না। এখন আর ৺বদরীকেদার ও গঙ্গোত্রির পথে যাত্রীদের ত্রাসজনক নিত্যদোলায়মান পাহাড়ী ঝোলা নাই। সর্ব্বত্রই পাকা সাঁকো ও রাস্তা হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা বিবিধ প্রকারে সুগম হইয়াছে। প্রতিবৎসর সেই জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্নদেশীয় বহুলোক সমাগম হওয়ায় স্থানমাহাত্ম্য ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে উত্তরাখণ্ডবাসী পাহাড়ীদের মধ্যে কেহ চোর ছিল না। এক্ষণে যাত্রিসমাগমশূন্য হিমালয়ের অভ্যন্তরস্থ গ্রাম্য লোকের মধ্যেই

কেবল সেই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ী জনসাধারণ যতই দিন দিন নিম্নদেশীয় লোকের সংস্রবে আসিতেছে, তত ইতাহাদের স্বভাব চরিত্রেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমিও ১৬।১৭ বৎসর পূর্ব্বে হৃষীকেশ ও উত্তরাখণ্ডের যে ভাব দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে, শুনিতে পাই। কেবল তীর্থদর্শনোদ্দেশে পাকা রাস্তায় গিয়া ৺বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়াই যাঁহারা স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন, তাঁহারা আবার হিমালয়ের অনেক তথ্যই অবগত নহেন। তাঁহারা হিমালয়ের অন্তঃস্থিত অন্যান্য নিভৃত, বিজন, পরম পবিত্র ও রমণীয় তপোভূম সকলের বিষয় কিছুই জানেন না। যাঁহারা ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া কিছুকাল তথায় বাস করেন, তাঁহারাই কেবল ঐরূপ পবিত্রস্থানসমূহের মধ্যে কোন কোন স্থান দর্শন করিতে সমর্থ হন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় তিব্বৎ, সুতরাং তিব্বৎ যাইতে পথে ক্রমাগত কয়েকবৎসর যাবৎ হিমালয়ের গড়োয়াল ও কুমাউন সম্বন্ধে আমি যতদূর জানিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র এই প্রবন্ধের ভূমিকা স্বরূপে লিখিত হইবে।

হৃষীকেশ হইতে ডেরাদুন যাত্রাকালে জনৈক সাধু আমাকে উত্তরাখণ্ড প্রবেশের পূর্ব্বে পথে এক জোড়া জুতা লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি দুই দিনেই হৃষীকেশ হইতে ডেরাদুনে পঁহুছিলাম। সাধুর কথামত পথে একটী গ্রাম হইতে এক জোড়া জুতা কিনিয়া লইলাম। ডেরাদুনে দুই দিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া তথা হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী রাজপুর গ্রামে পঁহুছিলাম। মসুরী পর্ব্বতের নীচেই রাজপুর গ্রাম। রাজপুর পর্য্যন্ত আমার নিকট কয়েক আনা মাত্র পয়সা ছিল। আমি ঐখানেই তাহা ব্যয় করিয়া এককালীন রিক্তহস্ত হইলাম ও একাকী নিঃসম্বল হইয়া উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। কোন সাধু বা গৃহস্থ যাত্রীর সহিত ভ্রমণ করিব না এবং ক্ষুধার সময় ভিন্ন ভবিষ্যতের জন্য কখনও কিছু সঞ্চয় করিব না, সংকল্প করিলাম। একমাত্র ভগবান্ আমার সহায় এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সমুদয় উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিবার মানসে রাজপুর হইতে মসুরী পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম। মসুরীতে পঁহুছিয়া দেখিলাম যে, স্থানটী সাহেবদের বাঙ্গালায় পরিপূর্ণ। কেবল লণ্ডৌরের (মসুরীর বাজার পাড়াকে লণ্ডৌর বলে) একটী শিবমন্দিরে অভ্যাগত সাধুসন্ন্যাসিগণ

কষ্টে স্বষ্টে দুই এক রাত্রি বাস করিতে পারিতেন। দাক্ষিণাত্যের জনৈক প্রাচীন লিঙ্গায়েৎ জঙ্গম সাধু এই মন্দিরের অধিকারী। এইখানে এক রাত্রি বাস করিতেও আমার বিশেষ কষ্ট বোধ হইয়াছিল।

কিন্তু এই মন্দির ছাড়িয়া আর কোথায় যাই? বাজারপাড়া ছাড়া যে দিকে তাকাই, কেবল লাল মুখ। যাহা হউক, লণ্ডৌবের মন্দিরে পঁহুছিবামাত্র সেই জঙ্গম সাধুটী আমাকে বড়ই সমাদরের সহিত তাঁহার মন্দিরে আশ্রয় দিলেন। বস্ত্রের মধ্যে সেই সময়ে আমার গায়ে একটী কম্বলের আল্‌খাল্লা ও একখানি লুই মাত্র ছিল! উত্তরাখণ্ডভ্রমণোপযোগী বস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য দেখিযা এবং আমার আর্থিক সম্বল কিছুই নাই শুনিয়া সেই সাধুটী আমাকে মসুরীর জনৈক ধনাঢ্য বণিকের নিকট লইযা গিয়া একখানি কম্বল এবং একটী টাকা দেওযাইতে চাহিলেন। মসুরী হইয়া যে সকল সাধু মহাপুরুষ উত্তরাখণ্ড যাত্রা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে উক্ত বণিক্‌মহাশয় একটী টাকা ও একখানা কম্বল দিতেন। আমাকেও তাহা লইবার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, মসুরী হইতে টিহরী পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ ক্রোশ পথে ৩।৪ খানি দোকান মাত্র আছে, কোন গ্রাম নাই এবং সেই দোকানীরাও কাহাকেও ভিক্ষা দেয না। এইজন্য আহারাভাবে পথে তোমার অতিশয কষ্ট হইবে। আমি উত্তরাখণ্ড ভ্রমণকালে এককালীন অর্থস্পর্শ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি শুনিয়া তিনি অতিশয ভাবিত হইযা পথে যাহাতে আমার কোন বিপদ্ না হয়, তজ্জন্য তাঁহার আন্তরিক শুভকামনা জানাইলেন। আমাকে নিতান্ত অল্পবয়স্ক দেখিযা উক্ত জঙ্গম মহাপুরুষ আমার প্রতি অতিশয স্নেহপরবশ হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট কেবল পর্ব্বতভ্রমণোপযোগী একগাছি দীর্ঘ যষ্টি লইযাছিলাম।

যাহা হউক, আমি কিছুতেই বিচলিত না হইয়া বরং অভীষ্ট স্থানে পঁহুছিতে আর বিলম্ব নাই ভাবিয়া পরম উৎসাহের সহিত মসুরী হইতে টিহরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মসুরী হইতে ২।৩ ক্রোশ গিয়াছি, একটী দোকানী উপযাচক হইয়া আমাকে কিছু জলযোগ করাইয়া সৎকার করিল। আরও কয়েক ক্রোশ অগ্রসর হইলে উত্তর দিকে হিমালয়ের তুষারাচ্ছাদিত মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। প্রকৃতির সেই অসামান্য রূপরাশি দেখিবামাত্র আমি বসিযা পড়িলাম। অনিমেষনেত্রে সেই অপার তুষার-

রাশিপূর্ণ ভূধরশ্রেণী দর্শন করিতে করিতে আমার দেহ রোমাঞ্চিত ও মন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলকে যাহা দেখিবার জন্য উপদেশ দিতেন, এই কি সেই পুণ্যদর্শন হিমালয়? "হিমালয় শৃঙ্গে মহাদেব অঙ্কে প্রকৃতি পার্ব্বতী সতীর মিলন" কি এই? গিরিরাজকন্যা জগন্মাতা উমার এই কি পিত্রালয়? এই কি আমার চিরাভীপ্সিত স্থান হিমালয়!! বহুযোজনবিস্তীর্ণ বিশাল হিমালয় পর্ব্বতের দর্শন মাত্রে আমার হৃদয়ে যে এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। আমার প্রকৃতই মনে হইতে লাগিল যে, আমি যেন মর্ত্ত্য-লোক ছাড়িয়া কোন এক স্বর্গরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সেই অপার তুষাররাশির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আমার হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নিস্তব্ধ, গম্ভীর ও নিবিড় অরণ্যানী-সমন্বিত পর্ব্বতমালার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে আমি ভগবানের অপার মহিমা ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে বিহ্বল হইলাম এবং বিচিত্রবিভব-শালী যাবতীয় সৌন্দর্য্যের আকর গিরিরাজের পাদমূলে বার বার নমস্কার করিতে লাগিলাম। এইরূপে হিমালয়দর্শনজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া প্রায় ৮।১০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলাম। পথশ্রম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মসুরী হইতে এ পর্য্যন্ত পথে আমার সহিত দুই একটী মাত্র পার্ব্বতীয় পথিকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাদিগকে পথি-পার্শ্বস্থিত অসংখ্য বৃক্ষে প্রস্ফুটিত সুন্দর রক্তবর্ণ পুষ্পগুচ্ছ হইতে মধু আহরণ করিয়া খাইতে দেখিলাম। তাহারা কেবল মধু খাইয়া তৃপ্ত নহে, মধুভাণ্ড পুষ্পগুলি পর্য্যন্ত আহার করিতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, পাহাড়ীরা ইহাকে "বোরাস্" বলে। হিমালয়ের উচ্চ শিখরপ্রদেশে এই জাতীয় পুষ্প বিস্তর জন্মে। এই পুষ্পবৃক্ষগুলি বেশ বড় এবং ইহার কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা সকল প্রায়ই Mossএ (এক প্রকার শৈবাল) ঢাকা থাকে। এক এক গুচ্ছে অনেকগুলি পুষ্প; বর্ণ ঠিক রক্তজবার মত। মধ্যে বক ফুলের ন্যায় মধু থাকে। পাহাড়ী পথিকেরা একটু লবণ ও লঙ্কা মিশ্রিত করিয়া এই পুষ্পের অতি উপাদেয় চাট্নী প্রস্তুত করিয়া রুটীর সহিত পরম তৃপ্তিসহকারে আহার করে। আমিও প্রথম এইখানেই এই বোরাস ফুলের সহিত রুটী খাইয়াছিলাম। হিমালয় ভ্রমণের প্রথম দিনেই পরম উপাদেয় জ্ঞানে কাঁচা ফুল খাইয়া মনে করিলাম, এই রাজ্যের সকলই অদ্ভুত!

মসুরী হইতে প্রায় ১০ কোশ পথ অতিক্রম করিয়া প্রকাণ্ড এক পর্ব্বতের উপরে একখানি দোকান দেখিতে পাইলাম। সেইখানে পঁহুছিযাই দেখিলাম যে, একটী প্রৌঢ়া পার্ব্বতীয় স্ত্রীলোক সেই দোকানের অনতিদূরে বসিয়া আছে। আমিও তাহার নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া পড়িলাম। পর্ব্বতভ্রমণ ও হিমালয়ের সুশীতল বায়ুসেবনে আমার জঠরানল তখন প্রদীপ্ত। আমাকে দেখিযাই স্ত্রীলোকটী আমার নিকটে আসিয়া বসিল এবং আমি কোথা হইতে আসিতেছি ও কোথায় যাইব, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহার পর আমার তখনও আহার হয় নাই শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ আমাকে তথায় বসিতে বলিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই কয়েক খানি রুটী তৈয়ারি করিয়া এবং একটু লবণ ও লঙ্কার সহিত বোবাস্ ফুলের চাট্‌নী করিয়া আমাকে তাহা খাইতে দিল। আমি তাহার অতিথিসৎকার-স্পৃহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, এপথে কেহ কাহারও সৎকার করে না, তবে একি? আমি রুটী খাইতে লাগিলাম, আর সেই স্ত্রীলোকটী আমার মা বাপ আছেন কি না; আমি এত অল্প বযসে সন্ন্যাসী হইযাছি কেন? ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিল। আমিও যথাসম্ভব উত্তর প্রদান করিয়া তাহার সন্তোষ বিধান করিতেছি. ইত্যবসরে সে দূর. হইতে তাহার স্বামীকে মাথায় এক বোঝা কাষ্ঠ লইযা সেই দিকে আসিতে দেখিল। তাহাকে দেখিযাই সে অতিশয় শঙ্কিতচিত্তে আমাকে বলিতে লাগিল, "দেখ, আমার স্বামী অতিশয় নিষ্ঠুর ও কৃপণ-স্বভাবের লোক; কোন সাধু, সন্ন্যাসী, বা ক্ষুধাতুর পথিককে সে কখনও এক মুষ্টি ভিক্ষা দেয় না, সেই জন্য আমার স্বামী দোকানে থাকিতে আমি কাহাকেও কিছু দিতে পারি না। আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, যদি আমার স্বামী আসিয়া তোমাকে রুটী কে দিল জিজ্ঞাসা করে, প্রকৃত কথা প্রকাশ না করিয়া বলিবে যে, ময়দা তুমি কিনিয়াছ, এবং আমি কেবল রুটি কয় খানি তৈয়ার করিয়া দিয়াছি মাত্র। আমার স্বামী যদি আমি তোমাকে খাওয়াইয়াছি জানিতে পারে, তাহা হইলে সে আমার বড় অপমান করিবে।" এই কথা বলিয়াই সে তাহার স্বামী আসিয়া পঁহুছিতে না পঁহুছিতে চলিয়া গেল। যেন তাহার সহিত আমার কোন বাক্যালাপ নাই। আমি তাহার সেই কথা শুনিয়া খুব তাড়াতাড়ি

রুটী কয খানি গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, কি জানি, যদি তাহার স্বামী আসিয়া আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি একটু গোলে পড়িব। কারণ, এক দিকে সত্য কথা বলিলে আমার জীবনদায়িনী মাতৃস্থানীয়া দয়াময়ী স্ত্রীলোকটির অপমান, এবং অন্য দিকে মিথ্যাকথন,—সুতরাং সেই দোকানী যাহাতে আসিয়া আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে না পারে, আমি সেই সুযোগ দেখিতে লাগিলাম। দোকানী ভারবনতমস্তকে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার গৃহিণীকে দেখিতে পাইল সুতরাং তাহার বাহিরে আসিবার আর কোন প্রয়োজন হইল না। আমার প্রতি সে লক্ষ্যই করে নাই। ইত্যবসরে আমিও আপন কার্য্যশেষ করিয়া সেই স্ত্রীলোকটীর অকপট স্নেহ ও উদারতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

(ক্রমশঃ)

সাবিত্রী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অদূরে নর্ম্মদা নদী পবিত্রসলিলা,
(গলিত রজতস্রোত) বহে কলকলি।
শোভে উপকূলে তার চারু তপোবন,
সতত বিরাজে যথা ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্,
সপ্তকোটি দেবতার নিত্য আগমন,
হ্রী শ্রী দোঁহাকার বাঞ্ছিত আসন।
সারি সারি শোভে পর্ণকুটীরমণ্ডল,
কুশচীরপরিকীর্ণ, বেষ্টিত চৌধারে
শ্রীফল, পনস, তাল, তমাল, তিমিশ,
কেতক, চম্পক, নীপ, তিলক, তিনিশ,
অশোক, অশ্বত্থ, শমী, চন্দন, নীবার,
বিবিধ বিটপী দলে, ফলফুলে ভরী
হোমধূমে শাখা পত্র ঈষৎ মলিন,

ঘৃত মধু তৈলরসে অগুরু চন্দনে
সুচর্চ্চিত কাণ্ডমূল লোহিতচিক্কণ।
নিত্য ঋষিসহবাসে শিখিয়াছে তরু
আশ্রয়বিহীন জনে দিইতে আশ্রয়,
করিতে অতিথিসেবা, ক্ষুধার্ত্তে দানিতে
সুপক্ক রসাল ফল বহুস্বাদযুত;
ক্লান্ত জনে ছায়া দানি পল্লব-ব্যজনে,
কুসুম সৌরভদানে শ্রান্তি দূরিবারে।
সাধুর সংসর্গে হায় নাহি ঘটে যার
সুশিক্ষা, এ ভবধামে বৃথা জন্ম তার!

বিহগ বিহগীগণ বিবিধ-বরণ,
গাহি গান, চারি দিকে সুধা বরিষয়;
কেহ বা মধুর বোলে করে উচ্চারণ
বেদবাণী, ঋষিমুখে নিত্য শিক্ষা লভি,
ভাগবৎ স্তুতিমালা কেহ পাঠ করে,
ঋষিসুত কুতূহলে শিখায়েছে যাহা।
সুশীতল ছায়া লভি তরু তলে তলে
শায়িতা সবৎসা ধেনু সুলক্ষণবতী,
ধবলা শবলা কেহ কপিলা পাটলা;
ভালে সিন্দূরের বিন্দু কজ্জল নয়নে,
চন্দনে রঞ্জিত শৃঙ্গ, ক্ষুর অলক্তিত,
গলে পরাইয়া দেছে সুন্দরগাঁথনী
ফুলমালা ঋষিবধূ কৌতুক করিয়া।
হরিণ হরিণী যত, কৌতুকক্রীড়ায়
রঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালনে, ঋষিসুতচিত্তে
বাড়ায় আনন্দ কত। ভীরু শশকুল,
ইতস্ততঃ প্রধাবিত ত্রস্ত ব্যস্ত ভাবে।

মণ্ডল আকারে বসি—রাশিচক্রে যথা
গ্রহদল—ঋষিকুল বেদগানে রত।

উঠিছে ওঁকার ধ্বনি, করিয়া কম্পিত
মেদিনী, ব্যাপিছে গিয়া আকাশমণ্ডল।
কোথাও খনিয়া কুণ্ড, জ্বালিয়া অনল
মুহুঃ প্রবর্দ্ধিয়া তেজঃ হবিপ্রক্ষেপণে
রত হোমযাগে ঋষি, ঘৃতপবিমল
বহুদূর প্রবাহিত পবন বাহনে।
কোথায় বা সারি গাঁথি তাপস সকল,
পট্টবস্ত্র পরিধিয়া, চন্দন চর্চ্চিয়া,
যুড়ি কর, উর্দ্ধদৃষ্টে তুষিছেন স্তবে
দিননাথে,—নষ্ট তমঃ তেজবলে যাঁর।
পুণ্যালোকে হৃদিতমঃ মানবের যথা।
ঋষিবধূগণ যত, কেহ বা আনিছে
পুণ্য তোয ভরি ঘট, ঘৃত স্রুক্ ভরি,
চন্দন ঘর্ষিছে কেহ, জ্বালিছে অনল,
চিরিছে বা কুশচির, রাখিছে আনিয়া
ফল মূল পূত পাত্রে, ধূপ ধুনা দীপ
দিতেছে জ্বালিয়া কেহ, বাজাইছে কেহ
শংখ, শংখনখ, কাংস্য ঘণ্টা ঘণ্টী আদি।

বেদপীঠে বসি কোথা বৃদ্ধ মুনিবর
শ্বেতশ্মশ্রু, শ্বেতকেশ, রক্তপট্টবাস,
চন্দনচর্চ্চিতদেহ, ব্রাহ্মী তেজঃ বলে
মুখকান্তি বিভাসিত, গম্ভীর সুস্বরে
বর্ণিছেন হল করে, কেমন প্রকারে
পিতামহচিত্তে হায় মায়ার বিকৃতি,
গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি জল স্থল ভেদ,
তমঃ আলোকের জন্ম, কেমনে জন্মিল
দেব, উপদেব, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সর,
মানব, পতঙ্গ, কীট, পশু, পক্ষী আদি।
মানব ধাতার কিসে অনুগ্রহ সৃষ্টি,

এ ভূতলে আধিপত্য করিল স্থাপন,
ইতর যতেক ভূত নত পদতলে।
পিশাচ রাক্ষস দৈত্য ঈশ্বরবিরোধী,
পীড়িতে নিয়ত নরে দেবগণপ্রিয়,
নাশিলা কি রূপে বিভু নররূপ ধরি।
কেমনে ভারতভূমি সপ্তদ্বীপ মাঝে
ঈশ্বরের কৃপাবলে গণ্য ধন্য বলি।
কোন্ স্থলে, কোন্ কালে, কেমন প্রকারে,
কোন্ কোন্ নরপতি হইলা প্রবল,
কোন্ বংশে জন্ম কার, কোন্ কার্য্য করি
মহীতলে নরমাঝে চিরস্মরণীয়।

অশ্বত্থের ছায়ে কেহ পাতিয়া আসন
গাহিছেন রামায়ণ, কেমনে শ্রীপতি
রাক্ষসপীড়িতা ধরা করিতে উদ্ধার,
রামরূপে ভূতলে হইলা অবতার।
কেমনে কোথায় রাম রাজা অযোধ্যার,
কোথা কৈকয়ীর ছলে দারা ভ্রাতৃ সাথে,
জনকে ডুবায়ে শোকে গত বনবাস।
কেমনে হরিলা সীতা রাবণ দুর্ম্মতি
পাতি ছল। দাশরথি কপিদল সাথে,
উতারি লঙ্কার দ্বারে করিলা সংগ্রাম
অদ্ভুত, নাশিলা যত রাক্ষস দুর্জ্জয়ে।
উদ্ধারি বৈদেহসুতা ফিরি অযোধ্যায়,
কেমনে প্রেমের রাজ্য করিলা বিস্তার।

সুধার অধিক সুধা ভারতের কথা,
শ্রাবকের কর্ণমূলে ঢালিছেন কেহ।
কলির ভবিষ্য কথা বর্ণিছেন কেহ
কেমনে অচিরে হায়। ঘটিবে ভারতে
বিপর্য্যয়,—যবনের হবে প্রাদুর্ভাব।

ছাড়ি আর্য্যকুলাচার ধর্ম্ম পরিহরি,
কেমনে কলঙ্কে মুখ করিয়া উজ্জ্বল,
নির্লজ্জ আর্য্যের সুত বিচরিবে ভবে।
পুলকে উৎকর্ণ হয়ে স্ফুরিতনয়নে,
কৌতুকনির্ভর মনে ঋষিপুত্রগণ,
চারি পার্শ্বে নিজ নিজ লইয়া আসন,
পিয়িছে অমৃত কথা—পিয়িলা যেমতি
শুকমুখবিগলিত ভাগবতকথা
ঋষিকুল পুরাকালে নৈমিষ কাননে।

শ্রীহা—— ক্রমশঃ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নিতাইচরণ হালদার মহাশয় কনখল রামকৃষ্ণসেবাশ্রমে কূপখননার্থ ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কাশীরামকৃষ্ণসেবাশ্রমের কার্য্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। আশ্রমবাটীতে ১১ জন রোগীকে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইতেছে এবং ৫৮ জনকে ঔষধ, পথ্য, চাল প্রভৃতি বাটীতে পৌঁছিয়া দেওয়া হইতেছে। কলিকাতার ডাক্তার এস, কে, বর্ম্মণ মহাশয়—এই আশ্রমের জন্য প্রায় ৫০৲ টাকা মূল্যের ঔষধ বিনামূল্যে দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্প্রতি শোলাপুরে ধর্ম্মসম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২১ শে জুলাই সঙ্গীত রঙ্গালয়ে 'সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি ঈশা, মহম্মদ ও বুদ্ধদেবের জীবনী বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেন, সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য এক, সকলেই আত্মাকে নানা উপায়ে উপলব্ধির চেষ্টা করিতেছেন। এই কারণে অপর ধর্ম্মের দোষ দর্শন বা নিন্দা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে, তবে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য—দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান। ২৮শে জুলাই রিপন হলে 'সুখ'

সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন যে, পরিবর্ত্তনশীল বা অসৎ পদার্থ হইতে কখন প্রকৃত সুখলাভ হইতে পারে না, আত্মজ্ঞানেই প্রকৃত সুখ। ৩১ শে জুলাই 'স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে উক্ত স্থানেই আর এক বক্তৃতা দেন। তিনি যে কয়দিন শোলাপুরে ছিলেন, প্রতিদিনই প্রাতে ও অপরাহ্নে অনেক ব্যক্তি তাঁহার নিকট ধর্ম্মসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে আসিত। তিনিও অতি সরলভাবে সকলের সন্দেহ দূর করিয়া দিতেন। তিনি এক্ষণে মান্দ্রাজ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

হিমালয়-প্রদেশের কুমাউন জেলায় মায়াবতী নামক পাহাড়ে বেলুড় মঠের শাখাস্বরূপ অদ্বৈত আশ্রম প্রায় পাঁচ বৎসরের অধিক হইল,স্থাপিত হইয়াছে। এই মায়াবতী পাহাড় সমুদ্রসমতল হইতে ৬৮০০ ফিট উচ্চ। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি রমণীয় এবং ইহা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে যাইতে হইলে কলিকাতা, হাওড়া হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে মোগল সরাই যাইতে হয়। তথা হইতে আউধ রোহিলখণ্ড রেলযোগে বেরিলি ষ্টেশনে পঁহুছিযা তথা হইতে রোহিলখণ্ড কুমাউন রেলযোগে কাটগুদাম ষ্টেশনে নামিতে হয়। এই শেষ রেলওয়ে ষ্টেশন। কাটগুদাম ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হিমালয়ের সৌন্দর্য্য যাত্রীর নয়নপথে পতিত হয়। এখান হইতে মায়াবতী ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পার্ব্বত্য পথটুকু ঘোঁড়ায় চড়িয়া, ডাণ্ডি নামক কুলিবাহিত যানযোগে অথবা পদব্রজে যাইতে হয়। এই স্থান ভারতীয় যুক্ত প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস নাইনিতাল হইতে প্রায় ৭০ মাইল এবং এই জেলার রাজধানী আল্‌মোড়া হইতে ৪৭ মাইল দূরবর্ত্তী। এই আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটী সন্ন্যাসী শিষ্য এবং আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিসেস সেভিয়ার বাস করেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য—অদ্বৈত বেদান্তের শিক্ষা ও তদুপযোগী সাধনা। এই আশ্রমে শিক্ষিত হইবার জন্য ব্রহ্মচারী গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি দুই জন ব্রহ্মচারী শিক্ষালাভ করিতেছেন। যদি কোন গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ এই আশ্রমে কিছু দিনের জন্য বা চির কালের জন্য বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জন্যও বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে। আশ্রমের নিয়মাবলি জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিতে হয়। অদ্বৈতাশ্রম, মায়াবতী,লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া)।

উক্ত আশ্রম হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রবুদ্ধ ভারত নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাহাতে ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ সকলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা প্রত্যেক কার্য্যে লাগাইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যেই উক্ত পত্র প্রচারিত হয়। বিগত জুলাইমাস হইতে উহা পূর্ব্বাপেক্ষা সাধারণের অধিকতর উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী পত্রগুলির মূল ইহাতে ধারাবাহিকরূপে মুদ্রিত হইতেছে। সন্ন্যাসিগণ লিখিত অন্যান্য প্রবন্ধ ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তির ইংরাজী অনুবাদ, শাস্ত্রোক্ত বা মহাপুরুষরচিত সংস্কৃত স্তোত্রের মূল ও ইংরাজী অনুবাদ এবং ভাল ভাল ইংরাজী গ্রন্থকারের মূল্যবান্ উক্তিসমূহ ইহাতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইবে। ইহা ব্যতীত পাঠকগণের পরস্পর প্রশ্নোত্তর দ্বারা ভাব আদান প্রদানের জন্য এক পৃষ্ঠা রাখা হইয়াছে। ভাল গ্রন্থের চিন্তাশীল বিস্তৃত সমালোচনাও ইহাতে প্রকাশিত হয়। জুলাই মাসে Hindu Social Progress ও আগষ্ট মাসের পত্রে সিষ্টার নিবেদিতার The Web of Indian Life এর বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রের বার্ষিক মূল্য ১॥০। কার্য্যাধ্যক্ষ, প্রবুদ্ধভারত, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমুদয় বিবরণ জানা যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং আদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলোব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ। ভবান্ পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম, পরমং পবিত্র (চ)। (বশিষ্ঠাদয়ঃ) সর্ব্বে ঋষয়ঃ তথা দেবর্ষিঃ নারদঃ, অসিতঃ, দেবলঃ, ব্যাসঃ, ত্বাং শাশ্বতং অজং দিব্যং আদিদেবং বিভুং পুরুষং আহুঃ। স্বয়ং চ এব মে (তথা) ব্রবীষি চ। ১২—১৩।

মূলানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, আপনিই পর ব্রহ্ম, প্রকৃষ্ট জ্যোতিঃ এবং পরম পবিত্র। (বশিষ্ঠাদি) ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাসও বলেন যে, তুমি সনাতন পুরুষ, তুমি দিব্য, তুমি আদিদেব, তুমি জন্মহীন ও সর্ব্বব্যাপী এবং তুমিও নিজেও আমাকে এই প্রকারই বলিতেছ। ১২—১৩।

ভাষ্য। যথোক্তাং ভগবতো বিভূতিং যোগং চ শ্রুত্বা—(অর্জ্জুন উবাচ) পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা, পরং ধাম পরং তেজঃ, পবিত্রং পাবনং পরমং প্রকৃষ্টং ভবান্। পুরুষং, শাশ্বতং নিত্যম্, দিব্যং দিবি ভবং, আদিদেবং সর্ব্ব-দেবানামাদৌ ভবং, অজং, বিভুং বিভবনশীলং, ঈদৃশং আহুঃ কথয়ন্তি ত্বাং ঋষয়ঃ বশিষ্ঠাদয়ঃ সর্ব্বে, দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলোঽপি এবমাহ ব্যাসশ্চ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে। ১২—১৩।

ভাষ্যানুবাদ। ভগবানের যথোক্ত বিভূতি ও যোগ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, আপনি "পরব্রহ্ম" পরমাত্মা, "পর ধাম" পরম তেজঃ, "পরম পবিত্র" প্রকৃষ্ট পাবন। বশিষ্ঠাদি সকল ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, দেবল ও অসিত এবং ব্যাসও বলিয়া থাকেন যে, তুমি পুরুষ, "শাশ্বত" নিত্য, "দিব্য" স্বর্গে অবস্থিত, "আদি দেব" সকল দেবতার আদিতে অবস্থিত, "দেব" (দ্যোতনশীল) "বিভু" ব্যাপকস্বভাব, তুমি নিজেও আমাকে (এই প্রকারই) বলিতেছ। ১২—১৩।

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ। হে কেশব মাং যদ্ বদসি এতৎ সর্ব্বং ঋতং মন্যে, হে ভগবন্ হি (যস্মাৎ) তে ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ (তথা) দানবা (অপি) ন (বিদুঃ)। ১৪।

মূলানুবাদ। হে কেশব, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই আমি সত্য বলিয়াই বোধ করিতেছি। কারণ, হে ভগবন্, তোমার প্রভাব দেবতাগণও বুঝেন না, দানবগণও বুঝেন না। ১৪।

ভাষ্য। সর্ব্বমিতি। সর্ব্বমেতদ্ যথোক্তং ঋষিভিস্ত্বয়া চ তদৃতং সত্যমেব মন্যে। যন্মাং প্রতি বদসি ভাষসে হে কেশব; ন হি তে তব ভগবন্ ব্যক্তিং প্রভবং বিদুঃ ন দেবা ন দানবাঃ। ১৪।

ভাষ্যানুবাদ। সর্ব্বং ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ এই যে) যে সকল বিষয় ঋষিগণ ও তুমি যে ভাবে বলিযাছ, তাহা সকলই সেই ভাবেই সত্য বলিয়া বোধ করিতেছি। তুমি (নিজে) তোমার (যে স্বরূপের বিষয়) বলিযাছ, সেই স্বরূপ দেবতারাও জানেন না, দানবগণও জানেন না। ১৪।

স্বযমেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। হে ভূতভাবন! ভূতেশ! দেবদেব! জগৎপতে! পুরুষোত্তম! ত্বং স্বযমেব আত্মনা আত্মানং বেত্থ। ১৫।

মূলানুবাদ। হে ভূতভাবন! ভূতেশ! দেবদেব! জগৎপতে! পুরুষোত্তম! তুমি নিজেই আপনার প্রভাবে আপনাকে জান (অপর কেহই পূর্ণভাবে তোমাকে জানিতে পারে না)। ১৫।

ভাষ্য। যতস্ত্বং দেবানামাদিরতঃ—স্বযমেবাত্মনা আত্মানং বেত্থ ত্বং নিরতিশযজ্ঞানৈশ্বর্য্যবলাদিশক্তিমন্তমীশ্বরং পুরুষোত্তম। ভূতানি ভাবযতীতি ভূতভাবনো হে ভূতভাবন ভূতেশ ভূতানামীশিতঃ হে দেবদেব জগৎপতে। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ। হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন (যিনি প্রাণিগণের জন্মদাতা, তিনিই ভূতভাবন) হে ভূতনিবহের ঈশ্বর, হে দেবদেব জগৎপতে, যে কারণে তুমি দেবাদি সকল প্রাণীর প্রথম, সেই কারণেই তুমি নিজেই সেই আপনাকে আপনি বুঝিতে পার যে, তোমার জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বল প্রভৃতি শক্তি অসীম, তুমিই ঈশ্বর। ১৫।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬॥

অন্বয়। ত্বং যাভির্বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি (তাঃ) দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ (আত্মবিভূতীঃ) অশেষেণ বক্তুমর্হসি। ১৬।

মূলানুবাদ। তুমি যে সকল বিভূতির দ্বারা এই লোকসমূহকে ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই সকল দিব্য বিভূতি কিপ্রকার, তাহা (আমাকে) সম্পূর্ণ ভাবে বল। ১৬।

ভাষ্য। বক্তুমিতি। বক্তুং কথয়িতুমর্হসি অশেষেণ দিব্যা হ্যাত্ম-বিভূতয়ঃ আত্মনো বিভূতযো যাস্তাঃ বক্তুমর্হসি। যাভির্বিভূতিভিরাত্মনো মাহাত্ম্যবিস্তারৈরিমান্ লোকান্ ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ। বক্তুং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যে সকল নিজ "বিভূতি" ও মাহাত্ম্য বিস্তার দ্বারা তুমি এই সকল লোককে ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই সকল "দিব্য" অপ্রাকৃত আত্মবিভূতি (অর্থাৎ) নিজের বিভূতি বলিতে তুমিই যোগ্য হও। ১৬।

কথং বিদ্যামহং যোগিন্ ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া॥ ১৭॥

অন্বয়। হে যোগিন্ সদা পরিচিন্তয়ন্ (অহং) ত্বাং কথং বিদ্যাং। হে ভগবন্ কেষু কেষু ভাবেষু ময়া ত্বং চিন্ত্যোঽসি চ। ১৭।

মূলানুবাদ। হে যোগিন্, সর্ব্বদা কি প্রকারে চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে পারিব? হে ভগবন্, কোন্ কোন্ বস্তুতে আমি তোমার ধ্যান করিব? ১৭।

ভাষ্য। কথমিতি। কথং বিদ্যাং বিজানীয়াং অহং হে যোগিন্ ত্বাং সদা পরি-চিন্তয়ন্। কেষু কেষু চ ভাবেষু বস্তুষু চিন্ত্যোঽসি ধ্যেয়োঽসি ভগবন্ ময়া। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। কথমিত্যাদি শ্লোকের অর্থ। কি প্রকারে হে যোগিন্, সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে আমি তোমাকে জানিতে পারিব? কোন্ কোন্ ভাবে অর্থাৎ বস্তুতে হে ভগবন্, আমি তোমাকে চিন্তা করিব অর্থাৎ ধ্যান করিব? । ১৭।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্। ১৮।

অন্বয়। হে জনার্দ্দন আত্মনো যোগং বিভূতিং চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়, হি (যতঃ) অমৃতং শৃণ্বতো মে তৃপ্তির্নাস্তি। ১৮।

মূলানুবাদ। হে জনার্দ্দন, তুমি পুনর্ব্বার বিস্তীর্ণভাবে নিজের যোগ ও বিভূতি বর্ণন কর, কারণ, (তোমার মুখ হইতে নিঃসৃত বাক্যরূপ) অমৃত পান করিতে করিতে আমি এখনও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। ১৮।

ভাষ্য। বিস্তরেণেতি। বিস্তরেণ আত্মনো যোগং যোগৈশ্বর্য্যশক্তিবিশেষং বিভূতিঞ্চ বিস্তরং ধ্যেয়পদার্থানাং হে জনার্দ্দন (অর্দ্দতের্গতিকর্ম্মণোরূপম্) অসুরাণাং দেবপ্রতিপক্ষভূতানাং জনানাং নরকাদিগমযিতৃত্বাজ্জনার্দ্দন। অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপুরুষার্থপ্রয়োজনং সর্ব্বৈর্জনৈর্যাচ্যতে ইতি বা। ভূয়ঃ পূর্ব্বমুক্তমপি কথয়, তৃপ্তির্হি পরিতোষো যস্মাৎ নাস্তি মে শৃণ্বতস্ত্বন্মুখনিঃসৃতবাক্যামৃতম্। ১৮।

ভাষ্যানুবাদ। বিস্তরেণ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। বিস্তারের সহিত তোমার নিজের "যোগ" যোগৈশ্বর্য্যশক্তিবিশেষ এবং বিভূতি (অর্থাৎ) ধ্যেয় বস্তুনিবহের বিস্তর আধিক্য "ভূয়ঃ" একবার পূর্ব্বে বলা হইলেও পুনর্ব্বার, বল হে জনার্দ্দন। (গতিকর্ম্মক অর্দ্দ ধাতু হইতে অর্দ্দন এইরূপটী নিষ্পন্ন হইয়াছে) জনগণের (অর্থাৎ) দেবতাগণের শত্রু অসুরগণের নরকাদিলোকপ্রাপ্তির পক্ষে কারণ বলিয়া (তিনি) জনার্দ্দন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অথবা সুখ ও মোক্ষলাভ করিবার জন্য তিনি জনগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া থাকেন, এই জন্যও তাঁহাকে জনার্দ্দন বলা যাইতে পারে। যে কারণ তোমার মুখ হইতে নির্গত বাক্যরূপ অমৃত পান করিয়া আমার (এক্ষণও) "তৃপ্তি" পরিতোষ হয় নাই। ১৮।

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯॥

অন্বয়। হে কুরুশ্রেষ্ঠ তে দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ (আত্মবিভূতীঃ) প্রাধান্যতঃ কথয়িষ্যামি হন্ত হি (যতঃ) মে বিস্তরস্য অন্তো নাস্তি। ১৯।

মূলানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ। আমার দিব্য আত্মবিভূতিসমূহের মধ্যে যাহা প্রধান, সেইগুলি তোমাকে বলিব, কারণ, আমার বিভূতির বিস্তার অনন্ত। ১৯।

ভাষ্য। হন্ত তে ইত্যাদি। হন্তেদানীং তে দিবিভবাঃ আত্মবিভূতয়ঃ আত্মনো মম যা বিভূতয়ঃ তাঃ কথয়িষ্যামি ইত্যেতৎ প্রাধান্যতো যত্র যত্র প্রধানা যা যা বিভূতিস্তাং তাং প্রধানাং প্রাধান্যতঃ কথয়িষ্যামি কুরুশ্রেষ্ঠ। অশেষতস্তু শতেনাপি বর্ষৈঃ ন শক্যা বক্তুং। যতো নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে মম বিভূতীনামিত্যর্থঃ। ১৯।

ভাষ্যানুবাদ। হন্ত তে ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। হন্ত (হর্ষসূচক অব্যয়) এক্ষণে তোমাকে "দিব্য" (স্বর্গীয়) আত্মবিভূতি অর্থাৎ আমার নিজের বিভূতি বলিতেছি, ইহাই তাৎপর্য্য। "প্রাধান্যতঃ" অর্থাৎ যেখানে যেখানে আমার যে যে প্রধান বিভূতি আছে, সেই সেই প্রধান বিভূতিই প্রাধান্যতঃ নির্দ্দেশ করিব। আমার যত কিছু বিভূতি আছে, তাহা শত বর্ষ বলিয়াও শেষ করা যায় না। কারণ, আমার বিভূতির বিস্তারের অন্ত নাই। ইহাই অর্থ। ১৯।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥

অন্বয়। হে গুড়াকেশ। অহং সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা, অহং এব ভূতানাং আদিশ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ। ২০।

মূলানুবাদ। হে জিতনিদ্র। আমি সকল প্রাণীর আশয়ে অবস্থিত আত্মা, আমিই সকল ভূতের আদি, মধ্য এবং অন্ত। ২০।

ভাষ্য। তত্র প্রথমমেব তাবচ্ছৃণু। অহমাত্মা প্রত্যগাত্মা গুড়াকেশ গুড়াকা নিদ্রা তস্যাঈশ গুড়াকেশ জিতনিদ্র ইত্যর্থঃ। ঘনকেশ ইতি বা। সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়ে অন্তর্হৃদি স্থিতোঽহমাত্মা প্রত্যগাত্মা নিত্যং ধ্যেয়ঃ। তদশক্তেন চ উত্তরেষু ভাবেষু চিন্ত্যোঽহং চিন্তয়িতুং শক্যঃ। যস্মাদহমেব আদির্ভূতানাং কারণং তথা মধ্যঞ্চ স্থিতিরন্তঃ প্রলয়শ্চ। ২০।

ভাষ্যানুবাদ। তাহার মধ্যে প্রথমেই সম্পূর্ণভাবে শুন। হে, "গুড়াকেশ" গুড়াকা (শব্দের অর্থ) নিদ্রা তাহার ঈশ অর্থাৎ জিতনিদ্র অথবা (গুড়াকেশ

শব্দের অর্থ) ঘনকেশ। আমি আত্মসকলের আত্মা (অর্থাৎ পরব্রহ্ম) (সেই আত্মার কি স্বরূপ ?) সকল প্রাণীর আশয়ে (অর্থাৎ) অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিত। অর্থাৎ সর্ব্বভূতের প্রত্যগাত্মা এইরূপে আমার সর্ব্বদা ধ্যান করা উচিত। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ধ্যান করিতে অসমর্থ, সে বক্ষ্যমাণ বস্তুনিচয়ে আমাকে ধ্যান করিবে, যে কারণে আমিই সর্ব্বভূতের "আদি" কারণ "মধ্য" স্থিতি এবং "অন্ত" প্রলয়।২০।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥২১॥

অন্বয়। অহং আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ (অস্মি) জ্যোতিষাং অংশুমান্ রবিঃ (অস্মি) মরুতাং মরীচিঃ (অস্মি) অহং নক্ষত্রাণাং শশী (অস্মি)।২১।

মূলানুবাদ। আমি দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্য। জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক বস্তুনিচয়ের মধ্যে আমি রশ্মিমান্ সূর্য্য। মরুৎ এই নামে প্রথিত দেবতাগণের মধ্যে আমি মরীচি। এবং আমিই নক্ষত্রনিবহের মধ্যে চন্দ্র (স্বরূপে বিদ্যমান আছি)।২১।

ভাষ্য। এবং চ ধ্যেয়োঽহং—আদিত্যানাং দ্বাদশানাং বিষ্ণুর্নাম আদিত্যোঽহং জ্যোতিষাং রবিঃ প্রকাশয়িতৄণাং অংশুমান্ রশ্মিমান্। মরীচির্নাম মরুতাং মরুদ্দেবতাভেদানাং অস্মি। নক্ষত্রাণামহং শশী চন্দ্রমাঃ।২১।

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকারে ধ্যান করিতে হইবে। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণুনামক আদিত্য। জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশকারী পদার্থগণের মধ্যে আমি অংশুমান সূর্য্য। মরুৎ এই নামে প্রসিদ্ধ দেবতাগণের মধ্যে আমি মরীচি। এবং নক্ষত্রনিচয়ের মধ্যে আমি চন্দ্রমাঃ।২১।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥২২॥

অন্বয়। (অহং) বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ অস্মি। ইন্দ্রিয়াণাং চ মনঃ অস্মি, ভূতানাং চেতনা অস্মি।২২।

মূলানুবাদ। আমি চারি বেদের মধ্যে সামবেদ; দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অন্তঃকরণ এবং প্রাণিগণের মধ্যে চেতনা (স্বরূপে বিদ্যমান) রহিয়াছি।২২।

ভাষ্য। বেদানামিতি। বেদানাং মধ্যে সামবেদোঽস্মি। দেবানাং রুদ্রাদিত্যাদীনাং বাসবইন্দ্রোঽস্মি। ইন্দ্রিয়াণাং একাদশানাং চক্ষুরাদীনাং মনশ্চাস্মি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং মনশ্চাস্মি। ভূতানাং অস্মি চেতনা কার্য্য-করণসঙ্ঘাতে নিত্যাভিব্যক্তা বুদ্ধিবৃত্তিশ্চেতনা।২২।

ভাষ্যানুবাদ। বেদানাং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। চারিটী বেদের মধ্যে আমি সামবেদ হই। দেবগণের অর্থাৎ রুদ্র ও আদিত্যাদির মধ্যে আমি "বাসব" ইন্দ্র হই। ইন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়-গণের মধ্যে আমি মন। যে অন্তঃকরণে সংকল্প ও বিকল্প নামে বৃত্তিদ্বয় উৎপন্ন হয়, সেই অন্তঃকরণকে মন কহে, আমি সেই মন হই। ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা হই। অর্থাৎ এই কার্য্য ও করণের সমুদায়রূপদেহে নিত্য অভিব্যক্ত বুদ্ধিবৃত্তিই চেতনা শব্দের প্রতিপাদ্য। এই দেহের মধ্যে আমিই সেই চেতনারূপে আছি।২২।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাং।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্।২৩।

অন্বয়। রুদ্রাণাং চ শঙ্করঃ অস্মি, যক্ষরক্ষসাং বিত্তেশঃ (অস্মি) বসূনাং পাবকঃ (অস্মি) অহং শিখরিণাং মেরুঃ (অস্মি)।২৩।

মূলানুবাদ। আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর হই। যক্ষ ও রাক্ষস-গণের মধ্যে কুবের হই। বসুগণের মধ্যে পাবক হই এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু হই।

ভাষ্য। রুদ্রাণামিতি (রুদ্রাণামেকাদশানাং শঙ্করশ্চাস্মি। বিত্তেশঃ কুবেরঃ যক্ষরক্ষসাং যক্ষাণাং রক্ষসাং চ। বসূনাং অষ্টানাং পাবকশ্চাস্মি অগ্নিঃ। মেরুঃ শিখরিণাং শিখরবতামহম্। ২৩।

ভাষ্যানুবাদ। রুদ্রাণাং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর হই। যক্ষ ও রক্ষোগণের মধ্যে আমি বিত্তেশ অর্থাৎ কুবের, অষ্ট বসুর মধ্যে আমি পাবক অর্থাৎ অগ্নি এবং উচ্চশৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু হই।২৩।

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিং।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ।২৪।

অন্বয়। হে পার্থ মাং পুরোধসাং মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি। সেনানীনামহং স্কন্দঃ (অস্মি) সরসাং (অহং) সাগরঃ অস্মি ।২৪।

মূলানুবাদ। হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলিয়া জানিও। আমি সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় হই। এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে সমুদ্র হই ।২৪।

ভাষ্য। পুরোধসামিতি। পুরোধসাং রাজপুরোহিতানাং মুখ্যং প্রধানং মাং বিদ্ধি জানীহি হে পার্থ বৃহস্পতিম্। স হি ইন্দ্রস্যেতি মুখ্যঃ স্যাৎ পুরোধাঃ। সেনানীনাং সেনাপতীনাং অহং স্কন্দঃ দেবসেনাপতিঃ। সরসাং যানি দেবখাতানি সরাংসি তেষাং সরসাং সাগরোঽস্মি ভবামি ।২৪।

ভাষ্যানুবাদ। পুরোধসামিত্যাদি শ্লোকের অর্থ। পুরোধাঃ (অর্থাৎ) রাজপুরোহিতগণের মধ্যে আমাকে "মুখ্য" প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে। বৃহস্পতি ইন্দ্রের পুরোহিত, এই কারণে প্রধান। সেনানী (অর্থাৎ) সেনাপতিগণের মধ্যে আমি "স্কন্দ" দেবসেনাপতি। "সরঃ" অর্থাৎ যে সকল দেবখাত জলাশয় আছে, তাহাদিগের মধ্যে আমি সাগর হই।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ। ২৫।

অন্বয়। অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ গিরাং একমক্ষরং অস্মি, যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ অস্মি। ২৫।

মূলানুবাদ। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু. পদসমূহের মধ্যে আমি এক ওঁকার হই, যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ হই, স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয় হই। ২৫।

ভাষ্য। মহর্ষীণামিতি। মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরাং বাচাং পদলক্ষণানাং একমক্ষরং ওঁকারোঽস্মি। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি, স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং হিমালয়ঃ। ২৫।

ভাষ্যানুবাদ। মহর্ষীণাং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। মহর্ষিগণের মধ্যে

সৃষ্টিতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল।

কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার শক্তির যে প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অস্পষ্টা, এবং চৈতন্যবিরহিতা বলিয়া অসম্পূর্ণা। তিনি যে আদ্যন্তবিরহিতা, চৈতন্যনিরপেক্ষা সনাতনী শক্তিকে সমস্ত জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শক্তি জড়, সুতরাং এই জড় প্রকৃতি হইতে চিদচিদাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে? জড় হইতে কখনও চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় না, অজ্ঞান হইতে জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব। এই সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতি সংহতা এবং সংহতা বলিয়াই পরার্থা; সুতরাং এই পরার্থা পরিণামবিশিষ্টা প্রকৃতি কি কখনও ভোক্তা হইতে পারে? অতএব প্রকৃতি যাহার ভোগের নিমিত্ত সদাব্যস্ত, যাঁহার জন্য স্বয়ং এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে, সেই ভোক্তা নিশ্চয়ই অসংহত, সেই ভোক্তা নিশ্চয়ই অপরিণামী। যদি জড়প্রকৃতির অতিরিক্ত চৈতন্য না থাকিত, তাহা হইলে মোক্ষাভিলাষে মনুষ্যের কখনও প্রবৃত্তি হইত না। স্বস্বরূপতালাভ করাই মোক্ষ। সুতরাং চেতন জীবের স্বরূপ কখনও অচেতন হইতে পারে না, অতএব নিশ্চয়ই এই সংহত পরিণামবিশিষ্টাজড়প্রকৃতিব্যতিরিক্ত, অসংহত, অপরিণামী এবং চৈতন্যময় পুরুষ বিদ্যমান আছেন। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে অন্ধপঙ্গুর ন্যায় পরস্পর সাপেক্ষ পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ হইতেই সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে। সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের অপেক্ষা থাকিলেও সাংখ্যাচার্য্যেরা পুরুষকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, পুরুষ যখন অপরিণামী, তখন পুরুষকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে পুরুষ কখনও অসংহত হইতে পারেন না, এবং পুরুষের সংহত্যকারিত্ব স্বীকার করিলে পরার্থতাপত্তি হেতু অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের টীকাকার বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন,—

"পুরুষস্যাপরিণামিত্বেন কারণতাবাঙ্গ্যান্তরস্যাঃ কারণত্বৌচিত্যমিত্যর্থঃ, পুরুষস্যাপরিণামিত্বে চেদং বীজং পুরুষস্য সংহত্যকারিত্বে পরার্থত্বাপত্ত্যানবস্থা।"

সুতরাং প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ। প্রকৃতি জড় হইলেও অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্য হেতু লৌহের যেরূপ চেষ্টা হইয়া থাকে, চৈতন্যের সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতিতেও সেইরূপ সৃষ্টিবিষয়ক প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়।

পুরুষের ভোগাপবর্গের নিমিত্ত প্রকৃতি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইয়া থাকেন। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতির প্রথম পরিণাম, মহত্তত্ত্ব আরও স্থূলরূপে পরিণত হইলে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই অহঙ্কার হইতেই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি হয়। স্থূলতা এবং সূক্ষ্মতা লইয়াই মহত্তত্ত্বাদির সহিত অব্যক্তের প্রভেদ, অব্যক্ত সূক্ষ্ম, এবং মহত্তত্ত্বাদি অব্যক্ত অপেক্ষা স্থূল ও ব্যক্ত।

"অভিব্যক্তাৎ ত্রিগুণান্মহত্তত্ত্বাদপি মূলকারণমব্যক্তং সূক্ষ্মং মহত্তত্ত্বস্য হি সুখাদিগুণৈঃ সাক্ষাৎ ক্রিয়তে, প্রকৃতেশ্চ গুণোঽপি ন সাক্ষাৎ ক্রিয়ত ইতি, প্রধানং পরমাব্যক্তং মহত্তত্ত্বং তু তদপেক্ষয়া ব্যক্তমিত্যর্থঃ" বিজ্ঞানভিক্ষু। মহর্ষি বশিষ্ঠদেবও "চিন্মাত্রাকাশমেবাদৌ ততোঽস্মীত্যেব বেদনং, তদ্ঘনং কথ্যতে বুদ্ধিঃ সা ঘনা মন উচ্যতে", এই বাক্য দ্বারা প্রকারান্তরে ঐ কথাই বলিয়াছেন।

আমরা যতদূর পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, কেবল জড় হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না, সুতরাং জড়ব্যতিরিক্ত চৈতন্যের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্য এই চৈতন্যকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে মহদাদিক্রমে কিরূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও দেখাইয়াছেন; দেখাইয়াছেন যে, জগতের সমস্ত পদার্থই ত্রিগুণাত্মক; সমস্ত বস্তুতেই সত্ত্ব রজঃ বা তমঃ কোন না কোন গুণের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং জগতের উপাদান কারণ নিশ্চয়ই সত্ত্বরজস্তমোময়। এই সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থাকে সাংখ্য প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সাংখ্যের পুরুষ যদিও নিষ্ক্রিয়, উদাসীন এবং নিত্যমুক্ত, প্রকৃতি যদিও জড়, তাহা হইলেও অন্ধ পঙ্গুর ন্যায় পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ হইতে সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে। চৈতন্যের সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে মহদাদিক্রমে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দেখিয়াছি যে, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব—প্রকৃতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যক্ত, কিঞ্চিৎ

স্থূল। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং রজোগুণের সাহায্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের এবং তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের, এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি হয়।

সাংখ্যাচার্য্যেরা পুরুষপ্রকৃতির যে সংযোগরূপ ভিত্তির উপর এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সাংখ্য বলিয়াছেন, প্রকৃতি জড় হইলেও পঙ্গু যেরূপ অন্ধকে গমনকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করায়, পুরুষও সেইরূপ প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি জানিতাম, পঙ্গু পুরুষের ন্যায় নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন, বুঝিতাম যদি পঙ্গুতে বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি কিছুই নাই, তাহা হইলে সাংখ্যের এই দৃষ্টান্তকে সৎ বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন দেখিতেছি, পঙ্গুতে বাক্‌শক্তি, কল্পনাশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন পঙ্গুর সহিত নিষ্ক্রিয় উদাসীন নিত্যমুক্ত পুরুষের তুলনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যে নিষ্ক্রিয়, যে উদাসীন, যে নিত্যমুক্ত, তাহার প্রবর্ত্তকত্ব কখনও স্বীকার করা যাইতে পারে না। চুম্বকের সান্নিধ্যহেতু লৌহেতে যেরূপ চেষ্টা হয়, পুরুষের সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতিও সেই রূপ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকেন, এরূপ বলাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, চুম্বকের সান্নিধ্য অনিত্য এবং কারণান্তরের অপেক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ ঘটায় এরূপ কোন কারণান্তর পরিলক্ষিত হয় না, সুতরাং পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ অসম্ভব, আবার পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ হেতু সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি না ঘটিলেও সৃষ্টিকার্য্য হইতে পারে না। সাম্যাবস্থাতেও সত্ত্বরজস্তমো গুণের বৈষম্যপ্রাপ্তির যোগ্যতা আছে স্বীকার করিলেও জড় প্রকৃতিতে জ্ঞানশক্তির অভাবহেতু, এরূপ বিচিত্রতাময়, শৃঙ্খলাযুক্ত জগৎ রচনা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, সুতরাং এই জড়প্রকৃতি কখনও জগৎকারণ হইতে পারে না।

কেবল জড় পরমাণুও জগতের কারণ হইতে পারে না, তাহাও মহর্ষি বেদব্যাস তৎপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রে "মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মের উপাদানকারণত্বই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতিও

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি" এবং "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন,এবং ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত কারণ,তাহাও "স ঈক্ষাঞ্চক্রে সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয," ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দেখাইয়াছেন। যখন সৃষ্টির পূর্ব্বে এক ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই বিদ্যমান ছিল না,তখন ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ব্রহ্মই যদি জগতের উপাদান কারণ, তাহা হইলে জগতে ব্রহ্মবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় কেন? জগৎ জড় এবং নানারূপ দুঃখজালে পরিপূর্ণ, কিন্তু ব্রহ্ম বিশুদ্ধ এবং কলনারহিত, মহর্ষি শঙ্করাচার্য্য এই প্রকার নানা রূপ আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক একে একে সমস্ত আপত্তিগুলিই শ্রুতি ও যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করিয়াছেন ; দেখাইয়াছেন, চেতনই যে চেতনের প্রভব এবং অচেতন হইতেই যে অচেতনের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। মনুষ্য চেতন, কিন্তু তদুৎপন্ন কেশনখাদি অচেতন, এবং অচেতন গোময়াদি হইতেও চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মের অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে চেতনাচেতন শব্দদ্বয়ের ব্যবহার হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সত্তাসামান্যরূপে সমস্ত বস্তুতেই বিদ্যমান রহিয়াছেন ; তরঙ্গের যেরূপ সলিলাতিরিক্ত সত্তা পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

সমুদ্র যেরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গমালায় বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ব্রহ্মও সেইরূপ এই কোটি জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মের সহিত অবিভাগাপন্না মায়া নাম্নী যে শক্তি আছে, সেই শক্তি হইতে প্রথমে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম-ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রথমে সূক্ষ্মাকাশ তৎপরে সূক্ষ্মবায়ু তদনন্তর সূক্ষ্মতেজ এবং তাহা হইতে সূক্ষ্মসলিল, এবং তৎপরে সূক্ষ্ম পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। আকাশের সত্বাংশ হইতে শ্রোত্রেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্বাংশ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সত্বাংশ হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, জলের সত্বাংশ হইতে রসনেন্দ্রিয় ও পৃথিবীর সত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, এবং এই পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সমষ্টি সত্বাংশ হইতে মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের ব্যষ্টি রজোঽংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের এবং সমষ্টি রজোঽংশ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়। এইরূপে পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের তমোঽংশ হইতে পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন মতগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি, এক্ষণে তাহাই আপনাদের নিকট প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্রগুলি যথাশক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, সমস্ত দর্শন শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক, সাংখ্যমতাবলম্বীই হউন, নৈয়ায়িকই হউন, বৈদান্তিকই হউন, সকলেরই হৃদয় একসূত্রে গ্রথিত, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক এক উদ্দেশ্যেই ধাবিত হইয়াছেন। যাহার কর্ণ আছে, সেই শুনিতে পাইবে যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই হৃদয় হইতে,

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপোবহিশ্চ॥
বায়ুর্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপোবহিশ্চ॥
সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু-
র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥"

এই সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে; যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পাইবে যে, তাঁহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা সমস্তই অদ্বৈতে যাইয়া বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে।

যখন এই পরিদৃশ্যমান কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে যাইয়া লীন হয়, যখন স্থূলভূত সমুদায় সূক্ষ্মভূতে এবং সূক্ষ্মভূত সমুদয় মায়াতে যাইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, তখন প্রকৃতির সেই নামরূপবিবর্জ্জিতা তমোময়ী মূর্ত্তি চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় না বিস্ময়রসে অভিভূত হয়? বাস্তবিকই এ মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করী। বোধ হয় যেন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত হইয়া রহিয়াছে। তখন দ্রষ্টাও নাই, দৃশ্যও নাই, জড়ও পরিলক্ষিত হয় না, চেতনও দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন কেবল দ্বৈতবিবর্জ্জিত একমাত্র সৎ আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করিতে থাকেন। এই ভয়ঙ্কর প্রলয়াবস্থা স্মরণ করিলে মনে হয়, আর বুঝি সৃষ্টি

হইবে না, আর বুঝি সুখ দুঃখ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া জীবগণ কাতর স্বরে চীৎকার করিবে না, বাস্তবিকই তখন মনে হয়, জীবকুল জ্বালাযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া শাশ্বত শান্তি লাভ করিল ; সৃষ্টিকার্য্য যে অনাদি, তখন তাহা ভুলিয়া যাই ; তখন মনে হয় না যে, সমস্ত বাসনাবীজ শক্তিরূপে লীন রহিয়াছে। সেই সমস্ত বিচিত্র কর্ম্মসমূহই আবার বিচিত্রতাময় ভাবী সৃষ্টির কারণ হইবে। এই ভয়ঙ্কর প্রলয়াবস্থায় যে চিহ্নবিবর্জ্জিত সৎ বিদ্যমান থাকেন, সেই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যে প্রথমে কামের অর্থাৎ সংকল্পশক্তির আবির্ভাব হয়,এই সঙ্কল্প-শক্তিই সৃষ্টির মূল ; এই সংকল্পশক্তি হেতু অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য পরিচ্ছিন্নবৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন, এই স্পন্দধর্ম্মিনী সংকল্প শক্তিই মায়ানামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মায়া অর্থাৎ সংকল্পশক্তি স্পন্দিত হইতে থাকিলে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্য নিজেকে পরিচ্ছিন্ন বিবেচনা পূর্ব্বক প্রজাপতি হিরণ্য-গর্ভরূপে আবির্ভূত হইয়া সংকল্পবলে জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে যুগপৎ কাল ও দিকের জ্ঞান হইল, তৎপরে কিরূপে মায়া হইতে সৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহাই বলিতেছি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মায়া—সংকল্পশক্তি , এবং এই সংকল্পশক্তিও চৈতন্যের স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নয়। যখনই এই মায়া স্পন্দিত হইতে থাকে, তখনই ইহাতে তিন প্রকার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, কোন দিকে সত্বগুণাধিক্য, কোন দিকে রজোগুণাধিক্য এবং কোনদিকে তমোগুণা-ধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয়, যেন কালকে সহচর করিয়া মহাকালী মায়া শান্ত নির্ব্বিকার চৈতন্যের উপর তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে জগজ্জাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে রজোগুণেরই ক্রিয়া হইয়া থাকে। রজোগুণ মধ্যস্থানে থাকিয়া সত্ব এবং তমো-গুণের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রথমে তমোগুণ সত্বরজঃকে অভি-ভূত করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমে শব্দতন্মাত্র, তৎপরে সূক্ষ্ম-বায়ু, বায়বীয় পরমাণু বা স্পর্শতন্মাত্র, এবং সূক্ষ্মবায়ু হইতে সূক্ষ্মতেজ, তৈজস পরমাণু বা রূপতন্মাত্র, তৎপরে সূক্ষ্মতেজ হইতে সূক্ষ্ম সলিল, জলীয় পরমাণু বা রসতন্মাত্র, এবং সূক্ষ্ম সলিল হইতে সূক্ষ্ম পৃথিবী, পার্থিব পরমাণু বা গন্ধত-ন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্মভূত সমুদয় স্পন্দন বশতঃ মিলিত হইলে পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি হয় ; যে মিশ্রণে যাহার ভাগ বেশী থাকে, তাহাকে সেই নামেই অভিহিত করা হয়। যেমন স্থূলাকাশে, সূক্ষ্মাকাশের ভাগ

অধিক আছে বলিয়া ইহাকে আকাশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, এইরূপে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত হইতে পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়া কোটিজগৎরূপে নভোমণ্ডলে বিরাজ করিতে থাকে।

গ্রহোপগ্রহসমন্বিত এই অন্নময় ভুবন সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির তমোময়ীশক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিলে অন্নময় ভুবন বিগলিত হয়, এবং অল্পে অল্পে প্রাণময় ভুবন উদিত হইতে থাকে। বোধ হয় যেন একদিকে তমোময়ী রজনী ক্রমশঃ অস্তমিতা হইতেছে এবং অপরদিক হইতে অরুণনয়না লোচনলোভনীয়া জীবনদায়িনী উষা হাসিতে হাসিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। যাঁহারা এই অন্নময় ভুবনে কেবল জড়াধিক্য দেখিতে পাইয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে শ্রুতির সেই অমূল্য বাক্য স্মরণ করিতে বলি,—

"অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ,
অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
অন্নেন জাতানি জীবন্তি,
অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"।

এক্ষণে রজঃপ্রধানাশক্তি তমঃ সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে লতা গুল্ম বৃক্ষ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জপ্রাণী, তৎপরে কতিপয় কর্ম্মেন্দ্রিয়সহিত স্বেদজ, অণ্ডজ প্রভৃতি প্রাণী সমুদয় উৎপন্ন হইয়া গ্রহোপগ্রহ সমুদয় পূর্ণ করিতে লাগিল। উদ্ভিজ্জাণ্ডজস্বেদজ প্রাণী সহিত এই প্রাণময় ভুবন সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির রজঃপ্রধানাশক্তির উপশম হইল না। এক্ষণে সত্ত্বপ্রধানশক্তির বিকাশ হইতে থাকিলেও, যেমন মানিনী স্ত্রীর অভিমান স্বামীর প্রিয় সম্ভাষণে যাইয়াও যায় না, অবশেষে স্বয়ং অশ্রুরূপে বিগলিত হইয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জন্মাইয়া থাকে, সেইরূপ রজঃপ্রধানশক্তির ক্রিয়া বা প্রাণশক্তি, সত্ত্বগুণের বিকাশ থাকিলেও, উপশান্ত হইয়াও উপশমিত হইল না, পরিশেষে স্বয়ং সত্ত্বগুণের সহিত মিলিত হইয়া এক অভিনব মনোরম ভুবন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

প্রথমে নানাবিধ পশু ও তৎপরে মনুষ্যসকল উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষাদিপরিশোভিত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র, নানাবিধ প্রাণিপরিপূর্ণ গ্রহোপগ্রহে বসতি করিতে আরম্ভ করিল। জরায়ুজাদি প্রাণিসহিত এই মনোময় ভুবন সৃষ্ট হইলে, সত্ত্ব প্রধানাশক্তি আরও অধিকতর স্ফুরূপে প্রকাশ পাইতে থাকিল, বোধ হইল যেন অন্ধকার দূরীভূত করিয়া,অরুণ সহিত উষাকেও অতিক্রম পূর্ব্বক সুমধুর হাস্যে

সমস্তদিক্ আলোকিত করিয়া সহস্রকর সমুদিত হইয়াছে। এক্ষণে অজ্ঞান রূপ অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইযাছে, রজঃপ্রধানাশক্তিও অতিমাত্র অভিভূতা। এই বিজ্ঞানময় ভুবনে এক্ষণে বিজ্ঞানের রাজত্ব। এক্ষণে দেবতাগণ উৎপন্ন হইযা মনুষ্য ও তির্য্যগাদি জাতিতে পরিপূর্ণ এই লোক-সমুদযে আধিপত্য স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই বিজ্ঞানময ভুবনের পর সেই আনন্দময়ের আনন্দধাম। এ আনন্দ অপ-রিচ্ছিন্ন, নিরতিশয়,এ সেই স্বযং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। কাহার প্রাণ এই কোটিসূর্য্য-সন্নিভ, চন্দ্রকোটিসুশীতল চৈতন্যময প্রাণারামকে দেখিযা কৃতকৃতার্থ হইতে না চায? বাস্তবিকই, জ্ঞানতঃ হউক অজ্ঞানতঃ হউক, সকলেই এই পরমানন্দ লাভ করিবার জন্য লালাযিত। জগতে যত কিছু কার্য্য হইতেছে, বা যত কিছু চেষ্টা দেখিতেছি, সকলই সুখের নিমিত্ত, সকলই দুঃখনিবৃত্তির জন্য। কবি দুঃখ ভুলিযা সুখী হইবার নিমিত্ত কাব্যরসে নিমগ্ন, শিল্পী সুখে থাকিবার নিমিত্ত শিল্পনির্ম্মাণে তৎপর, বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক সুখী হইতে প্রযাসী, দার্শনিকও চিরসুখে সুখী হইতে যত্নবান, বৌদ্ধদর্শনের উদ্দেশ্যও সুখ, সুখই ন্যাযদর্শনের উদ্দেশ্য ; সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্যও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ; মহর্ষি পতঞ্জলিও ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইতে আনন্দধারা পান করিতে অভিলাষী ; অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন সুখই বেদান্ত দর্শনের উদ্দেশ্য ; বেদ এবং উপনিষদেরও ভূমা আনন্দই লক্ষ্যস্থল।

তাই বলিতেছি. যে দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিনা কেন, সেই দিকেই দেখিতে পাই, জীবসকল সুখের জন্য লালাযিত ; কিন্তু আমরা এতই মোহান্ধ যে, প্রকৃত সুখ কি, তাহা ভুলিযা গিযাছি, সেই জন্যই পাগলের ন্যায় এখানে সুখ, ওখানে সুখ বলিযা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের প্রতি ধাবিত হইতেছি। বিষযে যে প্রকৃত সুখ নাই, তাহা আমরা বুঝিনা, প্রবৃত্তিতে যে আনন্দ নাই, তাহা আমরা জানিনা, জানিনা যে, নিবৃত্তিতেই সুখ ; জানিনা যে, সংসারাসক্তিত্যাগই আনন্দ।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বযম্ভু-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

সুতরাং প্রকৃত সুখে সুখী হইতে হইলে, অমৃতত্ব লাভ করিয়া অমর হইতে হইলে, বহির্মুখীন ইন্দ্রিয়গ্রামকে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে, এবং সমস্ত সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মৈকচিত্ত হইয়া যে স্থানে থাকিলে তাঁহাকে ডাকিবার কোন বিঘ্ন হইবে না, সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে। তবেই না চিত্ত কল্মষরহিত হইয়া প্রশান্ত হইবে এবং স্বীয় অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন সত্তার উপলব্ধি হইবে! তখনই আমরা দেখিতে পাইব যে, এই বিশাল জগৎ চৈতন্যের স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নয়, এবং এই স্পন্দনও চৈতন্যময়, সুতরাং জগৎ বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ নাই, আছে কেবল সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম। এই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মে আমরা নাম রূপের আরোপ করিয়াছি, শুক্তিকে রজত ভাবিয়া সুখ দুঃখে অভিভূত হইতেছি সুতরাং আমাদের ন্যায় মূর্খেরা যদি কষ্ট না পায়, তাহা হইলে আর কে কষ্ট পাইবে?

একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা কেবল নাম ও রূপ, তাহা কেবল শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের সমষ্টি; প্রকৃত বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ যে শ্বেতবর্ণ ফুলটী পবন-হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া নৃত্য করিতেছে, উহা যে ফুল, তাহা কে বলিল? আমরা উহাকে ফুল বলিতেছি, আবার আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জীবেরা উহাকে অন্যরূপ দেখিতেছে, সুতরাং উহা যে স্বরূপতঃ ফুল, তাহার নিশ্চয়তা কই? আবার উহা যে শ্বেতবর্ণ, তাহাই বা কে বলিল? আমাদের চক্ষু উহার শ্বেতরূপ গ্রহণে সমর্থ কিন্তু আমাদের অপেক্ষা অধিক-তর দৃক্‌শক্তিবিশিষ্ট জীবের চক্ষে উহা অন্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। আমরা উহাকে কোমল বলি কিন্তু ঐ ফুল হইতেও যাহাদের স্পর্শশক্তি কোমল, তাহারা উহাকে কঠিন বলিবে। আরও দেখিতে পাই, উহার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হইতেছে; এই ক্ষণে উহা যেরূপ ছিল, পরক্ষণে উহার আর ঠিক সেইরূপটা নাই, সুতরাং উহাকে কিরূপে ফুল বলিয়া বিশেষিত করি? একটি ফুলের সম্বন্ধেও যেরূপ, সমস্ত জগতের পক্ষেও সেইরূপ। জগত হইতে যদি আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়প্রদত্ত শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ তুলিয়া লই, তাহা হইলে জগতের যে রূপ থাকে, তাহাই তাহার প্রকৃত রূপ, তাহাই সেই নির্ম্মল কল্পনারহিত চৈতন্য। মরুভূমিতে সূর্য্যকিরণের স্পন্দনকেই যেমন আমরা জল বলিয়া থাকি, সেইরূপ চৈতন্যের স্পন্দনকেই

আমরা অজ্ঞানবশতঃ জগত বলিয়া অভিহিত করি। মরীচিকায় পিপাসার শান্তি না হইয়া যেমন উত্তরোত্তর অশান্তিরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ চৈতন্যকে আমরা জগতরূপে দেখি, সেই জন্যইত আমাদের এত কষ্ট, এত দুঃখ। বাস্তবিকই মহর্ষিদিগের এক একটী অমূল্য উপদেশ স্মরণ করিলে হৃদয় এত পুলকিত হয় যে, ইচ্ছা হয় প্রতিজনকে ডাকিয়া বলি, ভাই,

যস্মাদুদেতি কলনাকুলদৃশ্যজালং
যৎ তত্র চ স্থিতবদিত্যনুভূতমুচ্চৈঃ।
যস্মান্মনো বিপরিবর্ত্তিতি দেহসৃষ্ট্যা
সর্ব্বং তু তৎ পরমবস্থিতি বিদ্ধি বিশ্বং॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

উপসংহারে আমার ইহাই বক্তব্য যে, বিষয় যেরূপ দুরুহ, তাহাতে মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালকের পক্ষে চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া একটী সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করা অসম্ভব। অথবা সময়ের অল্পতার দোহাই দিয়া নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবারই বা চেষ্টা করি কেন? আমি যদি সহস্র বৎসর ধরিয়াও এ বিষয় চিন্তা করি এবং উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং উৎকৃষ্ট দার্শনিকও হই, তাহাহইলেও সৃষ্টি-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে না পারিয়া অবশেষে সেই পূজ্যপাদ তত্ত্বদর্শী আর্য্য-ঋষিদিগের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে জগতের সমক্ষে বলিতে হইবে,—

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কোবেদ যত আবভূব
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্তসো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ।

(ঋগ্বেদ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রেমোন্মত্ততা।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—যত মত, তত পথ। জগতের যত ধর্ম্মমত, সকলই ঈশ্বরানুভূতিকল্পে এক একটী পন্থা মাত্র বলিয়া উপ-

লব্ধি হয়। তাঁহার মতে সকল মতেই যে অল্পাধিক সত্য নিহিত আছে, তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মমতই দৃঢ় বিশ্বাসে অনুষ্ঠিত হইলে ভগবানে পৌঁছাইয়া দেয়। অতএব সকল গুলি সমভাবে সত্য। সুতরাং কোন ধর্ম্ম মতই আমাদের রুচিকর না হইলেও অন্যের উন্নতির সহায় বলিয়া উপেক্ষ-নীয় হইতে পারে না। তবে আমার মতে আমি চলিব এবং অন্য মত বা পথকে হেয় মনে করিব না।

প্রত্যেক মতের সার কথা ইহাই প্রতীত হয় যে, ঈশ্বর লাভের এক মাত্র উপায়,—তাঁহাতে একান্ত অনুরাগ। বৈধী ভক্তির ক্রমে ঐকান্তিকতায় পরিণমিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যাহার তাহা হয় নাই, জানিব সে ধর্ম্মজীবনের অনেক নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। জপ ধ্যান হোম পূজা প্রভৃতিতে নিষ্ঠা দ্বারা যাহার হৃদয়ে উদ্দাম অনুরাগের সঞ্চার হয় নাই, তাহার জপ পূজাদি পণ্ডশ্রমে পরিগণিত। কিন্তু জপ হোমাদি বৈধী গণ্ডীর ভিতর অবস্থিত না হইয়াও যাঁহার মন ভগবান্ লাভে নিতান্ত ঐকতান-বৃত্তি, তিনিই জগতে বহু ভাগ্যবান্। বহুশাস্ত্রান্তদর্শী উদ্ভিন্নপ্রতিভা মনুষ্যাপেক্ষা অনুরাগরঞ্জিতনেত্র ভক্তই জগতের বহুকল্যাণকারী হয়েন। ভগবদনুরাগের প্রবল স্রোতে তিনি বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রোক্ত অনুভূতি ও অবস্থাসকল অতি সহজেই লাভ করিয়া নিজে ধন্য হন এবং অপরকে কৃতার্থ করেন। যে অনুরাগে ভগবান্ ঈশা ৪০ দিন অনাহারে কাননে অবস্থিত ছিলেন, যে অনু-রাগে ভগবান্ বুদ্ধ, স্ত্রীপুত্রের মায়া ছিন্ন করিয়া নৈশতিমিরে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, যে অনুরাগে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, যে অনুরাগে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব গঙ্গাসৈকতে লুণ্ঠিতকলেবরে শিশুর ন্যায় মা মা বলিয়া কান্দিয়া আকুল হইতেন, সেই অনুরাগের শতাংশের একাংশ পাইলে জীব ধন্য হইয়া যায়। কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে সকলেই পারে, কিন্তু বহুজন্মার্জ্জিত মার্জ্জিতসংস্কারাপন্ন মানব ভিন্ন অনুরাগের উদ্দাম তরঙ্গে কেহ ঐরূপে তরঙ্গিত হয় না। শুকপক্ষীবৎ বর্ণোচ্চারণের সামর্থ্য অনেক পণ্ডিতের থাকিতে পারে। অনন্ত শাস্ত্র অনে-কের জিহ্বাগ্রে এমন স্ফুরিত হইতে পারে, যাহা দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইবে। কিন্তু এতাবৎ সত্ত্বেও যাহার ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা জন্মায় নাই, তাহার সমস্ত পাণ্ডিত্য বৃথা অভিমানই আনিয়া দেয়। ধনমানযশপ্রভৃত বিদ্যাবত্তা যদি ঈশ্বর লাভের সহায় না হইল, তবে সে সকল মানবের

বিপজ্জাল মাত্র। আর ইহারা যদি ঈশ্বর লাভে কথঞ্চিৎও সহায়কারী হয়, তবে সে ধনমানাদি বহুমানার্হ।

একটু স্থির মনে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়—এ জগতে ধন মানাদি সকলি জীবিত কাল পর্যান্ত ; কিন্তু ধ্বংস যখন অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যু যখন অপরিহার্য্য, দেহ যখন পঞ্চত্বগত হইবেই, তখন মৃত্যুর পর আমি থাকিব কি না, একথা জানিতে চেষ্টা করা সকলেরই আবশ্যক।

এই সন্দেহেই নচিকেতা যমসদনে বিজিজ্ঞাসু হইয়া গমন করেন। এই সন্দেহনিরাকরণোদ্দেশেই অনন্ত শাস্ত্রের সৃষ্টি। এই সন্দেহের ফলেই ধীরে ধীরে ঈশ্বরে বিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়। সাধারণ শ্রেণী অপেক্ষা একটু উন্নত মানব কেবল মাত্র বিশ্বাস করিযাই স্থির থাকে না। নিজ বিশ্বাসের মত যাহাতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। এইরূপে বিশ্বাসের পরিপক্বাবস্থাতে তাহার ঈশ্বরের দর্শনতৃষা বেগবতী হয়। সে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে চায় যে, যিনি আছেন বলিয়া এতকাল বিশ্বাস করিতেছি,তিনি নিশ্চয আছেন কিনা। এই অপরোক্ষ তীব্র তৃষার নামই অনুরাগ। এইরূপে অনুরাগমন্দাকিনী বিশ্বাস-হিমাচল ভেদ করিয়া নানামতরূপ অযুত অনন্ত পথে অখণ্ড চিদানন্দসাগরোদ্দেশে স্যন্দমানা। দেশকালসর্ব্ববাধা-উল্লঙ্ঘিনী, ঘৃণালজ্জাভয়াদিঅষ্টপাশছেদিনী, গোপীকুলোদ্দামানুরাগোল্লাসমন্দাকিনীতে একবার স্নান করিলে মানব কৃষ্ণময় নবীন জীবন লাভ করিয়া যাবতীয় বিধি নিষেধের পারে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং তাহার চেষ্টাদি কামকাঞ্চনমোহিত জীবের নিকট উন্মত্তবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু সে উন্মত্ততা বহুসুকৃতিলভ্য। যে উন্মত্ততায় জগৎ ভুলাইয়া দেয়, দেহাত্মবোধ ছিন্ন করে, সে উন্মত্ততা কে না পাইতে ইচ্ছা করে? সে প্রেমোন্মত্তের পদতলে আশ্রয় লইয়া কত লোকই না সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া থাকে!

হে জীব! সেই উন্মত্ততার সাধক হও ; ঐ তোমার সম্মুখে প্রেমোন্মাদের জ্বলন্ত ছবি শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। অভয় দিয়া বলিতেছেন,—নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যক্ষীকৃত হইবে—কারণ, আমি নিজ জীবনে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিযাছি। হে মানব! বৃথা তোমার বেদাদি পাঠে শ্রম ; বৃথা বিধিনিষেধ সীমার গণ্ডীতে অবস্থান ; বৃথা ধন, মান, বিদ্যা, যশের গৌরব। যদি এই দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া ঈশ্বরপ্রেমোন্মত্ত না হইলে—যদি

মৃত্যুর ভীষণ ছায়া মরিবার অগ্রেই সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়া মৃত্যু লাভ করিতে না পারিলে।

প্রেমোন্মত্ততালাভ করিয়া যে মৃত্যুঞ্জয়ী—সে বলে, কালসহায মৃত্যু! আমি কি তোমায় ভয় করি? ঐ দেখ আমায় মা ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন; দেহ থাক্ বা যাক্, আমি ঈশ্বর দর্শন স্পর্শন করিয়াছি—আমার "জাত গিয়াছে!" প্রেমোন্মাদ জন্ম মৃত্যুর পরপারে অবস্থিত হইয়া হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, আবার অহেতুক দয়ার প্রেরণায় জীবের পরিত্রাণে দেহ ক্ষয় করিতেছেন। তাঁহারই পদধূলিতে দেশ প্রদেশ তীর্থীভূত হয়। এ প্রকার প্রেমোন্মাদ জগতে কয়টা দেখা যায়? যাঁহারা এ অবস্থা প্রাপ্ত হন—তাঁহারাই জগতের যথার্থ উপদেষ্টা—বেদাদিপ্রকাশক ব্রহ্মভাবাপন্ন—ঈশ্বরকল্প অবতার।

বদ্ধজীব তাঁহাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারে না বা পাগল বলিয়া উপেক্ষা করে। আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান মনে করায় তাঁহাদের আচরণ কাকের ন্যায়ই হইয়া থাকে। কথায় বলে, কাক বেশী বুদ্ধিমান, তাই জঘন্য পদার্থই তাহার আহার। ঐরূপ বুদ্ধিজীবীরা সত্য সত্যই কৃপাপাত্র, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় প্রেমোন্মাদ পুরুষ গত ৪০০ বৎসরের মধ্যে আর কেহ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হন নাই। যখনই ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয়, সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিদেশে তাদৃশ মহাপুরুষের আবার অভ্যুদয় হয়। ইদানীন্তন কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেহে যে অনুরাগের প্রবল বন্যা, যে প্রেমোন্মত্তা, যে মহা সমন্বয়ভাব, যে ভাব ভক্তি জ্ঞান ধ্যানাদির অদ্ভুত একত্র সম্মিলন দেখা গিয়াছে, তাহাতে দেশের সৌভাগ্য সূচনা করে। যাঁহার নামে সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরা আজ প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—যিনি নিরক্ষর পূজক ব্রাহ্মণ হইয়াও আজ আম্লেচ্ছ শিক্ষিতগণের নমস্য হইয়াছেন—তাঁহার বিষয় অনুচিন্তন, তাঁহার পূত জীবনের কথা শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা দ্বারা ভারতে কেন, সমগ্র জগতে ব্রহ্মবিবিদিষা এবং ঈশ্বরানুরাগ শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইবে, ইহা আমার স্বীয় জীবনের প্রত্যক্ষ হইতেই নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

তিব্বতে তিন বৎসর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ]　　　　[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

এইরূপে টিহরী পর্য্যন্ত আমি কোথাও আহারাভাবে কষ্ট পাই নাই। মসুরী হইতে তিন দিনে টিহরীতে পৌছিলাম। টিহরী দেশীয় গড়োয়ালের রাজধানী। দেশীয় রাজার রাজ্য বলিয়া গড়োয়াল জেলার পশ্চিমাংশকে "দেশীয় গড়োয়াল" (Native Garhawal) এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীন বলিয়া পূর্ব্বাংশকে ব্রিটিশ গড়োয়াল (British Garhawal) বলে। টিহরীর রাজা ক্ষত্রিয়। বর্ত্তমান রাজা কীর্ত্তিসহায় তখন নাবালক ছিলেন। আমি টিহরীতে পঁহুছিয়া এক অভাবনীয় কারণে কিছুদিনের জন্য আটক্ হইয়া পড়িলাম। ডেরাডুনের পথে আমি যে জুতা জোড়াটী আনিয়াছিলাম, তাহা পায়ে দিয়া দুই তিন দিন ভ্রমণ করিয়াই আমার দুই পায়ে ফোস্কা পড়িয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। টিহরীতে রাজার দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ লাগাইয়া আরোগ্য লাভ করিতে আমার ৮।১০ দিন লাগিল। পূর্ব্বে টিহরীর রাজারাই সমুদয় গড়োয়াল রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। ইদানীন্তন ব্রিটিশ্ গড়োয়ালের শ্রীনগরই ইঁহাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল। শ্রীনগরের ভগ্নাবশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রস্তরময় রাজপ্রাসাদ সেদিন পর্য্যন্ত ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। ব্রিটিশ্ আক্রমণের পর হইতে ভাগীরথীতীরে এই টিহরীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশীয় গড়োয়ালে টিহরীর তুল্য সমৃদ্ধিশালী নগর আর নাই। এই খানে টিহরী রাজাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী দেবমন্দির আছে এবং এই খানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বাস। দেশীয় গড়োয়ালের জনসাধারণ তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি টিহরীর বাজারে ক্রয় করে।

টিহরী হইতে যাত্রা করিবার সময় জনৈক রাজবংশীয় ভদ্রলোক যমুনোত্রি ও গঙ্গোত্রির পথে বড় জোঁকের ভয় বলিয়া অতিশয় পীড়াপিড়ী করিয়া পুনরায় আমাকে এক জোড়া জুতা গছাইয়া দিলেন। একবার জুতা পায়ে দিয়া আমি যে শাস্তি পাইয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া তিনি এবার জুতা জোড়াটা তেলে ও হলুদে ভিজাইয়া কিছু নরম করিয়া দিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এ যাত্রায়ও আমি তাহা ব্যবহার করিতে পারিলাম না। উত্তরাখণ্ড

যাত্রা শেষ করিয়া তিব্বত পর্য্যন্ত (প্রথম বৎসর) আমি আর জুতা স্পর্শ করি নাই। হিমালযের উচ্চ প্রদেশে শীতকালে যেমন পাদত্রাণ ভিন্ন পা বাঁচানো দায হয়, তেমনি নিবিড়শুষ্কপত্রাচ্ছাদিত সংকীর্ণ পার্ব্বত্যপথে জুতা পাযে দিযা চলাও বিষম দায। শীতকালে খালিপায় চলিলে বড় জোর পা দুখানিই পুড়িযা যাইবে; কিন্তু নিবিড় অরণ্যময় গিরিসঙ্কটে জুতা পায় শুষ্ক পত্রে পা পিছলাইয়া গেলে আর তাহাকে দেখিতে হইবে না। আমি দুইবার এইরূপে ভযঙ্কর গিরিসঙ্কট হইতে পড়িযা যাইতে যাইতে রক্ষা পাইয়াছি। সে সকল স্থানে খালি পাযে আঙ্গুল টিপিয়া টিপিযা যাওয়াই নিরাপদ।

টিহরী হইতে ৺গঙ্গোত্রির পাকা রাস্তার রাস্তায় প্রায় ১৮ ক্রোশ গিয়া আমি ধরাসু নামক একখানি ক্ষুদ্র ঘরবারী কন্‌ফোড় যোগীর গ্রামে পঁহুছিলাম। এই গ্রাম হইতে পাকা রাস্তা ছাড়িয়া যমুনোত্রির একটী পগ্‌ডণ্ডী পথ আছে। অপরিচিতের পক্ষে সেই পথে একা ভ্রমণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। একেই ভীষণ হিংস্রজন্তুসমাকুল বিজন অরণ্য, তাহাতে দুই দিনের পথে জন মানবের সহিত দেখা নাই। কেবল বন, কোথাও পথভ্রম হইলে তাহা দেখাইযা দিবারও কেহ নাই। এরূপ পথে একাকী আমি কিরূপে যাইব ভাবিতে ভাবিতে ধরাসুতে পঁহুছিবামাত্র দেখিলাম যে, প্রায় ১০।১২ জন যমুনোত্রি অঞ্চলের পাহাড়ী—মাথায় বিড়ের মত টুপি দেওয়া—সেই খানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। ঠিক মধ্যাহ্নের সময আমি সেইখানে পঁহুছিযাছিলাম। তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিযা জানিলাম যে, তাহারা যমুনোত্রি অঞ্চলের জামদগ্ন্যজী মকাম গ্রামের অধিবাসী; ডেরাদুন হইতে হাট বাজার করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিতেছে। তাহাদের এই পরিচয পাইয়া আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কোথায আমি ভাবিতেছিলাম যে, একটী সহযাত্রী পথপ্রদর্শকের অভাবে বুঝি বা আমার যমুনোত্রি দর্শন ঘটিল না। কিন্তু ধন্য ভগবান্! তিনি সহায় থাকিলে কিছুরই অভাব থাকে না। তাঁহার ইচ্ছায় আমি এই ভীষণ অরণ্যে একেবারে বহুজনপরিবেষ্টিত হইলাম। আমি যমুনোত্রি যাইব শুনিয়া সেই পাহাড়ীরাও বিশেষ আনন্দিত হইল।

যমুনোত্রি অঞ্চলের পাহাড়ীদের পরিচ্ছদাদি অনেকটা রামপুর বেসহরীদের মত। মাথায় সেই বিঁড়ের মত কম্বলের টুপি, জালের মত জুতো ও পট্টুর

লম্বা চাপকান্।* গড়োযালের পূর্ব্বাঞ্চলবাসীদের সহিত পশ্চিমাঞ্চলবাসীদের পরিচ্ছদাদির বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ধরাসু হইতে জামদগ্ন্যজীর মকাম প্রায় দুই দিনের পথ। ইহার মধ্যে কোথাও গ্রাম বা জনমানবের চিহ্ন নাই। কেবল পথিকেরা যে স্থানে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইযা রাত্রিবাস করে, তাহারই নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। পথে আমরা যেখানে একরাত্রি বাস করিলাম, সেই খানে বিস্তর প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা চিড় বৃক্ষের গুঁড়ি পড়িযাছিল। হিমালয়ের নিম্ন অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রদেশ এই চিড়জাতীয় বৃক্ষে পরিপূর্ণ। ইহা (Pinus Longefolia) দেখিতে অনেকটা ঝাউগাছের মত। পাহাড়ীরা প্রকাণ্ড চারিটা চিড় গাছের গুঁড়ি পাশাপাশী রাখিযা তাহাতে আগুণ লাগাইযা ভীষণ অগ্নিকুণ্ড জ্বালিযা দিল এবং তাহার দুই পার্শ্বে সকলে সারি সারি বসিযা কটী সেঁকিতে লাগিল। মড়ুযা বা কোদার (কোদ্রব) দুই দুই খানি রুটী খাইযা পাহাড়ীরা গাত্রাবরণ উন্মোচন করিযা সেই প্রদীপ্ত আলোকে জুঁযা মারিতে লাগিল। জুঁযা (louse) একপ্রকার উকুনজাতীয় কীট, শীতপ্রধান দেশে গাত্রবস্ত্রে থাকিযা দেহের রক্তশোষণ করে।

মশা, ছারপোকা অপেক্ষাও জুঁযা অধিকতর কষ্টদাযক। তাহারা পরিধেয বস্ত্রাদির সহিত থাকিযা সদা সর্ব্বদা দেহের সহিত লাগিযা থাকে ও রক্ত পান করে। একটু অবকাশ পাইলেই পাহাড়ীরা জুঁযা মারিতে আরম্ভ করে। আমাদের সেই জ্বলন্ত প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের নিকট কোন হিংস্রক জন্তুরই অগ্রসর হইবার সাধ্য ছিল না। সুতরাং আমরা নিশ্চিন্তমনে রাত্রিযাপন করিলাম। আমরা তৎপর দিবস সন্ধ্যার সময যমুনার তীরবর্ত্তী জামদগ্ন্যজীর মকামে পঁহুছিলাম। এই গ্রামটীতে একটী প্রাচীন মন্দিরে কতকগুলি প্রাচীন দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। আমি এই গ্রামে দুই রাত্রি বাস করিযা তৃতীয দিবসে যমুনোত্রি অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

যমুনার তীরে তীরে পথ। সেইগ্রাম হইতে যাত্রা করিবার পরদিন পথে

* সিমলা পাহাড়ের উত্তরাংশকে রামপুর বেসহর বলে। বেসহর দিয়াও একটী তিব্বতীয় পাস আছে। বেসহরীরা সেই পথে তিব্বতের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করে। উহারা বৌদ্ধ এবং তিব্বতীয ভাষায কথাবার্ত্তা কহে। এখানে একটী পাহাড়ী রাজা আছেন। রামপুর বেসহর ও যমুনোত্রির এই অংশ গড়োযালের পশ্চিমসীমা বলিযা উভয় স্থানের পোষাকই প্রায একরূপ।

আমার সহিত একজন দশনামী নাগা সন্ন্যাসী ও একজন বৈষ্ণব সাধুর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা জম্বু হইতে বরাবর পার্ব্বত্যপথে ৺ বদরী-নারায়ণ যাত্রার মানসে তথায় আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন। তাঁহারাও যমু-নোত্রি যাইতেছিলেন সুতরাং আমরা তিন জন সহযাত্রী হইলাম। আমরা তিনজন একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পর বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। স্বতঃপ্রাপ্ত সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী যমুনোত্রি যাওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভবপর হইল না সুতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া যমুনোত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত থাকিতে হইল।

যমুনোত্রি গড়োয়ালের রমৌলী পরগণায়। এই অঞ্চলের পাহাড়ীদের মধ্যে অতিথিসৎকারস্পৃহা আদৌ নাই বলিলেই হয়। আমরা প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চলিতাম। আহারাদির পর পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার সময় কোন গ্রামে গিয়া রাত্রিবাস করিতাম। যমুনার তীরে তীরে পথ,—এই পথে চলিতে চলিতে আমরা কখনো প্রকাণ্ড উচ্চ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতেছি এবং পুনরায় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া যমুনাতীরবর্ত্তী হইতেছি। এইরূপে পথে যে কত চড়াই উৎরাই করিতে হয়, তাহার সংখ্যা নাই। এই পথে পাহাড়ীরা সদা সর্ব্বদা যাতায়াত করে। যমুনোত্রির যাত্রীদের গমনাগমনের জন্য কোন বন্দোবস্তই নাই। যমুনাতীরে পথের ধারে ধারে লঙ্গুরা (এক জাতীয় fern) ও কাপ্‌রা নামক শাক বিস্তর জন্মে। আমরা পথে চলিতে চলিতে প্রচুর পরিমাণে সেই শাক তুলিতাম। মধ্যাহ্নকালে কোন গ্রামে পঁহুছিয়া আমা-দের সহযাত্রী বৈষ্ণব সাধুটী যৎসামান্য ভিক্ষালব্ধ ঝঙ্গোরা ও শ্যামাকের (একপ্রকার তৃণ ধান্য বা মুনিধান্য) সহিত তাঁহার লোটায় (ঘটীতে) সেই শাক সিদ্ধ করিতেন। পথশ্রান্ত ও ক্ষুধাতুর অবস্থায় আমরা পরম উপাদেয় জ্ঞানে এক এক তাল সেই শাক সিদ্ধ খাইয়া অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিতাম। এ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে এক এক খানি ধর্ম্মশালা আছে। সেই ধর্ম্মশালাতে গিয়া আমরা রাত্রি যাপন করিতাম।

বলিতে পারি না, যমুনোত্রির পথে আমাদের মত ভাগ্য সকলের ঘটিয়াছে কি না।—পাহাড়ীদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আমরা একদিনও কোন গ্রাম হইতে তিন জনের উপযুক্ত ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এ অঞ্চলের লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া জোর জার করিয়া ভিক্ষা না করিলে

পথশ্রান্ত সাধু সন্ন্যাসী বা পথিকগণ যদি অষ্ট প্রহর অনাহারে ধর্ম্মশালায় বসিয়া থাকেন, অযাচিত ভাবে কেহই ভিক্ষা দিয়া তাহাদিগের সৎকার করিবে না। দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতে হইবে, নচেৎ অনাহারে বসিয়া থাক, কেহই তোমার খোঁজ লইবে না। গড়োয়ালবাসী মাত্রেরই এই স্বভাব, তবে গড়োয়ালের পূর্ব্বাংশে দশৌলী পরগণায় ৺ বদরীনারায়ণ অঞ্চলের পাহাড়ীরা অপেক্ষাকৃত অতিথিসৎকারপরায়ণ। গড়োয়ালবাসীরা যে সহজে অতিথিসৎকার করিতে জানে না, তাহা একটী কথায় চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই কথাটী এই—"গড়োয়াল সরীখা দাতা নহী, লট্টা বগর দেতা নহী"। অর্থাৎ জোর জার করিয়া লইতে পারিলে গড়োয়ালবাসীদের তুল্য দাতা নাই।

ইহার বহুকাল পরে একবার ভ্রমণ কালে এই গড়োয়ালে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে উক্ত প্রবাদবাক্যের সার্থকতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। স্বতঃই সেইদিনকার ঘটনা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। আমরা একবার টিহরী হইতে শ্রীনগরের পথে একখানি গ্রামে সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়া মিষ্ট কথায় সামান্য দুই খানি কাষ্ঠ ও একটু অগ্নি চাহিয়া পাই নাই। সে যাত্রায় পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ও সারদানন্দ প্রমুখ আমরা চারি জন সন্ন্যাসী ছিলাম। প্রথমতঃ আমরা একটু অগ্নির জন্য প্রত্যেক গ্রামবাসীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কেহই আমাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহার পর ভাগ্যক্রমে উক্ত প্রবাদবাক্যটী আমাদের মনে পড়িয়া গেল। আমরা সেই গ্রামের মধ্যস্থিত চত্বরে বসিয়া যেমন কয়েক বার আগ্ লাও, লকড়ী লাও বলিয়া চীৎকার করিয়াছি, তখন অমনি দেখি যে, সুড় সুড় করিয়া কেহ অগ্নি, কেহ কাষ্ঠ, কেহ শাক, রুটী ও কেহ দুগ্ধ প্রভৃতি লইয়া নিতান্ত ভাল মানুষের ন্যায় আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছে! তাহার পর আমাদিগের কোন অভাব সম্বন্ধেই আর তাহাদিগকে কিছু বলিতে হইল না। সম্মুখে ধুনী (অগ্নিকুণ্ড) জ্বালিয়া সকলে অবাক্ হইয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। যেন তাহারা আর সে লোক নয়। দুই চারিবার চীৎকার করাতেই তাহাদের যেরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, বোধ হয় যে, একটু ভয় দেখাইলে তাহারা আপন আপন ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে উদ্যত হয়।

কারণ কি, বলিতে পারি না, যমুনোত্রি অঞ্চলের পাহাড়ীদের মধ্যে যেমন প্রায় সকলেরই গলায় গলগণ্ড হইতে দেখিলাম, এমন আর আমি কুত্রাপি দেখি নাই। এই অঞ্চলের এক প্রকার ভয়ঙ্কর মাছীর কথাও উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যদিচ এই জাতীয় মক্ষিকা হিমালয়ের প্রায় সর্ব্বত্রই আছে কিন্তু আমি যমুনোত্রিপথেই ইহার দংশন-সুখ ও বিষের প্রভাব বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম।

মাছীগুলি দেখিতে অতিশয় ক্ষুদ্র,নীল বর্ণের মশকের মত,কিন্তু মশকের ন্যায় লম্বা শুঁড় ও পদ বিশিষ্ট নহে। ইহারা শরীরের যেস্থানে দংশন করে, সেইখানে একবিন্দু রক্ত বাহির হয় এবং দংশন করিবামাত্র শরীরে সূক্ষ্ম একটী কাঁটা ফুটাইয়া দিবার মত বেদনা বোধ হয়। তাহার পর সেই স্থান চুলকা-ইতে থাকে,—চুলকাইতে চুলকাইতে সেই সূক্ষ্ম রক্তবিন্দু এক অহোরা-ত্রেই একটী বিস্ফোটকে পরিণত হয়। টীকা দিবার সময় যেমন তাহার বিষের প্রভাব কিছুই বুঝিতে পারা যায় না, ইহা ঠিক সেইরূপ। আমাকে পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কেহই সাবধান করে নাই সুতরাং আমি প্রথম দিন আমার পায়ের যে যে স্থানে এই মাছী দংশন করিয়াছিল, মনের সাধে চুলকাইয়াছি। তাহার পর দিনই দেখিলাম যে, মক্ষিকাদষ্ট স্থান বিষম বেদনাযুক্ত এক এক খানি ঘায়ে পরিণত হইয়াছে। এত শীঘ্র আমার পায়ে এরূপ ঘা হইবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করায় আমার সহযাত্রিদ্বয় আমাকে বলিলেন যে, পাহাড়ী বিষাক্ত (জহরীলা) মক্ষিকার দংশনে আমার পায়ে এরূপ ঘা হইয়াছে। তাঁহারা আমাকে দষ্ট স্থান চুলকাইতে নিষেধ করিলেন, অথবা একখণ্ড শুষ্ক গোময়ের দ্বারা চুলকাইতে বলিলেন। এই অতি ক্ষুদ্র নগণ্য কীটের কি ভয়ঙ্কর বিষ! একবার ইসারায় ছুঁইয়া, মনুষ্যশরীরে কি ভয়ঙ্কর বিষই ঢালিয়া যায়! ইহার দংশনে আমাদের অনেক সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাকে একবার কিছুদিন হাঁসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, এক্ষণে গঙ্গাস্নানাভিমুখে অগ্রসর হওয়া যাউক। এইরূপে ২।৩ দিন পরে বুঝিতে পারিলাম যে, যমুনোত্রির পথে যদি আমার কোন সঙ্গী না জুটিত, তাহা হইলে বোধ করি, আমার ভাগ্যে সেই শাক-সিদ্ধও জুটিত কিনা সন্দেহ। পাত্রের মধ্যে আমার কেবল একটী দরি-য়াই নারিকেলের কমণ্ডলুমাত্র ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গী দুইজনের প্রত্যেকের দুই দুইটী ঝুলি ছিল। তাঁহাদের সেই বিচিত্র ঝুলি চারিটীতে

ছিল না, এমন পদার্থই নাই। মুদি ও কাঁসারীর দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া মণিহারী পর্য্যন্ত সকলই সেই ঝুলি কয়টীতে বিদ্যমান। আটা, ডাল, লবণ, লঙ্কা, ঘটী, বাটী, তাওয়া, হাতা, খুন্তী প্রভৃতি এবং এমন খুটী নাটী আরও কত দ্রব্যই যে তাহাতে ছিল, তাহা বলা যায় না। তাহাদের নিকটে যে কিছু পয়সা কড়ি ছিল, তাহাও পরে জানিতে পারিলাম।

আমি ইহা একবারও ভাবি নাই যে, যমুনোত্রির পথে আমার কোথাও অর্থের আবশ্যক হইবে। ৺কেদার, বদরীনারায়ণ ও গঙ্গোত্রি যেমন প্রতিবৎসর নানাদেশীয় যাত্রিসমাগমে পূর্ণ হয়, যমুনোত্রিতে তাহা হয় না। যমুনোত্রিতে নিত্য পূজারও কোন ব্যবস্থা নাই এবং পথও অতিশয় দুর্গম। আমরা তিন জন ভিন্ন সে সময়ে আর কোন যাত্রী ছিল না। যমুনোত্রির শেষ প্রান্তস্থ গ্রামে পঁহুছিয়া শুনিলাম যে, সেই গ্রামে যমুনোত্রির পাণ্ডারা বাস করে। সেই গ্রামের পাণ্ডারা যাত্রীদের সঙ্গে না গেলে বিদেশীযের পক্ষে পথ চিনিয়া যমুনোত্রি পঁহুছানো অসম্ভব। সুতরাং বাধ্য হইযা সকলকে কিছু দক্ষিণা দিয়া সেই গ্রাম হইতে (বোধ হয় গ্রামের নাম খরশালী) দুই এক জন পাণ্ডাকে পথপ্রদর্শক স্বরূপ সঙ্গে লইতে হয়। পাণ্ডারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহারা কিছু দক্ষিণা না পাইলে কিছুতেই কোন যাত্রীর সঙ্গে যাইতে সম্মত হয় না। মসুরীর নীচে রাজপুর গ্রাম হইতেই তো আমি রিক্তহস্ত হইযাছিলাম। অতএব যদি আমি একাকী এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ দয়া করিয়া আমাকে যমুনোত্রি লইয়া যাইত কি না সন্দেহ। আমার সহযাত্রিদ্বয় কয়েক আনা পয়সা বাহির করিয়া দিবা মাত্র দুই জন পাণ্ডা আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া যমুনোত্রি লইয়া চলিল।

ক্রমশঃ।

উদ্ধৃত।

স্বদেশী সমাজ।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

*   *   *   *   *   *   *

বৌদ্ধপরবর্ত্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা কিছু আছে ও ছিল, তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িযাছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি মহৎপদ হারাইতে হইযাছে। এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিযাছিল, ধর্ম্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত, সকলদিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশ সকল অধিকার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল, তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে;—আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার কবিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিযাছে। সমুদ্রযাত্রা আমরা সকল দিক্ দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিযাছি—কি জলময় সমুদ্র, কি জ্ঞানময় সমুদ্র! আমরা ছিলাম বিশ্বের—দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্য সমাজে যে ভীরু স্ত্রীশক্তি আছে, সেই শক্তিই, কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্যলাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ স্ত্রৈণপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া পড়িযাছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা কিছু আরম্ভ কবিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিযা জগতের ঐশ্বর্য্য বিস্তার কবিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলঙ্কারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ্ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোওয়া যাইতেছে, তাহা খোওয়াই যাইতেছে!

বস্তুতঃ এই গুরুর পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বরত্ব কোনোকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদ্‌রূপে ছিল না—তাহা কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই—তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার—

অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্ম্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যখন হইতে আচারপালনমাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল—যখন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র অর্থাৎ অনার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না,—সমাজকে নব নব ঐশ্বর্য্যবিতরণের ভার যে ব্রাহ্মণের ছিল, সেই ব্রাহ্মণ যখন আপন যথার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের দ্বারদেশে নামিয়া আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভারগ্রহণ করিল—তখন হইতে আমরা অন্যকেও কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল, তাহাকেও অকর্ম্মণ্য ও বিকৃত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কি উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তখন হইতেই সে বিরাট্‌মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় কেবল ভারস্বরূপে বিরাজ করে। বস্তুতঃ কেবল টিঁকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন-জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বারবাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্ব্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্ম্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্ত্তিত্বের চেয়ে বড়।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুঁটুলি-পাঁট্‌লা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরাজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্রবেড়া অনেকস্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য। এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা জিনিষ আমরা আবিষ্কার করিলাম।

আমাদের কি আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কি আশ্চর্য্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত করা, চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। ইংরাজ ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই,—যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল "গেল গেল" বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা, তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরাজ হইতে পারিব না, নকল ইংরাজ হইয়াও আমরা ইংরাজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়— আমরা নিজে যাহা, তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে, হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশে তাপসেরা তপস্যাদ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারত-বর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না— সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে

আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হৌক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

* * * * * * * * *

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১১।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ফটো।

আমি ভৃগু। "গীঃ" অর্থাৎ পদরূপ শব্দনিচয়ের মধ্যে আমি "অক্ষর" প্রণব হই। যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ হই। "স্থাবর" স্থিতিমান্ পদার্থ-সমূহের মধ্যে আমি হিমালয়। ২৫।

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ ॥২৬॥

অন্বয়। (অহং) সর্ব্ববৃক্ষাণাং অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাং নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং চ কপিলো মুনিঃ (অস্মি)। ২৬।

মূলানুবাদ। (আমি) সকল বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল নামে মুনি (হই)। ২৬।

ভাষ্য। অশ্বত্থ ইতি অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ দেবা এব সন্তঃ ঋষিত্বং প্রাপ্তা মন্ত্রদর্শিত্বাৎ তে দেবর্ষয়ঃ তেষাং নারদোঽস্মি। গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ নাম গন্ধর্ব্বোঽস্মি। সিদ্ধানাং জন্মনৈব ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়ং প্রাপ্তানাং কপিলো মুনিঃ। ২৬।

ভাষ্যানুবাদ। অশ্বত্থ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। সকল বৃক্ষের মধ্যে (আমি) অশ্বত্থ। দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ। দেবতা হইয়া যাঁহারা মন্ত্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেবর্ষি কহে; সেই দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ (ইহাই তাৎপর্য্য)। গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ নামে গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধগণের (মধ্যে) আমি কপিল নামে মুনি। জন্ম হইতেই যাঁহারা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের অতিশয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বলে। ২৬।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়। অশ্বানাং মাং অমৃতোদ্ভবং উচ্চৈঃশ্রবসং বিদ্ধি, গজেন্দ্রাণাং ঐরাবতং (বিদ্ধি) নরাণাঞ্চ নরাধিপং (বিদ্ধি)।

মূলানুবাদ। অশ্বগণের মধ্যে আমাকে উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া জানিবে, (উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব অমৃতমথনের সময় সমুদ্র হইতে নির্গত হইয়াছিল)

গজেন্দ্রগণের মধ্যে (আমাকে) ঐরাবত বলিয়া জানিবে, মনুষ্যগণের মধ্যে আমাকে নরপতি বলিয়া জানিবে। ২৭।

ভাষ্য। উচ্চৈরিতি। উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং উচ্চৈশ্রবা নাম অশ্বঃ তং মাং বিদ্ধি জানীহি অমৃতোদ্ভবং অমৃতনিমিত্তমথনোদ্ভবং। ঐরাবতং ইরাবত্যা অপত্যং গজেন্দ্রাণাং হস্তীশ্বরাণাং তং মাং বিদ্ধি, ইতি অনুবর্ত্ততে। নরাণাং মনুষ্যাণাং চ নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি জানীহি। ২৭।

ভাষ্যানুবাদ। উচ্চৈঃ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। অশ্বগণের মধ্যে আমাকে উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া জান; উচ্চৈঃশ্রবা একটা অশ্ব, ঐ অশ্ব অমৃত লাভের জন্য যে সময় সমুদ্রমথন হয়, সেই সময় আবির্ভূত হইয়াছিল। আমাকে সেই উচ্চৈঃ-শ্রবা অশ্ব বলিয়া বুঝিবে (ইহাই তাৎপর্য্য)। গজেন্দ্র অর্থাৎ হস্তিশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে আমাকে ঐরাবত বলিয়া "জানিবে" (জানিবে এই পদটীর) অনুবৃত্তি হইতেছে। ইরাবতীর অপত্যকে ঐরাবত কহে। "নর" অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে আমাকে "নরাধিপ" অর্থাৎ রাজা বলিয়া জানিবে। ২৭।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮॥

অন্বয়। অহং আয়ুধানাং বজ্রং (অস্মি) ধেনূনাং কামধুক্ (অস্মি) প্রজনঃ কন্দর্পশ্চ (অস্মি) সর্পাণাং বাসুকিঃ অস্মি। ২৮।

মূলানুবাদ। আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র হই, পয়স্বিনী গাভীগণের মধ্যে কামধেনু হই, আমি লোকসৃষ্টির কারণ কন্দর্প, সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি। ২৮।

ভাষ্য। আয়ুধানামিতি। আয়ুধানাং অহং বজ্রং দধীচ্যস্থিসংভবং ধেনূ-নাং দোগ্ধ্রীণাং অস্মি কামধুক্ বশিষ্ঠস্য সর্ব্বকামানাং দোগ্ধ্রী সামান্যা বা কাম-ধুক্। প্রজনঃ প্রজনয়িতা অস্মি কন্দর্পঃ কামঃ। সর্পাণাং সর্পভেদানাং অস্মি বাসুকিঃ সর্পরাজঃ। ২৮।

ভাষ্যানুবাদ। আয়ুধানাং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "আয়ুধগণের" অস্ত্রগণের মধ্যে আমি "বজ্র" দধীচি নামক মুনির অস্থি হইতে উৎপন্ন (প্রসিদ্ধ অস্ত্রবিশেষ) ধেনু অর্থাৎ প্রচুর দুগ্ধবতী গাভীগণের মধ্যে আমি "কামধুক্" (ঐ নামে প্রসিদ্ধ) মহর্ষি বশিষ্ঠের ধেনু অথবা সাধারণ কামধেনু। আমি "প্রজন"

উৎপত্তি হেতু "কন্দর্প" কাম, এবং সর্পগণের অর্থাৎ সর্পবিশেষগণের মধ্যে আমি বাসুকি সর্পরাজ হই। ২৮।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯॥

অন্বয়। নাগানাং চ অনন্তঃ অস্মি, যাদসাং অহং বরুণঃ (অস্মি) পিতৄণাং অর্য্যমা চ অস্মি, অহং সংযমতাং যমঃ (অস্মি)। ২৯।

মূলানুবাদ। আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত হই, আমি জলীয়প্রাণিগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং লোকনিয়ন্তৃগণের মধ্যে যম (হই)। ২৯।

ভাষ্য। অনন্ত ইতি। অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং নাগবিশেষাণাং নাগরাজ-শ্চাস্মি, বরুণো যাদসামহং অব্দেবতানাং রাজাহং। পিতৄণাং অর্য্যমা নাম পিতৃরাজশ্চাস্মি। যমঃ সংযমতাং সংযমং কুর্ব্বতাং অহম্। ২৯।

ভাষ্যানুবাদ। অনন্ত ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। 'নাগ' অর্থাৎ নাগবিশেষ-গণের মধ্যে আমি 'অনন্ত' নাগরাজ হই। যাদঃ অর্থাৎ জলদেবতাগণের মধ্যে আমি বরুণ অর্থাৎ তাহাদের রাজা। পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা নামে পিতৃরাজ হই। "সংযমৎ" অর্থাৎ লোকনিয়ন্তাদিগের মধ্যে আমি যম। ২৯।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং॥ ৩০॥

অন্বয়। দৈত্যানাং চ প্রহ্লাদঃ অস্মি। অহং কলয়তাং কালোঽস্মি। অহং মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রঃ পক্ষিণাঞ্চ বৈনতেয়ঃ (অস্মি)। ৩০।

মূলানুবাদ। আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ হই, হননকারিগণের মধ্যে আমি কাল, মৃগগণের মধ্যে আমি মৃগেন্দ্র এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়। ৩০।

ভাষ্য। প্রহ্লাদ ইতি। প্রহ্লাদো নাম চাস্মি দৈত্যানাং দিতিবংশ্যানাং কালঃ কলয়তাং কলনং গণনং কুর্ব্বতাং অহং,মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রঃ সিংহো ব্যাঘ্রোবা অহং বৈনতেয়শ্চ গরুত্মান্ বিনতাসুতঃ পক্ষিণাং পতত্রিণাম্। ৩০।

ভাষ্যানুবাদ। প্রহ্লাদ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "দৈত্য" অর্থাৎ দিতি-

বংশীয়গণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ হই। "কলয়ৎ" অর্থাৎ গণনকারিগণের মধ্যে আমি কাল, মৃগগণের মধ্যে আমি "মৃগেন্দ্র" সিংহ কিংবা ব্যাঘ্র হই, "পক্ষী" পতত্রিগণের মধ্যে আমি বৈনতেয় (অর্থাৎ) বিনতার পুত্র গরুড় ।৩০।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়। অহং পবতাং পবনঃ অস্মি, শস্ত্রভৃতাং রামোঽস্মি, ঝষাণাং চ মকরোঽস্মি, স্রোতসাং জাহ্নবী অস্মি। ৩১।

মূলানুবাদ। আমি পবিত্রতাকারিগণের মধ্যে পবন হই, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি রাম হই, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর হই, নদীগণের মধ্যে আমি গঙ্গা হই। ৩১।

ভাষ্য। পবন ইতি। পবনোবায়ুঃ পবতাং পাবয়িতৄণাং অস্মি, রামঃ শস্ত্রভৃতাং শস্ত্রাণাং ধারয়িতৄণাং দাশরথীরামোঽহং। ঝষাণাং মৎস্যাদীনাং মধ্যে মকরঃ নাম জাতিবিশেষঃ অহং। স্রোতসাং স্রবন্তীনাং অস্মি জাহ্নবী গঙ্গা।৩১।

ভাষ্যানুবাদ। পবন ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। পবৎ (অর্থাৎ) পবিত্রতাকারী, তাহাদের মধ্যে আমি "পবন" বায়ু, "শস্ত্রভৃৎ" অর্থাৎ যাহারা শস্ত্রধারণ করে, তাহাদিগের মধ্যে আমি রাম দশরথের পুত্র। "ঝষ" অর্থাৎ মৎস্যাদি জলচর জীবগণের মধ্যে আমি "মকর" (জলচর) জাতিবিশেষ, "স্রোত" (শব্দের অর্থ) নদী, সেই নদীগণের আমি "জাহ্নবী" অর্থাৎ গঙ্গা। ৩১।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। হে অর্জ্জুন! অহং এবং সর্গানাং আদিঃ মধ্যঃ অন্তশ্চ, (অহং) বিদ্যানাং অধ্যাত্মবিদ্যা, অহং প্রবদতাং বাদঃ (চ অস্মি)। ৩২।

মূলানুবাদ। আমিই এই সৃষ্টবস্তুগণের আদি মধ্য এবং অন্ত হই, আমি বিদ্যা সকলের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা, আমি বাদিগণের (ত্রিবিধ কথার মধ্যে) বাদ (নামে প্রসিদ্ধ কথাবিশেষ) হই। ৩২।

ভাষ্য। সর্গানামিতি। সৃষ্টীনামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমুৎপত্তিস্থিতিবিলয়া অহমর্জ্জুন। ভূতানাং জীবাধিষ্ঠিতানাং এব আদিরন্তশ্চ ইত্যাদ্যুক্তমুপক্রমে

ইহ তু সর্গমাত্রস্যৈব ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং মোক্ষার্থত্বাৎ প্রধানমস্মি, বাদোঽর্থনির্ণয়হেতুত্বাৎ প্রবদতাং প্রধানং অতঃ সোঽহং অস্মি প্রবক্তৃদ্বারেণ বদনভেদানাং এব বাদজল্পবিতণ্ডানামিহ গ্রহণং প্রবদতামিতি। ৩২।

ভাষ্যানুবাদ। সর্গাণামিত্যাদি শ্লোকের অর্থ। সৃষ্ট পদার্থসমূহের আমিই আদি মধ্য ও অন্ত (অর্থাৎ) আমিই উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়। হে অর্জ্জুন, এই অধ্যায়ে প্রারম্ভে আদি ও অন্ত আমিই হই এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি জীবাধিষ্ঠিত ভূতনিবহের আদি ও অন্ত। এখানে কিন্তু সকল পদার্থেরই আদি ও অন্ত যে ভগবান্, ইহাই সামান্যাকারে বলা হইল (এই বিশেষ)। সকল বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা (কারণ) মোক্ষহেতু। এই জন্য ঐ বিদ্যাই সকল বিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ। বাগ্মিগণের নিকটে আমি বাদ কথা (অর্থাৎ) জল্প বিতণ্ডা ও বাদ এই তিনভাগে বিভক্ত কথার মধ্যে পদার্থনির্ণয় বাদকথাতেই হয়, এই জন্য ঐ ত্রিবিধ কথার মধ্যে বাদকথাই প্রধান; এই কারণ আমিই সেই বাদকথা, যদিচ এই শ্লোকে বক্তাদিগেরই নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি এই স্থানে বক্তাকে দ্বারস্বরূপ করিয়া বদন অর্থাৎ বাদ জল্প ও বিতণ্ডা নামক কথাত্রয়েরই গ্রহণ করা হইতেছে অর্থাৎ "বাগ্মিগণের মধ্যে" এই বাক্যটীর অর্থ এই হইবে যে, বাগ্মিগণের ত্রিবিধ কথার মধ্যে। ৩২।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩॥

অন্বয়। (অহং) অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি সামাসিকস্য দ্বন্দ্বোঽস্মি অহমেব অক্ষয়ঃ কালোঽস্মি, অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতাঽস্মি। ৩৩।

মূলানুবাদ। আমি অক্ষরগণের মধ্যে অকার হই, সমাসগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস হই। আমিই অক্ষয় কাল, আমিই বিশ্বতোমুখ ধাতা। ৩৩।

ভাষ্য। অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং অকারো বর্ণোঽস্মি, দ্বন্দ্বোঽস্মি সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য। কিঞ্চ অহমেব অক্ষয়ঃ অক্ষীণঃ কালঃ প্রসিদ্ধঃ ক্ষণাদ্যাখ্যঃ অথবা পরমেশ্বরঃ কালস্যাপি কালঃ অস্মি। ধাতাঽহং কর্ম্মফলস্য বিধাতা সর্ব্বজগতো বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখঃ। ৩৩।

ভাষ্যানুবাদ। অক্ষরাণাং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "অক্ষর" বর্ণগণের মধ্যে অকারনামে বর্ণ হই। "সামাসিক" সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস। আরও আমি "অক্ষয়" অক্ষীণ কাল, ক্ষণাদিরূপে প্রসিদ্ধ কালই (এইস্থলে কালশব্দের অর্থ) অথবা (এখানে কালশব্দের অর্থ) কালেরও কাল পরমেশ্বর। আমি "ধাতা" সর্ব্বজগতের কর্ম্মফলের বিধাতা "বিশ্বতোমুখ" সর্ব্বতোমুখ। ৩৩।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহং উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়। অহং সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ ভবিষ্যতাঞ্চ উদ্ভবঃ (তথা) নারীণাং কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ। ৩৪।

মূলানুবাদ। আমি সর্ব্বহর মৃত্যু। আমি ভবিষ্যদ্বস্তুগণের উদ্ভব, আমিই নারীগণের কীর্ত্তি শ্রী বাক্ স্মৃতি মেধা ধৃতি ও ক্ষমা হই। ৩৪।

ভাষ্য। মৃত্যুঃ দ্বিবিধঃ ধনাদিহরঃ প্রাণহরশ্চ সর্ব্বহর উচ্যতে সোঽহমিত্যর্থঃ। অথবা পর ঈশ্বরঃ প্রলয়ে সর্ব্বহরণাৎ সর্ব্বহরঃ সোঽহম্। উদ্ভব উৎকর্ষঃ অভ্যুদয়ঃ তৎপ্রাপ্তিহেতু-চাহং কেষাং? ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানামুৎকর্ষপ্রাপ্তিযোগ্যানামিত্যর্থঃ। কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতিঃ ক্ষমা ইত্যেতা উত্তমাঃ স্ত্রীণামহমস্মি যাসামাভাসমাত্রসম্বন্ধেনাপি লোকঃ কৃতার্থমাত্মানং মন্যতে। ৩৪।

ভাষ্যানুবাদ। মৃত্যু দুই প্রকার (এক যে) ধনাদি হরণ করে (দ্বিতীয় যে) প্রাণ হরণ করে (তাহাকেও মৃত্যু কহা যায়) সুতরাং মৃত্যু সর্ব্বহর বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, আমি সেই মৃত্যু। অথবা আমি সেই পরম ঈশ্বরস্বরূপে প্রলয়কালে সমুদয় হরণ করি বলিয়া সেই সর্ব্বহর মৃত্যু আমিই হই। "উদ্ভব" (এই শব্দটীর অর্থ) উৎকর্ষ অর্থাৎ অভ্যুদয় এবং তাঁহার প্রাপ্তির কারণ "ভবিষ্যৎ" যাহারা কল্যাণাস্পদ হইয়া উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ যাহারা উৎকর্ষপ্রাপ্তির যোগ্য, তাহাদের (আমিই উৎকর্ষ)। আমি নারীগণের কীর্ত্তি বাক্ শ্রী স্মৃতি মেধা ধৃতি ও ক্ষমা এই কয়টী উত্তম স্ত্রীস্বভাব (রূপে বিরাজমান আছি) যাহাদিগের আভাস রূপ সম্বন্ধ লাভ করিলেও লোক আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে। ৩৪।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫॥

অন্বয়। তথা সাম্নাং বৃহৎসাম অস্মি। ছন্দসাং গায়ত্রী অস্মি। অহং মাসানাং মার্গশীর্ষোঽস্মি। ঋতূনাং কুসুমাকরোঽস্মি। ৩৫।

মূলানুবাদ। আরও আমি সামগানের মধ্যে বৃহৎসামনামক প্রধান সাম গান। ছন্দঃসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রীছন্দঃ। মাসনিবহের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ। আমি ঋতুছয়টীর মধ্যে বসন্ত ঋতু। ৩৫।

ভাষ্য। বৃহৎসামেতি বৃহৎসাম তথা সাম্নাং প্রধানমস্মি। গায়ত্রী-চ্ছন্দসাং গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টানাং ঋচাং গায়ত্রী ঋক্ অহং ইত্যর্থঃ। মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং ঋতূনাং কুসুমাকরো বসন্তঃ।৩৫।

ভাষ্যানুবাদ। বৃহৎসাম ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। সামগানসমূহের মধ্যে প্রধান বৃহৎসাম নামক গান আমি হই। ছন্দঃসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী (অর্থাৎ) গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দোযুক্ত মন্ত্রগণের মধ্যে আমি গায়ত্রী-ছন্দোযুক্ত মন্ত্র। মাসগণের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং ঋতুগণের মধ্যে আমি "কুসুমাকর" বসন্ত। ৩৫।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬॥

অন্বয়। অহং ছলয়তাং দ্যূতং অস্মি। তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি জয়ঃ অস্মি ব্যবসায়ঃ অস্মি অহং সত্ত্ববতাং সত্ত্বং অস্মি।৩৬।

মূলানুবাদ। আমি ছলনাকারিগণের দ্যূত হই। তেজস্বিগণের তেজঃ হই; আমি জয়, আমি ব্যবসায়, আমি বলবান্ প্রাণিগণের বল। ৩৬।

ভাষ্য। দ্যূতমিতি। দ্যূতমক্ষদেবনাদিলক্ষণং ছলয়তাং ছলস্য কর্তৄণাং অস্মি। তেজস্তেজস্বিনামহং জয়োঽস্মি জেতৄণাং ব্যবসায়োঽস্মি ব্যবসায়িনাং সত্ত্বং সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানামহং। ৩৬।

ভাষ্যানুবাদ। দ্যূতমিত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "দ্যূত" অক্ষক্রীড়াদিরূপ; আমি ছলনাকারিগণের (দ্যূত) হই। আমি তেজস্বিগণের তেজঃ হই, জয়কারিগণের জয় হই, ব্যবসায়িগণের ব্যবসায় হই এবং "সত্ত্ববান্" সাত্ত্বিক-গণের সত্ত্ব হই। ৩৬।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়। (অহং) বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ (অস্মি) অহং মুনীনামপি ব্যাসঃ কবীনাং (অহং) উশনাঃ কবিঃ। ৩৭।

মূলানুবাদ। বৃষ্ণিকুলের মধ্যে আমি বাসুদেব হই, পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয় হই, মুনিগণের মধ্যেও আমি ব্যাস হই এবং কবিগণের মধ্যে আমি কবি শুক্রাচার্য্য। ৩৭।

ভাষ্য। বৃষ্ণীনামিতি। বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি অয়মেবাহং ত্বৎসখা, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়স্ত্বমেব মুনীনাং মননশীলানাং সর্ব্বপদার্থজ্ঞানিনামপ্যহং ব্যাসঃ। কবীনাং ক্রান্তদর্শিনাং উশনাঃ কবিরস্মি। ৩৭।

ভাষ্যানুবাদ। বৃষ্ণীনাং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমি বাসুদেব এই তোমার সখা আমিই। পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয় অর্থাৎ তুমি। "মুনি" অর্থাৎ মননশীল সর্ব্বজ্ঞগণের মধ্যেও আমি ব্যাস, "কবি" অর্থাৎ অতীত বস্তুনিচয়দর্শিগণের মধ্যে আমি উশনাঃ নামে কবি হই। ৩৭।

দণ্ডোদময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়। দময়তাং দণ্ডোঽস্মি, জিগীষতাং নীতিঃ অস্মি, গুহ্যানাং চৈব মৌনং অস্মি জ্ঞানবতাং অহং জ্ঞানং অস্মি। ৩৮।

মূলানুবাদ। দমনকারিগণের আমি দণ্ড, বিজয়েচ্ছুগণের আমি নীতি; গুহ্যগণের মধ্যে আমি মৌন, জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞান হই। ৩৮।

ভাষ্য। দণ্ড ইতি। দণ্ডো দময়তাং দময়িতৄণাং অস্মি অদান্তানাং দমকারণম্। নীতিরস্মি জিগীষতাং, মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্। ৩৮।

ভাষ্যানুবাদ। "দময়ৎ" অর্থাৎ দমনকারিগণের আমি "দণ্ড" অদান্তজন-গণের দমনের হেতু হই "জিগীষৎ" জয়েচ্ছুগণের আমি নীতি হই। "গুহ্য" গোপ্যগণের মধ্যে আমি মৌন হই এবং জ্ঞানবান্‌গণের [illegible] জ্ঞান হই। ৩৮।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

(শ্রী সরসীলাল সরকার এম, এ)

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ের মধ্যে একটী আদর্শ থাকে, তাহাই সে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। স্বামীজীর এই কয়টি কথার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। যেরূপ মনুষ্যের কার্য্য ও আচরণ দেখিয়া আমরা তাহার চরিত্র সম্বন্ধে অনুমান করিতে পারি, সেইরূপ জাতীয় কার্য্য ও আচরণ দ্বারাও আমরা জাতীয়-চরিত্র বুঝিতে পারি। অতএব মনুষ্যবিশেষের চরিত্র অথবা জাতি বিশেষের চরিত্র উভয়ই আমরা দুই অংশে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম, আদর্শ, দ্বিতীয়, সেই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা। একজন অপরের মনে উচ্চ আদর্শের চিত্র অঙ্কিত করিয়া চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু সেই আদর্শ নিজের জীবনে পরিণত করিতে প্রত্যেক মনুষ্যকে নিজের উপর নির্ভর করিতে হয়।

সাহিত্যে জাতীয়-জীবনের প্রতিবিম্ব থাকে, এজন্য কোন সময়বিশেষের সাহিত্যে সেই সময়ের জাতীয়-জীবনের পরিচয় অনেকাংশে পাওয়া যায়। এখনকার বঙ্গসাহিত্য পাঠ করিলে তাহার সর্ব্বত্রই প্রায় হতাশ ভাব দেখা যায় এবং কি যেন একটা ছায়া ছায়া অনিশ্চিত ভাবের ছড়াছড়ি ভিন্ন কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অধিকাংশেই উদ্দেশ্যহীনতার পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। গ্রন্থকর্ত্তা কি বলিতে চান, তাহা তিনি নিজেই যেন ঠিক জানেন না বা ধরিতে পারেন নাই। ইহাতে মনে হয়, আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ এখনও সম্যক্‌রূপে স্থির হয় নাই। আমরা কি চাই, তাহা আমরা এখনও ঠিক জানিনা। সাহিত্যের ভিতরের এই নিরাশা, এই বিলাপ, এই উদ্দেশ্যহীনতা তাহারই পরিচয় প্রদান করে। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা কীদৃশ মহানুভব ছিলেন এবং আমরা কতদূর অধঃপাতে গিয়াছি, এই কথা তুলিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিবার সুবিধা পাইলে সে মাহেন্দ্র সুযোগ কোন লেখকই পরিত্যাগ করেন কিনা সন্দেহ। কিসে আমরা উন্নত হইতে পারি, কিসে আমরা চরিত্রবান হইতে পারি, এই বিষয় লইয়া বিতর্ক করিতে আমাদের যে সময় চলিয়া যায়, উন্নত আদর্শকে নিজের জীবনে দৃঢ়ভাবে

স্থাপন করিতে যদি সে সময়ের শতাংশের একাংশও ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে যে আমরা উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, দুঃখদারিদ্র্যের স্রোতে পড়িয়া দিন দিন আমরা অধঃপাতসমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছি বলিয়া রোদন মাত্রেই আমাদের ভিতর মনুষ্যত্বের উদয় হইবে না।

পূর্ব্ব-পুরুষদের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাদের ন্যায় হইবার আমাদের ইচ্ছা ও উদ্যম আছে কি না, ইহাই অনুসন্ধান করিতে যদি আমরা ব্যগ্র হইতাম, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কীর্ত্তি প্রাণের ভিতর উত্তেজনার আগ্নেয় অক্ষরে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" এই মহাবাণী অঙ্কিত করিয়া দিত! তখন অশ্রুজল ফেলিয়া বিলাপ করিবার অবসরও থাকিত না।

আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টার অভাবই যে কেবল আমাদের ভিতর বর্ত্তমান, তাহা নহে, উন্নত আদর্শ-বিশেষ জীবনে পরিণত করিয়াছে, এমন মনুষ্যেরও যথেষ্ট অভাব।

নন্দলাল তো একদিন একটা করিল বিষমপণ,
দেশের জন্য যা করেই হোক্ রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল "আহাহা কর কি কর কি নন্দলাল।"
নন্দ বলিল বসিয়া বসিয়া র'ব কি চিরটা কাল।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চিত্রিত নন্দলালের মত আদর্শই এখন দেশে অনেক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃত ত্যাগ, নিরলস চেষ্টা ও আড়ম্বরহীন কার্য্য যে দেশ হইতে লোপ হইয়াছে, তাহা নয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর নামও এতদিন লুপ্ত হইয়া যাইত।

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের জীবনে যে অশ্রান্ত চেষ্টা, অপরিসীম উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পৃথিবীস্থ সকল জাতির নিকটেই এক উন্নত আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের আদর্শে আমাদের জাতীয় জীবন যে উন্নতি লাভ করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। এবং তজ্জন্য প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

হাওড়ার আঠার মাইল পশ্চিমে পাইকপাড়া গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺তারক নাথ সরকার। সামান্য ভূমিসম্পত্তির আয় দ্বারা তিনি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ

করিতেন। এই শ্রেণীর লোক ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ইহাঁদিগকে নিজের বুদ্ধি অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হইত, সেজন্য তাঁহারা স্বাধীনচিত্ত ও স্বাবলম্বন-প্রিয় ছিলেন। ইংরেজ অধিকারে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচলনে, খাদ্যদ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা হেতু ও অন্যান্য কারণে এই শ্রেণীর লোককে বিশেষ কষ্টভোগ করিয়া পরিশেষে বাধ্য হইয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে! ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার বাল্যকালে নিজ পরিবারবর্গকে ঐরূপ দুর্দ্দশাভোগ করিতে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঐ স্মৃতিই যে 'ারে বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়া লোকের ঐরূপ দুর্দ্দশা মোচন করিবার উদ্দেশ্য তাঁহার জীবনে আনিয়া দেয়, ইহা নিঃসন্দেহ।

তারকনাথ সরকারের অল্প বয়সেই মৃত্যু হইল। ঐ ঘটনায় মহেন্দ্রের মাতা নিতান্ত নিরাশ্রয়া হইয়া পড়িলেন এবং পুত্র দুটীকে লইয়া কলিকাতায় ভ্রাতার গৃহে আশ্রয় লওয়া ব্যতীত তাহার আর অন্য উপায় রহিল না। এইরূপে মাতুলগৃহেই ডাক্তার সরকারের জীবনের প্রথম ভাগ অতিবাহিত হয়। মাতুলালয়ে মহেন্দ্রলাল এবং তাঁহার মাতার কষ্টে দিনযাপন করিতে হইত। বাজার হইতে বিচালী কিনিয়া আনা, উহা কাটিয়া গরুর খাইবার উপযোগী করিয়া দেওয়া প্রভৃতি অশেষবিধ গৃহকার্য্যই তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে করিতে হইত। বাল্যজীবনের ঐ সমস্ত পারিবারিক ক্লেশ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনে একদিকে যেমন বিশেষ সহায় হইয়াছিল, সেইরূপ অন্যদিকে আবার কয়েকটি কর্কশরেখাও দৃঢ়-অঙ্কিত করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সুইফ্‌টের (Swift) চরিত্র সমালোচনা করিতে যাইয়া থ্যাকারে (Thakeray) এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, সুইফ্‌ট অদ্ভুত প্রতিভাশালী এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন কিন্তু কৈশোর জীবনে পরমুখাপেক্ষী হইয়া দাসভাবে অবস্থানই তাঁহার স্বভাবের কর্কশতার একটী প্রধান কারণ! বাল্যকাল হইতেই ডাক্তার সরকার অত্যন্ত নির্ভীক এবং বিশেষ স্পষ্টবাদী ছিলেন; অপ্রিয় সত্য বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এজন্যই বোধ হয় পরজীবনে তাঁহার কর্কশ স্বভাবের অপবাদ হইয়াছিল। তাঁহার স্বভাবে কিন্তু বাস্তবিক কর্কশতা ছিল না। উপরের কঠিনস্তর একবার ভেদ করিতে পারিলে—এবং অতি সহজেই উহার ভেদ হইত—ভিতরে অমৃতময়ী পরদুঃখকাতরতা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি কোমল গুণরাশি প্রতীয়মান হইত। তাঁহার পরিচিত সকলেই এ বিষয়ে ভূরি নিদর্শন পাইয়াছেন।

মহেন্দ্রলাল সাতবৎসর বয়সে হেয়ারস্কুলে ভর্ত্তি হয়েন এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ হইতে সিনিয়ার বৃত্তি পাইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। পঠদ্দশায় তিনি সমস্ত শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম, ডি পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন!

প্রবন্ধের ভূমিকায় আদর্শ এবং ঐ আদর্শ জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা রূপ মানবচরিত্রের যে দুইটি বিভাগের কথা বলিয়াছি, ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের চরিত্রে সেই দুইটী অংশই বিশেষ পরিস্ফুট দেখিতে পাই। ডাক্তার সরকার সকল বিষয়েই উচ্চতম আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন বটে, কিন্তু কেবল এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়েই বিশেষরূপে পারদর্শিতা লাভ করা তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। চিকিৎসা বিষয়ে তিনি মহর্ষি চরকের বিশ্বজনীন উপদেশই মনমধ্য করিয়াছিলেন, -"স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েৎ।" যে মত অবলম্বন করিয়াই চিকিৎসা করুন না কেন, তিনিই ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ, যিনি রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। ডাক্তার সরকারের যখন ধারণা হইল যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ, তখন তিনি নিজের আর্থিক উন্নতির সমূহ ক্ষতি করিয়াও ঐ প্রণালী পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর সার্ জন উডবরণ ডাক্তার সরকারের উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানসভার একটী বক্তৃতায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "ডাক্তার সরকার, তুমি বিজ্ঞানসভা সম্বন্ধে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট নহ। ইহার কারণ ইহা নহে যে, তুমি বিজ্ঞানসভা স্থাপন ও তাহার উন্নতিকল্পে যে যে কার্য্য করিয়াছ, সে গুলি সামান্য কার্য্য কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তোমার আদর্শ এত উচ্চ যে, তুমি অল্পে সন্তুষ্ট হইবার নহ। সাধারণের নিকট যাহা অসামান্য বলিয়া বোধ হয়, তোমার নিকট তাহা যৎসামান্য মাত্র।"

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার সরকার বিজ্ঞানসভা স্থাপন করেন। ঐ সভা স্থাপনের পর তিনি যে ২৭ বৎসর জীবিত ছিলেন, উহারই উন্নতিকল্পে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানসভার দ্বারা দেশ কিরূপে উন্নত হইতে পারে এবং এ সভার উদ্দেশ্য যে বহুদূরব্যাপী, তাহা তিনি সভার বাৎসরিক অধিবেশনে সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। ডাক্তার সরকার বুঝিয়া-

ছিলেন, কেবল পূর্ব্বপুরুষগণের গুণকীর্ত্তন করিলেই দেশের অন্নকষ্ট ঘুচিবে না অথবা মন্ত্রশক্তিবলে যে, সহসা আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে, সে আশাও বৃথা। ভারত যদি আবার কখন উন্নত হয়, ত কেবল মাত্র দেশবাসীদের অশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে হইবে। আবার পরিশ্রম যদি উদ্দেশ্যহীন হয়, তাহা হইলে তাহাও বৃথা হইবে। যথার্থ কর্ম্মী প্রত্যেক কর্ম্মের উদ্দেশ্যটি আপন মনে স্পষ্ট অনুভব করিয়া ও ঐ উদ্দেশ্যকে দীপশিখার ন্যায় সম্মুখবর্ত্তী করিয়া তৎকর্ম্মে অগ্রসর হন এবং ক্রমে সিদ্ধমনোরথ হইয়া থাকেন। আমাদেরও ঐ পথ আশ্রয় করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যদেশগুলির এবং নব অভ্যুদিত জাপানের উন্নতির মূল খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায়, বিজ্ঞানচর্চ্চাই এবং ঐরূপে কর্ম্মানুষ্ঠানই ইহাদের সমস্ত উন্নতির মূল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটিবে। এই অন্নবস্ত্রহীন দারিদ্র্যদুঃখপীড়িত ভারতবর্ষের যদি এখন উন্নতির কোন উপায় থাকে ত সে কেবল স্বাবলম্বনে, অদম্য-উদ্যমে ও বিজ্ঞান চর্চ্চায়। গত বৎসর "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা, ইহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও অভাব" শীর্ষক একখানি বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হয়। উহার ভূমিকাতে ঐ বিষয়টী বিস্তৃত ভাবে বুঝান হইয়াছে। আমরা উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। "কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে সামান্য একজন মজুরের মাহিনা দশটাকা, কিন্তু রেলে হউক অথবা অন্যস্থানে হউক, একজন শিক্ষিত ভদ্রযুবক সেই মাহিনায় চাকুরী পান না। সে দিন একজন ছাত্র-বৃত্তি পাশকরা ব্রাহ্মণ যুবক পাচকের কার্য্য করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে, কোন এক ব্যক্তি এফ্, এ, পাশ করিয়া এক আফিসে দপ্তরীর কার্য্য করিতেছেন। ফল কথা, ভদ্রসন্তানগণকে যে পেটের জ্বালায় কুলিগিরি করিতে হইতেছে, তাহারই পূর্ব্বসূচনা প্রকাশ পাইতেছে। এখন উপায় কি? আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা করা এবং সেই বিজ্ঞান কৃষি ও শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত করাই এই বিপৎসাগর হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়। ইহার পর ভবিষ্যতে আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের যে কিরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা হইবে, যাঁহারা সে কথা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাঁহারা বিজ্ঞানসভার জন্য, লজ্জা ও ঘৃণায় জলাঞ্জলি দিয়া, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত হইবেন।" ডাক্তার সরকার এটিও বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন যে, বিজ্ঞানালোচনায় যে শুদ্ধ ঐহিক উন্নতি হয়, এরূপ নহে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, সত্যানুসন্ধানের

চেষ্টা হব এবং সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কিরূপেই বা বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিলে সিদ্ধকাম হইতে পারেন, তাহারও শিক্ষা হয। আবার ইহাতে মানবহৃদযেরও অদ্ভুত বিকাশ হইযা থাকে। এই মহতী বিচিত্রতাময়ী ও অপার রহস্য-ময়ী প্রকৃতির রহস্যানুসন্ধানে চিত্ত নিযোজিত করিলে চিত্তবৃত্তিগুলি যে ক্রমশঃ ইহার সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টির নিত্য নূতন ভাবে পরিচয পাইযা ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে ?

বিজ্ঞানসভায় বক্তৃতা দ্বারা এবং বহুতর লিখিত প্রবন্ধের দ্বারা জন সাধারণে এই সমস্ত তত্ত্বগুলির প্রচারেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইযাছে। তাঁহার অদ্ভুত জীবনে এই ভাব এতই অধিক ছিল যে, রোগে শোকে নিরাশায অন্ধকারে এবং মৃত্যুশয্যায শায়িত হইযা তিনি যে ভক্তি-রসাত্মক সংগীত গুলি রচনা করিযাছেন, তৎসমুদাযও এই ভাবে পরিপূর্ণ! আমরা তাহার একটি এখানে উদ্ধৃত না করিযা থাকিতে পারিলাম না।

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

দেখ দেখ চেযে দেখ গগনমণ্ডলে।
কি শোভা করেছে সেথা গ্রহ তারা দলে॥
(যেন) প্রকৃতি সাজাযে রেখেছে জ্যোতির্ম্ময় পুষ্পদলে।
দিতে পুষ্পাঞ্জলি বিধাতার চরণকমলে॥
দূরবিন সহকারে বিজ্ঞানের বলে।
(দেখ) অদ্ভুত রূপ তাদের জ্ঞানচক্ষু মেলে॥
দেখিবে তবে এই অসীম বিশ্বরাজ্য
চালাইছেন বিশ্বনাথ কি কৌশলে॥
ছড়ায়ে ধূলি এক মুষ্টি, তিনি করিযাছেন সৃষ্টি,
অগণ্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, ধূলা খেলার ছলে॥
সঙ্কর ও মহাপ্রলয করিতে নিবারণ,
বন্ধন করেছেন তাদের নিযম শৃঙ্খলে,
নিযম পালনে তারা ভ্রমিতেছে অনুক্ষণ,
অপার মহিমা তাঁর গাইতেছে সবে মিলে॥

স্বামী বিবেকানন্দও স্থির করিযাছিলেন যে, ভারতবর্ষের উন্নতির নিমিত্ত আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হওয়া বিশেষ

আবশ্যক। উদ্বোধনে প্রকাশিত তাঁহার একখানি পত্রপাঠে জানা যায়, তিনি রামকৃষ্ণমিশনের সভ্যগণকে ঐরূপ প্রচারকার্য্যের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। সমাজের নিম্নস্তরস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মোটামুটি তত্ত্বগুলি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতার দ্বারা বুঝাইবার বন্দোবস্ত করিবার পরামর্শ দিতেছেন। ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতি সামান্য সামান্য যন্ত্র সাহায্যে ঐ বক্তৃতাগুলি সাধারণের চিত্তাকর্ষক করিবার কথাও বলিতেছেন। ঐরূপ সামান্য ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিতে কুণ্ঠিত হইতেও নিষেধ করিতেছেন। কারণ, সামান্য বীজ হইতেই পরিণামে মহান্ মহীরুহের উৎপত্তি হয় এবং ঐরূপ সামান্য ভাবে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি ক্রমশঃ সাধারণে প্রচারিত হইলে পরিণামে বহুজন-কল্যাণ-রূপ সুফল প্রদান করিবে। ডাক্তার সরকার এবং স্বামী বিবেকানন্দের ঐ সারগর্ভ বচনগুলি রামকৃষ্ণ-মিশন এবং দেশস্থ অন্যান্য সভাসমিতির সভ্যগণ যদি হৃদয়ে ধারণা করিয়া ঐ সুমহৎ প্রচারব্রত যাহার যতটুকু সাধ্য, অনুষ্ঠান করেন, তবে দেশের এই দুর্দ্দশামোচন অতি শীঘ্রই সম্পাদিত হয়।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অনেক প্রকার লোকসম্মানে ও রাজসম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার ইউনিভার্সিটীর ফেলো পদে নির্ব্বাচিত হন। ঐ পদে নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি ইউনিভার্সিটীর শিক্ষাপ্রণালীসংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের মীমাংসায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৩ খৃীঃ পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৮৮৭ খৃীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার সেরিফের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ খৃীঃ অব্দে তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত হয়েন। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটী হইতে ডি, এল (D. L.) উপাধি প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন মিউনিসিপ্যাল কমিসনার, আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য প্রভৃতি নানা পদে নির্ব্বাচিত হইয়া সকল পদের কার্য্যভারই দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া ভূরি সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে তিনি দি ক্যালকাটা জর্ণাল অফ মেডিসিন (The Calcutta Journal of Medicine) নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পত্রিকা তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল।

ডাক্তার সরকারের ধর্ম্মমত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্মজীবনে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ২।১ টী কথা বলা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতে আর্য্যজাতিগণের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ আলোচনা হইয়াছিল, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে কখনও সেরূপ হয় নাই, এ কথা বলা অত্যুক্তি মাত্র। ভারতের প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে,কোন দর্শন কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তি অবলম্বনে গঠিত হইয়াছে, কোনটি বা প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। আবার কোন দর্শন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রমাণ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এইরূপে, ধর্ম্মতত্ত্ব যত প্রকারে আলোচনা করা সম্ভব, প্রাচীন ঋষিগণ তাহা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ধর্ম্মজগতে আজ এক প্রকার নূতন প্রমাণপ্রণালীর অভ্যুদয় হইয়াছে। **এই নূতন** প্রমাণপ্রণালীর নাম বিজ্ঞানপ্রমাণ। ধর্ম্মজগতে আজ কাল যে মহাবিপ্লব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঋষিগণস্বীকৃত প্রমাণপ্রণালীর সহিত উক্ত বিজ্ঞানপ্রমাণের সংযোগ-সংঘর্ষেই উৎপন্ন হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ বর্ত্তমান যুগের হিন্দুধর্ম্মপ্রচারকেরা ঋষিগণাবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের সত্যতা বিজ্ঞানপ্রমাণপ্রয়োগে পুনঃ প্রমাণিত করিয়াই লোকের মনে ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মূর্খজনমনোহারী পুরাণসমূহের রূপকোপাখ্যানাদি এবং মানসকল্পিত ভূগোলাদির উপরেই যে হিন্দুধর্ম্মের শ্রুতিস্মৃতি দণ্ডায়মান নহে, ইহা প্রমাণিত হওয়াতেই হিন্দুধর্ম্ম সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

বিবেকানন্দপ্রমুখ আচার্য্যেরা ইহাই দেখাইয়াছেন যে, পুরাণাদি সামান্য-গ্রন্থনিবদ্ধ অসার ভাগের সহিত বিজ্ঞানপ্রমাণের সামঞ্জস্য না থাকিলেও বেদান্তবেদ্য অদ্বৈত তত্ত্বের দৃঢ়ভিত্তি উহাদ্বারা অধিকতর অচল অটলভাবে সংস্থাপিত হইতেছে! উহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের সার অংশের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য হইয়া যাইবে।

পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহে এবং উহাদের অনুকরণে এদেশেও কেহ কেহ আবার উক্ত বিজ্ঞানপ্রমাণকে এতদূর সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনে করিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বগুলি যে দিন দিন নানাত্বপূর্ণ জগৎ একত্ব হইতেই প্রসূত প্রমাণিত করিতে দ্রুতপদসঞ্চারে ধাবমান, ইহা এককালে ভুলিয়া যান! এজন্যই পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদেরা কেহ বা সেশ্বর এবং কেহ বা নিরীশ্বরবাদী দেখিতে পাওয়া যায়। পরিণামবাদপ্রণালীর (Evolution) পশ্চাতে কেহ বা পূর্ণ অদ্বৈত তত্ত্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া থাকেন এবং কেহ বা ঐ প্রণালীরই পশ্চাতে ইচ্ছাবুদ্ধ্যাদিসম্পন্ন (!) লীলাময় (!) জড়ের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া জড়বুদ্ধি হইয়া পড়েন।

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার বিজ্ঞান-প্রমাণ বাদী ছিলেন বটে কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার ঐ প্রকার গোঁড়ামী ছিল না। তিনি স্বীকার করিতেন যে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানপ্রমাণেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইবে।

পুরাতন মত ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইলে উহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন মত গ্রহণ করিতে ডাক্তার সরকারের কোন দ্বিধা হইত না। কিন্তু যতদিন বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা কোনও মত ভুল বলিয়া প্রমাণিত না হইত, তত দিন ডাক্তার সরকার সেই মত কখনই পরিত্যাগ করিতেন না।

শ্রী 'ম' লিখিত 'রামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ করিলে জানা যায় যে, এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার কখন কখন মতভেদ হইত। উহাতে এক স্থলে দেখা যায়, কোন সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ অবতারতত্ত্বের বিষয় নিম্নলিখিতভাবে ডাক্তার সরকারকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ডারউইনের (Darwin) ক্রমবিকাশবাদ(Theory of Evolution) স্বীকার করিয়া লইয়া অনায়াসে আমরা অনুমান করিতে পারি যে,মনুষ্য ক্রমশঃ উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে করিতে এত উন্নত হইবে যে,আমরা নরচক্ষে তাঁহাকে আর ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন করিতে পারিব না। কিন্তু ডাক্তার সরকার, প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিকে কল্পনার সহায়ে অতদূর পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিশ্বাস করিতে অস্বীকৃত হন।

ডাক্তার সরকার যে শুদ্ধই বিজ্ঞানপ্রমাণ মানিয়া চলিতেন, এ কথা বলিলেও ঠিক সত্য কথা বলা হয় না। কারণ, কেহ কেবল বিজ্ঞানপ্রমাণসহায়ে নিজ ধর্ম্মমতামত সংস্থাপনের চেষ্টা করিলে হয়ত বা প্রকৃতির ন্যায় নিরীশ্বরবাদী না হইতেও পারেন, কিন্তু সাধনসহায়ে বিজ্ঞানপ্রমাণিত গভীর সাক্ষিবে

বিচরণ করিতে না শিখিলে কখনই তিনি অজ্ঞেয়তাবাদের (Agnosticism) হস্ত হইতে পুরিত্রাণ পাইবেন না।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একদিকে যেমন বিজ্ঞানাবিষ্কৃত তত্বসমূহে আস্থাবান্ ছিলেন, অন্যদিকে আবার তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগে সত্যনির্ব্বাচন করিতে যাইযা তাঁহার হৃদয় শুষ্ক না হইয়া বরং তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতা, সরলতা ও ঈশ্বরবিশ্বাস শতগুণে বৃদ্ধিই পাইযাছিল। শ্রী-'ম' কথিত "রামকৃষ্ণকথামৃত" পাঠ করিলে জানা যায়, যোগবিভূতিসম্পন্ন শ্রীমৎ রামকৃষ্ণপরমহংসদেব ডাক্তার সরকারের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ঐ কথা বিশেষরূপে বলিযা গিয়াছেন। ঐ পুস্তক হইতে কয়েক লাইন নিম্নে উদ্ধৃত না করিযা থাকিতে পারিলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর যে অবতার হ'তে পারেন, এ কথা যে ওঁর সায়েন্সে নাই। তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়?

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

"সরল না হলে ঈশ্বরে চট্ করে বিশ্বাস হয না। ঈশ্বর বিষযবুদ্ধি থেকে অনেকদূর। বিষযবুদ্ধি থাক্‌লে নানা সংশয উপস্থিত হয়, আর নানারকমে অহঙ্কার এসে পড়ে;—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, মানের অহঙ্কার, এই সব। (ভক্তদের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল।

গীতার প্রতি ডাক্তার সরকারের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। গত দুইবৎসর বৈকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিযা প্রায়শঃ তাঁহাকে গীতাপাঠে নিযুক্ত দেখিযাছি। বিজ্ঞানসভার বাৎসরিকবক্তৃতার কতিপযস্থলে তিনি ঈশ্বরের সৃষ্টিনৈপুণ্য অতি ভক্তিভাবে আলোচনা করিযা গিযাছেন। বিজ্ঞানপ্রমাণের প্রতি আস্থাবশতঃ হিন্দুধর্ম্মের অসারাংশসমূহ তিনি পরিত্যাগ করিযাছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের সকলকথা বিচার করিয়া দেখিলে তিনি যে একজন আন্তরিকশ্রদ্ধাসম্পন্ন হিন্দু ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয। বিজ্ঞান-প্রমাণ তাঁহার অন্তর্নিহিত হিন্দুভাবকে তিলমাত্রও ধ্বংস করিতে পারে নাই।

ডাক্তার সরকারের জীবনের শেষ ঘটনাতে তাঁহার স্বদেশীযদিগের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা এবং ঈশ্বরের প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় বিশেষরূপে পাওযা যায। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন তাঁহার কথা বলিবার শক্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখন তিনি কিছু লিখিতে ইচ্ছা করিতেছেন,

এইভাব ইঙ্গিতে জানাইলেন। একটী পেন্‌সিল ও একখানি কাগজ তাঁহাকে দেওয়া হইলে তিনি অতিদ্রুতভাবে কয়েকটি কথা লিখিতে লাগিলেন। কয়েকটী কথা লিখিতে লিখিতেই তাঁহার জীবন ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গেল। তিনি যে কয়েকটী কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই—

হে আমার মঙ্গলেচ্ছুগণ, বিদায়। সৃষ্টি-কর্ত্তাকে কোন দোষ দিও না। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন, ঠিক যথাযথ সেইরূপই ঘটিবে।"

এই ঘটনায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সংসারের সকল ভোগ পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের মত ইহলোক হইতে চলিয়া যাইতে তাঁহার কিছুমাত্র ভয় বা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয় নাই এবং কোন্ সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইবে, সে কথাও তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কর্ম্মবীরাগ্রণি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এইরূপে বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত সময়ে একাত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলেন। সিন্ধুতে বিন্দু মিলিল; বিম্বের রূপনাশে যে জল, সেই জলই রহিল।

বঙ্গে অকালমৃত্যু।

মহামারী (প্লেগ) ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ।

(ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম, বি)

চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুন্নত অবস্থায় রোগনির্ণয়ের অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত মারীভয় উৎপাদক বিভিন্ন সংক্রামক রোগ এক মহামারী নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে জনপদধ্বংসন বা মহামারীর কথাই শুনিতে পাই, মহামারী উৎপাদক ব্যাধি সকলের বিশেষ বর্ণনা দেখা যায় না। মহর্ষি চরকের জনপদধ্বংসন যদিও আধুনিক ম্যালেরিয়া বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে, কিন্তু সুশ্রুতের মহামারী, কোন সংক্রামক ব্যাধিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন কালে ইউরোপখণ্ডে, জনপদধ্বংসকর সকল সংক্রামক রোগের সাধারণ নাম মহামারী বা প্লেগ (Plague) ছিল। ঐতিহাসিক কালে ইউরোপের মধ্যযুগে যে সংক্রামক ব্যাধি সহস্র বৎসর ধরিয়া মৃত্যুস্রোত বৃদ্ধি করিয়াছিল, কেবল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যকালে আড়াই কোটি লোকের অকালমৃত্যু

সংঘটন করিয়া মহাদেশকে জনশূন্য করিযাছিল. মহামারী বা প্লেগ (Plague) নামে তিনিই বিশেষরূপে বিখ্যাত হইযাছেন। চরকসুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদীয বা অপর কোন গ্রন্থে মহামারী রোগ সম্বন্ধে কোন কথা পাওযা যায় না। প্রাচীন ভারতে এই ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির বর্ত্তমানতা বিষয়ে একারণ সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু দুইসহস্র বৎসরেরও অধিককাল ধরিযা ইউরোপ ও আসিযার বিভিন্ন অংশে মহামারী ব্যাধি যে সুপরিচিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

খৃষ্ট জন্মের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে, মহামারী, মিসর, সিরিযা ও সন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে প্রাদুর্ভূত হইযা মারীভয় উৎপন্ন করিযাছিল, যবন চিকিৎসকদিগের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী কালে ইহার উপদ্রবের কাহিনী লিপিবদ্ধ না থাকিলেও, ইহার বিষদন্ত ভগ্ন হইযাছিল বলিযা বোধ হয না। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিসর দেশ হইতে আরম্ভ করিযা মহামারী তাৎকালিক সমগ্র রোমসাম্রাজ্যে বিস্তৃত হইযাছিল। ইহারই নাম—জাষ্টিনিযান মহামারী—ইহা সম্রাট্ জাষ্টিনিযানের রাজত্বকালে উদ্ভূত হইযা অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ রোমরাজ্যে অকালমৃত্যুর প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত করিযা, অসংখ্য জনপদ মরুভূমিতে পরিণত করিযাছিল। মধ্য ইউরোপের বর্ব্বর বাহিনী কর্ত্তৃক রোমরাজ্য ধ্বংস হইলে, সভ্যতা ও জ্ঞানালোকের তিরোভাবের সহিত সহস্রবর্ষব্যাপী অজ্ঞানান্ধকার ইউরোপ আচ্ছন্ন করে। এই সমযে দীর্ঘকালযুদ্ধ, বিদ্রোহ, অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ও পাশব অত্যাচারে যেরূপ প্রজাকুল ইতস্ততঃ বিতাড়িত ও নিষ্পেষিত হইযাছিল, মারীভযও সেইরূপ নানামূর্ত্তি ধারণ করিযা অকালমৃত্যুর আর্ত্তনাদে দিগ্‌দিগন্ত আকুলিত করিযাছিল।

কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে মহামারী ইউরোপে আবির্ভূত হয, তাহার ন্যায সর্ব্বগ্রাসী মারীভয ইতিহাসে বর্ণিত হয় নাই। তাৎকালিক জনৈক লেখক লিখিযাছেন—"কেহ কেহ লোকালয হইতে পলাইযা বিজন ভাবিযা অরণ্যে আশ্রয গ্রহণ করিযাছিল, কেহবা অর্ণবযানে আরোহণ করিযা তীর হইতে বহুদূর সমুদ্রের উপর বাস করিতে লাগিল। কিন্তু যে দেবযোনি রোগবীজ ছড়াইতেছিলেন, তাঁহার একপদ জলে, অপরটি স্থলে। এরূপ নিবিড় জঙ্গল ছিল না, যাহার মধ্যে মহামারী পদক্ষেপ না করিযাছেন ; তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিযাছে, এরূপ নিভৃত স্থান দেখা যায় নাই। পলায়ন করিযা কিরূপে বাঁচিবে? মহামারীর হস্ত সর্ব্বত্র বিস্তৃত। ব্যবসায কেবল শবাধার ও শবাচ্ছাদনবস্ত্র প্রস্তুত—তাহাও কিছুদিন মাত্র চলিয়াছিল। অপরাধমোচনের

জন্য কে বা পুরোহিতের নিকট স্বকীয় পাপ স্বীকার করিবে? ধর্ম্মমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত, কিন্তু না আছে পুরোহিত, না আছে অনুতাপী। সকলেই একত্রে শ্মশানভূমে শায়িত। মন্দিররক্ষক ও চিকিৎসক একই গভীর ও বিস্তৃত কবরে নিহিত; উইলকারক, তাঁহার উত্তরাধিকারী ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকগণ একই শকট হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া একই গহ্বরে সমাধিস্থ। গৃহের অগ্নি নির্ব্বাপিত; যেন তাহা দাহিকাশক্তিপরিশূন্য হইয়াছে। নাবিক ও খালাসিহীন জাহাজ সূর্য্যালোকে কেবল শূন্যবক্ষ প্রসারণ করিয়াছিল। গৃহদ্বার উন্মুক্ত, ভাণ্ডার অরক্ষিত কিন্তু চৌর্য্যভয় নাই। সকল প্রকার দুষ্ক্রিয়া অন্তর্হিত, কেবল মাত্র সর্ব্বব্যাপী মহামারীর আর্ত্তনাদ শ্রুত হইয়াছিল।"

এই মহামারীর সাধারণ লক্ষণ কর্ণমূল, বাহুমূল বা উরুমূলের বিচী সকলের প্রদাহ ও বৃদ্ধি। এই কারণ ইহার ইংরাজী নাম বিউবো প্লেগ (Bubo plague)। কিন্তু অনেক সময়ে এই লক্ষণ পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বে ফুসফুসের প্রদাহ উৎপন্ন এবং শোণিত ও স্নায়ুমণ্ডল ব্যাধিবিষে বিকৃত হইয়া, রোগীর দেহ কালিমাবর্ণ ধারণ করে ও অল্পক্ষণেই সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ঈদৃশ-লক্ষণাক্রান্ত ব্যাধি অত্যন্ত মারাত্মক এবং ইউরোপখণ্ডে ইহারই প্রাবল্যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, উল্লিখিত ভীষণ মৃত্যুকাণ্ড উপস্থিত হইয়া মহামারীকে "কালামড়ক" (Black Death) নামে আখ্যাত করিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কেবল লণ্ডন নগরে, ১৬০৩, ১৬০৯, ১৬২৫, ১৬৩৬ ও ১৬৬৫ এই পাঁচবৎসরে, ষোল লক্ষ অধিবাসী মহামারীর আক্রমণে কবরশায়িত হয়। ১৬০৩ সালে মিসর দেশে ইহা দশলক্ষ লোকের অকালমৃত্যু সাধন করে। ১৬৫৬ সালে ইতালিরাজ্যে নেপল্‌সের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে তিন লক্ষ, জেনোয়া নগরে ষষ্টি সহস্র ও রোমে চতুর্দ্দশ সহস্র কালকবলিত হয়। ১৬৭৯ সালে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ৭৬০০০, ১৬৮১ সালে প্রেগ নগরে ৮৩০০০, ১৭০৪ সালে সুইডেনের প্রধান নগর ষ্টকহলমে ৪০০০০, ১৭২০ সালে ফ্রান্সের প্রধান বন্দর মারসেলিসে ৫০০০০, ১৭৭০ সালে হাঙ্গেরী, পোলণ্ড প্রভৃতি প্রদেশে তিনলক্ষ এবং ১৭৭১ সালে রুসরাজধানী মস্কোনগরের চতুর্থাংশ অধিবাসী শমনের আশ্রয়গ্রহণ করে। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র কেহই অব্যাহতি পায় নাই। সমৃদ্ধজনপদ শ্মশানে পরিণত; হরিতশস্যশালিনী দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত্র, হরিদ্রাবর্ণ শুষ্ক তৃণে আচ্ছাদিত; মহামারীর ঘোর তিমিরাবরণে ইউরোপের জাতীয় জীবন কালনিদ্রাগত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এদেশের কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে এই ব্যাধি সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ নাই। পাশ্চাত্য জাতিদিগের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে ইহার বর্ত্তমানতার প্রমাণাভাব। কেহ কেহ অনুমান করেন, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান সম্রাট্ দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের বুদ্ধি-বিকার ও অবিমৃশ্যকারিতার ফলে রাজ্যমধ্যে বিগ্রহ ও বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলে এই মহামারী ব্যাধিই দুর্ভিক্ষের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ভারত ব্যাপিয়া মারীভয় উপস্থিত করে। এই দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ের কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ থাকিলেও ব্যাধি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট নিদর্শন না থাকাতে মহামারী ব্যাধি যে ইহার কারণ, সে বিষয়ে নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই। এইরূপ ঐ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন তৈমুরলঙ্গ অসংখ্য তাতারসৈন্য লইয়া দিল্লী আক্রমণ করেন, মহামারীও তৎসমভিব্যাহারে ভারতে পদার্পণ করিয়া মৃত্যুস্রোত শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমরা এই সংক্রামক ব্যাধির প্রথম প্রামাণিক উল্লেখ দেখিতে পাই। ১৬৮৪ সালে তাৎকালিক বাণিজ্যপ্রধান সুরাট নগর, মহামারী রোগে আক্রান্ত হইয়া, ছয় বৎসর ধরিয়া প্রপীড়িত হইতে থাকে। এক এক দিনের মৃত্যুসংখ্যা তিন শতেরও অধিক হইয়াছিল। ইহার পাঁচ বৎসর পরে বোম্বাই সহরে মারীভয় প্রবেশ লাভ করে। সেই বৎসর আটশত ইংরাজ অধিবাসীর মধ্যে কেবল পঞ্চাশ জন রক্ষা পাইয়াছিল। ১৮১২ সালে গুজরাত ও কাটিহার প্রদেশে মহামারী প্রাদুর্ভূত হইয়া দশবৎসর কাল এরূপ অকালমৃত্যু বৃদ্ধি করে যে, প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিবাসী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। এই সময়ে গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে মহামারীর আবির্ভাব হয় এবং কেদার তীর্থ আক্রান্ত হওয়াতে তীর্থরক্ষক ব্রাহ্মণ ও বহু তীর্থযাত্রী রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার পর ১৮৩৬ সালে মাররারের বাণিজ্যস্থান পালি সহরে, ইহা আবির্ভূত হইয়া এরূপ বিস্তৃতি লাভ করে যে,রাজপুতানার নানাস্থানে প্রায় লক্ষাধিক লোকের অকালমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। অতঃপর যদিও গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পার্ব্বতীয় প্রদেশে সময়ে সময়ে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইত, কিন্তু তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নিবৎ কখন বিস্তৃতি লাভ করে নাই।

বহুকাল ভারতে ইহার তেজ মন্দীভূত থাকিলেও১৮৯৬সালে মহামারী নূতন বিক্রমে বোম্বাই সহর আক্রমণ করিয়াছে। ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে ইহা এরূপ প্রবলাকার ধারণ করে যে, প্রতি সপ্তাহে সহস্রাধিক লোক ইহার

গ্রাসে জীবন বিসর্জ্জন দিযাছিল। প্রথম বৎসব কেবল বোম্বাই প্রদেশে ইনি পঞ্চাশ সহস্র লোকের অকালমৃত্যু সাধন কবেন। ক্রমে সমস্ত বোম্বাই প্রদেশ, গুজরাত,কচ্ছ,সিন্ধু ও পঞ্জাবের কতকাংশ,মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিমেব স্থানবিশেষে মহামারীর দাবানল প্রজ্বলিত হইযাছে। কিন্তু এতাবৎকাল বঙ্গদেশে এই নরকুলান্তক ব্যাধির বিষদৃষ্টি পতিত হয নাই। ১৮৯৮সালে রাজধানী কলিকাতা মহামারীর বিভিষিকামযীমূর্ত্তি প্রথম দর্শন করে। পর্ব্বতগাত্রে ক্ষীণকায স্রোতস্বিনী যেরূপ বর্দ্ধিতপ্রবাহে দেশদেশান্তব প্লাবিত করে, সেরূপ অলক্ষিত ভাবে মহামারী বঙ্গে প্রবেশ কবিযা ধীবে ধীবে দিন দিন কালহস্ত বিস্তার পূর্ব্বক বজ্রমুষ্টিতে বঙ্গভূমি নিষ্পীড়িত করিতেছে। ইহার আবির্ভাবের প্রথম যুগে কত সন্দেহ, কত অনিশ্চয়তা; পূর্ব্বপরিচিত সামান্য ব্যাধিভ্রমে কত আশ্বাসবাক্যে দুর্ব্বার মহাবোগ উপেক্ষিত হইল কিন্তু কাল প্রতীক্ষা করিযা নির্ম্মম নিযতিবৎ মহামাবী বঙ্গে মৃত্যুস্রোত ক্রমশই বৃদ্ধি করিতেছে। ১৮৯৮ সালে বঙ্গদেশে ১৫৫ জনেব মহামারী বোগে মৃত্যু হইযাছে বলিয়া স্বাস্থ্যবিবরণীতে প্রকাশ। ১৮৯৯ সালে কিঞ্চিদধিক তিনসহস্র, ১৯০০ সালে ৩৮৪১২, ১৯০১ সালে ৭৮৬২৯জন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। বাঙ্গালার ৪৬টি জেলার মধ্যে বিহার প্রদেশেব ৮টি জেলা মাত্র এখন মহামাবী আক্রান্ত। এই মহামারীর জ্বলন্ত শিখা নির্ব্বাপিত না হইলে দেশে বিস্তৃত হইযা কিরূপ অকালমৃত্যুর চিতানল প্রজ্বলিত করিবে, ভাবিলেও হৃদয অবসন্ন হয।

আমরা দেখিলাম, ম্যালেরিযা, ওলাউঠা, বসন্ত ও মহামারী, বঙ্গে কিরূপ অকালমৃত্যু উপস্থিত কবিযাছে। ইহা ব্যতীত অতীসার, টাইফযেড জ্বর, যক্ষ্মা প্রভৃতি অপব কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধির উৎপীড়নে, প্রতিদিন কত বঙ্গগৃহের ভবিষ্যৎ আশা চিবদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইতেছে, তাহা কে সংখ্যা করে? বঙ্গের স্বাস্থ্যবিবরণীতে প্রকাশ প্রতিবৎসর ন্যূনাধিক পঞ্চাশ সহস্র মৃত্যুব কারণ অতীসার রোগ। যদিও এদেশে এখন রোগবিশেষে মৃত্যু-সংখ্যা নির্দ্ধারণ অত্যন্ত কঠিন কিন্তু অতীসার সম্বন্ধে উপরোক্ত সংখ্যা অতি-রিক্ত বলিয়া বোধ হয় না। রাজকীয় সেনা ও জেলবিভাগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষেরা বিশেষ মনোযোগী এবং বিচক্ষণ চিকিৎসকের হস্তে রোগনির্ণয়ের ভার থাকাতে এই দুই বিভাগের মৃত্যুবিবরণী প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৮৯১ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত নয়বৎসরে সহস্র জীবিতের মধ্যে অতীসাব বোগে ইউরোপীয সেনার বাৎসরিক গড় মৃত্যুসংখ্যা ০.৮৭

দেশীয় সেনার ০.৫৯ ও কারাবাসীদিগের মধ্যে ৮.৯৯। কিন্তু বঙ্গে প্রজা-সাধারণের ঐরোগে, ১৮৯৫ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত পাঁচবৎসরের গড় মৃত্যু-হার ০.৬৫ বলিয়া উল্লিখিত আছে। সৈনিকবিভাগের স্বাস্থ্য যেরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষিত এবং ইহাদের মধ্যে সংক্রামকরোগ সকল যেরূপ সুচিকিৎসিত ও সহজে নিবারিত হয়, তাহাতে এইরোগে ইহাদের মৃত্যু-সংখ্যা সাধারণ প্রজার অপেক্ষা অনেক অল্প হইবারই সম্ভাবনা। সুতরাং এ দেশে অতীসার রোগে বাৎসরিক মৃত্যু, পঞ্চাশ সহস্র না হইয়া লক্ষাধিক হইলেও অতিরিক্ত বিবেচনা করিবার কারণ নাই।

অনেক বহুদর্শী চিকিৎসকের মতে, টাইফয়েড জ্বর বঙ্গের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ জনপূর্ণ নগরে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে এবং স্বাস্থ্যবিবরণীতে জ্বর বলিয়া যে সকল মৃত্যু উল্লিখিত হয়, এই সংক্রামক রোগ তাহার কতকাংশ পূর্ণ করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন কোন সান্নিপাতিক জ্বররোগের লক্ষণের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে সুতরাং ইনি এতদ্দেশে নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া বোধ হয় না।

টাইফয়েডের ন্যায় যক্ষ্মারোগও বঙ্গের নগরাদিতে দিন দিন প্রবল হইতেছে। চরক ও সুশ্রুতে এই রোগের উৎপত্তি, লক্ষণ ও সংক্রামকতা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম কালেও এই অসাধ্য রোগের প্রবলতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। দেবশরীরও ইহার প্রভাবে জীর্ণ হইয়াছে বলিয়া পৌরাণিক আখ্যায়িকায় উক্ত আছে। শান্তনুনন্দন কুরুরাজ বিচিত্রবীর্য্য যক্ষ্মারোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন, মহাভারতে ইহা প্রসিদ্ধ। রোগনির্দ্ধারণের অভাব প্রযুক্ত বাঙ্গালার প্রজা সাধারণের ভিতর এই ব্যাধির উপদ্রবের বিবরণ জানা সুকঠিন। এদেশের কারাবাসীদিগের মধ্যে মোট মৃত্যুর দশমাংশের অধিক যক্ষ্মারোগে সংঘটিত হইয়া থাকে। এবং কলিকাতা ও অপরাপর নগরের স্বাস্থ্যবিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মোট মৃত্যুর শতকরা দশ হইতে পনর এই রোগজনিত। বসন্ত, ওলাউঠা, মহামারী প্রভৃতি সময়ে সময়ে প্রচণ্ড ঝটিকাবৎ অকালমৃত্যু বৃদ্ধি করতঃ, ভয়াকুল লোকদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে কিন্তু যক্ষ্মা, কালাকাল অগ্রাহ্য করিয়া নীরবে মানব-চক্ষুর অন্তরালে ধ্বংসকার্য্য সম্পন্ন করেন।

বঙ্গে অকালমৃত্যুর প্রলয়প্রবাহ কিরূপ দেশব্যাপ্ত, ইহার ফল

বঙ্গভূমির ভবিষ্যৎ আশা কিরূপ অতলনিমজ্জিত, পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহা বিবৃত হইয়াছে। প্রতিবৎসর গড় বিংশতি লক্ষ লোক বঙ্গে জীবলীলা সংবরণ করে; ন্যূনপক্ষে ইহার অর্দ্ধাংশ, পূর্ব্বোক্ত সংক্রামক রোগ সকলের আক্রমণে অকালমৃত্যু আশ্রয় করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিদ্‌গণের মতে উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে সংক্রামক ব্যাধি কর্তৃক এই নরকুলক্ষয় নিবারিত হইতে পারে; ইংলণ্ড ও ইউরোপের স্বাস্থ্য ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই ভীষণ অকালমৃত্যু নিবারণের শক্তি কি বর্ত্তমান বঙ্গে আছে? এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার উপর এ দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

তিব্বতে তিনবৎসর।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর] [স্বামী অখণ্ডানন্দ।

অস্তাচলচূড়াবলম্বী রবিকিরণে চিরনীহারাবৃত হিমালয় যে, হেমোজ্জ্বলরূপ ধারণ করে, তাহা আমি এই পথেই প্রথম দর্শন করিলাম। চির-শুভ্র-তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের সেই তপ্তকাঞ্চননিভ গৌরাঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি সবিস্ময়ে একান্ত বিমোহিতচিত্তে কেবল ভাবিতে লাগিলাম যে, এই "চাম্পেয় গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি" কাহার? সূর্য্যাস্তকালে হিমগিরি প্রকৃতই হেমগিরিরূপে প্রতীয়মান হইল। সেই অপরূপ দৃশ্যের তুলনা নাই! সেই অপার সৌন্দর্য্যরাশির বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে! গিরিরাজ হিমালয়ের একাঙ্গ রজতময়, কর্পূরের ন্যায় অতি শুভ্র এবং অপরাঙ্গ সুবর্ণের ন্যায় অতি উজ্জ্বল! একাধারে দুই বিভিন্নমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবিলাম যে, এ কি হরগৌরীর মিলন। "চাম্পেয়গৌরার্দ্ধশরীরকায়ৈ, কর্পূরগৌরার্দ্ধশরীরকায়" একাধারে হরগৌরীর এই অপূর্ব্ব সম্মিলন এক হিমালয়েই প্রত্যক্ষ করিলাম। সেই বিরাট্ দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবিলাম যে, উমাগতপ্রাণ হিমালয় বুঝি বা অর্দ্ধনারীশ্বর হরগৌরীর দিব্যমূর্ত্তি অহরহঃ ধ্যান করিতে করিতে তন্ময় ও তদাকারপ্রাপ্ত হইয়া জামাতৃসহ স্বীয় অলোকসামান্যা দুহিতার বিরহ-দুঃখ চিরদিনের মত বিস্মৃত হইয়াছেন!

জগন্মাতা গৌরীর নয়নাভিরাম রূপরাশি ও মনোমোহন দর্শন এবং

পার্ব্বতীহৃদয়বল্লভ, ভূতভাবন ভোলানাথের প্রলয়কালীন ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি, একত্র এক হিমালয়েই প্রত্যক্ষ করিলাম। নর-নারায়ণ-সেবিত, মহর্ষিগণ-বন্দিত, পুণ্যসলিলা গঙ্গা, যমুনা ও মন্দাকিনীবিধৌত, বিশ্ব-বিমোহন বদরিকাশ্রম, জীবন্মুক্ত ঋষি, মুনি ও সিদ্ধচারণগণনিষেবিত সুরম্য গিরিগহ্বর; দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের প্রিয় নিকেতন, বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধবিশিষ্ট বিবিধফলপুষ্পভারাবনত বৃক্ষৌষধি ও জীবনদায়িনী বিবিধ সোমবল্লী প্রভৃতিতে পূর্ণ বনস্পতি; নানাজাতীয় সুন্দরপক্ষবিশিষ্ট অসংখ্য বিহগকুলকণ্ঠবিনিঃসৃত মধুর কলরবে নিনাদিত, কস্তুরী প্রভৃতি পরম রমণীয় মৃগকুলে সুশোভিত, বিস্তীর্ণ তপোবন, অসংখ্য নদ, নদী, হ্রদ, সরোবর, প্রস্রবণ; স্বভাবচ্যুতবনকুসুমামোদিতা বিমলা নির্ঝরিণী, নন্দনকাননসদৃশ বিবিধলতা-বিতানে সমাচ্ছাদিত উপত্যকা, এই সকল দর্শন করিয়া বোধ হয় যেন যাবতীয় সুখ, ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের আকর হিমালয় অতুল রূপ ও ঐশ্বর্য্য-শালিনী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় অনন্ত জীবনিবহের আশ্রয়দাত্রী সর্ব্বমঙ্গলা গৌরীরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে চিরশান্তি বিতরণ করিতেছেন! আবার অতি ভীষণ, প্রাণীমাত্রেরই অগম্য, মহাশ্মশানসদৃশ, অত্যুচ্চ চির-তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ; অসংখ্যহিংস্রজন্তুসমাকুল সদ্যোজীবনান্তকবিবিষ-বল্লীপূর্ণ নিবিড় অরণ্যানী, পাষাণভেদী, প্রচণ্ডবেগশালী, ভীষণগর্জ্জন-কারী, মহাত্রাসজনক, অসংখ্য জলপ্রপাত, ঘোর আবর্ত্তময়ী বিপুল জলরাশি, অগণ্য দুর্গম গিরিসঙ্কট, এবং বিভীষিকাময় নরকঙ্কালপূর্ণ বিজন গিরিকন্দরসমূহ দেখিলে মনে হয় যেন সাক্ষাৎ রুদ্র প্রলয়-কালীন তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া অসংখ্য স্বয়স্ফুলিঙ্গরূপে জীবজগতের ত্রাসোৎপাদন করিতেছেন।

হিমালয় দর্শন করিয়া চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রকেই বলিতে হইবে যে, মূর্ত্তিমান্ হরগৌরী এই বিরাট্ দেহ ধারণ করিয়া দর্শকের হৃদয় যুগপৎ বিস্ময়, ভয় ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ করিতেছেন। এরূপ বিচিত্র ভাবের একত্র সমাবেশ হিমালয় ভিন্ন আর কোথাও দেখি নাই। হিমালয় যেমন মনোরম, তেমনি ভীষণ। এমন পরস্পর বিরোধী ভাবসমষ্টির একত্র সমাবেশ হরগৌরীর হিমালয়রূপ বিরাট্ দেহেই দৃষ্ট হয়! "সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ, সদা শিবানাং পরিভূষণায়, শিবান্বিতায়ৈ চ শিবা-

স্থিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।" শুভাশুভভাবসমন্বিত হরপার্ব্বতীর এই অভেদাত্মক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম।

যাহা হউক, আর বর্ণনার প্রয়োজন নাই। আশা করি, পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা কখনও হিমালয় দেখেন নাই, তাঁহারা জীবনে অন্ততঃ একবারও উহা দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট হইতে গতবার যে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম, আসুন কল্পনাসহায়ে আমার সহিত যমুনোত্রির সেই পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রামে।

উক্ত গ্রাম হইতে যমুনোত্রির পথ অধিকতর দুর্গম। পথিমধ্যে ভৈরবঘাটী নামক একটী স্থান আছে। তথা হইতে কিয়দ্দূর গিয়াই আমরা ভূর্জ্জপত্র বৃক্ষের শাখাবলম্বনে অতিকষ্টে যমুনোত্রিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। স্থানটী অপ্রশস্ত, অত্যুচ্চ বিশালতুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গে পরিবেষ্টিত। যমুনা সেই গিরিশৃঙ্গ হইতে মহান্ ঝর ঝর রবে নিপতিত হইয়া প্রবাহরূপে উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে যেন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা পূর্ণ করিবার মানসে অতি ব্যগ্রতার সহিত সোৎসাহে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিতা হইয়াছেন। যমুনোত্রিতে একটী বৃহদায়তনের মন্দিরে শ্রীযমুনার রৌপ্য ও পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। যমুনোত্রির উষ্ণ প্রস্রবণ ও উষ্ণ গহ্বর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিমালয়ের অনেক স্থানেই আমি অবগাহনোপযোগী গন্ধকমিশ্রিত তপ্তকুণ্ড দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ উষ্ণ প্রস্রবণ আর দেখি নাই। শুনিয়াছি যে, কাঙ্গড়ার উপরে মণিকরণে এইরূপ একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

যমুনোত্রির তপ্ত কুণ্ডে আমরা ডাল, ভাত, রুটী সিদ্ধ করিয়া খাইলাম। পাহাড়ী পাণ্ডারা সেই দিনই আমাদিগকে তথায় রাখিয়া চলিয়া গেল। আমরা তিন জনে এক রাত্রি তথায় সেই উষ্ণ গহ্বরটীতে বাস করিলাম। গহ্বরটীর মধ্যে বেশ গরম বোধ হইতে লাগিল। তাহার পরদিন প্রাতে আমরা যমুনোত্রি হইতে সেই পাণ্ডাদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উত্তরাখণ্ডভ্রমণকালে এইরূপে আমি প্রায় ৬৭ দিবস যাবৎ উক্ত দুইজন সাধুর সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলাম। তাহার পর যমুনোত্রি হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহারা উপরিকোটের পথে ৺গঙ্গোত্রি যাত্রা করিলেন আর আমি পুনরায় জামদগ্ন্যজীর মকাম হইয়া ৺গঙ্গোত্রির পথে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী উত্তরকাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জাম-

দগ্নজীর মকাম হইতে উত্তরকাশী দুই দিনে পঁহুছিয়াছিলাম। পথে ভয়ঙ্কর ভল্লুকের উপদ্রব;—এমন কি, পাহাড়ীরাও একাকী সেই পথে ভ্রমণ করিতে সাহসী হয় না। পথিমধ্যে একখানি মাত্র গ্রাম দেখিতে পাইলাম। সেই গ্রামের লোক চোর ডাকাতের ভয় কাহাকে বলে, তাহা আদৌ জানে না। সুতরাং তালা চাবীর ব্যবহারও সেখানে নাই। দুই দিবস যাবৎ আমাকে নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক্, সৌভাগ্যক্রমে আমি পথে কোন হিংস্রক জন্তুর সম্মুখে পতিত হই নাই।

বালককালে কথামালায় দুই পথিক ও ভালুকের গল্পে যাহা পড়িয়াছিলাম, তাহা যে, একান্ত অমূলক নহে, তাহা আমি পাহাড়ীদের কথায় বুঝিতে পারিলাম। নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ভল্লুকের সম্মুখে পড়িলে পাহাড়ীরা বলে, চোকে কাপড় বাঁধিয়া উপুড় হইয়া মড়ার মত নিস্পন্দভাবে কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলে আর কোন ভয় নাই। ভল্লুকের স্বভাব,—প্রথম আক্রমণেই থাবা মারিয়া মুখ চোক্ ছিঁড়িয়া ফেলে। সেই জন্য সাবধান হইয়া মুখখানি বাঁচাইতে পারিলে আর তাহার দ্বারা বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যাহা হউক্, ভল্লুকের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার উপায় আমি এইরূপে জানিয়া রাখিলাম। জামদগ্নজীর মকাম হইতে এক জন পাহাড়ী পথপ্রদর্শক হইয়া আমার সহিত একদিনের পথ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল।

উত্তরকাশীকে পাহাড়ীরা বরহাট্ বলে। এইখানে ভাগীরথী উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন এবং ৺কাশীধামের ৺বিশ্বনাথ ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত আছে। অতুলসমৃদ্ধিশালী বারাণসী ক্ষেত্রই যেন এই বিজন পার্ব্বত্যপ্রদেশে আসিয়া তপস্যায় মগ্ন হইয়া আছেন। উত্তরকাশী হইতে কিছু দূর গিয়া আমার সহিত একটী খাম্বাজাতীয় তিব্বতীয় ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া চা পান করিতে দেখিলাম। তাহাকে তিব্বতে যাইবার সুগম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সে আমাকে যোষী মঠ হইতে নীতি ঘাটা বা পাস দিয়া তিব্বতে গেলে কৈলাস ও মানস সরোবর খুব নিকট হইবে বলিল। গঙ্গোত্রি হইতেও তিব্বতে যাইবার একটা পথ আছে, তাহাকে "নিলিং ঘাট বা পাস" বলে। সে আমাকে এই পথে তিব্বতে

যাইতে নিষেধ করিয়া ৺বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া নীতির পথে যাইতে পরামর্শ দিল। উত্তরকাশী হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম দিনেই আমি প্রায় ১৮।১৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ভটারী নামক একটি গ্রামে পঁহুছিলাম। পথিমধ্যে কয়েকটী মহারাষ্ট্রীয় যাত্রীদের নিকট আমি ভিক্ষা করিয়াছিলাম। কেবল মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়াছিলাম, তাহার পর সমস্ত দিনই চলিয়াছি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভটারী গ্রামের প্রায় এক মাইল নীচে পঁহুছিয়া দেখিলাম যে, একজন সন্ন্যাসী গৈরিক বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পথিমধ্যে পড়িয়া আছেন। সেই সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও হইতেছিল। নিকটে গ্রাম থাকিতে সেই বিজন আরণ্যপথে পড়িয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সন্ন্যাসীর মুখে শুনিলাম যে, তিনি পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া তাঁহার বোঁচ্‌কা বুঁচ্‌কী লইয়া চলিতে অক্ষম হইয়াছেন সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া তথায় সেই অবস্থায় পড়িয়া আছেন। আমি তাঁহাকে সেই ভীষণ লোকালয়শূন্য স্থানে দেখিয়া আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কিন্তু কি উপায়ে তাঁহাকে তথা হইতে ভটারী গ্রামে লইয়া যাই? তাঁহার বোঁচ্‌কাটী প্রায় একটী মানুষের বোঝা। আর কেহ যদি বোঁচ্‌কাটী লয়, তবে আমি তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারি। দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া এই সকল চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে ঈশ্বরেচ্ছায় সেইখানে একজন ব্রহ্মচারী যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ভটারী অভিমুখে অতি দ্রুতপদে যাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে সেই সন্ন্যাসীর দুরবস্থার কথা বলিলে তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার বোঁচ্‌কাটী লইয়া অগ্রেই ভটারী অভিমুখে চলিয়া গেলেন। তাহার পর আমি ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীকে তুলিয়া খাড়া করিলাম।

যখন তিনি খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন, দেখি যে, সেই দীর্ঘকায় পুরুষ উচ্চে আমার দ্বিগুণ! আমার লম্বা লাঠী গাছটী তাঁহাকে দিয়া আমি তাঁহার কোমর ধরিয়া অতি অল্প দূর যাইতে না যাইতেই তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। আর একটু হইলে আমরা দুইজনেই সেই উচ্চ পার্ব্বত্য পথ হইতে গভীর পর্ব্বতগর্ভে নিপতিত হইয়া সদ্যই ৺গঙ্গালাভ করিতাম। সেই স্থানটী গঙ্গাগর্ভ হইতে খাড়াই উচ্চে আন্দাজ ৪৫০০ হাত হইবে। সন্ন্যাসী মহাশয় তো কাঁপিতে কাঁপিতে একেবারে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যে, আর এক পাও চলিতে তিনি অক্ষম। তাঁহাকে পীঠে করিয়া

লইযা না গেলে আর তাঁহাব গ্রামে যাওয়া হয না। সুতবাং আমি তৎক্ষণাৎ ভটাবীতে গিযা সেই গ্রামের অধিবাসীমাত্রকেই সেই বিপন্ন সাধুকে গ্রামে আনিবাব জন্য অতিশয কাতবভাবে মিনতি কবিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই রাত্রিতে তথায কেহই যাইতে সম্মত হইল না। অনেক ক্ষণ সাধাসাধীর পর বীজু নামক একটী পাহাড়ী তাঁহাকে আনিবাব জন্য সম্মত হইযা আমাব সহিত আসিল। সে সন্ন্যাসীকে বহিযা আনিবাব জন্য আমাব নিকট চাবি আনা পযসা মাত্র চাহিল। আমিও যেরূপে পাবি সন্তুষ্ট কবিব বলিযা তাহাকে লইযা চলিলাম।

বীজুকে খালি পীঠে যাইতে দেখিযা আমি তাহাকে একটী কেণ্ডী (কবাণ্ডী, এক প্রকাব পাহাড়ী ঝুড়ী, ইহাতেই পাহাড়ীবা মানুষ ও বোঝা বহে) লইতে বলিলাম, কিন্তু সে খালি পীঠেই তাঁহাকে আনিতে পাবিবে বলিযা আমাব কথাটা বড গ্রাহ্য কবিল না। তাহাব পব আমবা সেইখানে পঁহুছিযা দেখি যে, সেই দীর্ঘকায পুরুষ লম্বা হইযা পথিমধ্যে শুইযা আছেন। বীজু তাঁহাব দুইটী হাত ধবিযা যেমন পীঠেব উপব তুলিযাছে, অমনি তাঁহাব পা দুইটী মাটীতে লুটাইতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে, ঐরূপে কিছু দূব তাঁহাকে লইযা গেলেই আব বেশীক্ষণ বাঁচিযা থাকিতে হইবে না। নিতান্ত অল্পপথ হইলেও না হয চেষ্টা কবা যাইত। তখন বীজুও দেখিল যে, একটী কেণ্ডীব নিতান্ত আবশ্যক, সুতবাং আমবা সাধুকে আবাব পথিমধ্যে বাখিযা পুনরায ভটাবীতে কেণ্ডিব চেষ্টায় আসিলাম। সেখানে গিযা দেখি যে, কযেকজন যাত্রী টিনের কানাস্তাবা ভবিযা গঙ্গোত্রিব জল কেণ্ডীতে কবিযা আনিযাছে। আমবা কিছুক্ষণেব জন্য তাহাদেব নিকট একটী কেণ্ডী চাহিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাহারা আমাদিগকে বিশ্বাস কবিযা তাহা দিতে পাবিল না। তীর্থস্থানে প্রাযই বাত্রিতে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস কবিতে চাহে না। সুতবাং অবশেষে আমাব গাযেব লুইখানি বন্ধক বাখায তাহাবা আমাদিগকে একটী কেণ্ডি দিল। এইরূপে অনেক খানি বাত্রি হইযা গেল। এই বাব আমবা সাধুকে সেই পথ হইতে গ্রামে লইযা আসিলাম। জ্যোৎস্নাব বাত্রি ছিল বলিযা পার্ব্বত্য পথে কযেকবাব যাতাযাত কবিতে আমাদেব তেমন অসুবিধা হয নাই।

ক্রমশঃ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ১৯শে ভাদ্র রেঙ্গুনে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইয়াছিল। তদুপলক্ষে শতাধিক সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান একত্র মিলিত হইয়া সমস্ত দিবস ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ পাঠ, আলোচনা, ভগবন্নামগুণকীর্ত্তনাদি করেন। প্রায় ২০০ কাঙ্গালীকে পয়সা, চাল ও প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ জানিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল।

বিগত জন্মাষ্টমীর দিবস অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এবারেও কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিগত ১লা আশ্বিন শনিবার কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া স্বামী সচ্চিদানন্দ সমিতির সভ্যগণের সহিত প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন করেন।

• মাণিকতলাবাজার হরিসভার সপ্তম সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে বিগত ৩০শে ভাদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া উৎসব চলিতেছে। ১৭ই আশ্বিন উৎসব শেষ হইবে। এই সভায় বিগত ১লা আশ্বিন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী "ব্যবসা ও অক্ষয় ধনলাভ", ২রা আশ্বিন স্বামী শুদ্ধানন্দ "নির্ভর" ও ৪ঠা আশ্বিন শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় "সুগম সাধন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৫ই আশ্বিন হইতে ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ কথক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কথকতা করেন। ১৬ই আশ্বিন কাঙ্গালীভোজন ও ১৭ই আশ্বিন নগরসংকীর্ত্তনান্তে উৎসব সমাপ্ত হইবে।

বিগত ২রা আশ্বিন সাহিত্যসভার পঞ্চম বাৎসরিক পঞ্চম মাসিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব এম, এ মহাশয় "কর্ম্মফল" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বিগত ৩১শে ভাদ্র কলিকাতা টাউনহলে "শিবাজী উৎসব" অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালী বীরপূজা করিতে ধীরে ধীরে শিখিতেছে দেখিয়া আশা হয়। আশা করি,এ সকল উৎসব সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসমাত্রে পর্য্যবসিত না হইয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উহাদের প্রভাব বিস্তার করিবে।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহ সাবিত্রী, পাণ্ডুবাস, The Angel of Misfortune ও The Web of Indian Life নামক পুস্তকচতুষ্টয়ের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। সময়ান্তরে ইহাদের সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯॥

অন্বয়। হে অর্জ্জুন যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদ্ অহং (এব অস্মি) ময়া বিনা ভূতং যৎ স্যাৎ তৎ চরাচরং ন অস্তি। ৩৯।

মূলানুবাদ। হে অর্জ্জুন সকল ভূতের যাহা কিছু বীজ, তাহা আমিই হই। যাহাতে আমি নাই, এমন বস্তু স্থাবর বা জঙ্গম কিছুই হইতে পারেনা। ৩৯।

ভাষ্য। যচ্চাপীতি সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহমর্জ্জুন প্রকরণোপসংহারার্থং বিভূতিসংক্ষেপমাহ ন তদস্তি ভূতং চরাচরং চরমচরং বা ময়া বিনা যৎ স্যাদ্ভবেৎ ময়া অপকৃষ্টং পরিত্যক্তং নিরাত্মকং শূন্যং হি তৎ স্যাৎ অতো মদাত্মকং সর্ব্বমিত্যর্থঃ।৩৯।

ভাষ্যানুবাদ। যচ্চাপি ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যাহা কিছু সকল ভূতের "বীজ" অর্থাৎ প্ররোহকারণ, হে অর্জ্জুন, আমিই তাহা হই। প্রকরণের উপসংহার করিবার জন্য বিভূতির সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, চরই হউক বা অচরই হউক, এমন কোন ভূতই থাকিতে পারেনা, যাহা আমার সহিত সংসৃষ্ট নহে, যে বস্তুতে আমি নাই, আমি যাহা পরিত্যাগ করি, তাহাই শূন্য অর্থাৎ নিরাত্মক (সুতরাং তাহা থাকিবে কি প্রকারে?) এই কারণে সকল পদার্থই মদাত্মক অর্থাৎ আমিই সকল বস্তুর আত্মা।৩৯।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥৪০॥

অন্বয়। হে পরন্তপ মম দিব্যানাং বিভূতীনাং অন্তঃ নাস্তি এষ তু বিভূতের্বিস্তরো ময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ।৪০।

মূলানুবাদ। হে শত্রুপীড়াদায়ক। আমার দিব্য বিভূতিগণের অন্ত নাই। এই মদীয় বিভূতির বিস্তার আমি যৎকিঞ্চিৎ বলিলাম।৪০।

ভাষ্য। নান্তোঽস্তীতি। নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং বিস্তরাণাং পরন্তপ। নহীশ্বরস্য সর্ব্বাত্মনো দিব্যানাং বিভূতীনাং ইয়ত্তা শক্যা বক্তুং জ্ঞাতুং বা কেনচিৎ, এষতু উদ্দেশতঃ একদেশেন প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া।৪০।

ভাষ্যানুবাদ। নান্তোঽস্তি ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। হে পরন্তপ। আমার

দিব্য "বিভূতি" বিস্তরের অন্ত নাই। সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরের দিব্য বিভূতি সমূহের ইয়ত্তা কেহ বলিতে বা জানিতে পারে না। আমার বিভূতির বিস্তর এই আমি "উদ্দেশতঃ" অর্থাৎ একদেশতঃ বলিলাম।৪০।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১॥

অন্বয়। যৎ যৎ সত্ত্বং (বস্তু) বিভূতিমৎ শ্রীমৎ উর্জ্জিতং বা তত্তৎ এব ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং অবগচ্ছ।৪১।

মূলানুবাদ। যে যে বস্তু বিভূতিসম্পন্ন, সুন্দর ও উৎসাহপরিপূর্ণ. সেই সেই বস্তুকেই তুমি আমার তেজোময় অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে।৪১।

ভাষ্য। যদ্যদিতি। যদ্ যল্লোকে বিভূতিমদ্ বিভূতিযুক্তং সত্ত্বং বস্তু শ্রীমদ্ ঊর্জ্জিতং এব বা শ্রীর্লক্ষ্মীস্তয়া সহিতং উৎসাহোপেতং বা তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং জানীহি মম ঈশ্বরস্য তেজসঃ অংশ একদেশঃ সম্ভবো যস্য তৎ তেজোঽংশসম্ভবং ইত্যবগচ্ছ ত্বং।৪১।

ভাষ্যানুবাদ। যদ্যদ্ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। লোকে যাহা যাহা "সত্ত্ব" বস্তু "বিভূতিমৎ" বিভূতিযুক্ত "শ্রীমৎ" শ্রীশব্দের অর্থ লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মীর সহিত যুক্ত, বা "ঊর্জ্জিত"উৎসাহসমন্বিত, তাহাকে তাহাকেই তুমি আমার"তেজোঽংশ-সম্ভব" বলিয়া জান, তেজোঽংশ শব্দের অর্থ আমার অর্থাৎ ঈশ্বরের তেজের একদেশ, তাহাই যাহার উৎপত্তিহেতু, তাহাকেই তেজোঽংশসম্ভব বলা যায়।৪১।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণা-
র্জ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। অথবা হে অর্জ্জুন, তব এতেন বহুনা জ্ঞাতেন কিং? অহং একাংশেন ইদং কৃৎস্নং জগৎ বিষ্টভ্য স্থিতঃ ।৪২।

মূলানুবাদ। অথবা হে অর্জ্জুন, তোমার এই সকল বিশেষ করিয়া জানিয়া কি লাভ? আমি নিজের একাংশ মাত্রের দ্বারা এই সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছি ।৪২।

ইতি ব্যাসদেব প্রণীত লক্ষশ্লোকাত্মকশ্রীমহাভারত শাস্ত্রের ভীষ্মপর্ব্বে
যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাখ্য উপনিষৎসমূহ আছে,
যাহা ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র স্বরূপ,
যাহা শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদাত্মক,
তদন্তর্গত বিভূতিযোগনামক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভাষ্য। অথবেতি। অথবা বহুনা এতেন এবমাদিনা কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন স্যাদশেষেণ। অশেষতস্ত্বিমমর্থমুচ্যমানং শৃণু বিষ্টভ্য বিশেষেণ স্তম্ভনং কৃত্বা ইদং কৃৎস্নং জগদেকাংশেন একাবয়বেন একপাদেন সর্ব্বভূতস্বরূপেণ ইত্যেতৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি" ইতি স্থিতোঽহমিতি ।৪২।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ
শিষ্যশ্রীমদাচার্য্যশ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্রীভগবদ্গীতা-
ভাষ্যে বিভূতিযোগোনাম দশমোঽধ্যায়ঃ ।১০।

ভাষ্যানুবাদ। অথবা ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। অথবা বহু এই প্রকার অনেক বিশেষভাবে জ্ঞাত হইলে হে অর্জ্জুন। তোমার কি ফল হইবে? অশেষভাবে (সামান্যরূপে) যাহা বলিতেছি, তাহা শুন। "একাংশ" একটীমাত্র অবয়ব অর্থাৎ নিজের একটী পাদ, যাহা সর্ব্বভূতস্বরূপ, তাহা দ্বারা এই সমগ্র জগৎকে বিশেষরূপে স্তব্ধ করিয়া (সর্ব্বাংশে ব্যাপিয়া) আমি অবস্থিত রহিয়াছি। বেদের মন্ত্রাক্ষরেও আছে যে, "এই পরমেশ্বরের একটি মাত্র পাদ স্বরূপ এই ভূতনিচয়" ইত্যাদি ।৪২।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ ভগবান্
গোবিন্দাচার্য্যের শিষ্য শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশঙ্কর ভগবানের
কৃত শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যের বিভূতিযোগ
নামক দশম অধ্যায় ।১০।

অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতোমম॥১॥

অন্বয়। ত্বয়া মদনুগ্রহায় যৎ পরমং গুহ্যং অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং বচঃ উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ।১।

মূলানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে পরম গোপনীয় আত্মবিষয়ক বাক্য বলিয়াছ, তাহা দ্বারা আমার এই মোহ অপগত হইয়াছে।১।

ভাষ্য। ভগবতো বিভূতয় উক্তা তত্র চ বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ ইতি ভগবতাঽভিহিতং শ্রুত্বা যজ্জগদাত্মরূপমাদ্যমৈশ্বরং তৎ সাক্ষাৎকর্ত্তুমিচ্ছন্ (অর্জ্জুন উবাচ) মদনুগ্রহায় মমানুগ্রহার্থং পরমং নিরতিশয়ং গুহ্যং গোপ্যং অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং যৎ ত্বযোক্তং বচঃ বাক্যং তেন তে বচসা মোহোঽয়ং বিগতোমমাবিবেকবুদ্ধিরপগতে- ত্যর্থঃ।১।

ভাষ্যানুবাদ। (পূর্ব্ব অধ্যায়ে) ভগবান্ আত্মবিভূতিসমূহের পরিচয় দিয়াছেন (ঐ পরিচয়দানপ্রসঙ্গে) "আমি এই সমগ্র জগৎকে আমার একাংশ দ্বারা ব্যাপিয়া রহিয়াছি" এই প্রকার ভগবানের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবানের যে আদ্য ঐশ্বর জগদাত্মস্বরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য (অর্জ্জুন বলিতেছেন) যে, আমার অনুগ্রহার্থ যে "পরম" অতিশয়রহিত (অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট) "গুহ্য" গোপ্য এবং "অধ্যাত্মসংজ্ঞিত" আত্মা ও অনাত্মার বিবেকপ্রকাশক বাক্য তুমি বলিয়াছ, তাহার দ্বারা (অর্থাৎ তোমার সেই বাক্যের দ্বারা আমার এই মোহ বিগত হইয়াছে অর্থাৎ আমার অবিবেকবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে।১।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশোময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥২॥

অন্বয়। হে কমলপত্রাক্ষ ত্বত্তঃ ভূতানাং ভবাপ্যযৌ বিস্তরশঃ ময়া শ্রুতৌ অব্যয়ং মাহাত্ম্যং অপি (শ্রুতং) চ ।২।

মূলানুবাদ। হে পদ্মপলাশলোচন! তোমার নিকট হইতে ভূতসমূহের উৎপত্তি ও প্রলয় বিস্তররূপে শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার অবিনাশী মাহাত্ম্যও (শ্রবণ করিয়াছি)।২।

ভাষ্য। কিঞ্চ ভব উৎপত্তিঃ অপ্যযঃ প্রলযঃ ভূতানাং তৌ ভবাপ্যযৌ শ্রুতৌ বিস্তরশোময়া ন সংক্ষেপতস্ত্বত্তঃ ত্বৎসকাশাৎ কমলপত্রাক্ষ কমলস্য পত্রং কমলপত্রং তদ্বদক্ষিণী যস্য স ত্বং কমলপত্রাক্ষঃ হে কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চ অব্যযং শ্রুতমিত্যনুবর্ত্ততে ।২।

ভাষ্যানুবাদ। আরও (বক্তব্য এই যে) "ভব" (শব্দের অর্থ) উৎপত্তি "অপ্যয" (শব্দের অর্থ) প্রলয, ভূতনিবহের সেই ভব ও অপ্যয আমি তোমার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। "বিস্তরশঃ" সংক্ষেপে নহে (কিন্তু অতি বিস্তৃতভাবে) হে "কমলপত্রাক্ষ" "কমল" (অর্থাৎ) পদ্মের পত্র (এই অর্থে) কমলপত্র (এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে) সেই কমলপত্রের ন্যায যাঁহার দুইটী চক্ষু আছে তাঁহার নাম কমলপত্রাক্ষ (সেই কমলপত্রাক্ষ শব্দের সম্বোধনে) কমলপত্রাক্ষ। (এই পদটী নিষ্পন্ন হয) এবং (তোমার) "অব্যয' অক্ষয মাহাত্ম্যও "তোমার নিকট হইতে শুনিয়াছি" এই কয়টী পদের অনুবৃত্তি হইতেছে ।২।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥

অন্বয়। হে পরমেশ্বর, ত্বং যথা আত্মানং আত্থ তৎ এবমেব; হে পুরুষোত্তম, তে ঐশ্বরং রূপং (ইদানীং) দ্রষ্টুং ইচ্ছামি।৩।

মূলানুবাদ। হে পরমেশ্বর, তুমি যে প্রকারে নিজের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছ, তাহা সেই রূপই; হে পুরুষোত্তম, আমি (এক্ষণে) তোমার ঐশ্বর স্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি।৩।

ভাষ্য। এবমিতি। এবমেতন্নান্যথা যথা যেন প্রকারেণ আত্থ কথয়সি ত্বং আত্মানং পরমেশ্বর। তথাপি দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে তব জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সম্পন্নং ঐশ্বরং বৈষ্ণবং রূপং, পুরুষোত্তম।৩।

ভাষ্যানুবাদ। তুমি যে প্রকার আত্মস্বরূপ বর্ণন করিয়াছ, তাহা ঠিক, সেই বিষয়ে অন্যথা হইতে পারেনা। হে পরমেশ্বর! তোমার সেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য বল ও বীর্য্যযুক্ত সেই ঐশ্বর (অর্থাৎ) বৈষ্ণবরূপ আমি হে পুরুষোত্তম, দেখিতে ইচ্ছা করি।৩।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪॥

অন্বয়। হে প্রভো! যদি তৎ (রূপং) ময়া দ্রষ্টুং শক্যং ইতি মন্যসে ততো হে যোগেশ্বর ত্বং অব্যয়মাত্মানং মে দর্শয়।৪।

মূলানুবাদ। হে প্রভো! যদি সেইরূপ দেখিবার শক্তি আমার আছে, এই প্রকার আপনি বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর, আপনি আমাকে আপনার সেই অবিনাশী স্বরূপ দর্শন করিতে দিন।৪।

ভাষ্য। মন্যসে ইতি। মন্যসে যদি চিন্তয়সি ময়া অর্জ্জুনেন তৎ শক্যং দ্রষ্টুমিতি প্রভো স্বামিন্ যোগেশ্বর! যোগিনো যোগাস্তেষামীশ্বরঃ যোগেশ্বরঃ হে যোগেশ্বর যস্মাদহমতীবার্থী দ্রষ্টুং ততস্ত্বমমে মদর্থং দর্শয় ত্বং আত্মানং অব্যয়ম।৪।

ভাষ্যানুবাদ। মন্যসে ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। মন্যসে (এই পদটীর অর্থ) চিন্তা কর (কি?) যদি "আমি" অর্জ্জুন সেইরূপ দেখিতে পারিব, তাহা হইলে হে "প্রভো" স্বামিন্ হে "যোগেশ্বর" (এই স্থানে) যোগ শব্দের অর্থ যোগী, সেই যোগিগণের যিনি ঈশ্বর, তাঁহাকেই যোগেশ্বর বলা যায়, হে যোগেশ্বর! যে কারণ আমি সেইরূপ দেখিবার জন্য অত্যন্ত অর্থী, সেই কারণেই তুমি আমার জন্য সেই তোমার অব্যয় আত্মাকে প্রদর্শন করাও।৪।

শ্রী ভগবান্ উবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

অন্বয়। হে পার্থ নানাবিধানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ শতশঃ সহস্রশঃ মে দিব্যানি রূপাণি অথ পশ্য।৫।

মূলানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ, অনেক বর্ণ ও অনেক আকার-যুক্ত বহু প্রকার আমার শত ও সহস্রসংখ্যক দিব্যরূপনিচয় তুমি অবলোকন কর।৫।

ভাষ্য। এবং চোদিতোঽর্জ্জুনেন (ভগবানুবাচ) পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ অনেকশঃ ইত্যর্থঃ। তানি চ "নানাবিধানি" অনেক-প্রকারাণি দিবি ভবানি দিব্যানি অপ্রাকৃতানি "নানাবর্ণাকৃতীনি চ" নানা বিলক্ষণা নীলপীতাদিপ্রকারা বর্ণাস্তথা আকৃতয়ঃ অবয়বসংস্থানবিশেষা যেষাং রূপাণাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ।৫।

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার অর্জ্জুন প্রার্থনা করিলে (ভগবান্ কহিলেন) হে পার্থ "শতশঃ" ও"সহস্রশঃ" অর্থাৎ অনেক প্রকার আমার রূপনিবহ তুমি দর্শন কর। সেই সকল রূপ (কেমন?) "নানাবিধ" বহুপ্রকার "দিব্য" স্বর্গীয় অর্থাৎ অপ্রাকৃত এবং "নানাবর্ণাকৃতি" বর্ণ শব্দের অর্থ নীলপীতাদি স্বরূপ অনেকরঙ, আকৃতি শব্দের অর্থ অবয়ববিন্যাস, সেই বর্ণ ও আকৃতি নানা প্রকার ভাবে যে সকল রূপে বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে নানাবর্ণাকৃতি কহে ।৫।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥৬॥

অন্বয়। আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ মরুতঃ পশ্য হে ভারত! তথা বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য ।৬।

মূলানুবাদ। (আমার দেহের মধ্যে) দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ এই নামে প্রসিদ্ধ দেবগণ এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বস্তুসমূহও দর্শন কর।৬।

ভাষ্য। পশ্যাদিত্যানিতি। পশ্য আদিত্যান্ দ্বাদশ বসূন্ অষ্টৌ রুদ্রান্ একাদশ অশ্বিনৌ দ্বৌ। মরুতঃ সপ্ত সপ্তগণা যে তান্ তথা বহূনি অপি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি মনুষ্যলোকে ত্বয়া ত্বত্তোঽন্যেন বা কেনচিৎ পশ্য আশ্চর্য্যাণি অদ্ভুতানি ভারত।৬।

ভাষ্যানুবাদ। পশ্যাদিত্যান্ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "পশ্য"দেখ (কি?) আদিত্য অর্থাৎ দ্বাদশ আদিত্য, রুদ্র (ইঁহারা) একাদশ, বসু (ইঁহারা) আট-জন, অশ্বী (ইঁহারা) দুই জন, মরুৎ ইঁহারা এক একদলে সাতজন করিয়া থাকেন, মোট ইঁহাদের সাতটী দল আছে (অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ইহাঁরা ঊনপ-ঞ্চাশৎ জন) সেই মরুদ্গণকেও দেখ। এইপ্রকার তুমি বা তুমি ভিন্ন অন্য কোন

মনুষ্য যাহা কখন দেখে নাই, এইরূপ অনেক "আশ্চর্য্য" অদ্ভুত বস্তুনিচয়ও তুমি দর্শন কর।৬।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥৭॥

অন্বয়। হে গুড়াকেশ ইহ মম দেহে একস্থং সচরাচরং কৃৎস্নং জগৎ পশ্য যচ্চ অন্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি (তদপি পশ্য)।৭।

মূলানুবাদ। হে নিদ্রাজয়কারিন্, এই আমার দেহে সচরাচর সকল বিশ্ব একত্র সমাবেশিত রহিয়াছে দেখ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও দেখ।৭।

ভাষ্য। ন কেবলমেতাবদেব। ইহৈকস্থং একস্মিন্ স্থিতং জগৎ কৃৎস্নং সমস্তং পশ্যাদ্য ইদানীং সচরাচরং সহ চরেণ অচরেণ চ বর্ত্ততে মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ জয়পরাজয়াদি যচ্ছঙ্কসে "যদ্বা জয়েম যদি বা নোজয়েয়ুঃ" ইতি যদবোচঃ তদপি দ্রষ্টুং যদিচ্ছসি।৭।

ভাষ্যানুবাদ। কেবল যে ইহাই তাহা নহে (আরও বলি শুন) এই সচরাচর অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গমের সহিত বর্ত্তমান এই সমুদয় বিশ্ব আমার এই দেহে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তুমি দেখ (কিরূপে আছে ?) তাহাই বলিতেছেন) "একস্থ" এক (আমার দেহকেই) আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে আর কিছু (অর্থাৎ) জয় পরাজয়াদি (যাহা) তুমি শঙ্কা করিতেছ, কারণ পূর্ব্বেই তুমি বলিয়াছ যে আমরা বিজয়ী হইব বা হইতে পারিব কি না ? ইত্যাদি আমার এই দেহে তুমি যদি তাহা দেখিতে ইচ্ছা কর (তাহা হইলে বল তাহাও তুমি দেখিতে পাইবে)।৬।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥৮॥

অন্বয়। অনেন স্বচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং তু (ত্বং) নৈব শক্যসে (অহং) তে দিব্যং চক্ষুঃ দদামি মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য।৮।

মূলানুবাদ। তুমি তোমার এই চক্ষুর দ্বারা আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের বৎসরে একমাস ছুটী লওয়া হয়। ইতিপূর্ব্বে ১লা ভাদ্র প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণে ১৫ই কার্ত্তিকের সংখ্যা প্রকাশ করিব না। তাহা হইলে এক মাস সম্পূর্ণ হইল।

নূতন সংসার।

শ্রীরাগ—একতালা।

কবে নবসাজে আমি সাজিব রে,
নূতন সংসার ভবে স্থাপিব রে।
বৈবক্ষ পিতার ধরি কর সুকোমল
বিমল অভয়ধামে ভ্রমিব রে।
শান্তিরমণী হবে অঙ্কশায়িনী,
তারে যতনে স্থাপিব হৃদিপুরে,
অতি সোহাগে তুষিব সমাদরে,
আমার সে অন্তঃপুরে।
দৌবারী রাখিব দ্বারে শমদম ভাই দুজনারে,
যেন কামাদি তস্কর জোর করে,
আমার প্রাণের প্রতিমা না নেয় হরে রে।
ভূমিতল হবে সুখশয্যা শয়নে,
তায় নীলাকাশ চাঁদোয়া উপরে,
আমি লজ্জা নিবারিব দিগম্বরে,
আদরে ক্ষমা জননী, দয়া অমায়া ভগিনী,
জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম সুধাধারে,
ভোজন করাবে কাঙ্গালেরে,
তার ভবক্ষুধা পলাইবে দূরে রে।

শ্রী কৈলাস চন্দ্র গুপ্ত।

তিব্বতে তিনবৎসর।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]　　　　　　　　　　　　　　　　[স্বামী অখণ্ডানন্দ।

ভটাবীতে পঁহুছিয়া আমি আব এক দুর্ভাবনায় পড়িলাম। ঠিক পথের উপরেই ভটারী গ্রামেব কযেক খানি ঘরট্ট (পাহাড়ীবা ঘরাট্ বলে, এক প্রকাব Water Mill, জলেব তোড়েই যাঁতা ঘোরে ; ইহাতেই সমুদয় পাহাড় অঞ্চলে ময়দা পেষা হয়) এক খানি ধর্ম্মশালা, টিহরীর রাজার একখানি বাঙ্গলা এবং যাত্রীদের জন্য কযেক খানি ঘর আছে। প্রকৃত গ্রামখানি ঠিক তাহার কিছু উপরেই অবস্থিত। ভটাবী চটীতে পঁহুছিয়া পীড়িত ব্যক্তিকে বাহিরে রাখা বিধেয় নহে ভাবিয়া আমি তাঁহার জন্য একটু আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলাম। যাত্রীদেব ঘবগুলি লোকে পরিপূর্ণ দেখিযা, বীজু আমাকে ধর্ম্মশালায় লইযা গেল এবং সেইখানেই সে সাধুকে রাখিতে বলিল। ধর্ম্মশালার দ্বারে পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই একেবারে বহুজনকণ্ঠোত্থিত "দূর দূর" শব্দে আমাদেব কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দিল। ধর্ম্মশালার ভিতরে অন্ধকাব, সুতরাং আমরা প্রথমে উহা কাহার সম্ভাষণ, তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিছুক্ষণ পরেই জানিতে পারিলাম যে, একদল বৈষ্ণব নাগা সাধুতে ধর্ম্মশালা ঘবটী পরিপূর্ণ। ধর্ম্মশালার দ্বারে বসিয়া অতিশয় কাতরভাবে আমরা যতই তাঁহাদিগকে সেই ধর্ম্মশালার মধ্যে একজন মাত্র পীড়িত সাধুর উপযুক্ত একটু স্থান করিয়া দিতে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলাম, ততই তাঁহারা আমাদিগকে বহুবিধ কটুকাটব্য কথায় গালি দিতে লাগিলেন। এ দিকে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া বীজু বোঝা ফেলিয়া যাইতে ব্যগ্র। আমি তো মহা বিপদে পড়িলাম। কি করি, আমি তো সাধুকে ভিতরেই রাখিব মনে করিয়া একেবারে নাছোড়বন্দ হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাঁহাদেব অজস্র অভিসম্পাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপও না করিয়া আমি তাঁহাদিগকে প্রকৃত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

"চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। আমাদেব কথার একবর্ণও না বুঝিয়া, অবশেষে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, আমরা কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহি, তখন আমাদিগকে যেন ভস্ম করিতে উদ্যত হইয়া, অজস্র গালাগালি দিতে

দিতে ধর্ম্মশালা হইতে প্রায় ১৬। ১৭ জন হৃষ্ট পুষ্ট বৈষ্ণব নাগা সাধু "তোরাই থাক্, তোরাই থাক্" বলিয়া ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাদের এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। তাঁহারা মনে করিলেই বিনা বাক্যব্যয়ে অনায়াসে সেই ঘরের মধ্যে একটু স্থান দিতে পারিতেন। আমি আর ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া সাধুকে কেণ্ডি হইতে নামাইয়া ধর্ম্মশালার এক পার্শ্বে শোয়াইলাম। যাহা হউক, অনেক কষ্টে আমি সাধুকে ধর্ম্মশালার মধ্যে শোয়াইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। এইরূপে রাত্রি প্রায় ৯।১০ টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি যাত্রীদের কেণ্ডি দিয়া আমার লুই ফেরৎ আনিলাম এবং বীজুকে পরদিন প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিতে বলিলাম।

নাগারা ধর্ম্মশালার চারিধারে রকের উপর শয়ন করিলেন এবং আমি তাহারই নিম্নে অনতিদূরে একটী বৃক্ষের তলদেশে শুইয়া পড়িলাম। সেই রাত্রি তো আমার এই রূপেই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই দেখি যে, নাগারা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছেন এবং এক এক বার ধর্ম্মশালার মধ্যে গিয়া সেই পীড়িত সাধুকে দেখিয়া আসিতেছেন। যেন তাঁহাদের কি ধাঁধাঁই লাগিয়াছে! প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া নাগাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "আরে যহতো পরমহংস হ্যায়, নহী তো ইৎনী গালি গালাজ্ কোঁয়া কর সহ সক্তে" এবং কেহ কেহ আসিয়া গত রাত্রিতে তাঁহারা আমাদের সহিত যে দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, আমি আর সে সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ না করিয়াই সর্ব্বাগ্রেই সাধুকে দেখিতে গেলাম। ধর্ম্মশালার মধ্যে গিয়া দেখিলাম যে, সাধু বসিয়া আছেন। তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বেশ ভালই বোধ হইল। আমি কয়েক খানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে একটী ধুনী জ্বালিয়া দিলাম। তাহার পর তিনি ঝুলি হইতে আটা বাহির করিয়া দিয়া কয়েক খানি রুটি করিয়া দিতে বলিলেন। আমি তাঁহার জন্য রুটি করিতে লাগিলাম। তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে তিনি আমাকে এই পর্য্যন্ত বলিলেন যে, মাড়োয়ার হইতে ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া পথে তিনি অর্শোরোগাক্রান্ত হন এবং তাঁহার কিছু অর্থও নাকি মারা যায়।

আমি সাধুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময়ে বীজু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সাধুর নিকট সে মজুরী স্বরূপ চারি আনা মাত্র পয়সা চাহিল।

এই কথা শুনিয়াই সাধু অতিশয় বিরক্ত হইলেন, এবং তাঁহার নিকট কিছু নাই ও তাঁহাকে কিছু দিতে পারিবেন না বলিলেন। তাঁহার নিকট বস্ত্রাদি ও বাসন প্রভৃতি এত দ্রব্য ছিল, যাহার একটা কিছু দিলেই বীজু সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়। অর্থের পরিবর্ত্তে সাধুর নিকট একটা কিছু লইবার জন্য বীজু কত চেষ্টা করিল কিন্তু সাধুর মন কিছুতেই টলিল না, বরং তিনি তাহার ঐরূপ অন্যায় দাবী অসহ্য বোধ করিয়া, আমি তাঁহাকে কেন সেই লোকটার পীঠে আনিলাম বলিয়া আমাকে যথোচিত তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এইরূপ উত্তেজনায় পীড়িত ব্যক্তির অনিষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া আমি বীজুকে যেরূপে পারি সন্তুষ্ট করিব বলিয়া বিদায় দিলাম।

রুটি প্রস্তুত হইলে, আমি সাধুকে তাহা খাইতে দিলাম। তিনি আপন হাতেই রুটি খাইতে লাগিলেন। আমিও স্নান করিয়া গ্রামে ভিক্ষা করিতে গেলাম। গ্রামের লোক সেই দিন আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং আমার নিকট সকল কথা শুনিয়া বীজুকে এক জন দুই আনা পয়সা দিল এবং আর একজন বৈকালে দুই আনা দিয়া আমাকে ঋণমুক্ত করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

গ্রাম হইতে ধর্ম্মশালায় আসিয়া দেখিলাম যে, সাধুর মৃত্যুকাল উপস্থিত, কণ্ঠে ঘড ঘড ধ্বনি হইতেছে এবং রাশিরাশি মক্ষিকায় মুখখানি আবৃত। অকস্মাৎ সাধুকে আমি এইরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিব, তাহার কোন লক্ষণই কিছু পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি তাঁহাকে কত ডাকিলাম, আর কে কাহাকে উত্তর দেয়? কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যিনি অতি তুচ্ছ একটা পদার্থেরও মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, উপকারী ব্যক্তিকেও তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত করিতে যিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, একটী মাত্র মক্ষিকার তাড়নায়ও যিনি বিকল হইতেন, তাঁহার সেই মমতার আধার দেহ অসংখ্য মক্ষিকায় আচ্ছন্ন, তাঁহার সেই অতি আদরের সামগ্রী সরকারী লোকের জিম্মায়। আমার অনুপস্থিতি কালে টিহরী রাজার একজন পাটোয়ারী আসিয়া সাধুর সমুদয় দ্রব্যাদির একটা তালিকা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অন্তিমকালে আমি সাধুর মুখে একটু গঙ্গাজল দিয়া ভগবানের নাম শুনাইলাম। অল্পক্ষণ পরেই সাধু ৺গঙ্গা লাভ করিলেন। এই সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র রাজপাটোয়ারী আসিয়া সাধুর সমুদয় দ্রব্যাদি লইয়া গেলেন। তাঁহার বোঁচকার মধ্যে কি আশ্চর্য্য, একটী দোয়ানী বাহির হইল। আমি কেবল মাত্র সেই দোয়ানীটী বীজুকে

দিয়া তাহার বাকী পাওনা চুকাইয়া ঋণমুক্ত হইলাম। পার্ব্বত্যরীত্যনুসারে দুইটী নীচজাতীয় পাহাড়ীর দ্বারা সাধুর মৃতদেহ মা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। আমি স্বয়ং সাধুকে গঙ্গায় দিতে পারিলাম না বলিয়া একটু আক্ষেপ রহিয়া গেল। সাধুর মৃত দেহ নড়াইবার সামর্থ্য আমার ছিল না এবং গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ বা রাজপুতই সাধুকে গঙ্গায় লইয়া যাইতে সম্মত হইল না, সুতরাং বাধ্য হইয়াই আমাকে অপর লোক দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইল। এই একটী অভাবনীয় ঘটনায় ভটারীগ্রামে আমাকে দুই দিন থাকিতে হইয়াছিল।

ভটারী হইতে যাত্রা করিয়া বোধ হয় চতুর্থ দিবসে আমি গঙ্গোত্রিতে পঁহুছিয়াছিলাম। গঙ্গোত্রি পথে ধরারী শেষপ্রান্তস্থিত গ্রাম। উক্ত গ্রাম হইতে গঙ্গোত্রি প্রায় ১২ ক্রোশ হইবে। পথের মধ্যস্থলে ভৈরব ঘোলা নামে একটী স্থান আছে। ভৈরবজীর স্থান বলিয়া গঙ্গোত্রির যাত্রিগণ সেই স্থানে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া যাতায়াত করে। স্থানটীতে একটী ছোট মন্দিরের মত আছে। পথে আর কোন গ্রাম বা দোকান নাই। ভৈরব ঘাটীতে গিয়া আমি প্রকৃত পথ ছাড়িয়া অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছিলাম। এইখানে ভোট গঙ্গা নামে আর একটী নদী আসিয়া মূল ধারা ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পথহারা হইয়া কিছুক্ষণ ঘুরিতে ঘুরিতেই আমি পুনরায় প্রকৃত পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা হউক, যতই আমি গঙ্গোত্রির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, হিমালয়ের সুবিশাল অপরূপ দৃশ্য ততই আমার নয়নগোচর হইতে লাগিল। সম্মুখে সেই তুষারাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড পর্ব্বত। পর্ব্বতটী দেখিয়া অনেকটা কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই পর্ব্বত হইতেই ত্রিভুবনপাবনী ভাগীরথী প্রবাহরূপে মর্ত্ত্যে আগমন করিতেছেন। সর্পের ন্যায় কুটিল গতিতে পতিতপাবনী ভাগীরথী কর্ণ বধির করিয়া অবিরাম হরহর ধ্বনি করিতে করিতে নিম্নে অবতরণ করিতেছেন। গঙ্গোত্রিতে নার প্রবাহ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও তাঁহার প্রচণ্ড বেগে শত ঐরাবতেরও সাধ্য নাই যে, ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকে। মা গঙ্গার অতি শুভ্র ও পবিত্র জলরাশি উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে অসংখ্য জীবের উদ্ধারকামনায় অতি দ্রুতগতিতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছেন, ক্ষণকালও যেন কোথাও তিষ্ঠিতে পারিতেছেন না। ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বের অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর উপরিভাগ অগাধ তুষাররাশিতে পরিপূর্ণ এবং নিম্নভাগ গাঢ় হরিত বর্ণ দেবদারু বৃক্ষে সমাচ্ছা-

দিত এবং স্থানে স্থানে ভাগীরথীর উভয়তীরবর্ত্তী স্থান এমনি সুন্দর, সুচিক্কণ ও শুভ্রপাষাণময় স্বাভাবিক বেদিকার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে যে, তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে একেবারে আত্মহারা হইলাম। সেখানে পঁহুছিয়া প্রকৃতই আমার মনে হইল যে, আমি যেন আর মর্ত্ত্যলোকে নাই। আমি ত স্থানে স্থানে বসিয়া পড়িতে লাগিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাই যেন আর দেখিতে পাইব না বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহা ফেলিয়া যাইব, তাহাই যেন আর ফিরিয়া পাইব না। এই মনে করিয়া কত স্থানেই যে বসিতে বসিতে গেলাম, তাহা বলিতে পারিনা।

পথে সন্ধ্যা হইল, তথাপি আমার হুঁস নাই। আমি যেন এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। সেই অবস্থায় একজন সাধু আমার ঐ অবস্থা দেখিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গোত্রিতে লইয়া চলিলেন। এই সাধুটীর সহিত আমার ভৈরব ঝোলার নিকট সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইনি আমাকে পথে রুটি করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর আমরা গঙ্গোত্রিতে পঁহুছিলাম, গঙ্গোত্রির মন্দিরে মার ধাতুময়ী সুন্দর প্রতিমা দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। গঙ্গোত্রিতে মা গঙ্গার একটী প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। যাত্রীদের ও পাণ্ডাদের জন্য কয়েক খানি ঘর এবং তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য দুই একখানি দোকান মাত্র ছিল। গঙ্গোত্রির ঘাটের উপরেই একটী গুহাতে জনৈক সাধু থাকিতেন। তিনি ধরালী ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামে ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগ্রহ করিতেন, তাহা দ্বারা গঙ্গোত্রিতে তিনি প্রতি বৎসর বহুতর সাধু সন্ন্যাসীর সৎকার করিতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন গঙ্গোত্রিতে কোন সদাব্রত ছিল না। যদি সেই সাধু ভিক্ষালব্ধ অন্নে সকলের সেবা না করিতেন, তাহা হইলে অর্থহীন অবস্থায় সেইখানে ২।১ রাত্রি অবস্থান করাও কষ্টকর হইয়া উঠিত।

এই স্থান হইতে মূল গঙ্গোত্রি বা গোমুখী প্রায় ১২ক্রোশ হইবে। ভাগীরথীর উভয়পার্শ্বস্থিত চিরতুষারমণ্ডিত পর্ব্বত-মালা এতই দুর্গম যে, বহু চেষ্টা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত কেহ তথায় পঁহুছিতে পারে নাই। শুনিয়াছি যে, এই স্থান হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একবৎসর একটী য়ুরোপীয়ান্ পরিব্রাজক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও কয়েক জন ইংরাজ ভ্রমণকারী বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি অতি কষ্টে এক মাইল

আরও উপরে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি বর্ষার পূর্ব্বে অধিকতর দুর্লঙ্ঘ্য হইবার কারণ এই যে, নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণে তুষার-রাশি বিগলিত হইয়া পর্ব্বতগাত্র এমনই পিচ্ছিল হয় যে, কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহার উপর পদবিক্ষেপ করে। সেইস্থানে পঁহুছানো এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থানে ৺ গঙ্গোত্রি স্নান করিয়া সকলে কৃতার্থ হইতেছেন এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও সেইজন্য এই খানেই ৺গঙ্গোত্রির মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। যাত্রীরা যে ঘাটে স্নান করে, তাহা "ভগীরথশিলা" নামে খ্যাত। ৺গঙ্গোত্রির মন্দিরের বাহিরে একটী অতি সুন্দর শুভ্র স্ফটিকলিঙ্গ দেখিলাম। পাণ্ডারা সেই লিঙ্গ মূর্ত্তিটী একটী তাম্রাবরণে ঢাকিয়া রাখে। ৺ কেদার ও বদ্রীনারায়ণের সহিত তুলনায় ৺ গঙ্গোত্রির যাত্রিসংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং মহারাষ্ট্রীয় যাত্রীর সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। যাত্রিগণ প্রায়ই এইখানে একরাত্রি মাত্র বাস করিয়া চলিয়া যায়। বৎসরে ছয় মাস এইখানে মা গঙ্গার পূজা ও যাত্রিসমাগম হয়। আর ভোগ রাগের তেমন ব্যবস্থা নাই। প্রসাদপ্রার্থী সাধু সন্ন্যাসিগণ অপ-রাহ্নে পিণ্ডাকার একটী ভাতের গোলা প্রসাদ পান। তাহাও পাহাড়ী পূজ-কেরা দুই এক দিনের অধিক কাহাকেও দিতে সম্মত হয় না।

আমি মন্দির হইতে গঙ্গার তীরেতীরে অতি অল্পদূর গোমুখীর দিকে গিয়া একটী অতিসুন্দর ও প্রশস্ত গহ্বর দেখিতে পাইলাম। গহ্বরটী বেশ প্রশস্ত এবং উহাকে বাসোপযোগী করিবার জন্য সুন্দর তক্তা দিয়া দুই পার্শ্ব আবৃত, এক জোড়া কপাটও লাগানো ছিল। গুহাটীর পশ্চাতে আর একটী অপেক্ষাকৃত ছোট গুহা আছে। সেই সময় মোরাদাবাদ অঞ্চলের এক জন বানপ্রস্থাশ্রমী বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ সেই গুহাতে বাস করিতেছিলেন। তথায় তিনি কিছু দিন হইতে গায়ত্রী পুরশ্চরণ করিতেছিলেন। আমি ছোটগুহাটীতে আশ্রয় লইলাম। ২।১ দিনের মধ্যেই সেই ব্রাহ্মণের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব হইল। শুনি-লাম যে, তিনি দুই দিবস যাবৎ গুহা ছাড়িয়া ভিক্ষার্থে কোথাও যান নাই এবং পূজারী ও পাণ্ডারাও কেহ তাঁহার খোঁজ করে নাই। আমি তাঁহার দুই দিন উপবাসের কথা শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলাম এবং তাঁহাকে কোন উপায়ে কিছু খাওয়াইবার চেষ্টায় বাহির হইয়া গঙ্গোত্রির মন্দিরে গেলাম। ভগবানের এমনি কৃপা যে, যার মন্দিরে পঁহুছিবাই দেখিলাম যে, দিল্লী হইতে এক জন ধনাঢ্য যাত্রী আসিয়া পঁহুছিয়াছেন এবং তিনি সাধু ও ব্রাহ্মণ ভোজনের

আযোজন করিতেছেন। গঙ্গোত্রির যাবতীয় সাধু ব্রাহ্মণকেই তিনি সে দিন সিরা (গুড়ের হালুয়া) ও পুরী দিয়া ভোজন করাইলেন। গঙ্গোত্রির সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলরই ভোজন হইয়া গেল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, গঙ্গোত্রিবাসী পাহাড়ীদের মধ্যে কেহই সেই বিবিক্তসেবী, গিরিগুহাবাসী জাপক ব্রাহ্মণের কথা একবার মনেও করিল না। আমি দিল্লীর সেই শেঠ মহাশয়ের নিকট গিয়া ব্রাহ্মণের কথা বলিবামাত্র তিনি আমার সহিত সেই গুহায় আসিয়া তাঁহার দর্শন করিলেন এবং আমাদের দুইজনের ৮।১০ দিনের আহার্য্যোপযোগী আটা, গুড়, চাউল ও ঘৃত প্রভৃতি দিয়া গেলেন।

এইবার ব্রাহ্মণের অনশনক্লেশ ঘুচিল। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন এবং আমাকে অতিশয় যত্নসহকারে মিঠাভাত ও রুটি প্রভৃতি করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। এইরূপে এক সপ্তাহ কাল আমাদের পরমানন্দেই অতিবাহিত হইল। দেবদারু কাষ্ঠের ধুনী নিরবচ্ছিন্ন কাল আমাদের গুহায় প্রজ্বলিত থাকিত। দেবদারু কাষ্ঠে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ থাকায় অতি অল্প কাষ্ঠেই অহোরাত্র আমাদের ধুনী প্রদীপ্ত থাকিত। ইহা হইতে রজন ও তার্পিণ হয়। দেবদারু কাষ্ঠ অপর্য্যাপ্ত থাকাতে এই অঞ্চলের পাহাড়ীদের মধ্যে রাত্রিকালে স্বতন্ত্র প্রদীপের আবশ্যক হয় না। ইহার একটু মোটা রকমের একটা কাটিলেই এক একটা মশালের কাজ হয়। এই সকল স্থানে অগ্নি ভিন্ন যেমন থাকা যায় না, ভগবানের ইচ্ছায় এখানে অগ্নিও তেমনি সুলভ।

৺কেদারবদ্রী ও গঙ্গোত্রি প্রভৃতি তীর্থগুলি হিমালয়ের অত্যুচ্চ উত্তর সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া বৎসরের মধ্যে ছয় মাস মাত্র লোকসমাগম থাকে। অক্ষয়তৃতীয়ার পর বৈশাখ মাসের ৩।৪ দিন থাকিতেই পট খোলে অর্থাৎ পূজা ও যাত্রা আরম্ভ হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসের ২।৩ দিন হইতেই পট বন্ধ হয়, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত অত্যন্ত তুষারপাত নিবন্ধন জনমানবের অগম্য হওয়ায় এই ৬ মাস কাল যাত্রা এককালীন বন্ধ থাকে। পাহাড়ীরা বলে যে, এই সময়ে দেবগণের যাত্রা আরম্ভ হয় এবং তাঁহারাই প্রত্যহ আসিয়া পূজা করেন। আমি যে বৎসর গিয়াছিলাম, ঠিক তাহার পূর্ব্ব বৎসরেই গঙ্গোত্রির পটবন্ধের পর জনৈক ব্রহ্মচারী তথায় থাকিয়া ছয় মাস নির্জ্জনে তপস্যা করিতে উদ্যত হন। তাঁহারই জন্য ধরারী গ্রামের একজন ধার্ম্মিক গৃহস্থ এই গুহাটী বিশেষরূপে বাসোপযোগী করিয়া দেন।

এবং গুহার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড সিন্ধুকে ছয় মাসের উপযোগী অন্নের সংস্থান করিয়া দেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী মহাশয় নাকি কিছুদিন থাকিয়াই শীতের চোটে নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করেন! তাঁহার জন্যই গুহাটী অমন সুন্দর বাসোপযোগী করা হইয়াছিল। সে যাহা হউক্, এক সপ্তাহ পরেই আমি গঙ্গোত্রি হইতে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম। টিহরী হইতে আসিবার কালীন ৺গঙ্গোত্রির জল লইবার জন্য একটী শিশি আনিয়াছিলাম। কেবল এক শিশি জল মাত্র সঙ্গে লইলাম। উক্ত ব্রাহ্মণও আমার প্রতি এত দূর অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার সংকল্পিত পুরশ্চরণ শেষ হইতে না হইতেই তিনি সনির্ব্বন্ধে আমার সহিত একত্রে ভ্রমণ করিবেন বলিয়া আমার সহযাত্রী হইলেন। তাঁহাকে আমার একাকী ভ্রমণ করিবার প্রতিজ্ঞার বিষয় শুনাইয়া আমার সহিত ভ্রমণ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তিনি আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। গঙ্গোত্রি হইতে যাত্রা করিয়া ধরালী গ্রামে পঁহুছিয়া আমরা একরাত্রি মাত্র একত্রে ছিলাম। আমার একাকী ভ্রমণ করিবার বাসনা এতই প্রবল হইয়াছিল যে, আমি অম্লানবদনে ব্রাহ্মণের সেই অকপট স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন কাটাইয়া সেই গ্রামেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ৺কেদারনাথ দর্শনাভিলাষী হইয়া উত্তরকাশী অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ক্রমশঃ।

ব্রহ্ম কি ?।

(শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।)

বস্তু সকল কি স্বভাবাপন্ন, কি নিয়মে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, কিরূপেই বা রূপান্তরিত হয়, আমরা যতই জানিতে পারি, আমাদের জ্ঞান ততই বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। জ্ঞানবলে বর্দ্ধিতশক্তিসাহায্যে আমরা কি না করিতেছি! দৃষ্টান্ত ইহার এতই প্রচুর যে, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে যাওয়া বৃথা শক্তি ক্ষয় মাত্র। জ্ঞানই যে শক্তি, ইহা মহা-

জনোক্তি। জ্ঞানের বৃদ্ধিতে যেমন শক্তির বৃদ্ধি, সেইরূপ শক্তির বৃদ্ধিতে আবার সুখের বৃদ্ধি ; এবং সুখী হইতে আমাদের সকলেরই ইচ্ছা। সুখী হইবার ইচ্ছা যেরূপ আমাদের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি, সেইরূপ জ্ঞানবৃদ্ধির প্রবৃত্তিও আমাদের স্বাভাবিক। প্রতিপদবিক্ষেপে আমরা যাহা করিতেছি বা করিবার অভিলাষ করিতেছি, তাহা জাগতিক বস্তুনিচয়ের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ জ্ঞান উপার্জ্জনে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই পথে চিন্তা করিতে করিতে একটু অগ্রসর হইলে দেখিব যে, গৌণ বা মুখ্য ভাবে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই বিশাল জগতের মূল কারণ জানিবার জন্য আমরা সকলেই স্বভাবতঃ অল্প বিস্তর সমুৎসুক। মৃত্তিকাবিষয়ক জ্ঞান হইলে মৃত্তিকা হইতে যে সকল বস্তু হইতে পারে, তাহার জ্ঞান জন্মিবে। মৃত্তিকাজাত বস্তুসমূহের যথার্থ বোধ মৃত্তিকাজ্ঞান ব্যতীত সম্পূর্ণ হইবে না। সমগ্র বস্তুর মূলীভূত কারণকে ঋষিগণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। সুতরাং সমুদয় পদার্থের মূল অনুসন্ধানে ব্রহ্মতত্ত্বেরই অনুসন্ধান করা হইবে। ব্রহ্ম-তত্ত্বঅনুসন্ধানে আমাদের জাগতিক জ্ঞান, বল ও সুখ বৃদ্ধি হইবে। ইহা শুনিলে অদ্ভুত কথা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বলিতে কি, যে শিক্ষা ও সংস্কার বশে আমরা ঐ কথা অদ্ভুত মনে করি, তাহাই আমাদের অধঃপতনের হেতু। ঐ শিক্ষাবশেই এক্ষণে আমরা গৃহপ্রাঙ্গণে ব্যাঘ্রশৃগালের ভক্ষ্য হইয়াছি! যে জ্ঞান কেবল মৃত্যুর পর মানুষকে সুখী করিবে বলে, ইহজগতের উন্নতিসাধনে ঔদাস্য শিক্ষাই যে জ্ঞান লাভের একমাত্র সাধন, তাহাকে আজ দূর হইতে নমস্কার করা উচিত। তাহার সেবা করিয়াই সেই আর্য্যঋষিগণের বংশধরদিগের আজ এই অবস্থা। যে জ্ঞান বশিষ্ঠকে বিশ্বামিত্রের বিষাক্ত শায়ক সমূহের মর্ম্মবেদনা সহাস্যবদনে সহ্য করিতে শিক্ষা দিয়াছিল, সেই জ্ঞানই আবার মহামতি ভীষ্মকে স্বেচ্ছায় শরশয্যাগ্রহণে শিক্ষা দেয়। আজ কিন্তু শিক্ষার দোষে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" ইহাই আমাদের প্রাণের কথা দাঁড়াইয়াছে। এবং উহারই প্ররোচনায় আমরা অনেকে গৈরিক বসন, কমণ্ডলু বা হরিনামের ঝুলি লইয়া মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য সমুদয়ে জলাঞ্জলি দিতে ব্যস্ত হইয়া থাকি।

সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদিগকে কখনই ওরূপ শিক্ষা দেয় না। সর্ব্বকারণের কারণজ্ঞান ওরূপ শিক্ষা কখন দিবেও না। ব্যক্তিগত ভাবে উহা যেরূপ একব্যক্তির অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সাধন হেতু হইবে

আবার জাতিগত ভাবে সেইরূপ উহা সেই জাতিকে স্বকীয় সর্ব্ববিধ অভাব মোচন করিতে সমর্থ করিবে। কর্ম্মই সকলের বন্ধহেতু, এ কথা নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না, কিন্তু উহা হইতে মোচনের উপায়স্বরূপ স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে সকলের হৃদয়ে বলদানে সহায় হইবে। ব্রাহ্মণকে উহা সমাধি-নিবিষ্ট হইয়া যেরূপে আত্মস্বরূপে নিমগ্ন হইবার জন্য জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিক্ষা দিবে, ক্ষত্রিয়কে তদ্রূপ বাহুবলের দ্বারা সত্য ও ধর্ম্মের রক্ষার জন্য জগৎ হইতে অত্যাচার অনাচারের লোপ সাধনের জন্য মৃত্যুকে উপহাস করিতে শিক্ষা দিবে। বৈশ্যপ্রকৃতি মানবকে যেরূপ বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা দেশের সমৃদ্ধিসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া জীবনবিসর্জ্জন করিতে উৎসাহী করিবে, শূদ্রপ্রকৃতিকে তদ্রূপ প্রভুর হিতার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া উন্নতি লাভ করিতে প্রস্তুত করিবে। বেদসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান বস্তুর যথার্থ স্বরূপ শিক্ষা দিয়া মানবকে একদিকে যেমন কৃতার্থ করে, অন্যদিকে আবার উহাই সেইরূপ স্ব স্ব অধিকারগত কর্ত্তব্যপালনে তাহাকে নিয়োজিত ও সমর্থ করিয়া সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণ বিধান করিয়া থাকে। মহাভারতাদি ইতিহাসনিবদ্ধ, ভারতের তাৎকালিক শ্রী ও সমৃদ্ধিই ইহার প্রমাণস্থল। আজ-কাল এই ব্রহ্মজ্ঞান ইহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ কর্ত্তব্যপালনসামর্থ্য প্রদান করে না বলিয়াই আমাদের এই অবস্থা। আমরা নগরবাসের অনুপযোগী হইয়া ক্রমে অরণ্যবাসের যোগ্য হইতেছি। প্রাপ্তবস্তুর ক্ষয়জনিত ভয় এবং মৃত্যুভয় আমাদিগকে কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ করিয়াছে, আত্মা ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসই আমাদের মৃত্যুভয়ের হেতু এবং অজ্ঞানই ঐ অবিশ্বাসের মূল। শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান থাকিলে আমাদের আত্মা ও ঈশ্বরজ্ঞানও দৃঢ় হইত। তখন মৃত্যুভয়ে কাতর হইয়া কাপুরুষ হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইত।

আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার আর একটী কারণ ভবিষ্যদ্দৃষ্টির অভাব। ভবিষ্যদ্দৃষ্টির অভাব আবার অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। কি করিলে কি হয়, এ কথা আমরা যতই জানিব, ততই ভবিষ্যদ্দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। ততই আমরা পতনের হেতু নিবারণে সমর্থ হইব। ভবিষ্যদ্দৃষ্টির অভাব বশতঃই আমাদের ক্ষণিক সুখভোগের লালসা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই ক্ষণিকসুখ-ভোগলালসাই আমাদিগকে আরও কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ, দেখা যাইতেছে, অজ্ঞান যেমন আমাদের সর্ব্ববিধ দুঃখের হেতু, তদ্রূপ জ্ঞানই আমাদের সর্ব্ববিধ সুখের হেতু। আর এই অজ্ঞাননিবারণও জ্ঞান

ব্যতীত সাধিত হয় না। সমগ্র বিশ্ব যাঁহার কার্য্য, তাঁহার জ্ঞান লাভ হইলে আমাদের সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মিবে। তাঁহার জ্ঞান লাভ হইলে জগৎ সম্বন্ধে আমরা অভিজ্ঞই হইব। সর্ব্ব প্রকার কার্য্য-কারণ-জ্ঞান হইলে আমাদের সর্ব্বাবস্থাতেই সুখের সম্ভাবনা। অন্যথা সুখের আশা সুদূরপরাহত।

বিজ্ঞান নানাশাখাবিস্তারে বুঝাইতেছে, নানা বস্তুর সম্মিলনস্থল বিচিত্রতাময় জগৎ পরস্পর অবিরুদ্ধ নানা নিয়মে আবদ্ধ। সেই নানা নিয়ম আবার জড় ও চেতন দুই শ্রেণী পদার্থ নিবদ্ধ। চেতন স্বসত্তানুভবক্ষম ও জড় তদক্ষম, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। এই জড় ও চেতনের মূল কি ও উহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি জানিতে পারিলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় কিন্তু উহা নিতান্ত দুরূহ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাহায্যে বুঝাইতে বিজ্ঞান এখনও সক্ষম হন নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্য লইতে আমরা বাধ্য। ধীমান মনীষিগণ এ বিষয়ে নানামতাবলম্বী হইয়াছেন। অধিক কি, একজন ইহাকে চির অজ্ঞেয়তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন! প্রাচীন মহাত্মাগণের পদপংক্তি অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে বেদ, উপনিষৎ, পশ্চাৎ বেদান্ত, ভাগবত, গীতা প্রভৃতি পুস্তকে ইহার এক প্রকার বোধগম্য মীমাংসা বেশ পাওয়া যায় বটে কিন্তু পরবর্ত্তি মহাত্মাগণ ব্যাখ্যাচাতুর্য্যে ঐ গুলিকে নিজ নিজ মতেরই প্রমাণ ও পোষকে পরিণত করিয়াছেন। তত্ত্ববুভুৎসুর পক্ষে একের সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্যক্ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আবার সর্ব্বশ্রেণীর ব্যাখ্যাকর্ত্তার ব্যাখ্যা অবগত হওয়াও সহজসাধ্য নহে। এক বিষয়ে ৫টী মতের ব্যাখ্যা একত্র পাইলে, নিজ প্রতিভাবলে অনেকেই একটা যথার্থ তথ্য নির্ণয়ে সমর্থ হন। কিন্তু আজ আমাদের সে সুযোগ নাই। যাহা হউক তথাপি স্বাধীনভাবে প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাত্মাগণের আবিষ্কৃত সত্য এবং যুক্তি অবলম্বনে আমরা ইহা যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। সুতরাং বিজ্ঞান ও ন্যায়সম্মত অনুমান, স্বাত্মানুভূতি এবং সিদ্ধ মহাত্মাগণের উপদেশসমূহই সহায় রূপে গৃহীত হইবে। একশাখীয় বিজ্ঞান বলিয়া দিবে, যাহা জড়, তাহা জড়ই, তাহা চিরকালই জড় আর যাহা চেতন, তাহা চিরকালই চেতন। একটী মৃত জীবাণু পুনরায় জীবিত হয় না কিন্তু একটী জীবিত জীবাণুকে মৃত হইতে দেখা যায়। জড় হইতে চেতন উৎপন্ন হইতে দেখা যায়

না আবার জড়বিহীন চেতনও এ পর্য্যন্ত কাহারও প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই যে, চেতন হইতে জড়ের উৎপত্তি অনুমান করিয়া লইব। কিন্তু এখানে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, জড় ও চেতন পৃথক্ হইলেও কখনও পৃথক্ সত্তায় সত্তাবান হইতে পারে কি? বিজ্ঞান আজ কাল পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কিছু অগ্রসর হইয়া জড় বলিয়া নিশ্চিতপূর্ব্ব পদার্থনিচয়েও চৈতন্যের অস্তিত্ব দেখিতেছেন, এবং জড়ও চেতনাশূন্য নহে বলিতে সাহসী হইতেছেন। তবে উহা এখনও প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সর্ব্ব বিজ্ঞানবাদীর নিকট স্বীকৃত নহে।

অনুমানপ্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিলে এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক। জড়ে চেতনের সত্তাব স্বীকার আমরা আগাগোড়া অনুমান সহায়ে করিয়া থাকি। রাম, শ্যাম আমার কথার জবাব দেয়, আমার মত অভীষ্ট সিদ্ধিতে আনন্দ ও প্রতিকূল অনুভূতিতে দুঃখ করে সুতরাং উহাদের আমার ন্যায় চেতনা আছে। আমাতে যে চেতনা আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, আর সেই চেতনা আছে বলিয়া অপর বস্তুতে উহার অস্তিত্ব আমি বুঝিয়া থাকি বা অপর বস্তু জড় বা চেতন, ইহা অনুমান করিয়া থাকি। আমার চেতনার দ্বারা যেমন উহাদের মধ্যগত চৈতন্যকে বুঝি, তেমনি আমাতে অচেতন দেহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আছে বলিয়াই উহাদের সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিয়া থাকি। আমার ভিতরে দেহ ও চক্ষুরাদি জড়পদার্থের অস্তিত্ব না থাকিলে আমার অন্য জড়সম্বন্ধীয় জ্ঞান কখনই হইত না. অতএব স্থির হইতেছে যে, জড় বা চেতন বুঝিতে যখন জড় চেতন উভয়াত্মক বস্তুর প্রয়োজন, তখন আমরা জড় চেতন বলিতে যাহা বুঝি, তাহা অন্যোন্য পৃথক্ সত্তায় থাকিতে অক্ষম। তবে কি তাহারা একই পদার্থের দুই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র বা একই পদার্থাশ্রিত?

দেখিতে পাই, আমাদের যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আছে, সেইরূপ অপর একটী করণ বা ইন্দ্রিয় আছে; উহার দ্বারা আমাদের ইচ্ছা, অনুভূতি এবং অনুভূতিসমূহের একত্র সমাবেশকার্য্য সাধিত হইতেছে। তৎসহায়েই আমরা প্রাপ্ত অনুভূতিসমূহের সাহায্যে প্রয়োজনমত নূতন অনুভূতিসমূহ উৎপাদন করিতে পারি। ইহারই নাম জাগ্রদবস্থা। আবার দেখি, সময়ে সময়ে ঐ সব পূর্ব্বানুভূতি যেন কোথায় চলিয়া যায়; আবার ফিরিয়া আসে! কিন্তু নিজের অস্তিত্ববিষয়ক যে অনুভূতি, তাহা আমরা কখনও হারাই না। নিদ্রা মূর্চ্ছাদি অবস্থায়ও আমি যে কেবল বর্ত্তমান ছিলাম, আর কিছুই ছিল না, ইহা যেন

আমাদিগকে তৎসময়ে কে প্রাণের ভিতর বলিয়া দেয়। তৎসময়ে সেই আমি-ত্বের সহিত যে অন্যান্য রূপরসাদি বিষয় সংযুক্ত থাকে না, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। নিজ নিজ প্রত্যক্ষই তাহার প্রমাণ। সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। আমাদের আর একটী অবস্থা আছে, যাহা পূর্ব্বোক্ত অবস্থা সকল হইতে বিভিন্ন। উহাতে জাগ্রতবৎ সবই দেখি, সবই করি; কেবল তদবস্থায় অনুভূত বিষয়সমূহ জাগ্রদুপলব্ধ বিষয়সমূহ অবলম্বনেই উঠিয়া থাকে। জাগ্রতের বিষয়সমূহ যে জাতীয়, সেই অবস্থায় তজ্জাতীয় বিষয়াতিরিক্ত অন্য কিছুই থাকিতে দেখা যায় না। কিন্তু ঐ অবস্থায় বিষয়সমূহ অনুভব করিতে বহিঃস্থ কোন বস্তুর সাক্ষাৎ সাহায্য লইতে হয় না। ইহারই নাম স্বপ্নাবস্থা। পূর্ব্বোক্ত সুষুপ্তিতে "আমি ছিলাম" এই অনুভূতির মধ্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয় ভাব বিজড়িত ছিল বলিতে হইবে; কারণ, অনুভূতি কখন কর্ত্তাশূন্য এবং কর্ত্তা কখনও ক্রিয়াশূন্য নহে। ক্রিয়াও আবার বিষয়শূন্য নহে। কাযেই ঐ অবস্থায় অনুভূত "কেবল আমি ছিলাম" এই অনুভূতিটির সমস্তই আপাত চৈতন্যময় বোধ হইলেও উহাতে দৃশ্য বস্তু বা জড়ের গন্ধ যে এককালে বিলুপ্ত, তাহা নহে। কারণ, চৈতন্য আপন অস্তিত্ব অনুভব করা হেতু নিজেই দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, বলিতে হইবে। অতএব ঐ অনুভূতিটীও জড়চেতনাত্মক, ইহা নিশ্চিত। এবং ঐ অবস্থাবিশেষই সচরাচর ব্যবহৃত চেতন শব্দের অভিধেয়। মূর্চ্ছাদি অবস্থাতেও চেতনের ঐ ভাব। অতএব দেখা যাইতেছে, সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং মূর্চ্ছাদি অবস্থায় চেতন পদার্থটী দ্রষ্টা ও দর্শনরূপে প্রকাশিত থাকে অর্থাৎ ঐ অবস্থায় উহার ভিতর ঐ প্রকার স্বগত ভেদ পরস্পর সম্বন্ধবিশেষে বর্ত্তমান থাকে। জাগ্রদবস্থায় কিন্তু চেতন পদার্থ নিজে দ্রষ্টা রূপে প্রকাশিত থাকিলেও বহিঃপদার্থের সংঘর্ষে অপূর্ব্বদৃষ্ট বিষয় সকল অনুভব করেন। অতএব বিষয় যখন দ্রষ্টা নিজেই হয়, যেমন সুষুপ্ত্যাদি অবস্থায়, তখন চেতন, দ্রষ্টা ও দর্শন রূপে দ্ব্যাত্মক; আর বিষয়টী যখন দ্রষ্টা ভিন্ন অন্য কিছু হয়, যেমন জাগ্রদবস্থায়, তখন চেতন পদার্থটী দ্রষ্টা ও দর্শন ও দৃশ্যরূপে ত্র্যাত্মক। দ্ব্যাত্মক ও ত্র্যাত্মক হইলেও যে একেরই দ্ব্যাত্মকতা ও ত্র্যাত্মকতা, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

ইয়াকোহামা।
১০ই জুলাই, ১৮৯৩।

প্রিয় আলাসিঙ্গা, বালাজী, জি জি ও অন্যান্য মান্দ্রাজী বন্ধুগণ,—

আমার গতিবিধি সম্বন্ধে তোমাদের সর্ব্বদা খবর দেওয়া আমার উচিত ছিল, আমি তাহা করি নাই, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবে। এরূপ দীর্ঘ ভ্রমণে প্রত্যহই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। বিশেষতঃ আমার ত কখন নানা জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া ঘোরা অভ্যাস ছিল না। এখন এই সব যাহা সঙ্গে লইতে হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধানেই আমার সব শক্তি ব্যয় হইতেছে। বাস্তবিক, এ এক বিষম ঝঞ্ঝাট!

বোম্বাই ছাড়িয়া এক সপ্তাহের মধ্যে কলম্বো পৌঁছিলাম। জাহাজ প্রায় সারাদিন বন্দরে রহিল। এই সুযোগে আমি নামিয়া সহর দেখিতে গেলাম। গাড়ী করিয়া কলম্বোর রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। সেখানকার মধ্যে কেবল বুদ্ধ ভগবানের মন্দিরটীর কথা আমার স্মরণ আছে; তথায় বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ মহানির্ব্বাণ মূর্ত্তি শয়ান অবস্থায় অবস্থিত আছে। আমি মন্দিরের পুরোহিতগণের সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাঁহারা সিংহলী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন না বলিয়া আমাকে আলাপের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। এখান হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে সিংহলের মধ্যে অবস্থিত কাণ্ডি সহর সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র, কিন্তু আমার তথায় যাইবার সময় ছিল না। এখানকার গৃহস্থ বৌদ্ধগণ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই মৎস্যমাংসভোজী, কেবল পুরোহিতগণ নিরামিষাশী। সিংহলীদের পরিচ্ছদ ও চেহারা তোমাদের মান্দ্রাজীদেরই মত। তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, তবে উচ্চারণ শুনিয়া বোধ হয়, উহা তোমাদের তামিলের অনুরূপ।

পরে জাহাজ পিনাঙে লাগিল; উহা মালয় উপদ্বীপে সমুদ্রের উপরে একটী ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড মাত্র। ইহা খুব ক্ষুদ্র সহর বটে, কিন্তু অন্যান্য সুনির্ম্মিত নগরীর ন্যায় খুব পরিষ্কার ঝরিষ্কার। মালয়বাসিগণ সবই মুসলমান। প্রাচীনকালে ইহারা বণিক্‌কুলের ভীতির কারণ বিখ্যাত জলদস্যু ছিল। কিন্তু এখনকার

অভেদ্য দুর্গপ্রায় যুদ্ধপোতের কুম্ভীরানুকারী কামানের চোটে মালয়বাসিগণকে অপেক্ষাকৃত কম হাঙ্গামার কায করিতে বা ধ্য করিয়াছে।

পিনাং হইতে সিঙ্গাপুর চলিলাম। পথে দূর হইতে উচ্চশৈলসমন্বিত সুমাত্রা দেখিতে পাইলাম; আর কাপ্তেন আমাকে প্রাচীনকালের জলদস্যুগণের কয়েকটী আড্ডা দেখাইতে লাগিলেন। সিঙ্গাপুর প্রণালী উপনিবেশের রাজধানী। এখানে একটী সুন্দর উদ্ভিদুদ্যান আছে, তথায় অনেকজাতীয় পাম (Palm) সংগৃহীত আছে। ভ্রমণকারীর পাম নামক সুন্দর তালবৃন্তবৎ পাম এখানে অপর্য্যাপ্ত জন্মায়, আর "রুটিফল" (Bread-fruit) বৃক্ষ ত এখানে সর্ব্বত্র। মান্দ্রাজে যেমন আম অপর্য্যাপ্ত, বিখ্যাত ম্যাঙ্গোষ্টিনও এখানে তদ্রূপ অপর্য্যাপ্ত ; তবে আমের মত আর জিনিষ কি ? এখানকার লোকে মান্দ্রাজী লোকের অর্দ্ধেক কালও হবে না ; তবে কাছাকাছি বটে। এখানে একটী সুন্দর চিত্রশালিকাও (Museum) আছে। এখানে পানদোষ ও লাম্পট্য অপর্য্যাপ্ত মাত্রায় বিরাজমান, ইহাই এখানকার ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের যেন প্রথম কর্ত্তব্য। আর প্রত্যেক বন্দরেই জাহাজের প্রায় অর্দ্ধেক লোক নামিয়া এইরূপ স্থানের অন্বেষণ করে, যেখানে সুরা ও সঙ্গীতের প্রভাবে নরক রাজত্ব করে। থাক্ সে কথা।

তাহার পর হংকং। যদিও সিঙ্গাপুর, মালয় উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী, তথাপি ঐ স্থানে আসিলে যেন মনে হয়, চীনে আসিয়াছি। চীনের ভাব এখান হইতেই এত অধিক ! সকল কার্য্য, সকল ব্যবসা বাণিজ্য বোধ হয় তাহাদেরই হাতে। আর হংকংই আসল চীন। যাই জাহাজ কিনারায় নঙ্গর করে, অমনি শত শত চীনা নৌকা আসিয়া ডাঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে। এই নৌকাগুলি একটু নূতন রকমের—প্রত্যেকটীতে ২টী করিয়া হাল। মাঝিরা সপরিবারে নৌকায় বাস করে। প্রায়ই দেখা যায়, মাঝির স্ত্রীই হালে বসিয়া থাকে, একটী হাল দুই হাত দিয়া ও অপর হাল এক পা দিয়া চালায়। আর অনেক সময় দেখা যায়, তাহার একটী কচি ছেলে পিঠে এক প্রকার নূতন রকমের থলিতে বাধা থাকে, যাহাতে সে হাত পা অনায়াসে খেলাইতে পারে। এ এক দেখ্‌তে বড় মজা। এদিকে চীনে খোকা মায়ের পিঠে বেশ শান্তভাবে নড়্‌ছে চড়্‌ছে ; ওদিকে মা কখন তার যত শক্তি সব প্রয়োগ করে, নৌকা চালাচ্ছেন, কখন ভারী ভারী বোঝা ঠেল্‌ছেন, অথবা অত্যদ্ভুত তৎপরতার সহিত এক নৌকা থেকে অপর নৌকায়

লাফিয়ে যাচ্ছেন। আর এত নৌকা ও ষ্টিম লঞ্চের ভিড়, আর চীনে খোকার প্রতিমুহূর্ত্তে মাথাটী একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। খোকার সে দিকে খেয়াল নাই। তার পক্ষে এই মহাব্যস্ত কর্ম্মজীবনের কোন আকর্ষণ নাই। তার পাগলের মত ব্যস্ত মা মাঝে মাঝে তাকে দু এক থাবা পিঠে দিচ্ছেন, সে ততক্ষণ তার আলোচনা করেই সন্তুষ্ট।

চীনে খোকা একটী রীতিমত দার্শনিক। যখন ভারতীয় শিশু হামাগুড়ি দিতেও অক্ষম, এমন বয়সে সে স্থিরভাবে কার্য্য করিতে যায়। সে বিশেষ রূপেই অভাবের দর্শন শিখিয়াছে। চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতা-সোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দরিদ্রের অতি দারিদ্র্যই তাহার এক কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তাহার প্রাত্যহিক অভাবই তাহার সময়ের এতদূর ব্যাপৃত করিয়া রাখে যে, তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না।

হংকং অতি সুন্দর সহর। উহা পাহাড়ের ঢালুর উপর নির্ম্মিত; পাহাড়ের উপরেও অনেক বড়লোক বাস করে, উহা সহর অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা। পাহাড়ের উপরে খাড়াভাবে ট্রাম গিয়াছে। উহা বাষ্পীয় বলে চলে আর গাড়ীগুলি তারের দড়ি দ্বারা সংযুক্ত।

আমরা হংকঙে তিন দিন রহিলাম। তথা হইতে ক্যাণ্টন দেখিতে গিয়াছিলাম; হংকং হইতে একটী নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে ৮০ মাইল যাইলে ক্যাণ্টনে যাওয়া যায়। নদীটী এত চওড়া যে, খুব বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। অনেকগুলি চীনা জাহাজ হংকং ও ক্যাণ্টনের মধ্যে যাতায়াত করে। আমরা বৈকালে একটী জাহাজে চড়িয়া পরদিন প্রাতে ক্যাণ্টনে পঁহুছিলাম। কি হৈ চৈ! কি জীবনের চিহ্ন! নৌকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছেয়ে ফেলে দিয়েছে! এ শুধু মাল ও যাত্রী নিয়ে যাবার নৌকা নয়—হাজার হাজার নৌকা রয়েছে—গৃহের মত বাসোপযোগী। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অতি সুন্দর, অতি বৃহৎ। বাস্তবিক সেগুলি দুতলা তেতলা বাড়ীস্বরূপ—চারিদিকে বারাণ্ডা রয়েছে—মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে কিন্তু সব জলে ভাসছে!!

আমরা যেখানে নাবলাম, সেই জায়গাটুকু চীন গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিকদিগকে বাস করিবার জন্য দিয়াছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে, নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক মাইল ব্যাপিয়া এই বৃহৎ সহর অবস্থিত—এখানে অগণ্য মনুষ্য

বাস করিতেছে, জীবনসংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়াছে—প্রাণপণে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে। মহা কলরব—মহা ব্যস্ততা। কিন্তু এখানকার অধিবাসিসংখ্যা যতই হউক, এখানকার কর্ম্মপ্রবণতা যতই হউক, আমি ইহার মত ময়লা সহর দেখি নাই। তবে ভারতবর্ষের কোন সহরকে যে হিসাবে আবর্জ্জনাপূর্ণ বলে, সে হিসাবে বলিতেছি না—চীনেরা ত একবিন্দু ধূলি পর্য্যন্ত বৃথা নষ্ট হইতে দেয় না—সে হিসাবে নয়, চীনেদের গা থেকে যে বিষম দুর্গন্ধ বেরোয়, তার কথাই আমি বল্‌ছি—তারা যেন ব্রত নিয়েছে, কখন স্নান কর্‌বে না। প্রত্যেক বাড়ীখানি এক একখানি দোকান—লোকেরা উপরতলায় বাস করে। রাস্তাগুলি এত সরু যে, রাস্তা দিয়ে চল্‌তে গেলেই দুধারের দোকান যেন গায়ে লাগে। দশ পা চল্‌তে না চল্‌তে মাংসের দোকান দেখ্‌তে পাবে ; এমন দোকানও আছে, যেখানে কুকুর বিড়ালের মাংস বিক্রয় হয়। অবশ্য খুব গরীবেরাই কুকুর বিড়াল খায় !

আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিনী হিন্দু মহিলাদের যেমন পর্দ্দা আছে, তাদের যেমন কেউ কখন দেখ্‌তে পায় না, চীন মহিলাদেরও তদ্রূপ। অবশ্য শ্রমজীবী স্ত্রীলোকেরা লোকের সামনে বেরোয়। ইহাদের মধ্যেও দেখা যায়, এক একটী স্ত্রীলোকের পা তোমাদের ছোট ছেলের পায়ের চেয়ে ছোট ; তারা হেঁটে বেড়াচ্চে ঠিক বলা যায় না ; খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে থপ থপ কোরে চলেছে।

আমি কতক গুলি চীন মন্দির দেখিতে গেলাম। ক্যাণ্টনের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটী আছে, তাহা প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট্ এবং সর্ব্বপ্রথম ৫০০ জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের স্মরণার্থ উৎসর্গীকৃত। অবশ্য স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রধান মূর্ত্তি, তাঁহার নীচেই সম্রাট্ বসিয়াছেন—আর দুধারে শিষ্যগণের মূর্ত্তি—সব মূর্ত্তি গুলিই কাষ্ঠ হইতে সুন্দর রূপে খোদিত।

ক্যাণ্টন হইতে আমি হংকঙে ফিরিলাম। তথা হইতে জাপানে গেলাম।

নাগাসাকি বন্দরে প্রথমেই কিছুক্ষণের জন্য আমাদের জাহাজ লাগ্‌লো। আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য জাহাজ হইতে নামিয়া সহরের মধ্যে গাড়ী করিয়া বেড়াইলাম। চীনের সহিত কি প্রভেদ! পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে, জাপানীরা তাহাদের অন্যতম। ইহাদের সবই কেমন পরিষ্কার ! রাস্তাগুলি সব চওড়া, সিধা ও বরাবর সমানভাবে বাঁধানো।

ইহাদের খাঁচার মত ছোট ছোট দিব্যি বাড়ীগুলি, প্রায় প্রতি সহর ও পল্লীর পশ্চাতে অবস্থিত দেবদারু বৃক্ষে ঢাকা চিরহরিৎ ছোট ছোট পাহাড়গুলি, বেঁটে, সুন্দরকায়, অদ্ভুতবেশধারী জাপগণ—তাদের প্রত্যেক চালচলন, ভাবভঙ্গী সবই সুন্দর। জাপান"সৌন্দর্য্য"ভূমি। প্রত্যেক বাড়ীর পশ্চাতেই এক একখানি বাগান আছে—জাপানী ফ্যাশনে সুন্দরভাবে প্রস্তুত। ছোট ছোট গুল্ম, তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড, ছোট ছোট কৃত্রিম জলাশয়, ছোট ছোট পাথরের সাঁকো, এই সমুদয় দিয়া তাহার বাগানখানি উত্তমরূপে সজ্জিত।

নাগাসাকি হইতে কোবিতে গেলাম।

কোবি গিয়া জাহাজ ছেড়ে দিলাম, স্থলপথে ইয়াকোহামায় আসিলাম—জাপানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশসমূহ দেখিবার জন্য। আমি জাপানের মধ্যপ্রদেশে তিনটী বড় বড় সহর দেখিয়াছি। ওসাকা—এখানে নানাশিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়; কিয়োটো—প্রাচীন রাজধানী; টোকিয়ো—বর্ত্তমান রাজধানী। টোকিয়ো কলিকাতার প্রায় দ্বিগুণ বড় হইবে। লোকসংখ্যা প্রায় কলিকাতার দ্বিগুণ।

বৈদেশিককে ছাড়পত্র ব্যতিরেকে জাপানের ভিতরে ভ্রমণ করিতে দেয় না।

দেখিয়া বোধ হয়, জাপানীরা বর্ত্তমান কালে কি প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়াছে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়াছে। উহাদের সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থলসৈন্য আছে। উহাদের যে কামান আছে, তাহা উহাদেরই একজন কর্ম্মচারী আবিষ্কার করিয়াছেন। সকলেই বলে, উহা কোন জাতির কামানের চেয়ে কম নয়। আর তারা তাদের বলও ক্রমাগত বৃদ্ধি কচ্চে। আমি একজন জাপানী স্থপতিনির্ম্মিত এক মাইল লম্বা একটী সুড়ঙ্গ (Tunnel) দেখিয়াছি।

ইহাদের দেশলাইএর কারখানা এক দেখ্বার জিনিষ। ইহাদের যে কোন জিনিষের অভাব, তাই নিজের দেশে কর্বার চেষ্টা কচ্চে। জাপানীদের—নিজেদের একটী ষ্টিমার লাইন আছে—চীন ও জাপানের মধ্যে ইহাদের জাহাজ যাতায়াত করে। আর ইহারা শীঘ্রই বোম্বাই ও ইয়াকোহামার মধ্যে জাহাজ চালাইবে, মতলব করিতেছে।

আমি ইহাদের অনেকগুলি মন্দির দেখিলাম। প্রত্যেক মন্দিরে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা আছে কিন্তু মন্দিরের পুরোহিত-

গণের অল্প লোকেই সংস্কৃত বুঝে। কিন্তু ইহারা বেশ বুদ্ধিমান্। বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্রই যে একটা উন্নতির জন্য প্রবল তৃষ্ণা দেখা যায়, তা পুরোহিতদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদয় হচ্ছে, তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ কোরে বল্‌তে পারি না। তবে এই-টুকু বল্‌তে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক্। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্ব্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ।

আর তোমরা কি কোচ্চো? সারা জীবন কেবল বাজে বোক্‌চো। এস, এদের দেখে যাও, তার পর যাও গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরা-জীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমা-দের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার কোরে শক্তিক্ষয় কোর্‌ছো। পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি। আর তোমরা এখন কোর্‌ছোই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে কোরে সমুদ্রের ধারে পাই-চারি কোর্‌ছো। ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এককণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্চো আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০৲ টাকার কেরাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব কোর্‌ছো। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্ব্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে পাশে এক পাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—বাবা, খাবার দাও, খাবার দাও কোরে উচ্চ চীৎকার তুলেছে!!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমা-দের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সব ডুবিয়ে ফেল্‌তে পারো না?

এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর কোরে দাও। কারণ, এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন ভাল কথা শুনবে না—তাদের হৃদয়ও শূন্যময়, তারও কখন প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যা-চারের মধ্যে তাদের জন্ম; আগে তাদের নির্ম্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরে গিয়ে দেখ, সবজাতি কেমন

উন্নতিপথে চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য, প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়োনা—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেয়োনা, সাম্‌নে এগিয়ে যাও।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই নড়নচড়নরহিত সভ্যতা ভাঙ্গবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে প্রেরণ করেছেন আর মান্দ্রাজের লোকই ইংরাজদের ভারতে বসবার প্রথম সহায় হন। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আন্‌বার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন কর্‌বার জন্যে মান্দ্রাজ কতগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত?—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন প্রদান কর্‌বে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কর্‌বে আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ কর্‌বার জন্য আমরণ চেষ্টা কর্‌বে?

* * আমাকে কুককোম্পানি, চিকাগো, এই ঠিকানায় পত্র লিখিবে।

তোমাদের—ইত্যাদি

বিবেকানন্দ

পুঃ—ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কায করিতে হইবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে, নামযশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বি——

গীতা।

(শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল।)

গীতার এখন বড় সমাদর। ধনীর গৃহেও গীতা, নির্ধনীর গৃহেও গীতা; ধনী, নির্ধনী সকলেই এখন গীতার আদর করিয়া থাকেন। যিনি পণ্ডিত, তাঁহার ত কথাই নাই; যিনি অপণ্ডিত, তিনিও গীতার গভীর তত্ত্বগুলি লইয়া বাদানুবাদ করিতে বিরত হন না। তাই বলিতেছি, গীতার এখন বড় সমাদর। কেহ বলেন, গীতা কর্ম্মপ্রধান; কেহ বলেন, গীতা ভক্তিপ্রধান, কেহ বা "জ্ঞানই গীতার চরম উদ্দেশ্য" এই কথা বলিয়া জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা

করিয়া থাকেন। আমরাও অদ্য গীতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে অগ্রসর হইয়াছি দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন, আমরা কর্ম্মের কিম্বা ভক্তির কিম্বা জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনে অভিলাষী এবং বাদানুবাদ করাই আমাদের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। আমরা জিজ্ঞাসু এবং শিক্ষার্থী সুতরাং পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে প্রকৃত শিক্ষালাভ করাই আমাদের অভিপ্রায়। এক বিষয় লইয়া পণ্ডিতদিগকে বিতণ্ডা করিতে দেখিলে এবং সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শ্রবণ করিলে, জিজ্ঞাসুদিগের সন্দেহ নিরাকৃত হওয়া দূরে থাকুক, বরং সংশয়-জালে হৃদয় আরও অভিভূত হইয়া পড়ে।

কেহ বলেন, গীতা কর্ম্মত্যাগ করিতে বলেন নাই, কারণ, গীতা কর্ম্মত্যাগ করিতে বলিলে গীতোক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কখনও যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বারবার বলিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই অধিকতর প্রশস্ত। সুতরাং কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাই গীতার উদ্দেশ্য, কর্ম্মত্যাগ গীতার উদ্দেশ্য নহে।

যাঁহারা এইরূপে কর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনে অভিলাষী, তাঁহাদিগকে আমরা বলি, "শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন" এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া নাচিলে চলিবে কেন? শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ভাবে কিরূপ কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, তাহাই অগ্রে বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গীতা কর্ম্মত্যাগ করিতে বলেন নাই বলিয়া কেবল ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়, শীতলা মনসা, শনি শুক্রাদির পূজাকেই একমাত্র কর্ম্ম বলিয়া কোথাও উপদেশ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কেবল দুর্গোৎসব, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি প্রতিমার্চ্চন করিলেই কর্ম্মযোগের চূড়ান্ত অনুষ্ঠান হইল, এরূপ আভাস কোথাও দেন নাই। অহঙ্কারপরিপূর্ণ ধনৈশ্বর্য্যমত্ত মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রেন্ধনচিন্তায় অপহৃতবুদ্ধি, বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া দিবারাত্র অর্থের জন্য লালায়িত, এবং কিরূপে স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণ করিব এই চিন্তায় মুহ্যমান, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিও "গীতা কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন" বলিয়া স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। অল্লাধিক বেতনের কর্ম্ম করা এবং কর্ম্ম করিয়া গৃহে আসিয়া "তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী"দিগের মুখাবলোকন, কিম্বা দুএক বার চণ্ডীপাঠ এবং দুদশবার গায়ত্রীজপ অথবা একটু সন্ধ্যা আহ্নিক কিম্বা দুই একবার "ওঁতৎসৎ" "হরি হরি" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করা গীতোক্ত কর্ম্ম নহে,

গীতোক্ত কর্ম্ম অতিমহৎ। যিনি গীতোক্ত কর্ম্মের প্রকৃত অনুষ্ঠানকারী, তিনি সকলের পূজনীয়, তিনি সকলের নমস্ত। গীতোক্ত কর্ম্মের বিশাল মূর্ত্তি আমাদের নয়নপথে যতদূর পতিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য তাহাই অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিব।

যাঁহারা বলেন, গীতা কোন বৈষ্ণব কবি কর্ত্তৃক মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদিগের বিশ্বাস, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতোক্ত ধর্ম্মের উপদেশ দেন নাই, তাঁহাদিগের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। যেরূপ রামায়ণ হইতে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণকে পৃথক্ করিলে রামায়ণ অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, সেইরূপ মহাভারত হইতে গীতাকে পৃথক্ করিলে মহাভারতেরও উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বেদব্যাস যখন মহাভারত প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, "ভগবন্, আমি এক পরম শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রস্তুত করিয়াছি," এবং সেই কাব্যে কি কি বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা বলিবার সময় যখন সর্ব্বশেষে বলিলেন, "যচ্চাপি সর্ব্বগং বস্তু তচ্চৈব প্রতিপাদিতং" অর্থাৎ যাহা সর্ব্বগ বস্তু, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন গীতাকে মহাভারত হইতে পৃথক্ করিলে বেদব্যাসের উদ্দেশ্য যে অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা সুধীব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে সক্ষম। কারণ, গীতায় ঈশ্বরতত্ত্ব যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, মহাভারতের আর কোথায়ও সেরূপ সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হয় নাই। বাস্তবিকই, মহাভারতরূপ বিশাল শরীরের গীতাই অস্থিস্বরূপ।

অর্জ্জুন যখন কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, একদিকে বিশাল পাণ্ডবসৈন্য এবং অপরদিকে অসংখ্য কুরুসৈন্য যুদ্ধার্থে সমুৎসুক হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যখন দেখিলেন, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, পূজনীয় কৃপাচার্য্য সকলেই এই মহাসমরে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে আগমন করিয়াছেন, এবং কেবল কি তাঁহারাই? প্রাণের অধিক প্রিয়তর অভিমন্যু, প্রেমাস্পদ ভ্রাতৃগণ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্ব, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজন্যবর্গ সকলেই, এই কালসমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প, তখন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হস্ত হইতে গাণ্ডীব ধনু খসিয়া পড়িল, তিনি স্নেহাভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "আমি কিরূপে এই যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব? গুরুলোকদিগকে হত্যা করিয়া বিষয়ভোগ করা অপেক্ষা বরং ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করাও শ্রেয়ঃ। অতএব হে মধুসূদন, এক্ষণে

আমার পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক, তাহাই বল, আমি তোমার অনুগত শিষ্য সুতরাং আমাকে উপদেশ প্রদান কর।" অর্জ্জুনের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার দুর্ব্বল চিত্তের পরিচয় পাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে যে অমৃতময় বাক্য নির্গত হইল, তাহা কর্ম্মের সার, জ্ঞানের জ্ঞান এবং ভক্তিরও চরম সীমা, তাহা অতুলনীয়, তাহাই অমৃত। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় এই অমৃতময় বাক্যে পরিপূর্ণ। এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়া পশ্চাৎ গীতোক্ত কর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

আত্মার নিত্যত্ব এবং সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতিপাদন করাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। সেইজন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিমোহিতচিত্ত অর্জ্জুনকে বলিলেন, "তুমি মূর্খের ন্যায় অশোচ্য বন্ধুবান্ধবের নিমিত্ত বৃথা কেন শোক প্রকাশ করিতেছ? যাহা সৎ, তাহার কি কখনও অভাব হইয়া থাকে? এবং যাহা অসৎ, তাহারই কি কখন আবির্ভাব হয়? তুমি, আমি, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, সমস্ত রাজন্যবর্গ, আমরা সকলেই অবিনাশী, সকলেই নিত্য। তুমি পূর্ব্বেও ছিলে, এখনও আছ, ভবিষ্যতেও থাকিবে, সুতরাং তুমি নিত্য, তুমি হস্তপদাদিসমন্বিত নামরূপবিশিষ্ট দেহ নহ। যদি দেহই হইতে, তাহা হইলে কখনও "আমার দেহ" ইত্যাদি সম্বন্ধসূচক বাক্য ব্যবহার করিতে না। অতএব তুমি দেহ হইতে পৃথক্। তুমি যদি দেহই হইবে, তাহা হইলে মৃত দেহ অবশ্যই স্বেচ্ছামত গমনাগমন এবং কথোপকথন করিতে সক্ষম হইত, কিন্তু তাহা যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখন তুমি নিশ্চয়ই দেহাতিরিক্ত। শৈশব, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্য যেমন দেহের এক একটী অবস্থামাত্র, মৃত্যুও সেইরূপ অবস্থান্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়, সুতরাং এই উৎপত্তিবিনাশশীল দেহের নিমিত্ত কোন্ সুধী ব্যক্তি শোক করিয়া থাকেন? দেহ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিণত হইলেও আত্মা 'অপরিবর্ত্তনীয় এবং অবিনাশী। আত্মাকে দেহী বলিয়া বোধ হইলেও স্বরূপতঃ ইহা অনন্ত এবং অপরিচ্ছিন্ন। এই আত্মাই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, সুতরাং ইহা অনন্ত, অপরিমেয় এবং অব্যয়। যাহা অব্যয়, তাহার কি কখনও বিনাশ হইয়া থাকে? আত্মা চিৎস্বরূপ। এই অসীম চিৎসমুদ্রে অসংখ্য জলবিম্বতুল্য এই যে জীবসঙ্ঘ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা মনের ক্রীড়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। মনই জন্ম গ্রহণ করে, মনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আবার মনই সঙ্কল্পজালে বদ্ধ হইয়া সুখ দুঃখে অভিভূত হইয়া থাকে। লোকে যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ

পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে, মনও সেইরূপ সঞ্চিত বাসনাক্ষয়ের নিমিত্ত দেহ হইতে দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকে। বাষ্পীয় শকটে গমনকালীন পার্শ্বস্থ অচল বস্তুও যেরূপ সচল বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ চঞ্চল মন নানারূপ সঙ্কল্পজাল বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকিলে শান্ত নির্ব্বিকল্প আত্মাতে জগদ্ভ্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন প্রকৃত পক্ষে মনই দেহ হইতে দেহান্তর পরিগ্রহ করিলেও, বোধ হয় যেন আত্মাই জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং আত্মাই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আত্মা অনন্ত অদ্বিতীয় এবং কল্পনারহিত হইলেও, তাহাকে তখন সান্ত, নানা এবং দেহবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

মন সঙ্কল্পরহিত হইয়া প্রশান্ত হইলে, একমাত্র শান্ত নির্ব্বিকল্প আত্মাই বিদ্যমান রহিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তখনই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, এই নির্ব্বিকল্প আত্মা অবিনাশী এবং অনন্ত। অনলও ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ুও ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না, এবং অস্ত্র শস্ত্রও ইহাকে বিদীর্ণ করিতে অসমর্থ। যিনি এইরূপে আত্মতত্ত্ব অবগত হইযাছেন, তিনিই গীতোক্ত কর্ম্মের প্রকৃত অধিকারী। তিনি কাহাকে হননও করেন না, কিম্বা কাহারও কর্ত্তৃক হতও হন না। যাঁহার হৃদয়ে একাত্মবিজ্ঞান দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইযাছে, যিনি এই আত্মবিজ্ঞানরূপ সুদৃঢ় কবচ পরিধান করিতে পারিয়াছেন, সেই মহাত্মাই গীতোক্ত কর্ম্মের প্রকৃত অধিকারী, সেই মহাত্মাই গীতোক্ত কর্ম্ম করিতে সক্ষম। আমাদের যদু, মধু,নিধু, বিধু যে কর্ম্ম করিযা থাকে, গীতোক্ত কর্ম্ম যদি সেইরূপ সহজসাধ্য কর্ম্ম হইত, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের ন্যায শিষ্যের নিকট সেই কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিতে এত অধিক সময ক্ষেপণ করিতেন না। যিনি সমস্ত সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিগতস্পৃহ হইয়াছেন, যিনি কামনারহিত হইয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায স্থিরভাব অবলম্বন করিয়াছেন, সুখ দুঃখ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসমূহ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, যাঁহার বুদ্ধি কেবলমাত্র ব্রহ্মবিষয়িণী, সেই আত্মতৃপ্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই গীতোক্ত কর্ম্মের প্রকৃত অধিকারী। চিত্তশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে কর্ম্ম, তাহা গীতোক্ত কর্ম্ম নহে। নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাদি যে সমুদয় কর্ম্ম, তাহা গীতোক্ত কর্ম্ম নহে।

যাঁহারা বলেন, "অগ্রে কর্ম্ম, তৎপরে জ্ঞান, কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান কোথা হইতে হইবে? সেই জন্যই ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন", আমাদের বিশ্বাস,—তাঁহারা গীতোক্ত কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, গীতোক্ত কর্ম্ম করিতে হইলে অগ্রে আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন।

যিনি আত্মবিজ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই, তিনি কখনই গীতোক্ত কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইবেন না। গীতোক্ত কর্ম্মী হইতে হইলে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া আবশ্যক, এবং যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বিদিতবেদ্য হইয়াছেন, কেবল তিনিই গীতোক্ত কর্ম্ম করিতে সমর্থ।

এইজন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"॥ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা যে পদ লাভ করা যায়, কর্ম্মের দ্বারাও সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি জ্ঞান এবং কর্ম্মকে এক বলিয়া জানেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। এখানে যোগের অর্থ সন্ধ্যা আহ্নিক দান ধ্যান, দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি কর্ম্ম নয়। যোগ কি, তাহা ভগবান্ "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং" এই মহাবাক্য দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কর্ম্মের কৌশলের নামই যোগ। এক্ষণে কর্ম্মের কৌশল কিপ্রকার, তাহাই আমরা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। দুইজনকে কাঁটাল খাইতে বলায় তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, তিনি হাতে ও মুখে তেল মাখিয়া কাঁটাল খাইলেন। এইরূপ করায় তাহার হাতে ও মুখে আটাও লাগিল না, অথচ কাঁটাল খাওয়ার যে সুখ, তাহাও অনুভব করিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মূর্খ, সে কাঁটাল খাইতে যাইয়া হাতে ও মুখে এত অধিক আটা লাগাইল যে, কাঁটাল খাইয়া সুখভোগ করা দূরে থাকুক, আটার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিল। এই সংসারও একটী কাঁটাল স্বরূপ। যিনি জ্ঞানী, তিনিই ইহার সুখভোগ করেন, আর যে অজ্ঞানী, সে সুখভোগ দূরের কথা, আরও বরং সংসারজালে বদ্ধ হইয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে।

যিনি জ্ঞানী, তিনি কি কর্ম্ম করেন না? তিনিও কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনিও স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া গৃহে অবস্থান করেন, তিনিও বিশাল রাজ্যরক্ষা এবং প্রজাবর্গকে পালন করিয়া থাকেন। তিনি তত্ত্বদর্শী বলিয়া কর্ম্ম করিবার কৌশল সম্যক্ রূপে অবগত আছেন, সেইজন্য কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। কিন্তু যিনি অনাত্মদর্শী, তিনিই কেবল "আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভাই, আমার বোন্, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র" এইরূপে আমার আমার চীৎকার করিয়া থাকেন, তিনিই কেবল "কিসে আমার অর্থলাভ হইবে, কিসে আমি সুখে থাকিব, অদ্য আমার এই লাভ হইল, কল্য আমার এত লাভ হইবে, আমি ধনী, অমুক গরিব, অদ্য আমি রাজা উপাধি পাইয়াছি, কল্য আবার মহারাজা উপাধি পাইব" এইরূপে নানা প্রকার সঙ্কল্পজালে অভিভূত হইয়া

কখনও সুখে, কখনও দুঃখে মুহ্যমান হইয়া কাল যাপন করিয়া থাকেন। যাঁহার হৃদয় জ্ঞানালোকে কখনও আলোকিত হয় নাই, তিনিই কেবল কামিনী কাঞ্চন বিষয় সম্পত্তির আশায় উধাও হইয়া চলিয়া থাকেন। মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবার অবকাশ পান না। কিন্তু যিনি তত্ত্বদর্শী, তিনি সংসারের কোন বিষয়েও অভিভূত হন না। তিনি বলেন, "সংসার, তোমাকে আমি বিলক্ষণ চিনিয়াছি। তুমি আর আমার কি করিবে? এখন ত তোমাকে আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনি। এখন কেবল দেখিতেছি, প্রতি পরমাণু, প্রতি পত্র, প্রতি পুষ্প, প্রতিফল, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই এক পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এখন দেখিতেছি,—

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমা।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥
তিনিই অনল, সূর্য্য, বায়ু, নিশাপতি,
তিনি শুক্র, তিনি ব্রহ্ম, জল, প্রজাপতি।

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)

যাহা কিছু দেখিতেছি, এ সমস্তই সেই পরমেশ্বর। সেই আত্মতৃপ্ত যতাত্মা ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, "আমার পিতাও নাই, আমার মাতাও নাই, আমার স্ত্রীও নাই, আমার পুত্রও নাই। কারণ,

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
জাতোভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভঃ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)

তুমিই পুরুষ, তুমিই রমণী,
কুমার, কুমারী তুমি।
স্থবির হইয়া ধরি দণ্ডখানি
ভ্রমণ করিছ তুমি॥

নানারূপ ধরি নানাবিধ নামে
বিশ্বরূপে ভবধর।
লভিছ জনম মহিমা প্রকাশি'
যা কিছু তুমিই সব॥
তুমিই ভ্রমর, তুমিই বিহঙ্গ,
তুমি ঋতু, জলধর।
তুমিই সমুদ্র, অনাদি অনন্ত,
তুমি বিশ্ব চরাচর॥

সেই ব্রহ্মবিৎ তখন বলিযা থাকেন, যখন এ সমস্তই সেই চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুই নয়, তখন আমিও সেই চৈতন্যস্বরূপ। আমিও এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিযা বিদ্যমান রহিযাছি। অতএব

নাহং প্রাণসংজ্ঞো ন বা পঞ্চবাযুঃ
ন বা সপ্তধাতুর্ণ বা পঞ্চকোষঃ।
ন বাক্‌পাণিপাদোন চোপস্থপাযু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপঃ
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিযাণাং।
ন মে বন্ধনং নৈব মুক্তির্ণ ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

(শঙ্করাচার্য্য)

নহি আমি প্রাণসংজ্ঞ, নহি পঞ্চবাযু,
সপ্তধাতু নহি আমি, নহি পঞ্চ কোষ,
উপস্থ অথবা বাক্য নহি পাদ পাযু,
আমি শুধু চিদানন্দ, আমি আশুতোষ।
আমি নির্ব্বিকল্প, মোর রূপ নিরাকার,
আমি বিভু, আছি আমি ব্যাপি চরাচর,
নাহি বন্ধ, নাহি মুক্তি, কি ভয় আমার,
আমি শিব চিদানন্দ, আমি মহেশ্বর।

এই একাত্মবিজ্ঞানই কর্ম্ম করিবার কৌশল। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যাঁহার সংকল্পজাল দগ্ধীভূত হইযাছে, তিনিই কেবল অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে

সমর্থ। কারণ, তিনি জানিয়াছেন যে, তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহাতে পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই, তাঁহার বন্ধনও নাই, তাঁহার মুক্তিও নাই। তাঁহার কোন অভাব না থাকায়, তিনি স্বর্গপ্রদ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কিম্বা সংকল্পমূলক নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম অথবা দুর্গোৎসব, কালীপূজা, প্রভৃতি প্রতিমার্চ্চনরূপ ছেলেখেলা করেন না। তাঁহার তখন করণীয় কিছুই থাকে না। তিনি কেবল সর্ব্বদা আত্মতত্বচিন্তা এবং বোধলিঙ্গেরই পূজা করিয়া থাকেন। তিনি অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক বা হর্ষ প্রকাশ করেন না কিম্বা অনাগত বিষয়েরও আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি কেবল বর্ত্তমানে যে কার্য্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই অনাসক্ত ভাবে করিয়া যান। গীতোক্ত কর্ম্ম করিতে হইলে অগ্রে এই জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। এই একাত্মবিজ্ঞান লাভ করিলে কর্ম্ম করিযা লিপ্ত হইতে হয না। সেইজন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রথমে আত্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি কামনা-রহিত ও মমতাবিহীন হইয়া অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাবিত্রী। টাঙ্গাইল সাধন-সমিতি হইতে শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রভূষণ লাহিড়ী, বি, এ, ১২নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য।০ চারি আনা। ৪১ পৃষ্ঠায় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

সাবিত্রী পুরাণকারের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যাত্রায়, কথকতায়, নাটকে, কাব্যে, বারব্রতে, কতরূপে আমরা 'সাবিত্রীর' পুণ্যদর্শন লাভ করি, তবু যেন আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কারণ, সাবিত্রী হিন্দুরমণীর এক মহোচ্চ আদর্শ। আজ এই ক্ষুদ্রপুস্তিকায় স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনচ্ছলে সাবিত্রীচরিত আবেগময়ী ভাষায় বিবৃত দেখিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। সাবিত্রীচরিত ব্যতীত স্বামী-

স্ত্রীতে তত্ত্ববিষয়ক আর যে সে কথোপকথন আছে, তাহাও অতিশয় মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ। এখানি একখানি উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক।

পাণ্ডুবাস (নাট্যকাব্য) শ্রীফণিভূষণ কাব্যালঙ্কার প্রণীত। ৫৭নং, কলেজস্ট্রীট, বোস্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা।

বঙ্গীয় রাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহলবিজয় অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচিত। 'কৈফিয়তে' প্রকাশক লিখিয়াছেন,—

"তুলনায় সমালোচনা ব্যতীত বাস্তব ধারণা হয় না। বঙ্গের বিজয়কুমার লঙ্কায় যাহা করিয়াছিলেন, সদয়হৃদয় ইংরাজরাজ আজ আবার জাতীয় জীবনের উন্নতির নিমিত্ত তাহাই করিতেছেন। যক্ষরক্ষ বাঙ্গালীর স্থলে হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ বসাও, দেখিবে, আমরা কি উন্নত ছিলাম, কি অধোগতিত্ব লাভ করিয়াছি। আমাদেরই পিতৃপুরুষদিগের আসনে বসিয়া 'পৃথিবীর একপ্রান্তবাসী সুদূর সাগরপারেই' আমাদিগের উন্নতির জন্য কতই না সচেষ্ট। 'ত্রিবিধ কুসুমে মালা গ্রথিত সুন্দর' হিন্দু মুসলমান ইংরাজ জীবনের সদুদ্দেশ্য সাধনে মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া একই প্রেমেশপায় লুটাইতে সক্ষম হইতে কি পারি না ?" গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মহৎ। তিনি সিংহলবাসীদিগকে যক্ষ রক্ষ নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদিগকে হিন্দু মুসলমান এবং বিজেতা বাঙ্গালীকে ইংরাজ বলিয়া ধরিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছেন এবং যেমন বিজয়সিংহের সুশাসনে বাঙ্গালী, যক্ষ ও রক্ষে পরস্পর সম্প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্রূপ ইংরাজ, হিন্দু ও মুসলমানে পরস্পর সম্প্রীতির আশা করিতেছেন।

গ্রন্থকর্ত্তার আদর্শ উচ্চ হইলেও তাঁহার বর্ণিত বিবরণ যে সত্য হইতে অতি দূরবর্ত্তী, তাহা স্বামী বিবেকানন্দের বিলাতযাত্রীর পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হইবে (উদ্বোধন, প্রথম বর্ষ, ৬১১ পৃঃ দেখ)। "একটা ছিল মহা দুষ্টু বাঙ্গালী রাজার ছেলে—বিজয়সিংহ বোলে। সেটা বাপের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ কোরে নিজের মত আরও কতগুলি সঙ্গী জুটিয়ে, জাহাজ করে ভেসে ভেসে লঙ্কানামক টাপুতে হাজির। তখন ওদেশে বুনো জাতের আবাস। তাদের বংশধরেরা এক্ষণে 'বেদ্দা' নামে বিখ্যাত। বুনো রাজা বড় খাতির করে রাখলে, মেয়ে বে দিলে। কিছুদিন ভাল মানুষের মত রইল, তার পর একদিন মাগের সঙ্গে যুক্তি করে, হঠাৎ রাত্রে সদলবলে উঠে, বুনো রাজাকে সর্দ্দারগণ সহিত কতল করে ফেল্লে। তার পর বিজয়সিংহ হলেন রাজা।

স্থুটুমিব এইখানেই বড় অস্ত হলেন না। তারপর আর তাঁর বুনোর মেয়ে বাণী ভাল লাগ্‌লো না। তখন ভারতবর্ষ থেকে আরও লোকজন আর অনেক মেয়ে আনালেন। অনুরাধা বলে এক মেয়ে ত নিজে কল্লেন বিয়ে, আর সে বুনোর মেয়েকে জলাঞ্জলি দিলেন। সে জাতকে জাত নিপাত কর্ত্তে লাগ্‌লেন। বেচারিরা প্রায় সব মারা গেল। কিছু অংশ ঝোড় জঙ্গলে আজও বাস কর্‌ছে। এই রকম করে লঙ্কার নাম হল সিংহল আর হল বাঙ্গালী বদ্‌মায়েসের উপনিবেশ।"

যাহা হউক, গ্রন্থকারের ভাব ও ভাষা অতি সুন্দর। নাটক হিসাবে গ্রন্থখানি উত্তম হইয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ৮ই আশ্বিন তারিখে মেট্রোপলিটান বিদ্যালয় গৃহে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির এক অধিবেশন হয়। স্বামী সচ্চিদানন্দ "কর্ম্মজীবনে বেদান্ত" বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। স্বামী সত্যকাম Song of the Sanyasin নামক স্বামী বিবেকানন্দের কবিতাটীর আবৃত্তি এবং বাবু পুলিন বিহারী মিত্র আধ্যাত্মিক সঙ্গীত করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে প্রশ্নোত্তর হয়। বিগত ১৫ই আশ্বিন সিমলা ষ্ট্রীটস্থ জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে উক্ত সমিতির আর এক অধিবেশন হয়। তাহাতেও স্বামী সচ্চিদানন্দ ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিয়াছিলেন।

অগষ্ট মাসের মধ্যভাগে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ মহীশূরের রাজধানী বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইংরাজী ভাষায় (১) পরে কি হইবে? (২) খ্রীষ্ট কি বৈদান্তিক ছিলেন? এবং (৩) বেদান্ত আস্তিক না নাস্তিক? এই তিনটী বক্তৃতা করেন। এক্ষণে স্বামী আত্মানন্দ বাঙ্গালোরে থাকিয়া তিনটী ক্লাস করিতেছেন। মুদালিয়ারের বাঙ্গালায় একটী,

দেবংখন স্কুলে একটী ও বিবেকানন্দ আশ্রমে একটী। পঞ্চদশী, গীতা প্রভৃতি অধ্যাপিত হইতেছে।

মসলিপাটামের হিন্দুগণ "বিবেকানন্দ মন্দির" নামক একটী মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। তথায় ওঙ্কারের পূজা ও সপ্তাহে দুই দিবস গীতাপাঠ হয়। গত ২৭শে অগষ্ট এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তথাকার হিন্দু সাধারণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া উক্ত দিবস ঐ প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করান। উক্ত স্বামী মসলিপটমে ইংরাজী ভাষায় দুইটী বক্তৃতা দেন (১) সত্য কি? (২) সত্য উপলব্ধি করিবার উপায়।

স্বামী শিবানন্দের তত্ত্বাবধানে বারাণসীস্থ রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। আশ্রমে বৎসরে গড়ে ২ জন করিয়া ব্রহ্মচারী রীতিমত সাধনভজন, পূজাপাঠ ইত্যাদি করিতেছেন। পাঠ্যবিষয়—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ, মহাভারত, গীতা, উপনিষৎ প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত এই আশ্রমের দ্বারা কাশীনিবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে দিন দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার আদর করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই আশ্রমের স্থায়িত্বকল্পে সহায়তা করা উচিত। যাঁহারা এই আশ্রম সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, অথবা আশ্রমের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নঠিকানায় পত্র লিখিতে বা সাহায্য পাঠাইতে পারেন ;—স্বামী শিবানন্দ, রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, খাজাঞ্জীর বাগান, লাক্সা, বেনারস সিটি।

অসুরনাশিনী মার সন্তান আমরা সব।
আজি মহানবমীতে কর্ 'জয় মা মা'
বিজয়ার সম্ভাষণ প্রেমাশ্লেষ সমাপনে।
মিষ্টমুখে বাহিরিব অশিবাসুরদলনে॥

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

ষোড়শ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

শ্রীরঙ্গমস্থ স্বীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যতিপুঙ্গব রামানুজ কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলেন। তৎকালে তদীয় শিষ্য কুরেশ তাঁহার নিকট হইতে চরম শ্লোকের * রহস্যার্থ জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় তিনি কহিলেন, "কুরেশ, মদীয় গুরু শ্রীগোষ্ঠিপূর্ণ আমায় আদেশ করিয়াছেন যে, যিনি একবৎসর কাল অভিমানলেশপরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও নিরতিশয় দাস্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাকেই শ্লোকার্থ দান করিবে; আর কাহাকেও নহে।" সুতরাং, তুমি এক বৎসর কাল উক্ত প্রকারে যাপন কর, তৎপরে আমি তোমায় শ্লোকার্থ দান করিব।" কুরেশ কহিলেন, "হে মহানুভব, জীবন অত্যন্ত অস্থির। কিরূপে জানিব যে, আমায় এখনও এক বৎসর কাল প্রাণ ধারণ করিতে হইবে? অতএব যাহাতে শীঘ্র আমি মন্ত্রার্থে অধিকারী হই, সেইরূপ বিধান করুন।" যতিরাজ তৎশ্রবণে কহিলেন, "শাস্ত্রে আছে, যিনি এক মাস অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন, তাঁহার বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ফল হয়। সুতরাং তুমি একমাস ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন অতিবাহিত কর, কারণ, ভিক্ষান্ন গ্রহণ ও অনশন দুইই সমান।" কুরেশ তদ্রূপ আচরণ করিয়া মাসান্তে শ্লোকার্থ লাভ করিলেন।

তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্য দাশরথিও চরমশ্লোকের রহস্য জানিবার জন্য আবেদন করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস, তুমি আমার আত্মীয় এবং সদ্ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব, সুতরাং তুমি গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট রহস্যার্থ জানিয়া লও, ইহাই আমার ইচ্ছা। আত্মীয় বলিয়া তোমার বহুদোষ থাকিলেও আমি দেখিতে পাইব না। সেই জন্য যাহা কহিলাম, তাহা কর।" দাশরথি মহাপণ্ডিত ছিলেন, এবং বোধ হয় তাঁহার তজ্জন্য কিছু

---

* গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের চরম উপদেশ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

অভিমানও ছিল, সেই হেতুই যতিরাজ তাঁহাকে গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট শ্লোকার্থ জানিতে আদেশ করিলেন।

দাশরথি রামানুজের নিদেশানুসারে গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট গমন করিলেন, কিন্তু ছয় মাস কাল ক্রমাগত গতায়াত করিলেও তিনি তাঁহাকে কৃপা করিলেন না। পরে একদিন অনুগ্রহ করিয়া কহিলেন, "দাশরথে, তুমি আত্মীয় এবং পরম পণ্ডিত, ইহা আমি জানি, কিন্তু ইহা স্থির জানিও, বিদ্যা, ধন ও সৎকুলে জন্মলাভ করিলে ক্ষুদ্রচিত্তেরই মদান্ধতা আইসে, সজ্জনের উক্ত বিষয়গুলি দমের কারণ হইয়া, দোষের পরিবর্ত্তে পরম সদ্গুণের কারণ হয়। ইহা সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুমি নিজ গুরুর পাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ কর। তিনিই তোমায় শ্লোকার্থ দান করিবেন।" এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া দাশরথি অনতিবিলম্বে শ্রীরামানুজ-সন্নিধানে গমন করিয়া সকলই জ্ঞাপন করিলেন। সেই সময় অত্তুলা-নাম্নী মহাপূর্ণের কন্যা তথায় উপস্থিত হইয়া যতিরাজকে এইরূপ নিবেদন করিলেন, "ভ্রাতঃ, পিতা আমায় তোমার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহার কারণ সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি অদ্যই শ্বশ্রূগৃহ হইতে আসিয়াছি। তথায় প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে আমায় রন্ধনার্থ সুদূরবর্ত্তী এক হ্রদ হইতে জল আনয়ন করিতে হয়। পথ দুর্গম ও জনশূন্য সুতরাং ভয় ও শারীরিক ক্লেশে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। একথা আমি গতকল্য শ্বশ্রূকে নিবেদন করায়, সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি কহিলেন, 'বাপের বাড়ি হইতে পাচক আনিতে পার নাই? আমার এমন সংস্থান নাই যে, তোমার জন্য এক চাকর রাখিয়া দি আর তুমি পায়ের উপর পা দিয়া থাক।' ইহাতে মন বড়ই ক্ষুব্ধ হইল এবং আমি কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট চলিয়া আসিলাম ও সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলাম। তিনি কহিলেন, "বৎসে, তোমার ধর্ম্মভ্রাতা রামানুজের নিকট গমন কর। তিনি এই বিষয়ে যাহা উচিত হয়, তাহাই করিবেন।' তদনুসারে আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। এখন কি কর্ত্তব্য হয় বল।"

শ্রীরামানুজ ইহা শুনিয়া অত্তুলাকে কহিলেন, "ভগিনী, তুমি দুঃখ করিও না। আমার নিকট একটি ব্রাহ্মণ আছেন, আমি তোমার সহিত তাঁহাকে প্রেরণ করিতেছি। তিনিই হ্রদ হইতে জল আনয়ন ও সমস্ত পাককার্য্য

সম্পন্ন করিবেন।" এই বলিয়া তিনি দাশরথির দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। গুরুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি সাগ্রহে অতুলার অনুবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহার শ্বশ্রুগৃহে গমন করতঃ অতি যত্নসহকারে ও ভক্তির সহিত পাচকের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এইরূপে ছয় মাস অতিবাহিত হইল। একদা কোনও বৈষ্ণব, শাস্ত্রের একটি শ্লোক লইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাঁহারা অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেছিলেন। দাশরথিও তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি শ্লোকার্থ শুনিয়া বুঝিলেন যে, ব্যাখ্যাকর্ত্তা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা শুনিতেছেন, উক্ত ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করিলে তাঁহাদের অমঙ্গল সম্ভাবনা। অতএব তিনি অর্থের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইহাতে ব্যাখ্যাতা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "মূঢ়, ক্ষান্ত হও, কোথায় শৃগাল আর কোথায় স্বর্গ! কোথায় পাচক আর কোথায়ই বা শাস্ত্র! শাস্ত্রে তোমার অধিকার কি? পাকশালায় গিয়া স্বীয় সামর্থ্য প্রকাশ কর।" মহাত্মা দাশরথি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ না হইয়া ধীরভাবে আপনি ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এরূপ ব্যাকরণসম্মত ও সুচারু বর্ণবিন্যাস দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল যে, সকলে তচ্ছ্রবণে মোহিত হইয়া গেলেন এবং ব্যাখ্যাতা স্বয়ং আসিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন ও কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ন্যায় সুধীবরের এরূপ দাসবৃত্তি কেন?" তিনি তাহাতে কহিলেন, শ্রীগুরুর আদেশ পালনার্থ তিনি পাচক হইয়াছেন। যখন তাঁহারা জানিলেন যে, তিনি যতিরাজ শ্রীরামানুজের দাশরথিনামা পরম পণ্ডিত শিষ্য, তখন তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইলেন ও যতিরাজকে কহিলেন, "হে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মন্, আপনার উপযুক্ত শিষ্য মহানুভব দাশরথিকে আর পাককার্য্যে নিযুক্ত রাখা উচিত নহে। তাঁহার অভিমানের লেশমাত্রও নাই। তিনি সাক্ষাৎ পরমহংসস্বরূপ। অতএব আপনি আদেশ করুন, যেন আমরা তাঁহাকে বহুসম্মানসহকারে আপনার শ্রীপাদমূলে আনয়ন করিতে পারি।" যতিরাজ তাঁহাদের কথা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং তাঁহাদের সহিত গমন করিয়া দাশরথিকে সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে তাঁহাকে শ্রীরঙ্গমে আনয়ন করিয়া চরমশ্লোকার্থ প্রদান পূর্ব্বক চরিতার্থ

করিলেন। দাশরথি বৈষ্ণবসেবা দ্বারা কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি বৈষ্ণবদাস নামে বিখ্যাত।

ইহার পর শ্রীরামানুজ মহাপূর্ণের আদেশক্রমে শ্রীবররঙ্গের নিকট হইতে তামিল প্রবন্ধ পুনরায় পাঠ করিলেন। গোষ্ঠিপূর্ণ, মালাধরনামা কোনও যামুন মুনির শিষ্যকে লইয়া, এই ঘটনার পর রামানুজ সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস, ইনি মহাপণ্ডিত, অস্মদাদির গুরু যামুন মুনির শিষ্য। ইনি "শঠারি সূক্ত" বা শঠারিরচিত "সহস্রগীতি" নামক প্রবন্ধের অর্থ সবিশেষ অবগত আছেন। ইহাঁর নিকট হইতে তৎসমস্ত অধ্যয়ন করিয়া কৃতকৃত্য হও। গুরুবাক্যানুসারে শ্রীমান্ যতিরাজ তদ্রূপ করিলেন। একদা তিনি মালাধরের ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ না করিয়া আপনি নূতন রূপে ব্যাখ্যা করায় উক্ত পণ্ডিতবর শিষ্যের এইরূপ আচরণকে ধৃষ্টতা মনে করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। গোষ্ঠিপূর্ণ লোক-পরম্পরাক্রমে ইহা শুনিয়া মালাধরের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমগ্র সহস্রগীতির সম্যক্ অর্থ রামানুজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তো?" ইহাতে মালাধর যেরূপ ঘটিয়াছে, নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে গোষ্ঠিপূর্ণ কহিলেন, "ভ্রাতঃ, তুমি উঁহাকে সামান্য মানব মনে করিও না। শ্রীযামুনমুনির হৃদ্গতভাব উনি যেমত অবগত আছেন, তদ্রূপ তুমি বা আমি কেহই অবগত নহি। সাক্ষাৎ রামানুজ লক্ষ্মণই রামানুজ নাম গ্রহণ করিয়া জীবহিত-চিকীর্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব উনি যেরূপ অর্থ করেন, তাহা তুমি যামুন মুনির মুখে না শুনিলেও, সাক্ষাৎ তন্মুখবিনিঃসৃত রহস্যার্থের ন্যায় গ্রহণ করিও।" গোষ্ঠিপূর্ণের বাক্যানুসারে মালাধর পুনরায় শ্রীরামানুজ সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যতিরাজ এক দিবস পুনরায় কোন শ্লোকের অন্যার্থ করায় মালাধর তাহাতে বিরক্ত না হইয়া মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করতঃ পরম বিস্মিত হইলেন। শ্লোকের ভিতর যে এরূপ গভীর অর্থ আছে, তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি পরমানন্দে শ্রীরামানুজকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন ও স্বীয় পুত্র সুন্দরবাহুকে তাঁহার শিষ্য করিয়া দিলেন। এইরূপে যতিরাজ মালাধরের নিকট হইতে সহস্রগীতি শিক্ষা করিয়া, শ্রীবররঙ্গের নিকট ধর্ম্মরহস্য উপদিষ্ট হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দেবগানবিশারদ বররঙ্গ যখন শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর সম্মুখে গান ও নৃত্য করিয়া ক্লান্ত হইতেন, শ্রীরামানুজ সেই

সময় তাঁহার পাদসম্বাহনাদি করিয়া ক্লেশ অপনোদন এবং হরিদ্রাচূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লেপন পূর্ব্বক তদীয় শরীরবেদনা দূর করিতেন। প্রতি রজনীতে তাঁহার জন্য স্বহস্তে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আহারার্থ প্রদান করিতেন।

এইরূপে ছয় মাস অতীত হইলে শ্রীবররঙ্গ তাঁহার উপর কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেন। পাদসম্বাহনকালে যতিরাজকে তিনি কহিলেন, "বৎস, তুমি আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ মানসে যে আমার সেবা করিতেছ, ইহা আমি জানি। অদ্য আমি তোমার প্রতি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আইস তোমায় আমি আমার হৃদ্গতভাব নিবেদন করি।" এই বলিয়া তিনি কহিলেন, "বৎস, যাহা কহিতেছি, ইহাই চরম পুরুষার্থ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুরেব পরং ধনম্। গুরুরেব পরঃ কামো গুরুরেব পরায়ণম্॥ গুরুরেব পরাবিদ্যা গুরুরেব পরাগতিঃ। যস্মাৎ তদুপদেষ্টাসৌ তস্মাদ্‌গুরুতরো গুরুঃ। উপায়শ্চাপ্যুপেয়শ্চ গুরুরেবেতি ভাবয়॥ অর্থাৎ গুরুই পরব্রহ্ম, গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠধন, গুরুই সর্ব্ববিধ কাম্য বস্তুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুরুই পরম আশ্রয়, গুরুই ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ, গুরুই শ্রেষ্ঠা গতি। তিনিই সংসারসাগরে তোমার কর্ণধারস্বরূপ বলিয়া তদপেক্ষা গুরুতর আর কেহই নাই। ভগবান্ লাভের উপায়ও তিনি, এবং স্বয়ং ভগবান্‌ও তিনি।" এই রহস্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরামানুজ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। তাঁহার মনের সমুদয় অভাব দূর হইয়া গেল। তিনি অবাপ্ত-সমস্তকাম হইয়া যারপরনাই দর্শনীয় ও পরমানন্দময় হইলেন। "গদ্যত্রয়" নামক মহাগ্রন্থে তিনি নিজ হৃদয়ের সেই বিপুল আনন্দ কথঞ্চিৎ প্রকটিত করিলেন। তাঁহাকে সকলে সেই সময় হইতে সাক্ষাৎ শ্রীরঙ্গনাথস্বামী বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

শ্রীবররঙ্গ নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার এক প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, নাম শোট্টনম্বি। তিনি তাঁহাকে শ্রীরামানুজের শিষ্য করিয়া দিলেন। কাঞ্চি-পূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠিপূর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গ এই পঞ্চ মহানুভব শ্রীযামুন মুনির অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। যতিরাজ ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া শ্রীযামুনাচার্য্যের দ্বিতীয় বিগ্রহ রূপে শোভা পাইতে লাগি-লেন। কারণ, উক্ত মুনিবর আপনার পঞ্চশিষ্যে পঞ্চখণ্ডরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে শ্রীরামানুজবিগ্রহে সেই পঞ্চখণ্ড একীভূত হওয়ায় মুনিবর তথায় পূর্ণাকারে বিরাজ করিতে লাগিলেন। যতিরাজের বিভূতির আতিশয্যই তাহার একমাত্র প্রমাণ। শ্রীভগবানের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার

সহিত বাক্যালাপ করিবার শক্তি তাঁহার বিশেষরূপে ছিল এবং সংসার-দাবসন্তপ্তগণকে শ্রীভগবৎপাদমূলে লইয়া গিয়া তাহাদের যাবতীয় দুঃখাপনোদনের শক্তিও তাঁহার তদনুরূপই ছিল, এই জন্য তাঁহাকে সকলে উভয়-বিভূতিপতি কহিত। তাঁহার প্রীতিসমুদ্ভাসিত বদনকমল দর্শন করিলে চির-সন্তপ্তেরও সন্তাপ দূরে পলায়ন করিত।

ক্রমশঃ।

সামাজিক ছবি।

(নং ২) *

" গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি;
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যথায় নিঠুর হরি।
(প্রাণবঁধূ লাগি আমি যোগিনী হব।"

বে—লি ষ্টেসন প্ল্যাটফরমে তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীদের অপেক্ষা করিবার আড্ডায় বসিয়া একতারার সঙ্গে গাহিতেছিল একটি বৈষ্ণবী। গলাখানি সাধা, মিঠা। বয়স ত্রিশের কম নহে; শ্যামবর্ণা, নাক খাঁদা, মুখ বাঙ্গলা পাঁচের মত, তবে রঙ্গিন কাপড়, রসকলি আর দুটো ভাসা ভাসা চোখে একটা ঢলঢলে মহা চতুর ভাব রূপের অভাব বড় বুঝিতে দেয় না। বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা। বৈষ্ণবী রেল হইতে নামিয়া কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখিয়া যেখানে কতকগুলি হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষ যাত্রী, গাড়ির অপেক্ষায় বসিয়াছিল, সেইখানে আপনার পুঁটলিগুলি রাখিয়া বসিল এবং একতারা বাজাইয়া গান ধরিল,—

"আমি মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হয়ে;
যদি মিলায় বিধি, মম গুণনিধি,
বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে।

---

* নং১ গত মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

আপন বঁধুয়া, আপনি বাঁধিব,
রাখিতে কেবা পারে ;
যদি রাখে কেউ, ত্যজিব এ জীউ,
নারী বধ দিব তারে।"

কয়েকজন স্ত্রীপুরুষ বৈষ্ণবীর দিকে সরিয়া আসিল। বৈষ্ণবী থামিলে একজন বলিল,

"বাঙ্গালীন হৈ, কলকত্তাসে আয়ি ?"

বৈষ্ণবী এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল,"এখানে বাঙ্গালী নাই নাকি ?" পরে প্রশ্নকর্ত্তাকে বলিল, "হাঁ, কলকত্তাসে আয়া, হিঁয়া সাধু বৈরাগী কাঁহা থাকৃতা ?"

লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ রাস্তার অপর পার্শ্বে, ষ্টেশনের ঠিক বিপরীত দিকে, একটি বাগানবাড়ি দেখাইয়া বলিল,

"ও যাঁহা নয়া মোকান্ লাগ রহা হৈ, হুঁয়া যাও ; ও ধরমশালা হৈ।"

বৈষ্ণবী দাঁড়াইয়া সেদিকে দেখিল, পরে লোকটিকে বলিল, "হাম মেয়ে মানুষ হৈ, নেই পছানতা ; তোম হামকো সঙ্গ আকে দেখিয়ে দেও।"

"চলো, অব বেলকো দের হৈ", বলিয়া লোকটি বৈষ্ণবীকে ধর্ম্মশালায় পঁহুছিয়া আসিল।

বড় রাস্তার উপরেই, একটি বৃহৎ কুয়া সম্মুখে, আম, কাঁটাল, পিয়ারা, কলাগাছে ঠাসা, ফুলগাছও যথেষ্ট, নূতন পাকা বাড়ী তৈয়ার হইতেছে, স্থানীয় কোন ধনাঢ্য বৈশ্যদের ধর্ম্মশালা।

বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কারিন্দা খাতাপত্র ফেলিয়া উঠিয়া আসিল, বলিল,—

"মায়ি, আপ হিয়া রহনা চাতি হৈ ?"

"ঘরদোরের মধ্যে ত দেখ্‌ছি সবে একটি দালানে ছাদ হয়েছে, আর সব খোলা, থাক্‌বো কোথায় ? এখানে নিকটে কোন বাঙ্গালী থাকে না ?" বৈষ্ণবী কারিন্দাকে শুনাইয়া 'স্বগত' কহিল।

কারিন্দা বাঙ্গালী শব্দটি বুঝিয়া বলিল, "বাঙ্গালী বাবু হৈ, মেরা মোকান্ কি পাস, আপ হুঁয়া জানা চাতি হৈ ?"

"হাঁ বাপু, হাম মেয়ে মানুষ হৈ, হিঁয়া কাঁহা থাকেগা। কেৎনা দূর হৈ ?"

"কৈ মাইল ভর হোগা। তো এসা করো, হিঁয়া প্রসাদ পাও, ফের কৈ দো তিন বাজে মে ঘরকো যাওগাঁ, তোমকো সাথ লেযাওগাঁ।"

"বেশ, তাই আচ্ছা।"

বৈষ্ণবী প্রাতঃকৃত্যাদি করিতে গেল। ক্রমে আরও তিন জন হিন্দুস্থানী বামায়েৎ সাধু আসিল এবং অনতিবিলম্বে অধিষ্ঠাতার গৃহে পাকাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ পাচক ধর্ম্মশালায় শালগ্রাম পূজা ও অভ্যাগতদিগের জন্য পাক করিতে আসিল। মধ্যাহ্নে পাকশেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে আরও একটি অতিথি আসিলেন, সন্ন্যাসী, দীর্ঘ কেশ শ্মশ্রু, শান্ত কমনীয় মূর্ত্তি, বয়স ৩৫।৩৬, গলা হইতে পা পর্য্যন্ত একটি আলখাল্লা পরা, পায়ে জুতা, সঙ্গে একখানি কম্বল ও একটি কমণ্ডলু। কাবিন্দা সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল এবং একখানি খাটিয়া বাহির করিয়া বসিতে দিল।

বৈষ্ণবী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কাবিন্দা দালানে নিজের দপ্তরের কাছে সন্ন্যাসীকে খাটিয়াতে বসাইয়াছে এবং কি ভিক্ষা করিবেন,জিজ্ঞাসা করিতেছে ; সম্বোধন করিতেছে, কখন 'পরমহংস বাবা' কখন 'মহাপুরুষ' বলিয়া। বৈষ্ণবী অনতিদূরে বৃক্ষতলে যেখানে অন্য সাধুরা বসিয়াছিলেন, সেইখানে নিজের পুঁটলিগুলি রাখিয়া বসিল এবং তাহাদের সঙ্গে আধা বাঙ্গলায় আধা হিন্দিতে আলাপ করিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে দালানের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী কাবিন্দার নানাবিধ ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসীর কোমল ও শান্তিমাখা স্বরে সারগর্ভ ও সরল কথাগুলি শুনিতে পাইতেছিল, কিন্তু একবারও সন্ন্যাসীর চক্ষু দুটীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট দেখিতে পাইল না। বৈষ্ণবী ভাবিতেছিল, "লোকটীর চেহারা দেখে বোধ হয়, কোন বড় ঘরের ছেলে, জ্ঞান, সংযমও বেশ আছে দেখ্‌ছি, কিছু পেয়েছে কি? আচ্ছা দেখা যাক্।" বৈষ্ণবী একতারা লইয়া গান ধরিল।

"বৈরাগ-যোগ কঠিন উধো,
হম ন করব হো!
কৈসে তজব ঐসো দেশ,
জটা মুকুট ধরব কেশ,
অঙ্গ বিভূতি লায় জহর,
খায় মরব হো!
কৈসে ধরব অঙ্গচীর,
মৃগছালা ধরি শরীর,
সুখদ শেজ ছাড়ি ভূঁইয়া
কৈসে পরব হো!

যমুনা জল অতি গভীর,
তনমন নহি ধরত ধীর,
কৃষ্ণ বিরহ লাগি রকক
ডুবি মরব হো।
একতো দুবল গাত,
ভুজে লিখত বিরহ বাত,
সুর শ্যাম দরশ বিনা
প্রাণ ত্যজব হো!"

কারিন্দা কথা বন্ধ করিয়া বৈষ্ণবীর দিকে ফিরিয়া উদ্গ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল এবং "মায়ি বহুত আচ্ছা গাতি হৈ" না বলিয়া থাকিতে পারিল না। অন্য সাধুরা নানাপ্রকারে আপনাদের সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য সত্ত্বেও বৈষ্ণবী পরমহংসটির দৃষ্টি একবারও তাহার দিকে আসিতে দেখিল না।

ওদিকে ব্রাহ্মণ পাক শেষ করিয়া শালগ্রামের ভোগ দিয়া সকলকে প্রসাদ পাইতে ডাকিল। একখানি ঝুপড়ির মধ্যে রান্নাঘর। চৌথার সন্নিকটেই ছাই দিয়া গণ্ডি কাটিয়া পরমহংসকে বসাইল, এবং কিছু দূরে অন্য অভ্যাগতদিগকে এক একটি গণ্ডির ভিতর বসিতে দিল। কারিন্দা পরমহংসের জন্য কিছু দহি ও বরফি আনাইয়াছিল। কারিন্দার বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরমহংস তাহা সকলকে ভাগ করিয়া দিতে বলিলেন!

আহারান্তে সকলে স্ব স্ব আসনে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী দালানে উঠিল। কারিন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "ক্যা মায়ি, কুছ কাহোগি?"

বৈষ্ণবী বলিল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি?"

সন্ন্যাসী খাটিয়ার উপর বসিয়াছিলেন, বৈষ্ণবীর প্রতি নির্ভয়, আশ্বাস-পূর্ণ, শুদ্ধ শান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কহিয়ে মায়ি, ক্যা আজ্ঞা হৈ?"

"আমি হিন্দিতে কথা কইতে পারিনি, বাঙ্গালায় বল্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বেন?"

"কহিয়ে।"

বৈষ্ণবী ভাবিল, লোকটি বাঙ্গালী নাকি? এবং কহিল, "হ্যাঁগা,

এই যে পৃথিবীতে সুখ আছে, যার জন্যে মা ছেলে-অন্ত প্রাণ, যার জন্যে পতি পত্নী পরস্পরের কাছে বাঁধা, যার জন্যে দাতা দান করে, তপস্বী তপস্যা করে, ডাকাত মানুষ মারে, বাঘ শিকার ধোরে তাকে আধমারা কোরে তার সঙ্গে খেলে ও গর্জ্জন করে, এসব ত মানসিক ও শারীরিক সুখ। এ ছাড়া অন্য কোন সুখ আছে ?"

"ইযে জো সুখ শরীর ও মন্‌কি আপনে কহা, উযো বিষয় জন্য অতএব পরাধীন হোনে সে সুখাভাস মাত্র হৈ, সুখ নহি হৈ। উযো কিসি সময় সুখরূপী হৈ, কভি দুঃখরূপী হৈ। উস্‌কো সুখ কহা নহি জা সক্তা হৈ। পরন্তু দুঃখকি নামান্তর মাত্র হৈ। সচ্চা সুখ মন ও শরীরসে নহি পায়া জা সক্তা হৈ। উযো আত্মাহিসে অনুভব হোতা। জব্ ইন্দ্রিয়াঁ আউর মন অপনা নিকৃষ্ট বিষয়বৃত্তি ছোড় কর্, উৎকৃষ্ট আত্ম-গতি প্রাপ্ত হোকর্ শান্ত হোতেহেঁ, তব্ সূর্য্যগ্রহণকালে আকাশমে য্যাসা তারকা দেখাই দেতি, এসাহি আনন্দময় আত্মা অপনা স্বরূপমে প্রকাশিত হোতা। তারকারাজি সদা আকাশমে মহজুদ হৈ, কেবল্ সূর্য্য কি জ্যোতিসে দেখাই নহি পড়তি, এসাহি আনন্দময় আত্মা সবজীবোঁকো হৃদয়মে সদা বিরাজিত হৈ, ইন্দ্রিয়াঁ আউর মনকি মলিনতাকি কারণ, মালুম নহি হোতা। ঐহি যথার্থ সুখস্বরূপ হৈ।"

"সন্ন্যাসী ঠাকুর, বিষয়টি গুছিয়ে ত বেশ বল্লে। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও মনকে শান্ত করে যে সুখ অনুভব হয়, তার প্রমাণ কি ? সে অবস্থাতে আর জড়াবস্থাতে ত প্রভেদ দেখি না। আর যদিই কোনপ্রকার সুখবোধ হয়, সে যে সূক্ষ্ম স্নায়বীয় সুখ নয়, তাই বা কে বল্লে ?"

"আপকা আক্ষেপ সহি হোতি, অগর যে আনন্দরূপী আত্মা অনুভবসিদ্ধ বস্তু নহিঁ হোতা। প্রামাণিক বস্তুমে কল্পনাকা মৌকা নহিঁ হোতি। যথা আপ কহি নহিঁ সক্তি কি আম নাম ফল নহিঁ হৈ, অগর হৈ তো কল্প হৈ, আউর মিঠা নহিঁ হৈ, পরন্তু মিরিচসে তেজি হৈ।"

"বলি ঠাকুর, তোমারত কল্পনা হল। তুমি আম খেয়েছ কি ? না, পুঁথি পড়ে বলছ ?"

মুহূর্ত্তেকের জন্য সন্ন্যাসী নির্ব্বাক্ হইয়া বৈষ্ণবীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "আপকি বঙ্গদেশমে এক কহাবৎ হৈ না কি 'আদ্রক্ কি বণিয়াকো জাহাজকি খবরসে ক্যা মতলব ?"

* * * * *

কারিন্দা একমনে বৈষ্ণবী ও পরমহংসের কথোপকথন শুনিতেছিল। বৈষ্ণবীর কথা প্রায়ই বুঝিতে পারিতেছিল না, কিন্তু পরমহংসের উত্তর শুনিয়া বৈষ্ণবীর প্রশ্নের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল এবং মনে মনে বৈষ্ণবীকে একটা কেহ ঠাওরাইতেছিল। কিন্তু বিষয়সংযোগজনিত অপর সুখের ন্যায় তাহার চিত্তচমৎকারজনক সুখ স্থায়ী হইল না, চকিতে নাশ হইয়া গেল। কারণ, পরমহংসের 'কহাবৎ" প্রহারে বৈষ্ণবীকে বাক্শক্তি-রহিত, নিস্পন্দ ও ভূমিবদ্ধদৃষ্টি পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল।

পরমহংসও পুনরায় নিজ শান্ত অন্তর্মুখী ভাব অবলম্বন করিলেন। কারিন্দা অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বৈষ্ণবীর ঘোর ভাঙ্গে না। গতিক দেখিয়া কারিন্দা বলিল, "মায়ি অব মে ঘরকো যাওগাঁ, আপ ভি চলিয়ে।" বৈষ্ণবী নিঃশব্দে দালান হইতে নামিয়া গেল।

ডান হাতে একতারা, বাঁ কাঁধে পুঁটলি পাঁটলার ঝুলি, ধর্ম্মশালা পার না হতে হতে সিধা রাস্তা ও খোলা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবীর স্বাভাবিক চিত্তচাবল্য, প্রগল্‌ভতা, স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি ফিরিয়া আসিল। সমস্ত পথ নিজের পেটেণ্ট হিন্দিতে কারিন্দার নিকট তাহার প্রতিবেশী বাঙ্গালী বাবুর ঘরের খবর লইতে লাগিল।

উচ্চৈঃস্বরে "চারু বাবু মোকানমে হৈ," বলিয়া কারিন্দা একটি বিনুক্তি সরু গলিতে একখানি পুরাতন দোতালা বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইল। দাসী বারান্দায় দেখা দিয়া বলিল, "বাবুজি অভি দপ্তরসে আয়া নহি।"

"দেখোতো, মায়িজিকো কহো কি এক বাঙ্গালীন মায়ি আয়ি হৈ, আপসে ভেট করনা চাহি হৈ," কারিন্দা বৈষ্ণবীকে দেখাইয়া কহিল।

দাসী ভিতরে চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে সদর দরজা খুলিয়া বৈষ্ণবীকে বাটীর ভিতর আসিতে বলিল। কারিন্দা বৈষ্ণবীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

বাটীর ভিতর ঢুকিয়াই বৈষ্ণবী উচ্চরবে বলিল, "জয় রাধে, কোথায় গিন্নিমা?"

একটি প্রবীণা বিধবা (তাঁহার আচল ধরিয়া একটি ছোট মেয়ে) আসিয়া বৈষ্ণবীকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি ঘরে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে এসেছ গা?"

"এখন ইষ্টিশনের কাছে ধর্ম্মশালা থেকে আস্‌ছি, সকালে রেল থেকে নেবেছি। ধর্ম্মশালায় থাক্‌বার জায়গা নেই দেখে সরকারকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে সে তোমাদের কথা বল্লে, আর এখানে পঁহুছে দিলে। সরকার মানুষটি বেশ বাপু।"

"তা বেশ করেছ, এখানে এসেছ। রাত্রে কি খেয়ে থাক ?" এমন সময় শিশুসন্তান ক্রোড়ে একটি যুবতী আসিল। প্রবীণা তাহাকে বলিলেন, "বৌমা, তুমি এই বষ্টুমদের মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও, আমি চাকুর রুটি করিগে" এবং বৈষ্ণবীর প্রতি "হ্যাঁগা বাছা, তুমি রাত্রে কি খেয়ে থাক ?"

"মা, আমরা ভিখারি, যা পাই তাই খাই, তোমরা যা দেবে, তাই খাব।"

"আমরা কায়স্থ, আমাদের হেঁসেলে খাবে, না, নিজে রাঁধ্‌বে ?"

"তোমাদের হেঁসেলেই হবে।" বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল। প্রবীণা চলিয়া গেলেন।

"তোমাদের বাড়ী কোথায় ?" বৌ জিজ্ঞাসা করিল।

"এখন যেখানে থাকি, আগে ছিল কল্‌কাতায়।"

"তোমরা—আপনারা ?"

"এখন বৈষ্ণব। আমি কুলীন কায়স্থের মেয়ে।"

"হ্যাঁগা, তোমার বিবাহ হয়েছিল ? তুমি বৈষ্ণব হলে কেন ?"

"সে অনেক কথা। এখন বল, তোমাদের বাড়ী কোথা ?"

"আমার শ্বশুরবাড়ী ও বাপের বাড়ী কল্‌কাতারই নিকটে। এখানে আমার স্বামীর চাকরি উপলক্ষে থাকা।"

"চাকু বাবু কত মাহিনে পান ?"

"ষাট টাকা।"

"হ্যাঁগা, তুমি এমন কাহিল কেন ? তোমার ছেলে মেয়ে দুটিই রোগা দেখ্‌ছি। এখানে এমন জল হাওয়া ভাল। কোন অসুখ আছে নাকি ? না, দেশের রোগ যা, অল্প বয়সে সন্তান হওয়া, তোমাদেরও তাই ?

বৌ সলজ্জ ভাবে বলিল, "না, এমন কোন অসুখ নেই, তবে অল্প বয়সে মা হয়েছি বটে।"

"আহা দেখ দেখি বোন, এমন সুখের জীবন, সুখের ঘরকন্না, অল্প

বয়সে বিয়ের জন্য সবই যেন এককলসী দুধে এক ফোঁটা চোনা পড়ার মত হয়েছে। তোমার শরীর খানি যেন কচি বাঁশে ঘুন ধরেছে। ছেলে মেয়ে দুটি যেন অপুরুষ্টু বরেশখি বাচ্ছা। আজ লিভর, কাল পীলে, পরশু পেটের ব্যামো, ভাবনায় ভাবনায় হাড় কালি। না আছে রাত্রে ঘুম, না হয় দিনে খাওয়া। ভেবে দেখ দেখি, বয়সে সন্তান হলে, কি সুখের হোতো—" বহির্দ্বারে শব্দ হইল, "কেওয়াড় খোল দেও।" বৌ ডাকিল, "গঙ্গাকি মায়ি, বাবু আয়া, কেওয়াড় খোল দেও।" দাসী গিয়া দরজা খুলিয়া দিল; চারু বাবু উপরে গেলেন। বৌ বৈষ্ণবীর কাছে বিদায় লইল, "এখন আসি, আবার আস্‌বো।" দাসী বৈষ্ণবীর ঘরে আলো লইয়া আসিল এবং তাহার শয্যা করিয়া দিল।

বৌ চারু বাবুর খাবার উপরে লইয়া গেলে, প্রবীণা বৈষ্ণবীর ঘরে তাহাকে খাবার আনিয়া দিলেন, কিছু বিলম্বে স্বামীকে খাওয়াইয়া বৌ বৈষ্ণবীর কাছে আসিল এবং প্রবীণাকে বলিল, "পিসীমা, তুমি যাও, আহ্নিক করগে, আমি এখানে বস্‌ছি।" প্রবীণা চলিয়া গেলেন।

বৈষ্ণবী বলিল, "উনি তোমার পিস্‌শাউড়ি, আমি ভেবেছিলাম তোমার শাশুড়ি।"

"না, আমার শাশুড়ি একটি পাঁচ বছরের ছেলে ও একটি দুমাসের মেয়ে রেখে মারা যান। পিসীমা কড়ে রাঁড়, ভাইয়ের বাড়ীতেই থাক্‌তেন, ভাইয়ের ঘরের গিন্নি হয়ে ছেলে মেয়ে দুটি মানুষ করেন। উনিই আমাদের সংসারের লক্ষ্মী।"

"বটে, তোমার ননদ আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় বিবাহ হয়েছে?"

"তার বিবাহ হয়নি।"

"বিবাহ হয়নি! কেন?

"সে অনেক কথা, অন্য এক সময় বল্‌বো। এখন আসি। পিসীমা এই ঘরেই এসে শোবেন।"

বৈষ্ণবী ভাবিল, "মন্দ নয়, হয়ত কোন ইতিহাস আছে!"

পরদিন প্রাতে চারু বাবু বৈষ্ণবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কত দিন এই বেশ নিয়েছেন?"

"প্রায সাত বৎসব হল।"

"আপনাদের আখড়া কোথায ?"

"আমি কোন আখড়ার নই, এমনি ঘুবে বেড়াই।"

"আপনা আপনিই এই আশ্রম নিযেছেন ?"

"হাঁ।"

"বটে। আপনাকে পূর্ব্বাশ্রমেব কথা কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি ?"

"তা জেনে আব কি হবে ? এখন বাধাকৃষ্ণ বলে পথে দাঁড়িযেছি। ঝড়ের পাতার মত এখানে ওখানে যাই, এই আমার জীবন।"

"আপনি লেখাপড়া জানেন ?"

"জানি।"

"এদেশে এসেছেন, যাবার উদ্দেশ্য কোথায ?"

"বদ্রীনাথ যাব।"

"এখানে কিছুদিন থাকুন না !"

"আপনাবা রাখেন ত থাক্‌বো।"

"বেশ ; আপনাব যত দিন ইচ্ছা থাকুন।" এই বলিয়া চারু বাবু স্নানাদি করিতে গেলেন।

চারু বাবু আপিসে চলিযা গেলে, যে সময় বৈষ্ণবী স্নান করিতেছিল, চারু বাবুর চার বৎসরেব মেযে সুহাসিনী বৈষ্ণবীব একতারা লইযা পিসীমার কাছে উপস্থিত। পিসীমা বামালসহিত চোবকে বৈষ্ণবীর কাছে আনি-লেন। বৈষ্ণবী হাসিযা বলিল, "বৈষ্ণবী হবে ? এস রসকলি পরিয়ে দি।" পিসীমা বলিলেন, "সুহাস তোমাব কাছে গান শুন্‌তে চায়।"

বৈষ্ণবী একতাবা লইযা গাহিতে বসিল।

"রাধা নামের হাট বসেছে, তাই এসেছি শুনে,

(ঘবে মন কি মানে)

আমার বাধা মন্ত্রেব উপাসনা স্থির হতে পারিনে।

রাধা নামেব কি মাধুরী, ভুলিল যত পুরুষ নারী,

তারা চলেছে সব সারি সারি হরি সংকীর্ত্তনে।

(জয রাধে শ্রীরাধে বলে)

রাধা নামে পাতক কাটে, নিতাই বিলাচ্ছেন প্রেম হাটে মাঠে,

আবার যে পেলে সে নিলে লুটে, অধম চণ্ডাল জনে।

বৈষ্ণবীর কোকিল ঝঙ্কার শুনিয়া পার্শ্বের দুতিন বাড়ীর মেয়েরা আসিল। পিসীমা ও বৌ ত বিস্মিত ও মোহিত। আগন্তুকদের হিন্দুস্থানী দেখিয়া বৈষ্ণবী আবার ধরিল।

"মেরে গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোই,
জাকে শির মোর মুকুট মেরো পতি সোই।
আঁখিরন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম বেল বোই,
অবতো বাত ফৈল গই জানে সব কোই।
সাধুন সঙ্গ বৈঠি বৈঠি লোক লাজ খোই,
দধিমথ ঘৃত কাঢ় লীন ছাচ পিবে কোই।
ছোড় দই কুলকী লাজ ক্যা করেগা কোই,
দাস মীরা শরণ আই হোনী হোসো হোই॥

বৈষ্ণবী থামিলে বৌ বলিল, "পিসী মা, কাল সরলাকে গান শুনতে ডাক্‌লে হয়।"

পিসী। "বেশ ত"।

বৈষ্ণবী বলিল, "নিকটে বাঙ্গালী আর কেউ আছে নাকি?"

বৌ। নিকটে এক ঘর আছে। সমস্ত বে—লি সহরে অনেক বাঙ্গালী আছে।"

সেই দিন আহারান্তে বৈষ্ণবী বৌকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একটী মেয়েকে রান্নাঘরের ভিতর লুকুতে দেখ্‌লুম, ওটী তোমার ননদ নাকি?"

"হ্যাঁ। ও বড় লাজুক, নূতনলোকের সম্মুখে বেরুতে পারে না।"

"তা ওঁর বে হয়নি কেন?"

"ওর বের সন্ধান কর্‌তে আর টাকা যোগাড় কর্‌তে বয়স অনেক হয়ে গিয়েছিল—প্রায় ষোল বছর। কিছু গহনা ও টাকা কম দেবার কথাতে তারা বর তুলে দিলে যে, ওর স্বভাব খারাপ হয়ে গিয়েছে। শেষে এমন মুস্কিল হলো! ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে হল, কিন্তু কোন ক্রমেই কোথাও বিবাহের স্থির কর্‌তে পারা গেল না। যেখানে কথাবার্ত্তা হয়, শত্রুরা উড়ো চিঠি বা অন্য কোন উপায়ে বদনাম রটিয়ে দিয়ে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়ে দেয়। এই রকমে ৪।৫ বছর হতে আমার ননদ একদিন গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তে গিয়েছিল। কি ভাগ্যে জান্‌তে পারা গিয়েছিল। না হলে মর্‌তো। তার পর থেকে বের চেষ্টা বন্ধ করে দেওয়া হল।"

"বটে, সেই পুরোণো কাহিনী। পুরুষে যা ইচ্ছে করুক, কোন দোষ নেই, মেয়ের নামে একটু সন্দেহ ওঠাতে পারলে হয়, তাহলেই সমাজ মেয়ের সর্ব্বনাশ করবেন! কি হবে, আমাদের দেশে মেয়েদের পশুত্ব ঘোচেনি, তারা লেখা পড়া জানে না, ভীরুর একশেষ, পুরুষের পাচাটা, কোন উপায়ই হবার জো নেই। মুখটি বুজিয়ে, পুরুষের সায়ে সায় দিয়ে যেতে হয়।

"তুমি কি বল, মেয়ে পুরুষ সমান ?"

"অসমান কিসে ? পুরুষের যে রক্তমাংসের শরীর, মেয়ের কি তা নয় ? পুরুষের যে ইন্দ্রিয়, মন, মেয়ের কি তা নয় ? পুরুষের যে ইচ্ছা, অভাব, সুখ, দুঃখ, আশা, সাধ, মেয়ের কি তা নয় ? মেয়ের স্বভাব খারাপ হয়, পুরুষের দ্বারাই ত! কিন্তু দণ্ড পায় কে ? মেয়ে। আর দণ্ডই বা কেমন ? যাবজ্জীবন জীবন্মৃতত্ব, সমাজের চূড়ান্ত ঘৃণা, যার চেয়ে আর দণ্ড হতে পারে না!"

"মেয়ে গর্ভধারিণী, সমস্ত বংশের কল্যাণ মেয়ের সতীত্বের উপর নির্ভর করে, তাই মেয়ের উপর এত কড়াক্কড়।"

"ও সব জুচ্চুরি কথা। মেয়ে পুরুষের সম্পত্তি, ক্রীতদাসী, 'আমার জিনিসে আর কেউ হাত দিতে পারে না,' পুরুষের এই ধারণা থেকে নিয়মের উৎপত্তি হয়েছে যে, 'স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষকে জানতে পারবে না।' বংশের কল্যাণের জন্য পুরুষের যতটা সতীত্বের দরকার, মেয়ের তার বেশি নয়। পুরুষ আইনের কর্ত্তা কি না, তাই নিজের কোলে ঝোল টেনেছেন। নিজেদের বেলা স্বেচ্ছাচার, মেয়েদের বেলা কড়াক্কড় নিয়ম। ন্যায়ের দিক থেকে হলে, মেয়ে পুরুষের একই নিয়ম হত। বোঝ না, পুরুষের বৈধব্য নেই, আশি বছরের বুড়ো পর্য্যন্ত দশবার বিয়ে করতে পারে, আর পাঁচ বছরের মেয়ে বিধবা হলে, তার আর বিয়ে হবার জো নাই! অবিচারের দৌড়টা একবার দেখ দেখি!"

"তুমি কি বল বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত ?"

"উচিত নয় ? বিধবারা কি অপরাধ করেছে যে, যাবজ্জীবন সংসারের সুখে বঞ্চিত থাকবে ? পুরুষের কি অধিকার আছে যে, মেয়েদের জ্যান্তে মরা করে রাখে ?"

"দেখ, সরলাও বলে, বিধবার বিয়ে হওয়া উচিত। সে বেশ লেখা পড়া জানে। মেম টিচার রেখে তার স্বামী তাকে ইংরেজি শিখিয়েছে। ছেলে পুলে হয় নি। স্বামী বড় চাকরী করে, সংসারে বেশি কাজ কর্ম্ম

নেই, খুব পড়া শুনা করে। তার সঙ্গে তোমার আলাপ হলে বেশ হবে। আজ তাকে চিঠি দিয়েছি, কাল দুপুর বেলা আস্‌বে।"

"সরলারা ব্রাহ্ম নাকি ?"

"না। সরলার স্বামী দুর্গাদাস বাবু কোন ধর্ম্মের ধার ধারেন না। তবে সরলার মামা ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি সরলাকে মানুষ করেন ও লেখা পড়া শেখান। দুর্গাদাস বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার পাঁচ ছয় বছর পরে সরলাকে বে করেন। দুর্গাদাস বাবু এদিকে লোক মন্দ নন, তবে বেশ্যা আছে, মদও খান। সরলার অন্য সব সুখ থাক্‌লেও স্বামীর স্বভাবের জন্যে বড় মনকষ্ট।"

"মনকষ্ট কর্‌লে কি হবে, আপনার সুখ কি কেউ ছাড়ে ? তা যাক্, এখন তোমার ননদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।"

"আমি কত বল্‌ছি, সে শোনে না। সরলার সঙ্গে তার খুব ভাব। সে যদি কাল আসে, জোর করে ধরে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। এখন বল, তোমার বিয়ে হয়েছিল কি না, আর তুমি এমনই বা হয়েছ কেন ?"

"নেহাৎ শুন্‌বে আমার কাহিনী, তবে ফুল মুটো করে বস! আমি ভরা যৌবনে বিধবা হয়ে একজন পুরুষের জন্য পাগল হয়েছিলুম; সেও খুব ভালবাসা দেখিয়েছিল। পরে আমার বোকামির জন্য বাড়ী থেকে বেরুতে হল আর কি! তার পর এই বৈষ্ণবী হয়েছি। এদেশ ও দেশ ঘুরি; নূতন জায়গা দেখি, নূতন মানুষ দেখি, আপনার মনের স্বচ্ছন্দে থাকি।"

বৌয়ের চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। বৈষ্ণবী হাসিয়া উঠিল, এবং এক-তারা বাজাইয়া গান ধরিল।

"শ্যামের নাগাল পেলুম নালো সই,
কি সুখে আর ঘরে রই।
আমি বনপোড়া হরিণের মত ইতি উতি চেয়ে রই।"

বউ উঠিয়া চলিয়া গেল।

তিব্বতে তিন বৎসর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ধরাবী গ্রামে আমি সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী প্রস্থান করিলাম বটে, কিন্তু সহজে তাঁহার অকপট স্নেহ ও ভালবাসা ভুলিতে পারি নাই। পথে যাইতে যাইতে কেবল ব্রাহ্মণের কথা মনে হইতে লাগিল। আমি যখন ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইলাম, তখন তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, কেবল ছল ছল নেত্রে তিনি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই সকরুণ দৃষ্টি ও কাতর ভাব মনে করিয়া আমারও প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল এবং এক একবার তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু কাহারো স্নেহ ও যত্নে মুগ্ধ হইলে পাছে আমি একাকী স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে না পারি, এই ভাবিয়া আমার মনকে স্থির করিয়া পুনরায় একাকী আমি যে পথে গঙ্গোত্রি গিয়াছিলাম, সেই পথেই নামিতে আরম্ভ করিলাম।

৺গঙ্গোত্রি হইতে ৺কেদার যাইবার দুইটী পথ। ভটারী হইতে বুঢ়া কেদার ও ত্রিযুগীনারায়ণ হইয়া আর একটী পথ উত্তরকাশী হইতে গিয়াছে। গঙ্গোত্রির যাত্রীরা এই দুই পথেই ৺কেদার ও বদরীনারায়ণ দর্শন করিতে যায়। আমাকেও ঐ পথেই যাইতে হইত, কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ পুনরায় আমাকে টীহরীতেই নামিয়া আসিতে হইল। ৺গঙ্গোত্রি যাইবার কালীন আমি টীহরীতে শুনিয়াছিলাম যে, টীহরী ও দেবপ্রয়াগের মধ্যবর্ত্তী ঘোর বনাকীর্ণ অতি নির্জ্জন প্রদেশে একটা উচ্চ পর্ব্বতের শিরোভাগে দাক্ষায়ণী সতীর ৫২পীঠের অন্যতম এক পীঠস্থানে চন্দ্রবদনী দেবী আছেন। ৺চন্দ্রবদনী দেবীর কথা শুনিয়া অবধি মহামায়ার সেই পবিত্র স্থান দর্শন করিবার জন্য আমার মন নিতান্ত উৎসুক হয়। ৺কেদার বদরী দর্শন করিয়া পুনরায় যদি আমি সেই অঞ্চলে আর আসিতে না পারি, তাহা হইলে আর আমার ভাগ্যে চন্দ্রবদনী দেবীর দর্শনের সম্ভাবনা নাই, এই জন্যই আমাকে পুনরায় টীহরী হইতে বিস্তর ঘুরিয়া ৺কেদার বদরীনারায়ণের পথে যাইতে হইল। ৺চন্দ্রবদনী দেবীর দর্শন করিয়া ৺কেদার বদরীনারায়ণে পঁহুছিতে আমার যে সময় লাগিল, ভটারী হইতে তাহার অর্দ্ধেক সময়ে আমি ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া ফিরিতে পারিতাম।

যাহা হউক, আমি উত্তরকাশী হইতে যে পথে গঙ্গোত্রি গিয়াছিলাম, সেই পথেই আবার উত্তরকাশীতে আসিয়া পঁহুছিলাম। এইবার উত্তরকাশীতে পঁহুছিয়াই আমি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলাম। বোধ হয় যাহাকে Hill diarrhœa বলে, আমারও তাহাই হইয়াছিল। হঠাৎ আমার ভয়ঙ্কর ভেদ হইতে লাগিল। কোথায় যাই, কি করি, ভাবিতে লাগিলাম। উত্তরকাশী একটী পরমতীর্থ। ৺কাশীধামের ন্যায় উত্তরকাশীতেও সেই মণিকর্ণিকা, সেই বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা এবং অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির প্রভৃতি থাকায় যাত্রার সময় স্থানটী জনতায় পূর্ণ হয়। হিমালয়ের বিজন প্রদেশে উত্তরকাশী বরহাট্‌কে একখানি গণ্ডগ্রাম বলা যাইতে পারে। বারে বারে গ্রামের বাহিরে যাওয়া অপেক্ষা আমি একেবারে উত্তরকাশী গ্রাম হইতে কিছুদূর গিয়া অতি নির্জ্জনে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী একখানি প্রশস্ত শিলার আশ্রয় লইলাম এবং সম্পূর্ণ রূপে রোগমুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামের বাহিরে সেই লোকসমাগমশূন্য স্থানে থাকাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলাম। দুইদিবস যাবৎ আমার যেরূপ ভয়ঙ্কর ভেদ হইতে লাগিল, তাহাতে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমি আর গ্রামে আসিতে পারিলাম না। দুইদিন অবিরাম ভেদ হওয়ায় আমার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। প্রকৃত গ্রাম হইতে আমি গঙ্গাতীরে এমন একটী নির্জ্জন স্থানে অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছিলাম যে, দুইদিনের মধ্যে আমার সহিত জনমানবের সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু দুই দিন নির্জ্জন বাসের পর রোগমুক্ত হইয়া যেদিন আমি উত্তরকাশীগ্রামে যাইব মনে করিয়াছি, সেই দিন প্রাতঃকালেই একটী মলিনবেশধারী পাহাড়ী সুপুরুষ আমার নয়নগোচর হইল। দুইদিন পরে আমার সহিত মনুষ্যের এই প্রথম সাক্ষাৎ হইল। লোকটী আমার নিকট আসিয়াই আমার সম্বন্ধে সকল কথা এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, যেন সে আমার উপস্থিত বিপদের কথা জানিতে পারিয়াই আমাকে গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া দুইদিন আমি সেই উন্মুক্ত লোকালয়শূন্য স্থানে একাকী কষ্ট পাইয়াছি শুনিয়া তাহার দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং সে কত দুঃখই করিতে লাগিল। তাহার সরল, আন্তরিকতাময়, প্রীতিপূর্ণ আচরণে আমি মুগ্ধ হইলাম। ভাবিলাম কে এ, আমার এই দুঃসময়ে আসিয়া আমার দুঃখে অকপট দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে সুস্থ করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছে। সে অবস্থায়

প্রকৃতই কাহারো সাহায্য ব্যতিরেকে আমার বিশেষ কষ্ট হইত, এবং সত্বর সুস্থ হইয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাত্রা করিতে আমার বিশেষ বিলম্ব ঘটিত।

আমিও ভাবিতেছিলাম যে, এই দুর্ব্বল শরীরে আমি কাহার নিকট যাই, কে আমাকে একটু নেবুর রস দিয়া দুটী ভাত দেয়। কি আশ্চর্য্য! আমাকে আব অধিকক্ষণ এ ভাবনা ভাবিতে হইল না। তাহাকে দেখিযাই আমার সকল ভাবনা দুব হইল। তাহার পর সে আমাকে অতিশয যত্নের সহিত তাহাব কুটীরে লইয়া গেল। গ্রামের এক প্রান্তে একখানি সামান্য কুটীরে তাহার বাস. কুঁড়েখানিতে কযেকটী মাটীব হাঁড়ি কুঁড়ি ও ২।১ খানি প্রস্তরখণ্ড ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমাকে পথ্য দিযা সুস্থ করিবার জন্য সে কিছুক্ষণ পরেই কোথা হইতে নেবু আনিযা আমাকে অতি শীঘ্র চারটী ভাত বাঁধিযা খাওযাইল। আমাকে সুস্থ কবিবার জন্য তাহার যত্নের সীমা ছিল না। আমাকে পথ্য দিয়া সে যে কতদূর আনন্দিত হইল, তাহা স্মরণ করিলেও আমার হৃদয় এক স্বর্গীয ভাবে পূর্ণ হয। সেই সামান্য আড়ম্বরশূন্য কুটীরখানিতে না জানি আমার মত কত অসহায বিপন্ন রোগী পথ্য কবিযা গিযাছে। সেই সামান্য কুটীরের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম। সেই কুটীরেব স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এবং সেই অদ্ভুত পুরুষেব স্বাভাবিক উদারতা ও সপ্রেম ব্যবহাব আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আহারেব জন্য অন্য কোন বাসন ছিল না, দুইখানি স্বভাব-জাত প্রস্তরখণ্ড ভোজনাধার, তাহাতেই আমরা দুই জনে পরমানন্দে ভোজন করিলাম।

যাহার জন্য উত্তবকাশীব সেই সামান্য কুটীর অতি পবিত্র স্থান বলিযা আমার হৃদযে অঙ্কিত রহিয়াছে, সেই হৃদয়বান পার্ব্বতীয পুরুষটী সম্বন্ধে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি যতদূর জানিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, তাহাতেই বুঝিলাম যে, উত্তরকাশীর জনসাধারণ সেই অদ্ভুত পুরুষেব সহৃদয়তার বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত নহে। সেখানকার সকলেই তাহাকে পাগল মনে করিত। উত্তবকাশীর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে তাহার আদি নিবাস। জাতিতে ব্রাহ্মণ, দেখিতে সুপুরুষ, কেবল দেহের প্রতি যথোচিত যত্নের আত্যন্তিক অভাব। তাহার দিব্য দেহের বাহ্য মলিন দশাসত্ত্বেও তাহার স্বাভাবিক শ্রী ও দীপ্তি যেন কিছুমাত্র নষ্ট হয নাই। সদা হাস্যবদন, হঠাৎ দেখিলেই তাহাকে পাগল বলিয়া মনে হইবে। সে যেন সহজে কাহাকেও ধরা দিতে

চাহে না বলিয়াই ঐরূপ পাগলের ভান করিয়া থাকিত। স্বেচ্ছায় সাধারণ লোকের কাছে ঘৃণিত হইবার ইচ্ছাই যেন তাহার প্রবল। স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়াও সে সকল জাতির সহিত আত্মীয়তা করিত এবং বিপদের সময় সকলেরই সেবা করিত। তাহার নিকট কোনো জাতিবিচার ছিল না বলিয়া তাহার স্বজাতীয়েরা তাহার চরিত্রের মহত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে পাগল বলিয়া ঘৃণা করিত। আমি তাহার উন্মত্ততার কোনো চিহ্নই দেখিতে পাই নাই। আমার চক্ষে সে যেন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হইল। সাধারণের নিকট সে অসংলগ্ন প্রলাপবাক্য বলিয়া সময় সময় পাগলের ভান করিলেও আমার নিকট সে একটীও অসংলগ্ন কথা বলে নাই। বরং তাহার প্রত্যেক কথাই অতি সরল ও শিক্ষাপ্রদ বলিয়া আমার মনে হইল।

যাহা হউক, আমি সেই অদ্ভুত পাগলের সেবা শুশ্রূষায় দুই তিন দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ বোধ করিলাম এবং আমার সেই আরোগ্যশালারূপ কুটীর খানি সাধারণের চক্ষে অতি সামান্য ও তুচ্ছ হইলেও আমার চক্ষে তাহা অতি পবিত্র ও মহৎ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমার সেই অসহায় রুগ্নাবস্থার কথা কে তাহাকে শুনাইল? সেই জনমানবশূন্য স্থানে উপস্থিত হইয়া আমার জীবনরক্ষার জন্য কে তাহাকে এত কষ্টস্বীকার করিতে বলিল? কতদূর ব্যথার ব্যথী হইলে যে, সেই রূপে হঠাৎ একজন দুঃস্থ অপরিচিত ব্যক্তির সেবা করিয়া আনন্দিত হওয়া যায়, তাহা যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি বুঝিতে পারিবেন, তদ্ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। আমার বলিয়া নহে, অভ্যাগত পথিক মাত্রেরই সে সেবা করিতে ভালবাসিত, তাহার ভিক্ষার অধিকাংশ ভাগই সে এইরূপে অন্যের সেবায় ব্যয় করিয়া স্বয়ং অতি অল্পমাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত। তাহাকে ভালবাসিয়া যে যাহা দিত, সে তাহাই খাইত। তাহার উদার প্রশান্ত চিত্তে অন্য কোন ভাব স্থান পাইত না।

যাহা হউক, পরিশেষে আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সেই পাগলটী বড় সাধারণ পাগল নহে। এত বুদ্ধি, উদারতা ও প্রেম কি পাগলে সম্ভবে? নির্ব্বিকারচিত্তে যে জীবের সেবা করিয়া মহা আনন্দ অনুভব করে, তাহাকে পাগল বলিয়া যাঁহারা উপহাস করেন, তাঁহারা যে কি, তাহা আমি আজও ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। সামান্য দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে আতিথেয়তা, উদারতা, যে সহানুভূতি ও প্রেম প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার

তুলনা অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজ-প্রাসাদেও নাই। এখনো এই হতভাগ্য দেশের অতি সামান্য নিভৃত কুটীরে নীরবে প্রত্যহ যে মহান্ পবিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার তুলনা কোথায়? ভ্রমণের সময় আমি বহুতর স্থানে ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাইয়াছি। ঐশ্বর্য্যের আগার ইন্দ্রভবনতুল্য ধনীর ভোগবিলাসপূর্ণ উত্তুঙ্গ সৌধমালা দরিদ্রের শূন্য পর্ণকুটীরের বিমল পুণ্যময় জ্যোতিতে চিরনিষ্প্রভ হইয়া রহিয়াছে। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ঐশ্বর্য্যের কিছুই নাই সত্য, কিন্তু সেখানে হৃদয় আছে, দুঃখীর দুঃখ বুঝিবার ও তাহা দূর করিবার জন্য সরল প্রাণে চেষ্টা করিবার লোক আছে। হৃদয়বান্ দরিদ্রব্যক্তি তাঁহার জীর্ণপর্ণকুটীরে ক্ষণেকের মধ্যে যে মহৎ পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা যে, ধনীর ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকাতেও নাই, তাহা চিরপ্রসিদ্ধ। ভারতীয় আর্য্য পর্ণকুটীরের অতুল মাহাত্ম্যে আমরা এখনো জীবিত রহিয়াছি।

প্রয়াগের পর্ণকুটীরে বন্যফলমূলাশী কৌপীনধারী ভরদ্বাজ মুনি স্বীয় তপঃপ্রভাবে রামমাতা কৌশল্যা, রামানুজ ভরত, শত্রুঘ্ন ও অযোধ্যাবাসিগণের সৎকারের জন্য এই মর্ত্ত্যেই যে বিপুল স্বর্গীয় সুখ ও ঐশ্বর্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রনিবাসী উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে সামান্য শক্তুপ্রস্থদানে যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যে পবিত্র যজ্ঞ-ভূমিতে লুণ্ঠিতকায় নকুলের অর্দ্ধাঙ্গ দিব্য কাঞ্চনময় রূপ ধারণ করিয়াছিল, যে যজ্ঞের অতুল মহিমা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকেও নিষ্প্রভ করিয়াছিল, বজ্রাশনিসদৃশকণ্ঠে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিরাট সভায় নকুল যে যজ্ঞের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সভাস্থ সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, ভারতভাগ্যে এখনো সেই পুণ্য ও তপঃপ্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। দরিদ্রের পর্ণকুটীরমাহাত্ম্য এখনো ভারতকে সজীব রাখিয়াছে।

ক্রমশঃ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বামী অখণ্ডানন্দ তিব্বতে অজ্ঞাতভাবে ৩।৪ বৎসর বাস করিয়া যখন কাশ্মিরে উপস্থিত হন, তখন তথাকার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিসবেট সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া লন। ফরেণ অফিস হইতে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান হইবার পর তাঁহার সম্বন্ধে ব্রিটিশ

গভর্ণমেণ্টের সকল সন্দেহ দূর হয় এবং ভারতগভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিব্বতাভিযানে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া রেসিডেন্সির ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার নিকট ঐ কথা উত্থাপিত করেন। নানা কারণে ঐ প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য হয় নাই। যাহা হউক, গভর্ণমেণ্টের রেকর্ড পুস্তকে এখনও ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত রক্ষিত আছে।

বিগত ১২ই কার্ত্তিক রামকৃষ্ণ মিশনের আর একজন সন্ন্যাসী আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। ইঁহার নাম স্বামী সচ্চিদানন্দ। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনি ভারতের নানাস্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং অনেক দিন যাবৎ উদ্বোধন ও প্রবুদ্ধ ভারতের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইনি কালিফোর্ণিয়ায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের কার্য্যের সহায়তা করিবেন।

বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মানন্দ সম্প্রতি শ্রীরঙ্গপট্টম্ ও কোলার নামক দুইস্থানে তিনটী বক্তৃতা করেন। ২টী বক্তৃতা ইংরাজীতে ও একটী হিন্দীতে হইয়াছিল।

উদ্বোধনের পাঠকবর্গ বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতির কথা অবগত আছেন। বাগবাজার অঞ্চলের কয়েকটি যুবক স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর দলবদ্ধ হইয়া স্বামীজির জীবনের আদর্শে জীবনগঠন ও নিঃস্বার্থ ভাবে লোকহিতার্থ কর্ম্ম করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তাঁহারা যে তাঁহাদের চেষ্টায় কি পরিমাণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা এই অঞ্চলের সকলেই অবগত আছেন। প্রতি বাড়ীতে হাঁড়ি রাখিয়া সমিতির সভ্যগণ সপ্তাহে সপ্তাহে চাল সংগ্রহ করেন। এইরূপে প্রায় ১২।১৩ মন চাল সংগৃহীত হয় ও প্রায় ৪০।৫০ ঘর নিঃস্ব ভদ্র পরিবারকে এতদ্দ্বারা সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত সমিতির অনাথ বিদ্যালয়ে প্রায় ১৩।১৪ জন বালক বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে।

বিগত ১৩ই কার্ত্তিক ৪৬নং বোসপাড়া লেনে উক্ত সমিতির প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। সভাস্থলে প্রায় ৪০০ চার শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। বাবু পুলিন বিহারী মিত্র কয়েকটী ধর্ম্মবিষয়ক গান গাহিলে

সমিতির অনাথবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্তোত্রাদি আবৃত্তি করেন। সহকারী সম্পাদক মহাশয় কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এবং সভাপতি স্বামী সারদানন্দ মহাশয় সমিতির উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে দি গ্রেট ইজিপসিয়ান ব্ল্যাক আর্ট এণ্ড ভ্যারাইটি পার্টী কর্ত্তৃক ম্যাজিক ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়া সভাভঙ্গ হয়। সভাস্থলে বীরবাণী ও স্বামী বিবেকানন্দ নামক দুই খানি পুস্তিকা, শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত বিরচিত একটি কবিতা এবং স্বামীজীর হাফটোন ছবি বিতরিত হয়। পর দিবস রবিবার সমিতির অনাথ-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় ডাকঘর সমূহের ডাইরেক্টর জেনেরল মহোদয় সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থ ডাকঘরের মারফতে গবর্ণমেণ্ট কাগজ ক্রয় বিক্রয় করিবার নিয়মাদি বিগত ১লা আগষ্ট তারিখ হইতে অনেকাংশে শিথিল করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ ক্রয় বিক্রয়ের জন্য কোনরূপ ফি বা কমিশন লাগিবে না, উহার সুদের উপর কোন ইনকম ট্যাক্স লওয়া হইবে না এবং সাবালকের পক্ষে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জমা রাখিতে পারা যাইবে। বিশেষ বিবরণ ডাকঘরে দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২য় ভাগ পুস্তকাকারে অতি সুন্দর কাগজে সুন্দরভাবে মুদ্রিত দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। পুস্তকের মূল্য বাঁধান ১।৵০। প্রকাশক শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্ত, ১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।

১৫ই কার্ত্তিক ছুটি হওয়া হেতু ১লা অগ্রহায়ণ ১৯শ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল। আগামী সপ্তমবর্ষে উদ্বোধনগ্রাহকগণকে স্বামী বিবেকানন্দের পত্ররূপ যে অমূল্য উপহার বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে দেওয়া যাইবে, তাহার বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপনের (ক) পৃষ্ঠায় দেখুন।

না। তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি। আমার ঐশ্বরিক যোগসামর্থ্য অবলোকন কর। ৮।

ভাষ্য। কিন্তু ন তু মামিতি। ন তু মাং শক্যসে ন স্বকীয়েন চক্ষুষা মাং বিশ্বরূপধরং শক্যসে দ্রষ্টুমনেন প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা স্বকীয়েন চক্ষুষা যেন তু শক্যসে দ্রষ্টুং দিব্যেন তদ্দিব্যং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুস্তেন পশ্য মে মম যোগমৈশ্বরং ঈশ্বরস্য মমৈশ্বরং যোগং যোগশক্ত্যতিশয়মিত্যর্থঃ। ৮।

ভাষ্যানুবাদ। ন তু মাং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। কিন্তু "প্রাকৃত" স্বাভাবিক এই নিজ চক্ষু দ্বারা "বিশ্বরূপধর" বিশ্বরূপধারী আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না। যে দিব্যচক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে, আমি তোমাকে সেই দিব্যচক্ষু দিতেছি, তদ্দ্বারা আমার "ঐশ্বরযোগ" দেখ। ঈশ্বরস্বরূপ আমার মহান্ যোগশক্তির অতিশয় (অলৌকিক শক্তিসমূহ) দেখ।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়। (হে) রাজন্, মহাযোগেশ্বরো হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমং ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস।৯।

মূলানুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন, হে রাজন্, সেই মহান্ ও যোগীদিগের প্রভু হরি এইরূপ বলিয়া তৎপরে অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন। ৯।

ভাষ্য। এবং তৎ যথোক্তপ্রকারেণোক্ত্বা ততোঽনন্তরং রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ মহাযোগেশ্বরো হরির্নারায়ণঃ দর্শয়ামাস দর্শিতবান্ পার্থায় পৃথাসুতায় পরমং রূপং বিশ্বরূপমৈশ্বরং। ৯।

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইভাবে বলিয়া তৎপরে হে "রাজন্" ধৃতরাষ্ট্র, "মহাযোগেশ্বর"—(ইনি) মহান্‌ও (বটেন) এবং যোগেশ্বরও (যোগ অর্থে এখানে যোগী, তাঁহাদের ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু) (বটেন, এই অর্থে মহাযোগেশ্বর শব্দ এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে) "হরি" নারায়ণ "পার্থকে" পৃথাপুত্র (অর্জ্জুনকে) পরম ঐশ্বররূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ দেখাইলেন। ৯।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়। (কীদৃশং তৎ রূপং ?) অনেকবক্ত্রনয়নং অনেকাদ্ভুতদর্শনং অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবং অনন্তং বিশ্বতোমুখং। ১০—১১।

মূলানুবাদ। (কেমন রূপ দেখাইয়াছিলেন ?) অনেকবদন ও নয়ন পরিপূর্ণ, বহু বিস্ময়কর দর্শন, অসংখ্য স্বর্গীয় আভরণ শোভিত ও অনেক অভ্যুদ্যত দিব্য আয়ুধনিচয়ে পরিশোভিত সেইদেহে দিব্য বস্ত্র ও মাল্য বিদ্যমান ছিল, স্বর্গীয় গন্ধদ্রব্য দ্বারা উহা অনুলিপ্ত, জগতের সকলপ্রকার বিস্ময়জনক বস্তুনিচয় ঐ দেহে বিরাজ করিতেছিল। ঐ দেহ দীপ্তিশালী, উহা অনন্ত এবং বিশ্বতোমুখ। ১০—১১।

ভাষ্য। অনেকেতি "অনেকবক্ত্রনয়নং" অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্ তৎ অনেকবক্ত্রনয়নম্। "অনেকাদ্ভুতদর্শনং" অনেকানি অদ্ভুতানি বিস্মাপকানি দর্শনানি যস্মিন্ রূপে তদনেকাদ্ভুতদর্শনং। তথা "অনেকদিব্যাভরণং" অনেকানি দিব্যানি আভরণানি যস্মিন্ তদনেকদিব্যাভরণং। তথা "দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং" দিব্যানি অনেকানি উদ্যতানি আয়ুধানি যস্মিন্ তং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং। দর্শযামাসেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। কিঞ্চ দিব্যমাল্যাম্বরধরং"দিব্যানি মাল্যানি পুষ্পাণি অম্বরাণি বস্ত্রাণি চ ধ্রিয়ন্তে যেন ঈশ্বরেণ তং দিব্যমাল্যাম্বরধরং। "দিব্যগন্ধানুলেপনম্" দিব্যং গন্ধানুলেপনং যস্য তং দিব্যগন্ধানুলেপনং। "সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং" সর্ব্বাশ্চর্য্যপ্রায়ং দেবং "অনন্তং" নাস্যান্তোঽস্তীত্যনন্তস্তং "বিশ্বতোমুখং" সর্ব্বতোমুখং সর্ব্বভূতাত্মত্বাৎ দর্শযামাস অর্জ্জুনো দদর্শ ইতি বা অধ্যাহ্রিয়তে। ১০—১১।

ভাষ্যানুবাদ। অনেক ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। "অনেকবক্ত্রনয়ন" মুখ ও নয়ন যে দেহে অনেক, তাহাকে অনেকবক্ত্রনয়ন বলা যায়। "অনেকাদ্ভুতদর্শন" যে দেহে অনেক বিস্ময়জনক দর্শনীয় বস্তু বিদ্যমান আছে, তাহাকে অনেকাদ্ভুতদর্শন বলা যায়। "অনেকদিব্যাভরণ" যে রূপে অনেক স্বর্গীয় অলঙ্কার আছে, তাহাকে অনেকদিব্যাভরণ বলা যায়। সেইরূপ "দিব্যানে-

কোদ্যতায়ুধ” অনেক দিব্য অস্ত্র যে দেহে সর্ব্বদা উদ্যত করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাকে দিব্যানেকোদ্যতায়ুধ বলা যায়। এই প্রকার রূপ“দেখাইয়াছিলেন” এই পূর্ব্বশ্লোকস্থ ক্রিয়ার সহিত অন্বয় করিতে হইবে। আরও “দিব্যমাল্যা-ম্বরধর” যে ঈশ্বর দিব্য “মাল্য” পুষ্পরাশি ও “অম্বর” বস্ত্রনিচয় ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে দিব্যমাল্যাম্বরধর বলা যায়। “দিব্যগন্ধানুলেপন” যাঁহার গন্ধানুলেপনও স্বর্গীয়, তাঁহাকে দিব্যগন্ধানুলেপন বলা যায়। “সর্ব্বাশ্চর্য্যময়” সকল প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থে পরিপূর্ণ “দেব” দীপ্তিময় “বিশ্বতোমুখ” অর্থ যে দেহে মুখ সকল দিকেই আছে, তাহাকে বিশ্বতোমুখ বলা যায়। তিনি যে কারণ সকল ভূতের আত্মা, এই কারণে (তিনি বিশ্বতোমুখ) এইপ্রকাররূপ “দেখাইয়াছিলেন” কিংবা অর্জ্জুন এইপ্রকার “দেখিয়াছিলেন” এইপ্রকার ক্রিয়ার অধ্যাহার করিয়া ইহার অন্বয় করিতে হইবে। ১০—১১।

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥১২॥

অন্বয়। যদি দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ তদা সা ভাঃ তস্য মহাত্মনো ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ।১২।

মূলানুবাদ। যদি আকাশে এক সময়ে সহস্র সূর্য্যের প্রভা উত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রভা সেই মহাত্মার দেহের প্রভার সদৃশ হইতে পারে।১২।

ভাষ্য। যা পুনর্ভগবতো বিশ্বরূপস্য ভাস্তস্যা উপমা উচ্যতে দিবি অন্তরীক্ষে তৃতীয়স্যাং বা দিবি সূর্য্যাণাং সহস্রং সূর্য্যসহস্রং তস্য যুগপদুত্থিতস্য যা যুগপদুত্থিতা ভাঃ সা যদি সদৃশী স্যাৎ তস্য মহাত্মনঃ বিশ্বরূপস্য ভাসঃ যদি বা ন স্যাৎ ততোঽপি বিশ্বরূপস্য ভা অতিরিচ্যতে ইতি অভিপ্রায়ঃ।১২।

ভাষ্যানুবাদ। সেই বিশ্বরূপ ভগবানের যে দেহপ্রভা, তাহার উপমা দেওয়া যাইতেছে। “দিবি” এই শব্দটীর অর্থ অন্তরীক্ষে অথবা দ্যোঃ এই নামে প্রসিদ্ধ সর্ব্বোপরি স্থিত তৃতীয় আকাশে; সহস্র সূর্য্য যদি এককালে উত্থিত হয় এবং সেই সহস্র সূর্য্যের রশ্মিনিচয় যদি একসঙ্গে (একস্থানে) উদিত হয়, তাহা হইলে সেই (সহস্র সূর্য্যের যুগপদুত্থিত) রশ্মিনিচয়, সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের দেহের প্রভার যদি সমান হয় অথবা হয়ই না অর্থাৎ তাহা হইতেও বিশ্বরূপের দেহপ্রভা অনেক পরিমাণে অতিরিক্ত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।১২।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥

অন্বয়। তদা পাণ্ডবঃ দেবদেবস্য তত্র শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ একস্থং অপশ্যৎ।১৩।

মূলানুবাদ। সেই সময়ে পাণ্ডব (অর্জ্জুন) সেই দেবদেবের শরীরে নানা প্রকারে বিভক্ত সকল জগৎ একত্র অবস্থিত রহিয়াছে দেখিয়াছিলেন।১৩।

ভাষ্য। কিঞ্চ তত্র তস্মিন্ বিশ্বরূপে একস্মিন্ স্থিতং একস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা দেবপিতৃমনুষ্যাদিভেদৈরপশ্যৎ দৃষ্টবান্ দেবদেবস্য হরেঃ শরীরে পাণ্ডবোঽর্জ্জুনস্তদা।১৩।

ভাষ্যানুবাদ। আরও, সেই বিশ্বরূপ দেবদেব হরির শরীরে সেই সময়ে দেব পিতৃ ও মনুষ্যাদি নানারূপে প্রবিভক্ত সমগ্র জগৎকে "পাণ্ডব" অর্জ্জুন একস্থানেই অবস্থিত দেখিতে পাইয়াছিলেন।১৩।

ততঃ সবিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪॥

অন্বয়। ততঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা স ধনঞ্জয়ঃ কৃতাঞ্জলিঃ সন্ দেবং শিরসা প্রণম্য অভাষত।১৪।

মূলানুবাদ। তাহার পর বিস্ময়াবিষ্ট রোমাঞ্চিতাঙ্গ অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই দেবকে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন।১৪।

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫॥

অন্বয়। হে দেব তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ব্রহ্মাণং ঈশং কমলাসনস্থং সর্ব্বান্ দিব্যান্ ঋষীন্ উরগাংশ্চ পশ্যামি।১৫।

মূলানুবাদ। হে দেব! আমি আপনার দেহে সকল দেবতা, সকল প্রকার জীবগণ, কমলাসনস্থিত ঈশ্বর ব্রহ্মা, সকল দিব্য ঋষি ও উরগগণকে দেখিতেছি।১৫।

ভাষ্য। কথং ত্বয়া দর্শিতং বিশ্বরূপং তদহং পশ্যামীতি স্বানুভবমাবিষ্কুর্ব্বন্ (অর্জ্জুন উবাচ) পশ্যামি উপলভে, হে দেব তব দেহে দেবান্ সর্ব্বান্ তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ভূতবিশেষাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং নানাসংস্থানবিশেষাণাং সঙ্ঘাঃ ভূতবিশেষসঙ্ঘাস্তান্। কিঞ্চ ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখং ঈশং ঈশিতারং প্রজানাং কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেরুকর্ণিকাসনস্থং ইত্যর্থঃ। ঋষীংশ্চ বশিষ্ঠাদীন্ সর্ব্বানুরগাংশ্চ বাসুকিপ্রভৃতীন্ দিব্যান্ দিবি ভবান্ ॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ। কেমন?—তুমি যে প্রকার বিশ্বরূপ দেখাইলে, আমি তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি (এই কথা অর্জ্জুন বলিতেছেন যে) হে দেব, তোমার দেহে সকল দেবগণকে আমি দেখিতেছি (অর্থাৎ) অনুভব করিতেছি। সেই প্রকার আরও সকল "ভূতবিশেষসঙ্ঘ" কে (ও দেখিতেছি) "ভূতবিশেষ" অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক নানা আকারবিশিষ্ট প্রাণিবিশেষ, তাহাদের সঙ্ঘ অর্থাৎ সমূহকে ভূতবিশেষসঙ্ঘ বলা যায়। আরও চতুর্ম্মুখ প্রজাগণের ঈশ্বর ব্রহ্মাকেও দেখিতে পাইতেছি। ঐ ব্রহ্মা "কমলাসনস্থ" অর্থাৎ পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেরুরূপ কর্ণিকাসনে যিনি অবস্থান করেন, তাঁহাকে কমলাসনস্থ বলা যায়। ঐরূপ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এবং বাসুকি প্রভৃতি "দিব্য" স্বর্গীয় উরগগণকে দেখিতে পাইতেছি।১৫।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬॥

অন্বয়। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ অনন্তবাহূদরবক্ত্রনেত্রং অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি তব অন্তং ন পশ্যামি ন মধ্যং ন পুনরাদিং (পশ্যামি)।১৬।

মূলানুবাদ। হে বিশ্বেশ্বর হে বিশ্বরূপ, আমি সকলদিকেই তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তোমার বাহু উদর মুখ ও নেত্র অনেক; তোমার আকার অনন্ত। আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিতেছিনা। ১৬।

ভাষ্য। "অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্" অনেকে বাহবউদরাণি বক্ত্রাণি

নেত্রাণি চ যস্য তব স ত্বমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রস্তমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বা ত্বাং সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র অনন্তরূপং অনন্তানি রূপাণি অস্য ইত্যনন্তরূপস্ত-মনন্তরূপং নান্তং অন্তোঽবসানং ন মধ্যং মধ্যং নাম দ্বযোঃ কোট্যোরন্তরং ন পুনস্তবাদিং তব দেবস্য নান্তং পশ্যামি ন মধ্যং পশ্যামি ন পুনবাদিং পশ্যামি হে বিশ্বেশ্বর হে বিশ্বরূপ। ১৬।

ভাষ্যানুবাদ। "অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্" যে তোমার বাহু উদর মুখ ও নযন সমূহ অনেক, সেই তুমি অনেকবাহূদববক্ত্রনেত্র, তোমাকে অনেক-বাহূদববক্ত্রনেত্র দেখিতেছি "সর্ব্বতঃ" সর্ব্বত্র "অনন্তরূপ" যাহাব রূপেব অন্ত নাই, সে অনন্তরূপ, তোমাকে অনন্তরূপ দেখিতেছি। অন্ত (শব্দেব অর্থ) অবসান, মধ্য (শব্দেব অর্থ) দুইটি সীমার অন্তব প্রদেশ, আমি তোমাব অন্তর দেখিতেছি না, তোমাব মধ্য দেখিতেছি না, তোমার আদিও দেখিতেছিনা, হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ। ১৬।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেযম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং দুর্নিরীক্ষ্যং দীপ্তানলার্কদ্যুতিং অপ্রমেযং সমন্তাৎ পশ্যামি। ১৭।

মূলানুবাদ। আমি তোমাকে সকল দিকেই দেখিতেছি। তুমি কিরীট-ধারী, তুমি গদাপাণি, তোমার হস্তে চক্র, তুমি সর্ব্বদিকে দীপ্তিমান্ তেজো-রাশি, তোমার দ্যুতি সূর্য্য ও অনলের ন্যায প্রদীপ্ত, তুমি কত বড়, তাহার ইযত্তা করা যায না। ১৭।

ভাষ্য। কিরীটিনং কিরীটং নাম শিরোভূষণবিশেষস্তদ্‌যস্যাস্তি স কিরীটী তং কিরীটিনং তথা গদিনং গদা যস্য বিদ্যতে ইতি গদী তং গদিনং তথা চক্রিণং চক্রমস্যাস্তি ইতি চক্রী তং চক্রিণং চ। তেজোরাশিং তেজঃপুঞ্জং সর্ব্বতো-দীপ্তিমন্তং সর্ব্বতো দীপ্তির্যস্যাস্তি স সর্ব্বতো দীপ্তিমান্ তং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং দুঃখেন নিরীক্ষ্যো দুর্নিরীক্ষ্যস্তং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ সমন্ততঃ সর্ব্বত্র দীপ্তানলার্কদ্যুতিং দীপ্তাবনলার্কৌ তযোর্দ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজো

যস্য তব স ত্বং দীপ্তানলার্কদ্যুতিঃ তং ত্বাং দীপ্তানলার্কদ্যুতিং। অপ্রমেয়ং ন প্রমেয়মপ্রমেয়ং অশক্যপরিচ্ছেদমিত্যর্থঃ। ১৭।

ভাষ্যানুবাদ। "কিরীটিনং" (এই শব্দটীর অর্থ) কিরীট (অর্থাৎ) মস্তকের ভূষণবিশেষ; তাহা যাহার আছে, তাহাকে কিরীটী কহা যায়, সেই তাহাকে (এই অর্থে) কিরীটিনং এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই প্রকারে "গদিনং" এই শব্দের অর্থ এই যে, যাহার গদা আছে, তাহাকে, সেইরূপ "চক্রিণং" ইহার অর্থ এই যে, যাহার চক্র আছে,তাহাকে (তোমাকে এইরূপে আমি দেখিতেছি) "তেজোরাশি" অর্থাৎ তুমি তেজঃপুঞ্জ এবং "সর্ব্বতোদীপ্তি-মান্" যাহার সকলদিকে দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার নাম সর্ব্বতোদীপ্তি-মান্, তুমি সর্ব্বতোদীপ্তিমান্ (তোমাকে সেইরূপেই আমি দেখিতেছি) তুমি "দীপ্তানলার্কদ্যুতি" (ইহার অর্থ এই যে) দীপ্ত অনল ও অর্ক (অগ্নি ও সূর্য্য) এই অর্থে দীপ্তানলার্ক এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই দীপ্তানলার্কের ন্যায় যাহার দ্যুতি, তাহাকে দীপ্তানলার্কদ্যুতি বলা যায় (তোমাকে আমি দীপ্তানলার্কদ্যুতিরূপে দেখিতেছি, ইহাই তাৎপর্য্য) "অপ্রমেয়" যে প্রমেয় নহে অর্থাৎ যাহার সীমা নাই, সেই অপ্রমেয়। তুমি অপ্রমেয় (ইহাও আমি দেখিতেছি) ইহাই অর্থ। ১৭।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতোমে॥ ১৮॥

অন্বয়। ত্বং পরমং বেদিতব্যং অক্ষরং। ত্বং অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং ত্বং অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (চ) ত্বং সনাতনঃ পুরুষো মে মতঃ।১৮।

মূলানুবাদ। তুমিই পরম জ্ঞাতব্য 'অক্ষর (অবিনাশি ব্রহ্ম) তুমিই এই বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তুমি অব্যয়, তুমিই সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, আমার বিবেচনায় তুমিই একমাত্র সনাতন পুরুষ। ১৮।

ভাষ্য। ইত এব তে যোগশক্তিদর্শনাদনুমিনোমি ত্বমক্ষরং ন ক্ষরতীতি পরমং ব্রহ্ম বেদিতব্যং জ্ঞাতব্যং মুমুক্ষুভিঃ। ত্বং অস্য বিশ্বস্য সমস্তস্য জগতঃ পরং প্রকৃষ্টং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্ ইতি নিধানং পর আশ্রয় ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ

ত্বং অব্যয়ঃ ন তব ব্যয়ো বিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতঃ নিত্যঃ ধর্ম্মস্তস্য গোপ্তা শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনশ্চিরন্তনস্ত্বং পুরুষঃ পরো মতোঽভিপ্রেতো মে মম। ১৮।

ভাষ্যানুবাদ। তুমি এই যে যোগশক্তি দর্শন করাইলে, ইহা দ্বারা আমি অনুমান করিতেছি যে, তুমি "অক্ষর" যাহার ক্ষরণ হয় না। সেই বস্তু অক্ষর তুমি "পরম" পর (ব্রহ্ম) "বেদিতব্য" অর্থাৎ মুমুক্ষুগণের তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য (পরব্রহ্ম) তুমি এই বিশ্বের অর্থাৎ সমস্ত জগতের একমাত্র পরম "নিধান" যাহাতে পদার্থ সকল নিহিত হয়, তাহার নাম নিধান ; তুমি পর নিধান অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আশ্রয়। আরও তুমি অব্যয় অর্থাৎ তোমার ব্যয় নাই সুতরাং তুমি অব্যয় এবং তুমি "শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা" যে ধর্ম্ম সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। তাহাকে শাশ্বত (অর্থাৎ) নিত্য ধর্ম্ম কহে, সেই শাশ্বত ধর্ম্মের যে রক্ষা করে, সেই শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা এবং আমার অভিপ্রায় এই যে, তুমিই সেই "সনাতন" চিরন্তন পরম পুরুষ (অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম)।১৮।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। অনাদিমধ্যান্তং অনন্তবীর্য্যং অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং পশ্যামি।

মূলানুবাদ। তোমার আদি মধ্য বা অন্ত নাই। তোমার পরাক্রম অনন্ত ; চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার নেত্র ; প্রদীপ্ত হুতাশনই তোমার বদন ; আমি দেখিতেছি যে, তুমি নিজতেজের দ্বারা এই বিশ্বকে তাপিত করিতেছ। ১৯।

ভাষ্য। কিঞ্চ, "অনাদিমধ্যান্তং" আদিশ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ ন বিদ্যতে যস্য সোঽয়ং অনাদিমধ্যান্তঃ তং ত্বামনাদিমধ্যান্তং। "অনন্তবীর্য্যং"ন তব বীর্য্যস্যান্তোঽস্তীতি অনন্তবীর্য্যস্তং ত্বামনন্তবীর্য্যং। তথা "অনন্তবাহুং" অনন্তা বাহবো যস্য তব স ত্বমনন্তবাহুস্তং ত্বামনন্তবাহুং। "শশিসূর্য্যনেত্রম্" শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তব স ত্বং শশিসূর্য্যনেত্রস্তং ত্বাং শশিসূর্য্যনেত্রং চন্দ্রাদিত্যনয়নং পশ্যামি ত্বাং"দীপ্তহুতাশবক্ত্রং" দীপ্তশ্চাসৌহুতাশশ্চ স এব বক্ত্রং যস্য তব স ত্বং দীপ্তহুতাশবক্ত্রঃ

আমেরিকায় দেখিলাম।
রত্নাকরগর্ভস্থ

মায়ের এক মনোহর উদ্যান।

(একখানি পত্র, আমেরিকা হইতে প্রেরিত।)

লস্এঞ্জিলস্; ২৯শে এপ্রিল, ১৯০৪।

পাঠকবর্গ,

অনেক দিন পরে, আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছি। নানাবিধ স্থানে প্রচারকার্য্যে অতীব ব্যস্ত থাকা বশতঃ, সাতিশয় ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনাদিগের দর্শন লাভ করিতে পারি নাই; ক্ষমা করিবেন। অনেক বার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। সকলই তাঁর ইচ্ছা। তিব্বতস্থ কৈলাস, মানস সরোবর, ও হিমাদ্রিশিখরস্থ তুষারক্ষেত্র হইতে আনাইয়া ভারতের "রাজ-প্রাসাদীয় সহরের" কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলেন; তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন তথায় তাঁর কার্য্য যথাসাধ্য করিলাম। পরে, তথা হইতে "সাত সমুদ্র তের নদী" পার করিয়া পৃথিবীর অপর তলে তুলিয়া দিলেন; এখানে আসিয়া দেখি ভীষণ কর্ম্মসমুদ্র। মনে করুন, স্যানফ্রান্‌সিস্কো হইতে এখানে গত মার্চ্চের শেষে আসিয়াছি, সেখানে প্রত্যাগমন করিব সেই জুলাই মাসে, জুলাই মাসে তথায় যাইয়া কবে কখন কাঁহার সঙ্গে দেখা করিব, এবং কবে কখন্ কিনি আসিয়া তথায় আমার সহিত দেখা করিবেন, এ সমস্ত "নোটবুকে" সেই মার্চ্চ মাসেই অর্থাৎ চারি মাস পূর্ব্বে, ঠিক করিয়া টুকিয়া লইতে হইয়াছে। শুধু তাহা নহে, সমস্ত বৎসরের মধ্যে কোথায় কবে কখন যাইয়া কি বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিব, তাহা এক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ঠিক হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাঁহাদের জন্য সপ্তাহে দুই তিন দিবস পৃথক্ রাখিয়া দিয়াছি, এক এক দিবস ১৬ জন হইতে ২৫ জন পর্য্যন্তও আসেন। পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কহিতে হয় যখন কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিব, তখন ঘরে আর কেহ থাকিবে না, ইহাই এখানকার প্রথা। কাহারও সহিত অর্দ্ধ ঘণ্টার উপর সময় অতিবাহিত করিতে পারি নাই। কেন না, আরও পাঁচ জন, দেখা করিবার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা দেখা করিতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক প্রকারের লোক থাকেন, কখনও কখনও তাঁহাদের

মধ্যে খবরের কাগজওয়ালাও থাকেন। এক এক দিন, প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অনবরত লোকজনের সহিত ঐরূপ কথা কহিতে হয়, মধ্যে কেবল দুইবার আহারের জন্য অর্দ্ধঘণ্টা করিয়া এক ঘণ্টা বিরাম পাই। এতই ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে।

অনেকেই ধর্ম্মের উপদেশ লইতে আসেন। কি করি, ঠাকুরের কার্য্য করিতেই হইবে, "নান্য পন্থা অয়নায়"। এ ছাড়া এখন আর আমার গতি নাই। ঠাকুর এই রূপ করাইতেছেন, করিতেই হইবে। ধন্য যে, ঠাকুরের কার্য্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। পরমহংসদেব বিড়াল ছানার উপমা দিতেন, আহা কি চমৎকার! ঠাকুর যেখানে রাখিবেন, সেইখানেই থাকিব; ঠাকুর যাহা করাইবেন, তাহাই করিব; ঠাকুর যেন সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকেন, ঠাকুরকে যেন সর্ব্বদাই মনে থাকে। যেখানে থাকি, যাহাই করি, মা আনন্দময়ি, মা ব্রহ্মময়ি, তোমাকে যেন না ভুলি। ইহাই হইতেছে "কর্ম্মসু কৌশলং". ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে পড়িয়াও, এইরূপে কর্ম্ম করিলে আর কর্ম্মবন্ধনে পড়িতে হয় না। আমার মাকে যদি না ভুলি, আমার ঠাকুরকে যদি না ভুলি, তাঁরা যদি আমার সঙ্গে থাকেন, তাঁরা যদি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরুক থাকেন, তাঁরা যদি আমার হাত ধরিয়া লইয়া বেড়ান, তাহ'লে আর আমার ভয় কি? ইহাই হইতেছে সিক্রেট অভ্ সকসেস্ (Secret of success)। ইহাই হইতেছে, যাবতীয় কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবার একমাত্র উপায়। "ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে", ব্রহ্মই এক মাত্র জয়লাভ করিতেছেন। তাঁহারই জয়, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। "জয়ন্তী মঙ্গলকালী" যাঁর হৃদয়ে সর্ব্বদা, তাঁর জয় সর্ব্বত্র। পাঠকবর্গ, প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করুন, যাতে আপনাদিগের এই ভৃত্য এখানে ঐরূপ ভাবে, ঠাকুরকে সর্ব্বদাই হৃদয়ে রাখিয়া, মা ব্রহ্মময়ীকে না ভুলিয়া, "তাঁহারই কার্য্য করিতেছি, শুভাশুভের ফল তাঁহারই", এইরূপ ভাব সদা মনে জাগরুক রাখিয়া চলিতে পারে।

পাঠকবর্গ, অনেক দিন আপনাদিগকে দেখি নাই, আপনাদিগকে আর কি দিব। সম্প্রতি, মায়ের এক অদ্ভুত উদ্যান দর্শন করিয়া আসিয়াছি, তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস আজ আপনাদিগকে দিতে চেষ্টা করিব। মা ব্রহ্মময়ীর সে অদ্ভুত উদ্যান বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত, কেবল আভাস মাত্র দিতে চেষ্টা করিব। নিজের চক্ষে না নিরীক্ষণ করিলে সে রত্নাকরগর্ভের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও অদ্ভুতত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

সকলেই জানেন, আমেরিকার পূর্ব্বদিকে অতলন্তিক মহাসাগর, এবং পশ্চিমদিকে প্রশান্তমহাসাগর। এই প্রশান্তমহাসাগরের উপকূলে "কালিফোর্ণিয়া" নামক এক প্রদেশ আছে। এখানকার লোকে এই প্রদেশকে কখন কখন "সুবর্ণ-প্রদেশ" বলে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশে প্রথম সুবর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়। তখন হইতে গতবৎসর পর্য্যন্ত "কালিফোর্ণিয়া" জগৎকে ৪,২৭, ৬৫, ৩৮, ০৮৭ টাকার সুবর্ণ প্রদান করিয়াছে। এই প্রদেশের মধ্যে "স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কো" নামক সহরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহর। এই সহর, কলম্বো হইতে জলপথে, প্রায় দশ হাজার মাইল পূর্ব্বোত্তর দিকে অবস্থিত। এখানে "রামকৃষ্ণ মিশনের" এক প্রধান বেদান্ত-সভা আছে। অনেকেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, জগতে যত প্রদেশ আছে, তাহার মধ্যে "কালিফোর্ণিয়া" স্বাস্থ্য ও জল-হাওয়া সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। ইহার দৈর্ঘ্য ৭৭০মাইল ও প্রস্থ২০০মাইল। 'স্যানফ্রান্সিস্‌কো' নামক সহর এই কালিফোর্ণিয়ার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণাঞ্চলে, স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো হইতে প্রায় ৪৮৩ মাইল দূরে, লসএঞ্জিলস নামক আর একটি সহর আছে। এখানেও রামকৃষ্ণ মিশনের একটী বেদান্ত-সভা আছে। লস্‌এঞ্জিলস হইতে ৫৩ মাইল ঠিক দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে 'ক্যাটালিনা' বা 'স্যান্টা ক্যাটালিনা' নামক এক ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী য্যাভেলন নগর ইহার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

• লস্‌এঞ্জিলস্‌ হইতে প্রথমে রেলপথে ২৭ মাইল দক্ষিণে "স্যান্‌পেড্রো" নামক স্থানে আসিতে হয়। ইহাতে এক ঘণ্টা কাল লাগে। ইহা সমুদ্রের উপকূলে। পরে, স্যান্‌পেড্রো হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর জাহাজে করিয়া আসিলে, ক্যাট্যালিনা দ্বীপে য্যাভেলন নামক নগরে পৌঁছান যায়। তাহাতে ২॥ ঘণ্টা কাল লাগে।

প্রশান্ত মহাসাগর, আগে মনে করিয়াছিলাম, যথার্থই বুঝি প্রশান্ত। জাপান হইতে যখন এ দেশে আসি, তখন ১৭ দিন ১৭ রাত্রি এই মহাসমুদ্রের বক্ষে বাস করিতে হইয়াছিল। তখন ইহাকে বিশেষরূপ জানিয়াছিলাম। নামে প্রশান্ত, চরিত্রে মহা দুর্দ্দান্ত। আমেরিকার এক জন প্রসিদ্ধ অর্ণবসেনাপতি সেই জাহাজে আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয়, আপনি ত সকল সমুদ্রেরই খবর রাখেন নিশ্চয়ই, বিশেষ,—অতলন্তিক ও প্রশান্ত এই দুইটি মহাসমুদ্রের, খবরত রাখিবেনই, কেননা, আমেরিকার দুই পার্শ্বে এই দুইটিই সমুদ্র বর্ত্তমান। বলুন্‌ দিকি

মহাশয়, এই দুর্দ্দান্ত মহাসমুদ্রের নাম "প্রশান্ত" দেওয়া হইল কেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "যথার্থই এ মহাসমুদ্র বড়ই দুর্দ্দান্ত বটে; ইহার নাম প্রথমে দক্ষিণ-আমেরিকার এক উপকূলিক নগর হইতে দেওয়া হয়, তথায় এই সমুদ্র যথার্থই প্রশান্ত; সেই অবধি এই সমগ্র মহাসমুদ্রকেই ঐ "প্রশান্ত" নামে ডাকা হয়।

যাহা হউক, এবারে স্যান্‌পেড্রো হইতে এই প্রশান্ত-সাগরে সামান্য আড়াই ঘণ্টার পথ আসিতেই যাবতীয় সাহেব বিবি আবাল-বৃদ্ধ প্রায় সকলেই সকলকার সেই অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত, সমস্তই "আবিষ্কার" করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রশান্ত মহাসাগর কিনা, তাই সকলকেই একেবারে চরম প্রশান্ত অবস্থায় প্রেরণ করিবারই তাঁর কেবল চেষ্টা! কাহারও আর কথাটি কহিবার সামর্থ্য নাই। যিনি যেখানে বসিয়া বা শুইয়া আছেন, তাঁহাকে সেইখানেই ঠিক থাকিতে হইয়াছে, দাঁতে দাঁত দিয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে, মাথাটি নাড়িবার যো নাই, চক্ষু চাহিবার শক্তি নাই, নড়িয়া বসিবার ক্ষমতা নাই, কাহারও মুখে হাত, কাহারও মাথায় হাত, কাহারও বুকে হাত. একটিও কথা কহিবার ভরসা নাই—পাছে এখনই অপদস্থ হইতে হয়; এত যে লোক, কোনও শব্দ নাই। শব্দের মধ্যে, বাহিরে প্রশান্ত মহাসাগরের দুর্দ্দান্ত গর্জ্জনের কোলাহল; আর ভিতরে, কেবল "আবিষ্কারের" হিক্কার, দুইয়ে মিশিয়া এক অদ্ভুত ঐকতান। আমি যে কিরূপ অবস্থায় ছিলাম, তাহা আর আপনাদিগকে বলিব না, তবে, ঠাকুর বিশেষ সহায় ছিলেন বলিয়া আর আবিষ্কার-কার্য্যটা আমাকে দিয়া করান নাই। এত যে কষ্ট, তবু কেহ তথায় যাইতে ছাড়িবে না। যিনি একবার গিয়াছেন, তাঁহার গলায় আবার জগন্নাথের ডুরি পড়িবেই পড়িবে। পাঠক মহাশয়, বলুন দিকিন, কেন?—মহামায়ার সেই অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিবার জন্য। ব্রহ্মময়ীর বিচিত্র লীলা অবলোকন করিবার জন্য। যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি মজিয়াছেন। তাঁহাকে আবার আসিতেই হইবে। আমিও গত বৎসরে একবার আসিয়াছিলাম, কাহাকেও কিছু বলি নাই, আপনাদিগকেও কিছু মাত্র বলি নাই। এ বৎসরে আবার তথায় না যাইয়া থাকিতে পারি নাই, এবং এবারে আর সব কার্য্য ফেলিয়া আপনাদিগকে তথাকার একটু খবর না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

দ্বীপটী যে বড়, তাহা নহে, অতি ক্ষুদ্র একটী দ্বীপ। এ দ্বীপের মাহাত্ম্য কেহ পূর্ব্বে জানিত না। কাব্রিলা নামক স্পেনদেশীয় জনৈক পর্য্যটক ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই ক্যাট্যালিনা দ্বীপ আবিষ্কার করেন। তখন ইহা এক বন্য জাতির আবাস ছিল। কাব্রিলা যখন প্রথম জাহাজ হইতে নামিলেন, সেই বন্য জাতি, তাঁহার প্রতি কোনও প্রকার অসদ্ব্যবহার না করিয়া, সকলে তীর-ধনুক ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল; তাহারা সকলেই তাঁহার আগমনে আনন্দ-ধ্বনি ও নৃত্য করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র দ্বীপ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঐতিহাসিক গল্প আছে। কিন্তু সে সকলের এখন প্রযোজন নাই। এখন আসল কথা বলি।

আমার সঙ্গে প্রায়ই একখানি গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা থাকে। গত ১০ই চৈত্রের প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় লস এঞ্জিলস্ সহর ছাড়িয়া মধ্যাহ্নে প্রায় এক ঘটিকার সময় "ক্যাট্যালিনা" দ্বীপের "য্যাভেলন" নামক নগরে পৌঁছিলাম। এখানে তারিখ ১০ই চৈত্র বলিলাম বটে, ইহা কিন্তু কলি-কাতার তারিখ; এখানকার তারিখ হওয়া উচিত—১২ ঘণ্টা পূর্ব্বে—৯ই চৈত্র।

আমার সময় অতি অল্প; লোকে দিন গণনা করেন, আমার দ্বারা ঠাকুর মিনিট গণনা করাইয়া লযেন। এক মিনিটও সময় আমাকে তিনি সহজে বাজে খরচ করিতে দেন না। সুতরাং জাহাজ হইতে নামিয়াই, অপর এক ক্ষুদ্র জাহাজে উঠিলাম। দুই চারিজন বন্ধু অভ্যর্থনা করি-বার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সেই জেঠি হইতেই কেবল হস্তোত্তোলন প্রভৃতি সাঙ্কেতিক সম্ভাষণ দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হইল। নামিয়া যে হস্তধারণ অর্থাৎ শেক্ হ্যাণ্ডস্ (Shake-hands) প্রভৃতি করিব, তাহার আর সময় পাইলাম না। এক দিনের মধ্যে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, তার পর দিনই লস্ এঞ্জিলস্ আসিয়া, জাহাজের কষ্ট ভুলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই সেখানে বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। অপরাপর যাত্রিগণ, কেহ বা নিজ বন্ধুর আলয়ে, কেহ কেহ বা নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

যে ক্ষুদ্র জাহাজে উঠিলাম, সে জাহাজ সাধারণ ভাবে নির্ম্মিত নহে। সেখানে এরূপ জাহাজকে 'পাওয়ার গ্লাস-বটম বোট (Power Glass-bottom Boat) বলে। "পাওয়ার" অর্থাৎ বাষ্পীয় যন্ত্রের দ্বারা চলে, সেই জন্য;

"গ্লাস-বটম" বলে, কারণ, ইহার তলা কাচ-নির্ম্মিত। আমরা প্রায় ৫০জন উঠিলাম। আমি ছাড়া আর সকলেই সেখানকার ২।৪ দিনের পুরাতন যাত্রী। জাহাজের তলার কাচ; বুঝিতেই পারিতেছেন, সাধারণ কাচ নহে; অতি স্থূল, কিন্তু বড়ই স্বচ্ছ, অত্যন্ত কঠিন, শীঘ্র ভাঙ্গিবার নহে। তত্রাচ, সামুদ্রিক উপদ্রবের দরুন, পাছে কোথাও হঠাৎ পাহাড়-পর্ব্বতে ধাক্কা-ধুক্কি লাগে বলিয়া কাচের চতুঃপার্শ্ব মোটা তক্তার বেড়ার দ্বারা রক্ষিত। সেই বেড়ার শিরোভাগ সমুদ্র-তলাভিমুখীকৃত। সুতরাং দর্শকবৃন্দের কাচাভ্যন্তর হইতে দর্শনের কিছু ব্যাঘাত হয় না। কাচের নিম্নে চতুঃপার্শ্বে বেড়া আছে বলিয়া দর্শকবৃন্দের বোধই হয় না। জাহাজের মধ্যস্থলে এঞ্জিন প্রভৃতি যন্ত্রাগার। সেই যন্ত্রাগারের পশ্চাতে ও সম্মুখে, আন্দাজ চারি হাত চওড়া ও দশ হাত লম্বা, এই মাপের স্থান মাত্র জাহাজের তলা কাচ-নির্ম্মিত। যন্ত্রাগারের উভয় পার্শ্ব দিয়া সরু লম্বা পথ—ঐ কাচ-নির্ম্মিত স্থানে যাইবার জন্য। আমরা প্রায় ২৫ জন ঐ সরু পথ দিয়া যন্ত্রাগারের পশ্চাতে নামিয়া জাহাজের তলে কাচনির্ম্মিত প্রদেশে যাইলাম। অপর ২০।২৫ জন যাত্রী ঐরূপ, যন্ত্রাগারের সম্মুখস্থ অর্থাৎ অপর দিকের, কাচনির্ম্মিত স্থলে যাইলেন।

আমরা যাইয়া সব, বেঞ্চের উপর পা ঝুলাইয়া, বসিলাম; বেঞ্চে সুন্দর মখমলের গদী পাতা। স্থানটী যেমন মধ্যে লম্বা টেবিল পাতা এবং টেবিলের চতুঃপার্শ্বে বেঞ্চ পাতা। কিন্তু, ঐ লম্বা টেবিলের পরিবর্ত্তে আমাদের কাচনির্ম্মিত লম্বা কূপ। কূপের চতুর্দ্দিকে রাবাণ্ডা বা রেলিং দেওয়া। আমরা বেঞ্চের উপর বসিয়া, সেই রেলিঙের উপর হাত রাখিয়া, কূপের ভিতর ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলাম। কূপ, পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, লম্বায় প্রায় দশ হাত, চওড়ায় প্রায় চারি হাত। গভীর প্রায়—আমরা যেখানে পা রাখিয়াছিলাম, তথা হইতে হাত আড়াই, তলা কাচ-নির্ম্মিত—ঠিক জলের উপরেই। কাচ যেন জলকে দাবাইয়া রাখিয়াছে; জল, কাচ ভেদ করিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিবার কতই চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। এই কাচের ভিতর দিয়া মহাসমুদ্রের রত্নাকর দেখিতে লাগিলাম!! ইহারই নাম "গ্লাস-বটম্-বোট্"(Glass-bottom Boat) অর্থাৎ কাচ-তল-পোত। ইহা ছোট বড় নানাপ্রকার কলেবরের আছে। কতকগুলি বাষ্পীয় যন্ত্রের দ্বারা চালিত, কতকগুলি দাঁড় দ্বারা বাহিত হয়। অনেক দেশ-

দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া থাকেন—এই অদ্ভুত "গ্লাস-বটম-বোট" দেখিবার জন্য। যদিও গ্লাস-বটম-বোট জগতে এক নূতন পদার্থ, কিন্তু লোকে কি, কেবল এই গ্লাস-বটম-বোটই দেখিতে আসেন? আমাদের চক্ষু নির্ম্মিত হইয়াছে কেন? কেবল কি চক্ষুরই জন্য? না—এই জগতের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য? গ্লাস-বটম-বোটও নির্ম্মিত হইয়াছে—আর এক জগতের অদ্ভুত বস্তু অবলোকন করিবার জন্য। পূর্ব্বে জানিতাম, রমণীয় কানন সকল কেবল স্থলেই হইয়া থাকে, পরে এখানে আসিয়া দেখিলাম, মায়ের মনোহর কানন জলমধ্যেও আছে। যাহা হউক, পাঠকবর্গ, এই জলধিমাঝে যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার কিছু বলিতেছি। সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা একেবারেই অসম্ভব, কেননা, সে সকল বস্তুর নাম ইহলোকে কেহ জানে না; এবং আমার ভাষাও প্রকাশ করিতে অক্ষম। শুধু তাহাও নহে, দেখিয়া শেষ করা যায় না। সময় অল্প। সেই ক্ষুদ্র জাহাজের ভিতর কাঁচের তলা দিয়া কতকগুলি বস্তু যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তখনই তাহা কাগজে টুকিয়া লইয়াছিলাম। সমস্ত টুকিতে পারি নাই। অতি যৎসামান্য টুকিয়া লইতে পারিয়াছিলাম।

ক্রমশঃ কিনারা হইতে সেই "পাওয়ার-গ্লাস-বটম-বোটে" করিয়া দূর সমুদ্রে যাইতে লাগিলাম। আমরা সকলেই "গ্লাস-বটমের" (কাঁচের তলার) দিকে নিম্নগ্রীব হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। বরাবর, যত দূরে যাইলাম, সমুদ্রের তলা অতি পরিষ্কার রূপে দেখা যাইতেছিল। যেমন কিনারা, তেমনি তলা। কিনারায়ও যেমন বালি ও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শামুক ভাঙ্গা, তলাতেও সেইরূপ। তবে মধ্যে মধ্যে শেওলা। পুকুরে-শেওলার মত নয়। সমুদ্রের শেওলা। সমুদ্র যেমন অতি সুন্দর দেখিতে, শেওলাও তেমনি সুন্দর। স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। সেই সকল শেওলার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য। ক্ষুদ্র বলিয়া, পুষ্করিণীর সফরী মৎস্যের মত ফরফরিয়া বেড়াইতেছে না। ইহারা সমুদ্রে বাস করে, সমুদ্রের মত ধীর। অতি গম্ভীর ভাবে হেলিয়া দুলিয়া নানারকমের রকমারি করিয়া বেড়াইতেছে। লাল, সবুজ, কাল হরিদ্রা, মিশ্রিত প্রভৃতি নানা রঙ্গের মৎস্য।

জাহাজ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে গভীর হইতে গভীরতর জলে যাইতে লাগিল। জলের অভ্যন্তরস্থ দৃশ্যও সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইতে লাগিল।

জাহাজ যেমন দূরে যাইতে লাগিল,জলও সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ বদ্‌লাইতে লাগিল। কিনারার নিকট জল বেশ সাদা ছিল, ক্রমশঃ নীলাভাযুক্ত হইতে লাগিল। নীল হইল বটে কিন্তু স্বচ্ছতার কিছু ব্যাঘাত ঘটিল না। সমুদ্রের তলার গঠন বা ধরণও সঙ্গে সঙ্গে বদলাইতে লাগিল। পূর্ব্বে সমতল ছিল, যত দূরে যাইতে লাগিলাম,সেই সমুদ্রের তলা ঢেউখেলানে হইতে লাগিল, যেন কোদালি দ্বারা খণ্ডীকৃত ক্ষেত্র। নানা প্রকারের ও নানা রঙের মৎস্য-দলও ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। মৎস্যের যেন মেলা। আমরা যেমন বাজারে একটা বড় মাছ আসিলে ভিড় করিয়া দাঁড়াই ও আহারের জন্য ক্রয় করিতে তৎপর হই, মৎস্যেরা তদ্রূপ তথায় যদি একটা নরদেহ পায় ত না জানি কত আহ্লাদ করিয়া থাকে!

ঢেউ-খেলানে জমি হইতে ক্রমশঃ, সমুদ্র-তল ছোট ছোট পাহাড় পর্ব্বতরূপে প্রকাশ হইতে লাগিল। পাহাড়গুলি আমাদের পাহাড়ের মত ঠিক নহে। যেন বড় বড় প্রস্তরপিণ্ড একত্রে সাজাইয়া পাহাড়ের আকারে কেহ করিয়া রাখিয়াছে। প্রস্তরখণ্ডগুলির গায়ে নানারঙ্গের শৈবাল। শুধু নানারঙ্গের নয়, নানা রকমের।

যত দূরে যাইতে লাগিলাম, ততই দৃশ্যের ঘোরঘটা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মনোহারিত্ব অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ নিবিড় জঙ্গল, বৃহৎ পর্ব্বত, বড় বড় বৃক্ষ, বড় বড় মাছ। আবার জঙ্গল একটু পাতলা হইয়া আসিল, পর্ব্বতগুলি ছোট ছোট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ এক অতীব চমৎকার পুষ্পোদ্যানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। নানা প্রকারের ফুল গাছ। গাছগুলি ছোট ছোট নয়। এক এক স্থলে খুব বড় বড় ফুল গাছ, গাছের পাতা ঠিক যেন স্বচ্ছ পাতলা পার্চমেণ্ট কাগজের মত দেখিতে। আকারে অনেকটা শালগাছের পাতার মত। কোথাও কোথাও, তলায় যেন তণ্ডুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে, সে গুলি মস-ফ্লাওয়ার (Moss-flower) বা শৈবালপুষ্প। খুব বড় বড় লাল মাছ, সবুজ মাছ, রূপোলি রঙ্গের,সোণালী রঙ্গের মাছ দেখিলাম; এক একটী মাছ মাঝারি কাতলা মাছের মত বড়। সমুদ্রের ভিতরেও তালগাছ (বিলাতী তাল গাছ) দেখিলাম। তাহার নাম সি-পাম (Sea-palm)। কোথাও ঠিক পলাশ-ফুল গাছের মত বড় বড় ও অতি সুন্দর ফুল গাছের জঙ্গল। কোথাও ছোট ছোট ঠিক মোমের ফুলের মত ফুল

গাছের জঙ্গল। কোথাও ছোট ছোট ঠিক মোমের ফুলের মত ফুলগাছের জঙ্গল। নানা রঙ্গের ফুল। ফুলের সে রঙ্ ও আকৃতি দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। যেন মা নিজে নির্জ্জনে বসিয়া তাঁর সেই চিদ্‌ঘন অঙ্গুলি দ্বারা নিজের মনের মত করিয়া এই মনোহর ফুলগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পাছে নরলোকে স্পর্শ করিয়া সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, সেই জন্যই বোধ হয় মা উহা সমুদ্রগর্ভের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কোথাও অতি সুন্দর অপরাজিতা ফুলের মত সবুজ ছোট ছোট ফুলের গাছ। গাছভরা ফুল। কোথাও কোন কোন গাছে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্পঞ্জ টুকরার মত ফুল। কোথাও সমুদ্রের তলা আবড়ো খাবড়ো, কোথাও অতি পরিপাটীরূপে ঢেউখেলানো। এক এক স্থলে তালের আঁঠির মত যেন কি ছড়ান রহিয়াছে।

বড় বড় ফুলগাছগুলির গোড়া যে মোটা, তাহা নহে, খুব লম্বা, এক-এনে, শাখা-প্রশাখা বিবর্জ্জিত, কেবল পাতা আর ফুল। সেই গাছের গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত কেবল গাত্রে সমান দূরবর্ত্তী এক একটী পাতা, আর প্রতি পাতার গোড়ায় কতকগুলি ফুল। ঐরূপ এক-এনে গাছ এক সঙ্গে দুই তিনটা করিয়া এক এক স্থলে। এক এক স্থলে ঝোপ-ড়ের মত। ঝোপড়গুলিও নেহাত বেঁটে নয়। এক একটি গাছ এমন কি ২০০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা।

এর এক রকম গাছে ঠিক জহরী-চাঁপা ফুলের মত ফুল রাশীকৃত। কোন কোন গাছ দেখিতে যেন ঠিক "গাজি-সাহেব"। খুব লম্বা ও মাথায় খুব বড় চামর। কোন কোন গাছ ঠিক বাবলা গাছের মত। এক একটী গাছ বেল ফুলের কুঁড়ির মত কুঁড়িতে ভরা। এ সব বাহারী গাছের তাকত করিতে হয় না, জল দিতে হয় না। কোনও কষ্ট নাই, কোনও যত্ন নাই; কিন্তু কেমন আশ্চর্য্য ফুলবাগান! এ বাগানের মালী ও মালিক কে জানেন?

এ বাগানের মালীও যে, মালিকও সে। কে জানেন?—মা—মা—মা। এ বাগানের নিয়ম, তন্ত্র প্রভৃতি সবই বিভিন্ন। মায়ের হুকুমে এ বাগান চলে। সে হুকুমও আমাদের হুকুমের মত নহে। সে হুকুম করিতে মুখ দরকার হয় না, কথা দরকার হয় না, ভাষা দরকার হয় না, সে হুকুম জারি কর্‌বারও দরকার হয় না।

পাঠক, বলুন দিকিন্, এ বাগানে, মায়ের এইরূপ মনোহর উদ্যানে কাহারা বাস করে? তাহারা কিরূপ দেখিতে?

মনে করিবেন না যে, জলাশয় বলিয়া তথায় কেবল সাধারণ মৎস্যই থাকা সম্ভব; মনে করিবেন না যে, উহা সমুদ্র বলিয়া তথায় কেবল সীল, হোয়েল, হাঙ্গর, জলহস্তী প্রভৃতি প্রকারের জন্তু থাকাই সম্ভব।

অবশ্য যে সকল প্রাণী সামুদ্রিক উদ্যানমধ্যে দেখিলাম, তাহাদিগকে জল-জন্তু বলিতে পারা যায়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জল-জন্তু।

এক প্রকার জীব দেখিলাম, তাহাদিগকে "সি-হেয়ার" (Sea-hare) বলে। দেখিতে ঠিক ছোট খরগোশের মত। কিন্তু বোধ হয় ইহারা অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিবান। কেননা, থাকে থাকে, হঠাৎ সমস্ত শরীর ভিতরে ঢুকাইয়া তাল গোল পাকাইয়া ঠিক একটী লাড্ডুর মত হয়ে যায়; আবার, যখন সমস্ত শরীর বাহির করে, তখন ঠিক একটি ছোট খরগোশের মত হয়।

খানিক ক্ষণ বাদে আর এক স্থলে দেখিলাম, কতকগুলি মৎস্য মাটির উপর লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতেছে। লম্বভাবে (মৎস্যেরা যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে) যে লাফাইয়া যাইতেছে, তাহা নহে। ঠিক খাড়া ভাবে।

নানা প্রকারের কর্কট দেখিলাম। তাহার মধ্যে দুই প্রকারের নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, কর্কটবিদ্বেষিগণ ক্ষমা করিবেন। এখানে Crab-salad (অতি ঈষৎ টক্ দিয়ে কাঁকড়া) হচ্ছে এক উপাদেয় Dish। এক প্রকারের নাম "Hermit-Crab" অর্থাৎ পরিব্রাজক-কর্কট। ইহারা পীঠে বাটী বা আবাস-স্থান লইয়া বেড়ায়। ঘাড়ের কাছে পৃষ্ঠ বাস্তবিকই একটা বড় ঝিনুক। ঝিনুকগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। কাঁকড়াগুলিও ততোধিক সুন্দর।

আর এক প্রকার; তাহার নাম "Sea Rock crab" অর্থাৎ সামুদ্রিক পার্ব্বতীয় কর্কট। যেমন আমাদের দেশে কাশ্মীরী লোক দেখিতে অতি সুন্দর, তেমনি কর্কটরাজ্যের মধ্যে 'সি রক ক্র্যাব' অতীব সুন্দর। ইহার মাথায় একটী অতি সুন্দর মটুক, কখন ঢুকছে, কখন বাহির হইতেছে, ঠিক্ যেমন, ময়ূর মধ্যে মধ্যে পুচ্ছগুলি প্রসারণ করিয়া "প্যাকম্" ধরে, আবার মধ্যে মধ্যে সে গুলি সঙ্কুচিত করিয়া

নয়। চক্ষুর উপরে একটী ঢাকুনি আছে, রক্ষাবরণের মত। দেখিতে ঠিক যেন জানালার গ্রীশিয়ান টব্। সেই রক্ষাবরণগুলিও দেখিতে অতি সুন্দর।

মাকড়সাও সেই জলের ভিতর নানাপ্রকারের দেখিলাম। লাল, পীত, সবুজ, মিশ্রিত রঙের, বাহারী, নক্সাকাটা প্রভৃতি নানা প্রকারের।

চিংড়ি মাছও নানা রকমের ও নানা রঙের। এখানে চিংড়ি মাছেরও স্যালাড্ (ঈষৎ টকের এক রকম তরকারি) অতি উপাদেয়। তবে সে সকল চিংড়ি মাছ অতি সাধারণ। এ সকল চিংড়ি মাছ নরলোকভোগ্য নহে।

শশা—গাছেই হইয়া থাকে, এবং অচেতন ফলের মধ্যেই গণ্য, এই জানিতাম। কিন্তু এখানে সমুদ্রের ভিতর দেখিলাম 'শশা' চেতনও হইয়া থাকে এবং জলে আপনা হইতে জন্মায় বিনা গাছের সাহায্যে। ইহাকে "সি কিউকম্বর্" (Sea Cucumber) অর্থাৎ সামুদ্রিক শশা বলে। ইহা এক প্রকার মাছ, ঠিক শশার মত দেখিতে।

তারপর, "স্যান্ ড্যাব" (Sandab Fish)। ইহার গায়ে নানা প্রকার ছিটের মত নক্সা। সেই সকল নক্সাও নানা রঙের।

"Opal-eyed Fish" ওপাল আয়েড ফিস্। ইহার চক্ষু ঠিক Opal অর্থাৎ মাণিকের মত। নানা রঙের চক্ষু—ভিন্ন ভিন্ন মাছের চোখে ভিন্ন ভিন্ন রঙের মাণিক।

"Electric Fish" (ইলেক্ট্রিক ফিশ্) অর্থাৎ "তড়িৎ-মৎস্য"। এই মাছগুলি দেখিতে খুব বড় বড় পায়রা-চাঁদা মাছের মত। কিন্তু গায়ে সব বিন্দু বিন্দু দাগ। সেই সকল বিন্দু হইতে নানা রঙের আলো (ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক) বাহির হইতেছে।

একটা মাছ দেখিলাম, খুব বড় কাতলামাছের মত; গায়ে নানা রকম রঙ্।

আর একটা মাছ, ঠিক ভেড়ার মত তার মুখ ও দাঁত। ইহাকে "Sheep-Fish" (শীপ্-ফিশ্) বলে, অর্থাৎ মেষ-মৎস্য।

নানা রঙের ও আকৃতির বড় বড় ঝিনুক ও শামুক সমুদ্রের তলায়, পাহাড়ের গায়ে ও গাছের গায়ে রহিয়াছে।

কলম ত, সাধারণতঃ, হংসাদির পালকেই হইয়া থাকে, এবং তাহা দিয়া আমরা লিখিয়া থাকি। এখানে কিন্তু সমুদ্রের ভিতরে এক রকম মৎস্য

দেখিলাম, তাহা ঠিক কলমের মত। ইহাকে "Sea-Pen" (সি-পেন্) অর্থাৎ "সামুদ্রিক কলম" বলে।

আর এক রকম মাছ, নাম Star-Fish (ষ্টার্-ফিশ্) অর্থাৎ তারা-মাছ। ইহা ঠিক * এইরূপ চিহ্নের মত। প্রতি ফলায সব বিন্দু বিন্দু দাগ। ঐ সকল দাগ জ্যোতিতে খুব ঝক্-মক্ করিতেছে।

বড় বড় ঝুমকো ফুলের মত একরকম মাছ দেখিলাম। ইহার নাম "সি অর্চিন্স" (Sea Urchins)। সি অর্চিন্স্ নানা রঙের হইয়া থাকে, সাদা, কাল, বেগুনি প্রভৃতি। অনেকটা Pin-pad (with pins on) এর মত দেখিতে।

আরও যে কত রকম ফুল, কত রকম গাছ, কত রকম মাছ, কত রকমের শামুক ও ঝিনুক দেখিলাম, তাহার আর কত বর্ণনা করিব! যাহারা দেখাইল, তাহারাও অনেকের নাম জানে না।

সাধারণ মৎস্যও নানা রকমের ও বৃহৎ বৃহৎ আকারের এখানে পাওয়া যায়। এই দ্বীপের আর একটী নাম "The Angler's Paradise" অর্থাৎ মৎস্যধারকের স্বর্গ। দূর দূর দেশ হইতে লোকে এখানে মৎস্য ধরিতে আসে। একজন, মিষ্টার এফ্, এস্, শেঙ্ক্ (Mr F S. Schenck) নামক ব্যক্তি ছিপ ও এখানকার মৎস্য ধরিবার ২১ নম্বর সূতার দ্বারা ৩৮৪ পাউণ্ড অর্থাৎ কমবেশ সাড়ে তিন মণ ওজনের এক প্রকাণ্ড ব্ল্যাক সি বাস্" (Black-sea Bass) জাতীয় মৎস্য ধরেন। এই মৎস্য নাকি অতি উপাদেয়। বৎসর দুয়েক কথা হইল, একজন স্ত্রীলোক, মিসেস এ, ডবলিউ, ব্যারেট (Mrs. A. W. Barret), ছিপ ও সুতার দ্বারা ৫ মণ ওজনের (৪১৬ পাউণ্ড) ঐ জাতীয় এক বৃহৎ মৎস্য ধরেন।

এই দ্বীপে, সমুদ্রের কিনারাতেই, "Zoological Station and Marine Aquarium" অর্থাৎ "পালিত সামুদ্রিক জন্তুর স্থান ও রক্ষিত সামুদ্রিক উদ্যান" নামক স্থান আছে। এই স্থান আজকাল তত ভাল অবস্থায় নাই। তত্রাচ অনেক নূতন নূতন সামুদ্রিক বস্তু জীবন্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। সব বড় বড় কাচের বাক্সের ভিতর জল ভরিয়া রাখিয়াছে ; সেই জলের ভিতরে হাওয়া যাবার পথ, এক এক সরু কাচ-নলের ভিতর দিয়া, করা হইয়াছে। এইরূপ জল-বাক্সের ভিতর সমুদ্রের নানা প্রকার মাছ ও গাছপালা অতি সুন্দররূপে পালিত ও রক্ষিত করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে যত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মাছের কথা বলিয়াছি, তাহা ছাড়া আরও কয়েক প্রকার নূতন মাছ এই স্থানে কাচ-বাক্সের ভিতর দেখিলাম। সে সকলেরও নাম গুটি কতক করি শুনুন।

একটী বাক্সের ভিতর (বাক্স চারিদিকেই কাচ দ্বারা নির্ম্মিত) দেখিলাম অত্যদ্ভুত পদার্থ। ইহার নাম ডেভিল্-ফিশ্ (Devil Fish) অর্থাৎ অসুর-মৎস্য। ইহা যখন নিজে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন দেখিতে ঠিক একটু মাংসপিণ্ড। রক্ষকেরা বলিলেন, ইহা যথার্থই পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য জন্তু। ইহার শরীরের ভিতর ফুস্ফুস্, যকৃৎ প্রভৃতি কোনও প্রকার সাধারণ আভ্যন্তরিক যন্ত্র নাই; উদর নাই; মস্তিষ্ক নাই। কিন্তু তত্রাপি, কোপগ্রস্ত হইলে ভয়ানক ভয়ানক নাক মুখ চোখ প্রভৃতি যে কেমন করিয়া সেই মাংসপিণ্ডের ভিতর হইতে বাহির করে, কিছুই বলা যায় না। ইহার শরীরে স্থানে স্থানে, ১২০টী করিয়া, Suckers অর্থাৎ রক্ত-শোষক যন্ত্র আছে। তাহার দ্বারা অন্যান্য জন্তুর গাত্র হইতে নিমিষে প্রচুর পরিমাণে রক্ত শুষিয়া লয়। বাক্সের গায়ে একটু আঘাত করিলেই অমনি উহা রাগান্বিত হয়। রাগান্বিত হইলেই নানাপ্রকারের ভীষণ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয় দেখায়। তখন লম্বায় প্রায় এক হাত ও প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ হাত হয় এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই নানাপ্রকার রঙ্ বদলায়।

একজন রক্ষক বলিলেন যে, উহাদের ঐ স্থানে, বৎসর কতক হইল, একটী Angel Fish (এঞ্জেল ফিশ্) অর্থাৎ "সাধু-মৎস্য" ছিল। সেটী মারা গিয়াছে। আর একটী আজও অন্বেষণ করিয়া পাইতেছেন না। এই মৎস্য নানাবিধ শান্ত স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে।

আপনারা সকলেই প্রায়, হাঙ্গর দেখিয়াছেন, কিন্তু বলুন দিকিন, হাঙ্গরের বাচ্চা পেটের ভিতর হইতে কি অবস্থায় বাহির হয়? কি অবস্থায় জানেন?

ডিম্বাকারে। হাঙ্গরের ডিম্ কি রকম জানেন? ঠিক পাকান শিঙের মত। আশ্চর্য্য নয় কি, ডিম—পাকান শিঙের মত? কতকগুলি এইরূপ হাঙ্গরের ডিম (তারা বলে—Shark-eggs) একটা জলভরা কাচের বাক্সের ভিতর রাখিয়া দিয়াছে।

আর একটা কাচের বাক্সের ভিতর কতকগুলি ঠিক রাধাপদ্ম ফুলের মত মাছ দেখিলাম। ইহারা একটু কিছু আওয়াজ হইলেই অমনি মুখ

বন্ধ করে; তখন দেখিতে ঠিক রাধাপদ্ম ফুলের কুঁড়ির মত। ক্ষণিক পরে, আবার প্রস্ফুটিত হয়। রক্ষকেরা বলিল, ইহারা নাকি ৫৪০ ফিট্ অর্থাৎ ৩০০ হাত জলের নীচে সমুদ্রে বাস করে।

কতকগুলি Live Sponge অর্থাৎ জীবিত স্পঞ্জ দেখিলাম। সে গুলিও মাছ।

Live coralও দেখিলাম অর্থাৎ জীবিত প্রবাল। দেখিতে খুব ছোট ছোট শৈবাল পুষ্পের Moss-flower) মত। পাহাডের গায়ে খুব ছোট ছোট গর্ত্তের ভিতর থাকে। ইহাদেব বাস-স্থান অতি সুন্দব। প্রাব মানুষের মত। সকলের বাটীগুলি লাইনগাঁথা। প্রতি বাটীতে বৈঠক-খানা (Parlours) প্রভৃতি আছে! ইহাবা আত্মীয় কুটুম্ব সহিত একত্রে বাস করে! দর্শকবৃন্দকে, সেখানকার রক্ষকেরা এ সমস্ত অতি যত্নসহকারে দেখায় ও বুঝাইযা দেয।

আর একটা বাক্সের ভিতর একটী ছোট পাহাড়েব গায়ে কতক-গুলি ছোট ছোট গর্ত্তের ভিতর খুব ছোট ছোট ঝুমকো ফুলের মত মাছ অনবরত ঢুকুছে আব বাহির হইতেছে। ঠিক ছোট ঝুমকো ফুলের মত খুব সরু সরু রঙ্গিন পাপড়ি।

এইরূপ আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মাছ ও ফুলগাছ আছে, আর কত নাম করিব! এই দ্বীপেব আব একটী নাম "Magic Island" অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক দ্বীপ। বলিয়াছি ত, মাযের বাগান। মা আমাদের "বাজীকরের মেয়ে শ্যামা" কিনা! তাই তাঁর দ্বীপ বা বাগান এত বিচিত্র! এই দ্বীপের আরও একটী নাম 'The Enchanted Isle of the sea" ঠিকই কথা। মাযের মন্ত্রমুগ্ধ দ্বীপই বটে।

পাঠকবর্গ, ক্ষমা করিবেন, আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিলাম এই দীর্ঘ পত্র পড়িতে। আবার শীঘ্র আপনাদিগেব নিকট আসিতে চেষ্টা করিব— এবার আরও কিছু ভাল বিষয শুনাইতে চেষ্টা করিব।

ইতি শুভানুধ্যাযী

ত্রিগুণাতীত।

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অত্যাচার অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় হওয়াতে আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা এখানে মন্দিরসংখ্যা অত্যধিক। এখানকার তুলনায় প্রাচীনঋষিসেবিত, সিন্ধুজাহ্নবীপূত, হিমাচলোপাধান বিস্তীর্ণ ভূভাগ দেবালয়শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যদিও মনুষ্যবুদ্ধিপ্রসূত শিল্পের মহিমায় এদেশ আপনাকে মহিমান্বিত মনে করে, তথাপি এই বিচিত্র বিশ্বসংসার যে আদি-শিল্পীর রচনা, সেই অতুলনীয় অদ্বিতীয়ব্রহ্মাণ্ড-পতি-বিরচিত, সাধুতপস্বিনিষেবিত, সর্ব্বসৌন্দর্য্যগাম্ভীর্য্যময় সত্ত্বগুণ-প্রধান উত্তুঙ্গশিখরবান্ তুহিনাচল আর্য্যভূমির গৌরবস্বরূপ হওয়ায় তাহার সহিত তুলনায় দাক্ষিণাত্যের গৌরবচ্ছটা সূর্য্যচ্ছটার সম্মুখে জ্যোৎস্নার ন্যায় পরিম্লান হইয়া যায়। মনুষ্যশিল্প কখনও নির্দ্দোষ হইতে পারে না, এবং তাহা কেবল প্রাকৃতিক রচনার অনুকরণ মাত্র; কিন্তু স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই যেন হিমালয়রূপ বিপুলমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে চিরকাল ধরিয়া আপনার ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতেছেন। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে এবং একের তুলনায় অন্যটি যে একবারে নগণ্য হইয়া যায়, ইহা স্পষ্ট। অতএব সুবৃহৎ দেবালয়পুঞ্জ-পরিমণ্ডিত হইলেও সৌন্দর্য্যবিষয়ে দাক্ষিণাত্যকে আর্য্যাবর্ত্তের পদতলে চিরকালই পড়িয়া থাকিতে হইবে।

কিন্তু সে যাহা হউক, যদি প্রাচীন হিন্দুগণের শিল্পকৌশল দেখিতে চাও, তাহা হইলে সীতাবিরহবিধুর রামের অশ্রুবারিপূতা রামকটকপ্রভৃতি দাক্ষিণাত্যভূমিতে না আসিলে তাহার সম্ভাবনা নাই। এখানকার মন্দিরগুলির আয়তন ও উচ্চতা উভয়ই সুবিপুল। শ্রীরঙ্গমস্থ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির এত বৃহদায়তন যে, পরিবারসহিত অর্চ্চকগণ তাহারই মধ্যে বাস করেন, এবং তাঁহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, শান্তিবিধানার্থ মন্দিরচত্বরের একপার্শ্বে দণ্ডনিবাস (পুলিস) অবস্থিত। সেই বিশালপ্রাঙ্গনের অন্য এক স্থলে সহস্রটি স্তম্ভের উপর এক মণ্ডপ বিরাজ করিতেছে। যখন ইংরাজ ও

ফরাসিগণ দাক্ষিণাত্য লইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময় সমুদয় ফরাশি সৈন্য উক্ত মহামণ্ডপের এক পার্শ্বে মাত্র আশ্রয় লইয়াছিল! এতদ্দ্বারা মন্দিরের বিশালতা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে।

সমুদয় অর্চ্চকগণ এক প্রধান অর্চ্চকের অধীন। ইঁহারই মতানুসারে সকলকে কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং ইনি একপ্রকার অন্যান্য সকলের উপর রাজত্ব করিয়া থাকেন। অর্চ্চকগণের স্বভাব সাধারণতঃ তত পবিত্র হয় না, কারণ, ইঁহারা ভগবদ্ভক্তিদ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া যে দেবার্চ্চনা করেন, তাহা নহে; অনেক সময়ে অর্থোপার্জ্জনই এই সেবার কারণ। অর্থ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির সাধক বলিয়া ইহার এত আদর। সুতরাং অর্থলোভিগণ ইন্দ্রিয়-সেবা-পরায়ণ। ভগবদ্ভক্তি ইন্দ্রিয়লৌল্য দূর করে কিন্তু অর্থপ্রিয়তা তাহারই ব্যঞ্জক। সুতরাং অধিকাংশ দেবার্চ্চকগণই ইন্দ্রিয়দাস। তাঁহারা যে ভগবদ্বিগ্রহের অর্চ্চনা করেন, তাহা অর্থোপার্জ্জনের উপায় বলিয়াই তাঁহা-দের নিকট আদরের সামগ্রী। সকল অর্চ্চকই যে এইরূপ, তাহা বলি-তেছি না। ইঁহাদের মধ্যে কখন কখন পরম ভক্তিমানও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ইহার বিপরীত লক্ষিত হয়। এই জন্যই দেবার্চ্চকগণ সমাজে দেবল বলিয়া হেয়।

শ্রীরামানুজের সময় যে প্রধান অর্চ্চকটি শ্রীরঙ্গনাথের সেবা করিতেন, তিনি তাদৃশ ভক্তিমান ছিলেন না। তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং ধনের প্রতিই তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। অর্থজন্য ইন্দ্রিয়সুখভোগই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায়, যখনই কেহ তল্লাভে তাঁহার অন্তরায়স্বরূপ হইত, তিনি যেন তেন প্রকারেণ তাঁহার উচ্ছেদসাধন করিতে চেষ্টা পাইতেন।

শ্রীরামানুজের অতুল কীর্ত্তি, তাঁহার প্রতি সকলের অকৃত্রিম অনুরাগ, শ্রীরঙ্গস্থ সম্ভ্রান্তজনসমূহের তদর্থে অকাতরে অর্থব্যয়, তাঁহাকে শ্রীরঙ্গ-নাথ স্বামীর দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে লোকের ধারণা, ও আপনার প্রতি জন-সাধারণের পূর্ব্বভক্তির হ্রাস দেখিয়া প্রধানার্চ্চক আর স্থির থাকিতে পারি-লেন না। কিরূপে তিনি এই কণ্টকের হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইবেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। দুষ্ট হৃদয়ে পৈশাচিক উপায় সহজেই প্রস্ফুরিত হয়। কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তিনি অবিলম্বেই শ্রীরামানুজসন্নি-ধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই দিবস নিজগৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করি-

লেন, এবং তৎপরে স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক সহধর্ম্মিণীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "দেখ, আজ রামানুজকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি। অন্নের সহিত তাহাকে বিষপ্রয়োগ করিতে হইবে, এই জন্যই সেই নরাধমটাকে নিমন্ত্রণ। ও পাপটা জীবিত থাকিলে অচিরাৎ আমাদের হা অন্ন হা অন্ন করিয়া কাল কাটাইতে হইবে। বিষপেটিকা কোথায় আছে, তুমি জান। অধিক আর কি বলিব। তুমি বুদ্ধিমতী, সাবধানে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।" নরপশুর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী সস্মিতবদনে লোচনভঙ্গি দ্বারা আপনার কার্য্যপটুতা প্রকাশ করিলে আনন্দোৎফুল্ল অর্চ্চক পিশাচীর গণ্ডে প্রেমভরে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর কৃপাতেই তোমার ন্যায় মনোবৃত্ত্যনুসারিণী ভার্য্যা লাভ করিয়াছি, আজ আমি নিষ্কণ্টক হইব। আজ আমি তোমাকে অঙ্কে লইয়া সুখে নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।" এই বলিয়া দুষ্ট দেবার্চ্চনার্থ শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

মধ্যাহ্নে যতিরাজ ভিক্ষাগ্রহণ মানসে অর্চ্চকালয়ে আগমন করিলেন। অর্চ্চকপত্নী তাঁহাকে অতি সমাদরে পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দিলেন ও স্বয়ং বস্ত্রদ্বারা তাঁহার পাদমার্জ্জনা পূর্ব্বক বসিবার আসন প্রদান করিলেন। যদিও পাপীয়সীর হৃদয় বজ্রসারময়, যদিও সে অনেকবার স্বহস্তে অনেককে বিষ-প্রয়োগ করিয়াছে, তথাপি শ্রীরামানুজের সারল্যময় বদনও দেবতুল্য কান্তি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে অপত্যস্নেহের সঞ্চার হইয়া ক্রমে তাহা এত বলবান্ হইয়া উঠিল যে, সে যখন বিষমিশ্রিত অন্ন লইয়া রামানুজের পাত্রে স্থাপন করিবে, তখন আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিয়া ফেলিল এবং কহিল, "বৎস, যদি প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, অন্যত্র গিয়া ভিক্ষা কর। এ অন্ন গ্রহণ করিলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে।" শ্রীরামানুজ তচ্ছ্রবণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ক্ষণকাল থাকিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কি এমন অনিষ্ট করিয়াছি, যাহাতে প্রধানার্চ্চক আমার প্রতি এইরূপ ভয়ঙ্কর আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন?" তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অন্যমনস্কের ন্যায় তথা হইতে উঠিলেন এবং শূন্যমনাঃ হইয়া কাবেরীর দিকে আপনি চলিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। কাবেরীতীরস্থ বালুকা আতপতাপে অগ্নিবৎ উষ্ণ হইয়াছে। তিনি অনতিদূরে গোষ্ঠিপূর্ণকে সন্দর্শন পূর্ব্বক সেই উষ্ণ সিকতাময় প্রদেশে পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে

প্রণাম করিলেন। তিনি সেই অবস্থায় অনেকক্ষণ রহিলেন। পরে গোষ্ঠিপূর্ণ তাঁহাকে স্বয়ং উঠাইয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিয়া কহিলেন, "হে গুরো, আমি প্রধানার্চ্চকের মনের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছি। এ ভীষণ মহাপাতক হইতে তাহার কিসে নিষ্কৃতি হইবে, তাহা বলুন।" গোষ্ঠিপূর্ণ ইহা শুনিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমার ন্যায় মহানুভব যখন সেই দুরাত্মার উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তখন আর তাহার কোনও ভয় নাই। অচিরাৎ সে পাপমার্গ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যমার্গের পথিক হইবে।" গুরু শিষ্য পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় হইলেন। শ্রীরামানুজ মঠে গমন করিয়া দেখিলেন যে, একটি ব্রাহ্মণ নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি কিঞ্চিৎ গ্রহণ পূর্ব্বক শিষ্যগণকে তৎসমুদয় বণ্টন করিয়া দিলেন এবং কাহাকেও উক্ত দিবসের ঘটনা জ্ঞাপন না করিয়া নিরন্তর অর্চ্চকের শুভচিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে অর্চ্চক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যখন শুনিলেন যে, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গী অকৃতকার্য্যা হইয়াছেন, তখন তাঁহার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃ কোমল বলিয়া তিনি জায়াকে ক্ষমা করিলেন এবং তখনই আর এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীরামানুজ প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর শ্রীরঙ্গনাথ স্বামী সন্দর্শনার্থ মন্দিরে গমন করেন। সেই দিবসও গমন করিলেন। অর্চ্চক তাঁহাকে স্নানজল পানার্থ দান করিলেন। তিনি পান করিলেন ও বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা বিষমিশ্রিত। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অতি উপাদেয় ও পবিত্র পীযূষ পানে যেরূপ হর্ষের উদয় হয়, সেইরূপ হর্ষ প্রকাশ করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে কৃপানিধে, দাসের প্রতি আপনার এত স্নেহ! এই দেবদুর্লভ পীযূষ অদ্য আমি কি পুণ্যে লাভ করিলাম, বলিতে পারি না। ধন্য তোমার অনুগ্রহ।" এই বলিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া টলিতে টলিতে শ্রীমন্দির হইতে বহির্গমন করিলেন। অর্চ্চক ভাবিলেন, বিষ ধরিয়াছে, এই জন্যই পদস্খলন হইতেছে। তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। ভাবিলেন, পরদিন প্রাতঃকালেই রামানুজের চিতাধূম আকাশপথ অবলম্বন করিবে। তিনি ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কারণ, তিনি যে বিষ

প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা দশজন বলিষ্ঠ মনুষ্যকে একপ্রহরের মধ্যে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারে।

পর দিবস শ্রীরামানুজের চিতাধূম আকাশে না উঠিয়া বরং শত শত কণ্ঠ হইতে এককালে "ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং মূঢ়মতে" এই আনন্দ সঙ্কীর্ত্তন গগন ভেদ করিয়া অর্চ্চকের হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। গৃহের বাহিরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, শ্রীরঙ্গমস্থ যাবতীয় নরনারী যতিরাজ শ্রীরামানুজকে নানাবিধ পুষ্পালঙ্কারে অলঙ্কৃত পূর্ব্বক মধ্যবর্ত্তী করিয়া, উক্ত নূতন গাথা গান পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। যতিরাজের লোচনযুগল আনন্দধারাপরিপ্লুত। বাহ্য দৃষ্টি কিছুই নাই। মন প্রাণ সমুদয়ই ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পিত। তাঁহার সেই দেবতুল্য কান্তি, অন্তর্মুখী জ্যোতিঃ, ও প্রেমময় বিগ্রহ অবলোকন করিয়া সেই রাক্ষসের হৃদয়েও সত্ত্বগুণের সঞ্চার হইল। তিনি আপনার বিষপ্রয়োগ-রূপ ভয়ঙ্কর নৃশংসতার বিষয় চিন্তা করিয়া, শ্রীরামানুজকে অমরণধর্ম্ম দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি জনতার মধ্যে বেগে ধাবমান হইয়া শ্রীরামানুজের পদতলে গিয়া পতিত হইলেন। সহসা এই ব্যাপারে সঙ্কীর্ত্তন থামিয়া গেল; সকলেরই চক্ষু প্রধানার্চ্চকের উপর পতিত হইল। তখন অনুতাপবশতঃ রোদন করিতে করিতে অর্চ্চক কহিলেন, "হে যতিরাজ, আপনি মানব নহেন, সাক্ষাৎ বিষ্ণু; কলেবর ধারণ করিয়া আমার ন্যায় দুরাত্মাগণের উচ্ছেদ সাধনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। তবে আর বিলম্ব কেন প্রভো! শীঘ্র আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করুন। উঃ! আমি কি মহাপাতকী! কত লোককে বিষপ্রয়োগে নাশ করিয়াছি! তোমাকেও বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম; কিন্তু জানিতাম না যে, তুমি মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ। প্রতি প্রলয়কালে কত যমের নাশ করিয়াছ, আবার প্রতি প্রলয়াবসানে কত যমের সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে? আমি অতি নরাধম। তোমার পাদস্পর্শ করিবার যোগ্য নহি। আমাকে সমুচিত শাস্তি দিয়া আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। অতি অন্ধতমোময় নরকে নানাবিধ যন্ত্রণার মধ্যে আমায় নিক্ষেপ করুন। দুঃসহ যন্ত্রণানলে হয়তো এই অসীম মহাপাতক কালক্রমে লঘু হইয়া যাইতে পারে। অয়ি দীনশরণ, আর বিলম্ব কেন? আমায় শীঘ্র হস্তিপদতলে বা জ্বলন্ত অঙ্গারে স্থাপন করুন। আর আমার মুহূর্ত্তমাত্রও

জীবন ধারণের সাধ নাই। নরক, নরক, নরক, তুমি কোথায়? এস, এস; শীঘ্র এই মহাপাতকীকে গ্রাস কর।" এই বলিয়া সবেগে ভূমির উপর মস্তকাঘাত করিতে করিতে সেই স্থানকে রুধিরসিক্ত করিয়া ফেলিলেন। পার্শ্বস্থ জনগণ নিরতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ নিরস্ত করিলেন। কিন্তু তিনি উত্তরোত্তর আরও অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি হৃদয়ে করাঘাত করিয়া তাহা রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ শোণিতরঞ্জিত হইল। অশ্রুবারি শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শোণিতবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। শ্রীরামানুজ ইতিমধ্যে বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে শান্ত করিলেন। তিনি কহিলেন, "ভ্রাতঃ, আর হিংসাদ্বেষপরায়ণ হইয়া নৃশংসের ন্যায় আচরণ করিও না। শ্রীরঙ্গনাথ স্বামী তোমার পূর্ব্বকৃত সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিলেন।" অর্চ্চক কহিলেন, "কি! আমার ন্যায় মহাপাতকীর প্রতিও তোমার এত দয়া! অথবা যখন তোমার বিগ্রহই দয়াগঠিত, যখন তুমি পাপীয়সী পুতনার বিষদিগ্ধ স্তন পান করিয়া তাহাকে স্বীয় জননীর সহিত এক লোকে বাস করিবার অধিকার দিয়াছ, তখন এই নৃশংস নরাধমের প্রতিও তোমার দয়া হওয়া অসম্ভব নয়। আহা! এমন দয়ালু পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার শরণ লইব? হে দীনশরণ, তোমার এ কীর্ত্তি চিরকাল লোকে ঘোষণা করিবে।" যতিরাজ স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। তদীয় শ্রীকরস্পর্শে অর্চ্চকের সমস্ত সন্তাপ দূর হইয়া গেল, নৃশংস পিশাচ, দেবত্বলাভ করিলেন।

ক্রমশঃ।

বাৎসরিকী।

গেল গেল গেল বরষ চলিয়া
কি করিনু আমি তোমার লাগি,
বৎসরেক পরে জাগাতে সে স্মৃতি
চিদাকাশে তাই উঠিলে জাগি।

কে ভাবিবে আর অভাগার তরে
তুমি না ভাবিলে করুণাসিন্ধু,
তুমি মুক্তা মাত্র এহৃদিসাগরে
নাহি তাহে আর রতনবিন্দু।

অপার করুণা নাহিক তুলনা
জাগাতে ধরার পতিত জনে,
কভু একাশনে কভু অনশনে
ভ্রমিলে ধরার নগরে বনে।

যে বাণী হৃদয়ে জাগিত সতত
জাগাতে সে বাণী নরের মনে,
করি প্রাণপণ স্বার্থত্যাগ শত
ব্যস্ত ছিলে দেব যামিনী দিনে।

হিমালয় হৃদি অগাধ কন্দরে
শুনেছিলে যেই প্রণবধ্বনি
'অস্তি''ভাতি''প্রিয়' অপরূপ স্বরে
উদ্বুদ্ধ যাহায় তোমার প্রাণী।

রম্য বৃন্দাবন মাধব নিকুঞ্জে
'পীতম পিয়ার' অপূর্ব্ব গান
শুনেছ ধ্বনিত যাহা কুঞ্জে কুঞ্জে
যাহাতে নাচিত তোমার প্রাণ।

নদীয়ার গোরা ভাবে মাতোয়ারা
প্রেমের নর্ত্তন তরঙ্গলীলা
যে ছবি তোমার প্রাণ মনোহরা
মানস নয়নে করিত খেলা।

গুরু নানকের সেবকগণের
অপূর্ব্ব 'ওয়াই গুরু কি ফতে'
যে বাণী শুনিয়া নাচিত সে হিয়া
ব্যস্ত ছিলে যাহা মানবে দিতে।

বেদান্ত বৃক্ষের অনন্ত ছায়ায়
'তত্ত্বমসি' গীত কেহ বা গায়;
ঘটে পটে প্রাণ কেহ বা জাগায়
কেহ বা নামের মহিমা গায়।

অদ্বৈতের ভাব করি নিরীক্ষণ
প্রাচীন নবীন সকল পথে,
জগতের জীব করি সম্ভাষণ
বুঝাইতে এই নূতন মতে।

এই সব কথা ছিল হৃদে গাঁথা
বুঝাইতে তাহা মানবগণে,
আপন জীবন করি সমর্পণ
ভ্রমিলে ধরায় যামিনী দিনে।

অসহায় দেব ছিন্ন বাস ধরি-
অনন্ত-তুষার-আবৃত দেশে
'তত্ত্বমসি' বার্ত্তা দিতে জনে জনে
অনশনে কত সয়েছ ক্লেশে।

'নহি নহি নহি মেষ-শিশু মোরা
সিংহের কুমার জগত মাঝে'
এই মহাবাণী জীব-মাতোয়ারা
অন্য কার আর শ্রীমুখে রাজে?

'অনন্তের মোরা সবে অধিকারী
প্রেমসিন্ধুনীরে হৃদয় ভরা'
এই মহাতত্ত্ব প্রাণোন্মাদকারী
মানবমনের তিমিরহরা।

কে আর দানিবে, কে আর কহিবে
উঠ জাগ জীব প্রস্তুত হও ?
কে আর কহিবে মানবে মানবে
অভীপ্সিত বর ত্বরায় লও ?

শুনিয়াছি দেব, ছিল তব ব্রত
ভারতে করিতে ধর্ম্মের গুরু ;
হইয়াছে দেব, সে কার্য্য সাধন,
শোভিছে হিন্দুর ধরম মেরু।

ব্রাহ্মণ-ইতর জাতির উন্নতি
ছিল তব দেব উদ্দেশ্য আর ;
দরিদ্র অনাথ ইতর সংহতি
পেয়েছে সন্ধান পেয়েছে তার।

আচণ্ডাল জীব সবে অধিকারী
উন্নত করিতে আপন প্রাণ
পেয়েছে এতত্ত্ব জীব-হিত করী
ছড়ায়ে পড়েছে নূতন জ্ঞান।

তাই আজি তব গুরুভ্রাতাগণ
চলেছে তোমার চালিত পথে,
স্মরি ইষ্টদেব যুগল চরণ
ঢেলেছে জীবন মহান্ ব্রতে।

দ্বারে দ্বারে ফিরে লয়ে জ্ঞানরাশি
তুলিতে জগত পতিত জনে
দ্বারে দ্বারে ফিরে সাজিয়া সন্ন্যাসী
পূরিল জগত মঙ্গল গানে।

জীব-সেবা-ব্রত করিয়া ধারণ
ভ্রমিছে তাহারা ভুবনময় ;
নারায়ণ সেবা করে নারায়ণ
তোমার(ই) সে শিক্ষা প্রচার হয়।

কবে হবে দেব সে দিন আমার
স্মরিয়া বাঞ্ছিত চরণ দুটি
অনাথের মত সেবিব অনাথে
জ্ঞানসূর্য্য হৃদে উঠিবে ফুটি ?

যাবে অহমিকা হবে তিরোহিত
অধম মনের তিমির ঘোর ?
কবে হবে দিন সাধি জীব-হিত
ঝরিবে নয়নে প্রেমের লোর ?

দিয়াছ অনেক বহু জনে দেব !
দাও কিছু এই পতিত জনে,
খুলে যাক্ তার হৃদয় ভাণ্ডার
সেও কিছু দিক্ স্বজনগণে।

কিরণ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারি রবিবার দক্ষিণেশ্বরস্থ রাণী রাসমণির দেবালয়ে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাঘ-মহোৎসব হইবে।

কিছুদিন হইল, মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে জনৈক বন্ধুর অর্থানুকূল্যে একটী দাতব্য ঔষধালয় খোলা হইয়াছে ও তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে একজন ডাক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছে। মায়াবতী কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের লোকেরা অতি দরিদ্র। সমতল প্রদেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্য তাহাদের নিকট পঁহুছে না। এই কারণে এখানকার অনেকে ২।১ বৎসর ধরিয়া বিনা চিকিৎসায় রোগ ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এখানে দরিদ্র লোকের মধ্যে রোগের এত আতিশয্য যে, অজ্ঞ জনগণের ঔষধাপেক্ষা দেবতার কৃপায় অধিক বিশ্বাস থাকিলেও এমন কি, ৩০ মাইল দূর হইতেও রোগিগণ চিকিৎসার্থ এখানে আসিয়া থাকে। অল্প অল্প দূর হইতে ত অনেকেই আসে। ইহাদিগকে উপযুক্ত বাসস্থান না দিলে ইহাদের চিকিৎসা করা অসম্ভব। আবার একজন লোকের দ্বারাও সমুদয় কার্য্যগুলি সুনিয়মিতভাবে চলে না। এই সকল কারণে এই কার্য্যকে স্থায়ী করিবার জন্য অর্থসাহায্য আবশ্যক। সহৃদয় সাধারণকে এই কার্য্যে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা যাইতেছে। সাহায্যদাতাগণ তাঁহাদের সাহায্য স্বামী স্বরূপানন্দ, অদ্বৈতাশ্রম, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) ঠিকানায় পাঠাইবেন। বিগত জুন মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসে এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৬৬ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

আজকাল আমরা অনেকে দেশের হিতচিন্তা করিতেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন দেশের জন্য যথার্থ কাতর? আমাদের মধ্যে কয়জন দেশের জন্য নিজের ব্যক্তিগত সুখস্বার্থ নিজ সাংসারিক উন্নতির আশা প্রভৃতি ছাড়িতে প্রস্তুত? কয়জন দেশকে যথার্থ ভালবাসেন?—যে ভালবাসায় মানুষ পাগল হয়—মানুষ মরিতে প্রস্তুত হয়? জিজ্ঞাসা করি কয়জন?

আমাদের ভারতভূমির দুর্দ্দশার কারণ কি কেবল ইংরাজের শাসননীতি? রাজনৈতিক আন্দোলনেই কি আমাদের সুখের দিন নিকটবর্ত্তী হইবে? আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত দোষ কি কিছুই নাই? সে কি দোষ? তন্নিবারণের কি কোন উপায় হয় না? সমগ্র প্রজাশক্তির ভিতর কি কোন মহাশক্তি নিদ্রিত নাই, যাহা জাগরিত হইলে রাজশক্তির সহায়তানিরপেক্ষ হইয়া প্রজাকুল নিজেদের হিত নিজেরা সাধন করিতে পারে? এই সমস্যা লইয়া আজ আমরা বিব্রত। কে ইহার প্রকৃত উত্তর দিবে?

ইহা সত্য যে, কোন কার্য্যই বিফল নহে। রাজনৈতিক আন্দোলনও একেবারে বৃথা হইবে না। কিন্তু বুঝিতে হইবে, উহাই আমাদের উন্নতির সর্ব্বাঙ্গীন উপায় নহে। সমাজরূপ বিরাট দৈত্য একবার জাগিয়া উঠিলে নানারূপে নানাদিকে নানা চেষ্টা হইবে। তন্মধ্যে সকলগুলিই অল্প বিস্তর কল্যাণের সহায়ক। উহার মধ্যে আবার যে পথে আমাদের আত্মনির্ভরবৃত্তি সবিশেষ বিকশিত হয়, সেইটীই সমধিক কল্যাণের নিদান।

আমরা নিজের মুক্তি সাধন ও সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির মুক্তিসাধনের চেষ্টাকেই আমাদের জীবনের লক্ষ্যস্থল বলিয়া বিবেচনা করি। এই মুক্তি আমাদের সকলের আদর্শ হইলেও ইহার পথ সকলের পক্ষে এক নহে: এ বিষয়ে ব্যক্তিগত, জাতিগত, দেশগত অধিকারভেদ আছে।

এই জন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে উন্নতির উপায় সংসার, কাহারও পক্ষে সন্ন্যাস। কাহারও জ্ঞান, কাহারও ভক্তি, কাহারও কর্ম্ম। বিভিন্ন জাতিরও সেইরূপ বিভিন্ন রূপ ভাব আছে। কোন জাতি ভোগের চরম দশায় উপস্থিত। তাহাদের পক্ষে বৈরাগ্য বা নিবৃত্তিধর্ম্ম। কোন জাতি বা সমগ জীবনে ভোগ কাহাকে বলে, তাহা জানেনা, তাহাদের অনেকের হয়ত দিনান্তে অর্দ্ধাশনও জুটে না। তাহাদের পক্ষে ভোগের পথ প্রশস্ত না করিলে তাহারা মোক্ষমার্গে কখনও অগ্রসর হইতে পারিবে না।

ভারতে এখন অন্নের অভাব, লৌকিক বিদ্যার অভাব। কিসে অন্নাভাব ঘুচিবে, কিসে বিদ্যা বিস্তার হইবে, এই চিন্তায় ভারতের মনীষিগণ অনেকে ব্যস্ত হইয়াছেন। এ সমস্যার কেহ মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন কি?

তং ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং তাপয়ন্তম্। ১৯।

ভাষ্যানুবাদ। (আরও দেখিতেছি যে তুমি) "অনাদিমধ্যান্ত" যে তোমার আদি মধ্য ও অন্ত নাই, সেই তুমি অনাদিমধ্যান্ত, সেই অনাদি-মধ্যান্ত তোমাকে (দেখিতেছি)। "অনন্তবীর্য্য" যে তোমার বীর্য্যের অন্ত নাই, সেই তুমি অনন্তবীর্য্য, সেই অনন্তবীর্য্য তোমাকে (দেখিতেছি)। সেইরূপ "অনন্তবাহু" যে তোমার বাহুসমূহ অনন্ত, সেই তুমি অনন্তবাহু তোমাকে (দেখিতেছি)। "শশিসূর্য্যনেত্র" যে তোমার নেত্রদ্বয় চন্দ্র ও সূর্য্য, সেই তুমি শশিসূর্য্যনেত্র, সেই চন্দ্রসূর্য্যনয়ন তোমাকে (দেখিতেছি)। "দীপ্তহুতাশবক্ত্র" দীপ্ত হুতাশ অর্থাৎ অগ্নি তোমার বক্ত্র (অর্থাৎ) মুখ, সেই তুমি দীপ্ত হুতাশবক্ত্র, সেই দীপ্তহুতাশবক্ত্র তুমি তোমার নিজেরই তেজের দ্বারা এই বিশ্বকে প্রতপ্ত করিতেছ, ইহা আমি দেখিতেছি। ১৯।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়। (হে) মহাত্মন্ ত্বয়া হি একেন ইদং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরং ব্যাপ্তং, সর্ব্বাঃ দিশশ্চ (ব্যাপ্তাঃ)। তব ইদং অদ্ভুতং উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্।২০।

মূলানুবাদ। হে মহাত্মন্, তুমি একাকীই যেহেতু এই দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যভাগ ব্যাপিয়া রহিয়াছ এবং সকলদিক্ (ও তুমি ব্যাপিয়া রহিয়াছ) সেই হেতু তোমার এই অদ্ভুত অথচ ভয়ঙ্কর রূপ বিলোকন করিয়া ত্রিলোক ব্যথা পাইতেছে। ২০।

ভাষ্য। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং অন্তরীক্ষং ব্যাপ্তং ত্বয়া একেন বিশ্ব-রূপধরেণ দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ। দৃষ্ট্বা উপলভ্য অদ্ভুতং বিস্ময়করং রূপ-মিদং তবোগ্রং ক্রূরং লোকানাং ত্রয়ং প্রব্যথিতং ভীতং প্রচলিতং বা মহা-ত্মন্ অক্ষুদ্রস্বভাব।২০।

ভাষ্যানুবাদ। দ্যৌ এবং পৃথিবীর এই অন্তর অর্থাৎ অন্তরীক্ষকে তুমি একাই ব্যাপিয়া রহিয়াছ। এবং দিক্‌সমূহও তুমি ব্যাপিয়া রহি-য়াছ। তোমার "অদ্ভুত" বিস্ময়জনক এবং "উগ্র" ক্রূর এইরূপ দেখিয়া

এই "লোকত্রয়" তিনটী লোক (অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্ত্য ও রসাতল) "প্রব্যথিত" অর্থাৎ ভীত বা প্রচলিত হইতেছে।" হে মহাত্মন্ (অর্থাৎ) অক্ষুদ্র-স্বভাব।২০।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১॥

অন্বয়। অমী সুরসঙ্ঘাস্ত্বাং বিশন্তি, কেচিৎ (সুরসঙ্ঘা) ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ (সন্তঃ) ত্বাং গৃণন্তি। মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্বস্তি ইত্যুক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি।২১।

মূলানুবাদ। এই কতকগুলি দেবতা তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, আবার কতকগুলি দেবতা ভয় পাইয়া ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তোমার স্তুতি করিতেছে। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি এই শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক অখণ্ড স্তুতি-নিবহের দ্বারা তোমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন।২১।

ভাষ্য। অথাধুনা পুরা "যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ু" রিত্যর্জ্জুনস্য সংশয় আসীৎ তন্নির্ণয়ায় পাণ্ডবজয়মৈকান্তিকং দর্শয়ামীতি প্রবৃত্তো ভগবান্ তৎ পশ্যন্নাহ কিঞ্চ অমী হি যুধ্যমানা যোদ্ধারঃ ত্বা ত্বাং সুরসঙ্ঘা যেহত্র ভূভারহরণায়াবতীর্ণা বস্বাদিদেবসঙ্ঘা মনুষ্যসংস্থানাস্ত্বাং বিশন্তি প্রবিশন্তো দৃশ্যন্তে। তত্র কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সন্তঃ গৃণন্তি স্তুবন্তি ত্বামন্যে পলায়নেঽপ্য-শক্তাঃ সন্তঃ যুদ্ধে প্রত্যুপস্থিতে উৎপাতাদিনিমিত্তান্যুপলক্ষ্য স্বস্ত্যস্তু জগত ইত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ মহর্ষীণাং সিদ্ধানাঞ্চ সঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ সম্পূর্ণাভিঃ।২১।

ভাষ্যানুবাদ। এক্ষণে "আমরা জয়ী হইব বা আমাদিগকে (তাহারা) জয় করিবে ?" এই প্রকার যে সংশয় অর্জ্জুনের হইয়াছিল, তাহার নির্ণ-য়ার্থ "পাণ্ডবের জয় যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা দেখাইব," এই ভাবে ভগবান্ প্রবৃত্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন আরও বলিতেছেন যে,—এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত যোদ্ধাগণ (ইহারা) দেবসমূহ (অর্থাৎ) ভূমির ভারহরণ করিবার জন্য যে সকল বসু প্রভৃতি দেবগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্য

আকার ধারণ পূর্ব্বক (যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও) "ত্বা" তোমার দেহেতে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহা দেখা যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে (আবার) কেহ বা ভীত হইয়া অঞ্জলিবন্ধসহকারে তোমার গুণবর্ণনা করিতেছেন। (আবার) পলায়নে অসমর্থ হইয়া (এবং) এই উপস্থিত যুদ্ধে উৎপাতাদি নানা ভয় নিমিত্ত দর্শন করিয়া "জগতের মঙ্গল হউক" এই কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক অন্যান্য মহর্ষি ও সিদ্ধগণ সম্পূর্ণরূপে নানাবিধ স্তুতি দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন।২১।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২॥

অন্বয়। যে রুদ্রাদিত্যা বসবঃ সাধ্যাঃ বিশ্বে (দেবাঃ) মরুত উষ্মপাঃ চ গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাশ্চ (তে) সর্ব্বে বিস্মিতা এব ত্বাং বীক্ষন্তে।২২।

মূলানুবাদ। যে সকল রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্ব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ নামক দেবতাগণ এবং উষ্মপনামক পিতৃগণ (আছেন) তাঁহারা এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছেন।২২।

ভাষ্য। কিঞ্চান্যৎ রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা রুদ্রাদয়ঃ গণাঃ বিশ্বে, অশ্বিনৌ চ দেবৌ মরুতশ্চ উষ্মপাশ্চ পিতরঃ, গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ গন্ধর্ব্বা হাহাহুহুপ্রভৃতয়ঃ অসুরা বিরোচনপ্রভৃতয়ঃ সিদ্ধাঃ কপিলাদয়ঃ তেষাং সঙ্ঘাঃ গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ তে বীক্ষন্তে পশ্যন্তি ত্বা ত্বাং বিস্মিতা বিস্ময়মাপন্নাঃ সন্তস্তে সর্ব্ব এব।২২।

ভাষ্যানুবাদ। আরও রুদ্র ও আদিত্যগণ, বসু ও সাধ্যনামক দেবগণ, বিশ্বদেবগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎসংজ্ঞাধারী দেবগণ ও উষ্মপনামধারী পিতৃগণ,—এবং হাহা ও হুহু নামক গন্ধর্ব্বগণ, কুবের প্রভৃতি যক্ষগণ, বিরোচনপ্রমুখ অসুরগণ ও কপিল প্রভৃতি সিদ্ধগণ (এই সকল দেবতাদিগের সমূহ একত্র হইয়া) বিস্ময়সহকারে সকলেই তোমাকে দেখিতেছেন।২২।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥

অন্বয়। হে মহাবাহো তে বহুবক্ত্রনেত্রং বহুবাহূরুপাদং বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ অহং চ প্রব্যথিতাঃ।২৬।

মলানুবাদ। হে মহাবাহো এই বহু মুখ ও নয়নযুক্ত, অনেক বাহু, উরু ও পাদযুক্ত, অসংখ্য উদরযুক্ত এবং বহুদন্তসমন্বিত ভয়ঙ্কর তোমার এ প্রকাণ্ড বপুঃ দেখিয়া এই সকল লোক এবং আমিও নিতান্ত প্রব্যথিত হইতেছি।২৩।

ভাষ্য। যস্মাৎ রূপং মহদতিপ্রমাণং তে তব 'বহুবক্ত্রনেত্রং" বহূনি বক্ত্রাণি মুখানি নেত্রাণি চক্ষূংষি যস্মিন্ তদ্রূপং বহুবক্ত্রনেত্রং হে মহাবাহো "বহুবাহূরুপাদম্" বহবঃ বাহবঃ ঊরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ রূপে তদ্ বহুবাহূরুপাদং, কিঞ্চ বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং বহুভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা রূপমীদৃশং লোকাঃ প্রাণিনঃ প্রব্যথিতাঃ প্রচলিতা ভয়েন তথাহমপি।২৩।

ভাষ্যানুবাদ। যে কারণ— তোমার এইরূপ (শরীর) "মহৎ" অতি বৃহৎ (এবং) "বহুবক্ত্রনেত্র" বহু (অর্থাৎ) অনেক "বক্ত্র" মুখ এবং "নেত্র" চক্ষুঃ যেরূপে আছে, তাহা বহুবক্ত্রনেত্র, হে মহাবাহো (এবং ঐরূপ) "বহুবাহূরুপাদ" যেরূপে অনেক বাহু উরু এবং পাদ আছে, তাহাই বহুবাহূরুপাদ এবং "বহূদর" (অর্থাৎ) অসংখ্য উদর যেরূপে বিদ্যমান আছে, তাহা বহূদর, এবং বহুদংষ্ট্রাকরাল অর্থাৎ অসংখ্য দন্তরাজি দ্বারা "করাল" বিকৃত, ভয়ঙ্কর, এই প্রকার তোমার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া "লোক" লৌকিক প্রাণিগণ এবং আমি 'প্রব্যথিত" ভয়ে প্রচলিত হইতেছি।২৩।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥২৪॥

অন্বয়। হে বিষ্ণো নভঃস্পৃশং দীপ্তং অনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা (অহং) ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামি।২৪।

মূলানুবাদ। হে বিষ্ণো তোমার দেহ গগনস্পর্শী এবং দীপ্তিমান্, তোমার বর্ণ অনেক প্রকার, তুমি মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছ, তোমার নেত্র অতি বিস্তৃত ও দীপ্তিময়, তোমাকে দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথা পাইতেছে, আমি ধৈর্য্য ও শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।২৩।

ভাষ্য। নভঃস্পৃশং দ্যুস্পৃশমিত্যর্থঃ দীপ্তং প্রজ্বলিতং অনেকবর্ণং অনেকে বর্ণাভয়ঙ্করা নানাসংস্থানা যস্মিন্ ত্বয়ি তং ত্বামনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং বিবৃতানি আননানি মুখানি যস্মিন্ ত্বয়ি তং ত্বাং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং দীপ্তানি প্রজ্বলিতানি বিশালানি বিস্তীর্ণানি নেত্রাণি যস্মিংস্ত্বয়ি তং ত্বাং দীপ্তবিশালনেত্রং দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা প্রব্যথিতঃ প্রভীতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য মম সোঽহং প্রব্যথিতান্তরাত্মা সন্ ধৃতিং ধৈর্য্যং ন বিন্দামি ন লভে শমং চ উপশমং মনস্তুষ্টিং হে বিষ্ণো।২৪।

ভাষ্যানুবাদ। নভস্পৃশ্ অর্থাৎ গগনস্পর্শী – দীপ্ত' প্রজ্বলিত "অনেকবর্ণ' অনেকবর্ণ অর্থাৎ ভয়ানক বিচিত্রাকার রূপ যাহার হয়, তাহার নাম অনেকবর্ণ তুমি সেই অনেকবর্ণ, "ব্যাত্তানন" ব্যাত্ত অর্থাৎ বিবৃত হইয়াছে আননসমূহ মুখনিচয় যে তোমার সেই তুমি ব্যাত্তানন "দীপ্তবিশালনেত্র" 'দীপ্ত" প্রজ্বলিত "বিশাল" বিস্তৃত হয় নেত্রসমূহ যে তোমার, সেই তুমি দীপ্তবিশালনেত্র এই প্রকার বিচিত্রাকার) তোমাকে দেখিয়া হে বিষ্ণো, আমি 'প্রব্যথিতান্তরাত্ম যাহার "অন্তরাত্মা" মন প্রব্যথিত, অতিশয় ভয়যুক্ত হইয়াছে, সেই আমি প্রব্যথিতান্তরাত্মা (হইতেছি) এবং "ধৃতি' ধৈর্য্য লাভ করিতে পারিতেছিনা ও"শম" উপশম অর্থাৎ মনস্তুষ্টিও (লাভ করিতে পারিতেছিনা)।২৪।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥

অন্বয়। দংষ্ট্রাকরালানি কালানলসন্নিভানি তে মুখানি দৃষ্ট্বা দিশো ন জানে ন চ শর্ম্ম লভে হে দেবেশ জগন্নিবাস প্রসীদ। ২৫।

মূলানুবাদ। তোমার মুখসমূহ দংষ্ট্রারাজি দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ মুখসকল যেন প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় জ্বলিতেছে। ঐ সকল মুখ দেখিয়া আমি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি, আমি কিছুতেই সুখ পাইতেছিনা। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। ২৫।

ভাষ্য। কস্মাদ্ দংষ্ট্রাকরালানি দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি তে তব মুখানি দৃষ্ট্বৈবোপলভ্য কালানলসন্নিভানি প্রলয়কালে লোকানাং দাহকোঽগ্নিঃ কালানলস্তৎসংনিভানি কালানলসদৃশানি দৃষ্ট্বেত্যতৎ দিশঃ পূর্ব্বাপরবিবেকেন ন জানে দিঙ্‌মূঢ়ো জাতোঽস্মি অতো ন লভে চ নোপলভে চ শর্ম্ম সুখমতঃ প্রসীদ প্রসন্নোভব হে দেবেশ জগন্নিবাস। ২৫।

ভাষ্যানুবাদ। কি কারণে?—"দংষ্ট্রাকরাল" দন্তরাজি দ্বারা করাল বিকৃত তোমার মুখসমূহকে দর্শন করিয়া (কিরূপমুখ?) "কালানলসংনিভ" প্রলয়কালে লোকসমূহদাহকারী যে অগ্নি, তাহাকে কালানল কহে, সেই কালানলের সংনিভ অর্থাৎ সদৃশ (তোমার মুখ) দেখিয়া এই এইপ্রকার পৃথক্‌ভাবে বুঝিতে পারিতেছি না অর্থাৎ আমি (ভয়ে) দিঙ্‌মূঢ় হইয়াছি এবং "শর্ম্ম"সুখ লাভ করিতে পারিতেছিনা। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও। ২৫।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাঽসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬॥

অন্বয়। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে (এব) অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ (তথা) ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অসৌ সূতপুত্রশ্চ অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বাং (বিশন্তি)। ২৬

মূলানুবাদ। ঐ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসকল অবনিপালগণের সহিত তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং ঐ ভীষ্ম ঐ দ্রোণ এবং এই সূতপুত্র আমাদের পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠগণের সহিত তোমাতে মিশিয়া যাইতেছে। ২৬।

ভাষ্য। যেভ্যো মম পরাজয়াশঙ্কা আসীৎ সা চাপগতা যস্মাৎ অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাঃ দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ "ত্বরমাণা বিশন্তি" ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ সর্ব্বে সহৈব সংহতা অবনিপালসঙ্ঘৈঃ অবনিং পৃথ্বীং পালয়ন্তি ইতি অবনিপালাস্তেষাং সঙ্ঘৈঃ। কিঞ্চ ভীষ্মঃ দ্রোণঃ সূতপুত্রঃ কর্ণঃ তথাসৌ, সহাস্মদীয়ৈরপি ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিভিঃ যোধমুখ্যৈঃ প্রধানৈঃ সহ। ২৬।

ভাষ্যানুবাদ। যাহাদের নিকট হইতে আমার পরাজয়ের আশঙ্কা ছিল, এক্ষণে সেই আশঙ্কা অপগত হইয়াছে, কারণ (তাহারা অর্থাৎ) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ (অর্থাৎ) দুর্য্যোধন প্রভৃতি অবনিপতিগণের সহিত "ত্বরাযুক্ত হইয়া তোমার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে"(এই ব্যবহিত বাক্যাংশের ইহার অন্বয় করিতে হইবে) অবনি অর্থাৎ পৃথিবীকে যাহারা পালন করে, তাহাদিগকে অবনিপাল কহে, তাহাদের সঙ্ঘ অর্থাৎ সমূহ এই অর্থে অবনিপালসঙ্ঘ এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। আরও ভীষ্ম,দ্রোণ এবং সূতপুত্র কর্ণ ইহারাও আমাদের পক্ষের যোদ্ধৃপ্রধান ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির সহিত (তোমার দেহে প্রবেশ করিতেছে) "যোধমুখ্য" যোধশব্দের অর্থ যোদ্ধা, তাহাদের প্রধান পুরুষগণকে যোধমুখ্য বলা যায়। ২৬।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭॥

অন্বয়। ত্বরমাণাঃ (এতে দুর্য্যোধনাদয়ঃ) তে দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তি, কেচিৎ দশনান্তরেষু বিলগ্না চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ সংদৃশ্যন্তে। ২৭।

মূলানুবাদ। (এই সকল দুর্য্যোধন প্রভৃতি) ত্বরার সহিত তোমার দংষ্ট্রাবিষম ভয়ানক মুখনিবহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, কেহবা তোমার দশনরাজি মধ্যে বিলগ্ন রহিয়াছে,উহাদের মস্তকসকল (তোমার দন্তাঘাতে) চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। ২৭।

ভাষ্য। বক্ত্রাণি মুখানি তে তব ত্বরমাণাস্ত্বরাযুক্তাঃ সন্তো বিশন্তি কিংবিশিষ্টানি মুখানি? দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ভয়ঙ্করাণি। কিঞ্চ কেচিৎ মুখানি প্রবিষ্টা লভ্যন্তে চূর্ণিতৈশ্চূর্ণীকৃতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিঃ। ২৭।

ভাষ্যানুবাদ। "ত্বরমাণ" ত্বরাযুক্ত হইয়া (ইহারা) "তে" তোমার "বক্ত্র" মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। কিরূপ মুখ? দংষ্ট্রাকরাল ও "ভয়ানক" ভয়ঙ্কর। আরও তোমার মুখের মধ্যে যাহারা প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহাদের মধ্যেই কেহ কেহ তোমার "দশনান্তর" দন্তসমূহের মধ্যে ভক্ষিত মাংসখণ্ডের ন্যায় লাগিয়া রহিয়াছে, এইরূপ দেখা যাইতেছে। তাহাদের 'উত্তমাঙ্গ" মস্তক-সমূহ (দন্তাঘাতে) "চূর্ণিত" চূর্ণীকৃত হইতেছে। ২৭।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥ ২৮॥
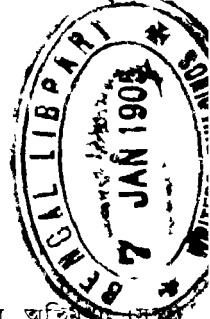
অন্বয়। যথা বহবো নদীনাং অম্বুবেগাঃ সমুদ্রং এব অভিমুখাঃ (সন্তঃ) দ্রবন্তি তথা অমী নরলোকবীরা অভিবিজ্বলন্তি তব বক্ত্রাণি বিশন্তি। ২৮।

মূলানুবাদ। যেমন নদীগণের অনেক জলবেগ সমুদ্রের অভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ এই সকল মনুষ্যবীরগণ তোমার ঐ প্রদীপ্ত মুখনিবহ অভিমুখে প্রবেশ করিতেছে। ২৮।

ভাষ্য। কথং প্রবিশন্তি মুখানি ইত্যাহ যথা নদীনাং স্রবন্তীনাং বহবো-ঽনেকে অম্বুনাং বেগা অম্বুবেগাস্ত্বরাবিশেষাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা প্রতিমুখা দ্রবন্তি প্রবিশন্তি যথা তদ্বৎ তব অমী ভীষ্মাদয়ঃ নরলোকবীরা মনুষ্যলোক-শূরা বিশন্তি বক্ত্রাণি অভিবিজ্বলন্তি প্রকাশমানানি। ২৮।

ভাষ্যানুবাদ। কিরূপে মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহাই বলিতে-ছেন। যেমন "নদী" স্রোতস্বতীগণের "বহু" অনেক "অম্বুবেগ" জলের "বেগ" ত্বরাবিশেষ অভিমুখ হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে, "তথা" সেইরূপ এই ভীষ্মপ্রভৃতি "নরলোকবীর" মনুষ্যলোকের শূরগণ সর্বতঃপ্রকাশ-মান তোমার মুখসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ২৮।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।

তিব্বতে তিন বৎসর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ।] পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

আমি সেই দরিদ্রের আন্তরিক চেষ্টায় ২।৩ দিনের মধ্যেই সুস্থ হই-লাম। কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রমণক্ষম না হইতে হইতেই উত্তরকাশী হইতে আমি টীহরী অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছি দেখিয়া আমার জীবনদাতাস্বরূপ সেই উদার পুরুষের হৃদয় গলিল। সে আমাকে সেইখানে আরও দুই চারি দিন থাকিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবলকায় হইয়া যাত্রা করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল। আমার ভ্রমণের এখনো অনেক বাকী সুতরাং আমার ধীরে ধীরে চলিয়া যাওয়াই উচিত, পথে বসিয়া থাকিলে আমার যাত্রা পূর্ণ হইবে না বলিয়া আমি তাঁহাকে কোনরূপে আশ্বাস দিয়া উত্তরকাশী হইতে যাত্রা করিলাম। আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই দেবচরিত্র লোকটী অনেক দূর আসিল। অকারণ আমার প্রতি তাহার নিঃস্বার্থ অকপট প্রীতির বিষয় ভাবিয়া আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতাবসে পূর্ণ হইল এবং কি বলিয়া যে আমি তাহার ধন্যবাদ করিব এবং কি বলিয়া যে আমার জীবনের সেই পরমোপকারী ব্যক্তিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন সে আমাকে বালকের ন্যায় বলিয়া ফেলিল যে, "এই শীতে আমার জীবনে কখনো লুই গায় দিই নাই"। তাহার এই কথাটী শুনিবামাত্র আমি তাহাকে আমার লুই-খানা দিয়া ভাবিলাম যে, সামান্য একখানি লুই দিয়া আমি যে, এমন একজন উদারচেতা পরমোপকারী পুরুষের মনের একটী সাধও মিটাইতে পারিলাম, ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমার নিকট বিদায় লইবার পর সে অনেকক্ষণ আমার প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পথে চলিতে চলিতে যতই আমি সেই পাগলের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমার তাহাকে একজন প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অতি বালককাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে, অনেক মহা-পুরুষ উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিয়া সাধারণের নিকট অতি গুপ্ত ভাবে থাকিতে ভালবাসেন, উত্তরকাশীর এই লোকটীও কি ঠিক সেইরূপ নহে?

এই একটু অভাবনীয় কারণ বশতঃ উত্তরকাশীতে আমার ৩৷৪ দিন বিলম্ব হয়। তাহার পর উত্তরকাশী হইতে টীহরী পঁহুছিতে আমার বোধ করি ৩৷৪ দিন লাগিয়াছিল। ৺গঙ্গোত্রির উত্তরকাশী হইতে ধরাসু পর্য্যন্ত পথটী আমি দেখি নাই। কারণ, আমাকে উপরে যাইবার সময় ধরাসু হইতে গঙ্গোত্রির কাটা সড়ক ছাড়িয়া অন্য পথে যমুনোত্রি যাইতে হয় এবং যমুনোত্রি হইতে উত্তরকাশীতে আসিয়া আমি গঙ্গোত্রির সড়ক ধরিয়াছিলাম। এই পথে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমার মনে পড়ে না। টীহরীতে পঁহুছিয়াও আমার পুনরায় একবার উদরাময় হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ না হইয়া পার্ব্বত্যপথে ভ্রমণ করিয়াই বোধ করি পুনরায় আমি রোগাক্রান্ত হইলাম। টীহরীতেও এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবা নির্ব্বিকারচিত্তে আমার সেবাশুশ্রূষা করিয়া আমার সেই বিপদের সময় মহদুপকার করিয়াছিল। এখানেও আমাকে ২৷৩ দিনের অধিক থাকিতে হয় নাই। ৺গঙ্গোত্রি হইতে আমি যে এক শিশি জল আনিয়াছিলাম, তাহা এই টীহরীতে আসিয়াই একজন বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারীর সাহায্যে পোষ্ট করিয়া ঠাকুরপূজার জন্য আমাদের বরাহনগর মঠে পাঠাই।

টীহরী হইতে আমি চন্দ্রবদনী দেবীর দর্শন মানসে যাত্রা করিলাম। টীহরী হইতে বরাবর আমাকে নিবিড় আরণ্য পথে যাইতে হইল। মধ্যে মধ্যে কোথাও দুই একটী পাহাড়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই চন্দ্রবদনী দেবীর পথের কথা জিজ্ঞাসা করি। এইরূপে প্রায় সমস্ত দিন চলিয়া আমি বেলা তৃতীয় প্রহরে মন্দিরের ন্যায় অত্যুচ্চ একটী ঘনবনাচ্ছাদিত মনোরম গিরিচূড়ার তলদেশে উপস্থিত হইলাম। এই গিরিচূড়ার শিরোভাগে চন্দ্রবদনী দেবীর মন্দির।

মায়ের মন্দিরের জন্যই বোধ করি হিমালয়ের এই গিরিশৃঙ্গটী বিলক্ষণ রূপে সুসজ্জিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালা হইতে এই গিরিশৃঙ্গটী যেন সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত; দেখিলেই মনে হয় যে, মহাভাগ্য গিরিরাজ হিমালয় সগর্ব্বে জগদম্বাকে এক শিরে ধারণ করিয়া দণ্ডবৎ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এবং অতিশয় ভক্তিবিনম্রচিত্তে অন্যান্য শিরগুলি অবনত করিয়া মাকে ঘিরিয়া নানাবিধ ফল পুষ্প দিয়া নিত্য মায়ের পূজা করিয়া ধন্য হইতেছেন। মায়ের পর্ব্বতটী নিম্নদেশ হইতে ঊর্দ্ধে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম চূড়ার মত হইয়া যাওয়ায়

এবং পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত হওয়ায় জগদম্বার সুবিশাল প্রাকৃতিক মন্দিরের অতুল শোভা বৃদ্ধি হইযাছে।

এই পর্ব্বতের নিম্নে প্রথমেই আমি একটী গ্রামে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, সেই গ্রামের অধিবাসী মাত্রেই মুশলমান। হিমালযের সমগ্র গাড়োযাল জেলায় এই একটী মাত্র মুশলমানের গ্রাম। পার্ব্বত্য স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারোপযোগী গালার চুড়ি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা। কেবল মুশলমান ভিন্ন সেই গ্রামে আর এক ঘরও হিন্দু নাই। সেইখান হইতেই পর্ব্বতারোহণ করিয়া মায়ের মন্দিরে পঁহুছিতে পারিব, কিন্তু কাহার সাধ্য যে সেই দুরারোহ পর্ব্বতে আরোহণ করে? প্রকৃত পথ ছাড়িয়া এই উচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপরে যাওয়া অসম্ভব। আমি পথভ্রান্ত হইযা কোন দিক দিয়াই উপরে উঠিতে না পারিযা সেই পর্ব্বতটী প্রদক্ষিণ করিতে করিতে উপরে মাযের মন্দিরে যাইবার একটী পথ দেখিতে পাইলাম। সেই পথ ধরিয়া বরাবর উপরে উঠিতে উঠিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মায়ের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

উপরে উঠিয়াই মনে হইল যে, মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য গিরি-চূড়ার সূক্ষ্মাগ্র ভাগটী সুন্দর সমতল করিয়া দেওযা হইয়াছে। জগন্মাতা চন্দ্রবদনী দেবীর অধিষ্ঠানের জন্যই যেন সর্ব্বতোভাবে মায়ের মন্দি-রের উপযোগী হইযাই এই গিরিশৃঙ্গটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। উপরে পঁহুছিয়াই মনে হইল যে, আমি সদামুখরিত নিত্যকোলাহলপূর্ণ বহুবিপ্লবগ্রস্ত নর-লোক হইতে বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি। এখানে পৃথিবীর কোন গোল নাই। সবই মহানিস্তব্ধ। এখানে পঁহুছিলে মনে হয় যেন চরাচর ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত মৌনব্রত ধারণ করিয়া রহিযাছে। এখানে যে পঁহুছিবে, তাহারও হৃদয় এই গভীর নিস্তব্ধভাবে মিশিয়া যাইবে! উপরে উঠিয়াই হিমালয়ের দিগন্ত-বিস্তৃত সুবিশাল অপার দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমার শ্রান্তি দূর হইতে ক্ষণেকও বিলম্ব হইল না। যে দিকে তাকাই, কেবল অনন্ত-গগন-বিহারী অসংখ্যগিরিশৃঙ্গসমন্বিত হিমালযের বিরাট মূর্ত্তি যেন আকাশ পাতাল ব্যাপিযা দণ্ডায়মান হইযা রহিয়াছে। উত্তরে অপার ও অগম্য শুভ্র চির-হিমানী মহাস্মিতবদনে অনন্তের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। শুভ্র জ্যোতিঃ-পুঞ্জকায় সুবিশাল হিমানী হইতে যেন অনন্ত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া

জগৎকে আলোকিত করিতেছে। না জানি কি মহান্ অসীম সৌন্দর্য্যরাশির ঘনীভূত মূর্ত্তি এই অনন্তভাবসম্পন্ন চিরহিমানী! এখানে সকলই মহা-নিস্তব্ধ, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। মনে হয় যেন সমগ্র জগৎ এক অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ! অনন্তের ধ্যানে মগ্ন হইয়া যেন সকলেরই বাক্‌রোধ হইযাছে। যাহা হউক্ আমি হিমালযের বিরাট্ দেহে অনন্তশক্তিরূপিণী মহামাযার আবির্ভাব দর্শন করিযা ধন্য হইলাম।

মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একবার চারিদিকে হিমালযের অপূর্ব্ব-শোভাসমন্বিত বিরাট্ মূর্ত্তি ভাল করিযা দেখিযা লইলাম। তাহার পর মাযের মন্দিরাভ্যন্তরে গিযা মহামাযার অনন্ত মহিমা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলাম। এখানে মাযের একখানি যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহাতেই মাযের পূজা হয; কোন প্রতিমা নাই। মাযের মন্দিরটী নিতান্ত অনুচ্চ ক্ষুদ্রাযতন প্রস্তরনির্ম্মিত একখানি ঘর এবং তাহার পার্শ্বেই যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য আর একখানি ছোট ঘর আছে। এইরূপ উচ্চগিরিশৃঙ্গের উপরে বাযুর বেগ এমনি প্রবল হয় ও উহা এমনি ভীষণ শব্দের সহিত বহিতে থাকে যে, মনে হয় যেন প্রকৃতির মহানিস্তব্ধ ভাব পবন-দেবের অসহ্য, যেন হিমালয়ের অনন্ত সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য তিনি সদা ব্যগ্র। চন্দ্রবদনী দেবীর পর্ব্বতের উপরে সময সময় এমনি প্রবল বেগে বাযু বহিতে থাকে যে, সেই উন্মুক্ত গিরিশৃঙ্গে দাঁড়াইযা থাকিতেও ভয় হইত, মনে হইত যে, সেই প্রবল বাযুর এক ঠেলাতেই না জানি আমি কোথায় গিযা পড়িব। সুতরাং এইরূপ উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে সুবৃহৎ হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হওযা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই সুবৃহৎ উচ্চ পর্ব্বতচূড়াই এখানে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী অনন্তশক্তিরূপিণী জগজ্জননী মহামাযার প্রকৃত মন্দির।

প্রকৃতির সুবিশাল বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত শোভার নিদান বৃহৎ গিরিমন্দিরে, মনুষ্যের কারুকার্য্য ও শিল্পরচনা স্থান পায না। সেই জন্যই এই তীর্থবহুল পার্ব্বত্য প্রদেশের মন্দিরগুলিতে মানবীয সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্য বা কারুকার্য্যের বিশেষত্ব নাই। যে মহাশক্তির এক লেশ আশ্রয় করিয়া মনুষ্য মহাশক্তিশালী ও সকল গুণের আধার হইযা জন্মিয়াছে, যে মহা-শক্তির এক কটাক্ষে এইরূপ অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে, সেই মহাশক্তি প্রকৃতি যেখানে আপনার উপযুক্ত মন্দির আপনি সৃজন করিযা তাহা বিরলে বসিযা মনের সাধে সাজাইযাছেন, সেই

থানে মানবীয় কলাকৌশল, শিল্পচাতুর্য্য ও বিদ্যাবুদ্ধি সকলই লয় পায়। সেই জন্যই বোধ হয় দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দু ও বৌদ্ধগণ স্ব স্ব উপাস্য দেব দেবীর মন্দিরাদি নির্ম্মাণে যে শক্তি ব্যয় করিয়া মানবীয় শিল্প-নৈপুণ্য ও কলাবিদ্যার চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, পার্ব্বত্য প্রদেশের মন্দিরাদি নির্ম্মাণে তাঁহারা সে প্রযাস করেন নাই।

সে যাহা হউক, আমি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজারীঠাকুর যেখানে মাযের ভোগের আয়োজন করিতেছিলেন, সেইখানে গিযা বসিলাম। মন্দিরের ভিতর দুইভাগে বিভক্ত; একভাগে কেবল মায়ের মন্দির ও অপরটীতে মাযের পাকশালা ও পূজারী ব্রাহ্মণের থাকিবার স্থান। একমাত্র মায়ের সেই পূজক ব্রাহ্মণ ভিন্ন সেখানে তখন আর কেহ ছিল না। আমার সেখানে পঁহুছিবার কিছুক্ষণ পরেই একটী পাহাড়ী এক ঘড়া জল লইযা তথায আসিযা উপস্থিত হইল। সেই ব্যক্তি দেবীর একজন টহলুয়া সেবক। এ ব্যক্তি পূজারী ব্রাহ্মণকে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে সে প্রত্যহ ভোগ বাঁধিবার জন্য জল লইযা আইসে এবং পূজার অন্যান্য কায করিয়া দেয়। যাহা হউক, এতক্ষণে আমরা সেই দুর্গম নিভৃত উচ্চ গিরিশৃঙ্গে তিনটী প্রাণী একত্র হইযা কিছুক্ষণের জন্য পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিয়া মর্ত্ত্যলোকের অতি ক্ষীণ সত্তা উপলব্ধি করিলাম। তিনজনে মিলিত হইয়া একবার লোকালয়ের অস্তিত্ব অনুভব করিলাম। সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবলমাত্র আমাদের তিনজনের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। ব্রাহ্মণ মায়ের ভোগ বাঁধিতে লাগিলেন আর আমি তাঁহাকে চন্দ্রবদনী দেবীর সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

সেই পূজক ব্রাহ্মণ এবং পরে অন্যান্য পার্ব্বত্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখেও শুনিযাছি যে, সতীর বক্ষঃস্থল এইখানে পতিত হয়। দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, মন্দিরের উপরিভাগ সম্পূর্ণরূপে একখানি মোটা চাঁদোযা দ্বারা আচ্ছাদিত। শুনিলাম যে, দেবীর মূল যন্ত্রখানি আর কেহ দেখিতে পায না, তাহা সেই চাঁদোয়া দ্বারা সদা আবৃত রহিযাছে। চাঁদোযা পরিবর্ত্তনের সময় অগ্রে নূতন চাঁদোয়াখানি টাঙ্গাইযা পুরাতন চাঁদোযাখানি বাহির করিয়া লওয়া হয়। জনপ্রবাদ এই যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মহাপবিত্র স্থানে আসিয়া দেবীর প্রাচীন মূল যন্ত্রখানি লোকচক্ষুর অগোচর করিয়া গিযাছেন এবং এই নূতন যন্ত্রখানি

স্থাপন করিয়া মূল যন্ত্র দর্শন কবিতে সকলকে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি নাকি মূল যন্ত্রখানি আর কেহ দেখিতে পায় না। ইহাও শুনিলাম যে, যদি কেহ হঠাৎ সেই যন্ত্রখানি দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে। এই সংস্কার যে কেবল এই খানেই তাহা নহে, দেবীর অধিকাংশ পীঠস্থানেই এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, মূল পীঠের কোথাও দর্শন হয় না এবং তাহার দর্শন ঘটিলেই মৃত্যুর সম্ভাবনা। চন্দ্রবদনী দেবীর পর্ব্বত দেশীয় গড়োয়ালের টীহরী রাজ্যে। টীহরীর রাজা বহুকাল হইতেই দেবীব পূজার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পর্ব্বতের অনতিদূরবর্ত্তী পূজার নামক একখানি গ্রামের অধিবাসী ব্রাহ্মণ মাত্রেই দেবীর পূজক ; টীহরীরাজকর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই গ্রামেব উপসত্ব দেবীর পূজক ব্রাহ্মণগণই পুরুষানুক্রমে ভোগ কবিযা আসিতেছেন। পর্য্যায়ক্রমে সেই গ্রামেব ব্রাহ্মণগণ মায়ের পূজা করিতেছেন। দেবীর টহলুয়া সেবকগণেরও বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে।

মার ভোগ প্রস্তুত হইতে হইতেই আমি তাঁহার অনেক কথা জানিয়া লইলাম। তাহাব পর রাত্রি প্রায় ৯টার মধ্যেই দেবীব পূজা, আরতি ও ভোগ হইল। এখানে প্রত্যহ শীলে চাউল গুঁড়াইযা তাহা তেলে ভাজিয়া মার ভোগ দেওয়া হয়। কেন যে এই পদার্থ মার এত প্রিয হইল, সে সম্বন্ধে আমাকে সেই ব্রাহ্মণও কিছুই বলিতে পাবিলেন না। চাউলেব গুঁড়া রুটী ও একটু দুধ দিয়া মাযের ভোগ হইল। আমিও সেই বাত্রিতে মাযের সেই প্রসাদ পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। সেই চাউলের গুঁড়া প্রসাদ যে, এত মিষ্ট লাগিবে, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, মহামায়ার প্রসাদ লাভ করিয়া পরমানন্দিতমনে বসিযা আছি, এমন সময পূজারী ঠাকুব অতিশয় ভদ্রতার সহিত আমাকে রাত্রিবাসের জন্য বাহিরেব সেই ধর্ম্মশালা ঘরটীতে যাইতে বলিলেন। তাঁহারই মুখে শুনিলাম যে, কিছুদিন পূর্ব্বে টীহরীরাজকর্ত্তৃক প্রদত্ত দেবীর পূজার কতকগুলি রূপাব বাসন জনৈক সাধুবেশধারী যাত্রী গভীর নিশীথে দেবীর মন্দির হইতে চুরী করিয়া পলায়ন করে। তাহাব পূর্ব্বে সাধু সন্ন্যাসী যাত্রীগণকে মন্দিরাভ্যন্তরে থাকিতে দেওযা হইত। এই ঘটনার পব হইতে মাযেব পূজক ব্রাহ্মণ ও সেবক ভিন্ন মন্দিরের মধ্যে বাত্রিকালে আব কেহ থাকিতে পায় না। সুতরাং আমাকে বাধ্য হইযা সেই ধর্ম্মশালাতে গিযা রাত্রিযাপন কবিতে হইল।

স্নিগ্ধ বিমল জ্যোৎস্নার রাত্রিতে হিমালয়ের যে অদ্ভুত বিচিত্র দৃশ্য নয়নগোচর হয় এবং সেই অপার ও চমৎকার স্বর্গীয় দৃশ্যের অবলোকনে যুগপৎ হৃদয় যে মহাবিস্ময় ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার বিষয় নহে। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সম্মুখে সেই মহান্ পবিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া বরং সমস্ত রাত্রি আমি বিশেষ আনন্দেই কাটাইলাম। যাহা হউক, মার কৃপায় প্রথম রাত্রি তো আমার পরমানন্দেই কাটিয়া গেল। তাহার পরদিনও সেই ভাবেই মায়ের পূজা দেখিলাম ও প্রসাদ পাইলাম। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে সেই পূজারী ও টহলুয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকেও মার মন্দিরে আসিতে দেখি নাই। আমি একবার অপরাহ্নে মার মন্দিরে যে ধারা হইতে জল আইসে, সেই পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিলাম। মায়ের মন্দির হইতে জলের জন্য অনেকটা নীচে নামিতে হয়। দুই রাত্রি বাস করিয়া তথা হইতে শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা করিবার মানস করিলাম। চন্দ্রবদনী দেবীতে দুই রাত্রি মাত্র থাকিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। সকল বিষয়ের সুবিধা হইলে আমি সেইখানে আরও কিছুদিন থাকিতাম। কিন্তু দুই একদিনের অধিক সেই দুর্গম গিরি-শিখরে কাহাকেও রাখিতে দেবীর পূজকগণ অসমর্থ। কেবল ২।১ জন সাধু সন্ন্যাসীকে দুই এক দিনের জন্য তাঁহারা মায়ের চারটী প্রসাদ দিয়া কোন রূপে সৎকার করিতে পারেন। এই সকল দুর্গম স্থানে দুই একদিন থাকাও বিষম কষ্টকর। অতি কষ্টেই যৎসামান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পূজারী ব্রাহ্মণ মায়ের পূজা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপ নানা অসুবিধা হওয়ায় আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছাসত্বেও আমি সেই-খানে অধিককাল থাকিতে পারিলাম না। ভগবতীর চরণে প্রণাম করিয়া পুনরায় যেন আমি তাঁহার দর্শন করিতে তথায় আসিতে পারি, এই প্রার্থনা করিলাম। দিনান্তে সামান্য দুই গ্রাস মাত্র অন্নের সংস্থান থাকিলেও আমি আরও ২।৪ দিন চন্দ্রবদনী দেবীতে থাকিতে পারিতাম।

কিন্তু কি করি, উপায় নাই বলিয়াই আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে মায়ের নিকট "আবার আসিব" বলিয়া বিদায় লইতে হইল। মায়ের পূজারী ব্রাহ্মণও আমাকে তথা হইতে শ্রীনগরে যাইতে পরামর্শ দিলেন। কারণ, শ্রীনগরে পঁহুছিলেই আমি ৺কেদার বদরীনারায়ণের পথ পাইব।

চন্দ্রবদনী হইতে একদিনেই শ্রীনগরে পঁহুছিতে পারা যায়। নিবিড় আরণ্যপথে প্রায় অর্দ্ধেক দিন চলিয়া শ্রীনগর হইতে যে কাটা সড়ক্ টীহরীতে গিয়াছে, সেই সড়ক ধরিয়া শ্রীনগরে যাইতে হয়। পূজারী ঠাকুর মন্দির হইতে কিছুদূর আসিয়া আমাকে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিবার একটী পথ, এবং দূর হইতে তাহাদের গ্রামখানি দেখাইয়া বলিল যে, আমি ঐ গ্রামে পঁহুছিতে পারিলেই তথা হইতে নিরাপদে শ্রীনগরে পঁহুছিতে পারিব। জন-মানবশূন্য ঘোর অরণ্য ও সেই অতি সংকীর্ণ মনুষ্যপদচিহ্নিত পথ দেখিয়া আমি পূর্ব্বেই মনে করিয়াছিলাম যে, পথ হারাইব। ফলে কিছুদূর যাইতে যাইতে তাহাই হইল। চন্দ্রবদনী দেবী হইতে যে পূজার গ্রাম লক্ষ্য করিয়া আমি অগ্রসর হইতেছিলাম, কিছুদূর গিয়াই আর আমি তাহা দেখিতে পাইলাম না। ক্রমশঃ এক মহাঘোর নিবিড় অরণ্যমধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার চতুঃপার্শ্বে কেবল ঘন নিবিড় বন; সূর্য্যালোকের পর্য্যন্ত প্রবেশ নাই। সেখানে গিয়া পথেরও আর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষম দুরারোহ পর্ব্বতা-রণ্যে পথভ্রান্ত হইয়া হঠাৎ একদিকে যাইতেও সাহস হইল না। তখনো আমি দেবীর মন্দির হইতে অধিক দূর নামিতে পারি নাই। কোন্ দিকে গেলে আমি ঠিক পথে পঁহুছিব, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে না পারিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলাম।

এমনই স্থানমাহাত্ম্য যে, অমন বিপৎসঙ্কুল কঠিন স্থানে পথহারা হইয়াও হতাশের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে নাই। কারণ, সেই স্থান যে স্বর্গতুল্য, তাহার যেখানেই থাকি স্বর্গসুখ। হিমালয়ে বিচিত্রলীলাময়ী প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার স্তূপাকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, প্রায় এক ঘণ্টাকাল সেই খানে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিলাম। আমি জানিতাম যে, পথ করিয়া লইব,' সেই স্থানেই আমাকে পড়িয়া থাকিতে হইবে না। এই নিশ্চয় ধারণা ছিল বলিয়া আমি এইরূপ বিপদের জন্য বড় ভাবিয়া ব্যাকুল হইতাম না। প্রায় এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়াও যখন এমন একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, যাহাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া জয় মা জগদম্বা! বলিয়া আপন মনে একদিকে চলিলাম। যত যাই, ঘোরতর নিবিড় বনের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলাম এবং ক্রমশঃই ওৎরাই

প্রকাণ্ড একটী পর্ব্বতের উপর হইতে নিম্নে যাইতেছি। পর্ব্বতের উপরে উঠা অপেক্ষা নামিবার সময় অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা থাকে। পর্ব্বত ভ্রমণে অভ্যস্ত ব্যক্তিমাত্রেই ইহা জানেন যে, পর্ব্বতে উঠিবার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ আযত্তে রাখিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু নীচে নামিবার সময় যেন সামাল, সামাল, নিজের পায়ের উপর তখন কোন জোর থাকে না, একটুতেই গড়াইয়া যাইতে হয়। হিমালয়ের উচ্চ হিমবান্ পার্ব্বত্য প্রদেশের উত্তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গারোহণ অবরোহণ যেরূপে করিতে হয়, তাহা আমি ক্রমশঃই প্রকাশ করিব।

পাহাড়ের চড়াই ওৎরাইয়ের এই ত মোটে আরম্ভ,—কেদার বদরী যাইতে আমাকে এখনো কত চড়াই ওৎরাই করিতে হইবে, বলা যায় না, তাহার পর তিব্বত।

যাহা হউক, এক্ষণে আমি সেই ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ বিকট পথে কোথায় যাইতেছি, দেখা যাউক,—আমি সেই প্রকাণ্ড পর্ব্বত হইতে যে দিক্ দিয়া নামিতে লাগিলাম, সেই দিকে কথনো মনুষ্যের পদসঞ্চার হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। এইরূপে অনন্ত জীবনিবহের একমাত্র নিয়ন্তা ভগবান্ আমাকে যেদিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন, আমিও সেই দিকেই চলিতে লাগিলাম। কিন্তু ক্রমশঃই আমি বিষম ওৎরাইয়ে আসিয়া পঁহুছিলাম, নামিয়া যাওয়া একান্তই কঠিন বোধ হইতে লাগিল। সেখানে আর সমান পা ফেলিয়া যাইবার জো নাই। তবে সেখানে রক্ষা পাইবার প্রধান কারণ হইল এই যে, সেই পর্ব্বতগাত্র শুষ্ক পাষাণময় না হইয়া ঘনতৃণবনাচ্ছাদিত হওয়ায় আমি পিঠে ভর দিয়া নরম মৃত্তিকায় পা বসাইতে বসাইতে, বৃক্ষশাখা ও তৃণগুচ্ছাদি ধরিতে ধরিতে প্রায় দুই তিন মাইল নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

কি কঠিন স্থান যে অতিক্রম করিয়া আসিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পার্ব্বত্য প্রদেশের কঠিন স্থানবিশেষে ৫।৭ মাইল পথ চলিতেই সমস্তদিন লাগিয়া যায়। যাহা হউক, এইরূপে আমি বেলা দ্বিপ্রহরের সময় একটী নিরাপদ সমতল স্থানে পঁহুছিয়া দেখিলাম যে, একটি পাহাড়ী-কৃষক একখণ্ড অল্পপরিসর শস্যক্ষেত্রে বসিয়া পক্ক গোধূমশীর্ষ আহরণ করিতেছে এবং একটি শুষ্ক তৃণপত্ররাশির অগ্নিকুণ্ড করিয়া তাহাতে উষ্মী করিতেছে। সদ্য-আহৃত অর্দ্ধপক্ক তৃণানল-

সংভৃষ্ট যবগোধূমমঞ্জরীকে ঐ অঞ্চলের পাহাড়ীরা উম্বীই বলে। যব ও গম পাকিলে পাহাড়ে উম্বী খাইবার ভারি ধুম লাগিয়া যায়। পাহাড়ী স্ত্রী, পুরুষ, ছেলেপিলে সকলে মিলিযা উম্বী খাইবার জন্য দল বাঁধিযা আপন আপন ক্ষেতে গিযা শুষ্ক তৃণপত্রাদির অগ্নিতে যব ও গমের শীষগুলি ভাজিযা তৃণদণ্ড হইতে একটি একটি করিয়া শস্য ছাড়াইযা কোঁচড ভরিযা খাইবে। তাহাতে তাহাদের বড়ই আনন্দ। যাহা হউক, আমার পাহাড হইতে নামিতে কেবল পা দুইখানি কাঁটা গাছে একটু একটু ছড়িযা যাওযা ভিন্ন আর কিছুই হয নাই। নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইযা একেবারে জলযোগের যোগাড দেখিযা বড়ই আনন্দ হইল। বিকট পথশ্রমে ক্ষুধা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এক্ষণে একটু বিশ্রামসুখ উপভোগ না করিতে করিতেই (এদিকেও বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছিল) আমার জঠরানল স্বভাবতঃই উদ্দীপ্ত হইল। পাহাড়ী ভাযা তো এক মনে উম্বী করিতে করিতে হঠাৎ আমাকে সেইখানে পঁহুছিতে দেখিযাই চমকাইযা গেল ও কিছুক্ষণের জন্য আমার দিকে তাকাইযা অবাক্ হইযা রহিল। তাহার পর সে পাহাড়ী কথায আমি কিরূপে কোথা হইতে সেইখানে আসিলাম, জিজ্ঞাসা করিল। আমি চন্দ্রবদনী দেবী হইতে সেইখানে আসিয়াছি শুনিয়া তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

ক্রমশঃ।

ব্রহ্ম কি?

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

এখন জড় ও চেতন যদি পৃথক্ হইযাও একত্র অবস্থান করে, অন্যথা করে না বুঝিলাম, তখন ইহাদের মূল কিছু আছে কিনা ও যদি থাকে, তবে তাহা কিরূপ, বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। প্রথমেই এই জড় ও চেতনের মূল থাকা না থাকা সম্বন্ধে কতপ্রকার মত আছে, আর কত প্রকারই বা হইতে পারে, দেখা যাউক। কারণ, তাহা হইলে একে একে তাহাদিগের আলোচনা করার সুবিধা হইবে। চিৎ ও জড়ের মূল সম্বন্ধে পরপৃষ্ঠায় লিখিত প্রায ১৬টি মত বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত যাহা হইতে পারে, তাহা যুক্তিবহির্ভূত কল্পনা মাত্র।

জড় ও চেতনের কারণ।
(১) কারণ নাই
(২) অজ্ঞেয়
আছে
এক
বহু
জাতিগত
ব্যক্তিগত
নিমিত্ত ও উপাদান
উপাদান
উভয়াত্মক
অনুভয়াত্মক
উভয়াত্মক
অনুভয়াত্মক
জড় (৩)
চেতন (৪)
জড় (৫)
চেতন (৬)
জড় (৭)
চেতন
জড় (১০)
চেতন (১১)
অভিন্ননিমিত্ত-বিবর্তোপাদান কারণ (৮)
অভিন্ন নিমিত্ত-পরিণামী উপাদান কারণ (৯)
নিমিত্ত। ঈশ্বর চেতন একটী
উপাদান। অনীশ্বর জীবচেতন ও জড় পৃথক্‌২
(১২)
জড় বা চেতন একটী মাত্র পৃথক্‌২।
জড় ও চেতন উভয় পৃথক্‌২(১৫
জড় চেতন।
১৩ ১৪
বহুজীবচেতন নিমিত্ত কারণ
বহুজড় পরমাণু উপাদান কারণ
১৬

উক্ত বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত ১৬টী মত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১ম। জড় ও চেতনের কারণ নাই, ইহারা চিরকালই এইরূপ, নিয়ত পরিবর্ত্তনে নিত্য নূতন নূতন পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র।

২য়। ইহাদের স্বরূপ চিরকাল অজ্ঞেয় সুতরাং ইহাদের কারণও চির অজ্ঞেয়।

৩য়। ইহাদের কারণ একজাতীয় জড় ও চেতন উভয়াত্মক জড়বিশেষ।

৪র্থ। ইহাদের কারণ একজাতীয় জড় ও চেতন উভয়াত্মক চেতন-বিশেষ।

৫ম। ইহাদের কারণ একজাতীয় জড় মাত্র।

৬ষ্ঠ। ইহাদের কারণ একজাতীয় চেতন মাত্র।

৭ম। ইহাদের কারণ একটী চিজ্জড়াত্মক জড়বিশেষ।

৮ম। ইহাদের কারণ একটী চিজ্জড়াত্মক অভিন্ন-নিমিত্ত-বিবর্ত্ত-উপাদান-কারণভূত চেতন।

৯ম। ইহাদের কারণ একটী চিজ্জড়াত্মক নিমিত্ত-পরিণামী-উপাদান-কারণভূত চেতন।

১০ম। ইহাদের কারণ একটী জড়।

১১শ। ইহাদের কারণ একটী চেতন।

১২শ। ইহাদের কারণ নিমিত্ত রূপে ঈশ্বরচেতন, উপাদানরূপে অনীশ্বর· পৃথক্ পৃথক্ বহু জীবচেতন ও বহু জড়।

১৩শ। ইহাদের কারণ বহু উপাদানভূত জড়।

১৪শ। ইহাদের কারণ বহু উপাদানভূত চেতন।

১৫শ। ইহাদের কারণ বহু উপাদানভূত জড় এবং চেতন।

১৬শ। ইহাদের কারণ বহু জীবচেতন নিমিত্ত কারণ ও বহু জড় পরমাণু উপাদান কারণ।

১ম মতটী ভুল। জগতের কারণ আছে, ইহার সূক্ষ্মাবস্থা আছে। প্রাণি-জগতে বিশেষ বিশেষ জাতীয় প্রাণীর ক্ষয়, জ্যোতিষ্কমণ্ডলে গ্রহ উপগ্রহের লয়, প্রত্যক্ষীকৃত এবং নির্দ্ধারিত সত্য। অঙ্গীভূত জাতি বা গ্রহ উপগ্রহাদি লয়ে অঙ্গভূত সমগ্র জগতের লয় ন্যায়সিদ্ধ। নিবিউলা বা তরলাবয়ব-বিশিষ্ট পরমাণুপুঞ্জই যে সূর্য্যাদিক্রমে উৎপন্ন, ইহাও সিদ্ধান্ত মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

২য়টী অজ্ঞেয়বাদ। জড় ও চেতনের স্বরূপ অজ্ঞেয়, সুতরাং ইহাদের মূলও অজ্ঞেয়। ইহা কতিপয় আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত। এ মতের ফলে আমাদের কারণান্বেষণে প্রবৃত্তি না হওয়াই উচিত কিন্তু ঐ মতাবলম্বিগণ জ্ঞানোন্নতির পক্ষে যথেষ্ট বদ্ধপরিকর। অজ্ঞেয় বলিলেও যে ঐ দুই বিষয় কতকটা জ্ঞেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই কতকটা যে কতদূর, তাহা কি করিয়া স্থির হইবে? অজ্ঞেয়বাদিগণ যোগশক্তিসাধ্য ব্যাপারসমূহের তথ্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া উহাদের অস্তিত্বেও সন্দিহান! যাহাই হউক, জড় ও চেতন পৃথক্. এইরূপ স্থূল দৃষ্টিতে অজ্ঞেয় বলা অযুক্তিযুক্ত নহে। পরন্তু জড় ও চৈতন একাশ্রিত বা এক, এমত খণ্ডনে অজ্ঞেয়বাদের যুক্তি পরাজিত। অতএব জড় চেতনের কারণানুসন্ধান যে অনুসরণযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৫ম, ৬ষ্ঠ, ১০ম, ১১শ সংখ্যক মতগুলিতে জড় ও চেতনের কারণ অনুভয়াত্মক। ইহাও ঠিক নহে, কারণ, কিছু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, সমস্তই জড় ও চেতনাত্মক এবং জড় চেতন উভয়াত্মক বস্তু দ্বারাই জড় ও চেতন সংক্রান্ত জ্ঞান হয়। সুতরাং ইহাদের মূল উভয়াত্মক হওয়াই অধিক সম্ভব।

৩য়, ৪র্থ, সংখ্যক মত দুইটীতে ইহারা এক জাতীয় ও উভয়াত্মকরূপে স্বীকৃত। কিন্তু একজাতীয় বলিলে কারণব্যতিরিক্ত আরও কিছু পদার্থ স্বীকার করা হয়। ইহার প্রথম হেতু এই যে, একজাতীয় বস্তু অনুভব করিতে হইলে তাহাদের সীমা ও আকৃতি স্বীকার করিতে হয়। তাহা অন্য বস্তু না থাকিলে অসম্ভব সুতরাং একজাতীয় পদার্থ স্বীকার করা হইল না, দুই বা বহু জাতীয় পদার্থ স্বীকার করা হইল। দ্বিতীয় হেতু এই যে, চিজ্জড় বলিতে আমরা সমস্ত বস্তুই ইতিপূর্ব্বে বুঝিয়াছি। দেশ কাল প্রভৃতিও গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং 'একজাতীয় উভয়াত্মক' পদার্থই মূল কারণ বলা ঠিক নয়। কোন কোন মতাবলম্বীরা দেশকালকে ছাড়িয়া দিয়া একজাতীয় উভয়াত্মক বস্তুই চিজ্জড়ের কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন। কিন্তু আমরা সমস্ত বস্তুর আদিম কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত সুতরাং ওরূপ মত আমাদের অনুসরণীয় নহে। যদি দেশকালের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া আপত্তি করা হয়, তাহা হইলে বলিব, না, উহা অসম্ভব নহে। একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থের প্রথম বিকৃতি ও আকৃতি পর্য্যায়ক্রমে কাল ও দেশের উৎপত্তির কারণ, এইরূপ হওয়াই সম্ভবপর।

১৩শ, ১৪শ, ১৫শ, এই মতগুলিতে বহু উপাদান কারণ সমষ্টিতেই এই জগৎ। এটীও আদরণীয় নহে। যেহেতু কেবল উপাদান কারণে এ জগৎরূপ কার্য্যে নিয়মের শৃঙ্খলা থাকা অসম্ভব। ইহার মূলে কোন বুদ্ধিমানের অস্তিত্ব অনুমান না করিলে কতকগুলি কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ব্যাপারের হেতু অনির্ণীত থাকিয়া যায় ও আমাদের স্বাভাবিক অনুমান বৃত্তিটিকেও সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া দিতে হয়! সত্যনির্ণয়ে ঐ বৃত্তিই আমাদের প্রধান সহায় এবং উহার সহায়তা গ্রহণ না করা যে প্রশংসনীয় চেষ্টা নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক ধারণা বিজ্ঞানালোকে অন্যথা প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া ঈশ্বরাস্তিত্ববোধও যে একদিন ঐরূপ ভুল প্রমাণ হইবে, ইহা অনুমান করা ন্যায়বিরুদ্ধ।

১৬শ মতটীও সুন্দর নহে। অসংখ্য জীব নিমিত্তকারণ হইলে এ জগতে বিশৃঙ্খলাই সম্ভব।

৭ম, ৮ম, ৯ম, ১২শ, এক্ষণে এই চারিটী মত অবশিষ্ট রহিল। তন্মধ্যে ৭ম মতের সহিত ৮ম, ৯ম মতের কোন ভেদ স্বীকার করা যায় না। ৭ম মতে উভয়াত্মক একটী জড়ই কারণ আর ৮ম, ৯ম মতে উভয়াত্মক একটী চেতনই কারণ। উভয়াত্মক বলায় জড় বা চেতন এতদুভয়ে বাস্তবিক কোন ভেদ থাকিতে পারে না। কেবল কথার পার্থক্য মাত্র বর্ত্তমান থাকে। ৮ম, ৯ম, ১২শ মতগুলিই আমাদের দেশে প্রধানতঃ আদরণীয়। আদি বিদ্বান্ মহর্ষি কপিল হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমান্ শঙ্কর, শ্রীমান্ রামানুজ, শ্রীমান্ মধ্ব, শ্রীমান্ বল্লভ এবং মহাপ্রভু চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের প্রচারিত মতগুলি উক্ত মতত্রয়ের প্রকারভেদমাত্র। তাঁহাদের মতের বিস্তৃত আলোচনা যথেষ্ট সময় ও সহিষ্ণুতা সাপেক্ষ। অতএব উহাদের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আলোচনা কালে তাঁহাদের প্রচারিত মতগুলি আনুসঙ্গিক ভাবে বিচার করিয়া দেখিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, ব্রহ্ম এক কিনা, এবং এক হইলে কি প্রকারের 'এক'। দেখিতে পাওয়া যায়, 'এক' শব্দ নানা প্রকারে ব্যবহার হয়। পরন্তু ইহা যে 'দ্বি' ও বহু শব্দের বিরোধী, তাহাতে সংশয় নাই। ব্যক্তি, জাতি, গুণ ও কাল প্রভৃতি, সমগ্র বা কোন একটী অর্থ অবলম্বনে 'এক' শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে। কোন বস্তু 'দ্বি' বা 'বহু' হইলে তাহাতে ভেদ থাকে, এক বলিলে কিন্তু ভেদের অভাব বুঝায়। একটী দ্রব্যেতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত

যে পরস্পরভেদ, তাহ অবয়বগত ভেদ বা স্বগতভেদ। এই ভেদসত্ত্বেও সেই বস্তুটীকে এক বলা যাইতে পারে। যথা আমাদের এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-বিশিষ্ট দেহ। একাধিকসংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু যদি একরূপ কার্য্যকারী—একপ্রকার চেতনবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে 'এক' বলা যায়। ইহা জাতি অর্থে 'এক', এবং ইহাতে বিজাতীয় ভেদের অভাব বুঝায়। এক বস্তু ও তাহার গুণ পৃথক্ রূপে অনুভূত হইলেও তাহাদের যে একত্ব, তাহা গুণ অর্থে একত্বের বোধক। গুণ আবার আকস্মিক ও স্বাভাবিক দ্বিবিধ হইতে পারে। এস্থলে স্বাভাবিক গুণের কথাই বলা হইল। কালার্থে একত্ব বলিলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে এক ছিল, এখন তাহা নহে; বা এখন এক নহে, পরে একে পরিণত হইবে।

বিজ্ঞানের চক্ষে জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, বহুত্বাত্মক জগতের বাহিরে বহুত্ব থাকিলেও একত্ব সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছে। বহুর মূলে এক অনেকস্থলে পরিলক্ষিত হইলেও বহুও সঙ্গে সঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ কারণের কার্য্যে পরিণতি, মূল কারণের সহিত সহকারী কারণের সদ্ভাব প্রমাণ করে। আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতাগ্রণী কেহ কেহ 'এক' হইতে 'বহুর' উৎপত্তি প্রমাণীকৃত করিতেছেন, কিন্তু তাহা হইলেও যে 'বহুর' কারণ একই হইতে হইবে, তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে পারেন নাই। বিজ্ঞান 'বহুর' কারণ 'এক' হইবার নিশ্চয় প্রযোজনীয়তা প্রদর্শন না করিতে পারিলেও দর্শনশাস্ত্র তাহাতে সমর্থ। যদি সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে তাহা 'একেতে' যেরূপ সঙ্গত হয়, 'বহুতে' সেরূপ সঙ্গত হয় না। 'বহুরই' কোন উদ্দেশ্য বর্ত্তিঃ জগৎ অতএব জগৎ বলিলে শৃঙ্খলার অভাব বোধই যে স্থূলদৃষ্টিগ্রাহ্য হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। শ্রুতি প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ যে একেরই প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ব্রহ্ম কাহারও দৃষ্ট বা পরিচিত কখনও হন নাই, এরূপ অবধারণ করিয়া আমরা এ তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত নহি, এ কথা পূর্ব্ব হইতেই মনে করিয়া রাখা আবশ্যক। যদ্যপি পূর্ব্বতন মহাত্মাগণের লেখনীনিঃসৃত তত্ত্বগুলি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাক্ষ্য সম্বন্ধে কি নিমিত্ত সন্দিহান হইব? অদ্যাপিও এরূপ সাক্ষ্যের একেবারে অসদ্ভাব হয় নাই।

জগৎকারণ যে এক, তাহা মানিয়া লইলাম। এখন দেখা যাউক, সে এক কি প্রকারের এক।

জগৎকারণ যে জাতিগত অর্থে এক নহে অর্থাৎ একজাতীয় কতকগুলি পদার্থ নহে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বহুত্বনিবারক যুক্তিতেই সিদ্ধ হয়। যদি এক-জাতীয় বহু বস্তুরই স্বভাবতঃ সুশৃঙ্খলা আছে বলা হয়, তাহা হইলে তাহার খণ্ডন নাই, পরন্তু ঐরূপ স্বীকারে যুক্তিরও বড় একটা আবশ্যকতা থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে যেমন 'বহুতে' শৃঙ্খলার পূর্ণতা অসম্ভব বুঝা যায়,সেইরূপ বহুবিধ শৃঙ্খলা স্বীকার করিলে 'একেতেও' তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে উদয় হয়। এই দুই পক্ষেই যুক্তি তর্ক বহুবিধ হইতে পারে। পরন্তু বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে, বহুশৃঙ্খলার 'একেতেই' পর্য্যবসান বেশ অনুমিত হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে 'একের' বহু শৃঙ্খলার পূর্ণতা 'বহুর' বহু শৃঙ্খলার পূর্ণতার সহিত, তুল্য হইতে পারে না। পরন্তু তাহা বহু পদার্থে সম্ভবপর হইলেও স্বগতভেদ বা গুণগতভেদবিশিষ্ট 'একের' তাহা পূর্ণরূপে না হইবার হেতু নাই। যাহা হউক, তাহা হইলে 'একের' বহু শৃঙ্খলার পূর্ণতা স্বীকার করিতে হইলে অবয়বগতভেদবিশিষ্ট বা গুণগতভেদবিশিষ্ট 'একেরই' স্বীকার করা হইল। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, মূল কারণ একজাতীয় বহু বস্তু নহে। জগৎ ও তাহার শৃঙ্খলা 'এক' হইলে সর্ব্ববিধভেদপরিশূন্য মূল একটী বস্তু,আর জগৎ ও তাহার শৃঙ্খলা বহু হইলে মূল বস্তুটী অবয়বগত বা গুণগতভেদবিশিষ্ট একটী বস্তু। এখন দেখা যাউক, জগৎ ও তাহার শৃঙ্খলা 'এক' কি 'বহু'। এ কার্য্য সাধন করিতে হইলে কেবল যুক্তি তর্কে হইবে না, উহাদের সহিত বিজ্ঞানের পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। পরন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা অতি বিস্তৃত ব্যাপার। ইহাতে প্রবৃত্ত হইলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই জগতের মূল 'এক', ইহা স্বীকার করেন ও তাহারই প্রমাণে বদ্ধপরিকর। শাব্দপ্রমাণ অবলম্বন করিলে আমরা কতকগুলি ভগবান্ বা ব্রহ্মবোধক এমন শব্দ পাইব, যাহার পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিলে জগৎকারণের একত্বই সুসিদ্ধ হইবে। 'সর্ব্বশক্তি-মান', 'সর্ব্বজ্ঞ', 'একই অদ্বিতীয়', 'একই বহু হইয়াছেন'—ইত্যাদি বাক্যে জগৎকারণের একত্বই বেশ বুঝা যায়।

এক্ষণে কাল অর্থে কিরূপ এক, তাহা একবার বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। 'পূর্ব্বে এক ছিল', বা 'পরে এক হইবে', ইহা কাল অর্থে এক শব্দের অভিধেয় হইতে পারে। যাহা পূর্ব্বে এক ছিল, তাহা যদি পরে বহু হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের একে বহুত্ব সূক্ষ্ম বা লুক্কায়িত ভাবে ছিল, বলিতে হইবে। কার্য্যের

সমস্ত ভাব কারণে থাকা যুক্ত, কিন্তু কারণের সমস্ত ভাব কার্য্যে থাকা অযুক্ত। কার্য্য বহু হইলে কারণও বহু মানিতে হয়, একের স্বীকারে অন্যের স্বীকার অপরিহার্য্য। কতকগুলি পণ্ডিত এই প্রকার যুক্তিজাল ছিন্ন করিবার জন্য একটীকে বাস্তব ও অপরটীকে অবাস্তব বলিয়া থাকেন, কারণটীকে সত্য সত্য 'এক' বলিয়া কার্য্যটীকে মিথ্যা বলেন। আবার কেহ কেহ অবয়বগত বা গুণগতভেদ স্বীকার দ্বারায় "এক কারণের" কার্য্যাবস্থার বহুত্ব সিদ্ধ করেন। 'কারণ' সত্য 'কার্য্য' মিথ্যা মতে, মিথ্যা শব্দের অর্থ আবার দুই রকম শুনা যায়। একটী অনিত্য ও তুচ্ছ অর্থে মিথ্যা, এবং অপরটী অভাব অর্থে মিথ্যা; এই দুই প্রকার অর্থে মিথ্যা শব্দের ব্যবহার হইতে দেখা যায়। যাঁহারা 'কার্য্যের' অসম্ভাব অর্থে মিথ্যা বলেন, তাঁহাদের মত পক্ষপাতদোষদুষ্ট; যে হেতু 'কার্য্য' ক্ষণস্থায়ী হইলেও অথবা কারণাতিরিক্ত না হইলেও কার্য্যাবস্থা স্বীকার ও তৎসঙ্গে তাহার অসম্ভাব বলায় নিজের কথায়, নিজেরই প্রতিবাদ করা হয়। অবশ্য অনিত্য ও তুচ্ছ অর্থে মিথ্যা শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রকৃতপক্ষে অন্য দুইটী মতের কোনটী স্বীকার করাই হয়। 'কার্য্যের' অনিত্যতা ও তুচ্ছতা হইলেও তাহা সেই মূল কারণের অবয়বগত ব্যাপার বা গুণগত ব্যাপারের কোন একটী না হইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সেই মূল কারণ 'এক' হইলেও অবয়বগতভেদবিশিষ্ট বা গুণগতভেদবিশিষ্ট। হইতে পারে। এখন এই দুইটীর কোন্‌টী সঙ্গত, তাহাই বিচার্য্য। সুতরাং দেখা যাউক, ব্রহ্ম এক হইলেও অবয়বগতভেদবিশিষ্ট কিম্বা গুণগতভেদবিশিষ্ট ব্রহ্ম বস্তু যে একেবারে সর্ব্ববিধভেদশূন্য, তাহা ভাবিবার আমাদের অবকাশ নাই, যে হেতু আমরা এই পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ দেখিয়াই তাহার মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত। বহুত্ব দেখিয়াই একত্বের অনুসন্ধানে রত। সুতরাং এই ভেদের সামঞ্জস্য সেই 'একে' কিরূপে হইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য। এই স্থানে আমাদের দেশে ৩টী মহাত্মার মত প্রবল দেখা যায়। সেই ৩ জন মহাত্মা,—শঙ্কর, রামানুজ ও চৈতন্য। মহাত্মা শঙ্করের মতে মূল পদার্থ 'এক', তাঁহার গুণ বা শক্তিসাহায্যে এই বিচিত্র বস্তুসমূহ জাত বলিয়া উহারা সেই মূল পদার্থের ন্যায় সত্য নহে, পরন্তু তাহা অনিত্য, তুচ্ছ অথবা মিথ্যা। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ বাস্তবিক ভেদ নহে, তাহা কাল্পনিক ভেদ মাত্র, আর কাল্পনিক ভেদকে মিথ্যা ব্যতীত কি বলা যাইতে পারে? বাস্তবিক ভেদে ২টী বস্তুর পৃথক্ সত্তার পৃথক্ আধারে অবস্থানসামর্থ্য

থাকে, আর সেই নিমিত্তই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সেই ভেদকে মানিতে হয়। যাহা বাধ্য হইয়া, নিজেকে ও অপরকে মানিতে হয়, অথবা যাহা, মান আর নাই মান, তথাপি তাহাই, এইরূপে মানিতে হয, তাহাই যথার্থ বাস্তবভেদের বিষয়। পক্ষান্তরে কাল্পনিক ভেদ সেরূপ নহে, ইহা যখনই ভাবিবে, তখনই বুঝিবে ; যখন ভাবিবে না, তখন বুঝিবে না। উহা কখন পৃথক্ আধাবে অবস্থান করে না ও করিতেও পারে না। ভাবিলে পৃথক্ বুঝা যায় আব না ভাবিলে পৃথক্ বুঝা যায় না, ইহাই ইহার বিশেষত্ব। পবন্তু তাই বলিয়া ইহা পাগলের চিন্তার মত নহে। যথারীতি যুক্তিপূর্ব্বক ভাবিলে সকলেই সেই একই রূপ কল্পনায় উপনীত হইবেন, অন্যথা হইবে না। সকলকেই একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় বলিয়াই উহা করিতে যেন আমবা বাধ্য ; আব সেই কাবণেই যেন ইহা, এক প্রকার বাস্তব ভেদবিশেষ বলিযা প্রতীত হয। বস্তুতঃ এই ভাবটীকে স্মরণ করিয়াই মহাত্মা শঙ্কর শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ অনির্ব্বচনীয় বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। শক্তি বশতঃ শক্তিমানের বৈচিত্র্য ভাব ধাবণ, কাল্পনিক বা মিথ্যা হইলেও তাহা অনির্ব্বচনীয, অত্যন্ত মিথ্যা বা অভাববৎ মিথ্যা নহে। ব্রহ্মের একত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সমগ্র মত আলোচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয।

মহাত্মা রামানুজ কিন্তু সেই মূল কাবণকে অবযবগতভেদবিশিষ্ট 'একটী' বস্তু বলিযাছেন। তাঁহার বিবেচনায "যাহাতে 'বৈচিত্র্য হেতু' থাকে, তাহাতে উহা অবযবগত ভাবে না থাকিলে উহা না থাকাব মধ্যে গণ্য। শক্তিগত-ভাবে স্বীকার করিলেও বিচিত্র অবযব বিশিষ্ট পদার্থেরই বিচিত্রশক্তি সম্ভব। অবিচিত্র বস্তুব বিচিত্রশক্তি কে বুঝিতে পারে ?" কিন্তু বিচারে ইহা সুযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। এক বলিযা অবযবগতভেদ স্বীকার করিলে প্রকৃত পক্ষে নিজের কথারই প্রতিবাদ করা হয। একটী বস্তুকে সর্ব্বত্র নিরবচ্ছিন্ন অসীম এক বলিয়া ভাবিলে তাহার অংশ কল্পনা পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্বত্র নিরবচ্ছিন্ন এক" ভাবনার বিরোধ সাধন করে। সুতরাং অংশ ভাবনাটীকে কাল্পনিক বলিতে হইবে নচেৎ উহাদের সমন্বয় অসম্ভব। স্বগত ভেদে যে নিজের কথায় নিজের প্রতিবাদ কবা হয, তাহা ছাড়া আর একটী দোষ আসিয়া পড়ে। ইহাতে বিজাতীয় বস্তুব অস্তিত্ব প্রকারান্তরে মানিতে হয়। একটি ঘটিকা যন্ত্রের অবয়বগত ভেদ আছে, যথা, কাঁটা, চাকা, প্রভৃতি। এ স্থলে কাঁটা ও চাকায়

অবয়বগত সীমাই তাহাদের পরস্পর পার্থক্যের হেতু, এবং সীমা অবকাশময় আকাশ পদার্থের দ্বারা সাধিত হয়, এবং অবকাশ, ঘটিকার অবযবের সহিত বিজাতীয় বস্তু। যদি বলা যায় যে, বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে যদি একটী অংশ বরফে পরিণত হইয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকে, তাহার সীমা যেমন বিজাতীয় পদার্থবিশেষ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় না—উহাও তদ্রূপ ; সুতরাং বিজাতীয় বস্তুর কোথায় সম্ভাব থাকিল ? তাহাও সিদ্ধ হয় না। দেখা যায়, জলমধ্যগত তাপের অল্পাধিক্য এবং জলপরমাণুর অন্তর্গত আকাশ-রূপ অবকাশের সঙ্কোচ বিস্তারই উক্ত বরফের সীমানির্ণয়ের হেতু। তাহার পর জল বরফ হইলে উহার অবয়ব বর্দ্ধিত হয়। এক ঘন ইঞ্চি জল বরফ হইলে তাহার সমগ্র অবযবের একাদশ ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি হয়। যদি বলা যায়, জলদৃষ্টান্ত গ্রহণ না করিয়া অপর তরল পদার্থের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে অবযববৃদ্ধির আশঙ্কা যাইল। তাহা নহে। যে হেতু অপর তরল পদার্থ বৃদ্ধি না পাইয়া সঙ্কুচিত হয়। যদি বলা যায়, অবয়বগত বৃদ্ধি ও সঙ্কোচের কথা পরিত্যাগ করিয়া যে তাপ ও আকাশের কথা বলা হইয়াছে, উহা বাস্তবিক বিজাতীয়ভেদবোধক নহে, যে হেতু তাপ ও আকাশ জলের সহিত সহাবস্থান করে সুতরাং জল বলাতেই উহা গৃহীত হইয়াছে। তাহাও নহে। তাহা না হইবার দুইটী কারণ আছে, প্রথম, যে তাপ ও আকাশ বরফ হইবার পূর্ব্বে জলে ছিল, তাহাই কখন বরফের হেতু নহে ; কিন্তু উহাদের অল্পাধিক্যই বরফে পরিণতির হেতু। অল্পাধিক্য মানিলেই তাপ ও আকাশের সজাতীয় অন্য তাপ ও অন্য আকাশ স্বীকার করা হইল এবং অন্য পদার্থ স্বীকারে উহারা উভয়েও পরস্পর বিজাতীয় হইল। যদি বলা যায়, অন্য তাপ ও আকাশের বিজাতীয়তা স্বীকার করিলাম তথাপি জলের তাপ ও আকাশের সজাতীয়তা লোপ হইল কিরূপে ? যদি বলা যায় যে, জলের তাপ ও আকাশ অপরিচ্ছিন্ন ভাবে সেই বরফের হেতুস্থানীয় তাপ ও আকাশের সহিত সংযুক্ত, এবং সেই সংযুক্ত তাপ ও আকাশ জলের সহিত সহাবস্থান করে, এইরূপ জলই দৃষ্টান্তে গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইলে বলিব যে, তুমি উহাকে আর অবয়বগত প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছ কেন ? উহা ত আমার গুণগত ভেদের সহিত সমান, যে হেতু আমার মতে গুণ ও গুণী তোমারই মতের ন্যায় পরস্পরে সম্বদ্ধ ; অতএব আর বিরোধ কোথায় ? যদি বল, না, বিরোধ আছে, যে হেতু তাপ ও আকাশ পরস্পরাবিত

জল ব্যতীত আছে। না, তাহাও বলিতে পারা যায় না, যে হেতু দৃষ্টান্তে কেবল জলনিমজ্জিত বরফের কথাই হইয়া আসিয়াছে ; জলাতিরিক্ত পদার্থের ধারণা ত ছিল না। শেষ কথা, স্বগতভেদবিশিষ্ট 'এক বস্তু' জগতের মূল কারণ বলা অপেক্ষা যে 'বিচিত্রগুণবিশিষ্ট এক বস্তুই' জগতের মূল কারণ বলা অধিক যুক্তিযুক্ত, একথা ঐ বিষয় যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই পরিস্ফুট হইতে থাকিবে।

মহাত্মা চৈতন্য অসামান্য প্রতিভাবলে মহাত্মা শঙ্কর ও রামানুজের মতের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার মতে অবয়বগতভেদবিশিষ্ট বস্তুর বাস্তবিক একত্ব অসম্ভব। অবয়বগত ভেদবিশিষ্ট বস্তুর ক্রিয়া বা গুণ গত ব্যাপারে একত্ব লক্ষ্য করিয়া কখন কি বস্তুর অবয়বগত ভেদকে অভেদ বলা যায়? না; কিন্তু তাহাকে গুণ বা শক্তিগত ভেদ বিশিষ্ট বলিয়া তাহার কার্য্যাবস্থাকে তুচ্ছ বা অনিত্য জ্ঞান করা যায়। যাহা শক্তিবশতঃ এক হইয়াও বহু হইতে পারে, তাহা যৎকালে বহু নাও হয়, তখনও সেই বহুত্বব্যাপারবিহীন নহে। সুতরাং সেই 'একে' বহুত্ব তখন সুপ্ত বা লুক্কায়িত বলিতে হয়, এবং লুক্কায়িত বা সুপ্ত বস্তু কখন লুপ্ত বা অভাব মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না।

ঐ তিন মহাপুরুষের যুক্তিজাল পরস্পর তুলনা করিলে শঙ্কর ও চৈতন্যই অধিকতর মহিমান্বিত বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই মতদ্বয় ব্রহ্মের একত্ব বিষয়ে পরস্পরের শব্দগত ভেদ পরিত্যাগ করিলে একই বলিয়া প্রতীতি হয়। শুদ্ধচিত্তে ভগবদ্ভক্তিমান্ হইয়া ভাবিলে অন্যথা কদাচই অনুভূত হইবে না বরং উভয়ে উভয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির হেতু হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইবে। মহামতি শঙ্কর ও চৈতন্যের মতদ্বয় একত্র তুলনা করিলে বোধ হয় যেন একটী বিশাল উভয়গ্রাহী মতের অঙ্গদ্বয় মাত্র। অঙ্গীভূত দুইটীর, কোন একটী ব্যতিরেকে অপরটি অসম্পূর্ণ। একেরই যে বহুত্ব, তাহা সমগ্র শাস্ত্র সাক্ষ্য দিবে, এবং তাহা হইলে তাহার অবয়বগত ভেদ মানিয়া পূর্ণত্বের বাস্তবিক হানি করা সুযুক্তির পরিচায়ক নহে। এবং গুণগত ভেদ মানিয়া কার্য্যকে কারণবৎ পূর্ণ সত্য বলাও মহাত্মা চৈতন্যের পক্ষে যেমন ঠিক নহে, শঙ্করের পক্ষেও কার্য্যকে এককালে মিথ্যা বা তুচ্ছ বলাও তদ্রূপ সঙ্গত নহে। যিনি যে উদ্দেশ্যেই 'কার্য্য' সত্য বা

মিথ্যা বলুন, যে মতে মানবকে নিয়ত কেবল ব্রহ্মেরই অনুধ্যানে অনুরাগী করিবে, তাহাই আদরণীয়। এবং ব্রহ্মেরই অনুচিন্তন উদ্দেশ্য থাকিলে জগৎ-জ্ঞান-কালে যথেচ্ছাচারিতা বা কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখতা কখনই আসিয়া মানবহৃদয় গ্রাস করিবে না।

এক্ষণে আমরা পূর্ব্বোক্ত ৪ প্রকার একত্বের কথা সংক্ষেপে এক প্রকার আলোচনা করিয়াছি। পরন্তু ব্রহ্মের একত্ব সম্বন্ধে আর একটী পন্থা বর্ত্তমান আছে। সেটী সর্ব্বতোভাবে একত্ব। ইহাতে গুণ বা শক্তি, অবয়ব বা কাল বা জাতিগত কোন প্রকার ভেদের লেশ মাত্র নাই, কেবল 'একই এক।' একত্ব প্রসঙ্গ সমাপ্তি করিবার পূর্ব্বে একবার এটীও চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। জগৎকারণ এরূপ একটী বস্তু বলিলে বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধির অতীত কথা আসিয়া পড়ে। এরূপ 'একে' কিরূপে এই বৈচিত্র্যের সমাধান হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। অধিকন্তু ইঁহারা জগদ্ব্যাপারকে ভ্রমমাত্র বলিয়া ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা যুক্তিসহ নহে। কারণ, ভ্রমব্যাপার কোন একটা সত্য বস্তু আশ্রয় করিয়া সেই বস্তুতে অন্যথা উপলব্ধি করাইয়া থাকে। তৎস্বীকারে এই প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া থাকে যে, ঐ অন্যথাভাব কোথায় ছিল যে, সেই আশ্রয়ীভূত বস্তুতে আসিয়া পড়িল? স্থূল কথা ইহা অসম্ভব। মহাত্মা শঙ্করের যুক্তিজাল অধ্যয়নকালে অনেক স্থলে ইহা তাঁহার মত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র লিখনভঙ্গী আলোচনা করিলে ইহা তাঁহার মত বলিয়া কখনই বোধ হইবে না। তাঁহার নামে এরূপ মতের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রবাদের হেতু, বোধ হয়, কোন তন্মতাবলম্বী মহাত্মার কার্য্য। যাহা হউক, ব্রহ্মের একত্বতত্ত্ব বুঝিতে যাইয়া কাহারও মতামত আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পূর্ব্বে যাহা যাহা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্ম যে কি প্রকারের 'একবস্তু', তাহা কতকটা বুঝিতে পারা গিয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্ম কি প্রকার বস্তু, আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

যজ্ঞমূর্ত্তিনামা কোনও দাক্ষিণাত্যবাসী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর্য্যাবর্ত্ত পর্যটন-পূর্ব্বক তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলিকে জয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি ভাগীরথীতীরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব যখন শুনিলেন যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য নামক কোনও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রচার করিতেছেন, তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইলেন। একরাশি পুস্তকপরিপূর্ণ একটি শকটও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল, কারণ, তিনি পুস্তকগুলি না লইয়া কখন কোথাও যাই-তেন না। যতিরাজের সম্মুখীন হইয়া তিনি তর্ক ভিক্ষা করিলেন। তাহাতে শান্তমূর্ত্তি, স্মিতবিকশিতানন শ্রীরামানুজ কহিলেন, "মহাত্মন্, তর্কের আবশ্য-কতা কি, আমি আপনার নিকট পরাস্ত হইলাম। আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত; আপনার সর্ব্বত্রই জয়।" ইহাতে যজ্ঞমূর্ত্তি কহিলেন, "যদি আপনি পরাস্ত বলিয়া আপনাকে স্বীকার করিলেন, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, আপনি ভ্রান্ত বৈষ্ণব মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভ্রান্ত মায়াবাদ গ্রহণ করিলেন?" যতিরাজ কহিলেন, "মায়াবাদীরাই তো ভ্রান্তি ভ্রান্তি করিয়া উন্মত্ত। তাঁহা-দের মতে তর্কযুক্তি প্রভৃতি সকলই মায়া। অতএব মায়াবাদ কিরূপে অভ্রান্ত হইতে পারে?" ইহাতে যজ্ঞমূর্ত্তি কহিলেন, "দেশ কাল নিমিত্তের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎসকলই মায়াময়, এই জন্যই মায়াবাদী বলেন, এ তিনটি ত্যাগ না করিলে কখনও অভ্রান্ত সত্যে উপনীত হওয়া যাইবে না। আমরা যাহাকে ভ্রম বলি, আপনারা তাহাকেই সত্য বলেন। সুতরাং আপনারা ভ্রান্ত না হইয়া আমরা কিরূপে ভ্রান্ত হইব?"

বাদানুবাদ এইরূপে আরম্ভ হইয়া সপ্তদশ দিবস ধরিয়া চলিতে লাগিল। শেষ দিন শ্রীরামানুজের যুক্তিগুলি যজ্ঞমূর্ত্তি খণ্ডন করিয়া ফেলিল। যতিরাজ তাহাতে কিছু বিমর্ষ হইয়া স্বমঠে গমন করিলেন ও মঠস্থ দেববিগ্রহ শ্রীদেবরাজের সম্মুখে এই বলিয়া যুক্তকরে আবেদন করিলেন; "হে নাথ, যে বৈষ্ণবশাস্ত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহানুভবগণ অবলম্বন করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মমকরন্দপানের

অধিকারী হইয়াছেন, কালক্রমে সেই মহান্ শাস্ত্র মায়াবাদরূপ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মায়াবাদিগণ কুটযুক্তি দ্বারা আপনাদিগকে ও মোহান্ধ জীবগণকে মোহিত করিতেছে। তাহাদের তর্কজাল এরূপ ভ্রান্তি আনয়ন করে যে, সাত্ত্বিক মহাত্মাগণও সময়ে সময়ে চমৎকৃত হইয়া উঠেন। হে আনন্দধামন্, আর কতকাল নিজ সন্তানগণকে আপনার শ্রীপাদছায়া হইতে দূরে রাখিবেন?" এই বলিয়া জীবদুঃখকাতর যতিরাজ অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই বিবুধাগ্রণী রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে দেবরাজকে সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার নিকট এই আশ্বাসবাণী শুনিলেন, "যতিরাজ, উদ্বিগ্ন হইও না। ভক্তিযোগের প্রকৃত মাহাত্ম্য তোমার ভিতর দিযাই শীঘ্র জগতে ঘোষিত হইবে।"

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার আব আনন্দের সীমা রহিল না। এই অমৃতনিঃস্যন্দিনী সরস্বতী তাঁহার হৃদয়ের যাবতীয় গ্লানি দূর করিয়া, তদীয় মুখমণ্ডল এক প্রকার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দ্বারা মণ্ডিত করিল। তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যজ্ঞমূর্ত্তির মঠে উপনীত হইলেন। তাঁহার অমানুষী রূপবিকাশ দেখিয়া মায়াবাদী স্তম্ভিত হইযা গেলেন। ভাবিলেন, "গতকল্য গমন সময়ে শ্রীরামানুজ মলিনমুখে স্বমঠে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য দেখিতেছি, সাক্ষাৎ স্বর্গীয দেবতার ন্যায ইনি এখানে উপনীত। নিশ্চয়ই ইনি দৈববল আশ্রয করিযা আসিযাছেন। ইহাঁব সহিত তর্ক করা বিফল। এরূপ মহাপুরুষের শরণাগত হওয়াই শ্রেয়ঃ, কারণ, বৃথা শুষ্ক তর্ক করিয়া সমস্ত জীবনটা কাটাইলাম। অহঙ্কারকে এইরূপে পরিপুষ্ট করিয়া চিত্তের গ্লানিই বর্দ্ধন করিলাম। যখন চিত্তশুদ্ধিই হইল না, তখন ব্রহ্মজ্ঞান ত সুদূরাবস্থিত। কিন্তু এই মহাপুরুষের স্বভাব কি নির্ম্মল! ক্রোধ, অহঙ্কার, অভিমান ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না। বদন সর্ব্বদাই এক অনির্ব্বচনীয় দিব্য কান্তিতে উদ্ভাসিত। এত কর্কশ কথা প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু এতদিনের মধ্যে ইহাঁকে কখনও রুষ্ট হইতে দেখি নাই। কিন্তু ক্রোধে ও অভিমানে আমি যে ইতিমধ্যে কতবার দগ্ধ হইযাছি, তাহা গণনা করিতে পারি না। ধিক্ আমাকে! এরূপ মলিন হৃদয় লইযা এরূপ দেবতুল্য পবিত্রহৃদয় মহাপুরুষের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করা বাতুলতা-মাত্র। ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, আমি এ পাপের প্রাযশ্চিত্ত করিব, অহঙ্কারকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া পবিত্রতারূপ অমৃত আস্বাদনে যত্নবান্ হইব।"

এইরূপ স্থির করিয়া সুকৃতী যজ্ঞমূর্ত্তি যতিরাজের পাদগ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। যতিপতি তাহাতে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "যজ্ঞমূর্ত্তে, আপনি মহাপণ্ডিত হইয়া এ কিরূপ আচরণ করিতেছেন? অদ্য তর্কের অবতারণা করিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন?" ইহাতে বিনয়নম্র পণ্ডিতবর উত্তর করিলেন, "মহানুভব, যে তার্কিক এতদিন ধরিয়া আপনাকে বিবিধমতে শ্লেষোক্তিসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল, আমার পূর্ব্ব সুকৃতফলে সে এক্ষণে আমার হৃদয়রাজ্য হইতে প্রস্থান করিয়াছে সুতরাং কে আর আপনার ন্যায় মহানুভবের সহিত বৃথা তর্ক করিবে? অধুনা সম্মুখে আপনার চিরদাস দণ্ডায়মান আছে, তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন। আমি আপনার শিষ্য, আপনার পবিত্র উপদেশ দ্বারা আমার চির অন্ধকারাচ্ছন্ন মনকে পবিত্রতার আলোকে আলোকিত করুন।" "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"। বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানকে প্রশ্রয় দিয়া আমি অহম্ভাবকেই বলবান করিয়াছি। হায়! আমার ন্যায় মূর্খ আর কে আছে? আপনি এ অকিঞ্চন দাসকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করুন। শ্রীরামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তির সহসা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন না, কারণ, তিনি নিজ ইষ্টদেব শ্রীবরদরাজের স্বপ্নকথিত বাক্যগুলি স্মরণ করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহারই কৃপায় সম্মুখস্থ দাম্ভিক পণ্ডিত বিনয়ভূষণে বিভূষিত হইয়া এক মনোহর দেবতুল্য কান্তিলাভ করিয়াছেন।

তিনি মৃদুমধুরস্বরে কহিলেন, "ধন্য শ্রীবরদরাজ! তাঁহার কৃপা পাষাণকেও দ্রব করিল! যজ্ঞমূর্ত্তে, অন্যান্য অভিমান ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করা মনুষ্যশক্তির আয়ত্তাধীন নহে। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্', কিন্তু সেই বিদ্যা যদি অবিদ্যারূপে দম্ভ ও মদের প্রসূতি হয়, তাহা হইলে আর কাহার সাহায্যে মদান্বিত দাম্ভিক হৃদয়ে বিনয়ের প্রবেশলাভ হইতে পারে? একমাত্র শ্রীভগবৎকৃপায় এই অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভবপর করিতে পারে। তুমি সেই কৃপাবলেই অদ্য, মানবের পরম শত্রু যে অহঙ্কার, তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছ। অসীম তোমার সৌভাগ্য!" যজ্ঞমূর্ত্তি কহিলেন, "যখন আপনার ন্যায় মহানুভবের সন্দর্শন লাভ করিয়াছি, তখন বাস্তবিকই আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। এখন আমায় কি করিতে হইবে আদেশ করুন। আমি আপনার মূর্খ সন্তান।" যতিরাজ কহিলেন, "বৎস,

'হীনো যজ্ঞোপবীতেন যদি স্যাৎ জ্ঞানভিক্ষুকঃ।
তস্য ক্রিয়াঃ নিষ্ফলাঃ স্যুঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥
গায়ত্রীসহিতানেব প্রাজাপত্যান্ ষড়াচরেৎ।
পুনঃসংস্কারমাহৃত্য ধার্য্যং যজ্ঞোপবীতকম্॥
উপবীতং ত্রিদণ্ডঞ্চ পাত্রং জলপবিত্রকম্।
কৌপীনং কটিসূত্রঞ্চ ন ত্যাজ্যং যাবদায়ুষম্॥'

এই বচনানুসারে তোমার যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রথম কর্ত্তব্য।" যজ্ঞমূর্ত্তি তাহাতে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। তিনি যথাবিধানে উপবীত ধারণ করিলেন। পরে যতিরাজ তাঁহাকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করাইয়া শঙ্খচক্রাঙ্কিত করিলেন, এবং দেবরাজের কৃপায় তাঁহার চৈতন্য লাভ হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে দেবরাজ মুনি এই আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস, এক্ষণে তোমার অতুল পাণ্ডিত্য অভিমানমেঘমুক্ত হইয়া পরম শোভার আস্পদ হইয়াছে। তুমি সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া লোকের হিতসাধনে আপনাকে নিযুক্ত কর। যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীগুরুবাক্যানুসারে তামিল ভাষায় "জ্ঞানসার" ও "প্রমেয়সার" নামক দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইলেন। শ্রীরামানুজ তাঁহার নিবাসের জন্য এক বৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে চারিজন মেধাবী শান্ত দান্ত বৈরাগ্যবান্ যুবক শ্রীরামানুজের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য আগমন করিল। যতিরাজ তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা দেবরাজ মুনির নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শিষ্যত্ব গ্রহণ কর। তাঁহার ন্যায় মহাপণ্ডিত পৃথিবীতে অতি বিরল। শুদ্ধ পাণ্ডিত্যই তাঁহার ভূষণ নহে, তাঁহার ন্যায় ভগবদ্ভক্তিপরায়ণও অতি দুর্লভ।" তদ্বাক্যানুসারে উক্ত চারিটি যুবক দেবরাজ মুনির শিষ্য হইলেন। শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করা দূরে থাকুক, ভাবিলেন, "এ আবার কি এক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথায় বহুকষ্টে অভিমানের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি, তদুপরি আবার 'আমি গুরু' ইত্যাকার অভিমান আমায় মোহিত করিতে প্রবৃত্ত হইল।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্বীয় গুরুর পাদমূলে উপনীত হইলেন এবং অতি দীনভাবে কহিলেন, "প্রভো, আমি আপনার সন্তান। তবে আমার প্রতি আপনার কেন এরূপ নিষ্ঠুরতা?" যতিরাজ কহিলেন, "কেন বৎস, কি হইয়াছে?" দেবরাজ মুনি কহিলেন,

"পিতঃ, আপনার কৃপায় অভিমান রূপ রাক্ষসের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। আবার কেন এ অকর্ম্মশীল দুরাচারকে সেই অভিমানকবলে নিক্ষেপ করিতেছেন? আমায গুরু হইতে আদেশ করিবেন না। জলে পদ্মপত্রের ন্যায আমার নির্লেপভাব এখনও আইসে নাই। আপনি আমায নিজ দাস করিয়া আপনারই নিকট স্থান দিন। আমার নূতন মঠের আবশ্যক নাই।" শ্রীরামানুজ তাঁহার এই বাক্যে পরমপ্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস, আমি তোমায় পরীক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ করিয়াছি। তুমি পরীক্ষায উত্তীর্ণ হইয়াছ। হে বৈষ্ণবশিরোমণে, তোমার শুদ্ধা ভক্তিলাভ হইয়াছে। তুমি আমার নিকটেই থাক ও মঠস্থ দেববিগ্রহ শ্রীবরদরাজের সেবা করিয়া সমগ্র জীবন অতিবাহিত কর।" এই আদেশলাভ করিয়া দেবরাজ মুনি আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন এবং শ্রীমদ্দেবরাজের সেবা ও শ্রীরামানুজের কৈঙ্কর্য্য করিয়া অবশিষ্ট জীবনের অমূল্যতা সম্পাদন পূর্ব্বক সকলেরই অনুকরণীয় হইলেন।

ক্রমশঃ।

আক্ষেপ।

কুটীরের কোণে বসি,
গড়িলে মূরতি তার,
জানিনা কেন ভাঙ্গিয়া যায়!
কল্পনার তুলি দিয়া,
আঁকিলে তাহার ছবি,
জানি না কেন মুছিয়া যায়!
দিবানিশি কেঁদে কেঁদে,
ফেলি কত অশ্রুধার,
পড়ে না ছায়া হৃদয় মাঝে!
কোথা হ'তে আসে যেন,
আকুল সন্দেহ ঘোর,
প্রাণের দ্বারে বিষম বাজে!

আসিবার কালে হেথা,
পূজিতে চরণ তার,
প্রতিজ্ঞা কত করিয়াছিনু!
কি মোহ মদিরাপানে,
বিভোর হইয়া এবে,
চরণ তার ভুলিয়া গেনু!
অভাবে পড়িয়া পাছে,
ভুলে থাকি নাম তার,
আদরে তাই যতন করে;
আমার সুখের লাগি,
সাজাইয়া চারিধারে,
রেখেছে কত থরে বিথরে!

পূত জাহ্নবীর জল,
মধুমাখা ফুল, ফল,
শিশুর মুখে মধুর হাসি!
দখিনা মলয় বায়,
বিহগের কল গান,
অমিয় মাখা জোছনা রাশি!
পথহারা হব ভেবে,
দিবাকর, নিশাকর,
সদাই তার দুয়ারে জাগে,
দৌড়ে যথা যাই আমি,
তারাও ছুটিয়া ধায়,
দেখায়ে পথ আমার আগে।

কত দয়া, ভালবাসা,
বুকেতে জাগিছে তার,
আমার শুধু কল্যাণ তরে,
অকৃতজ্ঞ, পাপী আমি,
শুধু আমারে লইয়া,
ডুবিয়া আছি ঘুমের ঘোরে।
এ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাবে,
এ নিশা হইবে ভোর,
তাহার কাছে রহিব আমি।
আসিবে সুদিন যবে,
মিশিব তাহার সনে,
আমার সেই হৃদয়-স্বামী।

শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী।

সাধ।

(১)

তবু মোর সাধ যায়!
তোমার সেবক সনে,
ঘুরি ফিরি বনে বনে,
তব নাম গুণ গেয়ে,
পরাণ জুড়াই।
সৌভাগ্যের অন্তরালে,
যদিও বিজুলী খেলে,
যদিও আলোক দেখি,
তমসা নিশায়,
তবু মোর সাধ যায়!

(২)

তবু মোর কাঁদে প্রাণ,
কামিনীর ভালবাসা,
যশ, মান, ধন আশা,
যদিও হৃদয়ে জাগে,
আঁধিয়া নয়ান,
চরণে শরণ লব,
পুজিব চরণ তব,
আজন্ম অৰ্জ্জিত পুণ্যে
লভিয়াছি প্রান;
তবু মোর কাঁদে প্রাণ!

(৩)

পথ নাহি পাই আর,
কত সুখ স্বপ্ন দেখি,
এ জগৎ ভুলে থাকি,
আঁকিলে মূরতি তব,
হৃদয়ে আমার !
ও দিকে কুটীর ঘরে,
ক্ষুদ্র আঙ্গিনায় প'ড়ে,
অতৃপ্ত বাসনা কত,
করে হাহাকার,
পথ নাহি পাই আর !

(৪)

মরণ আসিছে ঘিরে,
দুদিনের ভালবাসা,
দুদিনের মেলা মেশা,
দুদিনে ফুরায়ে যায়
চিরদিন তরে।
ভেঙে দাও ঘুম দেব,
প্রণমি শ্রীপদে তব,
বাজিছে কালের ভেরী
কুটীর দুয়ারে।
মরণ আসিছে ঘিরে !

শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী।

সমালোচনা।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস। শ্রীকুসুম কুমারী রায় প্রণীত। ভবানীপুর ২নং কেদার নাথ বসুর লেন হইতে শ্রীনবগোপাল চাকি এম, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা ভাষায় প্রকাশ করিয়া একটু শান্তি পাইবার আশায়" লেখিকা এই কবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন। তদীয় পিতৃদেবের অনুরোধে প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থপ্রকাশের পূর্ব্বেই লেখিকা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কবিতাগুলিতে প্রাণ আছে। পড়িয়া মনে হয় কবিতাগুলি কবির হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। ভাষা ও ছন্দ মনোরম। মোটের উপর মর্ম্মোচ্ছ্বাস আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্র। শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত প্রণীত। ৩৯নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা।

এটী চৈতন্য লাইব্রেরির পুরস্কার প্রবন্ধ। সুতরাং ইহার পরিচয় প্রদান বাহুল্য মাত্র। গ্রন্থকার ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্রের স্থান

অতি উচ্চে। গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তিকায় সংক্ষেপে হেমচন্দ্রচরিত আলোচনা করিয়া তাঁহার কবিতাগুলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনাটী উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা গ্রন্থকারের নিকট হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনার প্রত্যাশা করি।

দেশের কথা। প্রথম ভাগ। শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। কলিকাতার সকল প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ এক টাকা।

দেউস্কর মহাশয়ের নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। সম্প্রতি তিনি ভারতহিতৈষী উইলিয়ম ডিগ্‌বি, দাদাভাই নৌরোজি, শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতির গ্রন্থ অবলম্বনে অতি সুললিত ভাষায় দেশের কথা বিবৃত করিয়াছেন। ইংরাজের শাসননীতিতে ভারতবর্ষের কৃষক ও শিল্পিকুলের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ভারতে দুর্ভিক্ষ যে একটী চিরস্থায়ী ব্যাধিবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন কি, সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে যে অবনতি ঘটিয়াছে, গ্রন্থকার তাহা বিশিষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বিবৃত করিয়াছেন। এরূপ একখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হওয়াতে বঙ্গভাষা বিশেষ লাভবান্ হইলেন, বলিতে হইবে। গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহা কাল্পনিক উচ্ছ্বাসমাত্র নহে, ইহাতে প্রতি পদে সরকারী তালিকা ও বিশ্বাসযোগ্য মনস্বী লেখকগণের রচনা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের মতে স্বদেশভক্তি এবং প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনই এই অবস্থা প্রতীকারের একমাত্র উপায়। আমরা বলি, রাজনৈতিক আন্দোলন কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সহিত আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত কর্ত্তব্যগুলি কি আমরা যথাসাধ্য করিতেছি? আমাদের বিশ্বাস,——যেমন ব্যক্তিগত কর্ম্মফলে ব্যক্তিগত অবনতি হয়, তদ্রূপ জাতীয় কর্ম্মফলে জাতীয় অবনতি। এই কর্ম্মফল কাটাইতে হইলে জাতীয় শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রয়োজন। শুধু গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চীৎকারই সে শুভ অনুষ্ঠান নহে। কতকগুলি সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন,—যাঁহারা দেশকে তাঁহাদের ইষ্টদেবতারূপে জানিবেন এবং মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া সাধারণের ভিতর ধর্ম্মশিক্ষার মধ্য দিয়া সর্ব্ববিধ লৌকিক বিদ্যার বিস্তার করিবেন। তবেই দেশের আমূল সংস্কারের কার্য্য আরম্ভ হইবে। ভারতে প্রবল

আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান হইলে সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি লইয়া দেশের লোক ভাবিতে শিখিবে। ভাবিতে শিখিলেই উপায় উদ্ভাবিত হইবে।

যাহা হউক, গ্রন্থখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গভাষাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম। ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড। পান্নাধিপতির ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ এম বি কর্ত্তৃক বিরচিত। ৫৫নং জানবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীশম্ভুনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ১৷৹ টাকা।

এই পুস্তক তিনখানির কলেবর ও নাম দেখিয়া আমরা যেরূপ আশান্বিত হইয়াছিলাম, পাঠ করিয়া তদ্রূপ নিরাশ হইয়াছি। গ্রন্থকার বর্ণনা না করিয়াছেন, এমন বিষয় নাই, কিন্তু আমরা ইহার মধ্যে 'বৈজ্ঞানিক' কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। গ্রন্থকারের ভাষা স্থলে স্থলে হাস্যোদ্দীপক, ভাবও তথৈবচ। এরূপ পুস্তক প্রচারে শুধু গ্রন্থকার সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হন, তাহা নহে, হিন্দুধর্ম্মেরও অবমাননা করা হয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এখন বেওয়ারিস মাল। তাহাকে যিনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেছেন। এ অবস্থায় আর শ্রীনাথ বাবুর অপরাধ কি? আমরা কাহাকেও এই সুদীর্ঘ তিনখণ্ড পুস্তক পাঠ করিয়া সময়ের অপব্যয় করিতে বলি না।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ১৮ই ও ২৫শে অগ্রহায়ণ মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির অধিবেশন হয়। স্বামী সারদানন্দ 'সাংখ্য ও গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব' এবং 'গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রে কথিত বিষয়ানুভূতির ক্রম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

মানুষ সময়ে সময়ে উৎসাহ সহকারে কত কার্য্য করে, আবার সময়ে সময়ে উৎসাহ কমিয়া যায়, তখন যন্ত্রবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। দেখা যায়, সভাসমিতি যখন প্রথম প্রথম স্থাপিত হয়, তখন দু একজন উৎসাহী লোক থাকাতে তাহার কার্য্য সুচারুরূপে চলে, তাহার দ্বারা কতকগুলি খুব

ভাল ভাল কার্য্য হয়। কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে হয় সেটী উঠিযা যায়, নতুবা কতকগুলি লোক, যাহাদের সেই কার্য্যে কোন উৎসাহ নাই, কোন অনুরাগ নাই, তাহাদের উপর সেই কার্য্যের ভাব পড়ে। তাহারা ঔষধগেলার মতন কার্য্য নির্ব্বাহ করে, ফলে হয় শেষে কার্য্যটী উঠিযা যায় অথবা প্রবর্ত্তকেব উদ্দেশ্যেব বিপরীত কার্য্য হইতে থাকে। ইহাকেই আমাদের দেশের চলিত কথায় বলে, প্রথমে বিগ্রহ, পরে নিগ্রহ, পরিশেষে গঙ্গগ্রহ।

ইহাই প্রকৃতির নিযম—উত্থান, পতন। মাযার রাজ্যে কিছুই চিরস্থায়ী হয না, এটী জানিযা বাখা আবশ্যক। তবে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য সুচারুরূপে কায চালাইতে গেলে ব্যক্তিগত উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতা আবশ্যক। নিয়মাদির সংস্কার প্রকৃত সংস্কার নহে, যোড়াতাড়া দিয়া কায চালান মাত্র।

মিউনিসিপ্যালিটির কায ভাল চলিতেছে না। শুধু আন্দোলনেই কি সুফল পাইবে? আগে নিজের ঘর দোর, বাড়ীর সাম্‌নের রাস্তা ভাল করে সাফ কর, রাস্তাঘাট খামখেযালিমত অপবিষ্কার কবিও না। তুমি বলিতেছ, আমি একা না হয করিলাম, আর দশজনে যদি না করে, আমি একা কতটুকু করিতে পাবি? তুমি সব কবিতে পার। বিশ্বাস কব, তোমার ভিতরে সব শক্তি অন্তর্নিহিত ও সঁব ভার তোমার উপর।

এক ব্যক্তি কতদূর কায কবিতে পাবে, তাহা আমবা এখনও জানি না। আমাদের আত্মশক্তি সম্বন্ধে আমবা এখনও অপরিচিত। আগে যতটুকু পার কর দেখি। পাশ্চাত্য সংহতির (Organization) কথা বলি-তেছ? এই সংহতির মূলেও ব্যক্তিগত শক্তি।

নেতার উপর অবিচলিত বিশ্বাস, উদ্দেশ্যের (Cause) সম্মুখে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা মতামত বিসর্জ্জন এবং পরস্পর বিশ্বাসই সংহতির মূল। এ দেশে এখনও তাহা সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে বিলম্ব আছে।

'গুরুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস' বলিয়া একটা কথা এ দেশে প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আজ আমরা সেটাকে কুসংস্কার বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছি। কিন্তু এ দেশে সংহতি গঠন করিতে হইলে প্রথমে এই 'গুরুর উপর অবিচলিত বিশ্বাসের' ভিত্তির উপরে তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

তবে কি নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিব? স্বাধীনতাই যে মানবজীবনের অমূল্য সম্পত্তি! মনকে যত পার স্বাধীনতা দাও, কিন্তু কার্য্যকালে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার কর। গুরু—যাহাকে তুমি গুরু বা নেতৃপদে বরণ করিয়া লইয়াছ—তিনি যাহা বলেন, তোমার অন্যায় বোধ হইলেও আগে কর, পরে প্রতিবাদ। তোমার কোন বিশেষ মতামত চলিল না বলিয়া স্বতন্ত্র দল গঠন করিতে যাইও না।

জাতীয় ভাব উদ্বোধনের প্রতিবন্ধক এ দেশে দুইটী। যাঁহারা বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত, তাঁহারা সময়ে সময়ে জাতীয়ভাব লইয়া গলাবাজি ও চীৎকার করিলেও কার্য্যকালে তাঁহাদের নিজ পদোন্নতি, নিজ আত্মীয় স্বজনের কথাই বিশেষভাবে জাগরূক হয়, তাঁহারা অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিবার আদৌ সময় পান না—হুজুগ করা ছাড়া। আর এক প্রকৃতির লোক, যাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম করেন, তাঁহারা দেশের জন্য প্রাণ দেওয়াটাকে 'মায়া'র অন্তর্গত বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া হরিনামের মালা জপ করেন।

এদেশে জাতীয়ভাবের যে অভ্যুত্থান, ইহা এখনও ঘোরতর পাশ্চাত্য-গন্ধবিশিষ্ট রহিয়াছে। ইহা অনেকটা পোষাকী ব্যাপার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। চাই গুটিকতক অবিবাহিত, সংসারসম্বন্ধরহিত যুবা, যাঁহারা এই ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডী ছাড়িয়া সমগ্র দেশের জন্য ভাবিতে ও কায করিতে পারেন।

ব্রহ্ম কি ?

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ব্রহ্মের একত্ব বুঝিতে যাইয়া আমরা এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে, জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, ব্রহ্মজ্ঞানের উপকারিতা এবং জগৎকারণ সম্বন্ধে যত প্রকার প্রচলিত মত, পূর্ব্বভাগে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। অধুনা, ব্রহ্ম কি পদার্থ, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ঘট কি পদার্থ বলিলে, উহা মৃত্তিকানির্ম্মিত ইত্যাকার পদার্থ জানিয়া, যেমন আমরা আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি চরিতার্থ করি, 'ব্রহ্ম কি' বলিতে আমাদের সেইরূপ একটী কিছু বুঝিতে হইবে। মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের যে জ্ঞান, তাহার কিছুই মৌলিক ও নূতন নহে। যাহা যাহা দেখি বা শুনি, তাহাই ভাবি, এবং যাহা কিছু নূতন বলিয়া সাধারণতঃ মনে করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত উপার্জ্জিত জ্ঞানের প্রকারান্তর মাত্র। প্রকৃত পক্ষে যথার্থ নূতন আমরা কিছুই ভাবিতে বা বুঝিতে পারি না; নৃসিংহ মূর্ত্তি অঙ্কিত করা সাধারণতঃ নূতন ভাবনা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহা নূতন নহে, উহা পূর্ব্বদৃষ্ট সিংহ ও নরের মূর্ত্তির অবয়ব-সংযোগ দ্বারা সাধিত। জড়-বিজ্ঞান আলোচনা কালেও আমরা দেখিতে পাই যে, এ সৃষ্টির উপাদান যাহা পূর্ব্বে ছিল, এখনও তাহাই আছে, ইহার একটা পরমাণুও বৃদ্ধি হয় নাই, এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই। উভয় স্থলেই আমরা দেখিলাম, মানস কার্য্যে বা জড় জগতে নূতন কিছুই হয় না বা আমরা মনে আনিতেও পারি না। প্রকৃত পক্ষে এ কথাটী ঠিক। ইহা যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। যাহা আছে বা ছিল, তাহা চিরকালই থাকিবে ও থাকিবে। কাল ও অবস্থাভেদে বস্তুসমূহের রূপান্তর ও প্রকারান্তর ভেদ হয় মাত্র।

'ব্রহ্ম কি বস্তু' বুঝিতে হইলে আমাদের এই জাগতিক জ্ঞান সাহায্যে বুঝিতে হইবে। তাহাকে বাক্য মনের অগোচর বা চিদ্বস্তু বলিয়া ক্ষান্ত হইলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কিছুই বুঝা হয় না। যেহেতু জগদতীত পদার্থের জ্ঞান আমাদের নাই। আমরা যাহা বুঝি, তাহা এই জাগতিক পদার্থের তুলনায় বা ইহাদিগকে দৃষ্টান্তস্থানীয় করিয়া বুঝি। পরিজ্ঞাত বস্তুসমূহের সহিত মিলাইয়া ইহা সেই বস্তুর সহিত কোন অংশে একরূপ এবং কোন

অংশে অন্যরূপে স্থির করিয়া বুঝি। ব্রহ্ম যদি জগৎকারণ না হইতেন, জগতের সহিত কোন রূপে সম্বন্ধ না হইতেন, বলিতে কি, তাহা হইলে আমরা কখনও ইহা বুঝিতে চাহিতাম কিনা জানি না। যদি তিনি জগৎকারণ হন, তাহা হইলে তিনি জগতের সহিত সম্বন্ধ, সেই হেতু তিনি আমাদের বোধ্য হইবেন। বোধ্য বলিয়াই যে সর্ব্বতোভাবে বোধ্য, তাহাও ভাবিব না। যেহেতু 'কার্য্যে' 'কারণের' যতটা ভাব বর্ত্তমান থাকে, ততটাই 'কার্য্য' দৃষ্টে আমাদের বোধ্য। 'কারণ' ভাব সমগ্রভাবে 'কার্য্যে' বর্ত্তমান থাকে না, পরন্তু 'কার্য্যভাব' সমগ্রভাবে 'কারণে' থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম যখন জগৎকারণ, তখন জগদ্ভাব সমগ্ররূপে তাঁহাতে আছে, তাঁহার সমস্তভাব জগতে নাই, তাঁহার কতক ভাব যে জগদতীত, তাহাই সম্ভব। যাহা জগদতীত, তাহা আমাদের এস্থলে বুঝিবার প্রবৃত্তি নাই। তবে যতটা ভাব তাঁহার জগৎ দৃষ্টে অনুমান করা যাইতে পারে, ততটাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। একরূপভাবে ব্রহ্ম বুঝিতে ইচ্ছা করিলে জাগতিক জ্ঞান আমাদের যতই পূর্ণ হইবে, বলা বাহুল্য, আমরা জাগতিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ ব্রহ্মকে ততই পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব। আজকাল বিজ্ঞানের উন্নতি যে ইহার একটী প্রধান সহায়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যাহা হউক, জাগতিক বিজ্ঞান যতই উন্নত হউক, কতিপয় সিদ্ধবিষয়ে ইহা অন্যথা প্রমাণ করিবে না মনে হয়। আমরা সেই কতিপয় সিদ্ধ সত্য অবলম্বনে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইবার চেষ্টা করিব।

জগতের জ্ঞান আমরা যতই উপার্জ্জন করি, দেখি, ইহা জড় ও চেতনসংক্রান্ত। জড় ও চেতন ব্যতীত তৃতীয় জাতীয় পদার্থ কিছুই দেখি না। কেহ কেহ বলেন যে, জড় ও চেতন ব্যতীত জড় ও চেতন উভয়াত্মক একটা পদার্থও দেখা যায়। কিন্তু সেটী তত ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। এ জগতে যাহা এতদিন বিশুদ্ধ জড় বলিয়া জানিতাম, তাহা আজ বিজ্ঞানালোকে সম্পূর্ণ চেতনবিহীন নহে, আভাস পাইতেছি। এবং যাহা চেতন, তাহাও একটু বিচার করিলে জড়ীয়ভাবপরিশূন্য নহে, দেখা যায়। মৃত দেহও চেতনশূন্য নহে। জড়দেহে চেতনের বিশেষ অভিব্যক্তভাবই জীবিতের চেতন, তাহার লোপই মৃত্যু নামে অভিহিত হয়। জীবিতের চেতন অপগত হইলেও সামান্যভাবে অব্যক্ত চেতন মৃতদেহ ত্যাগ করে না। জড়ে চেতন যে নিতান্ত পৃথগ্‌ভাবে থাকে না, তৈলে জলের মত থাকে না, তাহা পূর্ব্বে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। জড়ে 'জীবন' জড়স্থ চেতনের বিশেষ

অভিব্যক্তি। মন তাহাতে আরও বিশেষ অভিব্যক্তি। বলিতে কি, এমতটী বিজ্ঞান এখনও প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্র ও অনুমানের শরণ লইয়া ঐটী মানিয়া লইলাম।

বিজ্ঞান যাহা প্রমাণ করেন, তাহাতে অনেক প্রকার মতের সম্ভাবনা হইতে পারে। জড়াত্মবাদিগণ 'চেতন' জড়সম্ভব বলেন, এবং চেতনাত্মবাদিগণ 'জড়' চেতন-সম্ভব বলেন। এ দুই মতে কোন জীবনই একেবারে চেতনশূন্য নহে। বৃক্ষেরও অব্যক্তভাবে নিজ সত্তা অনুভব করিবার মন বা ক্ষমতা আছে। কতিপয় সম্প্রদায় সমস্ত জড়ে সামান্য ও বিশেষ উভয়বিধ জীবন ও সমস্ত জীবনে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা মন ও জীবনকে আগন্তুক পদার্থ বলেন। যাহাই হউক, জড় ও চেতন যদি সম্পূর্ণ এক বস্তু হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে জড় ও চেতন যতই পৃথক্ বস্তু হউক, তাহাদের অভ্যন্তরে ঐক্য থাকিবে। আর একরূপতা থাকিবে বলিয়াই যে, জড় ও চেতনের কোন পার্থক্য থাকিবে না তাহাও ভাবা উচিত নহে। এক উৎপত্তিস্থান মানিলে এবং জড়ে চেতনের আগন্তুকতা স্বীকার করিলে 'জীবন' পদার্থটা জড়ে, চেতনের এক প্রকার বিশেষ অভিব্যক্তি-মাত্র অনুমিত হয়। জড় ব্যতীত যেমন জীবন দেখা যায় না, জীবন ব্যতীত তেমন মন দেখা যায় না এবং মন ও জীবন ব্যতীত জড়ও দেখা যায় না। নিতান্ত বিজাতীয় ভিন্ন বস্তুতে অন্য বস্তুর আগন্তুকত্ব সম্ভব কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়। পরন্তু আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে জড় ও চেতনের উৎপত্তিস্থান যে একটী বস্তু, তাহা পূর্ব্বে ব্রহ্মের একত্ব প্রস্তাবে স্থির হইয়াছে; সুতরাং জড়ে 'জীবন' চৈতনের বিশেষ অভিব্যক্তিমাত্র, এইমত অনুসারেই অগ্রসর হওয়া যাউক।

অন্যদিকে আমাদের যে আমিত্ববোধ আছে যাহা সচরাচর চেতনের একমাত্র অতি পরিস্ফুট দৃষ্টান্তস্থল, তাহাতেও বলিতে কি, জড়ীয় ভাব রহিয়াছে। অনুভবকর্ত্তার অনুভব্য বিষয় চিরকালই জড়, ইহা জড় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। চেতন কখন ইহার অনুভব্য বিষয় হয় নাই ও হইবেও না। চেতন অনুমিত বিষয় হইতে পারে, অনুভূত বিষয় হইতে পারে না। বোদ্ধা-বোধ্য-ভাবটী যখন এক পর্য্যায়ক্রমে 'আমি এই বোধের' মধ্যেও সংঘটিত হয়, তখন 'চেতন'ও জড়চেতনাত্মক। বোদ্ধা যখন অন্য কিছু না ভাবিয়া নিজেই নিজেকে ভাবে বা অনুভবের

বিষয় করে, তখনই তাহা কেবল চেতন নামে অভিহিত হয়। এই চেতন অপেক্ষা আর বিশুদ্ধ চেতনের পরিচয়, সাধারণতঃ এ জীবনে আমাদের হয় কি না জানা যায় না। দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই চেতনের মধ্যে অনুভবক্রিয়া বর্ত্তমান। অনুভবক্রিয়া থাকায় বিষয়-বিষয়ী ভাবও বর্ত্তমান। কাজেই আমরা যাহা চেতন বলিয়া বুঝি, তাহাতেও বিষয়বিষয়িভাব রহিয়াছে এবং তাহা থাকায় ঐ চেতনেও জড়ের অংশ আছে, মানিতে হয়। চেতনে যদি কোন অনুভবক্রিয়া না স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহা কল্পনামাত্রগ্রাহ্য বিশুদ্ধ জড় অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বস্তু হইয়া দাঁড়ায়, অন্যদিকে আবার অনুভবক্রিয়া থাকিলে উহা বিষয়সংযুক্ত, একথা অপরিহার্য্য। বিষয়স্পর্শ থাকিলে আবার আমিত্ব বোধে ভিন্নতা আসিয়া পড়ে। কারণ, নিজে নিজেকে অনুভব স্থলেও 'আমি' ও 'আমি-ভিন্ন' উভয়াকার ভাব লক্ষিত হয়।

সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে, জড় ও চেতন সর্ব্বত্রই একত্র অপৃথক্ ভাবে, অন্যোন্য আশ্রিভাবে বর্ত্তমান। সচরাচর যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহা জড়চেতনাত্মক এবং যাহাকে আমরা চেতন বলি, তাহাও জড়চেতনাত্মক। এক্ষণে জগৎ যদি কেবল জড় ও চেতনময় বস্তু হইল, তখন এতদ্ব্যতীত তৃতীয় জড়চেতনাত্মক বস্তু স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। আবার জগৎ যখন জড় ও চেতনময় হইল, তখন উহার মূলও যে তদ্রূপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জড় ও চেতন যদি পৃথক্ পৃথক্ বস্তু হইত, তাহা হইলে উহার মূল অন্যোন্য পৃথক্ জড় ও চেতনাত্মক পদার্থ হইত। জড় ও চেতন যে হেতু একাধারে বা একই বস্তুতে সহাবস্থান করে, সেই হেতু ইহার মূলও যে তদ্রূপ হইবে, ইহা বেশ বুঝা যায়।

যে সমস্ত পণ্ডিত জড় ও চেতনকে পৃথক্ মানিয়া ইহার মূলকে কেবল চেতন বা কেবল জড় বলেন, তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত, সন্দেহ নাই। এতদুভয়কে পৃথক্ মানিয়া মূলেও পৃথক্ মানা বরং যুক্তি-সঙ্গত। একদিকে যুক্তিসঙ্গত হইলেও এমতে অপর দিকে অনেক গোল থাকিয়া যায়। কারণ, বিশেষ ব্যক্তচেতনাত্মক জীবিত জীবদেহে জড় ও চেতনের স্বাভাবিক সহাবস্থান ব্যতীত যে প্রাণ সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহাতে জড় ও চেতন বই একটি পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, আর সেই জন্যই, এইরূপ চেতনের জড়সংযোগ-

জনিত নিয়ত সুখ দুঃখ অনুভব অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ, জড় ও চেতন পৃথক্ হইলে মূলেও পৃথক্ থাকিয়া ব্রহ্মকেও ঐরূপ নিয়ত সুখদুঃখভাগী করিবে। পরন্তু ব্রহ্ম ঐরূপ নিয়ত সুখদুঃখভাগী, একথা আমরা কিছুতেই মানিতে পারি না। উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থে ঋষিগণও বলিয়াছেন যে, সমস্তই ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতেই স্থিত, ও ব্রহ্মেতেই লয় হইবে; ব্রহ্ম চিন্মাত্র, নিত্য, একরূপ, ইত্যাদি, তিনি এক, আনন্দময় সুখদুঃখবিহীন ইত্যাদি। উক্ত বাক্য সকলের সমান মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে ব্রহ্ম জড় ও চেতনের অতীত বা উভয়াত্মক অথবা উভয়প্রসূ না বলিয়া থাকা যায় না। জগৎকারণ উভয়াত্মক হইবার আরও হেতু আছে। সেটী এই,—চেতন ও জড় পৃথক্ মানিয়া ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বময়ত্ব, সর্ব্বকারণকারণত্ব, একত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হয় না। কিন্তু জড় ও চেতন একটী বস্তুর ভাবদ্বয়মাত্র, এইরূপ বুঝিলে উহা পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হয়।

আমাদের এই উভয়াত্মক বস্তুকে শাস্ত্রে "চিৎ" নাম দেওয়া হইয়াছে। উপনিষদাদিতে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ কথন কালে, তাহাকে সচ্চিদানন্দ, সত্যজ্ঞান ও প্রজ্ঞান প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। ঐ "চিৎ"টী আমাদের জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির চিৎ নহে। জাগ্রদাদির চিৎ বা চেতন জড়ে ঐ চিতের একটী বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। বিদ্যুৎ যেমন সমস্ত বস্তুতে থাকিলেও ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা বস্তুবিশেষে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে এবং তখনই ঐ বস্তু বিদ্যুদ্‌গুণবিশিষ্ট বলিয়া কথিত হয়, উহাও তদ্রূপ। সুতরাং ব্রহ্মকে সাধারণ অর্থে চেতন বলা যুক্তিযুক্ত নহে। সাধারণ চেতন জড়সাপেক্ষ, জড়ের অস্তিত্বতুলনায় সিদ্ধ, ব্রহ্মচেতন কিন্তু স্বাধীন ও জড়াস্তিত্বনিরপেক্ষ। ইহাতে জড়ত্ব ও সাধারণ চেতনত্ব একত্র প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। উপনিষদে চিৎ যে অর্থে ব্যবহৃত, সে অর্থে কোন দোষই নাই, তাহা জড় ও চেতনের কারণ, সুতরাং তাহা উভয়াত্মক।

সচরাচর চিৎ অর্থে আমরা উভয়াত্মক একটা বস্তু বুঝি না, কিন্তু কখন আসে কখন যায়, দেহ ছাড়া একটী পৃথক্ বস্তুবিশেষ বলিয়াই বুঝি। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই উভয় চিদ্বস্তুতে একটী সাধারণ ভাব রহিয়াছে। উপনিষদের চিৎ

একপ্রকার একরূপ, নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব মাত্র স্বরূপ, অহং ইত্যাকার বোদ্ধৃবোধ্যভাবাত্মক জ্ঞানমাত্র, অহেতুক, বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রবাহ। জৈব চিৎ কিন্তু অবচ্ছিন্ন, অহং ইত্যাকার বোদ্ধৃবোধ্যভাবাত্মক অস্তিত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট, অনির্দ্দেশ্য সংশয়িত জ্ঞানপ্রবাহ। অহং ইত্যাকার বোদ্ধৃবোধ্য-ভাবাত্মক অস্তিত্বস্বরূপতাই ইহাদের সাধারণ অংশ। যে অংশে মিল নাই, তাহা অবস্থাভেদ মাত্র। এই সাধারণ ভাবটী বিশেষ বিশেষ জড়ে অভি-ব্যক্ত হইয়া প্রচলিত অহং শব্দের লক্ষ্য যে চেতন, তাহাই বুঝায়। বিশেষ-রূপে অভিব্যক্তিই ইহার উৎপত্তি, এবং এই উৎপত্তি থাকায় ইহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মৃত্যুতে যে অজ্ঞান দেখা যায়, 'আমি যেন ছিলাম না' এইরূপ যে একটী ভাব দেখা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে আমির অস্তিত্ব অংশের লোপবোধক নহে, তাহাতে আমির দেহাদি সম্বন্ধ-জ্ঞানের লোপমাত্র বুঝায়।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, আমি এই বোধটীর মধ্যে উক্ত দুইটী অংশ বিরাজমান। অস্তিত্বরূপী পূর্ব্বোক্ত সাধারণ অংশটী আমিতে অক্ষুণ্ণ থাকে। এই অস্তিত্বরূপী বোধটীই আমির নিজত্ব বা বস্তুত্ব। মৃত্যু আদি অবস্থাতে আমি বস্তুর বস্তুত্ব বোধ যায় না। আমরা যে উহার অভাবের কল্পনা করি, তাহা ভ্রম। কারণ, আমরা কোনকালেই একেবারে আমাদের আমিত্বের সম্পূর্ণ অভাব বোধ কল্পনা করিতে পারি না। যদি মৃত্যুতে সম্পূর্ণ অভাব হইত, তাহা হইলে আমাদের ওরূপ অভাব কল্পনার সামর্থ্য থাকিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহারো তাহা বোধ হয় নাই। যতই কঠোরতার সহিত, সাবধানে আমরা ইহার কল্পনা করি, ততই আমাদের আমিত্বের অস্তিত্ব অংশটুকু আকাশের মত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, কখনই একেবারে লোপের জ্ঞান আসে না।

তাহার পর বস্তুর একেবারে লোপ কল্পনা করিবার আমাদের অধিকার নাই। আমরা কখন এমন কোন বস্তু দেখি নাই, যাহা একেবারে লোপ হই-য়াছে। বলিতে পারা যায় যে,এই যে পরিদৃশ্যমান ঘটটী রহিয়াছে, এটা ভাঙ্গিলে আর এটী ত থাকে না ; যাহা পরে হইবে, তাহা ইহার মতই হইবে, সুতরাং "এই"কথাটির বিনাশে আমরা একেবারে লোপের বা অভাবের আভাস পাইতে পারি এবং আমিত্ব সম্বন্ধেও ঐরূপ ভাবিয়া লইতে পারি। না ; উহা ঠিক নহে, উহা আমরা পারি না। যে হেতু "এই" বলিয়া কোন জিনিষ নাই।

ছিল "এই ঘট"। "এই" কথাটি দ্বারা যাহাই বুঝি না কেন, উহা ঘটে সম্বন্ধ ছিল। ঘট গিয়াছে; আবার ঘট আসিবে, ঠিক তদ্রূপই আসিবে, আসিবে না কেবল "এই" শব্দবাচ্য পদার্থটী। বস্তুতঃ "এই ঘট" কথাটীর ভিতর আছে কি? আছে তদ্রূপতা ও কালসাপেক্ষতা মাত্র। অর্থাৎ এই সময়ের এইরূপ ঘট—এই ভাবটী আছে মাত্র। উহার মধ্যে এতদ্রূপতাটি ব্যাপারসাধ্য; 'কালসাপেক্ষতা'টিই কেবল অসাধ্য। হাজার হাজার "ঘট" কর, সেই সময়ের ঘটটী আর আসিবে না। যন্ত্রসহযোগে একটী মৃৎপিণ্ড হইতে পুনঃ পুনঃ একইরূপ ঘট নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, পারা যায় না কেবল সেই সময়ের সেই ঘটটী করিতে। যাহাই হউক, কালসাপেক্ষতা দ্বারা কখনই বস্তুর বস্তুত্ব প্রমাণ হয় না। উহা সম্বন্ধের জ্ঞাপক মাত্র। সম্বন্ধের লোপ বা অভাব আমরা বুঝিতে পারি ও স্বীকার করি, কিন্তু বস্তু লোপ বা অভাব বুঝি না বা স্বীকার করি না। মৃদ্বস্তুই ঘটরূপ হয়। মৃদ্বস্তুর অভাব কখনই হয় না। অতএব সম্বন্ধের অভাবসম্ভবতা বস্তুতে আরোপ করিয়া আমিত্বের অস্তিত্ব অংশের প্রতি সংশয় করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে।

তাহার পর আমি বোধে বিষয়তা আছে, অনুভূতি রূপ ক্রিয়া আছে, সেই হেতু কোন দেহাদিসম্বন্ধীয় কার্য্যের সংস্কার ইহার গাত্রে অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহাই পুনর্দ্দেহসম্বন্ধকালে ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে। স্থূল বিষয়ে অহরহ নিমজ্জিত থাকায় আমরা সুষুপ্তি, মৃত্যু বা মূর্চ্ছার আমিত্ববোধ বুঝিতে পারি না। পরন্তু অভ্যাসবলে তাহাও সুসাধ্য হয়। এবং যাঁহাদের হয়, তাঁহারাই পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারেন। শাস্ত্র ইহার ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করেন। যাহা হউক, যে কারণে উহা এরূপ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়, তাহা আমরা কিঞ্চিৎ পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে উপনিষদের চিতের বা ব্রহ্মবস্তুর একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাউক।

আমরা পূর্ব্বেই সর্ব্বকারণকারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই হেতু সেই একটী বস্তু ব্যতীত সমস্তই ইহা হইতে জাত, এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমরা বিচার করিব। অপর বস্তুও আছে এবং সেইটীও আছে, এ ভাবে তাহার বিচার করিব না। সুতরাং উহা সর্ব্বকারণকারণ বলিয়া ইন্দ্রিয়াদি অন্তঃকরণ প্রভৃতি কোন সহকারী কারণ নাই। ইহাতে

কেবল নিজে নিজেরই অনুভূতিমাত্র বর্ত্তমান। অন্য এমন কিছুই নাই, যাহার দ্বারা ইহার কোন তারতম্য হইতে পারে। দেশ বা সীমা নাই যে, ইহার অঙ্গ বা অংশ কল্পনা হইবে, কাল নাই যে, ইহা এখন একরূপ, কিন্তু পরে আর একরূপ হইবে। অন্য বস্তু নাই যে, তৎসহযোগে ইহার গুণের পরিচয় হইবে। এই হেতু ইহা নির্গুণ, কিন্তু গুণশূন্য বলিয়া নির্গুণ নহে। ইহা কেবলই কেবল, সুতরাং নিষ্ক্রিয়। স্বাত্মানুভূতিরূপ ক্রিয়াবিহীন বলিয়া নিষ্ক্রিয় নহে।

পূর্ব্বে একত্ব সম্বন্ধে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা কেবল একটী বস্তুমাত্র। ইহাতে জাতি বা অবয়বগত কোন ভেদ বা বিশেষ নাই। পরন্তু কোন বাস্তবিক বিশেষ নাই বলিয়া যে ইহাতে কোন প্রকারই বিশেষ নাই, তাহা নহে। ইহাতে শক্তিগত ব্যাপার-ভেদ বা বিশেষ কল্পনা করিতে আমরা বাধ্য। উহাতে অন্য সর্ব্ববিধ ভেদ কল্পনার তুলনায় শক্তিগতভেদ বা বিশেষ কল্পনাই অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ। ঐরূপ ভেদকল্পনায় উহার সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি পরিচয়গ্রামের অধিক সার্থক্য সাধিত হয়। অপর সর্ব্ববিধ বিশেষ স্বীকারে ঐরূপ সার্থকতা থাকে না। শক্তিগত ঐরূপ ভেদ স্বীকার না করিলে উহাতে আপন অস্তিত্বানুভূতি থাকিতে পারে না এবং এ দৃশ্য জগতের উৎপত্তি ব্যবস্থা এবং লয়ও উহা দ্বারা হইতে পারিত না। জগৎ নাই বলিলে দৃষ্টের অপলাপ করা হয়, এবং জগতের অস্তিত্ব না মানিলে এ বিচারকার্য্যই বা কে করিত? অন্য বস্তু না থাকায় তাঁহাতেই তাঁহার শক্তির কার্য্য মানিতে হইবে। অগ্নির দাহিকাশক্তি, অন্যবস্তুরূপ কাষ্ঠে প্রকাশ পায়। ইহা কিন্তু সে প্রকারের নহে। বোদ্ধৃবোধ্যভাবাত্মক স্বাত্মানুভূতিই ইহার গুণ বা শক্তি-গত ভেদের পরিচায়ক। আবার বোধ্যভাবটী যে ইহার বোদ্ধাভাব ছাড়া, তাহাও নহে। এ দুইটী ভাব পৃথক্ নহে, ইহারা থাকিয়াও একত্বের হানি করে না। ইহাতে একত্ব বোধ ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে। আমরা পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারি বলিয়া ইহা পৃথক্ নহে। অপর কোন বস্তু না থাকায় ইহার সেই কেবল ভাবের ভাবান্তরের বাস্তবিক হেতু নাই।

এই জন্যই ইহাকে স্বাধীন সুতরাং আনন্দস্বরূপ বলা যায়। এ আনন্দ আপেক্ষিক শব্দ নহে, ইহা দুঃখের সহিত সম্বন্ধ রাখে না। এটী একটী স্বতঃসিদ্ধ ভাব। ইহা অনুভব করিতে হইলে একটু ধ্যান অভ্যাস প্রয়োজন।

আমাদের মধ্যে সকলেই অল্প বিস্তর এরূপ গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন অনেক সময়ে হইয়া থাকেন। ইহা সেই গাঢ় চিন্তার অনুরূপ করিয়া একটু মাত্রা বাড়াইলেই হইবে।

যাহা হউক বুঝিলাম ইহা চিৎ, ইহা এক, অপরিচ্ছিন্ন অসীম নিষ্ক্রিয় আনন্দময় নিত্য অনুভূতি স্বরূপ বস্তু। আমাদের যে 'আমি' অনুভূতি, ইহা তাঁহারই অনুভূতি, পরন্তু তাঁহার অনুভূতিতে যেমন অসীমত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বপাবকত্ব বর্ত্তমান, আমাদের তাহার বিপরীত দেহমাত্রত্ব, অল্পজ্ঞত্ব, অল্পপাবকত্ব রহিয়াছে। ব্রহ্মের 'আমি' আবৃত হইয়া আমাদের 'আমি' হইয়াছে। তাঁহাতে যেমন তাঁহার নিত্যভাবের অপলাপ না হইয়া এই বহুভাব বর্ত্তমান, আমাদিগেতে তদ্বিপরীত আসা যাওয়া রূপ জন্ম মৃত্যু বর্ত্তমান। শক্তিবশে জগদাদি বিচিত্ররূপ ধারণ করায় বৃক্ষের সমষ্টি বনের ন্যায় ইনি ইহাদের নিয়ামক রূপও ধারণ করিয়া থাকেন, অথচ ইহাঁর কোন ক্ষয়বৃদ্ধি হয় না। বহুর মধ্যে যে একটী একভাব, তাহা বহুর নিয়ামক হইয়া পড়ে। ভগবানের বহুত্বে ভগবানেও সেইরূপ নিয়ামকত্ব অনুমেয়। জগতে যেমন দেখা যায়, কোন বস্তু হইতে কোন বস্তু জন্মিলে তাহা ঠিক পূর্ব্ববৎ ভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয় না, ইহাতে সেরূপ ভাব নাই। জগতে যেমন কোন বস্তু কোন রূপান্তর গ্রহণ করিলে তৎকালে স্বীয় রূপের ব্যতিক্রম নিবারণ করিতে পারে না, ইনি সেরূপ নহেন। ইহাঁতে যেন সর্ব্ববিরুদ্ধধর্ম্ম সমন্বয়প্রাপ্ত।

এ পর্য্যন্ত যত মত উঠিয়াছে, তাহার কোনটিই ভগবান্‌কে বিরুদ্ধ ভাব হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। তাহা পারে নাই বলিলেও তাহারা যে ভগবান্‌কে অধিকতর স্পষ্টভাবে বুঝে নাই, তাহাও নহে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্‌ই এইরূপ। ইনি সমস্ত প্রসব করেন বলিয়া, প্রসূত পদার্থের দ্বারা তাঁহাকে বুঝিবার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন তাঁহার একদেশমাত্র বুঝাইতে সক্ষম হয়। কার্য্য দ্বারা কারণ কখনই সমগ্রভাবে বুঝাইবার আশা করা যায় না। বরফ জমিলে অবয়ব বৃদ্ধি পায়, ইহা অন্য সমস্ত তরলবস্তুবিলক্ষণ। যে হেতু ইহার মত অপর তরল বস্তু জমিয়া অবয়ব বৃদ্ধি করে না, সেই হেতু উহা ওরূপ কেন হইবে, ওরূপ হইতেই পারে না, এরূপ কথা যেমন আমরা না বলিয়া উহা ঐ রূপই হয় বলিয়া বুঝি, ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ করিয়া বুঝিতে হইবে। কোন বস্তু বিষয়ক জ্ঞান আমাদের দুই প্রকার হয়। প্রথম, বস্তুটীকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া,

দ্বিতীয়, অপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সহিত সংযোগ করিয়া তাহার গুণ ও ক্রিয়াগত বিশেষতা উপলব্ধি করিয়া। প্রস্তর দেখাও বলিলে, প্রস্তরখণ্ডটী যদি হাতে একেবারে আনিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান, এবং প্রস্তরখণ্ডটী হাতে করিয়া পরে অগ্নি প্রভৃতি অন্য বস্তুতে সংযোগ বা আঘাতাদি দ্বারায় প্রস্তরের যে বিশেষ ক্রিয়া ও গুণের উপলব্ধি হয়, তাহা দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের প্রথম প্রকারের জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজ্ঞানলাভোদ্দেশ্যে উঁহাকে "আমি বস্তু" বলা হইয়াছে এবং সম্বন্ধজ্ঞান বা দ্বিতীয় প্রকারজ্ঞান-লাভোদ্দেশ্যে পূর্ব্বোক্ত অব্যয়, অসীম, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, নির্ব্বিকার প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমাদের ভিতরকার আমি বস্তুটির মল শূন্য করিতে পারিলে আমাদের ব্রহ্ম বস্তুর প্রথম প্রকারের জ্ঞান পূর্ণ হয়, আর বিচিত্র জগৎ ব্যাপার একরূপ ব্রহ্ম হইতে তৎশক্তিবশে জাত, এইটি বুঝিতে পারিলে ব্রহ্মবিষয়ক দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান হয়। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থার হেতু দেহ মন বুদ্ধি এবং অজ্ঞান বা জীবত্ব বাঞ্ছা লইয়াই আমাদের আমি বস্তু এবং উহাই ব্রহ্মে মলস্থানীয়, এবং বিচিত্রজগদ্ব্যা-পার একই ব্রহ্মে অসম্ভব এই প্রকার বোধই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। বিচারসাহায্যে উক্ত প্রতিবন্ধক ও মল দূর করিতে পারিলে যে রূপ বোধ হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহা দূর করিতে হইলে বিশেষ সাবধানসহকারে বিচার প্রয়োজন, নচেৎ পদে পদে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়।

মহাত্মা শঙ্কর, যিনি ব্রহ্মবস্তুকে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ বিষয়বৎ জগতে স্পষ্ট জ্ঞানগম্য করিয়া গিয়াছেন—যিনি চিন্তামণিজিজ্ঞাসুর হস্তে চিন্তামণি দিয়া "এই চিন্তামণি লও" বলার মত ব্রহ্মবস্তুকে আমি বস্তুতে ও আমি বস্তুকে স্বরূপতঃ ব্রহ্মবস্তুতে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যিনি সত্যবস্তু বলিতে এক-মাত্র ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও ব্রহ্মবিষয়ক সম্বন্ধজ্ঞান সম্বন্ধে অথবা ব্রহ্মের শক্তিগত ব্যাপারবৈচিত্র্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া ফেলিয়াছেন। সেই ঔদাসীন্যফলে ব্রহ্মের নিত্য, নির্দ্দোষ, নির্ব্বিকার ও অব্যয়ভাব রক্ষার্থ, পরবর্ত্তী তন্মতাবলম্বিগণ জগৎকে একেবারে সত্তাহীন ভ্রম বা বন্ধ্যাপুত্রবৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মকে একেবারে নির্গুণ ও নিঃশক্তি বুঝিয়া লইয়াছিলেন। এক ব্রহ্মেরই শক্তিবশে ব্যাপারবৈচিত্র্য যে সম্ভব, তাহা

ভুলিয়া গিয়াছেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপতায় ও জড় পাষাণে বিশেষ কোন ভেদ রাখিতে পারেন নাই। এ জন্য নির্ম্মল আমি বস্তুই ব্রহ্ম, ইহা বুঝিতে যাইয়া সমল অহংজ্ঞানই ব্রহ্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মহাত্মা শঙ্করের মত তন্মতানুসারিগণ কর্তৃক বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে কালে মহাপ্রভু চৈতন্য উহার পুনঃ সংস্কার করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ আচার্য্য শঙ্কর ভ্রম অর্থে সদ্বস্তুতে অন্যথা বোধ এবং মিথ্যা শব্দে পরিবর্ত্তনশীলতা হেতু অনিত্য অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; জগদ্ব্যাপার বা ব্রহ্মশক্তির অত্যন্তাভাব উপদেশ করেন নাই। তাঁহার নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিঃশক্তি, নির্ব্বিকার প্রভৃতি শব্দগুলি ব্রহ্মে বস্ত্বন্তররাহিত্য বুঝায় মাত্র, গুণ বা শক্তিরাহিত্য অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই।

সুতরাং বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মে সমস্ত অন্যথাভাব তাঁহার শক্তিপ্রভাবে তাঁহাতেই, বিনা অন্য উপকরণে সংঘটিত। এক অসীম বস্তুর শক্তিপ্রভাবে রূপান্তর ঘটিয়াও সেই বস্তু যে রূপ সেই রূপই রহিয়াছে, এরূপ ধারণা করা দুঃসাধ্য। আমরা অজ্ঞাত বস্তু দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুমান করিয়া থাকি, এ স্থলে কোন একটী দৃষ্টান্ত সাহায্যে এই ব্যাপারটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। শাস্ত্রকারগণ এজন্য নানাবিধ দৃষ্টান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা এ স্থলে তন্মধ্যে একটী গ্রহণ করিব। ইহা মন ও তাহার কার্য্য। অন্যান্য দৃষ্টান্ত অপেক্ষা ইহা প্রকৃতপক্ষে বহুদূরব্যাপী ও বহুভাবগ্রাহী। আমরা মনসাহায্যে যেমন কোন বস্তুব্যতিরেকেও সমস্ত সৃজন করিয়া সমস্ত রূপ ধারণ করিয়াও তাহার ব্যবস্থা প্রভৃতি করিতে পারি, অথচ নিজের স্বরূপ ভুলি না, নিজের নিজত্ব অপরের সহিত পৃথক্ রাখিতে পারি, ব্রহ্ম এ স্থলে তদ্রূপ করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াই জগদ্ব্যাপার 'ব্রহ্মকল্পনা' বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। জগৎ আদির প্রকাশ ও অপ্রকাশ মনেতে যেমন স্মৃতির উদয় ও অনুদয়। স্মৃতিতে থাকার মত থাকে বলিয়া জগদ্ব্যাপার ব্রহ্মে বস্তুগত কোন প্রকার অস্তিত্ব প্রমাণ করে না, পরন্তু বস্তুতে শক্তিবিশেষ যেমন লুক্কায়িত থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি করে বুঝায়।

কেহ কেহ আপত্তি করেন, আমরা কোন কল্পনাবলে যে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হই না, এ কথা ঠিক নহে। কারণ, কল্পনার মুহূর্ত্তকালে যাহা কল্পনার বিষয়, তাহাই বর্ত্তমান থাকে, কল্পনাকর্ত্তা সেই 'বিষয়ে' মিশাইয়া

যায় এবং ইহা অত্যন্ত অল্পক্ষণস্থায়ী বলিয়া স্বাভাবিক বা অকল্পনা কালের কর্ত্তা ভাবটী বর্ত্তমান থাকে বলা হয়। না, এ আপত্তি ঠিক নহে। যেহেতু আত্মার অহং ইত্যাকার জ্ঞানই অন্তঃকরণে প্রকাশিত। এই অহংজ্ঞান স্মৃতিস্থ বা বহিঃস্থ বিষয়কে আবরণ করিয়া তাহার আকারটী যেন একটী ছাঁচের মত হইয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করে। সুতরাং অহংভাব বিনষ্ট হয় না। দুইটী বিষয় চিন্তাকালে আমাদের একটীর পর একটী আসে সত্য, একটী বিস্মৃত বা চিত্ত হইতে অপসারিত হইয়া অপরটী আসে সত্য, কিন্তু এস্থলে সেরূপ নহে। দুইটী চিন্তাই এককালে বিষয় মধ্যে গণ্য, কিন্তু একটী অহংচিন্তা ও অপরটী অনহংচিন্তা হইলে, উহারা বিষয়মধ্যে গণ্য হয় না। কাজেই ঐ আপত্তি স্থান পায় না। সুতরাং চিত্তে স্মৃতির উদয় অনুদয় দৃষ্টান্তটী এ অংশে দোষাবহ নহে।

নানারূপ ধারণ করিয়াও যাহা তাহাই, কেবল এইটী বুঝিবার জন্য আরও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতে হইলে, স্বর্ণ ও কুণ্ডলের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে স্বর্ণ, কুণ্ডল হইলেও, স্বর্ণত্ব যায় না; সেইরূপ ব্রহ্ম জগৎ হইলেও তাঁহার ব্রহ্মত্ব কোন অংশে একটুও যায় নাই। এ দৃষ্টান্তে জাতিগত ঐক্য রক্ষা হয় মাত্র, স্বগতভেদ নিবারণ হয় না। কল্পনা বা চিন্তার দৃষ্টান্ত দিয়া একবস্তু এক হইয়াও নানারূপ হয়, বুঝা যাইল বটে, কিন্তু কল্পনা বলিলে অনতিদূরে আর একটী দোষ আসিয়া পড়ে। মনে হয়, জগৎ তবে আমাদের মনঃপ্রসূত, ইহার কিছুই সত্য নহে, এই আছে এখনই যাইবে, শিক্ষা সদাচার প্রভৃতি সবই বৃথা। এ দোষটী নিবারণ করিবার জন্য এক সম্প্রদায় ইহা সত্য সত্যই সৃষ্ট বলিয়াছেন। পরন্তু তাহাতেও আবার আর একটী মহান্ দোষ উপস্থিত হয়। মনে হইবে যে, ব্রহ্ম তাহা হইলে বিকারী। ইহা নিবারণাভিপ্রায়ে তাঁহারা বৈদূর্য্যমণির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। বৈদূর্য্যমণি বা "ক্যাটস্ আই" প্রস্তর একটী বস্তু হইলেও নানাদিক্ দিয়া নানারূপ দেখায়। পরন্তু ইহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। স্বগতভেদই ইহার ঐরূপ বৈচিত্র্যের হেতু, এবং স্বগতভেদবিশিষ্ট বস্তু কখনই সম্পূর্ণ স্বাধীন বা সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারে না। যাহার অংশবিশেষ দ্বারায়, জগদ্ব্যাপার সাধিত হয়, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে অবিকারী নহে, তাহাতে সংশয় নাই। যাহার কার্য্য সৎ এবং পরিবর্ত্তনশীল, তাহার কারণও যে তদ্রূপ, তাহা সুনিশ্চিত। অন্যপক্ষীয়গণ আবার ব্রহ্ম জগতের কারণ হইয়াও অপরিবর্ত্তনীয়

অবিকারী, ইহা বুঝাইবার জন্য জগৎ, রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি, বা স্বপ্ন, অথবা ঐন্দ্রজালিকব্যাপারবিশেষ বলিয়াছেন। বলিতে কি, ইহাও দোষপরিশূন্য নহে। কল্পনা বলিলে যে দোষ, ইহাতেও সেই দোষ আসিয়া পড়ে। জগৎকে ভ্রান্তি প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য্য ব্রহ্মভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, জগৎকে মিথ্যা বলিবার জন্য নহে। স্থূল কথা, ব্রহ্ম সব হইয়াও স্বস্বরূপে আছেন। দৃষ্টান্তপ্রয়োগ দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বাংশের জন্য নহে, ইহা সততই কোন বিশেষ বিশেষ অংশ বা ভাব বুঝাইবার জন্য। এবং সেই অংশে মাত্র অবস্থান করিলে কোন দৃষ্টান্তই দোষাবহ নহে। চাঁদের মত মুখখানি বলিলে মুখখানি চাঁদের মত গোলাকার বুঝায় না।

এখন দেখা যাউক, ব্রহ্মে জগতের উদয় অনুদয় আছে কিনা ও যদি থাকে, তবে তাহা কি প্রকার ? মনেতে কোন ব্যাপার স্মরণ করার ন্যায় শক্তিসাহায্যে ব্রহ্মের জগদাদি ভাবান্তর যেন হইয়া থাকে, এ দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাতে বাস্তবিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যবিষয়ক কিছুই বুঝান হয় নাই, পরন্তু করণ ও উপকরণান্তররাহিত্যই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উদয় অনুদয় থাকিলে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই কোনরূপ থাকিবে সুতরাং উদয় অনুদয় বিচারকালে উদ্দেশ্যও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা আবশ্যক। ভ্রান্তি বা সুবর্ণ ও কুণ্ডলের দৃষ্টান্তও জগৎকর্ত্তার উদ্দেশ্য লক্ষ্যে প্রযুক্ত হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন না থাকিলে কখনই সত্য হউক বা মিথ্যাই হউক, কোন কার্য্যে কাহারো প্রবৃত্তি দেখা যায় না। শাস্ত্র এস্থলে "ক্রীড়াপরায়ণ বালকের চেষ্টার ন্যায় ব্রহ্মের চেষ্টা" দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। বাস্তবিক ক্রীড়াপরায়ণ বালকের কোন আনন্দের অভাব নাই অথচ একটী খেলা বা ভাব ছাড়িয়া অন্য খেলা আরম্ভ করে ; ব্রহ্মে সৃষ্টির উদয় অনুদয় তদ্রূপ। এ দৃষ্টান্ত কিন্তু সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যেহেতু আনন্দের অভাব না হইলেও পূর্ণতার অভাব না মানিয়া থাকা যায় না। এবং একটী খেলা ছাড়িয়া অপর খেলা গ্রহণে পূর্ব্বভাবের লোপ হয়। এ দোষ নিবারণার্থ শাস্ত্র জগদ্ব্যাপারকে তাঁহার স্বভাব বা বিভূতি বলিয়াছেন, যেহেতু ঐরূপ বলিলে পূর্ণতার অভাব আপত্তি স্থান পায় না। এ আপত্তিটী এস্থলে থাকিল না বটে, কিন্তু আবার অন্য আপত্তি উপস্থিত হইল। সেটী স্বভাবের অপরিহার্য্যতা নিবন্ধন বাধ্যতা। ব্রহ্ম যেন তাহা হইলে আর অন্যরূপ হইয়া থাকিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার স্বাধীনতার

খর্ব্বতা হইল। কোন কোন মহাত্মা এরূপে নির্দ্দোষতা প্রমাণ অসম্ভব বিবেচনায় জগদ্ব্যাপার একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে যে দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। উভয় দোষের তুলনায় মিথ্যা বলা দোষই অধিক বলিয়া বোধ হয়।

মোট কথা, ভগবত্তত্ত্ব এতই দুর্ব্বোধ্য যে, ইহা তাঁহার কৃপা ও বিনা সাধনে কখনই নিশ্চয়াবধারণ হইবে না। তবে এটুকু বুঝা যায় যে, তাঁহাতে জগতের আবির্ভাব তিরোভাব তাঁহার ইচ্ছা বশতই হয়, উহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারের ন্যায় অনায়াসসাধ্য এবং সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার স্বরূপের চ্যুতি হয় না। অপর, সৃজন করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়াও তাঁহার আনন্দের পূর্ণতার অভাবও নাই। যুক্তিপ্রাপ্ত সত্যের অনুরোধে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পরস্পর বিরোধী ও মনে ধারণা করা যায় না। পরন্তু জগৎতত্ত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই সমস্ত অসম্ভবের আশ্রয় সেই ভগবান্‌কে এরূপ ব্যতীত অপর কোন রূপ বলিতে প্রবৃত্তির অভাব উপলব্ধি হইবে। মনুষ্যের জ্ঞান যতই বিস্তৃত হউক না কেন, স্বভাবের উপর আমাদের আধিপত্য যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, আমাদের ক্ষমতা যে একটী অদৃশ্য অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতার অধীন, তাহার পরিমাণ একটুও কমে নাই। যেহেতু এই বৈসাদৃশ্য মোচন আমাদের ক্ষমতার অতীত, এবং সর্ব্বমূল যিনি, তিনিই এই বৈসাদৃশ্য প্রসব করিয়াছেন, তখন তিনি সেই বৈসাদৃশ্যের অতীত বস্তু বলায় আমাদের কোন প্রকারে যুক্তিরাজ্যের বহির্ভূত আচরণ করা হইবে না। প্রত্যুত একটী নূতন বস্তুর নূতন গুণ যেমন আমরা পরীক্ষার দ্বারায় স্থির করিয়া মানিয়া লই, ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের তাহাই করা উচিত। উৎপত্তি লয় হয় না বলিবার উপায় নাই। যেহেতু সৃষ্টিরই অংশবিশেষ আমাদের সমক্ষেই উৎপন্ন ও লয় হইতেছে। এবং হয় বলাও ঠিক নহে, যেহেতু তাহা হইলে ব্রহ্মের বিকার সম্ভব। এই উভয় পক্ষকে সমান মর্য্যাদা দিলে বদতো-ব্যাঘাত দোষ আছে, নিজের কথার প্রতিবাদ নিজের দ্বারাই করা হয়। কাজেই একটীকে গৌণ ও একটীকে মুখ্য করিতে হয়। ব্রহ্মের বিকারহীনতা মুখ্য সত্য করিয়া জগৎ উৎপত্তি গৌণ সত্য করা ভিন্ন উপায় নাই। এই জন্যই জগদ্ব্যাপার মনঃকল্পনাসদৃশ, ইন্দ্রজালবৎ সত্য, অথবা বস্তুর শক্তিগত ব্যাপারবৈচিত্র্যবৎ বলিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়।

এতদূরে আমরা দেখিলাম, ব্রহ্ম কি বস্তু। ইনি চিৎ বা স্বকীয় অনুভূতি মাত্র স্বরূপ। স্বভাব বশে কার্য্য করার মত ইনিই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় ব্যাপার দ্বারা, জীবজগৎ ও ঈশ্বর ভাব ধারণ করিতেছেন মাত্র। এবং ইহাতে তাঁহার, করা ও না করার মধ্যে যে একটা সাধারণ বা এক ভাব আছে, তাহার পরিবর্ত্তন বা বিস্মৃতি হয়না। ইনি খণ্ড খণ্ড বস্তুসমষ্টি নহেন সুতরাং অখণ্ড বা অপবিচ্ছিন্ন। ইঁহার সীমা বা অন্ত নাই সুতরাং অসীম। ইনিই কেবল একমাত্র বস্তু, ইঁহা ছাড়া অন্য আর কিছুই নাই। জীবগণ যাহাকে অন্য বস্তু বা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বলিয়া থাকে, তাহা তিনিই অন্য বা পৃথক্ রূপ ধারণ কবিয়াছেন মাত্র। অন্যরূপ ধারণ করিলেও মনের ভিতরের ইচ্ছা দ্বারা বা স্মৃতি দ্বারা যেমন নিজেতে অন্যথাভাব অনুভব করা যায, তাঁহাতে কতকটা তদ্রূপই হয। ইহাকেই তাঁহার লীলা বলা হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে হৃদযঙ্গম কবিতে হইলে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে অভ্যাস প্রভৃতির প্রয়োজন। এই অভ্যাসগুণে ইহা ক্রমেই হৃদয়ে প্রকাশ হইতে থাকিবে।

ব্রহ্ম স্বরূপতঃ যেরূপ বস্তু, এবং সর্ব্বকারণকারণরূপে যেরূপ বস্তু, তাহা কতকটা বুঝা গেল, এক্ষণে এই জগদ্ব্যাপারের সহিত বা সমগ্র বিশেষ ভাবেব সহিত তিনি কিরূপ বস্তু, তাহা একবার দেখা যাউক। জগদ্ব্যাপারের সহিত কিরূপ ভাবাপন্ন জানিতে পারিলে তাঁহাব সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ, এবং তাঁহার প্রতি, জগতের প্রতি, ও আমাদেব নিজেব প্রতি আমাদের কিরূপ কর্ত্তব্য, তাহা স্থির কবা যাইতে পারে। এবাব আমরা ব্রহ্মকে কিভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহা একটা দৃষ্টান্তেব দ্বাবা পবিস্ফুট করা যাউক। জল কারণ, বরফ কার্য্য। জলে বরফ হইবার শক্তি থাকে। সেই শক্তির প্রকাশ, যখন জল বরফ হয। এবং অপ্রকাশ, যখন জল জলাবস্থায থাকে। জলজ্ঞান হইলে কাবণাবস্থার জ্ঞান হয, এবং বরফ জ্ঞান হইলে কার্য্যাবস্থার জ্ঞান হয়। জল জ্ঞান বরফ জ্ঞান ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ, এবং বরফজ্ঞানও জলজ্ঞানব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ। পূর্ব্বে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে জলের জ্ঞান কতকটা জন্মিয়াছে, এইবার বরফ জ্ঞানের দ্বারা সেই জল জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধন করা যাউক।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্ম একরূপ শীরানন্দ ব্যতিরেকেও যখন

আনন্দের বৈচিত্র্য বিধান করেন, তখনই সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল। বিষয়সমূহের মনের ভিতর স্মৃতিরূপে স্থিতির ন্যায় সমগ্র জগদ্ব্যাপার তাঁহাতে শক্তিরূপে লীন ছিল, এক্ষণে তাহা জাগরূক হইল। ইচ্ছাই এই জাগরণের হেতু, এবং তাঁহার বিচিত্ররসাস্বাদন স্বভাবই এই ইচ্ছার উদ্দেশ্য। প্রভুর আজ্ঞায় ভৃত্যের আগমনের ন্যায় সেই শক্তি যেন তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যকে বক্ষে ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল। ইহাই শ্রুতি উক্ত ঈক্ষণ। স্মরণমাত্র স্মৃতবিষয় জাগরূক হইয়া যেমন একটী বিষয়ান্তর হয়, আনন্দের বিচিত্ররসাস্বাদন উদ্দেশ্যে স্মরণমাত্রে তাঁহারও যেন তাহাই হইল। এবং তিনি যেন নিজে সেই বিষয়ান্তরের দ্রষ্টা হইলেন। এইরূপ ব্যাপার হইবামাত্র সেই ব্রহ্ম প্রকৃতি ও পুরুষ পদবাচ্য হইলেন।

যাহা তাঁহার স্মরণপথে আসিল, তাহাই এখানে প্রকৃতি এবং স্মৃত বিষয়ের দ্রষ্টাভাবই ব্রহ্মের পুরুষ ভাব। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ শব্দদ্বয় আপেক্ষিক বা সম্বন্ধবোধক শব্দদ্বয়। একটী ব্যতীত অপরটীর সত্তা স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মের এই পুরুষ ভাবটির জগতের সম্বন্ধে নিমিত্তকারণতা, এবং ঐ প্রকৃতিভাবটির ঐ সম্বন্ধে উপাদানকারণতা বুঝিতে হইবে। গুণ ও বস্তুকে যেমন আমরা পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারি, সেইরূপ এখানেও ব্রহ্মকে প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে ভাবিতেছি মাত্র। আর ভাবিতে পারি বলিয়াই যেমন গুণ গুণী বাস্তবিক পৃথক্ নহে বা পৃথক্ সত্তায় সত্তাবান নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতি পুরুষ ভাবও পৃথক্ পৃথক্ সত্তায় সত্তাবান নহে।

কিন্তু এই যে প্রকৃতিভাব, ইহা ব্রহ্মের শক্তির সহিত এক পদার্থ নহে। ব্রহ্মের প্রকৃতিভাবাপন্ন হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের শক্তির সত্তা আছে; কিন্তু প্রকৃতির সত্তা তখন প্রকৃতির আকারে ছিল না; শক্তির আকারে লীন ছিল। ব্রহ্ম এই শক্তিবশে পূর্ব্বে যে নিজানন্দ ভোগ করিতেছিলেন, তাহা পূর্ব্ব ভাবেই ব্রহ্মেতে রহিল অর্থাৎ ব্রহ্ম তাঁহার নিজানন্দ বিস্মৃত বা নিজ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইলেন না। এবং যে শক্তিবশে তাঁহার স্বরূপ অচ্যুত রহিল, তাহারই কিয়দংশ সৃজনেচ্ছায় পরে সৃষ্টিকার্য্যে পরিণত হইল। ব্রহ্মে সেই পুরুষ ও প্রকৃতি ভাব দুইটী প্রকৃত পক্ষে একটী বস্তুরই ভাব বলিয়া ব্রহ্মকেই পরমেশ্বর বলা হইয়া থাকে।

সুতরাং ব্রহ্মের ঈক্ষণ ক্রিয়ার পরমুহূর্ত্ত হইতেই ব্রহ্মের চারিটী

ভাবের পরিচয় আমরা পাইলাম। প্রথম আদিম নিত্য ব্রহ্মভাব, দ্বিতীয় পুরুষভাব, তৃতীয় প্রকৃতিভাব, চতুর্থ পরমেশ্বর ভাব। নিজানন্দের বৈচিত্র্য বাঞ্ছা করিয়া ব্রহ্ম যে মুহূর্ত্তে সৃষ্টির সূচনা করিলেন, অমনিই ক্রিয়ার পরিমাপক কালব্যাপার আরম্ভ হইল অর্থাৎ তিনিই কালরূপ ধারণ করিলেন। এবং যে মুহূর্ত্তে সসীম জগচ্ছবি তাঁহার স্মরণপথে সমুদিত হইল, অমনিই সসীমাবস্থা বা দেশের আবির্ভাব হইল। সৃষ্টি-কার্য্যে আনন্দের বিচিত্রতা সাধন হইল; কাজেই বুঝিতে হইবে, বিষয় ও বিষয়ভোক্তা উভয়েরই বৈচিত্র্য বা বহুত্ব সাধনও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইল। ব্রহ্মের স্মরণ মাত্রই তাঁহাতে যে সৃষ্টিচ্ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাঁহাতে তিনি নিজে যখন সেই ছবি দেখিয়াছিলেন, তখনই তিনি আপনাতে ব্যষ্টিভাব আরোপ করিয়া জীব ও জগতের বীজভাব ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পরমেশ্বরেই ব্যষ্টিভাবে এই অগণ্য জীব ও জগৎ।

এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের বুঝিবার জন্য ব্রহ্মের এই ভাবান্তর ব্রহ্মের এক দেশবিশেষে বা অংশবিশেষে সাধিত হইল, একথা বলায় তাহাতে দোষ স্পর্শে, কারণ, অসীম ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করিলে তাঁহার অসীমত্বের হানি হয়। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, কারণাবস্থার ভাব পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া তিনি এইরূপ হইতেছেন। সমষ্টি পরমেশ্বরে ব্যষ্টি জীবজগৎ আদির ছবি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম, এস্থলে ইহাও বুঝিতে হইবে। বটবীজমধ্যে অণুবীক্ষণ সাহায্যে যেমন ভাবী বৃক্ষছবি দেখা যায়, এবং জলপরমাণুসমূহ একত্র অখণ্ডবৎ হইয়া যেমন জলাশয় নামে খ্যাত হয়, সূক্ষ্মত্ব ও অঙ্গীভূতত্ব অংশে পরমেশ্বরে ব্যষ্টিভাব কতকটা তদ্রূপ। স্থূল চক্ষে বটবীজে যদ্রূপ বটবৃক্ষ অথবা জলাশয়স্থ অখণ্ড জলের অঙ্গীভূত জলপরমাণুসমূহ যেমন অদৃশ্য বস্তু, পরমেশ্বরে সেই প্রথম বহুভাবও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

যে উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের এই বহুত্ব সাধন, তাহা ঐ বীজভূতরূপে সুসিদ্ধ না হওয়ায় অহং ইদং ভাবের বা জড়চেতনের বিশেষ অভিব্যক্তি প্রয়োজন হইল অর্থাৎ প্রাণবিশিষ্টত্বের প্রয়োজন হইল। ভগবান্ এইবার আকাশাদি পঞ্চমহাভূত হইয়া, বিশেষ বিশেষ চেতনকণার ভোগোপকরণ ও সাধনের আকার ধারণ করিলেন। আকাশাদির পঞ্চবিষয়তা বা গুণই উপকরণ, এবং সেই পঞ্চ মহাভূতের সার পদার্থ ইন্দ্রিয়াদি এবং অন্তঃকরণ রূপে ভোগসাধন হইল। পরমেশ্বরও তৎসঙ্গে সমষ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভভাব গ্রহণ করিলেন।

ইহাতেও সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়ায়, সেই ভূতপঞ্চ, পঞ্চীকৃত অর্থাৎ প্রত্যেক ভূত পঞ্চগুণবিশিষ্ট হইয়া আবার নূতন এক প্রকার পঞ্চ মহাভূত রূপে পরিণত হইল ; এবং তাহাদের সারভাগ হইতে সেই অন্তঃকরণাদি-বিশিষ্ট ব্যষ্টি জীবের এই পরিদৃশ্যমান ভোগায়তন স্থূল দেহ জন্মিল। ভগবান্‌ও সেই সঙ্গে তাহাদের সমষ্টিভাবে বিরাটরূপ ধারণ করিলেন।

এইবার তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল, এতক্ষণে তাঁহার এই পরিদৃশ্যমান জগদ্ভাব ধারণ করা হইল। সুতরাং বুঝিতে হইবে, আমরা অজ্ঞ অবস্থায় যে জগৎ দেখি ও উহাকে যেরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট মনে করি, উহা সেরূপ নহে, উহা যথার্থতঃ যেরূপ বস্তু,তাহার নাম ব্রহ্ম। ফল কথা,যাহা যে রূপ দেখিতেছি, তাহা সেরূপ নহে, ভিতরে অন্য ব্যাপার, অন্য ভাব সনাতন ভাবে রহিয়াছে। বিরাটরূপী ভগবান্‌কে বুঝিতে হইলে—যাহা দেখিতেছি, তাহার মধ্যে ভগবান্‌কে জানিতে হইলে, এই সমগ্র জীবসমূহের যে সাধারণ ভাব ও বৃত্তি ও ইহাদের সমষ্টি ভাবের সহিত যে ব্যষ্টি ভাবের বিশেষত্ব, তাহা বুঝিতে হইবে।

বৃক্ষ ব্যষ্টি কিন্তু বন সমষ্টি। বৃক্ষ হইতে এক কার্য্য হয়, কিন্তু বন হইতে তাহা ছাড়া অন্য কার্য্যও সাধিত হয়। সমস্ত বৃক্ষের যে একটী সাধারণ ভাব আছে, তাহা সেই বনের ভাব। বন বলিলে সমুদায় বৃক্ষ বুঝায়—বৃক্ষ বলিলে কিন্তু বন বুঝায় না। বৃক্ষের শক্তি অল্প, বনের শক্তি মহতী। বনত্ব বৃক্ষত্বের রক্ষক ও সহায়, এই ভাবে বনকে বৃক্ষের নিয়ামক কহা যাইতে পারে। কোন কৌশলে বৃক্ষ যদি বনত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে বনের মহতী শক্তি বৃক্ষও প্রাপ্ত হইবে।

ব্যষ্টিভাবে দেখা যায়, সর্ব্ব প্রাণীরই যথাসম্ভব সুখেচ্ছা, জীবিতাশা, জ্ঞান-পিপাসা বা শক্তিপ্রিয়তা বর্ত্তমান, সুতরাং সর্ব্বপ্রাণিসমষ্টি ভগবানেও ঐ বৃত্তি বর্ত্তমান। এজন্য ভগবান্‌কে মঙ্গলময় বলা হয়। যদি কেহ স্বীয় মঙ্গল কামনার সহিত অপরের মঙ্গল কামনা করে, স্বীয় রক্ষণাবেক্ষণের সহিত অপরেরও তাহাই করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে ঈশ্বরীয় বৃত্তির অনুগামী হইয়াছে, এবং তৎসংসৃষ্ট ঈশ্বরীয় ভাবের বা সুখের কিছু আস্বাদ পাইবে। আবার তাহার প্রতিকূলতা আচরণ করিলে তদ্বিপরীত দুঃখও অবশ্যম্ভাবী।

বলিতে পারা যায়, তবে ভগবানের দুঃখের সৃষ্টি করা কেন? উত্তরে বলিব, সুখের মাত্রা বৃদ্ধি করাই উহার উদ্দেশ্য ; কারণ, দুঃখের পর সুখ বড়ই প্রিয় হয়, এবং নিয়ত দুঃখ কোথায়ও নাই। আর দুঃখের উদ্দেশ্যে ভগবান্

দুঃখসৃষ্টি করেন নাই। ব্যষ্টিভাবের শক্তি একত্র হইলে সমষ্টিভাবের শক্তিতে পরিণত হয়, এবং সেই হেতু সমষ্টি ভাবের শক্তির যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যই, তাঁহার শক্তির পরিচায়ক, সুতরাং ব্যষ্টিভাবের শক্তি একত্র হইলে ঐশ্বর্য্য আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং ঐশ্বর্য্যের ফল যে সুখ ও আনন্দ, তাহাও আসিবে। ব্যষ্টি জীবের জ্ঞান যে যে বিষয়ে সমষ্টি ভাবের সহিত মিলিত হইবে, সেই সেই বিষয়ে অজ্ঞান দূর হইয়া যাইবে এবং ক্রমে সার্ব্বজনীন উৎকর্ষ সাধনে সকলকে সহায়তা করিবে।

সর্ব্ব বিষয়ক অজ্ঞান দূর হইলে যে পরিশেষে ভগবৎস্বরূপতা লাভ সুনিশ্চয়, এতদ্দ্বারা তাহা বেশ বুঝা যায়। এই ব্যক্ত জগতে ভগবানের যতটুকু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে, তাহা লাভ করিলে, উক্ত ফলগুলি যে আপনি আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব ভগবত্তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তি দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে নিজের যেমন ইহপারলৌকিক উপকার সাধিত হয়, সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জাতিরও তদ্রূপ উপকার সাধিত হয়। ইহাতে আত্মপরভাব হ্রাস পাইয়া, সকল বস্তুতে আত্মভাব সমুদিত হয়। জীবের কর্ত্তব্য শাস্ত্র এই ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইলে উহা যে সার্ব্বভৌমিক ও সকলের আদরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেখিলাম, পরমেশ্বরের তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে আমাদের কর্ত্তব্যসূত্রগুলিও বুঝা যায়। যে মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করি, তাহা জীব ও পরমেশ্বরের স্বভাবের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ইহাদের স্বভাব আলোচনা করিতে পারিলে কি বিধেয়, তাহা আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

পূর্ব্বে যাহা আলোচনা করা হইল, তাহাতে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতকটা সাধারণ সত্য নিরূপণ করা সম্ভব বোধ হয় বটে কিন্তু জীবের কর্ত্তৃত্ব বা স্বাধীনতা যদি না থাকে, তাহা হইলে, উক্ত প্রয়াস বৃথা। জীবের স্বাধীনতা যদি থাকে, তবেই তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ সার্থক, তবেই তাহার মন্দ প্রবৃত্তিনিচয় পরিবর্ত্তন সাধনের সফলতা। স্বভাবের স্রোতে যদি আমরা স্থির পরিচালিত হই, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্ব চেষ্টাই বৃথা। সুতরাং অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনার চেষ্টা করিব।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

শ্রীম—কথিত।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভক্ত সঙ্গে।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীবিজয়া দশমী। ১৮ই অক্টোবর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শরীর অসুস্থ—কলিকাতায় চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা সর্ব্বদাই থাকেন, ঠাকুরের সেবা করেন। ভক্তদের মধ্যে এখন কেহ সংসার ত্যাগ করেন নাই—তাঁহারা নিজের বাটী হইতে যাতায়াত করেন।

[সুরেন্দ্রের ভক্তি।]

শীতকাল, সকাল বেলা ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর অসুস্থ, বিছানায় বসিয়া আছেন। কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মত; মা বই কিছু জানেন না। সুরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন। নবগোপাল, মাষ্টার ও আরও কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রের বাটীতে ৺দুর্গাপূজা হইয়াছিল। ঠাকুর যাইতে পারেন নাই, তাই ভক্তদের প্রতিমা দর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আজ বিজয়া, তাই সুরেন্দ্রের মন খারাপ হইয়াছে।

সুরেন্দ্র। বাড়ী থেকে পালিয়ে এলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তা হলেই বা। মা হৃদয়ে থাকুন।

সুরেন্দ্র মা মা করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে কত কথা কহিতে লাগিলেন। ঠাকুর সুরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া গদ গদ স্বরে বলিতেছেন, কি ভক্তি! আহা, এঁর যা ভক্তি আছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সুরেন্দ্রের প্রতি)। কাল ৭টা ৭॥০ টার সময় ভাবে দেখ্‌লাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর প্রতিমা রহিয়াছেন, দেখ্‌লাম সব জ্যোতি-

---

* দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত। For opinions see advertisement sheets.

র্ম্ময়। এখানে ওখানে এক হ'য়ে আছে! যেন একটা আলোর স্রোত দু জায়গার মাঝে বইছে!

সুরেন্দ্র। আমি তখন ঠাকুর দালানে মা মা বলে ডাক্‌ছি, দাদারা ত্যাগ করে উপরে চলে গেছে। মনে উঠ্‌লো, মা বল্লেন, আমি আবার আস্‌বো।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও শ্রীভগবদ্গীতা।)

বেলা এগারটা বাজিবে। ঠাকুর পথ্য পাইলেন। মণি হাতে আঁচাবার জল দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। ছোলার ডাল খেয়ে রাখালের অসুখ হয়েছে। সাত্ত্বিক আহার করা ভাল। তুমি গীতা দেখ নাই?

মণি। আজ্ঞা হাঁ, যুক্তাহারের কথা আছে। সাত্ত্বিক আহার, রাজসিক আহার, তামসিক আহার। আবার সাত্ত্বিক দয়া, রাজসিক দয়া, তামসিক দয়া। সাত্ত্বিক অহং ইত্যাদি সব আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। গীতা তোমার আছে?

মণি। আজ্ঞা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওতে সর্ব্বশাস্ত্রের সার আছে।

মণি। আজ্ঞা, ঈশ্বরকে নানা রকমে দেখার কথা আছে; আপনি যেমন বলেন, নানা পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ধ্যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্ম্মযোগ মানে কি জান? সকল কর্ম্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করা।

মণি। আজ্ঞা, দেখেছি ওতে আছে। কর্ম্ম আবার তিন রকমে করা যেতে পারে, আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি কি রকম?

মণি। প্রথম, জ্ঞানের জন্য। দ্বিতীয়, লোকশিক্ষার জন্য। তৃতীয়, স্বভাবে।

ঠাকুর আচমনান্তে পান খাইতেছেন। মণিকে মুখ হইতে পান প্রসাদ দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ, Sir Humphrey Davy ও অবতারবাদ।]

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত ডাক্তার সরকারের কথা কহিতেছেন। পূর্ব্বদিনে ঠাকুরের সংবাদ লইয়া মাষ্টার ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার সঙ্গে কি কি কথা হলো?

মাষ্টার। ডাক্তারের ঘরে অনেক বই আছে। আমি এক খান বই সেখানে বসে বসে পড়্‌ছিলাম। সেই সব পড়ে আবার ডাক্তারকে শোনাতে লাগ্‌লাম। Sir Humphrey Davy *র বই। তাতে অবতারের প্রয়োজন, এ কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে? তুমি কি কথা বলেছিলে?

মাষ্টার। একটা কথা আছে, ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়ে না এলে মানুষে বুঝ্‌তে পারে না। (Divine truth must be made human truth to be appreciated by us.) তাই অবতারাদির প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাঃ, এ সব ত বেশ কথা!

মাষ্টার। সাহেব উপমা দিয়েছে, যেমন সূর্য্যের দিকে চাওয়া যায় না, কিন্তু সূর্য্যের আলো যেখানে পড়ে, (Reflected rays) সে দিকে চাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেশ কথা, আর কিছু আছে?

মাষ্টার। আর এক জায়গায় ছিল, যথার্থ জ্ঞান-হচ্চে বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ তো খুব ভাল কথা। বিশ্বাস হ'লে ত সবই হয়ে গেল!

মাষ্টার। সাহেব আবার স্বপন দেখেছিলেন,—রোমানদের দেব দেবী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এমন সব বই রয়েছে? তিনিই (ঈশ্বর) সেখানে কায করছেন। আর কিছু কথা হ'লো?

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও 'জগতের উপকার'।]

মাষ্টার। ওরা বলে, জগতের উপকার কর্‌বো। তাই আমি আপনার কথা বল্‌লাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কি কথা?

---

* Sir Humphrey Davy's *Consolations in travel or the Last Days of a Philosopher.*

শিক্ষাপ্রণালী অধীত হয় এবং ব্যবহার শাস্ত্র ও রাজনীতি স্বতন্ত্র আইন শিক্ষার কলেজে অধ্যাপনা হয়ে থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও সাহিত্য কলেজের শিক্ষা শেষ হলে যাহারা বিশেষ অনুশীলন কর্‌তে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের জন্য বিশেষ শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে (Post-graduate course.)। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বৃহৎ পুস্তকাগার, চিকিৎসা কলেজের আনুষঙ্গিক চিকিৎসালয়, জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদিস্থান (Observatory) পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র ও কৃষিবিদ্যা অনুশীলনার্থ ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরি (Laboratory) প্রভৃতি আধুনিক উপকরণ সকল শিক্ষার সহায়তা করছে। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখ্‌বার জন্য বহুবিস্তৃত নানাজাতীয় ও নানাদেশীয় বৃক্ষলতাদিপরিপূর্ণ বাগান, জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা ও সামুদ্রিক ল্যাবরেটরি, কৃষিক্ষেত্র, পশুচিকিৎসালয়, বনবৃক্ষের উৎকর্ষ সাধন কর্‌বার জন্য বৃক্ষপূর্ণ বন, রেসমের চাষের উন্নতি-কল্পে বিশেষ কৌশলে নির্ম্মিত অট্টালিকাদি নগরের বিভিন্ন স্থলে অবস্থিত। এ সমস্তই কলেজের ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য সমস্ত দিন ও রাত্রি উন্মুক্ত। উপরে যে সকল বিদ্যাশিক্ষার কথা বলা হল, ইহার প্রত্যেক শিক্ষা বিশেষে ব্যুৎপন্ন হতে ৩।৪ বৎসর কাল বিভিন্ন কলেজে অভ্যাস কর্‌তে হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এইখানেই শেষ হয় না।

যাঁরা শাস্ত্রবিশেষে পারদর্শী হ'তে ইচ্ছা করেন, তাঁরা উপরোক্ত শিক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বিশ্ববিদ্যালয়মন্দিরে (University Hall) পাঁচ বৎসর সেই বিষয়ের অনুশীলন করে থাকেন্। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরই জাপানে উচ্চশিক্ষার শেষ সোপান। ইহাই Post-graduate course। বৈজ্ঞানিক উচ্চ-শিক্ষার জন্য জাপান এখন পরমুখাপেক্ষী নয়। প্রথমে বিদেশীয় অধ্যাপকদিগের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি অধ্যাপনা হ'ত, কিন্তু আজ এই ক'দিনে বিজ্ঞানজগতে জাপানের নাম ধন্য হ'য়েছে। আজ বিজ্ঞানের কত গূঢ় তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটন জাপানি মস্তিষ্কপ্রসূত। জাপানও আজ বিজ্ঞানবিদ্ তত্ত্বদর্শী শিক্ষাগুরুর স্থান অধিকার করেছে। জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী অধ্যাপকের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হচ্চে।

ক্রমশঃ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ২৭শে জানুয়ারি বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিপূজা ও তৎপরদিন রবিবার ২৯শে জানুয়ারি সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসব হইবে। তদুপলক্ষে বেদাদি পাঠ, সঙ্গীত, কাঙ্গালী ভোজন প্রভৃতি হইবে।

বিগত ১৬ই ডিসেম্বর মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ে কলিকাতা বিবেকানন্দ-সমিতির এক অধিবেশন হয়। স্বামী সারদানন্দ 'সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে গীতার উপদেশ' বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন।

দেশের জন্য কোন সৎকার্য্য করিবার প্রস্তাব হইলে অনেকেই এই বলিয়া আপত্তি করেন,—এ কার্য্যে অগাধ অর্থের প্রয়োজন। আমাদের সে ধনবল কোথায়? ধনের আবশ্যকতা আছে বটে, কিন্তু প্রথম চাই লোকবল, যাঁহারা পদব্রজে লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্ম্মের ও সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক বিদ্যার বিস্তার করিবেন, দেশের অভাব স্বচক্ষে দেখিবেন, লোকের কষ্ট প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবেন, পরে প্রাণ দিয়া সেই অভাব মোচনে সহায়তা করিবেন। যাঁহারা দেশকে ইষ্ট বলিয়া জানিবেন, নরসেবাকে ঈশ্বরসেবার সহিত অভেদজ্ঞান করিবেন।

এ বিষয়ে ত শিক্ষা দীক্ষা আবশ্যক? আবশ্যক বৈ কি। তজ্জন্য 'ব্রতধারী' বিদ্যালয় চতুর্দ্দিকে প্রয়োজন। প্রাচীনকালের গুরুগৃহের কতকটা ভাব লইয়া তাহাতে সেবা, সাধন, অধ্যয়ন প্রভৃতি শিক্ষা আবশ্যক।

গুরুগোবিন্দ সিং সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তিনি এক সময় শক্তি পূজা করিয়া শিষ্যগণের সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন যে, মা নরবলি চাহিয়াছেন, অতএব তোমাদের মধ্যে কে কে বলি হইবার জন্য প্রস্তুত? একজন অগ্রসর হইল। তাহাকে যবনিকার মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। তাহার রক্ত অপর শিষ্যগণকে প্রদর্শিত হইল। আর কে প্রস্তুত বলিয়া আহ্বান করা হইল, আর একজন অগ্রসর হইল। এইরূপে কয়েকজনকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ মায়ের জন্য বলি দেওয়া হইল। তাহারাই পরে শিখদিগের গৌরবপ্রতিষ্ঠার নেতা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সাধকগণকে কেবল ছাগরক্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মাষ্টার। শম্ভু মল্লিকের কথা। সে আপনাকে বলেছিল, আমার ইচ্ছা যে, টাকা দিয়ে কতকগুলি হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সরী, স্কুল এই সব করে দি, তা হ'লে অনেকের উপকার হ'বে। আপনি তাকে যা বলেছিলেন, তাই বল্লুম, "যদি ঈশ্বর সম্মুখে আসেন,তবে তুমি কি বল্বে, আমাকে কতকগুলি হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সরী, স্কুল করে দাও?"। আর একটা কথা বল্লাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, থাক্ আলাদা আছে, তারা কর্ম্ম কর্ত্তে আসে। আর কি কথা?

মাষ্টার। বল্লাম, কালী দর্শন যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে রাস্তায় কেবল কাঙ্গালী বিদায় কর্লে কি হবে? বরং যো সো করে একবার কালী দর্শন করে নাও, তার পর যত কাঙ্গালী বিদায় কর্ত্তে ইচ্ছা হয় করো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর কিছু কথা হ'লো?

[ঠাকুরের ভক্ত ও কামজয়।]

মাষ্টার। আপনার কাছে যারা আসে, তাদের অনেকে কাম জয় করেছেন, এই কথা হলো। ডাক্তার তখন বল্লে, "আমারও কাম টাম উঠে গেছে, জানো"। আমি বল্লাম, আপনি তো বড় লোক! আপনি যে কাম জয় করেছেন, বল্ছেন, তাতো আশ্চর্য্য নয়। ক্ষুদ্র প্রাণীদের পর্য্যন্ত তাঁর কাছে থেকে যে ইন্দ্রিয় জয় হচ্ছে, এই আশ্চর্য্য।

"তার পর আমি বল্লাম, আপনি যা গিরীশঘোষকে বলেছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কি বলেছিলাম?

মাষ্টার। আপনি গিরীশ ঘোষকে বলেছিলেন, 'ডাক্তার তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নাই।' সেই অবতারের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি অবতারের কথা তাঁকে (ডাক্তারকে) বল্বে। অবতার অর্থাৎ যিনি তারণ করেন। তা দশাবতার আছে, চব্বিশ অবতার আছে আবার অসংখ্য অবতার আছে।

মাষ্টার। গিরীশ ঘোষের ভারি খবর নেয়। কেবল জিজ্ঞাসা করে, গিরীশ ঘোষ কি সব মদ ছেড়েছে? গিরীশ ঘোষের উপর বড় চোখ্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি গিরীশ ঘোষকে ও কথা বলেছিলে?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ, বলেছিলাম। আর, সব মদ ছাড়্বার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি ব'ল্‌লে ?

মাষ্টার। তিনি বল্‌লেন, তোমরা যে কালে বল্‌ছো, সেকালে ঠাকুরের কথা বলে মানি—কিন্তু আর জোর ক'রে কোন কথা বোল্‌বো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কালীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও নিত্যলীলা যোগ।]

[Identity of the Absolute or the Universal Ego and the Phenomenal world.]

বৈকাল হইয়াছে, ডাক্তার আসিয়াছেন। অমৃত (ডাক্তারের ছেলে) ও হেম, ডাক্তারের সঙ্গে আসিয়াছেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরাও উপস্থিত আছেন।

ঠাকুর নিভৃতে অমৃতের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার কি ধ্যান হয় ? আর বলিতেছেন,—'ধ্যানের অবস্থা কি রকম জান ? মনটী হয়ে যায় তৈলধারার ন্যায়। এক চিন্তা, ঈশ্বরের ; অন্য কোন চিন্তা তার ভিতর আস্‌বে না'। এইবার ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। তোমার ছেলে অবতার মানে না। তা বেশ। নাই বা মান্‌লে।

"তোমার ছেলেটী বেশ। তা হবে না ? বোম্বাই আমের গাছে কি টোকো আম হয় ? তার ঈশ্বরে কেমন বিশ্বাস। সেই ত মানুষ। মানুষ আর মানহুঁস্। যার হুঁস্ আছে, চৈতন্য আছে, সে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য—সেই মান হুঁস্।

"তা অবতার মানে না, তাতে দোষ কি ? ঈশ্বর ; আর এ সব জীব জগৎ, তাঁর ঐশ্বর্য্য। এ মান্‌লেই হলো। যেমন বড় মানুষ আর তার বাগান।

"এ রকম আছে, দশ অবতার—চব্বিশ অবতার আবার অসংখ্য অবতার। যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ, সেখানেই অবতার। তাইত আমার মত।

"আর এক আছে, যা কিছু দেখ্‌ছো, এ সব তিনি হয়েছেন। যেমন

বেল, বিচি, খোলা, শাঁস তিন জড়িয়ে এক। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা, যাঁরই লীলা, তাঁরই নিত্য। নিত্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বোঝা যায় না। লীলা আছে বলেই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিত্যে পৌঁছান যায়।

"অহংবুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ লীলা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। নেতি নেতি করে ধ্যানযোগের ভিতর দিয়ে নিত্যে পৌঁছান যেতে পারে। কিন্তু কিছুই ছাড়্‌বার যো নাই। যেমন বল্‌লাম—বেল।

ডাক্তার। ঠিক কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কচ* নির্ব্বিকল্প সমাধিতে রয়েছেন। যখন সমাধি ভঙ্গ হচ্ছে, একজন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তুমি এখন কি দেখ্‌ছো? কচ বল্‌লেন, দেখ্‌ছি যে, জগৎ যেন তাঁতে জরে রয়েছে। তিনিই পরিপূর্ণ। যা কিছু দেখ্‌ছি, সব তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর কোন্‌টা ফেল্‌বো, কোনটা লবো, ঠিক পাচ্চি না।

"কি জান নিত্য আর লীলা দর্শন করে, দাস ভাবে থাকা। হনুমান সাকার, নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তার পরে, দাস ভাবে ভক্তের ভাবে ছিলেন।

মণি (স্বগতঃ)। নিত্য লীলা দুইই নিতে হবে। জর্ম্মানিতে বেদান্ত যাওয়া অবধি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাহারও কাহারও এইমত†। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন, সব ত্যাগ—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ—না হলে নিত্য ও লীলার সাক্ষাৎকার হয় না। ঠিক ঠিক ত্যাগী। সম্পূর্ণ অনাসক্তি। এইটুকু ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ দেখ্‌ছি।

নূতন জাপান।

স্বামী সদানন্দ লিখিত।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

সহর বেড়িয়ে আমরা কোবি ষ্টেসনে ফিরে এলুম। কোবি থেকে টোকিও পর্য্যন্ত রেলপথ। আমরা যে, গাড়িতে চড়্‌লুম, তাহা ডাক গাড়ি; আমেরিকার অনুকরণে প্রস্তুত, ঘুমোবার ও খাবার স্বতন্ত্র

---

* যোগবাশিষ্ঠ।

† Hegel

কামরা আছে। প্রত্যেক ট্রেনে কতকগুলি বালক চাকর যাত্রীদের জিনিষ-পত্র কেনা, বিছানা করা, কাপড় জুতা পরিষ্কার করা প্রভৃতি সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। এই রেল পথটী অনেক পাহাড় কেটে করতে হ'য়েছে সুতরাং যা'বার সময় বিস্তর টনেল (Tunnel) দেখা গেল। রেলের দু'ধারেই ধানের ক্ষেত। যে দিকে দেখ, ঝরনা হ'তে জল পড়্‌চে, চারিদিকেই সরু সরু নদী। জাপানে কিরূপ ইউরোপীয় ব্যবসায় বুদ্ধি প্রবেশ ক'রেছে, তা রেল দেখ্‌লেই বুঝা যায়। ষ্টেসনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছাড়া, রেলপথের দু'পাশেই বড় বড় কাঠের বোর্ডে অসংখ্য বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। জাপানের প্রত্যেক ষ্টেসনে এ দেশের পুরি মিঠাই বা রুটি গোসের মত যাত্রীদের আহারের জন্য এক একটী ছোট কাগজের বাক্সের ভিতর ভাত মাছ ও ব্যঞ্জন, সঙ্গে দুটি কাটি, বিক্রী হয়ে থাকে। ১৮৭২ সালে জাপানে প্রথম রেল খোলা হয়। প্রথম বৎসর ১৮ মাইল নির্ম্মাণ হয়েছিল। ১৯০১ সালে ৪০০০ মাইল রেল খোলা হয়েছে। ইহার মধ্যে প্রায় ১০০০ মাইল রেল রাজসরকার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত; বাকি ৩০০০ মাইল বে-সরকারি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির দ্বারায় প্রস্তুত। এই রেলপথ নির্ম্মাণ করতে রাজভাণ্ডার হ'তে প্রায় কুড়ি কোটী এবং বিভিন্ন কোম্পানির বত্রিশ কোটী টাকা মূলধন ব্যয় হয়েছে। জাপান রাজত্বের প্রথম উদ্দেশ্য,—সকল কার্য্য, সকল ব্যবসায় প্রজাদের জন্য খুলে দেওয়া। প্রজারা শিক্ষিত হ'বে এই সকল কার্য্যভার নিজেরা যেমন গ্রহণ করছে, রাজহস্তও ধীরে ধীরে সে সকল তাদের উপর অর্পণ করছে।

আমাদের জাপানি সমভিব্যাহারী ইয়োকোহামা (Yokohama) যাবার জন্য আমাদের নিকট বিদায় নিলেন। তাঁর সহিত আলাপ অবধি আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁর অতিথি হয়ে আসছিলাম, তাঁহার সহযোগে আমাদের বিদেশের কোন কষ্ট ভুগ্‌তে হয় নি। বিদেশীর প্রতি এরূপ আতিথ্য জাপান ভিন্ন অন্য কোথাও আছে কি না জানি না। টোকিওতে কোন পূর্ব্বপরিচিত জাপানি বন্ধুর বাটীতে আমরা অতিথি হব স্থির করেছিলাম। ইহাঁকে তাঁহার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করায় জাপানি ভাষায় লিখে দিয়ে বল্লেন, যে কোন পুলিষের লোককে ইহা দেখালেই আমরা গন্তব্য স্থানে যেতে পার্‌বো। তাঁহার নিঃস্বার্থ আতিথ্যের জন্য শত শত ধন্যবাদ দিয়ে আমরা পরস্পর বিদায়

নূতন জাপান।

কু সিঙ্গাপুর ষ্টেসনে উপস্থিত। ৭ই জুলাই
২ই আগষ্ট প্রায় একমাসে আমরা জাপানের
সুম। পিতলের চাক্তি দেখাবামাত্র কুলিরা
য় একটী কুকমা (রিক্সর জাপানি নাম)
কুকমাওলাকে আমাদের ঠিকানা দিয়ে একজন
পথ জেনে নিতে বল্লুম। জাপানি পুলিশ কি
সকলেরই সহায় স্বরূপ। তাহারা যেরূপ দেশের শান্তি-
ব্যক্তিরও যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকে। যদি কোন
ভিজ্ঞ বিদেশী লোক বিপদে পড়ে, রাস্তা থেকে টেলিফোঁ
নিয়ে পুলিস তার তদন্ত করে থাকে। জাপান দেখে
শিক্ষা এই—সেখানে সম্রাট্ থেকে সামান্য পুলিস পর্য্যন্ত
াকে প্রজা সাধারণের প্রতিনিধি জ্ঞান করে। প্রজার সুখ
স্ত তারা—তারা প্রজারক্ষক, যথার্থই "আপত্রাতা।" আর
জ, মাজিষ্ট্রর, মিউনিসিপালিটি, পুলিস, কেরানিবাবু পর্য্যন্ত দেশের
তিনিধি—সকলেই সরকারের চাকর, ভারতের প্রজা সাধারণের
াদের ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ। পুলিসের লোক বাড়ি এলেই
উপস্থিত মনে করি; সর্ব্বস্বান্ত হলেও লোকে পুলিসের
া করতে চায না। ষোল আনা টেক্স দিয়েও প্রজাকুল মিউনিসি-
র নিকট জোড়হস্ত। সকল অবস্থাতেই আমাদের "নায়ের কড়ি
় ডুবে পার।

টোকিওতে আমরা যেখানে বাসা ভাড়া কল্লুম, তাহার অতি নিকটেই
পানের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় (Tokio Imperial University)। যে সকল
ক্তির সম্মিলনে নূতন জাপানের অভ্যুদয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা তাহাদের
মধ্যে প্রধান। পূর্ব্বে এ দেশের চতুষ্পাঠীতে যেমন সংস্কৃত কাব্য অলঙ্কার
ব্যকরণ ন্যায় দর্শনাদির চর্চ্চা হ'ত ও ব্রাহ্মণবর্ণের ভিতর সেই সকল বিদ্যা
আবদ্ধ ছিল, জাপানেও সেইরূপ চীন সাহিত্যের ও শাস্ত্রগ্রন্থের আদর ও
অনুশীলন হ'ত। রাজা ও জমীদারদিগের সভাতেই বিদ্বজ্জনেরা আপনাদের
পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন। লেখা পড়া প্রধানতঃ বৌদ্ধ শ্রমণদের হাতে ছিল।
যখন কোন শাসনকর্ত্তা (সোগুণ) বিদ্যানুরাগী হ'তেন, তিনি গ্রাম্য
পাঠশালা স্থাপন করে সাধারণ শিক্ষার কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা করতেন কিন্তু

দেশের মত জাপানেও উচ্চবর্ণ ভিন্ন দেবতা
ভারতের ন্যায় জাপানের অদৃষ্ট আকাশে যত দি
না হয়েছিল, ততদিন জাপান আপনার প্রাচী
শিল্প বজায় রেখে সুখে দুঃখে জীবন যাত্রা নি
মুহূর্ত্তে ম ..র্কিন নৌসেনাপতি কমোডর পেরির (Com
জাহাজ থেকে জাপানের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত কর্‌বার জন্য
হ'ল, জা ানের জনকতক সূক্ষ্মদর্শী লোক স্থির বুঝ্‌লেন
কর্‌তে তাঁহাদের প্রাচীন শিক্ষা কৌশল অক্ষম। অন্যে
পশ্চাতে এক নূতন জ্ঞানবল বর্ত্তমান। যদি এই জা
বিপদ্ থেকে উদ্ধারের কোন উপায় থাকে, যদি জাপা
রক্ষা কর্‌তে চায়, তা হ'লে এই নূতন বিজ্ঞানবল সহ
নচেৎ নয়। জাপান বুঝ্‌লে, যদি তার চিরাগত স্বাধ
নষ্ট হয়, তবে তার ধর্ম্মকর্ম্ম, ইহলোক পরলোক চিরদিনের
অতলজলে নিমজ্জিত হবে। এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানরূপ মহাশক্তির
জাপান প্রাণ মন উৎসর্গ কর্‌লে। জাপান নিজের সমাজ, ধর্ম্ম,
আচারাদি সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত; বিদেশীয় আহার, বি
চ্ছদ, বিদেশীয় সমাজ, বিদেশীয় ধর্ম্মগ্রহণ কর্‌তে কুণ্ঠিত নয়, :
মহাদেবীপ্রসাদে দুইসহস্র বৎসরের স্বাধীনতা রক্ষা কর্‌তে স.
জাপানের মহা সাধনা সিদ্ধ হয়েছে, আজ জগৎ তাহার সাক্ষী।
জাপানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন শিক্ষা জাপানে প্রবর্ত্তিত হো
১৮৭২ সালে নূতন শিক্ষাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয়ে রাজ আজ্ঞায় দেশ ম
প্রচারিত হোলো। সম্রাট্ ঘোষণা কর্‌লেন—"কি রাজশাসনসম্বন্ধীয় কার্য্য
কি বাণিজ্য, কি কৃষিকর্ম্ম, কি শিল্প চিকিৎসা, যে কোন বৃত্তি হউক না, সকল
বিষয়েরই, জ্ঞান লাভের উপায় শিক্ষা। অদ্যাবধি শিক্ষাপ্রণালী এরূপ
বিস্তারত হবে যে, কোন গ্রামে একটীও অজ্ঞ পরিবার অবস্থান কর্‌বে
না, কোন পরিবারে একটীমাত্র লোকও মূর্খ থাকবে না।" জাপানের
অদৃষ্টক্রমে এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের হাতে তার শাসনভার ন্যস্ত হয়েছিল।
তাঁহারই পুণ্যে জাপানের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না।

বর্ত্তমান শিক্ষা আইনে প্রত্যেক বালক বালিকাকে সাধারণ বা জাতীয়
শিক্ষা (National Educaton) লাভ কর্‌তে হবে। ছয় বৎসর বয়স

১৮৭২ খৃঃ পিতা, মাতা বা অভিভাবক প্রত্যেক বালক ও বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য। ছয় বৎসর হ'তে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাধারণ বা জাতীয় শিক্ষার কাল। যাহাতে অতি দীনদরিদ্রও এই সাধারণ শিক্ষা লাভ কর্‌তে পারে, তজ্জন্য প্রত্যেক গ্রাম্য সমিতি ও মিউনিসিপালিটি বিনা বেতনে বিদ্যা দান কর্‌বার জন্য পাঠশালা স্থাপন করে। বিশেষ কারণ থাকলে স্থানীয় শাসনকর্ত্তার অনুমতি নিয়ে শিক্ষার্থীর নিকট বেতন লবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু এই জাতীয় শিক্ষা আপামর সাধারণ বিনা বেতনে লাভ করে, ইহাই রাজ আজ্ঞা। যদি অবস্থার বৈগুণ্যে ছেলেটিকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে হয়, তা হ'লেও যাতে শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত না হয়, নিয়োগকর্ত্তাকে এরূপ ব্যবস্থা কর্‌তে হয়। ১৯০৩ সালে প্রায় ২৬৮০০ এইরূপ পাঠশালা (Primary School) ৪৮ লক্ষ বালক ও বালিকাকে জাতীয় শিক্ষাদান কর্‌ছিল। প্রত্যেক একশত শিক্ষোপযোগী বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের মধ্যে ৯১ জন ঐ বৎসর শিক্ষালাভ কর্‌তে পাঠশালায় প্রবেশ করে। এই সকল পাঠশালার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রাম্য সমিতি ও মিউনিসিপালিটি বহন করে। অর্থাভাবে পাঠশালা স্থাপনে অসমর্থ হ'লে রাজভাণ্ডার থেকে ব্যয় সঙ্কুলান হয়ে থাকে।

এই জাতীয় শিক্ষার দুটি শ্রেণী আছে। নিম্নশ্রেণীর পাঠশালায় জাপানি ভাষা, গণিত, নীতি ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহা ছাড়া চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও কামার ও ছুতারের কর্ম্ম, স্থানবিশেষে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। চারি বৎসর এইরূপ শিক্ষা লাভ করে উচ্চ শ্রেণীর পাঠশালায় প্রবেশ কর্‌তে হয়। এখানে দুই হইতে চারিবৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ কর্‌লে সাধারণ বা জাতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। উচ্চশ্রেণীর পাঠশালায় জাপানি ভাষা, নীতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা ব্যতীত স্থান-বিশেষে কৃষি, ব্যবসায়বিশেষ বা সূত্রধরাদির কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বালিকারা বিশেষ বিশেষ শিল্পকর্ম্ম, সেলাই প্রভৃতি শিক্ষা করে।

এই জাতীয় শিক্ষা দিন দিন এরূপ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, স্থানা-ভাবে দেবমন্দির, লোকের আবাসগৃহ প্রভৃতি স্থানে পাঠশালা স্থাপন করে শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হচ্চে।

দ্বাদশ হতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কোন বিশেষ অর্থকরী শিক্ষা লাভ কর্‌বার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে প্রবেশ

কর তে হয়। এইরূপ বিদ্যালয়ের নাম মধ্য বিদ্যালয় (Middle ...
এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ দৃষ্টি থাকে। ইহাতে শিক্ষার কাল পাঁচ বৎসর। জাপানি ভাষা, পাটীগণিত, বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদির সহিত স্থানবিশেষে ব্যবসায় বা উপজীবিকাবিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে ইচ্ছা করে, এ ... দিগেরও উপযোগী মোটামুটি শিক্ষাবিধান আছে। যাহারা ব্যবসায় ও বৃত্তি বিশেষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে যত্নবান, তাঁহারা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল শেষ করে বিশেষ টেক্‌নিকাল (Technical) বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং যাঁহারা বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারি প্রভৃতিতে বুৎপন্ন হ'তে প্রয়াসী, তাঁহারা আর একশ্রেণীর উচ্চ বিদ্যালয়ে (High school) তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাবার উপযোগী হন। গত ১৯০২ সালে ২১৮টি মধ্য বিদ্যালয়ে প্রায় ৭৮০০০ ছাত্র শিক্ষালাভ করছিল। ঐ বৎসর প্রায় ৩৭০০ ছাত্র বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অধিকাংশই উচ্চ ও টেক্‌নিকাল বিদ্যালয়ে এবং অল্পসংখ্যক সৈনিক বিভাগে, ব্যবসায়বিশেষে ও রাজসরকারে নিযুক্ত হয়েছিল। এখন জাপানে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮টি। উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী ছাত্রগণ অধ্যয়ন করে থাকে। জাপানে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়। একটী বর্ত্তমান রাজধানী টোকিওতে, অপরটী প্রাচীন রাজধানী কিয়োটোতে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় নগরের বিস্তীর্ণ প্রদেশ নিয়ে অবস্থিত; ইহার মধ্যে ছয়টি কলেজ আছে। ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে, সিভিল (Civil) মেকানিকাল (Mechanical) ইলেক্‌ট্রিক (Electric) ইঞ্জিনিয়ারিং, জাহাজ নির্ম্মাণ, কামান বন্দুকাদি প্রস্তুত, স্থপতিবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, বারুদাদি প্রস্তুত প্রণালী, খনিজ-দ্রব্য বহিষ্করণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুদর্শী অধ্যাপকেরা শিক্ষাদান করেন; বিজ্ঞান কলেজে গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবৃত্তান্ত, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি আলোচিত হয়। কৃষিকলেজে কৃষিবিদ্যা, কৃষিসম্বন্ধীয় রসায়ন, অশ্বগবাদি প্রতিপালন ও চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়। সাহিত্য কলেজে দর্শন, জাপানি সাহিত্য, চীন সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাশাস্ত্র, ইংরাজি, জর্ম্মন ও ফরাসি সাহিত্য অনুশীলন হয়ে থাকে। চিকিৎসা কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র ও ঔষধাদি